

গল্প সমগ্র

হুমায়ূন আহমেদ



গল্প সমগ্র

AMARBOL.COM

গল্প সমগ্র

হুমায়ূন আহমেদ

AMARBOL.COM

AMARPOL.COM

উৎসর্গ
রাসেল ইমায়ূন

সূচিপত্র

রূপা / ৯

বুড়ি / ১৩

একটি নীল বোতাম / ১৯

পিঁপড়া / ২৬

উনিশ শ' একাত্তর / ৩৬

কুকুর / ৪২

একজন সুখী মানুষ / ৪৯

জুয়া / ৫৬

জীবন যাপন / ৬২

সে / ৬৯

খেলা / ৮০

কল্যাণীয়াসু / ৮৪

নিমধ্যমা / ৯৬

শিকার / ১১০

অসুখ / ১১৬

খাদক / ১২০

ফেরা / ১২৭

তুচ্ছ / ১৩০

দ্বিতীয় জন / ১৩৪

সাদা গাড়ি / ১৪৪

অসময় / ১৫১

পাখির পালক / ১৫৫

বেবি রুথ / ১৬৪

চোখ / ১৬৯

একজন ক্রীতদাস / ১৮৮

অপরাজ / ১৯২

জিন-কফিল / ১৯৭

কবি / ২৩১

রহস্য / ২৩৫

বীনার অসুখ / ২৩৯

অয়োময় / ২৪৯

সঙ্গিনী / ২৫৬

অঙ্ক শ্লোক / ২৬৮

বান / ২৭৩

শঙ্খমালা / ২৭৬

নিউটনের ভুল সূত্র / ২৮০

মন্ত্রীর হেলিকপ্টার / ৩০০

ভয় / ৩০৫

অচিন বৃক্ষ / ৩২১

নিশিকাব্য / ৩৩০

কৃষ্ণপক্ষ / ৩৩৭

ছায়াসঙ্গী / ৩৪৩

জলিল সাহেবের পিটিশন / ৩৫২

শবযাত্রা # ১ / ৩৬০

আনন্দ-বেদনার কাব্য / ৩৭৩

অপেক্ষা / ৩৭৭

শীত / ৩৮২

ওইজা বোর্ড / ৩৮৯

শ্যামল ছায়া / ৪০৩

বেয়ারিং চিঠি / ৪১০

ভালোবাসার গল্প / ৪১৬

সৌরভ / ৪২৩

জলছবি / ৪২৭

নন্দিনী / ৪৩৩

সুখ-অসুখ / ৪৩৭

গোপন কথা / ৪৪৩

ফজলুল করিম সাহেবের জাগ্রদ / ৪৪৯

সুলেখার বাবা / ৪৫৫

যন্ত্র / ৪৫৯

মিরখাইয়ের অটোথাক / ৪৬৭

রুঁকুর গল্প / ৪৭৬

মোবাবক হোসেনের মহাবিপদ / ৪৮৬

একটি ভয়ংকর অভিযানের গল্প / ৪৯২

ভূত মন্ত্র / ৫০০

পানি রহস্য / ৫০৪

গুণীন / ৫১৩

আয়না / ৫২৫

কুদ্দুসের এক দিন / ৫৪২

ভাইরাস / ৫৫৩

নিজাম সাহেবের ভূত / ৫৫৯

লিপি / ৫৬৮

মৃত্যুগন্ধ / ৫৮০

সম্পর্ক / ৫৮৯

শবযাত্রা # ২ / ৬০০

নেড়িকুকুর এবং আজহারউদ্দিন মণ্ডল / ৬১১

প্রেসক্রিপশন / ৬২২

অন্তরার বাবা / ৬৩০

তাহারা / ৬৩৯

অঁহক / ৬৫২

পরশের 'হইলদা' বড়ি / ৬৫৯

জাদুকর / ৬৬৪

পিশাচ / ৬৭০

সালাম সাহেবের পাপ / ৬৭৬

বিভ্রম / ৬৮১

দ্বিতীয় মানব / ৬৮৯

কাকলী প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত লেখকের বইসমূহ

দ্বৈরথ

হোটেল গ্রেভার ইন

সমুদ্র বিলাস

গৌরিপুর জংশন

আমার ছেলেবেলা

ভূত ভূতং ভূতৌ

গল্প সমগ্র

নি

স্বনির্বাচিত উপন্যাস

কোথাও কেউ নেই

জনম জনম

কিশোর সমগ্র

তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে

অনন্ত নক্ষত্র বিথী

এই আমি

আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই

সকল কাঁটা ধন্য করে

কবি

অনন্ত অশ্বরে

গৃহত্যাগী জোহনা

হিমুর দ্বিতীয় প্রহর

আমার প্রিয় ভৌতিক গল্প (সম্পাদনা)

মীরার গ্রামের বাড়ি

আঙুল কাটা জগলু

পঞ্চকন্যা

মৃন্ময়ীর মন ভালো নেই

বাদল দিনের দ্বিতীয় কদম ফুল

প্রিয় ভয়ংকর

মিসির আলি UNSOLVED

নলিনী বাবু B.Sc

একটি সাইকেল এবং কয়েকটি ডাঙ্ক পাখি



রূপা

‘ভাই, আপনি কি একটা ইন্টারেস্টিং গল্প শুনতে চান?’

আমি ভদ্রলোকের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। কিছুক্ষণ আগে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে— তাও এমন কোনো আলাপ না। আমি ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছি কি-না জানতে চাইলেন। আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, এবং ভদ্রতা করে জানতে চাইলাম, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?’

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, ‘আমি কোথাও যাচ্ছি না। আমি আমার স্ত্রীকে রিসিভ করতে এসেছি। ও চিটাগাং থেকে আসছে। ট্রেন দু’ঘণ্টা লেট। ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। বাসায় যাবো আবার আসবো, তাবলাম অপেক্ষা করি।’

তাঁর সঙ্গে এইটুকুই আমার আলাপ। এই আলাপের সূত্র ধরে কেউ যখন বলে, ভাই আপনি কি একটা ইন্টারেস্টিং গল্প শুনতে চান, তখন খানিকটা হলেও বিস্মিত হতে হয়। অপরিচিত লোকের কাছ থেকে গল্প শোনার আগ্রহ আমার কম। তা ছাড়া আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছি— ইন্টারেস্টিং গল্প বলে যে গল্প শুরু হয় সে গল্প কখনোই ইন্টারেস্টিং হয় না।

আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। ভদ্রলোক বুদ্ধিমান হলে আমার চুপ করে থাকার অর্থ বুঝতে পারবেন। বুদ্ধিমান না হলে এই গল্প আমার শুনতেই হবে।

দেখা গেল ভদ্রলোক মোটেই বুদ্ধিমান নন। পকেট থেকে পানের কৌটা বের করে পান সাজাতে সাজাতে গল্প শুরু করলেন—

‘আপনি নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হয়ে আমার কথা শুনছেন। নিতান্তই অপরিচিত একজন মানুষ হড়বড় করে গল্প বলা শুরু করেছে, বিরক্ত হবারই কথা। কিন্তু সমস্যাটা কি জানেন? আজ আমার জন্যে একটা বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনে আমার মজার গল্পটা কাউকে না কাউকে বলতে ইচ্ছা করে। যদি অনুমতি দেন— গল্পটা বলি।’

‘বলুন।’

‘আপনি কি পান খান?’

‘জি-না।’

‘একটা খেয়ে দেখুন, মিষ্টি পান। খারাপ লাগবে না।’

‘আপনি কি বিশেষ দিনে গল্পের সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে পানও খাওয়ান?’

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। আন্তরিক ভঙ্গিতেই হাসলেন। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের মতো হবে। অত্যন্ত সুপুরুষ। ধবধবে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবিতে তাঁকে চমৎকার মানিয়েছে। মনে হচ্ছে তিনি স্ত্রীর জন্যে খুব সেজেগুজেই এসেছেন।

‘প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স করছি— পদার্থবিদ্যায়। এখানে অঙ্ককার বলে আপনি সম্ভবত আমাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন না। আলো থাকলে বুঝতেন আমি বেশ সুপুরুষ। কুড়ি বছর আগে দেখতে রাজপুত্রের মতো ছিলাম। ছাত্রমহলে আমার নাম ছিল— ‘দ্যা প্রিন্স।’ মজার ব্যাপার হচ্ছে, মেয়েমহলে আমার কোনো পাতা ছিল না। আপনি ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন কি-না জানি না— পুরুষদের রূপের প্রতি মেয়েরা কখনো আকৃষ্ট হয় না। পুরুষদের সবকিছুই তাদের চোখে পড়ে— রূপ চোখে পড়ে না। বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে কোনো মেয়ে আমার সঙ্গে ভাব করার জন্যে কিংবা কথা বলার জন্যে এগিয়ে আসেনি। আমিও নিজ থেকে এগিয়ে যাইনি। কারণ, আমার তোতলামি আছে। কথা আটকে যায়।’

আমি ভদ্রলোককে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ‘আমি তো কোনো তোতলামি দেখছি না। আপনি চমৎকার কথা বলে যাচ্ছেন।’

‘বিয়ের পর আমার তোতলামি সেরে যায়। বিয়ের আগে প্রচণ্ড রকম ছিল। অনেক চিকিৎসা করেছি— মার্শেল মুখে নিয়ে কথা বলা থেকে শুরু করে হোমিওপ্যাথি অষুধ, পীর সাহেবের তাবিজ কিছুই বাদ দেইনি। যাই হোক— গল্পে ফিরে যাই, আমার সাবসিডিয়ারি ছিল ম্যাথ এবং কেমিস্ট্রি। কেমিস্ট্রি সাবসিডিয়ারিতে একটা মেয়েকে দেখে আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা হলো। কী মিষ্টি চেহারা! দীর্ঘ পল্লব, ছায়াময় চোখ। সেই চোখ সব সময় হাসছে। ভাই, আপনি কি কখনো প্রেমে পড়েছেন?’

‘জি-না।’

‘প্রেমে না পড়লে আমার সেই সময়কার মানসিকতা আপনাকে বুঝাতে পারব না। আমি প্রথম দিন মেয়েটিকে দেখেই পুরোপুরি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। সারারাত ঘুম হলো না। প্রচণ্ড পানির পিপাসায় একটু পরপর গলা শুকিয়ে যায়। পানি খাই আর মহসিন হলের বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করি।

সপ্তাহে আমাদের দু’টা মাত্র সাবসিডিয়ারি ক্লাস। রাগে-দুঃখে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করে। প্রতিদিন একটা করে সাবসিডিয়ারি ক্লাস থাকলে কী ক্ষতি হতো? সপ্তাহের দু’টা ক্লাস মানে পঞ্চাশ মিনিট করে একশ’ মিনিট। এই একশ’ মিনিট চোখের পলকে শেষ হয়ে যায়। তা ছাড়া মেয়েটা খুব ক্লাস ফাঁকি দেয়।

এমনও হয়েছে সে পরপর দু'সপ্তাহ কোনো ক্লাস করল না। তখন আমার ইচ্ছা করতো লাফ দিয়ে মহসিন হলের ছাদ থেকে নিচে পড়ে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটাই। সে যে কী ভয়াবহ কষ্ট আপনি বুঝবেন না! কারণ, আপনি কখনো প্রেমে পড়েননি।'

‘মেয়েটার নাম তো বললেন না, তার নাম কী?’

‘তার নাম রূপা। সেই সময় আমি অবিশ্যি তার নাম জানতাম না। নাম কেন— কিছুই জানতাম না। কোন্ ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী তাও জানতাম না। শুধু জানতাম তার সাবসিডিয়ারিতে কেমিস্ট্রি আছে এবং সে কালো রঙের একটা মরিস মাইনর গাড়িতে করে আসে। গাড়ির নাম্বার— ভ ৮৭৮১।’

‘আপনি তার সম্পর্কে কোনো রকম খোঁজ নেননি?’

‘না। খোঁজ নেইনি। কারণ, আমার সব সময় ভয় হতো খোঁজ নিতে গেলেই জানব— মেয়েটির হয়তো বা কারো সঙ্গে ভাব আছে। একদিনের একটা ঘটনা বললেই আপনি বুঝতে পারবেন— সাবসিডিয়ারি ক্লাসের শেষে আমি হঠাৎ লক্ষ করলাম মেয়েটা হেসে হেসে একটা ছেলের সঙ্গে গল্প করছে। আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। মনে হলো আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। সব ক্লাস বাদ দিয়ে হলে চলে এলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে আমার জ্বর এসে গেল।’

‘আশ্চর্য তো!’

‘আশ্চর্য তো বটেই! পুরো দু'বছর আমার এইভাবেই কাটলো। পড়াশোনা মাথায় উঠল। তারপর একদিন অসীম সাহসের কাজ করে ফেললাম। মরিস মাইনর গাড়ির ড্রাইভারের কাছ থেকে বাড়ির ঠিকানা জেনে নিলাম। তারপর মেয়েটিকে সম্বোধনহীন একটা চিঠি লিখলাম। কী লিখেছিলাম এখন আর মনে নেই। তবে চিঠির বিষয়বস্তু হচ্ছে— আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। তাকে রাজি হতেই হবে। রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের বাড়ির সামনে না খেয়ে পড়ে থাকব। যাকে পত্রিকার ভাষায় বলে “আমরণ অনশন।” গল্পটা কি আপনার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে?’

‘হ্যাঁ হচ্ছে। তারপর কী হলো বলুন। চিঠি ডাকে পাঠিয়ে দিলেন?’

‘না। নিজেই হাতে করে নিয়ে গেলাম। ওদের বাড়ির দারোয়ানের হাতে দিয়ে বললাম, এ বাড়ির একজন আপা আছেন-না ইউনিভার্সিটিতে পড়েন— তাঁর হাতে দিয়ে এসো। দারোয়ান লক্ষ্মীছেলের মতো চিঠি নিয়ে চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বলল, আপা বলেছেন তিনি আপনার চেনেন না। আমি বললাম, তিনি ঠিকই বলেছেন, তবে আমি তাঁকে চিনি। এটাই যথেষ্ট।

এই বলে আমি গেটের বাইরে খুঁটি গেড়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। বুঝতেই পারছেন— নিতান্তই পাগলের কাণ্ড। সেই সময় মাথা আসলেই বেঠিক ছিল।

লজিক নষ্ট হয় গিয়েছিল। যাই হোক, সকাল ন'টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত কোনো রকম ঘটনা ছাড়াই গেটের সামেন দাঁড়িয়ে রইলাম। লক্ষ করলাম দোতলার জানালা থেকে মাঝে-মধ্যে কিছু কৌতূহলী চোখ আমাকে দেখছে। বিকেল চারটায় এক ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বের হয়ে কঠিন গলায় বললেন, 'যথেষ্ট পাগলামি করা হয়েছে। এখন বাড়ি যাও।'

আমি তাঁর চেয়েও কঠিন গলায় বললাম, 'যাবো না।'

'পুলিশে খবর দিচ্ছি। পুলিশ এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

'কোনো অসুবিধা নেই খবর দিন।'

'ইউ রাস্কেল মাতলামি করার জায়গা পাও না?'

'গালাগালি করছেন কেন? আমি তো আপনাকে গালি দিচ্ছি না।'

ভদ্রলোক রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন। তার পরপরই শুরু হলো বৃষ্টি। ঢালাও বর্ষণ। আমি ভিজছি নির্বিকার ভঙ্গিতে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝছি যে জ্বর এসে যাচ্ছে। সারা দিন রোদে পোড়ার পর এই ঠাণ্ডা বৃষ্টি সহ্য হবে না। তখন একটা বেপরোয়া ভাব চলে এসেছে— যা হবার হবে। ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে এই বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম।

ইতিমধ্যে আমি আশপাশের মানুষদের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছি। বেশ কয়েকজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন? আমি তাঁদের সবাইকে বলেছি, আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি একজন পাগল-মানুষ।

মেয়েটির বাড়ি থেকেও হয়তো টেলিফোনে এই বিচিত্র ঘটনার কথা কাউকে কাউকে জানানো হয়েছে। সন্ধ্যা গাড়ি তাদের বাড়িতে এলো। গাড়ির আরোহীরা রাগী ভঙ্গিতে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলেন।

রাত ন'টা বাজলো। বৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যে থামল না। জ্বরে তখন আমার গা পুড়ে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। দারোয়ান এসে আমাকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, সাহেব পুলিশ আনতে চাইতেছে, বড় আফা রাজি না। বড় আফা আপনার অবস্থা দেইখ্যা খুব কানতাছে। টাইট হইয়া বইয়া থাকেন।

আমি টাইট হয় বসে রইলাম।

রাত এগারোটা বাজলো। ওদের বাড়ির বারান্দায় বাতি জ্বলে উঠল। বসার ঘরের দরজা খুলে মেয়েটি বের হয়ে এলো। মেয়েটির পেছনে পেছনে ওদের বাড়ির সব ক'জন মানুষ। ওরা কেউ বারান্দা থেকে নামল না। মেয়েটি একা এগিয়ে এলো। আমার সামনে এসে দাঁড়াল এবং অসম্ভব কোমল গলায় বলল, কেন এমন পাগলামি করছেন?

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কারণ, এই মেয়ে সেই মেয়ে নয়। অন্য একটি মেয়ে। একে আমি কোনোদিন দেখিনি। মরিস মাইনর গাড়ির ড্রাইভার আমাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছে। হয়তো ইচ্ছা করেই দিয়েছে।

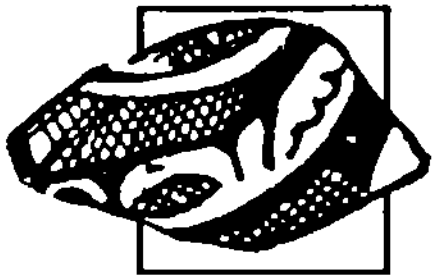
মেয়েটি নরম গলায় বলল, আসুন, ভেতরে আসুন। টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। আসুন তো।

আমি উঠে দাঁড়িলাম। বলতে চেষ্টা করলাম, কিছু মনে করবেন না। আমার ভুল হয়ে গেছে। আপনি সেই মেয়ে নন। আপনি অন্য একজন। মেয়েটির মমতায় ডুবানো চোখের দিকে তাকিয়ে এই কথা বলা সম্ভব হলো না। এত মমতা নিয়ে কোনো নারী আমার দিকে তাকায়নি।

জ্বরের ঘোরে আমি ঠিকমতো পা ফেলতে পারছিলাম না। মেয়েটি বলল, আপনার বোধহয় শরীর খারাপ। আপনি আমার হাত ধরে হাঁটুন। কোনো অসুবিধা নেই।

বাসার সবাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কঠিন চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের সবার কঠিন দৃষ্টি উপেক্ষা করে মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দিলো। যে গভীর ভালোবাসায় হাত বাড়ালো সে ভালোবাসাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা ঈশ্বর মানুষকে দেননি। আমি তার হাত ধরলাম। এই কুড়ি বছর ধরেই ধরে আছি। মাঝে মাঝে এক ধরনের অস্থিরতা বোধ করি। জ্ঞান্টির এই গল্প আমার স্ত্রীকে বলতে ইচ্ছা করে। বলতে পারি না। তখন আপনার মতো অপরিচিত একজন কাউকে খুঁজে বের করি। গল্পটা বলি চক্কণ, আমি জানি— এই গল্প কোনোদিন আমার স্ত্রীর কানে পৌঁছাবে না। জ্বাচ্ছ ভাই, উঠি। আমার ট্রেন এসে গেল।’

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। দূরে ট্রেনের আলো দেখা যাচ্ছে। রেললাইনে ঘড়ঘড় শব্দ উঠছে। ট্রেন সত্যি সত্যি এসে গেল।



বুড়ি

রাত দুপুরে কুঁ-কুঁ পোঁ-পোঁ শব্দ।

সবে শুয়েছি, ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছে— বিচিত্র শব্দে উঠে বসলাম, ব্যাপারটা কী? আমেরিকায় নতুন এসেছি। এদের কাণ্ডকারখানার সঙ্গে এখনো তেমন পরিচয় হয়নি। ক্ষণে-ক্ষণে চমকে উঠতে হয়।

এখন যেখানে আছি তার আমেরিকান নাম রুমিং হাউস। পায়রার খোপের মতো ছোট্ট একটা ঘর। সেই ঘরে সোফা কাম বেড, পড়ার টেবিল। টেবিলের একপাশে একটা এফ.এম. রেডিও। এই হলো আমার ঘরের সাজসজ্জা। ভাড়া পঞ্চাশ ডলার— জলের দাম বলা চলে। আমেরিকান এক দম্পতি তাদের বসতবাড়ির দোতলার সব ক’টা ঘর ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন। দরিদ্র বিদেশী ছাত্ররা এইসব ঘরে থাকে। কমন বাথরুম। রান্নাঘর নেই। খেতে হয় বাইরে। সিগারেট খাওয়া যায় না, ল্যান্ড লেডি ঘর ভাড়া দেয়ার সময় কঠিন গলায় এই তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন। উঁচু ভল্যুমে স্টেরিও শোনা নিষিদ্ধ। নানান বায়নাক্স। তবুও এখানে উঠে এসেছি। কারণ— সস্তা ঘর ভাড়া, তা ছাড়া জায়গাটা ইউনিভার্সিটির খুব কাছে। ওয়াকিং ডিসটেন্স। নর্থ ডেকোটার এই প্রচণ্ড শীতে দূর থেকে ক্লাস করতে আসা সম্ভব নয়। একটা গাড়ি কিনে নেব সেও দুরাশা। দুপুরে ইউনিভার্সিটি মেমোরিয়াল ইউনিয়নে খেয়ে নেই। সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরি সঙ্গে থাকে একটা হ্যামবার্গার। ঐ খেয়ে রাত পার করি।

রুমিং হাউসে উঠে এসেছি পনেরো দিন হলো। কারো সঙ্গে তেমন পরিচয় হয়নি। আমার পাশের রুমে আছে ভারতীয় ছাত্র অনন্ত নাগ। সে আমাকে দেখলেই ‘আবে ইয়ার’ বলে একটা চিৎকার দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে। কথাবার্তা এই পর্যন্ত। কোনার দিকের ঘরে থাকে কোরিয়ান ছাত্র ‘হান’। সে ইংরেজি একেবারেই জানে না। আমাকে একদিন এসে বলল, ‘হেড পেই মার্ডার, মার্ডার’। অনেকক্ষণ পরে বুঝলাম— সে বলার চেষ্টা করেছে মাথার যন্ত্রণায় মারা যাচ্ছি। তার সঙ্গে ভাষার কারণেই ভাব হবার কথা নয়। আমার ঠিক মুখোমুখি ঘরে থাকে ফিলিপিনো মেয়ে তোহা। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স, অত্যন্ত রূপবতী। এই মেয়েটির অকৃতজ্ঞি বিচিত্র। সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। প্রায়ই গভীর রাতে ফুঁপিয়ে কাদে। পঞ্চম বোর্ডার এক আমেরিকান বুড়ি, নাম এলিজাবেথ। শুরুতেই আমাকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল— আমেরিকান বুড়ীদের কাছ থেকে যেন শত হস্ত দূরে থাকি। আমেরিকান সমাজে বুড়োবুড়ির কোনো স্থান নেই। তারা খুবই নিঃসঙ্গ। কাজেই কথা বলার কাউকে পেলে বুড়োবুড়িরা তার জীবন অতিষ্ঠ করে দেয়। অনন্ত নাগ আমাকে বলে দিয়েছে— এই বুড়িকে পাত্তা দেবে না। পাত্তা দিয়েছ কি মরেছ। সিন্দাবাদের ভূতের মতো কাঁধে চেপে বসবে, আর নামাতে পারবে না।

বুড়ি কয়েক বারই আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে, আমি অনন্ত নাগের উপদেশ মনে রেখে শুকনো গলায় বলেছি— এখন তো কথা বলতে পারব না, পড়াশোনা করছি। বুড়ি সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, ‘আচ্ছা আচ্ছা, পরে কথা হবে। এক জাহাজের যাত্রী, দেখা তো হবেই... হা-হা-হা। বরং এক কাজ করো, তোমার লেখাপড়ার চাপ যখন কম থাকবে আমার ঘরে চলে এসো। গল্প করব।’

আমি এখনো তার ঘরে যাইনি। যাবার উৎসাহ বোধ করিনি।

এখন এই মধ্যরাতে বিছানায় জেগে বসে আছি— শুনছি বিচিত্র কোঁ-কোঁ শব্দ। মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। পরদিন ভোরে মিডটার্ম পরীক্ষা। ভালো ঘুম দরকার। এ-কী যন্ত্রণা! শব্দের উৎসের সন্ধানে দরজা খুলে বাইরে বের হলাম। দেখা হলো অনন্ত নাগের সঙ্গে। সেও বিরক্ত মুখে বের হয়েছে। আমি বললাম, ‘কীসের শব্দ?’

অনন্ত শুকনো গলায় বলল, ‘ব্যাগ পাইপ।’

‘ব্যাগ পাইপটা কী?’

‘এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। আইরিশরা বাজায়। ফুসফুসের মারাত্মক জোর লাগে।’

‘বাজাচ্ছে কে?’

‘এলিজাবেথ। কী যন্ত্রণা বল তো দেখি! তুমি কি বুড়িকে বলে আসবে— এখন মিডনাইট। বুড়ির কোনো রাইট নেই মিডনাইটে আমাদের বিরক্ত করার।’

আমি এলিজাবেথের ঘরের দিকে এগুলাম। দরজা হাট করে খোলা। বুড়ি বিছানায় পা তুলে ব্যাগ পাইপ নিয়ে বসে আছে। এই বাদ্যযন্ত্রটি বাজাতে ফুসফুসের প্রচণ্ড জোর লাগার কথা। আশি বছরের বুড়ি এই জোর কোথায় পেল কে জানে?

আমাকে দেখেই বুড়ি হাসিমুখে উঠে এল— ‘আহমাদ ওয়েলকাম!’

প্রথমেই অভদ্র হওয়া যায় না। আমি বললাম, ‘কেমন আছ?’

‘ভালো। খুব ভালো। গ্যারাজ সেল থেকে একটা ব্যাগ পাইপ কিনে ফেললাম। একেবারে ব্রান্ড নিউ। মাত্র কুড়ি ডলারেই দিয়ে দিল। চমৎকার না জিনিসটা?’

‘হ্যাঁ, চমৎকার।’

‘অনেকদিন থেকেই শখ ছিল একটা বাদ্যযন্ত্র বাজান শিখব তাই...’

‘ব্যাগ পাইপ বাজান তো খুব কঠিন। শুনেছি ফুসফুসের খুব জোর লাগে।’

‘তা লাগে প্রথমে বাতাস ভরাটাই কষ্ট। একবার ভরা হয়ে গেলে মোটামুটি সহজ বলা চলে। তুমি বস না— দাঁড়িয়ে আছ কেন?’

‘আমি অন্য একদিন এসে বসব। কাল আমার একটা পরীক্ষা, মিডটার্ম। আমার ঘুম দরকার।’

‘অফকোর্স। আমার বাদ্যযন্ত্রে তোমার ঘুমের অসুবিধা করলাম কি?’

‘কিছুটা করেছ।’

‘সরি! এক্সট্রিমলি সরি! আর বাজাব না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাও। জাস্ট এ মিনিট, তোমাকে এক মগ হট কোকা বানিয়ে দিচ্ছি। হট কোকার মতো ঘুমের অশুধ হয় না।’

‘তোমাকে ধন্যবাদ, হট কোকা খেতে ইচ্ছা করছে না।’

‘না বললে হবে না। আমার কথা শোন, খেয়ে দেখ। মরার মতো ঘুমবে। হাসবেন্ডের মৃত্যুর পর আমার অনিদ্রা রোগ হলো। সারারাত জেগে থাকি, ঘুম আসে না। তখন এই অমুখটা আবিষ্কার করলাম।’

আমি লক্ষ করলাম কথা বলতে বলতে বুড়ি হিটিং কয়েল দিয়ে পানি গরম করে ফেলেছে। কোকা প্রস্তুত।

আমাকে খেতে হলো। খেতে খেতে বুড়ির গল্প শুনতে হলো। তার চার ছেলে-মেয়ে। একেক জন একেক জায়গায়। গত দশ বছর ধরে কারো সঙ্গে দেখা নেই। তবে যোগাযোগ আছে। ওরা চিঠি লেখে, ছবি পাঠায়।

‘আহমাদ, তুমি আমার নাতি-নাতনিদের ছবি দেখবে?’

‘আজ থাক, অন্য একদিন দেখব।’

‘আচ্ছা থাক। তুমি আরাম করে ঘুমাও। গরম কোকা খেয়েছ— চমৎকার ঘুম হবে। দেখবে এক ঘুমে রাত কাভার।’

গরম কোকা খাওয়ার কারণেই হয়তো সেই রাতে এক ঘুম হলো না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটলাম। ভোরবেলা বাথরুমে যাচ্ছি, এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা। সে হাসিমুখে বলল, ‘কেমন ঘুম হলো বল তো? আমি বিরক্তি চেপে রেখে বললাম, ভালোই।’

বুড়ি উল্লসিত গলায় বলল, ‘বলেছি না চমৎকার ঘুম হবে। কি, কথা ঠিক হলো?’

রুমিং হাউসের বুড়ি আমাদের খুব বিরক্ত করতে লাগল।

জানা গেল সে ডাকযোগে ব্যাগ পাইপ বাজান শিখছে। ডাকযোগে বাইবেল শেখা যায় জানি, কিন্তু বাদ্যযন্ত্র বাজানও যে শেখা যায়, তা জানতাম না। এই বিচিত্র দেশে সবই সম্ভব।

কিছুদিন পরপরই মাঝরাতে কোঁ-কোঁ পোঁ-পোঁ শব্দ হতে থাকে। তিক্ত-বিরক্ত অবস্থা। একদিন অনন্ত নাগ খুব চিৎকার-চেচামেচি করে এল—

‘তুমি বাজনা শিখছ ভালো কথা। দুপুর রাতে কেন? দিনে শিখতে পার না? দিনে আমরা কেউ থাকি না, ঘর থাকে ফাঁকা।’

‘দিনে আমার নানান কাজকর্ম থাকে।’

‘তোমার আবার কীসের কাজকর্ম? তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াও।’

‘এটাই আমার কাজ।’

‘খুব ভালো কথা। রাতে যখন তোমার ঐ যন্ত্র বাজাও— দরজাটা বন্ধ করে রাখতে পার না?’

‘এই বাদ্যযন্ত্র ফাঁকা জায়গায় বজাতে হয়। ইনস্ট্রাকশানে লেখা আছে। বিশ্বাস না করলে পড়ে দেখতে পার।’

‘তোমার নামে বাড়িওয়ালার কাছে আমরা নালিশ করব।’

‘করতে চাইলে কর। তাতে লাভ হবে না। বাড়িওয়ালার সঙ্গে আমার যে লীজ এগ্রিমেন্ট হয়েছে সেখানে লেখা নেই যে, ব্যাগ পাইপ বাজান যাবে না।’

‘তুমি অতি নিম্নশ্রেণীর একটি প্রাণী।’

‘ছিঃ ছিঃ! এমন কথা বলবে না। আচ্ছা যাও, আর বাজাব না।’

কয়েক দিন সত্যি বাজনা বন্ধ থাকে, আবার শুরু হয়। রাগে দাঁত কিড়মিড় করি। কিন্তু বুড়ি সদাহাস্যময়ী। দেখা হলে একগাদা কথা বলবেই—

‘আমার নাতনি এ্যানির দাঁত উঠেছে। ছবি পাঠিয়েছে। দেখবে? কী যে সুন্দর! এঞ্জেলের মতো লাগে। আমার মনে হয় এই পৃথিবীতে তার মতো সুন্দর বাচ্চা জন্মায়নি। সামারে তাকে দেখতে যাব। ছেলেকে লিখেছি টিকিট পাঠাতে। ও টিকিট না পাঠালে যেতে পারব না। ও লিখেছে পাঠাবে।’

ছেলে টিকিট পাঠায় না। বুড়ির যাওয়া হয় না। আমেরিকার অসংখ্য হতদরিদ্র বুড়িদের সে একজন। সোস্যাল সিকিউরিটির টাকায় কোনোক্রমে বেঁচে আছে। বাড়ি ভাড়া, খাবার খরচ এবং মেডিক্যাল ইন্সুরেন্স দিয়ে বুড়ির কাছে কিছুই থাকে না। এর মধ্যে তার আবার পার্টি ব্যয়িতক আছে। সস্তা ধরনের কয়েক বোতল মদ কিনে সে প্রায়ই পার্টি লাগিয়ে দেয়। ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে দেখি দরজার গায়ে নোট বুলছে। নোটে পঁ্যাচান হরফে লেখা—

প্রিয় বন্ধু,

আজকের দিনটি আমার জীবনের বিশেষ দিন। এই দিনে আমার স্বামী ববের সঙ্গে প্রথম দেখা। এই দিনেই আমরা প্রথম একসঙ্গে ডিনার করি এবং বব আমাকে বলে— I love you. বিশেষ দিনটিকে স্মরণ করে রাখার জন্যে ছোট্ট একটা পার্টির আয়োজন করেছি। আয়োজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তুমি আসবে।

পার্টিতে যেতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই। বুড়ি দশ মিনিট পরপর এসে বলবে, কই এখনো এলে না। সবাই এসে গেছে শুধু তোমার জন্যে অপেক্ষা। আমি যাবার পর দেখি— আমিই শুধু এসেছি আর কেউ আসেনি। বুড়ি এক কথা সবাইকে বলে বলে আসছে।

ঘরে মোমবাতি জ্বলছে। টেবিলে কিছু পটেটো চিপস্, চিনাবাদাম, কাজুবাদাম এবং দু’বোতল রেড ওয়াইন— যার দাম বড়জোর ছ’ থেকে সাত ডলার।

ঠোটে টকটকে লাল রঙ মেখে বুড়ি হাসিমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার আনন্দের সীমা নেই। পার্টিতে লোক বলতে আমরা ক’জন।

বাড়িওয়ালা-বাড়িওয়ালী কখনো আসে না। বুড়ির বাইরের কোনো বন্ধুবান্ধবও নেই। আমাদেরই সে বোধহয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ধরে নিয়েছে।

পার্টির মধ্যমণি হয়ে লাল মদের গ্লাস হাতে নিয়ে বুড়ি এর-তার কাছে যায়। উজ্জ্বল চোখে বলে, ‘জীবন বড় আনন্দময়, কি বল?’

আমরা বিরস মুখে বলি, ‘হ্যাঁ।’

‘বড় সুন্দর পার্টি হলো। অসাধারণ।’

‘হ্যাঁ, অসাধারণ।’

‘আমার মনে হচ্ছে, আমি আমার ইয়ুথে ফিরে গেছি।’

‘খুবই ভালো কথা— ফিরে যাও।’

এলিজাবেথ তার যৌবনে ফিরে যাবার ব্যবস্থা এত ঘনঘন করতে লাগল যে, আমরা তিক্ত-বিরক্ত হয়ে গেলাম। পার্টিতে যাওয়া বন্ধ। সে এসে করুণ গলায় বলে, ‘আজ আমার এমন একটা বিশেষ দিন আর তোমরা কেউ আসবে না?’

‘পড়াশোনার খুব চাপ।’

‘আজ দিনটি আমার জন্যে খুবই স্পেশাল। আজ বব আমাকে প্রপোজ করেছিল। ষাট বছর আগের কথা অথচ মনে হয় যেদিন...’

‘প্লিজ, আজ যেতে পারব না। এ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে।’

‘ঘণ্টাখানিক জন্যে এসো।’

‘অসম্ভব। একেবারেই অসম্ভব।’

বুড়ি একা একাই পার্টি করে এবং একসময় ভয়াবহ ব্যাগ পাইপ বেজে উঠে। আমাদের কাউকে-না-কাউকে ছুটে যেতে হয়। আমাদের কাছে অসহ্য বোধহয়। এ-কী যন্ত্রণা!

যাই হোক, শীতের শুরুতে যন্ত্রণার অবসান হলো। জানা গেল, টাকাপয়সার অভাবে এলিজাবেথ তার ব্যাগ পাইপ বিক্রি করে দিয়েছে। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। বাঁচা গেল, এখন আর মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ছুটে যেতে হবে না।

এক বিকেলের কথা। অনন্তের কাছে গুনলাম বুড়ি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। অবস্থা খুব ভালো নয়। মনটা একটু খারাপই হলো। সেন্ট জোসেফ হাসপাতালে বুড়িকে দেখতে গেলাম। বুড়ি মহাখুশি। উজ্জ্বল চোখে বলল, ‘কার্ড, কার্ড এনেছ?’

অসুস্থ কাউকে দেখতে হলে কার্ড নিয়ে যাওয়ার নিয়ম আছে। আমি গেট ওয়েল কার্ড নিতে ভুলে গেছি।

এলিজাবেথ বলল, ‘আমি কার্ডগুলি জমাচ্ছি। তুমি পরেরবার আসার সময় কার্ড নিয়ে এসো।’

‘আচ্ছা, আনব।’

‘এই দেখ হান কী সুন্দর কার্ড দিয়েছে! এই কার্ডটা দিয়েছে ‘তোহা’। আহা! মেয়েটা বড় ভালো। অনন্ত কী করছে দেখ! শুধু যে কার্ড দিয়েছে তাই না, ফুলও নিয়ে এসেছে। বেচারার টাকাপয়সা নেই— এর মধ্যে এত খরচ। আমি খুব রাগ করেছি।’

বুড়ির আনন্দ দেখে বড় ভালো লাগল। ভিজিটিং আওয়ারের শেষে বের হচ্ছি— বুড়ি গলার স্বর নামিয়ে বলল, ‘তোমাদের কাছে আমার একটা ক্ষমাপ্রার্থনা করার ব্যাপার আছে।’

আমি আগ্রহ নিয়ে তাকালাম। বুড়ি লাজুক গলায় বলল, ‘ব্যাগ পাইপ কেন বাজাতাম জান? একা একা থাকতে এত খারাপ লাগত! কুৎসিত বাজনাটা বাজালেই তোমরা কেউ না কেউ আসতে— খানিকক্ষণ কথা বলতে পারতাম। স্যরি! তোমাদের কষ্ট দিয়েছি।’

আমার মনটা অসম্ভব খারাপ হলো। কোনো কথা বলতে পারলাম না।

বুড়ি দু’মাস রোগভোগ করে সুস্থ হলো। তার বাড়ি থেকে উপলক্ষে আমরা ছোট্ট একটা পার্টির ব্যবস্থা করলাম। শুধু পার্টিই না— বুড়ির জন্যে সামান্য উপহারও আছে— নতুন একটা ব্যাগ পাইপ। আমরা সবাই চাঁদা করে কিনেছি।

আমেরিকানরা কাঁদতে পারে না— এই কথা বলে সে মহামূর্খ। অনন্ত নাগ যখন ব্যাগ পাইপ বুড়ির হাতে তুলে দিল— বুড়ি অবাক হয়ে আমাদের সবার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর শিশুদের মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। কান্নার এমন সুধুর দৃশ্য আমি আমার জীবনে খুব বেশি দেখিনি।



একটি নীল বোতাম

বারান্দায় এশার বাবা বসেছিলেন।

হাঁটু পর্যন্ত তোলা লুঙ্গি, গায়ে নীল রঙের গেঞ্জি। এই জিনিস কোথায় পাওয়া যায় কে জানে? কী সুন্দর মানিয়েছে তাঁকে! ভদ্রলোকের গায়ের রঙ ধবধবে শাদা। আকাশি রঙের গেঞ্জিতে তাঁর গায়ের রঙ ফুটে বেরুচ্ছে। সব

মিলিয়ে সুখী-সুখী একটা ছবি। নীল রঙটাই বোধহয় সুখের। কিংবা কে জানে ভদ্রলোকের চেহারাটাই বোধহয় সুখী-সুখী। কালো রঙের গেঞ্জিতেও তাঁকে হয়তো সুখী দেখাবে।

তিনি আমাকে দেখতে পাননি। আমি ইচ্ছা করেই গেটে একটু শব্দ করলাম। তিনি আমাকে দেখলেন। সুন্দর করে হাসলেন। ভরাট গলায় বললেন, ‘আরে রঞ্জু, তুমি? কী খবর? ভালো আছ?’

‘জি ভালো।’

‘গরম কি রকম পড়ছে বল দেখি?’

‘খুব গরম।’

‘আমার তো ইচ্ছা করছে চৌবাচ্চায় গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকি।’

তিনি তাঁর পাশের চেয়ারে আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। হাসি-হাসি মুখে বললেন, ‘বসো। তোমার কাছ থেকে দেশের খবরা-খবর কিছু শুনি।’

‘আমার কাছে কোনো খবরা-খবর নেই চাচা।’

‘না থাকলে বানিয়ে বানিয়ে বলো। বর্তমানে চালু গুজব কী?’

আমি বসলাম তাঁর পাশে। এশার বাবার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগে। মাঝে মাঝে এ-বাড়িতে এসে শুনি এশা নেই— মামার বাড়ি গেছে। রাতে ফিরবে না। তার মামার বাড়ি ধানমন্ডিতে। প্রায়ই সে সেখানে যায়। আমার খানিকটা মন খারাপ হয়। কিন্তু এশার বাবার সঙ্গে কথা বললে আমার মন-খারাপ ভাবটা কেটে যায়।

এই যে এখন বসলাম উনার পাশে— এখন যদি শুনি এশা বাসায় নেই, মামার বাড়ি গিয়েছে— আমার খুব খারাপ লাগবে না।

‘তারপর রঞ্জু নতুন কোনো গুজবের কথা তাহলে জান না?’

‘জি না।’

‘বল কী তুমি? শহর ভর্তি গুজব। আমি তো ঘরে বসে কত কি শুনি। চা খাবে?’

‘জি না।’

‘খাও এক কাপ। তোমার সঙ্গে আমিও খাব। তুমি আরাম করে বস। আমি চায়ের কথা বলে আসি।’

‘আপনাকে বলতে হবে না, আমি বলে আসছি। এশা কি বাসায় নেই?’

‘আছে। বাসাতেই আছে।’

বলেই তিনি চায়ের কথা বলতে উঠে গেলেন। কী চমৎকার তাঁর এই ভদ্রতা! আমি কে? কেউ না। অতি সামান্য একজন। একটা এ্যাড ফার্মে কাজ করি। অল্প যে ক’টা টাকা পাই তার প্রতিটির হিসাব আমার আছে। আর এঁরা? আমরা ধারণা, এদের গেটে দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ান আমার চেয়ে বেশি টাকা পায়। নিতান্ত ভাগ্যক্রমে এঁদের এক আত্মীয়ের সঙ্গে এ-বাড়িতে এসেছিলাম।

প্রথম দিনেই এশার কী সহজ সুন্দর ব্যবহার! যেন সে অনেকদিন থেকেই আমাকে চেনে। সেদিন কেমন হাসিমুখে বলল, ‘আপনি তো বেশ লম্বা। আসুন একটা কাজ করে দিন। চেয়ারে দাঁড়ান, দাঁড়িয়ে খুব উঁচুতে একটা পেরেক লাগিয়ে দিন।’

আমি বললাম, ‘এত উঁচুতে পেরেক দিয়ে কী করবেন?’

‘আজ বলব না। আরেকদিন এসে দেখে যাবেন।’

দ্বিতীয়বার এ বাড়িতে আসার কী চমৎকার অজুহাত তৈরি হলো! অথচ অজুহাতের কোনো প্রয়োজন ছিল না। এঁদের বাড়ি দুয়ারখোলা বাড়ি। যে-কেউ যে কোনো সময় আসতে পারে। কোনো বাধা নেই। অথচ মনে আছে দ্বিতীয়বার কত ভয়ে ভয়ে এসেছি। গেট খুলে ভেতরে ঢোকান সাহস হয়নি। যদি আমাকে কেউ চিনতে না পারে। যদি এশা বিস্মিত হয়ে বলে, আপনি কাকে চান?

সে-রকম কিছুই হলো না। এশার বাবা আমাকে দেখে হাসি-মুখে বললেন, ‘কী ব্যাপার রঞ্জু, গেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আসো, ভেতরে আসো।’

আমি খানিকটা বিব্রত ভঙ্গিতেই ঢুকলাম। তিনি হাসিমুখে বললেন, ‘দেশের খবরা-খবর বল। নতুন কী গুজব শুনলে?’

এশা বোধহয় বাইরে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, ‘বেছে বেছে আজকের দিনটিতেই আপনি এলেন? এখন বেরুচ্ছি। আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব না। চট করে আসুন ভেতরে, পেরেকটা কী কাজে লাগছে দেখে যান।’

আমি ইতস্তত করছি। এশার বাবার সামনে থেকে উঠে যাব, উনি কী মনে করেন কে জানে। উনি কিছুই মনে করলেন না। সুখী-সুখী গলায় বললেন, ‘যাও দেখে আস। জিনিসটা ইন্টারেস্টিং।’

পেরেক থেকে হালুদ দড়ির মতো একটা জিনিস মেঝে পর্যন্ত নেমে এসেছে। এশা বাড়ি নিভিয়ে একটা সুইচ টিপতেই অদ্ভুত ব্যাপার হলো। হালুদ দড়ি আলোয় ঝিকমিক করতে লাগল। সেই আলো স্থির নয়। যেন গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে নামছে। আলোর ঝরনা।

‘অপূর্ব!’

‘কি, অবাক হয়েছেন তো?’

‘হ্যাঁ হয়েছি।’

‘এ রকম অদ্ভুত জিনিস এর আগে কখনো দেখছেন?’

‘জি না।’

‘আমার বড় বোন পাঠিয়েছেন। নেদরল্যান্ড থাকেন যিনি, তিনি। এখন যান। বসে বসে বাবার গল্প শুনুন। বাবা কি আপনাকে তার কচ্ছপের গল্পটা বলেছে?’

‘জি না।’

‘তা হলে হয়তো আজ বলবে। বাবার গল্প বলার একটা প্যাটার্ন আছে। কোনটির পর কোন গল্প আসবে আমি সব জানি।’

এশা হাসল। কী সুন্দর হাসি! আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম— না জানি কোন ভাগ্যবান পুরুষ এই মেয়েটিকে সারা-জীবন তার পাশে পাবে।

এশার বাবা সেদিন কচ্ছপের গল্প বললেন না। পরের বার যেদিন গেলাম সেদিন বললেন।

‘কচ্ছপ কোথায় ডিম পাড়ে জান তো রঞ্জু? ডাঙায়। সে নিজে থাকে কিন্তু পানিতে। চলাফেরা, জীবনযাত্রা সবই পানিতে অথচ তার মন পড়ে থাকে তার ডিমের কাছে, ডাঙায়। ঠিক না?’

‘জি ঠিক।’

‘বুড়ো বয়সে মানুষেরও এই অবস্থা হয়। সে বাস করে পৃথিবীতে কিন্তু মন পড়ে থাকে পরকালে। আমার হয়েছে এই দশা।’

এই পরিবারটির সঙ্গে পরিচয় হবার পর আমার মনোবৃত্তি বড় ধরনের কিছু পরিবর্তন হলো। আগে বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে চমৎকার লাগত। এখন আর লাগে না। একসময় মেয়েদের নিয়ে কেউ কোনো কুৎসিত কথা বললে বেশ মজা পেতাম। এখন ভয়ঙ্কর রাগ লাগে। মনে হয় এই কুৎসিত কথাটি কোনো-না-কোনোভাবে এশাকে স্পর্শ করছে। যে খুপড়ি ঘরটায় থাকি সেই ঘর আমার আর এখন ভালো লাগে না। দম বন্ধ হয়ে আসে। নোনাধরা বিগ্ৰী দেয়াল। একটি ছোট জানালা যা দিয়ে আলো-বাতাস আসে না, রাতের বেলা শুধু মশা চুকে। চৈত্র মাসের গরমে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। নানানরকম কল্পনা মাথায় আসে। কল্পনায় আমার এই ঘর হয়ে যায় পদ্মানদীর নৌকায় একটা ঘর। জানালা খুললেই নদী দেখা যায়। সেই নদীতে জোছনা হয়। চাঁদের আলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ঘরের দরজায় টোকা পড়ে। আমি জানি কে টোকা দিচ্ছে। তবু কাঁপা গলায় বলি, কে? এশা বলে, কে আবার? আমি। এ-রকম চমৎকার রাতে আপনি ঘরটির বন্ধ করে বসে আছেন। পাগল নাকি? আসুন তো।

কোথায় যাব?

কোথায় আবার, নৌকার ছাদে বসে থাকব।

আমরা নৌকার ছাদে গিয়ে বসি। মাঝি নোকা ছেড়ে দেয়। এশা গুনগুন করে গায়, যদি আমায় পড়ে তাহার মনে, বসন্তের এই মাতাল সমীরণে। আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে।

সবই খুব সুন্দর সুখের কল্পনা। তবু এক এক রাতে কষ্টে চোখে জল আসে। সারারাত জেগে বসে থাকি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবি, আমার এই জীবনটা আমি কি কিছুতেই বদলাতে পারি না?

বন্ধু-বান্ধব সবাইকে অবাক করে এক সন্ধ্যায় জগন্নাথ কলেজের নাইট সেকশানের এম.এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে যাই। ধার-টার করে আমার ঘরের জন্যে নতুন পর্দা, বিছানার নতুন চাদর, নেটের মশারি কিনে ফেলি। অনেক ঘোরাঘুরি করে একটা ফুলদানি কিনি। একশ' টাকা লেগে যায় ফুলদানিতে। তা লাগুক, তবু তো একটা সুন্দর জিনিস। একগুচ্ছ রজনীগন্ধা যখন এখানে রাখব তখন হয়তো এই ঘরের চেহারাও পাল্টে যাবে। আমার এক আর্টিস্ট বন্ধুর কাছ থেকে একদিন প্রায় জোর করে জলরঙ্গা একটা ছবিও নিয়ে আসি। নোনাধরা দেয়ালে সেই ছবি মানায় না। নিজেই চুন এনে দেয়ালে চুনকাম করি।

চুন দেয়ালে আটকায় না, ঝরে ঝরে পড়ে। তবু আমার ঘরে দেখে বন্ধুরা চোখ কপালে তুলে।

করছিস কী তুই! ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছিস দেখি। আবার দেখি খুশবুও আসছে। বিছানায় আতর ঢেলে দিয়েছিস নাকি?

মাই গড। মেয়ে মানুষ ছাড়া এই ঘর মানায় না। এক কাজ কর একশ' টাকা দিয়ে একটা মেয়ে মানুষ এক রাতের জন্যে নিয়ে আয়। ফুটি কর। আমরা পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখি।

রাগে আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়। কিছু বলি না। কী হবে বলে? আমার বন্ধুরা গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডা দেয়। সিগারেটের টুকরা দিয়ে মেঝে প্রায় ঢেকে ফেলে। একজন আমার নতুন কেনা বিছানায় চায়ের কাপ উল্টে দিয়ে বলে, যা শালা, চাঁদে কলঙ্ক লেগে গেল।

আমি কিছু বলি না। দাঁতে দাঁতে চেপে থাকি। আর মনে-মনে ভাবি— এই মূর্খদের সঙ্গে কি করে এতদিন কাটিয়েছি। কি করে এদের সহ্য করেছি?

ইরফান বলল, 'প্রেম-প্রেম করেছিস কিনা বল। তোর হাবভাব যেন কেমন রঙ্গিলা।'

আমি জবাব দেই না। ইরফান পান-খাওয়া লাল দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলে জিনিস কেমন বল। টিপে-টুপে দেখেছিস তো?

সবাই হো হো করে হাসে। কোন অন্ধকার নরকে এরা পড়ে আছে? এদের কি কোনোদিন মুক্তি ঘটবে না? আমার ইচ্ছা করে এশাকে একদিন ওদের সামনে উপস্থিত করি। সেটা নিশ্চয়ই খুব অসম্ভব নয়। বললেই সে আসবে। তবে আমার বলতে সাহস করে না।

প্রথম যেদিন তাকে তুমি বললাম কী প্রচণ্ড ভয়ে ভয়েই না বললাম। সে গোলাপ গাছের ডাল ছেঁটে দিচ্ছিল। আমি পাশে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ কি হলো নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম, কাঁচিটা আমার হাতে দাও, আমি ছেঁটে দি। বলেই মনে হলো— এ কী করলাম আমি! আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। আমার মনে হলো সে এবার চোখে চোখে তাকিয়ে শীতল গলায় বলবে, আমাকে তুমি করে বলবেন না। এত ঘনিষ্ঠতা তো আপনার সঙ্গে আমার নেই।

এশা সে রকম কিছুই বলল না। কাঁচি আমার হাতে দিয়ে বলল, ‘তিন ইঞ্চি করে কাটবেন। এর বেশি না। আর আপনি কি চা খাবেন?’

‘হ্যাঁ খাব।’

‘চা নিয়ে আসছি। শুনুন, এ রকম কচকচ করে কাটবেন না, ওরা ব্যথা পায়। গাছেরও জীবন আছে। জগদীশচন্দ্র বসুর কথা।’

এশা ঘরে ঢুকে গেল। চৈত্র মাসের বিকেলে আমি গোলাপ ছাটতে লাগলাম। আমার ত্রিশ বছর জীবনের সেটা ছিল শ্রেষ্ঠতম দিন। বিকালটাই যেন কেমন অন্যরকম হয়ে গেল। শেষ বিকেলের রোদকে মনে হলো লক্ষ লক্ষ গোলাপ, বাতাস কী মধুর! এশার বাবা যখন বাইরে এসে বললেন, ‘তারপর রঞ্জু দেশের খবর কী বল? নতুন কী গুজব শুনলে?’

কী যে ভালো লাগল সেই কথাগুলি! মনে হলো এ-রকম সুন্দর কথা এর আগে আমাকে কেউ বলে নি।

‘গোলাপের ডাল ছাঁটছ মনে হচ্ছে।’

‘জি চাচা।’

‘এর একটা ফিলসফিক আসপেক্ট আছে। সেটা লক্ষ করেছ? ফুল ফোটাবার জন্যে গাছকে কষ্ট দিতে হচ্ছে। হা হা হা।’

তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও হাসলাম। এশা চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলল, ‘এত হাসাহাসি হচ্ছে কেন? আমি কি যোগ দিতে পারি?’

ওদের বাড়ি থেকে ফিরলাম সন্ধ্যার পর। এশা গেট পর্যন্ত এল। হাসিমুখে বলল, ‘আবার আসবেন।’

এই কথাটি কি পৃথিবীর মধুরতম কথার একটি নয়? আমি আবার আসতে পারি এ বাড়িতে। যতবার ইচ্ছা আসতে পারি। আমাকে কোনো অজুহাত তৈরি করতে হবে না। তবুও ছোটখাট কিছু অজুহাত আমি তৈরি করেই রাখি। যেমন একবার আমার একটা হ্যান্ড ব্যাগ ফেলে এলাম যাতে পরদিন গিয়ে বলতে পারি, জরুরি কিছু কাগজপত্র ছিল। যাক পাওয়া গেল। সবচেয়ে বেশি যা করি তা হচ্ছে— গল্পের বই নিয়ে আসি। তারপর সেই বই ফেরত দিতে যাই।

গল্পের বই আমি পড়ি না। ভালো লাগে না। কোনো কালেও ভালো লাগেনি। তবু রাতে শুয়ে শুয়ে বইয়ের ঘ্রাণ নেই, পাতা ওল্টাই। এশার স্পর্শ এই বইগুলির পাতায় পাতায় লেগে আছে ভাবতেই আমার রোমাঞ্চ বোধ হয়। গা শিরশির করে। গভীর আনন্দে চোখ ভিজে উঠে। বই ওল্টাতে ওল্টাতে একরাতে অদ্ভুত এক কাণ্ড হলো। টুক করে বইয়ের ভেতর থেকে কি যেন পড়ল। তাকিয়ে দেখি ছোট একটা নীল রঙের বোতাম। যেন একটা নীল অপরাজিতা। নাকের কাছে নিয়ে দেখি সত্যি গন্ধ আসছে। আমি গভীর মমতায় বোতামটা বালিশের নিচে রেখে দিলাম। সারারাত ঘুম হলো না। কেবলি মনে হলো একদিন না একদিন এশা আসবে এ বাড়িতে। আমি তাকে বলব, তুমি যে

ফুলটি আমাকে দিয়েছিলে সেটা এখনো ভালো আছে। কী সুন্দর গন্ধ! সে অবাক হয়ে বলবে, আমি আবার ফুল দিলাম কবে?

এর মধ্যে ভুলে গেলে? একটা নীল ফুল দিয়েছিলে না?

বলেন কি! নীল ফুল আমি কোথায় পাব?

আমি বালিশ সরিয়ে বোতামটা বের করে আনব। এশা বিস্মিত হয়ে বলবে— এটা বুঝি আপনার নীল ফুল? আমি বলব, বিশ্বাস না হলে গন্ধ গুঁকে দেখো।

এশার বাবা নিজেই দু'কাপ চা নিয়ে ঢুকলেন। আমার বড় লজ্জা লাগল। আমি বললাম, 'ছিঃ ছিঃ! আপনি কেন?'

তিনি হেসে বললেন, 'তাতে কী হয়েছে? খাও, চা খাও। চিনি হয়েছে কিনা বল।'

'হয়েছে।'

'গুড। চিনি আমি নিজেই দিয়ে এনেছি। কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই ব্যস্ত।'

'কোনো উৎসব নাকি?'

'না, উৎসব কিছু না। মেয়েলি ব্যাপার। এশার বিয়ে ঠিক হলো। ওরা দিন পাকা করতে আসবে। রাত আটটায় আসবে। এখনো তিন ঘণ্টা দেরি, অথচ ভাব দেখে মনে হচ্ছে...।'

আমি নিঃশব্দে চায়ে চুষকু দিতে লাগলাম। এশার বাবা বললেন, 'ব্যারিস্টার ইমতিয়াজ সাহেবের ছেলে। তুমি চিনবে নিশ্চয়ই। ইমতিয়াজ চৌধুরী, জিয়ার আমলে হেলথ মিনিস্টার ছিলেন। ছেলেটা খুব ভালো পেয়েছি। জার্মানি থেকে পিএইচ.ডি. করেছে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। এখন দেশে কি সব ইন্ডাস্ট্রি দিচ্ছে। ষাট তৈরি করবে। আমি ঠিক বুঝিও না।'

চা শেষ করবার পরও আমি খানিকক্ষণ বসে রইলাম। যাবার আগে এশা বেরিয়ে এল। কী চমৎকার করেই না আজ তাকে সাজিয়েছে! তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হয়। এশা হাসিমুখে বলল, 'বেছে বেছে আপনি ঝামেলার দিনগুলিতে আসেন কেন বলুন তো?'

আমি ফিরে যাচ্ছি আমার খুপড়ি ঘরে। অন্যসব রাতের মতো আজ রাতেও হয়তো ঘুম হবে না। বালিশের নিচ থেকে নীল বোতাম বের করে আজও নিশ্চয়ই দেখব। এই পরিবারটির কাছ থেকে একটা নীল বোতামের বেশি পাওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না। এই সহজ সত্যটি আজ রাতেও আমার মাথায় ঢুকবে না। আজ রাতেও বোতামটিকে মনে হবে একটি অপরাজিতা ফুল।



পিঁপড়া

‘আপনার অসুখটা কী বলুন?’

রুগি কিছু বলল না, পাশে বসে-থাকা সঙ্গীর দিকে তাকাল।

ডাক্তার নূরুল আফসার, এমআরসিপি, ডিপিএস, অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তাঁর বিরক্তির তিনটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে— আটটা বেজে গেছে, রুগি দেখা বন্ধ করে বাসায় যেতে হবে। আজ তাঁর শ্যালিকার জন্মদিন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে— গ্রাম থেকে আসা রুগি তিনি পছন্দ করেন না। এরা হয় বেশি কথা বলে, নয় একেবারেই কথা বলে না। ভিজিটের সময় হলে দর-দাম করার চেষ্টা করে। হাত কচলে মুখে তেলতেলে ভাব ফুটিয়ে বলে, কিছু কম করা যায় না ডাক্তার সাব। গরিব মানুষ।

আজকের এই রুগিকে অপছন্দ করার তৃতীয় কারণটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবু নূরুল আফসার সাহেবের কাছে এই কারণটিই প্রধান বলে বোধ হচ্ছে। লোকটির চেহারা নির্বোধের মতো। এই ধরনের লোক নিজের অসুখটাও ঠিকমতো বলতে পারে না, অন্য একজনের সাহায্য লাগে।

‘বলুন, তাড়াতাড়ি বলুন। আমার অন্য কাজ আছে।’

লোকটি কিছু বলল না। গল্প খাঁকারি দিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল। ভাবখানা এ-রকম যে অসুখের কথাটা সঙ্গীটিই বলবে। সে-ও কিছু বলছে না। ডাক্তার নূরুল আফসার হাত বাড়িয়ে দিকে একঝলক তাকিয়ে বললেন, ‘গরু-ছাগল তার কী অসুখ বলতে পারে না। তাদের অসুখ অনুমানে ধরতে হয়। আপনি তো আর গরু-ছাগল না। চুপ করে আছেন কেন? নাম কী আপনার?’

রুগি কিছু বলল না। তার সঙ্গী বলল, ‘উনার নাম মকবুল। মোহম্মদ মকবুল হোসেন ভুঁইয়া।’

‘নামটাও অন্য আরেকজনকে বলে দিতে হচ্ছে। আপনি কি কথা বলতে পারেন, না— পারেন না?’

‘পারি।’

‘কী নাম আপনার?’

‘মোহম্মদ মকবুল হোসেন ভুঁইয়া।’

‘বয়স কত?’

‘বায়ান্ন ।’

‘আপনার সমস্যাটা কী?’

রুগি মাথা নিচু করে ফেলল। নূরুল আফসার সাহেবের ধারণা হলো অস্বস্তিকর কোনো অসুখ, যার বিবরণ সরাসরি দেয়া মুশকিল।

‘আর তো সময় দিতে পারব না। আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। যদি কিছু বলার থাকে এফুনি বলবেন। বলার না থাকলে চলে যান।’

রুগি আবার গলা খাঁকারি দিল।

তার সঙ্গী বলল, ‘উনার অসুখ কিছু নাই।’

‘অসুখ কিছু নেই, তা এসেছেন কেন?’

‘উনারে পিঁপড়ায় কামড়ায়।’

‘কী বললেন?’

‘পিঁপড়ায় কামড়ায়। পিপীলিকা।’

ডাক্তারি করতে গেলে অধৈর্য হওয়া চলে না। রুগিদের সঙ্গে রাগারাগিও করা চলে না। এতে পশার কমে যায়। রোগের বিবরণ শুনে বিস্মিত হওয়াও পুরোপুরি নিষিদ্ধ। রোগের ধরন-ধারণ যতই অদ্ভুত হোক ভান করতে হয় যে, এ জাতীয় রোগের কথা তিনি শুনেছেন এবং চিকিৎসা করে আরাম করেছেন। নূরুল আফসার সাহেব ডাক্তারির এইসব সহজ নিয়ম-কানুন নিষ্ঠার সঙ্গে মানেন। আজ মানতে পারলেন না। ধমকেশ্বর বলে বললেন, ‘পিঁপড়ার কামড়ায় মানে?’

রুগি পকেটে হাত দিয়ে এক টুকরা কাগজ বের করে বলল, ‘চিঠিটা পড়েন। চিঠির মধ্যে সব লেখা আছে।’

‘কার চিঠি?’

‘কাশেম সাহেবের।’

‘কাশেম সাহেবকে?’

‘এমবিবিএস ডাক্তার। আমাদের অঞ্চলের। খুব ভালো ডাক্তার। উনি আপনার কাছে আমারে পাঠাইছেন। বলছেন নাম বললে আপনি চিনবেন। উনি আপনার ছাত্র।’

নূরুল আফসার সাহেব কাশেম নামের কোনো ছাত্রের নাম মনে করতে পারলেন না। কাশেম বহুল প্রচলিত নামের একটি। ক্লাসে প্রতিবছরই দু’একজন কাশেম থাকে। এ কোন কাশেম কে জানে।

‘স্যার চিনেছেন?’

চিনি না বলাটা ঠিক হবে না। পুরানো ছাত্ররা রুগি পাঠায়। এদেরকে খুশি রাখা দরকার। কাজেই আফসার সাহেব শুকনো হাসি হেসে বললেন, ‘হ্যাঁ চিনেছি। কী লিখেছে দেখি।’

‘উনি স্যার আপনাকে সালাম দিয়েছেন।’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখি চিঠিটা দেখি।’

চিঠি দেখে ডাক্তার সাহেবের জ্র কুণ্ঠিত হলো। বাঙালি জাতির সবচেয়ে দোষ হলো—এরা কোনো জিনিস সংক্ষেপে করতে পারে না। দুই পাতার এক চিঠি ফেঁদে বসেছে। তিনি পড়লেন—

পরম শ্রদ্ধেয় স্যার,

আমার সালাম জানবেন। আমি সেভেন্টি থ্রি ব্যাচের ছাত্র। আপনি আমাদের ফার্মাকোলজি পড়াতেন। আপনার বিষয়ে আমি সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছিলাম। সেই উপলক্ষে আপনি আপনার বাসায় আমাকে চায়ের দাওয়াত করেছিলেন।

আশা করি আপনার মনে পড়েছে। যাই হোক, আমি মকবুল সাহেবকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। মকবুল এই অঞ্চলের একজন অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তি। সে বছর চারেক ধরে অদ্ভুত এক ব্যাধিতে ভুগছে। একে ব্যাধি বলা যাবে না কিন্তু অন্য কোনো নামও আমি পাচ্ছি না। ব্যাপারটা হচ্ছে তাকে সব সময় পিঁপড়া কামড়ায়।

বুঝতে পারছি বিষয়টা আপনার কাছে খুবই হাস্যকর মনে হচ্ছে। শুরুতে আমার কাছেও মনে হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম এটা এক ধরনের মানসিক ব্যাধি। বর্তমানে আমার সেই ধারণা পুরোপুরি ভেঙে গেছে। আমি নিজে লক্ষ করেছি মকবুল সাহেব কোথাও বসলেই সারি বেঁধে পিঁপড়া তার কাছে আসতে থাকে।

পীর-ফকির, তাবিজ, ঝাড়-ফুক জাতীয় আধি ভৌতিক চিকিৎসা সবই করানো হয়েছে। কোনো লাভ হয়নি। আমি কোনো উপায় না দেখে আপনার কাছে পাঠালাম। আপনি দয়া করে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবেন না।

বিনীত

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র

আবুল কাশেম।

ব্লু স্টার ফার্মেসি। নান্দাইল। কেন্দুয়া।

ডাক্তার সাহেব রুগির দিকে তাকালেন। রুগি পাথরের মতো মুখ করে বসে আছে। গায়ে ফতুয়া ধরনের জামা। পরনে লুঙ্গি। অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তির পোশাক নয়।

ডাক্তার সাহেব কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। কিছু-একটা বলতে হয়। মকবুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। এই জাতীয় উদ্ভট যন্ত্রণার কোনো মানে হয়?

‘পিঁপড়া কামড়ায় আপনাকে?’

‘জি স্যার। কোনো এক জায়গায় বসে থাকলেই পিঁপড়া এসে ধরে।’

নূরুল আফসার সাহেব একবার ভাবলেন বলবেন, ‘আপনি কি রসগোল্লা না-কি যে পিঁপড়া ছেকে ধরবে? শেষ পর্যন্ত বললেন না।’

‘বড় কষ্টে আছি স্যার। যদি ভালো করে দেন সারাজীবন কেনা গোলাম হইয়া থাকব। টাকাপয়সা কোনো ব্যাপার না, স্যার। টাকা যা লাগে লাগুক।’

‘আপনার কি অনেক টাকা?’

‘জি স্যার।’

‘কী পরিমাণ টাকা আছে?’

রুগি কোনো জবাব দিল না। রুগির সঙ্গী বলল, ‘মকবুল ভাইয়ের কাছে টাকাপয়সা কোনো ব্যাপার না। লাখ দুই লাখ উনার হাতের ময়লা।’

নূরুল আফসার সাহেব এই প্রথম খানিকটা কৌতূহলী হলেন। লাখ টাকা ফতুয়া-গায়ে লুঙ্গি-পরা এই লোকটির হাতের ময়লা—এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তিনি নিজেও ধনবান ব্যক্তি। ফিক্সড ডিপোজিটে তাঁর এগারো লাখ টাকার মতো আছে। এই টাকা সঞ্চয় করতে গিয়ে জীবন পানি করে দিতে হয়েছে। ভোর ছ’টা থেকে রাত বারোটা—এক মুহূর্তের বিশ্রাম নেই।

একমাত্র ছুটির দিন শুক্রবারটাও তিনি কাজে আগান। সকালের ফ্লাইটে চিটাগাং যান, লাস্ট ফ্লাইটে ফিরে আসেন। শুক্রবার একটা ক্লিনিকে বসেন। ঐ ক্লিনিকের তিনি কনসালটিং ফিজিসিয়ান। আর এই লোককে দেখে তো মনে হয় না সে কোনো কাজকর্ম করে। রিকোন্সের মতো এই লোক এত টাকা করে কী করে? নূরুল আফসার সাহেবের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

মকবুল ক্ষীণ স্বরে বলল, ‘কোণটা যদি সারায়ে দেন।’

‘এটা কোনো রোগ না। আমি এমন কোনো রোগের কথা জানি না—যে রোগে দুনিয়ার পিঁপড়া এসে কামড়ায়। অসুখটা আপনার মনের। আমি সাইকিয়াট্রিস্টের ঠিকানা লিখে দিচ্ছি—তাঁর সঙ্গে কথা বলুন। আপনার যে সমস্যা এই সমসার সমাধান আমার কাছে নেই।’

নূরুল আফসার সাহেব বাক্যটা পুরোপুরি শেষ করলেন না। কারণ, একটা অদ্ভুত দৃশ্যে তাঁর চোখ আটকে গেল। তিনি দেখলেন, টেবিলের উপর রাখা মকবুলের ডান হাতের দিকে এক সারি লাল পিঁপড়া এগুচ্ছে। পিঁপড়ারা সচরাচর এক লাইনে চলে, এরা তিনটি লাইন করে এগুচ্ছে।

ডাক্তার সাহেবের দৃষ্টি লক্ষ করে মকবুলও তাকাল পিঁপড়ার সারির দিকে। সে কিছু বলল না বা হাতও সরিয়ে নিল না।

নূরুল আফসার সাহেব বললেন, ‘এই পিঁপড়াগুলো কি আপনার দিকে আসছে?’

‘জি স্যার।’

‘বলেন কি!’

‘পায়েও পিঁপড়া ধরেছে। এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসতে পারি না স্যার।’

নূরুল আফসার সাহেব কাছে এগিয়ে এলেন। উঁচু হয়ে বসলেন। সত্যি সত্যি দু’সারি পিঁপড়া লোকটির পা’র দিকে এগুচ্ছে।

‘মকবুল সাহেব।’

‘জি স্যার।’

‘আমার একটা জরুরি কাজ আছে, চলে যেতে হচ্ছে। আপনি কি কাল একবার আসবেন?’

‘অবশ্যই আসব। যার কাছে যাইতে বলেন যাব। বড় কষ্টে আছি স্যার। রাত্রে ঘুমাইতে পারি না। নাকের ভিতর দিয়ে পিঁপড়া ঢুকে যায়।’

‘আপনি কাল আসুন। কাল কথা বলব।’

‘জি আচ্ছা।’

মকবুল উঠে দাঁড়াল। পর মুহূর্তেই যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্যে নূরুল আফসার সাহেব মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। তার কাছে মনে হলো মকবুল কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। চিন্তা ও বিচার শক্তি পুরোপুরি লোপ পেয়েছে। তিনি দেখলেন মকবুল হিংস্র ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে, পা ঘসে ঘসে পিঁপড়া মারার চেষ্টা করছে। এক পর্যায়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেবিলে, দু’হাতে পিষে ফেলল পিঁপড়ার সারি। মকবুলের মুখ গামে চটচট করছে। চোখের তারা ঈষৎ লালভ। মুখে হিসহিস শব্দ করছে এবং নিচু গলায় বলছে, ‘হারামজাদা, হারামজাদা।’

তার সঙ্গী কিছুই বলছে না। মাথা নিচু করে দেয়াশলাইর কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁচাচ্ছে। তার ভাবভঙ্গি থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এ জাতীয় ঘটনার সঙ্গে সে পরিচিত। এই ঘটনায় সে অস্বাভাবিক কিছু দেখছে না।

নূরুল আফসার সাহেব শালীর জন্মদিনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন। রুগির দিকে হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দু’জন অ্যাসিস্ট্যান্টও ছুটে এসেছে। তারা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়ের চেয়ে ভয় বেশি।

মকবুল হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেল। নিচু গলায় বলল, ‘স্যার মনে কিছু নিবেন না। এই পিঁপড়ার ঝাঁক আমার জেবন শেষ কইরা দিছে। হারামজাদা পিঁপড়া! এক গেলাস ঠাণ্ডা পানি দিবেন?’

ডাক্তার সাহেবের অ্যাসিস্টেন্ট অতি দ্রুত ফ্রিজ থেকে পানির বোতল বের করে নিয়ে এল। একজন ভয়ঙ্কর পাগলের পাগলামি হঠাৎ থেমে গেছে এই আনন্দেই সে আনন্দিত।

মকবুল পানির গ্লাস হাতে নিয়ে বসে রইল। পানি মুখে দিল না। মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে বলল, ‘যেখানে যাই সেইখানে পিঁপড়া, কী করব কন। যে

খাটে ঘুমাই সে খাটের পায়ার নিচে বিরাট বিরাট মাটির সরা। সরা ভর্তি পানি। তাতেও লাভ হয় না।’

‘লাভ হয় না?’

‘জি না। ক্যামনে ক্যামনে জানি বিছানায় পিঁপড়া উঠে। ঘন্টায় ঘন্টায় বিছানার চাদর বদলাইতে হয়।’

‘বলেন কি!’

‘সত্যি কথা বলতেছি জনাব। একবর্ণ মিথ্যা না। যদি মিথ্যা হয় তা হইলে যেন আমার শরীরে কুষ্ঠ হয়। আমি জনাব এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতেও পারি না। জায়গা বদল করতে হয়। আমার জীবন শেষ।’

ডাক্তার সাহেব একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। যে লোকটিকে শুরুতে মনে হয়েছিল কথা বলতে পারে না, এখন দেখা যাচ্ছে সে প্রচুর কথা বলতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। গ্রামের লোকজনের প্রাথমিক ইনহিবিশন কেটে গেলে প্রচুর কথা বলে। প্রয়োজনের কথা বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনের কথাই বেশি বলে।

‘চিকিৎসায় কোনো ত্রুটি করি নাই জনাব। কেরোসিন তেলে কর্পূর দিয়ে সেই তেল শরীরে মাখছি যদি গন্ধে পিঁপড়া না আসে। প্রথম দুই-একদিন লাভ হয়, তারপর হয় না। পিঁপড়া আসে। এমন জিনিস নাই যে শরীরে মাখি নাই। যে যা বলেছে মাখছি। একজন বলল, বাদুড়ের গুঁ শরীরে মাখলে আরাম হইব। সেই বাদুড়ের গুঁও মাখলাম। এর চেয়ে জনাব আমার মরণ ভালো।’

ডাক্তার সাহেব তার অ্যাসিস্টেন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘বাসায় টেলিফোন করে দাও যে আমি একটা বামেলায় আটকে পড়েছি। আসতে দেরি হবে। আর আমাদের চা দাও।’

‘আপনি চা খান?’

‘জি চা খাই।’

‘চা খেতে খেতে বলুন কীভাবে এটা শুরু হলো, প্রথম কখন পিঁপড়া আপনার দিকে আকৃষ্ট হলো।’

‘একটু গোপনে বলতে চাই জনাব।’

‘গোপনে বলার ব্যাপার আছে কি?’

‘জি আছে।’

‘বেশ। গোপনেই বলবেন। আগে চা খান।’

লোকটি চা খেল নিঃশব্দে। চা খাবার সময় একটি কথাও বলল না। তার কথা বলার ইচ্ছা সম্ভবত ঢেউয়ের মতো আসে। ঢেউ যখন আসে তখন প্রচুর বকবক করে, ঢেউ থেমে গেলে চুপচাপ হয়ে যায়। তখন কথা বলে তার সঙ্গী। এখন সঙ্গীই কথা বলছে—

‘ডাক্তার সাব, সবচেয়ে বেশি ফল হয়েছে যে চিকিৎসায় সেইটাই তো বলা হয় নাই। মকবুল ভাই, ঐ চিকিৎসার কথা বলেন।’

‘তুমি বল।’

‘এই চিকিৎসা মকবুল ভাই নিজেই বাইর করছে। বিষে বিষক্ষয় চিকিৎসা। গুড়ের গন্ধে পিঁপড়া সবচেয়ে বেশি আসে। মকবুল ভাই করলেন কি, সারা শইলে গুড় মাখলেন। এতে লাভ হইছিল। সাত দিন কোনো পিঁপড়া আসে নাই।’

মকবুল গম্ভীর গলায় বলল, ‘সাতদিন না পাঁচদিন।’

ডাক্তার সাহেব বললেন, ‘পাঁচদিন পরে আবার পিঁপড়া আসা শুরু হলো?’

‘জি।’

‘পিঁপড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে মনে হয় অনেক কিছু করেছেন।’

‘জি। নদীর মাঝখানে নৌকা নিয়া কয়েক দিন ছিলাম। তিন দিন আরামে ছিলাম। চাইর দিনের দিনে পিঁপড়া ধরল।’

‘সেখানে পিঁপড়া গেল কীভাবে?’

‘জানি না জনাব অভিশাপ।’

‘কীসের অভিশাপ?’

‘আপনার গোপনে বলতে চাই।’

ডাক্তার সাহেব গোপনে বলার ব্যবস্থা করলেন। পুরো ব্যাপারটায় তিনি এখন উৎসাহ পেতে শুরু করেছেন। পালীর জন্মদিনের কথা মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে। খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছেন। এই পর্যন্তই। কোনো রুগির ব্যাপারে এ জাতীয় কৌতূহল তিনি এর আগে বোধ করেননি। অবিশ্যি এই লোকটিকে রুগি বলতেও বাঁধছে। কাউকে পিঁপড়া হেঁকে ধরে এটা নিশ্চয়ই কোনো রোগ-ব্যধির পর্যায়ে ফেলা যাবে না।

ঘর থেকে সম্বাইকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। মকবুলের সঙ্গীও নেই। দরজা ভেজানো। মকবুল নিচু গলায় কথা শুরু করল—

‘জনাব, আপনার আমি আগেই বলছি আমি টাকাপয়সাওয়ালা লোক। আমাদের টাকাপয়সা আইজ-কাইলের না। ব্রিটিশ আমলের। আমার দাদাজান পাকা দালান দেন। দাদাজানের দুইটা হাতি ছিল। একটার নাম ময়না, অন্যটার নাম সুরভি। দুইটাই মাদি হাতী।’

‘ঐ প্রসঙ্গ থাক, আপনার পিঁপড়ার প্রসঙ্গে আসুন।’

‘আসতেছি। আমি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক। টাকাপয়সা, ক্ষমতা এইসব জিনিস বেশি থাকলে মানুষের স্বভাব-চরিত্র ঠিক থাকে না। আমরা ঠিক ছিল না। আপনারা যারে চরিত্র-দোষ বলেন তাই হইল। পনেরো-ষোল বছর বয়সেই। বিরাট বাড়ি— সুন্দরী মেয়েছেলের অভাব

ছিল না। দাসী-বাঁদি ছিল। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের মেয়ে-বউরা ছিল।

আমারে একটা কঠিন কথা বলার বা শাসন করার কেউ ছিল না। আমার মা অবশ্য জীবিত ছিলেন। কেউ-কেউ তাঁর কাছে বিচার নিয়ে গেছে। লাভ হয় নাই। উল্টা আমার ধমক খাইছে।’

‘আপনি বিয়ে করেননি?’

‘জি বিবাহ করেছি। বিবাহ করব না কেন? দুটি বিবাহ করেছি। সন্তানদি আছে। স্বভাব নষ্ট হইলে বিয়ে-সাদী করলেও ফায়দা হয় না। মেয়েছেলে দেখলেই...’

‘আপনি আসল জায়গায় আসুন। আজেবাজে কথা বলে বেশি সময় নষ্ট করছেন।’

‘জি আসতেছি। বছর পাঁচেক আগে আমার দূর-সম্পর্কীয় এক বোনের মেয়ের উপর আমার চোখ পড়ল। চইদ-পনেরো বছর বয়স। গায়ের রঙ একটু ময়লা, কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো। আমার চরিত্র তো কারো অজানা না। মেয়ের মা মেয়েকে আগলায়ে রাখে। খুবই বজ্জাত মা, মেয়েকে নিয়ে আমার মা’র ঘরে মেঝেতে ঘুমায়। এত কিছু কইরাও লাভ হইল না। এক রাতে ঘটনা ঘটে গেল।’

‘কী বললেন, ঘটনা ঘটে গেল?’

‘জি।’

‘আশ্চর্য ব্যাপার! আপনি যেভাবে বলছেন তাতে মনে হচ্ছে খুবই তুচ্ছ একটা ব্যাপার। জিনিসটা তুচ্ছই কিছুই না। হে হে হে।’

‘হাসবেন না। হাসির কোনো ব্যাপার না।’

‘জি আচ্ছা। তারপর কী হলো— ঐ বজ্জাত মা সেই রাইতেই মেয়েটারে ইঁদুর-মারা বিষ খাওয়াইয়া দিল। আর নিজে একটা দড়ি নিয়ে বাড়ির পিছনে একটা আমগাছে ফাঁস নিল। আমারে বিপদে ফেলার চেষ্টা, আর কিছু না। মাগী চূড়ান্ত বজ্জাত। আমি চিন্তায় পড়লাম।

দুইটা মৃত্যু সোজা কথা না। থানা-পুলিশ হবে। পুলিশ তো এই জিনিসটাই চায়। এরা বলবে খুন করা হয়েছে।’

‘আপনি খুন করেননি?’

‘আরে না। খুন করব কী জন্যে। আর যদি খুনের দরকারও হয় নিজের ঘরে খুন করব? কাউরে খুন করতে হইলে জায়গার অভাব আছে? খুন করতে হয় নদীর উপরে। রক্ত ধুইয়ে ফেলা যায়। তারপর লাশ বস্তার ভিতর বইরা চুন মাখায়ে চার-পাঁচটা ইট বস্তার ভিতর দিয়ে বিলে ফালায়ে দিতে হয়। এই জনের জন্যে নিশ্চিত। কোনো সম্বন্ধির পুত কিছু জানব না।’

‘আপনি খুনও করেছেন?’

‘জি না। দরকার হয় নাই। যেটা বলতেছিলাম সেইটা শুনে, ঘরে দুইটা লাশ। আমি বললাম, খবরদার লাশের গায়ে কেউ হাত দিবা না। যে রকম আছে সে রকম থাক, আমি নিজে গিয়ে থানার ওসি সাহেবেরে আনতেছি, ওসি সাহেব আইয়্যা যা করবার করব।

থানা আমার বাড়ি থাইক্যা পনেরো মাইল দূর। পানসি নৌকা নিয়া গেলাম। দারোগা সাহেব আর থানা স্টাফের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা নজরানা নিয়া গেলাম। গিয়া দেখি বিরাট সমস্যা। দারোগা সাব গিয়েছেন বোয়ালখালী ডাকাতি মামলার তদন্তে। ফিরলেন পরের দিন। তারে নিয়ে আমার বাড়িতে আসতে লাগল তিন দিন।

বর্ষাকাল। গরমের দিন। তিন দিনেই লাশ গেছে পচে। বিকট গন্ধ। দারোগা সাবরে নিয়া কাঁঠাল গাছের কাছে গিয়া দেখি অদ্ভুত দৃশ্য। লাখ লাখ লাল পিঁপড়া লাশের শরীরে। মনে হইতেছে মাগীর সারা শরীরে লাল চাদর।

মেয়েটারও একই অবস্থা। মুখ হাত পা কিছুই দেখার উপায় নাই। পিঁপড়ায় সব ঢাকা। মাঝে মাঝে সবগুলি পিঁপড়া যখন একসঙ্গে নড়ে, তখন মনে হয় লাল চাদর কেউ যেন ঝাড়া দিল।’

ডাক্তার সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, ‘আপনি তো দেখি খুবই বদলোক।’

‘জি না, আমার মতো টেকাপয়সা ফাকি থাকে তারা আরো বদ হয়। আমি বদ না। তারপর কি ঘটনা সেইটাই শুনে— আমি একটা সিগারেট ধরাইলাম। সিগারেটের আগুন ফেলার সাথে সাথে মেয়েটার শরীরের সবগুলি পিঁপড়া নড়ল। মনে হলো যেন একটা বড় ঢেউ উঠল। তারপর সবগুলি পিঁপড়া একসঙ্গে মেয়েটারে ছাইড়া মাটিতে নামল। মেয়েটার চোখ মুখ সব খাইয়া ফেলেছে— জায়গায় জায়গায় হাড়ি বের হয়ে গেছে। দারোগা সাহেব রুমাল দিয়ে নাক চেপে ধরে বললেন, মাবুদে এলাহি। তারপর অবাক হয়ে দেখি সবগুলি পিঁপড়া একসঙ্গে আমার দিকে আসতেছে। ভয়ঙ্কর অবস্থা। আমি দৌড় দিয়ে বাইরে আসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে পিঁপড়াগুলি বাইরে আসল। মনে হইল আমারে খুঁজতেছে। সেই থাইক্যা শুরু। যেখানে যাই পিঁপড়া। জনাব, আপনার এই ঘরে কি সিগারেট খাওয়া যায়? খাওয়া গেলে একটা সিগারেট খাইতে চাই।’

‘খান।’

‘শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।’

মকবুল সিগারেট ধরাল। তার মুখ বিষণ্ণ। সে আনাড়িদের মতো ধূয়া ছাড়ছে। খুকখুক করে কাশছে। খানিকটা দম নিয়ে বলল, ‘আমার কাশি ছিল না। এখন কাশি হয়েছে। নাকের ভিতর দিয়া পিঁপড়া ঢুকে গেছে ফুসফুসে। ওরা ঐখানেই বসবাস করে। ক্যামনে বুঝলাম জানেন? কাশির সাথে রক্ত

আসে। আর আসে মরা পিঁপড়া।’

ডাক্তার সাহেব একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

মকবুল সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, ‘সিগারেট খাইতেছি যাতে ভালো মতো কাশি উঠে। কাশি উঠলে কাশির সাথে পিঁপড়া আর পিঁপড়ার ডিম বাইর হবে। আপনি দেখবেন নিজের চোখে। আমি ঘোষণা দিছি, যে আমারে পিঁপড়ার হাত থাইক্যা বাঁচাইব তারে আমি নগদ দুই লাখ দিব। আমি বদ লোক হইতে পারি কিন্তু আমি কথার খেলাপ করি না। আমি টাকা সাথে নিয়ে আসছি। আপনে আমারে বাঁচান।’

ডাক্তার সাহেব কিছু বললেন না। তিনি তাঁর বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপরের কাচের দিকে তাকিয়ে আছেন। মকবুলের বাম হাত টেবিলের উপর। দুই সারি পিঁপড়া টেবিলের দু’প্রান্ত থেকে সেই হাতের দিকে এগুচ্ছে। মকবুলেরও সেই দিকে চোখ পড়ল। সে ছোট নিশ্বাস ফেলে বলল, ‘আপনের কিছু করা সম্ভব না। ঠিক না ডাক্তার সাব?’

‘হ্যাঁ ঠিক।’

‘আমি জানতাম। আমার মরণ পিঁপড়ার হাতে।’

মকবুল মস্তমুণ্ডের মতো এগিয়ে আসা পিঁপড়ার সারি দু’টির দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ চকচক করছে। সে তার বাঁ হাত আরেকটু এগিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বলল, ‘নে খা।’

পিঁপড়ারা মনে হলো একটু থমকে গেল। গা বেয়ে উঠল না— কিছুক্ষণ অনিশ্চয়তার ভুগল।

মকবুল বলল, ‘নিজ থাইক্যা খাইতে দিলে এরা কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে, সঙ্গে সঙ্গে শরীরে উঠে না। শলাপরামর্শ করে। এই দেহেন ডাক্তার সাব— উঠতেছে না।’

‘তাই তো দেখছি।’

‘দুই এক মিনিটের ব্যাপার। দুই-এক মিনিটে শলাপরামর্শ শেষ হইব, তখন শইলে উঠা শুরু হইব।’

হলোও তাই। ডাক্তার সাহেব লক্ষ করলেন, পিঁপড়ার দল মকবুলের বাঁ হাতেই উঠতে শুরু করেছে। দু’টি সারি ছাড়াও নতুন এক সারি পিঁপড়া রওনা হয়েছে। এই পিঁপড়াগুলির মুখে ডিম। ডাক্তার সাহেব ভেবে পেলেন না, মুখে ডিম নিয়ে পিঁপড়াগুলি যাচ্ছে কেন? এরা চায় কী? কে তাদের পরিচালিত করছে। কে সেই সূত্রধর?



উনিশ শ' একাত্তর

তারা এসে পড়ল সন্ধ্যার আগে আগে।

বিরাট একটা দল। মার্চ টার্চ কিছু না। এলোমেলোভাবে হেঁটে আসা। সম্ভবত, বহুদূর থেকে আসছে। ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ছে একেক জন। ঘামে মুখ ভেজা। ধূলিধূসরিত থাকি পোশাক।

গ্রামের লোকজন প্রায় সবাই লুকিয়ে পড়ল। শুধু বদি পাগলা হাসিমুখে এগিয়ে গেল। মহানন্দে চেষ্টায়ে উঠল, 'বিষয় কী গো?'

পুরো দল থমকে দাঁড়াল মুহূর্তে। বদি পাগলার হাতে একটা লাল গামছা। সে গামছা নিশানের মতো উড়িয়ে চেষ্টাল, কই যান গো আশ্রমেরা? এমন অদ্ভুত ব্যাপার সে আগে কখনো দেখেনি।

মেজর সাহেবের চোখে সানগ্লাস। তিনি সানগ্লাস খুলে ফেলে ইংরেজিতে বললেন, 'লোকটা কী বলছে?'

রফিকউদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'লোকটা মনে হচ্ছে পাগল। আমাদের সব গ্রামে একটা করে পাগল থাকে।'

'তাই নাকি?'

'জি স্যার।'

'বুঝলে কী করে এ পাগল?'

রফিকউদ্দীন চুপ করে গেল। মেজর সাহেবের খুব পেঁচানো স্বভাব। একটি কথার দশটি অর্থ কল্পে। বদি পাগলাকে দেখা গেল ছুটতে ছুটতে আসছে। তার মুখ ভর্তি হাসি। রফিক ধমকে উঠল, 'এ্যাই, কী চাস তুই?' বদি পাগলার হাসি আরো বিস্তৃত হলো। রফিক কপালের ঘাম মুছল। সরু গলায় বলল, 'লোকটা স্যার পাগল। আমাদের সব গ্রামে একটা করে...।'

'এই কথা তুমি আগে একবার বলেছ। একই কথা দু'তিনবার বলার প্রয়োজন নেই।'

রফিক ঢোক গিলল। মেজর সাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'এ জায়গাটা আমার পছন্দ হচ্ছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক। সবাই টায়ার্ড।'

'মাইল পাঁচেক গেলেই স্যার নবীনগর। খুব বড় বাজার, পুলিশ ফাঁড়ি আছে। সন্ধ্যা নামার আগে আগে স্যার নবীনগর চলে যাওয়া ভালো।'

'কেন? তুমি কি ভয় পাচ্ছ?'

'জি না স্যার, ভয় পাব কেন?'

মেজর সাহেব দলটির দিকে তাকিয়ে কিছু-একটা বললেন। মৃদু সাড়া জাগল। নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়ল সবাই। মাথা থেকে ভারী হ্যালমেট খুলে ফেলতে লাগল। মেজর সাহেব নিচু স্বরে বললেন, ‘পাগলটাকে বেঁধে ফেলতে হবে।’ তিনি কাঠের একটি বাক্সের উপর বসে পাইপ ধরালেন। থাকি পোশাক পরা কারো মুখে পাইপ মানায় না। কিন্তু এই মেজর সাহেব অসম্ভব সুপুরুষ। তাঁর মুখে সবকিছুই মানায়।

পাগলটাকে আমগাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হলো। তার কোনো আপত্তি দেখা গেল না। বরং কাছাকাছি থাকতে পারার সৌভাগ্যে তাকে আনন্দিতই মনে হলো। কেউ তার দিকে তেমন নজর দিল না। এরা অসম্ভব ক্লান্ত। এদের দৃষ্টি নিরাসক্ত ও ভাবলেশহীন।

মেজর সাহেব পানির বোতল থেকে কয়েক চুমুক পানি খেলেন। বুটজুতা জোড়া খুলে ফেললেন। তাঁর বাঁ পায়ের গোড়ালিতে ফোঁস পড়েছে। রফিক বলল, ‘ডাব খাবেন স্যার?’

মেজর সাহেব সে-কথার জবাব না দিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, ‘আগে আমরা কোনো গ্রামে গেলেই ছোটখাট একটা দল পাকিস্তানি পতাকা হাতে নিয়ে আসত। এখন আর আসে না। এর কারণ কি জান?’

‘জানি না স্যার।’

‘ভয়ে আসে না। এই গ্রামের সব ক’টি লোক এখন জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। ঠিক না?’

রফিক জবাব দিল না। বদ্বি পাগলা বলল, ‘একটু বোতলের পানি খাইতে মন চায়।’

‘ও কী চায়?’

‘ওয়াটার বটল থেকে পানি খেতে চায় স্যার।’

গ্রামের সবাই শালিয়ে গেলেও আজিজ মাস্টার যেতে পারেনি। কারণ, সোনাপোতা থেকে তার ছোট বোন এসেছিল। আজ সকাল থেকেই তার প্রসবব্যথা শুরু হয়েছে। এ-রকম একজন মানুষকে নিয়ে টানাটানি করা যায় না। তবু আজিজ মাস্টার দু’বার বলল, ‘ধরাধরি কইরা নাওডাত নিয়া তুললে শ্যামগঞ্জ লইয়া যাওন যায়।’ তার জবাবে আজিজ মাস্টারের মা তার কাপুরুষতা নিয়ে কুৎসিত একটা গাল দিয়েছেন। পা ভাঙা বিড়ালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আজিজ মাস্টার প্রতিবাদ করেনি। কারণ, কথাটি সত্যি। সে বড়ই ভীতু। গ্রামে মিলিটারি ঢুকেছে শোনার পর থেকে তার ঘনঘন প্রস্রাবের বেগ হচ্ছে। সে বসে আছে উঠোনে। এবং সামান্য শব্দেও দারুণভাবে চমকে উঠছে।

‘মাস্টার বাড়িত আছ?’

‘কেডা?’

‘আমরা। খবর হনছ? বদি পাগলারে বাইক্কা রাখছে আমগাছে।’

‘হনছি।’

নীলগঞ্জের মুরব্বিদের কয়েক জন শঙ্কিত ভঙ্গিতে উঠে এল উঠোনে।

‘তোমার তো একটু যাওন লাগে মাস্টার।’

‘কই যাওন লাগে?’

দবীর মিয়া তার উত্তর না দিয়ে নিচু গলায় বলল, ‘তুমি ছাড়া কে যাইব? তুমি ইংরেজি জান। গুরু ভাষা জান।’

‘মিলিটারির কাছে যাইতে কন?’

‘হ।’

‘আমি গিয়া কী করতাম?’

‘গিয়া কইবা এই গেরামে কোনো অস্বিধা নাই। পাকিস্তানের নিশানটা হাতে লইয়া যাইবা। ভয়ের কিছু নাই।’

মাস্টার অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। দবীর মিয়া বিরক্ত হয়ে বলল, ‘কথা কওনা যে?’

‘আমি যাই ক্যামনে? বাড়িত অত বড় বিপদ। পুত্রির বাচ্চা অইব।’

‘তোমার তো কিছু করণের নাই মাস্টার। তুমি ডাক্তারও না, কবিরাজও না।’

মাস্টার ক্ষীণস্বরে বলল, ‘পাকিস্তানের পতাকা পাইয়াম কই?’

‘ক্যান ইস্কুলের পতাকা কী করল?’

‘ফালাইয়া দিছি।’

‘ফালাইয়া দিছ? ক্যান?’

মাস্টার জবাব দেয় না। দবীর মিয়া রাগী গলায় বলে, ‘আই.এ. পাশ করলে কি হইব মাস্টার? তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি অয় নাই। পতাকাটি তুমি ফালাইলা কোন আক্কেলে? এখন কি আর করবা। যাও খালি হাতে।’

‘আমার ডর লাগে চাচাজী।’

‘ডরের কিছু নাই। এরা বাঘও না, ভালুকও না। তুমি গিয়া খাতির-যত্ন কইরা দুইটা কথা কইবা। এক মিনিটের মামলা। কি কও আসমত?’

‘নেয্য কথা।’

‘দেরি কইরো না। আন্ধাইর হওনের আগেই যাও।’

‘একলা?’

‘একলা যাওনই বালা। একলাই যাও। তিনবার কুলছ আল্লাহ কইরা ডাইন পাওডা আগে ফেলবা। পাঁচবার মনে-মনে কইবা, ‘ইয়া মুকাদ্দেমু।’ ভয়-ডরের কিছুই নাই মাস্টার। আল্লাহর পাক কালাম। এর মরতবাই অন্য রকম।’

আজিজ মাস্টার মাথা নিচু করে বসে রইল। তার আবার প্রশ্রাবের বেগ

হয়েছে। ঘরের ভেতর থেকে পুতি কুঁ কুঁ করছে। প্রথম পোয়াতি। খুব ভোগাবে।

‘ভইনটারে এমুন অবস্থায় ফালাইয়া ক্যামনে যাই?’

‘এইটা কী কথা! তুমি ঘরে থাক্যা করবাটা কী? বেকুবের মতো কথা কও খালি। উঠ দেহি।’

আজিজ মাস্টার উঠল।

মেজর সাহেব দীর্ঘ সময় তার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন। অন্ধকার হয়ে আসছে। তাঁর মুখের ভাব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তিনি বসে আছেন কাঠের একটি বড় বাক্সের উপর। পা দু’টি ছড়ানো। মেজর সাহেব পরিষ্কার বাংলায় বললেন, ‘কী চাও?’

আজিজ মাস্টার থতমত খেয়ে গেল। এ বাংলা জানে নাকি? কী আশ্চর্য!

‘কী চাও তুমি?’

‘জি, কিছু চাই না।’

মেজর সাহেব এবার ইংরেজিতে বললেন, ‘কিছু চাই চাইলে এসেছ কেন? তামাশা দেখতে? সার্কাস হচ্ছে?’

আজিজ মাস্টার ঘামতে শুরু করল। মেজর সাহেবের পরবর্তী সমস্ত কথোপকথন হলো ইংরেজিতে। আজিজ মাস্টার বেশিরভাগ জবাবই দিল বাংলায়। তাতে অসুবিধা হলো না, মেজর সাহেব বাংলা বুঝতে পারেন।

‘তুমি কী কর?’

‘আমি এখানকার প্রাইমারি স্কুলের টিচার।’

‘এখানে আবার স্কুলও আছে নাকি?’

‘জি স্যার।’

‘আর কী আছে?’

‘একটা মসজিদ আছে।’

‘শুধু মসজিদ? মন্দির নেই? পূজা হয় যেখানে?’

‘জি না স্যার।’

‘ঠিক করে বল মন্দির আছে কিনা।’

‘নাই স্যার।’

মেজর সাহেব পাইপ ধরালেন। ঠাণ্ডা গলায় কাকে যেন পাঞ্জাবি বা অন্য কোনো ভাষায় কি বললেন। সেই লোকটি উঠে এসে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল আজিজ মাস্টারের গালে। আজিজ মাস্টার চিৎ হয়ে পড়ে গেল। আমগাছের সঙ্গে বাঁধা বদি পাগলা দারুণ অবাক হয়ে বলল, ‘ও মাস্টার উঠ উঠ।’ যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে মেজর সাহেব বললেন, ‘তোমার নাম কী?’

‘আজিজুর রহমান।’

‘আজিজুর রহমান, তোমাদের এদিকে মুক্তিবাহিনী আছে?’

‘জি না।’

‘সবাই পাকিস্তানি?’

‘জি।’

‘বাহ, খুব ভালো। তুমি নিজেও একজন খাঁটি পাকিস্তানি ঠিক?’

‘জি স্যার।’

‘সবাই পাকিস্তানি হলে এত ভয় কীসের? আমার তো মনে হয় এ গ্রামের সবাই ভয়ে পালিয়েছে। মেয়েগুলি লুকিয়ে আছে জঙ্গলে, ঠিক না?’

আজিজ মাস্টার জবাব দিল না। তার মাথা ঘুরছে। বমি আসছে। বহু কষ্টে সে বমির বেগ সামলাতে লাগল।

‘তোমাদের কি ধারণা আমরা তোমাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে যাব?’

আজিজ মাস্টার চুপ করে রইল।

‘কি, কথা বলছ না যে? তোমার স্ত্রীও কি জঙ্গলে লুকিয়েছে?’

‘স্যার আমি বিয়ে করিনি।’

‘বিয়ে করনি? বয়স কত তোমার?’

‘চল্লিশ।’

‘চল্লিশ, এখনো বিয়ে করনি? তাহলে চালাও কীভাবে? মাস্টারবেট কর?’

আজিজ মাস্টার কপালের ঘাম মুছল। মেজর সাহেব হুংকার দিয়ে উঠলেন, ‘কথার জবাব দাও।’

রফিকউদ্দীন ক্ষীণ সুরে বলল, ‘স্যার জানতে চাচ্ছেন আপনি হস্তমৈথুন করেন কিনা। বলে ফেলেন ভাই। স্যার রেগে যাচ্ছেন।’

‘করি না।’

‘বল কী? তোমার যন্ত্রপাতি ঠিক আছে? দেখি পায়জামা খুলে সবাইকে দেখাও তো।’

‘স্যার কী বললেন?’

‘পায়জামা খুলে তোমার যন্ত্রটা সবাইকে দেখাতে বললাম। ঝটপট কর। দেরি করবে না। আমার হাতে সময় বেশি নেই।’

আজিজ মাস্টার অবাক হয়ে তাকাল রফিকের দিকে। রফিকউদ্দীন অস্পষ্ট স্বরে বলল, ‘খুলে ফেলেন ভাই। ব্যাটাছেলেদের মধ্যে আবার লজ্জা কি? খুলে ফেলেন, স্যার রাগ করছেন।’

মেজর সাহেব নিচু গলায় কি একটা বললেন। একজন এসে হ্যাঁচকা টানে আজিজ মাস্টারের পায়জামা নামিয়ে ফেলল। মেজর সাহেব বললেন, ‘জামাটাও খুলে নাও।’

আজিজ মাস্টার দু’হাতে তার লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করতে লাগল। একটা মৃদু

হাসির গুঞ্জন উঠল চারদিকে। একজন কে যেন কাগজের দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারল আজিজ মাস্টারের দিকে। মেজর সাহেব বললেন, ‘তুমি পাকিস্তানিদের ভালোবাস?’

‘জি স্যার।’

‘ভেরি গুড। আমাকেও নিশ্চয়ই ভালোবাস। বাস না? বল, বলে ফেল।’

‘বাসী স্যার।’

‘যে তোমাকে নেংটা করে দাঁড়া করিয়ে রেখেছে তাকেও তুমি ভালোবাসছ। তুমি তো বিশ্বপ্রেমিক দেখছি।’

মেজর সাহেব অনুচ্চ স্বরে কি একটা বলতেই চারদিকে হাসির বান ডেকে গেল। বদি পাগলা চোখ বড় করে বলল, ‘মাস্টার, তোমার কাপড় কই? এ্যাই মাস্টার।’

আজিজ মাস্টার ঘোলা চোখে তাকাল তার দিকে। তার বমি-বমি ভাবটা কেটে গেছে। শুধু মাথার পিছন দিকটায় তীব্র ও তীক্ষ্ণ একটি যন্ত্রণা। মেজর সাহেব বললেন, আজিজুর রহমান তুমি ভয়ে মিথ্যা কথা বলছ প্রাণে বাঁচবার জন্যে। সত্যি কথা বল তোমাকে ছেড়ে দেব, ‘তুমি কি আমাকে পছন্দ কর?’

‘না।’

‘এই তো আসল কথা বেরাচ্ছে। তুমি কি চাও এটা বাংলাদেশ হোক?’

‘জি স্যার।’

‘তুমি তাহলে একজন দেশদ্রোহী। দেশদ্রোহীর মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। আমি সে ব্যবস্থাই করতে চাই। ক্বি তুমি বাঁচতে চাও?’

আজিজ মাস্টার জবাব দিল না।

‘দেরি করবে না। বলি ফেল বাঁচতে চাও কি-না।’

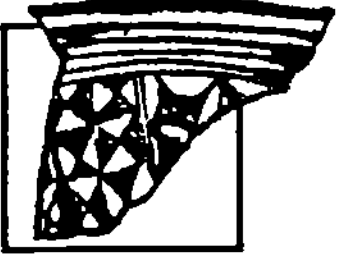
রফিকউদ্দীন ভয় পাওয়া গলায় বলল, ‘বলেন ভাই, বাঁচতে চাই। এ রকম করছেন কেন? শুধু নিজের বিপদ ডেকে আনছেন।’

বদি পাগলা আবার কথা বলে উঠল, ‘ও মাস্টার কাপড় পিন্দ। তুমি নেংটা।’

আজিজ মাস্টার নড়ল না। মেজর সাহেব বললেন, ‘কাপড় পর। কাপড় পরে আমার সামনে থেকে বিদেয় হয়ে যাও। ক্লিয়ার আউট।’

আজিজ মাস্টার কাপড় পরল না। হঠাৎ এক দলা থুথু ফেলল। সেই থুথু মেজর সাহেবের ডান প্যান্টের হাঁটুর কাছে এসে পড়ল। মেজর সাহেব চোখ তুলে তাকালেন। চারদিকে কোনো শব্দ নেই। আজিজ মাস্টার এগিয়ে এসে আরেক দলা থুথু ফেলল। সেই থুথু মেজর সাহেবের শাটে এসে পড়ল। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, ‘যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে। এবার আমরা রওনা হব।’

সৈন্যদল মার্চ করে এগুচ্ছে। মেজর সাহেবের মুখ অসম্ভব বিবর্ণ। পেছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একজন নগ্ন মানুষ।



কুকুর

‘কেমন আছেন প্রফেসর সাহেব?’

আমি মনের বিরক্তি গোপন করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বললাম,
‘জি ভালো আছি।’

ভদ্রলোক হাসি মুখে বললেন, ‘বসব খানিকক্ষণ?’

‘বসুন। আমি অবিশ্যি কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরুব।’

‘আমাকে কি চিনতে পারছেন?’

‘জি না।’

‘ঐ যে মোড়ের সিগারেটের দোকানের সামনে আলো প হলো। আপনি সিগারেট কিনছিলেন, আমি পান।’

আমি ভদ্রলোককে চিনতে পারলাম না। মোড়ের পানের দোকানে সামান্য আলোপের পর সারাজীবন চিনে রাখব আমার স্মৃতিশক্তি এত ভালো নয়। ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, ‘আমার নাম আলিমুজ্জামান। পোস্টাল সার্ভিসে ছিলাম। তিন বছর আগে রিটায়ার করেছি। এইটখ্ মে, মঙ্গলবার। এখন ঘরেই থাকি। একটা বাগান করেছি।’

‘ভালো, খুবই ভালো।’

ভদ্রলোক সোফায় বসেছেন। কৌতূহলী চোখে চারদিক দেখছেন। বারবার আমার বইয়ের আলমীয়ায় তাঁর চোখ আটকে যাচ্ছে। আমি শঙ্কিত বোধ করছি। এখনি হয়তো বলবেন, ‘আপনার তো অনেক বই। কয়েকটা নিয়ে যাই। পড়ে ফেরত দেব।’

আমি এখন পর্যন্ত কাউকে দেখিনি যে বই পড়ে ফেরত দেয়। ইনিও দেবেন তা মনে হয় না। বই নেয়ার ছুঁতায় রোজ এসে বিরক্ত করবেন। আমি এমন কোনো মিশুক লোক না যে এই বুড়ো মানুষটির সঙ্গে পছন্দ করব।

‘প্রফেসর সাহেব আপনি কি ভূত-প্রেত এইসব বিশ্বাস করেন।’

‘জি না করি না।’

‘শুনে ভালো লাগল। আজকাল শিক্ষিত লোক দেখি এইসব বিশ্বাস করে। মনটা খারাপ হয়। মানুষ চাঁদে যাচ্ছে বিশ্বাস করছে আবার ভূতও বিশ্বাস করছে। ফিজিক্সের এক প্রফেসরে হাতে দেখেছি চারটা পাথরের আংটি।’

আমি চুপ করে রইলাম। আমার কাছ থেকে উত্তর না পেলে ভদ্রলোকের

আলাপের উৎসাহ হয়তো কমে যাবে। তিনি বিদায় হবেন।

‘প্রফেসার সাহেব।’

‘জি।’

‘আপনি কি কোইনসিডেন্সে বিশ্বাস করেন?’

‘আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।’

‘কাকতালীয় ঘটনা।’

‘আমি এখনো আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না।’

‘আরেকদিন আপনাকে বলব। আজ মনে হচ্ছে আপনি একটু বিরক্ত। তবে ঘটনাটা বলা শুরু করলে আপনার বিরক্তি কেটে যেত।’

আমি ভদ্রলোকের কথায় সত্যিকার অর্থেই লজ্জিত বোধ করলাম। আমি বিরক্ত নিশ্চয়ই হয়েছি কিন্তু সেই বিরক্তি উনি ধরে ফেলবেন তা বুঝতে পারিনি। রিটার্ড মানুষ। একা একা থাকেন। কথা বলার সঙ্গী তো তাঁদেরই দরকার।

‘প্রফেসর সাহেব, উঠি।’

‘উঠবেন?’

‘জি। আজকাল কোথাও বেশিক্ষণ বসি না। রিটার্ড মানুষদের কেউ পছন্দ করে না। সবাই ভাবে সময় নষ্ট করার জন্যে গিয়েছি। তা ছাড়া মানুষদের সঙ্গে আমি নিজেও যে খুব পছন্দ করি না।’

‘আপনি আসবেন, আপনার সঙ্গে গল্প করব। কোনো অসুবিধা নেই। আজ অবিশ্যি একটু ব্যস্ত।’

‘গল্পগুজব আমি তেমন পছন্দ না। কোইনসিডেন্সের একটা ব্যাপার আমার জীবনে আছে— ঐ গল্পটা ছাড়া আমি কোনো গল্প জানি না। গল্পটা খুবই ব্যক্তিগত। এই জীবনে আমি কয়েক জনকে বলেছি। আপনাকে কেন জানি বলার ইচ্ছা করছিল।’

‘অবশ্যই বলবেন।’

‘আপনি যদি দ্রুত করে একটু বারান্দায় আসেন তাহলে আমার বাসাটা আপনাকে দেখাতাম। হঠাৎ কোনো-একদিন চলে এলে ভালো লাগত।’

আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক হাত উঁচু করে দেয়াল দিয়ে ঘেরা একতলা একটি বাড়ি দেখালেন। পুরানো বাড়ি। দোতলার কাজ শুরু করা হয়েছিল। শেষ হয়নি। বাড়ির সামনে দু’টা জড়াজড়ি কাঁঠাল গাছ।

‘একদিন যদি আসেন আপনার ভালো লাগবে। আমার জীবনের কোইনসিডেন্সের ঘটনাও শুনবেন।’

‘জি, আচ্ছা, একদিন যাব।’

‘আমার নামটা আপনার মনে আছে তো?’

‘জি আছে।’

‘নামটা বলুন তো?’

আমি দ্বিতীয়বার লজ্জা পেলাম। কারণ, ভদ্রলোকের নাম কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

ভদ্রলোকের স্বভাবও এমন বিচিত্র যে, আমার লজ্জা বুঝতে পেরেও জবাবের জন্যে মাথা নিচু করে অপেক্ষা করতে লগলেন।

‘নামটা বোধহয় আপনার মনে পড়ছে না, তাই না?’

‘জি-না।’

‘মনে থাকার কথাও না। আন-কমন নাম মানুষের মনে থাকে। আমার নাম খুবই কমন, আলীমুজ্জামান। একদিন আসবেন আমার বাসায় দয়া করে। ঘটনাটা বলব। শুনতে আপনার খারাপ লাগবে না।’

‘জি আচ্ছা, আমি যাব। খুব শিগগিরই একদিন যাব।’

এক বৃহস্পতিবার বিকেলে ভদ্রলোকের বাসায় উপস্থিত হলাম। গল্প শোনার আগ্রহে নয়। লজ্জা কাটানোর জন্যে। ভদ্রলোক ঐ দিন আমাকে খুব লজ্জায় ফেলে ছিলেন।

বাসায় ঢুকে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। সাধারণ একটা বসার ঘর। বেতের কয়েকটা চেয়ার। দেয়ালজোড়া বইয়ের আলমীরা। খুব কম করে হলেও হাজার পনেরো বই ভদ্রলোকের সংগ্রহে আছে। কঠোরা ব্যক্তিগত সংগ্রহে এত বই থাকে আমার জানা ছিল না। নিজের অজান্তেই আমি বললাম, ‘অপূর্ব!’

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, ‘বলেছিলাম না, আমার বাসায় এলে আপনার ভালো লাগবে।’

‘আপনার বইয়ের সংখ্যা কত?’

‘ষোলো হাজারের কিছু বেশি। আমার শোবার ঘরেও বেশকিছু বই আছে। আপনাকে দেখাব।’

‘সব আপনার নিজের সংগ্রহ?’

‘আমার বাবার সংগ্রহ অনেক আছে। বই কেনার বাতিক বাবার কাছে থেকে পেয়েছি। বই-পাগল লোক ছিলেন। খুব বই পড়তেন। আমি তাঁর মতো পড়তে পারি না। অনেক বই আছে আমি কিনে রেখেছি, এখনো পড়িনি।’

‘এখন তো প্রচুর অবসর। এখন নিশ্চয় পড়ছেন।’

‘আমার চোখের সমস্যা আছে। বেশিক্ষণ একনাগাড়ে পড়তে পারি না। আমি খুব খুশি হব যদি আমার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে আপনি পড়েন। বই তো পড়ার জন্যেই, আলমীরায় সাজিয়ে রাখার জন্যে না।’

‘আপনি কি সবাইকেই বই পড়তে দেন?’

‘জি দেই।’

‘তারা বই ফেরত দেয়?’

‘অনেকেই দেয় না। সেই সব পরে কিনে ফেলি। আমার সংসার ছোট। একটা মাত্র মেয়ে, স্ত্রী মারা গেছেন। সংসারের তুলনায় টাকাপয়সা ভালোই

আছে। বই কেনায় একটা অংশ ব্যয় করি। আপনি ঘুরে ঘুরে বই দেখুন। আমি চা নিয়ে আসছি।’

‘চা লাগবে না।’

‘কেন লাগবে না? চা খেতে খেতে গল্প করব। আমার ঘটনাটা আপনাকে বলব। আপনাকে বলার জন্যে আমি এক ধরনের আগ্রহ অনুভব করছি।’

‘কেন বলুন তো?’

‘আপনি বিজ্ঞানের মানুষ। আপনি শুনলে একটা ব্যাখ্যা হয়তো দাঁড় করতে পারবেন। অবিশ্যি ব্যাখ্যার জন্যে আমি খুব ব্যস্তও না। প্রতিটি বিষয়ের পেছনে একটা কার্যকারণ যে থাকতেই হবে এমন তো কোনো কথা না। আমরা কোথেকে এসেছি, আমরা কোথায় যাচ্ছি— এই বিষয়গুলির তো এখানো মীমাংসা হয়নি, কি বলেন প্রফেসর সাহেব...’

অন্য সময় হলে এই ভদ্রলোকের কথায় আমি তেমন কোনো গুরুত্ব দিতাম না। কিন্তু যার বাড়িতে বইয়ের সংখ্যা ষোলো হাজার তার কথা মন দিয়ে শুনতে হয়। তার তুচ্ছতম কথাও অগ্রাহ্য করা যায় না।

ভদ্রলোকের গল্প সেই কারণেই অতি আগ্রহ নিয়ে শুনলাম। যেভাবে শুনেছি ঠিক সেইভাবে বলার চেষ্টা করছি। ভদ্রলোক গল্পের মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে ইংরেজিতে বলা শুরু করেছেন। আমি তা করছি না। কোনো রকম ব্যাখ্যা বা টীকা টিপ্পনিও দিচ্ছি না। পুরোটা পাঠকদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

ভাই, ঘটনাটা তাহলে বলা শুরু করি।

কিছু-কিছু মানুষ আছে পশু-প্রেমিক। কুকুর-বেড়াল, গরু-ভেড়া এইসব জন্তুর প্রতি তাদের অসাধারণ মমতা। রাস্তায় একজন ভিথিরি চিৎকার করে কাঁদলে সে ভিথিরির কাছে এগিয়ে যাবে না কিন্তু একটা বিড়াল কুঁইকুঁই করে কাঁদলে ছুটে যাবে, বিড়ালটাকে পানি খাওয়াবে।

আপনাকে শুধুতাই বলে রাখি— আমি এ রকম কোনো পশু-প্রেমিক না। কুকুর-বেড়াল এইসব আমার অপছন্দের প্রাণী। একটা গরু বা ভেড়ার গায়ে আমি হাত দিতে পারি কিন্তু কুকুর বা বেড়ালের গায়ে হাত দিতে আমার ঘেন্না লাগে। তা ছাড়া ডিপথেরিয়া, জলাতঙ্ক এইসব অসুখ এদের মাধ্যমে ছড়ায়— এটাও আমি সব সময় মনে রাখি।

যাই হোক, মূল গল্পে ফিরে যাই। আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট ফাস্ট ইয়ারে পড়ি। শীতকাল। কলেজ প্রাকটিক্যাল শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। তখন পড়ি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। আমাদের বাসা ঠাকুরপাড়ায়।

একদিন বাসায় ফিরছি। দিনটা মনে আছে— বুধবার। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। গায়ে গরম কাপড় ছিল না। প্রচণ্ড শীত লাগছে। বাসার কাছাকাছি এসে দেখি পাড়ার তিন-চারটা ছেলে কাগজ, শুকনো কাঠ এইসব জড় করে আগুন

করছে। আমাদের সামনের বাসার নান্টুকেও দেখা গেল। মহা ত্যাঁদড় ছেলে। তার হাতে একটা কুকুরছানা। ছানাটার গায়ে কাপড় জড়ান। শুধু মুখ বের হয়ে আছে। কুকুরছানা আরামে কুঁইকুঁই করছে।

আমি বললাম, ‘কী হচ্ছে রে নান্টু?’

নান্টু দাঁত বের করে হাসল। অন্য একজন বলল, ‘নান্টু কুকুরকে কম্বল পরিয়েছে। শীত লাগে তো এইজন্যে।’ দলের বাকি সবাই হো-হো করে হসে উঠল। ছেলেগুলির বয়স দশ থেকে এগারোর মধ্যে। এই বয়সের বালকরা সব সময় খুব আনন্দে থাকে। নানা জায়গা থেকে আনন্দের উপকরণ সংগ্রহ করে। কুকুরকে কাপড় দিয়ে মোড়া হয়েছে এতেই তাদের আনন্দের সীমা নেই।

মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি হচ্ছে আনন্দে অংশগ্রহণ করা। আমি ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম আমার এগিয়ে যাওয়াটা কেউ তেমন পছন্দ করছে না। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। হয়তো তারা চায় না ছোটদের খেলায় বড়রা অংশগ্রহণ করুক। নান্টুকে খুবই বিরক্ত মনে হলো।

ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ান মাত্র কেরোসিনের গন্ধ পেলাম। হয়তো বাসা থেকে কেরোসিন এনে কেরোসিন ঢেলে আগুন করেছে। বালকরা কায়দা-কানুন করতে খুব ভালোবাসে।

‘কেরোসিন দিয়েছিস না-কি?’

কেউ কোনো জবাব দিল না। নান্টুর মুখ কঠিন হয় গেল। আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। নান্টু বলল, ‘আপনি চলে যান।’

তার গলা কঠিন। চোখের কৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তাকিয়ে দেখি নান্টুর কোলের কুকুরছানা ভিজে চুপচুপ করছে। বুকটা ধবক করে উঠল। এরা কুকুর ছানাটার গায়ের কাপড় কেরোসিন দিয়ে চুবিয়েছে না-কি? নতুন কোনো খেলা? একে আগুনে ছেড়ে দেবে না তো? শিশুরা মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠে। আমি কড়া গলায় বললাম, ‘এই নান্টু, তুই কুকুরটার গায়ে কেরোসিন ঢেলেছিস?’

নান্টু কঠিন মুখে বলল, ‘তাতে আপনার কী?’

‘কেন কেরোসিন ঢাললি?’

নান্টু কিছু বলল না। অন্য একজন বলল, ‘কুকুরটাকে আগুনের মধ্যে ছাড়বে। এর গলায় ঘুংঘুর বাঁধা আছে। আগুনে ছাড়লে এর গায়ে আগুন লাগবে আর সে দৌড়াবে। ঘুংঘুর বাজবে। যত তাড়াতাড়ি দৌড়াবে তত তাড়াতাড়ি ঘুংঘুর বাজবে। এইটাই মজা।’

আমি হতভম্ব। এরা বলে কি! এরা বলে কি! ছেলেটার কথা শেষ হবার আগেই নান্টু কুকুরছানাটা আগুনে ফেলে দিল। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। কুকুরছানা দৌড়াল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো বা সে মানুষের নিষ্ঠুরতায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

আমি আগুনের উপর লাফিয়ে পড়লাম। আমার শাটে আগুন ধরে গেল।
প্যান্টে আগুন ধরে গেল। এইসব কিছুই গ্রাহ্য করলাম না। আমার একমাত্র
চিন্তা বাচ্চাটাকে আগুন থেকে বের করতে হবে।

আলীমুজ্জামান সাহেব থামলেন।

আমি বললাম, ‘বের করতে পেরেছিলেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘বাচ্চাটা বেঁচেছিল?’

‘না বাঁচেনি। বাঁচার কথাও না। আমার গায়ে থার্ড ডিগ্রি বার্ন হয়ে গেল।
কুমিল্লা মেডিক্যালে কিছুদিন থাকলাম। তারপর আমাকে পাঠান হলো ঢাকা
মেডিক্যাল কলেজ। দু’মাসের উপর হাসপাতালে থাকতে হলো। এক পর্যায়ে
ডাক্তাররা আমাকে বাঁচানোর আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। সেই সময় বার্ন-এর
চিকিৎসার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। স্কিন গ্রাফেটিং হতো না। অল্পতেই শরীরে
ইনফেকশন হয়ে যেত। যাই হোক, বেঁচে গেলাম। তবে সেই বছর পরীক্ষা
দিতে পারলাম না।’

আলীমুজ্জামান সাহেব নিশ্বাস নেবার জন্যে থামামাত্র আমি বললাম,
‘আপনি একজন অসাধারণ মানুষ।’

‘মোটাই না। আমাকে বোকা বলতে পারেন। সামান্য একটা কুকুরছানার
জন্যে নিজের জীবন যেতে বসেছিল। তখন সবাই আমার বোকামির কথাটা
আলোচনা করত। আমার নিজেরও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে হয়তো বোকামিই
করেছি। একজন মানুষের জীবন কুকুরের জীবনের চেয়ে অবশ্যই মূল্যবান।’

‘আপনার গল্প শুনে মুগ্ধ হয়েছি।’

‘এটা কিন্তু গল্প না। এটা গল্পের ভূমিকা। মূল গল্প এখন বলব।’

ঢাকা থেকে সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছি। শরীর তখনও খুব দুর্বল। ডাক্তার
বলে দিয়েছে প্রচুর রেস্ট নিতে। শুয়ে-বসেই দিন কাটছে। আমার ঘর
দোতলায়। মাথায় কাছে বিরাট জানালা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শুয়ে
থাকতে খুব খারাপ লাগে না।

এক রাতের কথা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে। জানালা দিয়ে বাইরে
তাকালাম। ফকফকে জ্যোৎস্না। এই জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে
পড়ল। রাজ্যের কুকুর এসে জড় হয়েছে বাসার সামনে। কেউ কোনো সাড়াশব্দ
করছে না বা ছোট্টাছুটি করছে না। সব ক’টা মূর্তির মতো বসে আছে। আমার
গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ব্যাপারটা কি!

একসঙ্গে এতগুলি কুকুর আমি এর আগে কখনো দেখিনি। এদের এই
জাতীয় আচরণের কথাও শুনিনি। আমাকে দেখে এরা সবাই মুখ ফিরিয়ে
আমার দিকে তাকাল।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি— দেখি, হঠাৎ তাদের মধ্যে এক ধরনের

চাঞ্চল্য দেখা গেল। এরা একে-একে চলে গেল। যেন ওদের কোনো গোপন অনুষ্ঠান ছিল, অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে— এখন চলে যাচ্ছে।

এই ব্যাপার মাঝে-মাঝে ঘটতে লাগল। নির্দিষ্ট কোনো সময় না। মাসে একবার কিংবা দু'মাসে একবার এ-রকম হয়।

এ-রকম একটা ঘটনা চাপা থাকার কথা নয়। সবাই জেনে গেল। অনেকেই দুপুর রাতে কুকুরের দল দেখতে আসত। খবরের কাগজেও ঘটনাটা উঠেছিল। দৈনিক আজাদে। ক্যাপশন ছিল— কুকুরের কাণ্ড।

আমার ছোটবোন আমাকে খুব ক্ষেপাত। সে বলত কুকুরের জন্যে তুমি জীবন দিতে যাচ্ছিলে, কাজেই তারা তোমাকে তাদের রাজা বানিয়েছে। তুমি হচ্ছ “কুকুর-রাজা”।

আমার বাবা পরের বছর বদলি হয়ে পাবনা চলে গেলেন। আমিও বাবার সাথে গেলাম। সেখানেও একই কাণ্ড। এক মাস দু'মাস পরপর হঠাৎ রাজ্যের কুকুর বাসার সামনে এসে জড় হয়। মূর্তির মতো চুপচাপ বসে থাকে। একসময় মাথা নিচু করে চলে যায়। যেখানে গিয়েছি এই কাণ্ড ঘটেছে। যেন কোনো-এক অদ্ভুত উপায়ে কুকুররা আমার খবর পৌঁছে দিয়েছে। শুধু তাই না, আমার মনে হয় কুকুররা আমাকে পাহারা দেয়। আমি যখন বাসায় হাঁটি, একটা দু'টা কুকুর সব সময় আমার সঙ্গে থাকে।

আজ আমার বয়স সাতষটি। আজও এই ব্যাপার ঘটছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, ‘বললেন কি!’

‘যা বলছি তার মধ্যে একটা মিথ্যা নেই। তবে কুকুরের সভা আগের মতো ঘনঘন হয় না। দু'মাসে এক বছরে একবার হয়। তবে হয়। কুকুরের ভাষা আমি জানি না। জানলে জিজ্ঞেস করতাম, তোমরা কী চাও? এইসব কেন তোমরা কর?’

‘ব্যাপারটা কি আপনার পছন্দ হয় না?’

‘না, পছন্দ হয় না। একদিন দু'দিনের ব্যাপার হলে হয়তো পছন্দ হতো। একদিন দু'দিনের ব্যাপার তো নয়। দিনের পর দিন ঘটছে।’

‘ভবিষ্যতে আবারো হবে বলে কি আপনার ধারণা?’

‘হ্যাঁ হবে। আজ রাতেও হতে পারে। আপনি কি দেখতে চান?’

বলতে বলতে আলীমুজ্জামান সহেবের চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে গেল। যেন তিনি প্রচণ্ড রাগ করছেন। যেন এই মুহূর্তে চোঁচিয়ে উঠবেন। আমি বললাম, ‘আপনি মনে হয় পুরো ব্যাপারটায় খুব আপসেট। এতে আপসেট হবার কিছু নেই। পশুরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে— এতে রাগ হবার কী আছে? কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অধিকার নিশ্চয়ই পশুদেরও আছে।’

‘এটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো ব্যাপার নয়। এটা একটা ভৌতিক ব্যাপার। সুপার ন্যাচারাল ব্যাপার।’

‘এর মধ্যে সুপার ন্যাচারালের অংশ কোন্টি?’

‘পুরো ব্যাপারটিই সুপার ন্যাচারাল। এই অংশটি আপনাকে বলিনি বলে আপনি বুঝতে পারছেন না।’

‘বলুন শুন।’

‘যে কুকুরছানাটিকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম সেই কুকুরছানাটি দলটার মধ্যে সব সময় থাকে। পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া একটা কুকুর। গলায় ঘুংঘুর বাঁধা। কুকুরছানাটা মাথা দুলায় আর ঘুংঘুরের শব্দ হয়।’

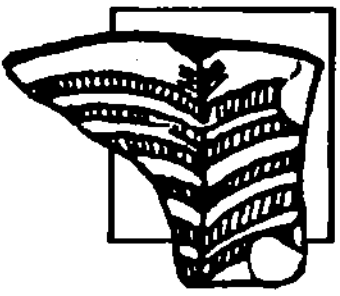
‘আপনি ছাড়া অন্যরাও কি এই কুকুরছানাটা দেখে?’

‘না, আর কেউ দেখতে পায় না। শুধু আমি দেখতে পাই। দেখুন ভাই, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র না। আমার বিষয় ইতিহাস। তবু অবৈজ্ঞানিক কোনো কিছুই আমি আমার জীবনে গ্রহণ করিনি। ভূত-প্রেত, ঝাড়-ফুক, পীর-ফকির কিছুই না। অথচ সেই আমাকেই কিনা সারাজীবন একটি অতিপ্রাকৃত বিষয় হজম করে যেতে হচ্ছে।’

আমি বললাম, ‘আবার কখনো এ-রকম কিছু হলে আপনি দয়া করে আমাকে খবর দেবেন। তিনি জবাব দিলেন না।’

আমি বিদায় নিয়ে চলে এলাম। তার পাঁচ মাস পর রাত দুটোয় টেলিফোন বেজে উঠল। আলীমুজ্জামান সাহেব টেলিফোন করেছেন। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ‘ওরা এসেছে। আপনি কি আসবেন?’

শ্রাবণ মাসের রাত। বাইরে ঝুমঝুমি হচ্ছে। বাড়ির বাইরে পা দিলেই এক হাঁটু পানি। এমন দুর্যোগের রাতে কোথাও যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আমি টেলিফোন নামিয়ে বিছানায় চান্দরের নিচে ঢুকে পড়লাম।



একজন সুখী মানুষ

জাকের সাহেবের বয়স ছাপ্পান্ন।

কিছুদিন আগেও তাঁর বয়স ছাপ্পান্নই মনে হতো। এখন হঠাৎ যেন তাঁর বয়স অনেকখানি বেড়ে গেছে। আয়নার দিকে তাকালেই মনে হয় সত্তর বছরের এক অচেনা বুড়ো। অথচ তিনি একজন সুখী মানুষ। অসম্ভব সুখী। সুখী

মানুষের বয়স বাড়ে না। কিন্তু তাঁর বেলায় এ-রকম হচ্ছে কেন?

তিনি দাড়ি কামাতে কামাতে এইসব ভাবতে লাগলেন। সম্ভবত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। ঘ্যাস করে তাঁর গাল কেটে গেল। বড় বড় কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ল বেসিনে। অনেকখানি কেটেছে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ব্যথা লাগছে না। বয়সের লক্ষণ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ু অসাড় হয়ে আসে। ব্যথারোধের তীব্রতা কমে আসে।

জাকের সাহেব ডান হাতের আঙুলে গাল চেপে ধরে অভ্যাসের বসেই বলেন, 'উহ'। বলে তিনি নিজে খুবই অবাক হয়ে গেলেন। 'উহ' বলার কোনো দরকারই ছিল না। কেন বললেন?

নাশতার টেবিলে মিলির সঙ্গে দেখা হলো। মিলি তাঁর বড় মেয়ে। নাশতার সময়টাতে সে বাবার সামনে বসে পরপর দু'কাপ চা খায়। অল্প কিছু কথাবার্তা হয়। আজ মিলি অস্বাভাবিক গম্ভীর। অনেকক্ষণ সে বাবার দিকে তাকালই না।

জাকের সাহেব এক চুমুকে কমলার রসটা খেয়ে ফেললেন। সিরিয়েলের বাটিতে দুধ ঢাললেন। চিনি মেশালেন। শুকনো চোখে তাকালেন রুটি মাখনের প্লেটের দিকে। আরেকটি বাটিতে গাঢ় লাল রঙের কি একটা তরল পদার্থ দেখা যাচ্ছে। টমোটোর স্যুপ নাকি? স্যুপ আগে খাওয়া দরকার ছিল। কোনো কিছুই মুখে নিতে ইচ্ছা করছে না। রুটি নষ্ট হয়ে গেছে। বয়সের লক্ষণ। একটা বয়সে ভালো কিছু আর খেতে ইচ্ছা করে না।

'বাবা, তোমার গালে কী হয়েছে?'

'কিছু না।'

'কিছু না মানে? গাল তো অনেকখানি কেটেছে।'

'হঠাৎ করে শেভ করতে গিয়ে...।'

'ইলেকট্রিক শেভার ব্যবহার করনি?'

জাকের সাহেব চুপ করে রইলেন। এই যন্ত্রটি তাঁর পছন্দ নয়। চালু করলেই বিজবিজ শব্দ হয়। গালে ছোঁয়ালেই সমস্ত শরীর শিরশির করতে থাকে।

'বাবা, কাটা জায়গায় কিছু দিয়েছ?'

'না।'

'স্যাভলন-ট্যাভলন কিছুই না?'

'না।'

মিলির মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল। জাকের সাহেব খুব বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

'একি বাবা, তুমি ডিমটা খাচ্ছ না কেন?'

'ইচ্ছা করছে না।'

'ইচ্ছা না করলে তো হবে না। দুদিন পরপর তোমাকে একটা ডিম খেতে

হবে। এই বয়সে তোমার ডায়েট ঠিক রাখা খুবই জরুরি।’

‘তা তো ঠিকই।’

‘আজ ডাক্তার সাহেব আসবেন না?’

‘হুঁ আসবেন।’

‘গালটা তাঁকে দেখাবে।’

‘ঠিক আছে।’

‘কোনো জিনিস অবহেলা করতে নেই।’

‘তা তো ঠিকই।’

তিনি সিদ্ধ ডিমে গোলমরিচের গুঁড়া ঢালতে ঢালতে সেটাকে কালো বানিয়ে ফেললেন। ডিমটা শেষ করতে তাঁর অনেক সময় লাগল। কিছুতেই গলা দিয়ে নামতে চাচ্ছে না। দু’একবার বমির মতো হলো। চমৎকার সব সুখাদ্য কিন্তু খাওয়া যাচ্ছে না। বয়স দ্রুত বাড়ছে। আজকাল অল্প হাঁটলেই বুকে হাঁপ ধরে। সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় রেলিং ধরে ধরে উঠতে হয়। অথচ তাঁর বয়স মাত্র ছাপ্পান্ন।

জাকের সাহেব হাঁটতে বেরুলেন। গালের কাটাচির চিনচিনে একটা ব্যথা হচ্ছে। কেন হচ্ছে কে জানে। বেরুবার সময় তাঁর জামাই তাঁকে খানিকটা ভয় পাইয়ে দিয়েছে। চিন্তিত মুখে বলেছে, ‘খালি হচ্ছে শরীরের সবচেয়ে সেনসেটিভ পার্ট, একে মোটেই অবহেলা করা উচিত না। সামান্য ক্ষতেই সেপটিক হয়ে সিরিয়াস ব্যাপার হতে পারে।’

জামাইয়ের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা বিশেষ হয় না। শরীর খারাপ হলে বা অসুখ-বিসুখ হলেই সে শুধু খোঁজ নিতে আসে। আজ যেমন নিয়েছে। রাতেও একবার খোঁজ নেবে।

জাকের সাহেব বাস্তার মোড়ের এক পানওয়ালার দোকান থেকে একটা ফাইভফাইভ কিনলেন। তখন মিহির বাবুর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। মিহির বাবু পাশের বাড়িতে থাকেন। অল্পদিন হলো রিটায়ার করেছেন। মিহির বাবু অবাক হয়ে বললেন, ‘সিগারেট কিনলেন নাকি?’

‘জি।’

‘আপনি সিগারেট খান জানতাম না তো।’

‘খাই না। এই আজ একটা কিনলাম।’

‘কোনো উপলক্ষ-টুপলক্ষ নাকি?’

‘না, না উপলক্ষ কিছু না, এমনি।’

জাকের সাহেব লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন। মিহির বাবু বললেন, ‘কোথাও যাচ্ছেন নাকি?’

‘জি না, একটু হাঁটছি। মর্নিং ওয়াক।’

‘সকাল দশটায় মর্নিং ওয়াক।’

‘না মানে এই হাঁটা আর কি?’

‘আপনার ছেলেরা ভালো আছে?’

‘জি ভালো।’

‘তারা যেন কোথায় আছে?’

জাকের সাহেব অন্তরঙ্গ গলায় বললেন, ‘দু’জনেই আমেরিকাতে। একজন নর্থ ডাকোটায়, অন্যজন সিয়াটলে।’

‘আরেক মেয়েজামাই জাপান না কোথায় আছে বলেছিলেন যেন।’

‘হনলুলু।’

‘আপনি তো ভাই সুখী মানুষ।’

‘তা ঠিক।’

‘চিন্তাভাবনা কিছু নাই। এখন শুধু দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো। আজ জাপান, কাল আমেরিকা, পরশু হনলুলু।’

জাকের সাহেব লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন। সিগারেট টানার জন্যেই বোধহয় তাঁর মাথা হাক্কা হাক্কা লাগছে। বমি-বমি ভাব হচ্ছে। একটা পান খেতে পারলে হতো। মিহির বাবু বিমর্ষ ভঙ্গিতে বললেন, ‘আমার অবস্থাটা দেখুন, দু’টা মেয়ের এখনো বিয়ে হয় নাই। এর মধ্যে রিটার্নমেন্ট হয়ে গেল। যাই কোথায় এখন বলুন? জীবনে একটা বাড়ি-মন্দির করতে পারলাম না। এখন যাচ্ছি গোরান। পাঁচটা টাকা নিয়ে বের হয়েছি কারণ কি জানেন?’

‘না।’

‘বেশি নিলে যদি খরচ হয়ে যায় সেই ভয়ে। আচ্ছা ভাই গেলাম। বাস ধরতে হবে।’

আশ্চার্যের ব্যাপার হচ্ছে জাকের সাহেবও পাঁচ টাকা নিয়ে বের হয়েছেন। নগদ টাকা তাঁর কাছে থাকে না। অবিশ্যি থাকার প্রয়োজনও তেমন নেই। নগদ টাকা দিয়ে তিনি কী করবেন? প্রতিদিন বাজারে যাবার আগে তোতা মিয়া এসে জিজ্ঞেস করে, ‘আমার কিছু লাগবে? লাগলে কন।’

মিলি সব সময়ই বলে, ‘বাবা তোমার প্রচুর টাকা আছে। তোমার দুই ছেলে প্রতিমাসে যত টাকা পাঠায় সেটা তুমি এই জীবনে খরচ করে শেষ করতে পারবে না। সব আলাদা করা আছে, যখন যা লাগবে বলবে।’

‘তা তো বলবই।’

‘কোনো লজ্জা করবে না।’

‘না লজ্জা কী জন্যে?’

‘যদি কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে যেতে ইচ্ছা করে বলবে।’

‘নিশ্চয়ই বলব।’

‘যখন যত টাকা লাগে চাইবে আমার কাছে। ক্যাশ টাকা তোমার ঘরে রাখতে চাই না। পাঁচ-ছ’জন কাজের লোক। নগদ টাকা দেখলে লোভ

সামলাতে পারবে না। শেষে স্বভাব নষ্ট হবে।’

‘তা ঠিক।’

‘তোমার যখন যা ইচ্ছা করে আমাকে বলবে।’

‘হু বলব।’

জাকের সাহেব বলার মতো তেমন কিছু কখনো খুঁজে পাননি। যে ঘরে তিনি থাকেন সে ঘরে লাল রঙের ছোট এটা ফ্রিজ আছে। বারো ইঞ্চি একটি রঙিন টিভি আছে। যে খাটে তিনি ঘুমান তার গদিটি আট ইঞ্চি ফোমের।

বিছানার পাশেই বেতের একটি ইজি চেয়ার। হাতের কাছে বইয়ের শেলফ। ‘নিউজ উইক’ এবং ‘টাইম’ এই দুটি পত্রিকা শুধু তাঁর জন্যেই রাখা হয়। একজন ডাক্তার আছেন যিনি সপ্তাহে একবার (বুধবার সন্ধ্যায়) এসে তাঁর ব্লাড প্রেসার মেপে যান। মিলি ঘড়ির কাটা ধরে প্রতি রাত দশটায় এসে বাতি নিভিয়ে যায়। রাত জাগলে তাঁর শরীর খারাপ করবে, তাই। তাঁর খাটের পাশে একটা সুইচ আছে যা টিপলেই রান্নাঘরে কলিং বেল বেজে উঠে। তোতা মিয়া ছুটে এসে জিজ্ঞেস করে কিছু লাগবে কিনা।

গত সপ্তাহেই ছোট মেয়ের চিঠি পেলেন। সে লিখেছে,

‘বাবা, তুমি কি হনলুলু বেড়াতে আসতে চাও? তিন মাসের ভিজিটার্স ভিসা নিয়ে চলে এসো না। তোমার খারাপ লাগবে না। বড় আপার চিঠিতে দেখলাম তুমি সারাক্ষণ বিষণ্ণ হয়ে থাক। এর কারণ কী? তোমার কি কোনো কিছুর অভাব আছে। মিলি কি তোমার যত্ন-চিন্তা ঠিকমতো করছে না? কোনো রকম সঙ্কোচ না করে লিখবে।’

তাঁর কোনো অসুবিধা নেই। মিলি তাঁর খুব ভালো যত্ন করছে। তিনি যথেষ্ট সুখে আছেন। তাঁর এখন মনেই পড়ে না এককালে তিনি দরিদ্র ছিলেন। চারটি ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে গিয়ে মাথা খারাপের যোগাড় হয়েছিল। একসময় এও ভেবেছিলেন ফরাসি আইএসসি পাশ করামাত্র তাকে কোনো একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবেন। ভাগ্যিস সেরকম কিছু করেননি। অমানুষিক কষ্ট করেছেন ছেলেদের জন্যে। তারাও মনে রেখেছে সে-সব।

যেবার তাঁর রক্ত আমাশা হলো কি ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। প্রতিরাতে টেলিফোন। এতদূর থেকে টেলিফোন নিশ্চয়ই ছ’সাত শ’ টাকা করে লাগত। বড় ছেলে মাসিক বরাদ্দের টাকা ছাড়াও বাড়তি এক হাজার ডলার পাঠিয়েছিল চিকিৎসা খরচের জন্যে। মিলিকে লিখেছে— বাবার সেবা-যত্নের জন্যে চব্বিশ ঘণ্টার একজন নার্স রেখে দেবে। খরচের জন্যে চিন্তা করবে না।

তাঁর দু’ ছেলেরই হাত খুব দরাজ। তাদের কথা মনে হলেই একটা তৃপ্তির ভাব আসে, মন ভালো হয়ে যায়। তারা অনেক কিছু করেছে তাঁর জন্যে কিন্তু তিনি নিজের বাবা-মা’র জন্যে কিছুই করতে পারেননি। তাঁর বাবা শেষ বয়সে বড় ভায়ের সঙ্গে থাকতেন। বড় ভাই ঘনঘন চিঠি লিখতেন।

‘বাবাকে আমার ঘাড়ে ফেলিয়া তোমরা সকলে কি প্রকার নিশ্চিত আছ তাহা আমি বুঝতে পারি না। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পালন করিবার দায়িত্ব কি আমার একার? তোমার কি কিছুই করিবার নাই? এই পত্র পাওয়ামাত্র বাবার খরচ হিসাবে অতি অবশ্যই পঞ্চাশ টাকা মানি অর্ডার যোগে পাঠাইবা। আমি বিশেষ অসুবিধায় আছি।’

এ. জাতীয় চিঠি তিনি সব সময় উপেক্ষা করেছেন। সে জন্যে অবিশ্যি তার মনে কোনো অপরাধবোধ নেই। তিনি দরিদ্র ছিলেন। খুবই দরিদ্র। বাবাকে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

জাকের সাহেব দুপুর এগারোটার দিকে বাসায় ফিরলেন। মিলি বিরক্ত হয়ে বলল, ‘কোথায় কোথায় ঘুরছিলে রোদের মধ্যে? তিনি অপ্রতিভ ভঙ্গিতে হাসলেন।’

‘কিছু খাবে এখন?’

‘না।’

‘ঠাণ্ডা কিছু খাও। বেলের শরবত করে দিক?’

‘ঠিক আছে দিতে বল।’

তুমি ঘর থেকে বেরুবার পরপর ফর্মসল টেলিফোন করেছিল। গাল কাটার খবর বললাম। সে খুব বিরক্ত হয়েছে। বারবার বলছিল, ‘বাবা এত অসাবধান কেন?’

তিনি লজ্জিত বোধ করত লাগলেন। মিলি বলল, ‘এখন থেকে তোতা মিয়া তোমার শেভ করে দেবে বুঝলে?’

‘আচ্ছা।’

জাকের সাহেব বরফ-দেয়া ঠাণ্ডা বেলের শরবত খুব তৃপ্তি করে খেলেন। জিনিসটা ভালোই। মিলি বলল, ‘সিদ্দিক আজ আবার এসেছিল।’

তিনি শঙ্কিত বোধ করলেন। সিদ্দিক তাঁর বড় ভাইয়ের ছেলে। কিছুদিন পরপরই সাহায্যের জন্যে আসে। মিলি বিরক্ত হয়।

‘আজ এসেই সে একটা মিথ্যা কথা ফেঁদেছে। বলেছে, তুমি নাকি তাকে আসতে বলেছ। তুমি নাকি সেলাই মেশিন কেনবার টাকা দেবে। বলেছ নাকি?’

জাকের সাহেব মাথা নাড়লেন, তিনি কিছু বলেননি। মিলি কঠিন স্বরে বলল, ‘ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক না।’

‘তা তো বটেই।’

‘আমি আজ কড়া এক ধমক দিয়েছি।’

‘ধমক দেয়ার কী দরকার ছিল?’

‘ধমক দেব না? আমার সামনে এসট্রের মধ্যে কাশ ফেলল। রাগে আমার গা জ্বলে গেছে। তুমি যাও, গরম পানি করা হচ্ছে। গোসল সার। গালে পানি

লাগিও না।’

রাত আটটায় বড় ছেলে সিয়াটল থেকে টেলিফোন করল।

‘বাবা তোমার গাল কেমন?’

‘ভালো।’

মিলি বলল, ‘তুমি নাকি ইলেকট্রিক শেভার ব্যবহার কর না?’

‘এখন থেকে করব।’

‘আমরা খুব চিন্তিত, বুঝলে বাবা?’

‘বুঝেছি।’

‘নাও, টুকুনের সঙ্গে কথা বল।’

টুকুন বাংলা বলতে পারে না। সে একগাদা কথা বলে গেল। জাকের সাহেব শুধু ঘনঘন মাথা নাড়লেন এবং ফাঁকে ফাঁকে বললেন, ‘ইয়েস ইয়েস।’

রাত দশটার কিছু পরে ছোট মেয়ের টেলিফোন এল হনলুলু থেকে। কানেকশন ভালো নয়। কিছুই প্রায় শোনা যায় না।

‘বাবা, তুমি এত অসাবধান কেন?’

‘এখন থেকে সাবধান হব।’

‘ভাইয়া টেলিফোন করে আমাকে জানাল। আমি চিন্তায় অস্থির। খুব বেশি কেটেছে?’

‘না, খুব বেশি না।’

‘বিদেশে থাকি। সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় কখন কি খবর এসে পড়ে।’

‘ভয় নাই। আমি অনেকদিন বাঁচব।’

কথাটা হয়তো ঠিক। তাঁদের দীর্ঘজীবী বংশ। তাঁর বাবা প্রায় অমর হয়ে গিয়েছিলেন। চোখে দেখেন না, কানে শুনেন না, উঠে বসতে পর্যন্ত পারেন না, তবু বেঁচে আছেন। তাঁর এত দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন ছিল না। বেঁচে থেকে তিনি বড় ভাইকে প্রায় পাগল করে দিলেন। আর কিছুদিন বাঁচলে বড় ভাই সত্যি সত্যিই হয়তো পাগল হয়ে যেতেন।

তিনিও কি তাই করবেন? দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে সবাইকে পাগল করে তুলবেন?

জাকের সাহেব বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে গেলেন। রাত বারোটায় তাঁকে ডেকে তোলা হলো। ছোট ছেলে কায়সার টেলিফোন করেছে নর্থডাকোটা থেকে। জাকের সাহেব ঘুম-ঘুম চোখে ওঠে বসলেন। মিলি চমকে ওঠে বলল, ‘কী সর্বনাশ! তোমার গালের এ অবস্থা কেন? সমস্ত মুখ ফুলে উঠেছে, বাম গাল এমন ফুলেছে যে একটা চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা। মিলি এসে বাবার হাত ধরল।’

‘ইস, এ তো অসম্ভব জ্বর। বাবা তুমি শুয়ে থাক।’

জাকের সাহেব শুয়ে থাকলেন না। টেলিফোন ধরতে নিচে নেমে গেলেন।

‘হ্যালো কায়সার?’

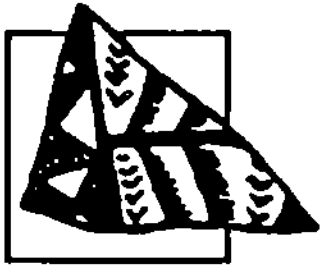
‘হ্যাঁ। বাবা তুমি কেমন আছ?’

‘ভালো, খুব ভালো। খুব চমৎকার আছি।’

এ পর্যন্ত বলে তিনি হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, ‘এত সহজে আমি মরছি না। বুঝলি? আমি দীর্ঘদিন বাঁচব। একসময় চোখে-টোখে দেখব না, কানে শুনব না। বিছানায় উঠে বসতেও পারব না। তবু বেঁচে থাকব।’

‘এইসব তুমি কী বলছ বাবা?’

জাকের সাহেব হাসতে লাগলেন। একজন সুখী মানুষের হাসি। আনন্দ ও তৃপ্তির হাসি।



জুয়া

থার্ড পিরিয়ডে প্রণব বাবুর কোনো ক্লাস নেই।

তিনি কমনরুমে এসে পত্রিকা খুঁজতে লাগলেন। একটিমাত্র পত্রিকা রাখা হয়। পড়া না হওয়া পর্যন্ত সেটি হেড মাস্টার সাহেবের ঘরে থাকে। আজ হেড মাস্টার সাহেব আঁসেননি। তাঁর মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। ছেলের বড় ফুপা এসেছেন। সেই উপলক্ষে তিনি বড় সাইজের কৈ মাছের খোঁজে গিয়েছেন।

কাজেই কমনরুমের টেবিলের পত্রিকাটি পাওয়া গেল। ভাঁজ পর্যন্ত খোলা হয়নি। এ-রকম একটা কড়কড়ে নতুন পত্রিকা পড়ার আনন্দই অন্য রকম। প্রণব বাবু কোনার দিকে ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরই তাঁর কপাল দিয়ে টপটপ করে ঘাম পড়তে লাগল। তিনি ভাঙা গলায় ডাকলেন, ‘বশীর মিয়া, ও বশীর মিয়া।’

বশীর মিয়া স্কুলের দপ্তরী। সেও হেড মাস্টার সাহেবের সঙ্গে কৈ মাছের খোঁজে গিয়েছে। কেউ এল না। ফোর্থ পিরিয়ডে আজিজুদ্দীন সাহেব কমনরুমে পানি খেতে এসে দেখেন প্রণব বাবু মরার মতো পড়ে আছেন।

‘প্রণব বাবু, কী হয়েছে?’

প্রণব বাবু বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। তাঁর কথা জড়িয়ে গেল। আজিজুদ্দীন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘শরীর খারাপ না-কি? এ্যাই প্রণব বাবু।’

‘শরীর ঠিক আছে।’

আজিজুদ্দীন সাহেব কপালে হাত রাখলেন। না কপাল ঠাণ্ডা। জ্বর-জ্বারি কিছু নেই। প্রণব বাবু দুর্বল কণ্ঠে বললেন, ‘পানি খাবো। একটু পানি দেন।’

‘মাথা ঘুরছে নাকি? এ্যাই প্রণব বাবু?’

প্রণব বাবু ফিসফিস করে বললেন, ‘লটারির রেজাল্ট দিয়েছে।’ আজিজুদ্দীন সাহেবের ব্যাপারটা বুঝতে অনেক সময় লাগল। রেড ক্রস লটারির দু’টাকা দামের টিকিট সবাইকে একটি করে কিনতে হয়েছে। হেড মাস্টার সাহেব পঞ্চাশটা টিকিট ময়মনসিংহ থেকে নিয়ে এসে গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, সবাইকে কিনতে হবে। দেশের কাজ। আমরা শিক্ষকরা যদি না করি কারা করবে? সবার জন্যে একটা এগজাম্পল সেট করতে হবে। পাঁচটা করে কিনবেন সবাই।

থার্ড মাস্টার জলিল সাহেব মুখ কালো করে বললেন, ‘দু’মাস ধরে বেতন নাই, এর মধ্যে এইসব আবার কী ঝামেলা স্যার?’

‘দেশের কাজের মধ্যে আবার ঝামেলা কী দেখলেন? পাঁচটা করে কিনবেন সবাই। আর স্টুডেন্টদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটের ব্যবস্থা করবেন। দেশের কাজ।’

পাঁচটা করে টিকিট কিনতে হলো সবাইকে। হেড মাস্টার সাহেব দেশের কাজের জন্যে হঠাৎ এত বাস্তব রহস্যও উদ্ধার হলো। প্রতি দশটি টিকিটে তাঁর দু’টাকা করে লাভ থাকে।

সেই লটারির রেজাল্ট দেখে প্রণব বাবুর কপাল ঘামছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে— এর অর্থ কী? আজিজুদ্দীন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, ‘কী ব্যাপার ভাই, কিছু পেয়ে গেলেন নাকি? অঁ্যা?’

প্রণব বাবু জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, ‘পেয়েছি।’

আজিজুদ্দীন সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ক্লাস নাইনে তাঁর ইংরেজি গদ্য পড়বার কথা, তিনি আর সেখানে গেলেন না। প্রণব বাবুর পাশের চেয়ারে চুপচাপ বসে রইলেন। দুনিয়াতে কত অসম্ভব ব্যাপারই না ঘটে। প্রণব বাবু পরশু দিন তাঁর কাছে পঞ্চাশটা টাকা চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘হাত একেবারে খালি, কোথায় টাকা পাব? গত মাসেও হাফ বেতন হয়েছে।’

আজিজুদ্দীন সাহেব ক্লান্ত স্বরে বললেন, ‘এ-রকম ভ্যাবদার মতো বসে আছেন কেন? ফুর্তি-টুর্তি করেন।’

‘কী ফুর্তি করব?’

‘তাও ঠিক। লোকজন এ রকম হঠাৎ লক্ষপতি হলে কী করে ফুর্তি করে কে

জানে। রেজাল্টটা কোথায় দিয়েছে? দেখি পত্রিকাটা?’

ক্লাস নাইনের ছেলেগুলো বড্ড গুগোল করছে। একজন এসে কমনরুমে উঁকি দিয়ে দেখে গেল। আজিজুদ্দীন সাহেব ভ্রু কুঁচকে লটারির খবর দু’তিনবার পড়লেন। তাঁর কাছে কোনো টিকিট নেই। তিনি সবগুলো নেজামের চায়ের স্টলে বিক্রি করে ফেলেছেন।

টিফিন পিরিয়ডে স্কুল ছুটি হয়ে গেল। মাস্টারদের কারো আর ক্লাস নেবার উৎসাহ রইল না। সবাই কমনরুমে শুকনো মুখে বসে রইলেন। স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ায় ছেলেদের জন্যে আনা টিফিন বেঁচে গেছে। লুচি আর বুন্দিয়া। অন্য সময় হলে টিফিনের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে উৎসাহী আলোচনা চলত। আজ আর কিছুই জমছে না। ক্লাস টেনের ছেলেগুলো কমনরুমের দরজার কাছে জটলা পাকাচ্ছিল। আজিজুদ্দীন সাহেব প্রচণ্ড ধমক দিলেন, ‘নাট্যশালা নাকি, অঁ্যা? যা বাড়ি যা। দু’দিন পরে পরীক্ষা, কোনো হুঁশ নাই। গরুর দল।’

হেড মাস্টার সাহেব খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন। এবং খুব হইচই শুরু করলেন, ‘স্কুল ছুটি দিয়েছে কে? স্কুল ছুটি দেয়ার মধ্যে কী হয়েছে বলেন তো? একজন লটারিতে ক’টা টাকা পেয়েছে আর ওঁসি স্কুল ছুটি? পেয়েছেনটা কী?’

হেড মাস্টার সাহেবের কথায় কারো কোনো ভাবান্তর হলো না। এ্যাসিস্টেন্ট হেড মাস্টার সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘কী ভ্যাজর ভ্যাজর করছেন? কে গিয়ে এখন ক্লাস নেবে?’

‘অসুবিধাটা কী? আমি তো এই মধ্যে অসুবিধার কিছু দেখলাম না।’

‘তিন মাস বেতন নাই। এই মধ্যে একজন দু’লাখ টাকা পেলে মেজাজ ঠিক থাকে?’

‘তিন মাস বেতন নাই—কথাটা তো ঠিক বললেন না। হাফ বেতন হয়েছে গত মাসে। এস.এস.সি. পরীক্ষার কালেকশন হলে বাকিটা পাবেন। ভালো কালেকশন হবে এইবার।’

বশীর মিয়া হেড মাস্টারের সঙ্গে ফিরে এসেছে। সে একটি বড় গামলায় তেল-মরিচ দিয়ে মুড়ি মাখছিল। দুপুরে এটাই স্যারদের টিফিন। কেরোসিন কুকারে চায়ের পানি ফুটছে। হেড মাস্টার সাহেব বিরস মুখে বললেন, ‘আজও মুড়ি? আজ একটা ভালো টিফিনের দরকার ছিল।’

কেউ কোনো সাড়া দিল না। টিফিন পর্ব শেষ হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। টিচাররা সবাই বাড়ি চলে গেলেন। প্রণব বাবু নড়লেন না। হেড মাস্টার সাহেব একসময় বললেন, ‘বাড়ি গিয়ে আমোদ-ফুর্তি করেন। চুপচাপ বসে আছেন কী জন্যে?’

‘ভালো লাগছে না, স্যার।’

‘ভালো লাগবে না কেন? আজ তো আপনার ভালো লাগারই দিন।’

হেড মাস্টার সাহেব শুকনো গলায় টেনে-টেনে হাসতে লাগলেন, ‘জোর-জবরদস্তি করে কিনিয়েছি বলেই পেলেন। মনে রাখবেন সেটা। হা-হা-হা। উপকারের কথা কারো মনে থাকে না— এইটাই দুনিয়ার নিয়ম।’

প্রণব বাবু বিড়বিড় করে কি যেন বললেন, পরিষ্কার বোঝা গেল না। হেড মাস্টার সাহেব শুকনো গলায় বললেন, ‘যে টিকিটে পেয়েছেন সেটা আছে তো? অনেক সময় দেখা যায় টিকিটটাই মিসিং। তখন সবই গেল।’

প্রণব বাবু মানিব্যাগ থেকে টিকিট বের করে হেড মাস্টার সাহেবের হাতে দিলেন। হেড মাস্টার সাহেব দ্রুত কুণ্ঠিত করে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন টিকিটের দিকে। তাঁর মেয়ের এই বিয়ের প্রস্তাবটাও হয়তো ভেঙে যাবে। ছেলের ফুপা বলেছে ছেলের নাকি মোটর সাইকেলের খুব শখ। অজপাড়াগাঁর পোস্টমাস্টারের ছেলে মোটর সাইকেল দিয়ে করবেটা কী? তেরো টাকার কৈ মাছ জলে গেছে বলাই বাহুল্য। হেড মাস্টার সাহেব ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘প্রণব বাবু, আপনি এইবার একটা মোটর সাইকেল কিনে ফেলেন।’

‘মোটর সাইকেল দিয়ে আমি কী করব?’

‘চড়বেন, চড়বেন। আপনারই তো দিন-কাল।’

হেড মাস্টার সাহেব আবার টেনে টেনে হাসতে লাগলেন।

প্রণব বাবু স্কুল থেকে বেরুলেন সন্ধ্যার পর। তাঁর ধারণা ছিল, বাজারের ভেতর দিয়ে যাবার সময় অসংখ্যবার লটারি টাকা পাওয়ার খবর তাঁকে বলতে হবে। কিন্তু সে রকম কিছুই হলো না। কেউ কি জানে না খবরটা? আশ্চর্য!

তাঁর ছেলে সুবল যেবার মধ্যমসিংহে চুরি কেইসে গ্রেফতার হলো সেবার প্রণব বাবুকে অসংখ্যবার ব্যাপারটা বলতে হয়েছে।

‘ফল্‌স কেইস বোঝায়। কি বলেন প্রণব বাবু? হাজার হলেও আপনার ছেলে। ভদ্রলোকের সন্তান।’

‘ফল্‌স কেইস না। চুরি সত্যি সত্যি করেছে।’

‘বলেন কি! ব্যাপারটা ঠিকমতো বলেন তো শুন। বসেন না। এই বাবুকে চা দে।’

আজ প্রণব বাবু নীলগঞ্জ বাজারের প্রায় শেষপ্রান্তে চলে এলেন। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। বাজার থেকে বেরুবার সময় করিম মিয়া চিকন গলায় ডাকল, ‘বাবু একটু শুনে যান তো।’

‘কী ব্যাপার?’

‘মোট দুইশ’ এগারো টাকা পাওনা। আমরা গরিব ব্যবসায়ী। এত টাকা আটকা পড়লে চলে?’

‘দিয়ে দিবো।’

‘এই কথা তো বাবু দু’তিন মাস ধরেই শুনতেছি। নিবারণ সাহার কাছে এই

রকম চারশ' টাকা পাওনা। হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে চলে গেল ইন্ডিয়া।'

‘আমি ইন্ডিয়া যাবো না। ইন্ডিয়াতে আমার কেউ নেই।’

প্রণব বাবুর খুব ইচ্ছা হলো লটারির কথাটা বলেন। কিন্তু বলতে পারলেন না।

তিনি বাড়ি পৌঁছলেন রাত আটটার দিকে। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। সাড়া-শব্দ করার লোকও অবিশ্যি নেই। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তিনি হাতড়ে-হাতড়ে তালা খুললেন। হারিকেন জ্বালালেন। টেবিলের ওপর খাবার ঢাকা আছে। খান কতক রুটি, একটা ভাজি, এক বাটি তেঁতুলের টক। তাঁর রান্না হয় জ্যাঠার বাড়িতে। রান্না হয়ে গেলে তালা খুলে খাবার রেখে যায়। সেই বাবদ জ্যাঠার হাতে যখন যা পারেন দেন।

প্রণব বাবু কেরোসিন কুকার জ্বালিয়ে রুটি গরম করতে বসলেন। তখনই হঠাৎ করে সুবল এসে উপস্থিত। সুবলের সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হয় না বললেই হয়। গত ছ'মাসে একবার মাত্র এসেছিল দু'দিনের জন্যে। তিনি কোনো কথা বলেননি। আজ নিজে থেকেই কথা বললেন, ‘আছিস কেমন সুবল?’

‘আছি কোনো মতো? তুমি আছ কেমন বাবা?’

‘খেয়ে এসেছিস নাকি?’

‘হুঁ মাটন বিরিয়ানি খেয়েছি ইন্ডিয়ানে। জানি তো এত রাতে খাওয়া-দাওয়ার কোনো আয়োজন তোমার নাই। খাচ্ছে কি তুমি, রুটি নাকি?’

‘হুঁ। খাবি একটা?’

‘না।’

প্রণব বাবু খেতে বসলেন। সুবল বাইরের বারান্দায় গিয়ে সিগারেট ধরাল। প্রণব বাবু লক্ষ করলেন সুবলের গায়ে চকচকে একটা শার্ট থাকলেও তার পায়ের চামড়ার জুতো জোড়াতে তালি পড়েছে। যে মোটর সপে মেকানিকের কাজ শিখতো। সেখানে পয়সা-কড়ি বোধহয় কিছুই দেয় না।

তাঁর মনে পড়ল দু'মাস আগে আড়াই শ' টাকা চেয়ে ভুল বানানে তিন পাতার একটা চিঠি লিখেছিল সুবল। তিনি জবাব দেননি। এবারো টাকার জন্যেই বোধহয় এসেছে।

‘বাবা ঘরে চায়ের পাতা আছে?’

‘আছে বোধহয়। দেখ্ তো হরলিক্সের বোতলটার মধ্যে।’

সুবল চায়ের পানি চাপিয়ে মৃদুস্বরে বলল, ‘তোমার কাছে তিনশ' টাকা হবে বাবা? আমার খুবই দরকার।’

প্রণব বাবু অনেকক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাবা খুব ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেছি। একটা ব্যবস্থা তোমাকে করতেই

হবে বাবা।

তাঁর ইচ্ছা হলো জিজ্ঞেস করেন, কী ঝামেলা? কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। তাঁর যে মেয়ে কলকাতার শিবপুরে ছিল সেও কি-একটা ঝামেলায় পড়েছিল। এক হাজার টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছিল। ছোট চিঠি কিন্তু সেই ছোট চিঠি পড়ে তিনি সারারাত ঘুমাতে পারেননি। মেয়েটি অনেক বয়স পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ঘুমাতো। কী বিশ্রী ঘুম! পা দু'টি বুকের কাছে এনে মাথা বাঁকা করে। কত বকাঝকা কত কি! লাভ হয়নি কিছুই। অঞ্জুর সেই চিঠির জবাব তিনি দেননি। লজ্জাতেই দিতে পারেননি। দীর্ঘ এক বছর সেই চিঠি পকেটে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। ক্লাসে গিয়েছেন। পাঠীগণিতের কঠিন সব অঙ্ক জলের মতো বুঝিয়ে দিয়েছেন।

প্রণব বাবু বারান্দায় এসে বসলেন। কী চমৎকার জ্যোৎস্না!

অন্ধকার হাল্কা হয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। লেবু ফুলের ঘ্রাণ আসছে। গাছটাতে লেবু হয় না। শুধুই ফুল ফুটে। গাছ-গাছালির কোনো যত্ন নেই আর। কে যত্ন করবে?

সুবল চায়ের কাপ নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

বাবা খুব বড় একটা ঝামেলার মধ্যে পড়েছি।

সবাই বড় ঝামেলায় পড়ে। তিনিও মেয়েকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছিলেন। বিয়ে দেবেন এমন ছেলে পাওয়া যায় না। শেষটায় কেশবনাথ বাবু কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিলেন। বিয়েটা কেমন হয়েছিল কে জানে? বর পছন্দ হয়েছিল পাগলিটার? আজ তার তেঁজানবার কোনো উপায় নেই। বাবাকে কি আর এইসব কথা কোনো মেয়ে লেখে? বাবাকে লিখতে হয় দারুণ সমস্যার সময়।

সুবল মৃদুস্বরে বলল, 'বাবা চা খাবে, চা দেই?'

'দে।'

'চিনি নাই। চিনি ছাড়া চা।'

'দে একটু।'

সুবল তাকিয়ে দেখল তার বাবার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ব্যাপারটা কী? সে আড়চোখে তাকাতে লাগল। মিনমিন করে বলল, 'তিনশ' টাকা না পেলে বেইজ্জত হবে।'

সুবল কথাটা বলেই মাথা নিচু করে ফেলল। এবং লক্ষ করল তার নিজের চোখও ভিজে উঠছে। সে হঠাৎ বলে ফেলল, 'বড় কষ্ট বাবা।'

'কষ্ট! হ্যাঁ, কষ্ট তো বটেই। প্রণব বাবু ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেললেন।'

'টাকাটার কি যোগাড় হবে?'

প্রণব বাবু জবাব দিলেন না। চোখ মুছলেন। সুবল বাবার কাছে সরে এল। প্রণব বাবু হঠাৎ কি মনে করে সুবলের একটি হাত চেপে ধরে সশব্দে ফুঁপিয়ে

উঠলেন।

সুবল বলল, 'কাঁদবেন না বাবা। দেখি একটা ব্যবস্থা আমি নিজেই করব। কাঁদবেন না।'

'মেয়েটারে বড় দেখতে ইচ্ছা হয় সুবল।'

তিনি দু'লক্ষ টাকার একটি টিকিট পকেটে নিয়ে একজন নিঃস্ব মানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন। সুবল বাবাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বসে রইল। তিনশ' টাকার তার সত্যি খুব প্রয়োজন। তার নিজেরও ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু সে কাঁদল না। নিচু গলায় বলল, 'চিন্তার কিছু নাই বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

প্রণব বাবু ধরা গলায় বললেন, 'কিছুই ঠিক হয় না।'

তার কথাকে সমর্থন করেই যেন ঘরের ভেতর থেকে তক্ষক ডেকে উঠল। বাইরে মাছের চোখের মতো মরা জ্যোৎস্না।



জীবনযাপন

আমার দুলাভাই লোকটি খবিশ ধরনের।

খবিশ শব্দটির মানে আমি ঠিক জানি না। মনে হয় এর মানে খুব খারাপ ধরনের জানোয়ার। অন্য কিছু হতে পারে। এই গালিটি আমি শিখি আমার দাদির কাছে। তিনি কারো উপর খুব রেগে গেলে তাকে খবিশ বলেন। তার বলার ধরন থেকেই বোঝা যায় এটা খুবই খারাপ গালাগাল।

যাই হোক, আমার দুলাভাই যে খবিশ ধরনের এটা আমি বা বিনু (বিনু আমার বড় বোন। ওর সঙ্গেই খবিশটার বিয়ে হয়েছে) প্রথমে বুঝতে পারিনি। বিনুর বুঝতে পারার কথা নয়। সে কিছুই বুঝে না। খুবই বোকা, বিয়ে হওয়াতে সে আনন্দে গদগদ। বিয়ে হওয়ায় কোনো মেয়ে এত খুশি হয় আমি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল, প্রথম কিছুদিন মেয়েগুলির খুব মন খারাপ থাকে। আর না থাকলেও ভান করে যে মন খারাপ। বিনুর এসব কিছু নেই। এই সকালবেলাতেই সে সেজেগুজে বসে আছে। ঠোঁটে আবার বদরঙের কি-একটা

লিপস্টিক দিয়েছে। বিনু মহানন্দে তার ঘর-সংসার দেখাতে লাগল এবং নিচু গলায় ক্রমাগত কথা বলতে লাগল। নিচু গলায় কথা বলার কারণ হচ্ছে দুলাভাই এখনো ঘুম থেকে ওঠেননি। আমি শুকনো মুখে বিনুর কথা শুনতে লাগলাম।

‘তিনটা ঘর এই বাড়িটাতে। আর বারান্দাটা কত বড় দেখেছিস? বসার ঘরটা আমরা তালা দিয়ে রাখি। ধুলাবালি যাতে না যায়। মেহমান-টেহমান আসলে তালা খুলে দেই। রান্নাঘরে আয় একটা জিনিস তোকে দেখাই, ময়লা ফেলবার জন্যে আমাদের একটা টিনের ড্রামের মতো আছে। ড্রামের মুখটা হাত না দিয়ে খোলা যায়।’

বিনু এমনভাবে কথা বলছে যেন সে দীর্ঘদিন ধরে এই বাড়িতে আছে। অথচ তার বিয়ে হয়েছে মাত্র পরশু। বিনুটা গাধার গাধা। ভ্যাজর ভ্যাজর করছেই। লজ্জা-শরম নেই।

‘দুটো ফ্যান আমাদের। বসার ঘরে আর শোবার ঘরে। আরেকটা কিনব। আর শোন, আমার এক ফুফু-শাশুড়ি আমাকে গলার হার দিয়েছে। বিরাট বড়লোক। আয় তোকে হারটা দেখাই। স্টিলের আলমিরায় রেখে দিয়েছি। আমাদের একটা স্টিলের আলমিরা আছে।’

দুলাভাই ঘুম থেকে উঠলেন দশটার দিকে। আমার দিকে তাকালেন কিন্তু মনে হলো চিনতে পারলেন না। গভীর মুখে দাড়ি কামাতে বসলেন। সেই সময়টায় বিনু তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকল এবং ক্রমাগত বলতে লাগল, ‘ডান গালে এখনো কয়েকটা আছে। গুতলিটা ভালোমতো হয় নাই। ইশ রক্ত বের হয়ে গেছে।’

রক্ত বের হবার কথাটা সে এমনভাবে বলল যেন রক্তপাতের ফলে দুলাভাই খানিকক্ষণের মধ্যেই মারা যাবেন। রাগে আমার মুখ তেতো হয়ে গেল। সব মেয়েগুলিই এ-রকম কেহায়া হয় না— শুধু বিনুটাই হয়েছে? কে বলবে এই মেয়ে বিয়ের দু’দিন আগে পর্যন্ত জালাল ভাইয়ের সঙ্গে চিঠি চালাচালি করেছে। কি সব ভাষা সেই সব চিঠির— ‘ওগো, তোমার ভালোবাসার চুম্বনটি আমি গ্রহণ করিলাম।’ চিঠিপত্রের চালাচালি বেশিরভাগই আমার মারফত হয়েছে। কাজেই কে কী লিখেছে আমার জানা।

দুলাভাই নাশতা খেতে বসলেন এগারোটার সময়। ইতিমধ্যে তাঁর গোসল হয়েছে। তিনি ইস্ত্রি করা একটা পাঞ্জাবি পরেছেন। মুখে ক্রীম দেয়ায় তাঁর চারদিকে মিষ্টি একটা গন্ধ। নাশতার টেবিলে বসেই তিনি আমার সঙ্গে প্রথম কথা বললেন। আমার দিকে না তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, ‘তারপর কী ব্যাপার, ভালো?’

‘আমি বললাম, জি ভালো। আপনি ভালো?’

তিনি তার জবাব দিলেন না। গভীর মনোযোগে ডিমের পোঁচ থেকে সাদা

অংশটি আলাদা করতে লাগলেন। বিনু হাসিমুখে বলল, ‘ও কুসুম খায় না। কুসুম খেলে হার্টের অসুখ হয়। তুই কুসুমটা খেয়ে ফেল।’

আমি চুপ করে রইলাম। একজনের খাওয়া জিনিস আমি খাব কেন? কিন্তু বিনুটা এমন গাধা যে ক্রমাগতই বলতে লাগল, ‘এই খেয়ে ফেল না। গোলমরিচ আছে। একটু গোলমরিচ দিয়ে খা মজা লাগবে।’

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, ‘তোমার ইচ্ছা হলে তুই খা।’

বিনু টপ করে কুসুমটা মুখে দিয়ে ফেলল। খাবার-দাবারের ব্যাপারে ওর লজ্জা-শরম একটু কম। দুলাভাই চায়ের কাপে চুমুক দিলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করে বললেন (আমার দিকে না তাকিয়ে), ‘বিনু তো তোমার দু’বছরের বড়। তাকে তুই তুই করে বলছ কেন? এটা অসভ্যতা। এখন থেকে আর তুই তুই করবে না। নাম ধরেও ডাকবে না। আপামনি বলবে, বুঝতে পারছ?’

আমি কঠিন মুখ করে বসে রইলাম। দুলাভাই মিহি গলায় বললেন, ‘তুমি এক কাজ কর, চলে আস এ বাড়িতে। বিনু একা থাকে, মজা পাবে। মেট্রিকের রেজাল্ট হোক, পাস করতে পারলে তোমাকে কলেজে ভর্তি করে দেব।’

দুলাভাইয়ের কথায় বিনু এতই আনন্দিত হলো যে, হা করে হাসতে গিয়ে ডিমের কুসুমের দু’ফোঁটা তার শাড়িতে ফেলে দিল।

দুলাভাইয়ের এই আহ্বানে আপত্তি থাকার কোনোই কারণ নেই। খুশি হবার মতন একটা ঘটনা। কেন তা একটু শুঁড়িয়ে বলি। বাবার মৃত্যুর পর আমরা চার ভাইবোন এবং মা গভীর গাভিয়ায় পড়ে যাই (গাভিয়া শব্দটার মানেও আমি জানি না। সম্ভবত সমুদ্র)। আমাদের সবাইকে ভাগাভাগি করে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনদের ঘাড়ে ফেলে দেয়া হয়। সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করে আমাদের ঝেড়ে ফেলে দিতে। পারে না। কারণ, আমরা আঠার মতো লেগে থাকি। আমি যার সঙ্গে লেগে আছি তিনি আমার বড় মামা। ইনি ইদানীং আমাকে আর সহ্যই করতে পারছেন না। কয়েক দিন আগে বড় মামার পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট চুরি গেল। সম্ভাব্য চোরদের যে তালিকা তিনি প্রস্তুত করলেন তার মধ্যে আছেন আমার মামি, আমি স্বয়ং এবং এ বাড়ির কাজের ছেলে। মামি কোরান শরিফ ছুঁয়ে বললেন টাকার কথা তিনি কিছুই জানেন না। মামা তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন কি-না বলা মুশকিল (কারণ, মামি যে-কোনো বড় মিথ্যা সাধারণত কোরান শরিফ ছুঁয়ে বলেন)। তবে আমার কথা একেবারেই বিশ্বাস করলেন না। একগাদা লোকের সামনে আমাকে এবং কাজের ছেলেটাকে (কাজের ছেলেটার নাম মুনির) কান ধরে একশ’ বার ওঠ-বোস করতে বললেন। বিরাট কেলেকারি ব্যাপার। মুনির অবশ্য মহা ইন্টেলিজেন্ট ছোকরা। পরদিনই মামার ফিলিপস রেডিও (টু ব্যান্ড) নিয়ে হাওয়া। আমার এ-রকম কিছু করার উপায় ছিল না। কারণ, আমার যাবার জায়গা নেই।

আমি এক শুক্রবারে আমার ইহজাগতিক বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে দুলাভাইয়ের বাসায় উঠে এলাম। বিনু আনন্দে আত্মহারা। আমার থাকার জায়গা হলো স্টোর রুমে। বিনু ছোট্টাছুটি করে ঘর গুছিয়ে দিতে লাগল। নানা জায়গায় ছেঁড়া মশারি যত্ন করে সারিয়ে দিল এবং নিচু গলায় বলল, 'তোরা দুলাভাইকে বলে তোকে একটা নেটের মশারি কিনে দেব। কয়েকটা দিন যাক।'

এখানে আসার কিছুদিনের ভেতরই কিছু নতুন জিনিস জানলাম, যেমন— দুলাভাই লোকটির অনেক বয়স। তিনি সপ্তাহে একদিন (বৃহস্পতিবার, গোসলের সময়) মাথায় কলপ দেন। আগে তার একবার বিয়ে হয়েছিল। লোকটি অসম্ভব কৃপণ।

এসব নিয়ে বিনুর কোনো মাথাব্যথা দেখলাম না। মাথার কলপ প্রসঙ্গে বলল, 'জুলফির দুই-একটা মাত্র চুল পেকেছে, বুঝলি? বেশি না। ওদের বংশের ধারা এরকম, অল্প বয়সে চুল পেকে যায়। ওর এক চাচা আছে পঁচিশ বছর বয়সে মাথার চুল সাদা।'

দুলাভাইয়ের প্রথম বিয়ে প্রসঙ্গে তার মত হচ্ছে, বউটা ছিল মহা হারামজাদী। মানুষটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মেরেছে। আপদ বিদায় হয়েছে, বাঁচা গেছে।

আমি বললাম, 'বিয়ের আগে এইসব কথা বলা দরকার ছিল।'

বিনু বিরক্ত হয়ে বলল, 'এইসব কি আগ বাড়িয়ে বলার জিনিস? লজ্জাতেই বলতে পারেনি।'

'বুড়ো ধাড়ি।'

'আহ্ এসব কী? একটা বয়স না হলে বরদের আমার ভালো লাগে না। চেংড়া জামাই আমার কাছে অসহ্য।'

বিনু এমনভাবে কথাগুলি বলল যেন চেংড়া জামাই তার আগে কয়েকটি ছিল। বিনুটা এমন বোকা।

আমাকে এত আগ্রহ করে এখানে রাখার রহস্যটা আমি দ্বিতীয় দিনেই বুঝলাম। এ বাড়িতে কাজের কোনো লোক নাই। সকাল বেলায় একটি ঝি (ময়নার মা, এর কথা পরে বলব) এসে বাসন ধুয়ে দিয়ে যায়, ঘর ঝাঁট দেয় এবং বাজার করে। বাজার করার দায়িত্ব আমার কাঁধে এসে পড়ল। আমার দ্বিতীয় দায়িত্ব দুলাভাইয়ের জন্যে সিগারেট আনা। তিনি একসঙ্গে বেশি সিগারেট কিনেন না, তাতে বেশি খাওয়া হয়। তার জন্যে একটি করে সিগারেট কিনতে হয়। এবং সেটা কিনতে হয় অদ্ভুত অদ্ভুত সময়ে, যেমন একবার রাত দুটোর সময় সিগারেট কিনতে পাঠালেন। বিনু ক্ষীণস্বরে বলল, 'এত রাতে দোকান তো সব বন্ধ।'

দুলাভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ক'টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে তুমি

জান? না জেনে কথা বলবে না। এই শহরে বেশিরভাগ দোকান সারারাত খোলা থাকে।’

আমি সিগারেট নিয়ে এসে দেখি বিনু বারান্দায় বসে কাঁদছে এবং দুলাভাই এ-মাথা ও-মাথা করছেন। আমাকে দেখেই গম্ভীর গলায় বললেন, ‘আবার যাও, আরো দু’টা সিগারেট নিয়ে এসো।’

এটা বললেন বিনুকে শাস্তি দেবার জন্যে। বিনু আরো শব্দ করে কাঁদতে লাগল। আমি আবার সিগারেট আনতে গেলাম এবং নিয়ে এসে দেখি তাদের মিটমাট হয়ে গেছে। বিনুর মুখ খুব হাসি-হাসি। সে রান্নাঘরে চা বানাচ্ছে। দুলাভাইয়ের মাঝে মাঝে দুপুররাতে চা খেতে ইচ্ছে করে। বিনু আমাকে বলল, ‘চা খাবি? বানাব তোর জন্যে এক কাপ?’

‘না।’

‘খা একটু। তোর দুলাভাই লোকটা কিন্তু খারাপ না, ভালোই।’

‘ভালো হলেই ভালো।’

‘রেগে গেলে মাথা ঠিক থাকে না। রোগা মানুষ তো, রাগ সামলাতে পারে না। বাবার কথা মনে নাই? রেগে গেলে কেমন মারধোর করত।’

‘দুলাভাই তোমাকে মারে নাকি?’

‘আরে না। মারবে কেন? আর ধর, যদি এক-আধটা চড় দিয়েই বসে তাতে এমন কোনো ক্ষতি তো হয় না? বাবা আমাদের মারতো না? আমরা কি কোনো দিন রাগ করেছি বাবার উপর?’

রাগে আমার গা জ্বলে যায়। কার সঙ্গে তার তুলনা। কোথায় বাবা আর কোথায় এই বুড়ো ভূমি (ভূমি শব্দটার মানেও আমি জানি না। দাদিজান সব সময় দাদাজানের প্রশংসা বলতেন)।

বাবা আমাদের মারতেন ঠিকই। হঠাৎ মেজাজ চড়ে গেলে একটা কঞ্চি হাতে নিয়ে মেঘপর্জন করতে করতে বাঁজিয়ে পড়তেন। কয়েক ঘা দেবার পর রাগ পড়ে যেত। তিনি কঞ্চি ছুঁড়ে ফেলে নিজেই কাঁদতে বসতেন এবং বিড়বিড় করে বলতেন— মহাপাষণ্ড আমি, মহাপাষণ্ড। আমার মতো পাষণ্ড খোদার আলমে নাই। কিছুক্ষণ এইভাবে বিলাপ করার পর গম্ভীর মুখে শার্ট গায়ে দিয়ে বের হয়ে যেতেন। যে মার খেয়েছে তার মুখে তখন হাসি ফুটতো। কারণ, বাবা তার জন্যে কিছু-একটা কিনতে গিয়েছেন। মহার্ঘ কোনো বস্তু নয়। একটা কাঠ পেনসিল, একটা দু’ নম্বর খাতা কিংবা চারটা আচার (পঁচিশ পয়সা করে প্যাকেট)। অনুতপ্ত পিতা সেই উপহার নিজের হাতে দিতেন না। মা’কে দিয়ে পাঠাতেন। রাতে ভাত খাবার সময় আরেক নাটক অভিনীত হতো। বাবা উঁচু গলায় বলতেন— তিনি মহাপাষণ্ড। তিনি জল্লাদ। কাজেই নিজেকে শাস্তি দেবার জন্যে রাতে তিনি কিছুই খাবেন না। উপবাস দেবেন। তাঁকে খাওয়াবার

জন্যে বহু সাধাসাধি করতে হতো। যে শাস্তি পেয়েছে সে একসময় কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে জড়িয়ে ধরবার পর বাবা খেতে বসতেন।

এই বাবার সঙ্গে বুড়ো ভামের তুলনা? বিনুটার মাথায় আল্লাহ কি এক ফোঁটা বুদ্ধিও দেন নি? রাগে আমার কান্না পেয়ে যায়? কী ক্ষতি ছিল তার আরেকটু বুদ্ধিগুন্নি থাকলে? চেহারাটা না হয় আরেকটু খারাপই হতো?

বিনুর যে বুদ্ধিগুন্নি একেবারেই নেই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে— ময়নার মা'র ব্যাপারটা সে কিছুই বুঝতে পারছে না অথচ আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। ময়নার মা'র বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের ভেতর। স্বাস্থ্য বেশ ভালো। শ্যামলা রঙ। চেহারা ভালো। কথায় কথায় গা দুলিয়ে হাসে। আমি বেশ অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, সে বিনুর সঙ্গে খারাপ ধরনের রসিকতা করার চেষ্টা করে। যেমন একদিন বলল, 'সায়েব এখনো ঘুমে? রাইতে ঘুমায় না? বুড়া বয়সে রস থাকে বেশি। হি হি হি।'

বলাই বাহুল্য, বিনু এই রসিকতার কিছুই বুঝল না। বিম্বিত হয়ে বলল, 'শুধু শুধু হাস কেন?'

'রসের কথায় হাসি।'

'হাসি বন্ধ করে ঘরের কাজ শেষ কর।'

'সায়েবের ঘুম ভাঙলে কইয়েন ময়নার মা একখানা ভালো শাড়ি চাইছে। চিকন সুতার টাঙ্গাইলের শাড়ি।'

'শাড়ি কী জন্যে?'

'বুড়ো বয়সে সুন্দর বউ পাওয়াই এই কারণে। কইয়েন। কইলেই দিব। হি হি হি।'

'আবার কেন হাসছ?'

'আমার হাসি-রোগ আছে। আপনার সায়েব এই রোগের কথা জানে। এই রোগের কোনো চিকিৎসা নাই। হি হি হি।'

আমি বিনুকে বললাম, 'মেয়েটা খারাপ। দুলাভাইকে বলে মেয়েটাকে ছাড়িয়ে দে।'

বিনু অবাক হয়ে বলল, 'খারাপ মানে? কী খারাপ?'

'তুই বুঝবি না। মেয়েটাকে ছাড়িয়ে দে।'

দুলাভাই বিনুর কথা কানেই তুললেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, 'ফালতু কথা আমার সঙ্গে একেবারেই বলবে না। কাজের লোক কি পাওয়া যায়? ভালো কাজকর্ম করছে। ছাড়িয়ে দেব কেন শুধু শুধু? শাড়ি চেয়েছে, একটা শাড়ি দিলেই হয়। বিয়ে-শাদী উপলক্ষে এরা তো দু'একটা শাড়ি আশা করতেই পারে। এর মধ্যে অন্যায় তো কিছু নেই।'

পরদিনই ময়নার মা'র জন্যে শাড়ি চলে এল। টাঙ্গাইলের চিকন পাড় শাড়ি। বিনু গম্ভীর গলায় বলল, 'কত দাম নিল?'

‘তা দিয়ে তোমার দরকার কী? টাকাপয়সার কোনো ব্যাপারে তুমি থাকবে না, বুঝলে? মেয়েছেলেদের টাকাপয়সা নিয়ে কথবর্তী আমি পছন্দ করি না। মেয়েছেলে থাকবে মেয়েছেলের মতো।’

ময়নার মা শাড়ি পেয়ে খুশি হলো কি-না বোঝা গেল না। সে খুব গা দুলিয়ে হাসতে লাগল।

বিনু বলল, ‘হাস কেন?’

‘খুশি হইয়া হাসি। শাড়ি পাইছি এইজন্যে হাসি। হি হি হি।’

‘এই রকম হাসলে আমার বাসায় কাজ করতে পারবে না।’

‘ওমা এইটা কেমন কথা। হি হি হি।’

ময়নার মার তীক্ষ্ণ হাসি আমাদের বেশি দিন সহ্য করতে হলো না। এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমরা নতুন একটা বাড়িতে গেলাম। বাড়ি বদলের পর্বটি সমাধা হলো খুব গোপনে। দুলাভাই বললেন, ‘বাড়ি বদলের ব্যাপারটা ময়নার মা’কে জানিয়ে কাজ নেই।’

বিনু অবাক হয়ে বলল, ‘জানাতে অসুবিধা কী?’

‘বেটি মহাহারামী। জানলে ঐখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।’

‘উপস্থিত হলে অসুবিধা কী?’

‘আরে কি শুধু মুখের উপর কথা? বললো জানাবে না। ফুরিয়ে গেল। হেনতেন একশ’ কথার দরকার কী?’

এক রাতে ময়নার মা’কে কিছুটা জানিয়ে এবং বাড়িওয়ালার দু’মাসের বাড়ি ভাড়া না দিয়ে আমরা নতুন বাসায় চলে গেলাম। নতুন বাসাটি আগেরটির চেয়ে বড়। দু’টি বাথরুম। সামনে-পেছনে বারান্দা। বিনুর আনন্দের কোনো সীমা রইল না। তার অবিশ্যি স্বাস্থ্য খারাপ হতে শুরু করেছে। চোখের কোণে কালি পড়ছে। মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু। পেট বড় হওয়া শুরু হয়েছে। তবু এই অবস্থাতেও সে বাড়ি গুছিয়ে রাখার জন্যে সারা দিন পরিশ্রম করে। সাবান পানি দিয়ে মেঝে ধোয়। রান্নাবান্না করে। কারণ, এখন আমাদের কোনো কাজের লোক নেই। যে-কোনো কারণেই হোক দুলাভাইয়ের মেজাজ এখন খুব খারাপ। রোজ রাতে ককর্শ গলায় ঝগড়া করেন।

সেই সব ঝগড়ার কোনো আগামাথা নেই। দুলাভাই নিজেই একতরফা চেষ্টা করে যান। বিনুর একটি কথাও শোনা যায় না। একসময় সে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদে। তখন একটি চড়ের শব্দ পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে দুলাভাইয়ের ক্রুদ্ধ গলা, ‘কতবার বলেছি কাঁদবি না।’

‘তুই করে বলছ কেন?’

‘শাট আপ। বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে।’

‘তুই তুই করে বলছ কেন?’

‘যা বেরিয়ে যা। ছোটলোকের দল বিদেয় হ।’

আমার ঘরটা দুলাভাইয়ের ঘরের পাশেই। সবকিছু শুনেও না শোনার ভান করে থাকি। রাত বাড়তে থাকে। একসময় পাশের ঘর থেকে আর কোনো সাড়া-শব্দ আসে না। ঝগড়া মিটমাট হয়ে যায় বোধহয়। গভীর রাতে বিনু এসে দরজা ধাক্কা দেয়। ফিসফিস করে বলে, ‘ঘুমিয়ে পড়েছিস?’

‘না কেন?’

‘তোরা দুলাভাইকে একটা সিগারেট এনে দে না।’

আমি দরজা খুলি, বিনু আলোতে আসে না। ঘোমটা দিয়ে তার বাঁ গাল আড়াল করে রাখতে চায়। আমি হাল্কা গলায় বলি, ‘আবার মেরেছে?’

বিনু সহজ স্বরে বলে, ‘না। মারবে কেন শুধু শুধু?’

‘গাল ঢেকে রেখেছিস কেন?’

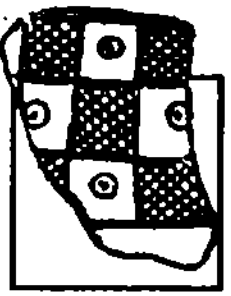
‘এম্মি।’

শ্রাবণ মাসের আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ে। আমি সিগারেট আনতে যাই। কোনো কোনো রাতে ঘরে ফিরে আসতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছা করে হাঁটতেই থাকি, হাঁটতেই থাকি। কিন্তু তখন মনে হয় বিনু দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। তার কোথাও যাবার জায়গা নেই।

আমি ফিরে আসি। বিনু উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করে, ‘সিগারেট ভিজে যায়নি তো?’

আমি গাঢ় স্বরে বলি, ‘আমি ভিজেছি, সিগারেট ভিজেনি। বিনু হাসে।’

বড় ভালো লাগে এই বোকা মেয়েটির হাসি।



সে

আমার ছোট মেয়ের গলায় মাছের কাঁটা ফুটেছিল।

মাছের কাঁটা যে এমন যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার তা জানা ছিল না। বেচারি ক্রমাগত কাঁদছে। কিছুক্ষণ পরপর বমি করছে, হেঁচকি উঠছে। চোখ-মুখ ফুলে একাকার। আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম।

অনেক ধরনের লৌকিক চিকিৎসা করানো হলো। শুকনো ভাতের দলা

গেলানো, মধু খাওয়ানো, গলায় সেক। এক পর্যায়ে আমাদের কাজের মেয়েটি বলল, ‘একটা বিড়াল এনে তার পায়ে ধরলে কাঁটা চলে যাবে। গ্রামদেশে না-কি এইভাবে গলার কাঁটা দূর করা হয়।’

বিপদে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। হাতের কাছে বেড়াল থাকলে হয়তোবা বেড়াল-চিকিৎসাও করাতাম। ডাক্তারের কথা একবারও মনে হয়নি। কারণ, মনে হলেও লাভ হতো না। আটচল্লিশ ঘণ্টার হরতাল চলছে। ঢাকা শহর অচল। পুলিশের সঙ্গে জনতার কিছু-কিছু খণ্ড সংঘর্ষ হচ্ছে বলেও খবর আসছে। দু’টি পেট্রোল পাম্পে না-কি আগুন লাগান হয়েছে। কয়েক জন মারাও গেছে। শহর ভর্তি গুজব। শোনা যাচ্ছে, এরশাদ সরকারের পতন হয়েছে। তিনি তাঁর প্রিয় গলফ সেট বিক্রি করে দিয়েছেন। একটা হেলিকপ্টার নাকি বঙ্গভবনে রেডি অবস্থায় আছে।

এই অবস্থায় মেয়ে কোলে নিয়ে রাস্তায় নামলাম। মেয়ে একটু পরপর কান্না থামিয়ে জিজ্ঞেস করছে— ‘বাবা, আমি কি মরে যাচ্ছি?’

সাত বছরের মেয়ে এই জাতীয় প্রশ্ন করলে বুক ভেঙে যায়। আমার নিজেরও চোখ পানি এসে গেল।

যখন প্রয়োজন থাকে না তখন মোড়ে মোড়ে ফার্মেসি দেখা যায়। সেই সব ফার্মেসিতে গম্ভীর মুখে ডাক্তার বসে থাকেন। আজ কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কোনো ফার্মেসি খোলা নেই। দু’জন ডাক্তারের বাসায় গেলাম— একজন বাসায় ছিলেন না, অন্যজন মেয়েকে না দেখেই বললেন, ‘মেডিক্যালে নিয়ে যান।’

মেডিক্যালেই নিয়ে যেতাম। তবু কেন জানি সাইনবোর্ড দেখে দেখে তৃতীয় একজন ডাক্তার খুঁজে বের করলাম। ইনি তিনতলায় থাকেন। সাইনবোর্ডে লেখা ‘স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ’। গলায় কাঁটা ফুটা নিশ্চয়ই স্ত্রীরোগ নয়, তবু গেলাম যদি কিছু করতে পারেন।

ডাক্তারের নাম হাসনা বানু। ছোটখাট মানুষ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ভদ্রমহিলার মধ্যে মাতৃভাব অত্যন্ত প্রবল। একদল মানুষ আছে যাদের দেখলেই আপনজন মনে হয়। প্রথম দর্শনেই তাঁকে এ-রকম মনে হলো। তিনি আমার মেয়েকে চেয়ারে বসিয়ে হা করালেন। গলায় টর্চের আলো ফেলে চিমটা দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে এক ইঞ্চি লম্বা একটা কাঁটা বের করে ফেললেন। অতি কোমল গলায় বললেন, ‘মামণি ব্যথা কমেছে?’

আমার মেয়ে চুপ করে রইল। সে বোধহয় তখনও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। ডাক্তার হাসনা বানু বললেন, ‘কি মেয়ে, আমার সঙ্গে কথা বলবে না?’

আমার মেয়ে হেসে ফেলল।

‘এখন বল তুমি কী খাবে? আইসক্রিম খাবে? দেব একটু আইসক্রিম?’

‘ভ্যানিলা আইসক্রিম থাকলে খাব।’

‘আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ভ্যানিলা আইসক্রিম আছে।’

ভদ্রমহিলার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। আমি তাঁকে চিকিৎসার জন্যে কিছু টাকা দিতে গেলাম। তিনি শান্ত গলায় বললেন, ‘ডাক্তারি যখন করি তখন চিকিৎসার টাকা তো নেবোই কিন্তু তাই বলে বাচ্চা একটা মেয়ের গলার কাঁটা বের করারও ফি দাবি করব— এটা কী করে ভাবলেন? কাঁটাটা বের করার পর আপনার মেয়ের হাসি আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। এই হাসির দাম লক্ষ টাকা। তাই না?’

মিসেস হাসনা বেগমের সঙ্গে এই হচ্ছে আমার পরিচয়ের সূত্র। পরিচয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তিনি নিউক্লিয়ার মেডিসিনে গবেষণায় একটি বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবার পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখন যে গল্পটি বলব সেটি তাঁর কাছ থেকে শোনা। যেভাবে শুনেছি অবিকল সেইভাবে গল্পটি বলার চেষ্টা করছি।

মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করে বেরবার পর আমি একটা ক্লিনিকে চাকরি নেই। এখন যেমন চারদিকে ক্লিনিকের ছড়াছড়ি, তখন তেমন ছিল না। অল্প কয়েকটা ক্লিনিক ছিল— সবই মাতৃসদন। আমি যে ক্লিনিকে চাকরি নেই সেটা সেই সময়ের খুব নামী ক্লিনিক। শ্রী পরিবারের মা’রাই শুধু আসতেন। সুযোগ-সুবিধা ভালো ছিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম ক্লিনিক। সর্বসাকুল্যে পনেরোটি বেড ছিল। দশটি ‘এ’ ক্যাটাগরির, পাঁচটি ‘বি’ ক্যাটাগরির। ‘এ’ ক্যাটাগরির ঘরগুলিতে এয়ারকুলার বসান ছিল। আমরা ডাক্তার ছিলাম তিনজন। প্রধান ডাক্তার মেডিক্যাল কলেজের একজন অধ্যাপক। আমি এবং নাসিমা— আমরা দু’জন সদ্য পাস করা ডাক্তার। অবিশ্য সব কাজ আমরা দু’জনই দেখতাম। যেহেতু ছোট ক্লিনিক। আমাদের কোনো অসুবিধা হতো না। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের ক্লিনিকে আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে ভর্তি হলো। প্রথম মা হতে যাচ্ছে। ভয়ে অস্থির। আমি প্রাথমিক পরীক্ষা করে দেখলাম এখনো অনেক দেরি। একেকটা কনট্রেকসানের ভেতর গ্যাপ অনেক বেশি। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম। বললাম, ‘ভয়ের কিছু নেই।’

মেয়েটি করুণ গলায় বলল, ‘তুমি তো বাচ্চা মেয়ে। তুমি পারবে? তুমি জান সবকিছু?’

আমি হেসে ফেললাম। হাসতে হাসতেই বললাম, ‘আমি বাচ্চা নই। তা ছাড়া আমি একজন খুব ভালো ডাক্তার। আপনার কোনো ভয় নেই। আমি ছাড়াও এখানে ডাক্তার আছেন। একজন প্রফেসর আছেন। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাকে দেখবেন।’

রুগিণী বললেন, ‘ভাই তোমাকে তুমি করে বলেছি বলে রাগ করনি তো?’
‘না।’

‘আমার এমন বদঅভ্যাস যাকে পছন্দ হয় তাকেই তুমি বলে ফেলি।’

আমি কাগজপত্র ঠিকঠাক করবার জন্যে ভদ্রমহিলার স্বামীকে নিয়ে অফিসে চলে এলাম। দেখা গেল খুবই ক্ষমতাবান পরিবারের বউ। সাত-আটটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হোমড়া-চোমড়া ধরনের কিছু মানুষ বিরক্ত মুখে হাঁটাহাঁটি করছে। একজন অতি বিরক্ত গলায় বলছে, ‘আপনাদের ব্যবস্থা তো মোটেই ভালো না। ইমার্জেন্সি হলে পেশেন্টকে আপনারা কী করবেন? এখানে কি অপারেট করার ব্যবস্থা আছে?’

‘জি আছে।’

‘আপনাদের নিজস্ব জেনারেটর আছে? ধরুন, হঠাৎ যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায় তখন? তখন কী করবেন? মোমবাতি জ্বালিয়ে তো নিশ্চয়ই অপারেশন হবে না?’

লোকগুলি আমাদের বিরক্ত করে মারল। দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোক বললেন, ‘আপনাদের এখান থেকে আমরা বেশ কিছু টেলিফোন করব। দয়া করে বিরক্ত হবেন না। সব পেমেন্ট করব। মানি উইল নট বি এ প্রবলেম।’

রুগিণী ভর্তি হয়েছেন বিকেলে। রাত ম’টা বাজার আগেই শ্রোতের মতো মানুষ আসতে লাগল। অনেকের হাতে ফুলের গুচ্ছ। অনেকের হাত উপহারের প্যাকেট। বিশ্রী অবস্থা।

আমি সহজে ধৈর্য হারাই নছি। আমারও শেষ পর্যন্ত মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমি বললাম, ‘আপনারা কী শুরু করেছেন? এটাকে একটা বাজার বানিয়ে ফেলেছেন। দয়া করে ভীড় পাতলা করুন। একজন শুধু থাকুন। ডেলিভারি হোক, তখন আসবেন।’

আমার কথায় একজন ভদ্রমহিলা, সম্ভবত মেয়ের শাশুড়ি হবেন, চোখ-মুখ লাল করে বললেন, ‘আপনি কি জানেন এই মেয়ে কোন বাড়ির বউ?’

আমি বললাম, ‘আমি জানি না। আমি জানতেও চাই না। সে আমার পেশেন্ট— এইটুকু শুধু জানি। আর দশটা পেশেন্টকে আমি যেভাবে দেখব তাকেও একইভাবে দেখা হবে।’

‘আর দশটা বউ এবং আমার ঘরের বউ এক?’

‘আমার কাছে এক।’

‘জান আমি এই মুহূর্তে তোমার চাকরি খেতে পারি।’

আমি শীতল গলায় বললাম, ‘আপনি আমার চাকরি খেতে পারেন না। চিকিৎসক হিসেবে আমার কোনো ব্যর্থতা পাওয়া গেলে তবেই চাকরি যেতে পারে। তার আগে নয়। আপনি শুধু শুধুই চেষ্টামেচি করছেন।’

ভদ্রমহিলা রেগে গিয়ে— ‘স্কাউন্ড্রেল, লোফার’ এইসব বলতে লাগলেন।

একজন ভদ্রমহিলা এমন কুৎসিত ভাষায় কথা বলতে পারেন আমার জানা ছিল না। বিরাট হইচই বেঁধে গেল। আমাদের প্রফেসর এলেন। ভেবেছিলাম তিনি আমার পক্ষে কথা বলবেন। তা বললেন না। আমার উপর অসম্ভব রেগে গেলেন। আমাকে অবাক করে দিয়ে সবার সামনে উঁচু গলায় বললেন— ‘হাসনা, তোমাকে এখানে চাকরি করতে হবে না। ইউ ক্যান লিভ।’

আমি আমার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার প্রফেসর জানেন কত আশ্রয়, কত যত্ন নিয়ে আমি এখানে কাজ করি অথচ তিনি...

আমি রিকশা নিয়ে বাসায় চলে এলাম। সহজে আমার চোখে পানি আসে না। কিন্তু রিকশায় ফিরবার পথে খুব কাঁদলাম। তখন বয়স অল্প। মন ছিল খুব স্পর্শকাতর।

রাত এগারোটায় প্রফেসর আমাকে নিতে এলেন। করুণ গলায় বললেন, ‘হাসনা খুব কলেঙ্কারি হয়ে গেছে। তুমি চলে আসার পর ক্লিনিকের কেউ কোনো কাজ করছে না। অসহযোগ আন্দোলন। এ রকম যে দাঁড়াতে কষ্টসাধ্য করিনি। এখন তুমি চল।’

আমি বললাম, ‘স্যার, আমার যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি রুগির আত্মীয়দের বলুন তাকে অন্য কোনো ক্লিনিকে নিয়ে যেতে।’

‘বলেছিলাম। পেশেন্ট যাবে না। সে এখানেই থাকবে।’

‘এখানেই থাকবে?’

‘হ্যাঁ, এখানেই থাকবে। এবং সে বলে দিয়েছে, ডেলিভারির সময় তুমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকতে পারবে না। এখন তুমি যদি না যাও আমার খুব মুশকিল হবে। আমি খুব বিপক্ষে পড়ব। তুমি তো বাইরের জগতের কোনো খোঁজখবর রাখ না। যদি বাসতে তাহলে বুঝতে এই মেয়ে কোন পরিবারের মেয়ে। বাংলাদেশের মতো দেশে এরা যা ইচ্ছা করতে পারে। তুমি চল।’

‘স্যার, আমি যাব না। ওরা যা ইচ্ছে করুক।’

‘হাসনা, অন্য সব কিছু বাদ দাও। তুমি পেশেন্টের দিকে তাকাও। সে তোমার উপর নির্ভর করে আছে। আমার উপর তোমার রাগটা বড়, না পেশেন্টের প্রতি তোমার দায়িত্ব বড়?’

আমি শাল-গায়ে বের হয়ে এলাম। ক্লিনিকে তখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ওয়েটিং রুমে তিনজন শুধু বসে আছেন। রুগিণীর কাছে দু’জন। দু’জনের একজন রুগিণীর শাওড়ি। তিনি আমাকে দেখেই শীতল গলায় বললেন, ‘রাগের মাথায় কি সব বলেছি কিছু মনে রেখো না মা। রাগ উঠলে আমার মাথা ঠিক থাকে না।’

আমি বললাম, ‘আমি কিছু মনে রাখিনি।’

‘বৌমা তখন থেকে বলছিল সে তোমাকে যেন কি বলতে চায়। তুমি ওর কথাটা শোন। ও খুব ভয় পেয়েছে।’

আমি মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়িলাম। মেয়েটি ক্ষীণ স্বরে বলল, ‘আপনারা ঘর থেকে যান মা। আমি ওর সঙ্গে একা একা বলব। আর কেউ যেন না থাকে।’

ভদ্রমহিলা দু’জন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ঘর ছেড়ে গেলেন। মেয়েটা বলল, ‘ভাই তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও।’

‘তার কি দরকার আছে?’

‘আছে, তুমি লক কর। তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে। দরজা বন্ধ করে তুমি আমার পাশে এসে বস।’

আমি তাই করলাম। কনট্রেকসনের সময় কমে এসেছে। ব্যথার ধকল সামলাতে মেয়েটির খুবই কষ্ট হচ্ছে। তার গলার স্বর পাণ্টে গেছে। মনে হচ্ছে সে অনেক দূর থেকে কথা বলছে। সে আমার হাত ধরে বলল, ‘ভাই তোমার কি রাগ কমেছে?’

‘হ্যাঁ কমেছে।’

‘তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে বল যে তোমার রাগ কমেছে।’

আমি তার কপালে হাত রেখে বললাম, ‘আমার রাগ কমেছে।’

‘আমি তোমাকে তুমি তুমি করে বলছি বলে রাগ করছ না তো? তুমি নিশ্চয়ই বয়সে আমার বড়।’

‘আমি মোটেই রাগ করিনি।’

‘আমি সবাইকেই তুমি তুমি বলিনি। যাদের আমার খুব প্রিয় মনে হয়, খুব আপন মনে হয় তাদেরকে আমি তুমি বলি। তোমাকে প্রথম দেখেই আমার ভালো লেগেছে। তুমিও কিন্তু আমাকে তুমি বলবে।’

‘কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি বরং চুপ করে থাক। বড় বড় করে নিশ্বাস নাও। আমার মনে হয় তোমার প্লাসেনটা ভাঙতে শুরু করেছে।’

‘আর কত দেরি।’

‘এখনো দেরি আছে। রাত তিনটার আগে কিছু হবে না। রাত তিনটা পর্যন্ত তোমাকে কষ্ট করতে হবে।’

‘এখন ক’টা বাজে?’

‘বারোটা একুশ।’

‘মনে হচ্ছে ঘড়ি চলছেই না।’

আমি উঠে দাঁড়িলাম। কিছু রুটিন কাজ আছে। এগুলি সারতে হবে। নরম্যাল ডেলিভারি হবে, বাচ্চার পজিশন ঠিক আছে। তবু ইমার্জেন্সির জন্যে তৈরি থাকা ভালো।

মেয়েটি বলল, ‘যে জন্যে তোমাকে বসিয়েছিলাম তা এখনো বলিনি। তুমি বস। উঠে দাঁড়ালে কেন? আসল কথা তো বলিনি।’

আমি বসলাম।

মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, ‘ওরা আমার বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে।’

আমি চমকে উঠলাম। এই মেয়ে এসব কী বলছে! প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আবোল-তাবোল বকছে না তো?

‘আমি জানি ওরা আমার বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে।’

‘কারা?’

‘আমার শ্বশুর বাড়ির লোকরা। ডাক্তার, নার্স সবাইকে টাকা দিয়ে কিনে ফেলেছে। তোমাকে কিনবে। তারপর বাচ্চাটাকে মারবে।’

‘তুমি এসব কী বলছ?’

‘যা সত্যি আমি তাই বলছি।’

‘ওরা বাচ্চাটাকে মারবে কেন?’

মেয়েটি জবাব দিল না। ব্যথার প্রবল ঝাপ্টা সামলাবার চেষ্টা করল। আমি তাকে সময় দিলাম। আমার মনে হলো মেয়েটা সম্ভবত পুরোপুরি সুস্থ নয়। হয়তো কিছু অস্বাভাবিকতা তার মধ্যে আছে।

‘তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না। তাই না?’

‘না।’

‘যা সত্যি তাই আমি বললাম।’

‘তুমি জানলে কী করে— ওরা বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে চায়?’

‘আমাকে বলেছে।’

‘কে বলেছে?’

‘আমার বাচ্চাটা আমাকে বলেছে।’

আমি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হলাম মেয়েটার মাথা খারাপ। সম্ভবত সে পারিবারিক জীবনে খুব অসুখী। শ্বশুরবাড়ির কাউকে তার পছন্দ না। সবাইকেই সে শত্রুপক্ষ ধরে নিয়েছে। মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ‘তুমি আমার কথা এক বর্ণও বিশ্বাস করনি, তাই না?’

‘তুমি ঠিকই ধরেছ। বিশ্বাস করার কথা না। তোমার বাচ্চা তোমাকে কী করে বলবে?’

‘ও আমাকে স্বপ্নে বলেছে। একবার না অসংখ্যবার বলেছে।’

‘স্বপ্নে বলেছে?’

‘হ্যাঁ, স্বপ্নে। গত কাল শেষ রাতেও স্বপ্নে দেখেছি।’

‘কী দেখেছ?’

‘দেখলাম আমার বাচ্চাটা আমাকে বলছে— মা, সবাই মিলে আমাকে মেরে ফেলবে। সবাই যুক্তি করে আমাকে মারবে। মা, আমি কী করি?’

বলতে বলতে মেয়েটি থরথর করে কাপতে লাগল।

আমি তাকে বললাম, 'প্রথমবার যে-সব মেয়েরা কনসিভ করে তাদের প্রায় সবাই ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখে। যেমন— তারা মারা যাচ্ছে, মৃত বাচ্চা হচ্ছে— এইসব। এর কোনো মানে নেই। মেয়েরা সেই সময় খুব আতঙ্কগ্রস্ত থাকে বলেই এ রকম স্বপ্ন দেখে।'

'আমি জানি আমি যা স্বপ্নে দেখেছি তা-ই হবে। আমার স্বপ্ন অন্য মেয়েদের স্বপ্নের মতো নয়। সবাই যুক্তি করে আমার ছেলেটাকে মারবে।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'তোমার কোলে যখন ফুটফুটে একটা বাচ্চা দিয়ে দেব তখন তুমি বুঝবে যে কত মিথ্যা সন্দেহ তোমার মধ্যে ছিল।'

মেয়েটার চোখ চিকচিক করতে লাগল। সে গাঢ় স্বরে বলল, 'সত্যি তুমি তাই করবে?'

'অবশ্যই!'

'তা হলে তুমি প্রতিজ্ঞা কর। কোরান শরিফ ছুঁয়ে বল, তুমি বাচ্চাটাকে মারবে না। ওরা যখন মারতে চাইবে তুমি মারতে দেবে না। তুমি ফেরাবে।'

'একটা শিশুকে আমি খুন করব এটা তুমি কী বলছ?'

'তুমি কোরান শরিফ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।'

'প্রতিজ্ঞার কোনো দরকার নেই।'

'দরকার থাকুক বা না থাকুক তুমি প্রতিজ্ঞা কর।'

'কোরান শরিফ এখানে পাবো কোথায়?'

'আমার সঙ্গে আছে। আমার ঐ কালো ব্যাগটার ভেতর। আমি নিয়ে এসেছি।'

রুগিকে শান্ত করবার জন্যেই প্রতিজ্ঞা করতে হলো। রুগি শান্ত হলো না। তার অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। সে চাপা গলায় বলল, 'আমি জানি তুমি প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে না। যদি না রাখ তাহলে আমার অভিশাপ লাগবে। আমি তোমাকে একটা কঠিন অভিশাপ দিচ্ছি।'

মেয়েটি সত্যি সত্যি একটা কঠিন অভিশাপ দিয়ে বসল। মেয়েটার মাথার যে ঠিক নেই, সে যে অসুস্থ একটি মেয়ে তার আরেকটি প্রমাণ পেলাম। তবে তার এই অসুস্থতা, এই মানসিক যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। একটি হাসি-খুশি শিশু তার সমস্ত কষ্ট ভুলিয়ে দেবে।

সবকিছুই ঠিকঠাক মতো চলছিল।

রাত দু'টায় বাইরের দু'জন পুরুষ ডাক্তার এলেন। ডেলিভারির সময় এরা থাকবেন। এঁদের মধ্যে একজন আমার পরিচিত। ডাক্তার সেন। বড় ডাক্তার এবং ভালো ডাক্তার।

আমাদের রুগিণী নতুন ডাক্তার দু'জন দেখেই আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমার হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, 'এরা কারা? এরা আমার

বাচ্চাকে খুন করবে।’

‘আমি বললাম, ‘তুমি নিশ্চিত থাক— আমি সারাক্ষণ এখানে থাকব। এক সেকেন্ডের জন্যে নড়ব না। তা ছাড়া ডাক্তার সেনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তাঁর মতো ডাক্তার কম আছে।’

‘মনে থাকে যেন তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ।’

‘আমার মনে আছে।’

‘প্রতিজ্ঞা ভাঙলে আমার অভিশাপ লাগবে।’

‘আমার মনে আছে।’

তার কিছুক্ষণ পরই ভদ্রমহিলার স্বামী আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। খুবই অল্প বয়স্ক একজন যুবক। তাকে বেশ ভদ্র ও বিনয়ী মনে হলো। তবে যেকোনো কারণেই হোক তাকে বেশ ভীত বলে মনে হচ্ছিল। ভদ্রলোক নরম স্বরে বললেন, ‘আপা আমার স্ত্রী সম্ভবত আপনাকে কিছু বলেছে। আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। ও এসব কেন যে বলেছে কিছু বুঝতে পারছি না। আমাদের বাচ্চাটা সংসারের প্রথম সন্তান। আমি আমাদের পরিবারের বড় ছেলে। অথচ ওর ধারণা...’

আমি ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করবার জন্যে বললাম, ‘আপনি এসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবেন না।’

‘সব ঠিকঠাক আছে তো আপা?’

‘সব ঠিক আছে।’

‘সিজারিয়ান লাগবে না?’

‘না— নরম্যাল ডেলিভারি হবে। তা ছাড়া ডাক্তার সেন এসেছেন। উনি খুবই বড় ডাক্তার এবং হাইলি স্কিলড।’

‘তাহলে আপনি বলছেন সব ঠিকঠাক হবে?’

‘হ্যাঁ।’

রাত তিনটার পর থেকে দেখা গেল সব কেমন বেঠিক চলছে। বাচ্চা নেমে এসেছে বার্থ চ্যানেলের মুখে। এই সময় ডাক্তার সেন বললেন, ‘বাচ্চার পজিসন তো ঠিক নেই। মাথা উপরের দিকে। এতক্ষণ তোমরা কী মনিটর করেছ?’

আমিও দেখলাম— তাই। এ-রকম হওয়ার কথা নয়। কিছুক্ষণ আগেই সব পরীক্ষা করা হয়েছে। আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে লাগল। এই সময় এত রক্তপাতের কোনোই কারণ নেই। টকটকে লাল রক্তের রক্ত— যা ধমনি থেকে আসছে। সমস্যাটা কোথায়?

ব্লাড ক্রস ম্যাচিং করা ছিল— রক্ত দেয়া শুরু হলো কিন্তু এটা সমস্যার কোনো সমাধান নয়। মনে হলো রুগিণী বাইরের রক্ত ঠিক গ্রহণ করতে পারছে না।

ডাক্তার সেন গম্ভীর গলায় বললেন, ‘সামথিং ইজ ভেরি রং। আমাদের

সবার গা দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। ডাক্তার এসব কী বলছেন?’

কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় সমস্যা দেখা দিল— হঠাৎ করে কনট্রেকসান বন্ধ হয়ে গেল। অথচ এই সময়ই কনট্রেকসান সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। শিশুটি কি বার্থ চ্যানেলে মারা গেছে?

রুগিণী ফিসফিস করে বলল, ‘আমার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।’

ডাক্তার সেন ফোরসেপ ডেলিভারির প্রস্তুতি নিলেন। আর তখন ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। আজকাল বাতি চলে গেলেই ইমার্জেন্সি বাতি জ্বলে উঠে— তখনকার অবস্থা তা ছিল না। তবে আমাদের কাছে টর্চ, হ্যাজাক, মোমবাতি সব সময় থাকে। সমস্যার সময় ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়া কোনো নতুন ঘটনা নয়— কাজেই প্রস্তুতি থাকবেই। দ্রুত হ্যাজাক জ্বালান হলো।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরিশ্রম করে ডাক্তার সেন ডেলিভারি করালেন— যে জিনিসটি বেরিয়ে এল আমরা চোখ বড় বড় করে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

কুৎসিত কদাকার একটা-কিছু যার দিকে তাকানো যায় না। এ আর যা-ই হোক মানবশিশু নয়। চেনা-জানা পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। ঘন কৃষ্ণবর্ণের একতাল মাংসপিণ্ড। এর থেকে হাতির শৃঙ্গের মতো আট-দশটি গুঁড় বেরিয়ে এসেছে। গুঁড়গুলি বড় হচ্ছে এবং ছোট হচ্ছে। তালে তালে মাংসপিণ্ডটিও বড়-ছোট হচ্ছে। মানবশিশুর সঙ্গে এর একটিমাত্র মিল— এই জিনিসটিরও দুটি বড় বড় চোখ আছে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে দেখছে চারদিকের পৃথিবীকে। চোখ দুটি সুন্দর। কাজল টানা।

ডাক্তার সেন হতভম্ব গলায় বললেন, ‘হোয়াট ইজ দিস? হোয়াট ইজ দিস?’ ফোরসেপ দিয়ে ধরা জন্তুটাকে তিনি মাটিতে ফেলে দিলেন। মেঝেতে সে কিলবিল করতে লাগল। মনে হচ্ছে গুঁড়গুলিকে পায়ের মতো ব্যবহার করে সে এগুতে চাচ্ছে। আমার সঙ্গে সহকর্মী হঠাৎ পেটে হাত দিয়ে বমি করতে শুরু করল।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে রুগিণীর জ্ঞান নেই। জ্ঞান থাকলে এই ভয়াবহ দৃশ্য তাকে দেখতে হতো।

ডাক্তার সেন বললেন, ‘কিল ইট। এফুনি এটাকে মেরে ফেলা দরকার।’

জন্তুটি কি মানুষের কথা বুঝতে পারে? ডাক্তার সেনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র ও তীক্ষ্ণ শব্দ বের হলে এল। অত্যন্ত হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড যা মানুষের স্নায়ুকে প্রচণ্ড ঝাঁকি দেয়।

ডাক্তার সেন বললেন, ‘অপেক্ষা করছেন কেন? কিল ইট।’

জন্তুটি এগুতে শুরু করেছে। গুঁড়গুলি বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে, আর সে এগুচ্ছে তার মা’র দিকে। আমরা দেখছি সে মেঝে বেয়ে বেয়ে তার মা’র খাটের দিকে যাচ্ছে— খাট বেয়ে উপরে উঠছে। আশ্রয় খুঁজছে মা’র কাছে।

যেন সে জেনে গেছে এই করুণ পৃথিবীতে একজনই শুধু তাকে পরিত্যাগ করবে না।

ডাক্তার সেন বললেন, ‘আপনারা অপেক্ষা করছেন কেন? কিল ইট।’

আবার আগে মতো শব্দ হলো। জন্তুটি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডাক্তার সেনের দিকে। তার চোখ দু’টি মানুষের চোখ। সেই চোখের ভাষা আমরা জানি। সেই চোখ করুণা এবং দয়া ভিক্ষা করছে। কিন্তু করুণা সে আমাদের কাছ থেকে পাবে না। আমরা মানুষ। আমরা আমাদের মাঝে তাকে গ্রহণ করব না। এই ভয়ঙ্কর অসুন্দর ও কুৎসিতকে আমরা আশ্রয় দেব না। সে পশু হয়ে এলে ভিন্ন কথা ছিল। সে পশু হয়ে আসেনি। মানুষের সিঁড়ি বেয়ে এসেছে।

ডাক্তার সেন বললেন, ‘এই জন্তুটিকে যে মেরে ফেলতে হবে, এ বিষয়ে কি আপনাদের কারো মনে কোনো দ্বিধা আছে?’

আমরা সবাই বললাম, ‘না, আমাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই।’

ডাক্তার সেন বললেন, ‘আপনারা কি মনে করেন এই জন্তুটি হত্যার আগে তার আত্মীয়-স্বজনদের মত নেয়া উচিত?’

আমরা বললাম, ‘না, আমরা তাও মনে করি না।’

যে লোহার দণ্ডটি থেকে স্যালাইন ওয়াটারের ব্যাগ ঝুলছিল আমি তা খুলে হাতে নিলাম। জন্তুটি এখন তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কী সুন্দর বড় বড় শান্ত চোখ! কী আছে ঐ চোখে? ঘৃণা, দুঃখ, হতাশা? জন্তুটি খাটের পা বেয়ে অর্ধেক উঠে গিয়েছিল। সেখানেই সে থেকে গেল। বোধহয় বুঝতে পেরেছে আর উঠে লাভ নেই।

প্রথম আঘাতটি করলাম আমি।

সে অবিকল মানুষের মতো গলায় ডাকল— ‘মা, মা।’

তার মা সাড়া দিল না।

আমরা দেখছি একটি দানবকে। সেও তার করুণ চোখে একদল দানবকেই দেখছে।

আমার হাত থেকে লোহার রডটি পড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার সেন তা কুড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। হত্যাকাণ্ডে বেশি সময় লাগল না।

ডাক্তার হাসনা বেগমকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘এই ঘটনার কি কোনো ব্যাখ্যা আপনি দাঁড় করাতে পারেন?’

ডাক্তার হাসনা ক্লান্ত গলায় বলেছিলেন, ‘আমার কাছে কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে এই ঘটনার প্রায় সাত বছর পর আমেরিকান জার্নাল অব মেডিক্যাল সোসাইটিতে এ-রকম একটি শিশুর জন্ম বৃত্তান্তের কথা পাই। শিশুটির জন্ম হয়েছিল বলিভিয়ার এক গ্রামে। শিশুটির বর্ণনার সঙ্গে আমাদের জন্তুটির বর্ণনা হুবহু মিলে যায়। ঐ শিশুটিকেও জন্মের কুড়ি মিনিটের মাথায় হত্যা করা হয়

এবং রিপোর্ট অনুসারে সেও মৃত্যুর আগে ব্যাকুল হয়ে বলিভিয়ান ভাষায় মা'কে কয়েক বার ডাকে।'

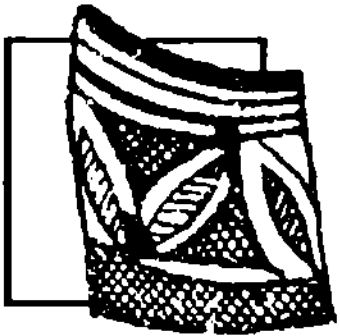
‘না। তবে আমার একটা হাইপোথিসিস আছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় প্রকৃতি ইভোলিউসন প্রক্রিয়ায় হয়তো নতুন কোনো প্রাণ সৃষ্টির কথা ভাবছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। আমরা প্রাণপণে সেই প্রক্রিয়াকে বাধা দিচ্ছি।’

‘আপনার ধারণা এ রকম ঘটনা আরো ঘটবে?’

‘হ্যাঁ। প্রকৃতি সহজে হাল ছাড়ে না। সে চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং সে লক্ষ রাখবে যাতে ভবিষ্যতে আমরা বাধা দিতে না পারি। ঐ যে মা আগে স্বপ্ন দেখলেন, তার একটিই ব্যাখ্যা— প্রকৃতি শিশুটি রক্ষার চেষ্টা করছে। এক ধরনের প্রোটেকশান দেবার চেষ্টা করছে। এখন সে পারছে না, তবে ভবিষ্যতে সে নিশ্চয়ই আরো কোনো ভালো প্রোটেকশানের ব্যবস্থা করবে।’

‘আপনি কি আপনার হাইপোথিসিস বিশ্বাস করেন?’

ডাক্তার হাসনা বানু জবাব দিলেন না। তাঁর কাছে এই প্রশ্নের জবাব নেই। জবাব থাকার কথাও নয়। কিছু-কিছু সময় আসে তখন আমরা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সীমারেখায় বাস করি। তখন একই সঙ্গে আমরা দেখতে পাই ও দেখতে পাই না। বুঝতে পারি ও বুঝতে পারি না। অনুভব করি এবং অনুভব করি না। সে বড় রহস্যময় সময়।



খেলা

খায়রুন্নেসা গার্লস হাই স্কুলের থার্ড স্যার, বাবু নলিনি রঞ্জন একদিন দুপুরবেলা দাবা খেলা শিখে ফেললেন। এই খেলাটি তিনি দু'চোখে দেখতে পারতেন না। দু'জন লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা বোর্ডের দিকে বিরক্তিকর ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকবে— মানে হয় কোনো? তবুও তাঁকে খেলাটা শিখতে হলো। জালাল সাহেব জিওগ্রাফি স্যার, তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু। জালাল সাহেবের কথা ফেলতে পারলেন না। টিফিন টাইমে তিনি শিখলেন বড়ে কীভাবে চলে, ঘোড়া কী করে আড়াই ঘরের লাফ দেয়, গজ গুঁড় উঁচু করে কোনাকুনি দাঁড়িয়ে থাকে। জালাল

সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ব্রেইনের খেলা, বুঝলে পণ্ডিত? বুদ্ধির চর্চা হয়।'

বুদ্ধির চর্চা কী করে হয় নলিনি বাবু সেটা ঠিক বুঝতে পারলেন না কিন্তু প্রথম খেলাতেই জালাল সাহেবকে হারিয়ে দিলেন। জালাল সাহেব ফ্যাকাশেভাবে হাসতে হাসতে বললেন, 'হেলাফেলা করে খেলেছি বলে এই অবস্থা। হবে নাকি আরেক দান?'

আরেক দানের সময় ছিল না। ফোর্থ পিরিয়ডে ইংলিশ কম্পজিশন। নলিনি বাবু উঠে পড়লেন। ক্লাসে ভালো পড়াতে পারলেন না। মাথার মধ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে দাবা খেলাটি ঘুরতে লাগল। এ রকম তাঁর কখনো হয় না।

ছুটির পর দু'হাত খেলা হলো। জালাল সাহেব শুকনো হাসি হেসে বললেন, 'তোমার সঙ্গে দেখি চিন্তাভাবনা করে ডিফেনসিভ খেলা দরকার।'

তৃতীয় খেলাটিতে জালাল সাহেব প্রচুর চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। তাঁর আছরের নামাজ ক্বাজা হয়ে গেল। খেলা চলল সন্ধ্যা পর্যন্ত। দফতরি বাচ্চু মিয়া ঘর বন্ধ করতে না পেরে অত্যন্ত বিরক্ত মুখে বারান্দায় হাঁটু হাঁটু করতে লাগল। খেলা শেষে জালাল সাহেব ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেললেন। নলিনি বাবু বললেন, 'তুমি দেখি মনমরা হয়ে গেছ।'

জালাল সাহেব বললেন, 'আরেক হাত খেল। লাস্ট দান। এইবার আর পারবে না— খুব ডিফেনসিভ খেলব।'

'আজ থাক। টুইশনি আছে।'

'কতকক্ষণ আর লাগবে, খেল দেখি।'

শেষ খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হলো। জালাল সাহেব ঘনঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। নলিনি বাবু বললেন, 'চল যাওয়া যাক।'

'আরেক হাত খেল।'

'আর না, রাত হয়েছে।'

'খেল তো, রাত বেশি হয় নাই।'

নলিনি বাবু আবার বসলেন। তাঁর জয়যাত্রা শুরু হলো। নিয়ামতপুরের লোকজন কিছুদিনের মধ্যেই জেনে গেল এ শহরে অসম্ভব ভালো একজন দাবাড়ু আছেন। তাঁকে কেউ হারাতে পারে না। তাঁর সেই খ্যাতি পরের পনেরো বছর পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রইল।

পনেরো বছর দীর্ঘ সময়। এই সময়ে তাঁর দুটি দাঁত পড়ল, বাঁ চোখের ছানি পড়ল। এবং তিনি এ্যাসিস্টেন্ট হেড মাস্টার হিসেবে শ্রাবণ মাসের এক মেঘলা দুপুরে রিটায়ার করলেন। তাঁর বিদায় উপলক্ষে মানপত্রে বলা হলো—

'বাবু নলিনি রঞ্জন দাবার জগতের একজন মুকুটহীন সম্রাট। তিনি বাংলাদেশে দাবার চ্যাম্পিয়ন জনাব আসাদ খাঁকে পরপর তিন বার পরাজিত করে দাবার জগতে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।'

কথাটা সত্যি। আসাদ খাঁর শালীর বাড়ি নিয়ামতপুর। তিনি কোনো এক

অশুভ ক্ষণে শালীর বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন এবং কৌতূহলী হয়ে খেলতে বসেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল মফস্বলে যা হয়ে থাকে মোটামুটি ধরনের একজন খেলোয়াড়কে নিয়ে সবাই মাতামাতি করে— এও সে রকম। খেলতে বসেও তাঁর সে ভুল ভাঙল না। তিনি দেখলেন রোগা এবং বেঁটে এই লোকটি ওপেনিং সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। যারা সাধারণ দু' একটা বইটাই পড়েছে তারাও যেসব জানে, এ লোকটি স্বভাবিক কারণেই সেসব কিছু জানে না। যার ফলে পঞ্চম চালের মাথায় আসাদ খাঁ নলিনি বাবুর রাজার সমানের বড়েটি নিয়ে নিলেন। তিনি অবহেলার একটা হাসিও হাসলেন। কিন্তু সে হাসি তাঁর ঠোঁটে ঝুলে পড়ল যখন দেখলেন কৃশকায় এই লোকটি তার দুটি ঘোড়া নিয়ে হঠাৎ করেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আসাদ খাঁ খুবই অবাক হলেন, কিন্তু নিয়ামতপুরের লোকজন এমন ভাব করতে লাগল যে নলিনি বাবুর কাছে হারার মধ্যে অবাক হবার কিছু নেই।

আসাদ খাঁর সে-বছর শালীর বাড়ি বেড়াতে আসার সমস্ত আনন্দ ধুয়ে-মুছে গেল। নেত্রকোনা থেকে প্রকাশিত একটি পাক্ষিক পত্রিকায় লেখা হলো— নিয়ামতপুর নিবাসী প্রবীণ দাবাড়ু খায়রুন্নেসা গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষক বাবু নলিনি রঞ্জন বাংলাদেশ দাবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়াছেন। উল্লেখ যে, নিয়ামতপুরের গৌরব এই কীর্তিমান দাবাড়ু বিগত দশ বৎসরে কাহারও নিকট পরাজিত হন নাই।

ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্যি নলিনি বাবু শুধু জিতেই গেছেন। অনেক দূর দূর থেকে লোকজন খেলতে আসতো তাঁর সঙ্গে। একবার দাবা ফেডারেশনের সেক্রেটারি এক বিদেশীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। এতবড় ঘটনা নিয়ামতপুরে আর ঘটেনি। যারা দাবা খেলার কিছুই বুঝে না, তারাও এসে ভিড় করল। টিফিনের পর খায়রুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল ছুটি হয়ে গেল। ফেডারেশনের সেক্রেটারি দু'বার বললেন, 'আপনি খুব সাবধানে খেলবেন। যাকে নিয়ে এসেছি তিনি বেলজিয়ামের লোক। খুব উঁচুদরের খেলোয়াড়।'

'আমি সাবধানেই খেলি।'

'তাড়াহুড়া করে চাল দেবার দরকার নেই, বুঝলেন?'

নলিনি বাবু মাথা নাড়লেন, বুঝেছেন।

'এঁর সঙ্গে গিয়াকো পিয়ানো ডিফেন্স খেলাই ভালো। সেই ডিফেন্স জানেন তো?'

'জি না। জানি না।'

সেক্রেটারি সাহেবের জ্র কুণ্ঠিত হলো। সেই কুণ্ঠন আরো গাঢ় হলো যখন দেখলেন, নলিনি বাবু পিকে ফোর-এর উত্তরে আর ফোর দিয়ে বসে আছেন।

'কী করছেন আপনি? এঁর সঙ্গে এক্সপেরিমেণ্ট করছেন নাকি? এটা কী দিলেন?'

সাহেবটিও ইংরেজিতে কি যেন বলল। বাবু নলিনি রঞ্জন ইংরেজির শিক্ষক, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলেন না। সেক্রেটারি সাহেব মুখ কালো করে বললেন, ‘প্রশিক্ষণহীন প্রতিভা দেখাতে নিয়ে এসে বড় বেইজ্জতির মধ্যে পড়লাম দেখি।’

খেলা হলো তিনটি। একটি ড্র হলো, দু’টিতে নলিনি বাবু জিতে গেলেন। সেক্রেটারি সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

‘আপনি টাকায় খেলতে আসেন না কেন?’

‘টুইশনি আছে। তা ছাড়া শরীরটা ভালো না। হাঁপানি।’

‘আরে না না। আপনি আসবেন ভাই।’

‘দরিদ্র মানুষ, টাকাপয়সা নাই।’

‘আরে আপনি আবার কীসের দরিদ্র?’

সেক্রেটারি সাহেব জড়িয়ে ধরলেন নলিনি বাবুকে।

কাজেই শ্রাবণ মাসের মেঘলা দুপুরে বাবু নলিনি রঞ্জনের বিদায় সংবর্ধনায় বারবার ঘুরে-ফিরে দাবার কথা এল। এবং সভার শেষে সভাপতি, স্কুল কমিটির সেক্রেটারি ও পৌরসভার চেয়ারম্যান সুরজ মিয়া অত্যন্ত রহস্যময় ভঙ্গিতে ঘোষণা করলেন যে, নিয়ামতপুরের গৌরব দাবার অপরাজেয় নক্ষত্র বাবু নলিনি রঞ্জনের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তিনি একটি ব্যবস্থা করেছেন। পনেরো হাজার টাকার একটি চেক দিচ্ছেন স্কুল ফান্ডকে। যদি কেউ নলিনি বাবুকে হারাতে পারে তাহলে তাকে এই টাকাটি দেয়া হবে। আর যদি কেউ হারাতে না পারে, তাহলে স্কুল ফান্ড নলিনি বাবুর মৃত্যুর পর এই টাকাটা পাবে।

সভায় তুমুল করতালি হয়। হেড মাস্টার সাহেবকে পনেরো হাজার টাকার চেকটি উঁচু করে সবাইকে দেখাতে হলো। সুরজ মিয়া যে এমন একটি নাটকীয় ব্যাপার করতে পারেন তা কারোর কল্পনাতেও আসেনি।

আশ্বিন মাসের এক সন্ধ্যায় নলিনি বাবুর হাঁপানির টান খুব প্রবল হলো। বাতাস তার কাছে ক্ষীণ মনে হলো। ফুসফুস ভরাবার জন্যে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর গলার কাছে একটি রগ বারবার ফুলে উঠতে লাগল। এই অবস্থাতেও তিনি তাঁর জীবনের শেষ খেলাটি খেলতে বসলেন। এই খেলাটি তিনি খেলবেন হারবার জন্যে। তিনি আজ হারবেন তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু জালাল সাহেবের কাছে। জালাল সাহেব পনেরো হাজার টাকা জিতে নেবেন। সেই টাকায় নলিনি বাবুর চিকিৎসা হবে। শীতের জন্যে গরম কিছু কাপড় কিনবেন, শীতে বড় কষ্ট হয় তাঁর। বহু কষ্টে জালাল সাহেব নলিনি বাবুকে এই প্রস্তাবে রাজি করিয়েছেন। একটি পরাজয়ে কিছুই যায় আসে না।

খেলা হচ্ছে স্কুলঘরে। জালাল সাহেব চ্যালেঞ্জের খেলা খেলছেন। অনেকেই এসেছে কৌতূহলী হয়ে। নলিনি বাবুর অবস্থা খারাপ হতে লাগল।

একটা ভুল চালে তাঁর গজ খোয়া গেল। তার কিছুক্ষণ পর একটা নৌকা পিনড হয়ে গেল। অস্ফুট গুঞ্জন উঠল চারদিকে। নলিনি বাবু দেখলেন জালাল সাহেবের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। পনেরো বছরের অপরাজেয় দাবা চ্যাম্পিয়ন আজ পরাজিত হতে যাচ্ছেন। জালাল সাহেবের মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ। চাল দেবার সময় তাঁর হাত কাঁপতে লাগল।

হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সোবহান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘নলিনি বাবুর অবস্থা তো খুব খারাপ।’

জালাল সাহেব ধরা গলায় বললেন, ‘সব আমাদের নলিনির ভান। দেখবেন এখুনি সব ঠিক করে ফেলবে।’

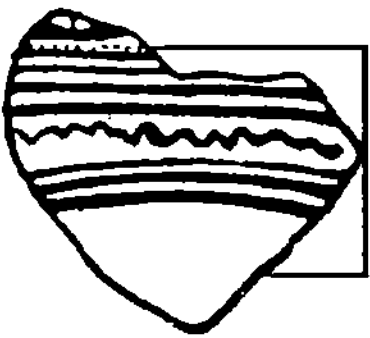
নলিনি বাবু ক্ষীণস্বরে বললেন, ‘তুমি কাঁদছ নাকি জালাল?’

‘না। চোখে কি যেন পড়ল।’

জালাল সাহেব চোখের সেই অদৃশ্য জিনিসটি বের করবার জন্যে চোখ কচলাতে লাগলেন।

ক্ষীণ একটি হাসির রেখা কি দেখা গেল নলিনি বাবুর ঠোঁটে? তিনি ঘোড়ার একটি কিস্তি দিলেন। রাজা সরে এল এক ঘর। দ্বিতীয় কিস্তি দিলে বড়ে দিয়ে। রাজা আরো এক ঘর সরল। নলিনি বাবু যেন অদৃশ্য কোনো নগরী থেকে তাঁর কালো গজটি বের করে আনলেন। সোবহান সাহেব বিস্মিত হয়ে বলেন, ‘কী সর্বনাশ! নলিনি বাবু গজটা বড়ের মুখে এগিয়ে দিয়ে বললেন কিস্তি।’

জীবনের শেষ খেলাটিতে বহু ঝুটকা করেও তিনি হারতে পারলেন না। সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় প্রায় ক্রিয়াকলাপে নিয়ামতপুরের গৌরবের মৃত্যু হলো— ১২ নভেম্বর ১৯৭৫ সন। রোজ মঙ্গলবার। খায়রুনুসা গার্লস স্কুল সে উপলক্ষে দু’দিন ছুটি থাকল।



কল্যাণীয়াসু

ট্রেটয়াকভ আর্ট গ্যালারিতে দেখতে গিয়েছিলাম পুরানো দিনের মহান সব শিল্পীদের আঁকা ছবি। দেখতে দেখতে এগুচ্ছি। হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো। সঙ্গে রাশিয়ার গাইড বলল, ‘কি হয়েছে?’

আমি হাত উঁচিয়ে একটি পেইনটিং দেখালাম। প্রিন্সেস তারাকনোভার পেইনটিং। অপূর্ব ছবি।

জরী, ছবিটি দেখে তোমার কথা মনে পড়ল। গাইড বলল, ‘সেন্ট পিটার্সবার্গ জেলে প্রিন্সেসের শেষ দিনগুলি কেটেছে। ঐ দেখ সেলের অন্ধকূপে কি করে বন্যার পানি ঢুকছে। দেখ, প্রিন্সেসের চোখে-মুখে কী গভীর বিষাদ! প্রগাঢ় বেদনা!’

আমি কথা বললাম না। অভিভূত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। গাইড বলল, ‘এসো পাশের কামরায় যাই।’

আমি নড়লাম না। মৃদু গলায় বললাম, ‘মিঃ যোখভ আজ আর কিছু দেখব না? চল, কোথায়ও বসে চা খাওয়া যাক।’

দু’জনে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। ভীষণ শীত বাইরে। রাস্তাঘাট ফাঁকা ফাঁকা। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া মোটা ওভারকোট ভেদ করে শরীরে বিঁধছে। আমার সঙ্গী হঠাৎ জানতে চাইলে, তোমার কি শরীর খারাপ করছে?

‘না।’

‘আর্ট গ্যালারি কেমন দেখলে?’

‘চমৎকার! অপূর্ব!’

আমি চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বললাম, ‘তোমাদের প্রিন্সেস তারাকনোভাকে দেখে আমার এক পরিচিতা মহিলার কথা খুব মনে পড়ছে।’

গাইড কৌতূহলী হয়ে বলল, ‘কে সে? নাম জানতে পারি?’

‘জরী তার নাম।’

যোখভ বিস্মিত হয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি মনে-মনে বললাম, ‘প্রিন্সেস জরী। প্রিন্সেস জরী।’

জরী, রাজকুমারীর ছবি দেখে আজ বড় অভিভূত হয়েছি। হঠাৎ করে তোমাকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছা করছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মন সঁয়াতসঁয়াতে হয়ে গেছে। ক্রমাগতই নস্টালজিক হয়ে পড়ছি। ঘুম কমে গেছে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। ঘনঘন কফি খাই। চুরুটের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠে। শেষ রাতের দিকে ঘুমুতে গিয়ে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। পরশু রাতে কি স্বপ্ন দেখলাম জান? দেখলাম, আমাদের নীলগঞ্জ যেন খুব বড় একটা মেলা বসেছে। বাবার হাত ধরে মেলা দেখতে গিয়েছি (ইশ! কত দিন পর বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম)। বাবা বললেন, ‘খোকা নাগরদোলায় চড়বি?’ আমি যতই না করি তিনি ততই জোর করেন। তারপর দেখলাম, ভয়ে আমি থরথর করে কাঁপছি আর শাঁ-শাঁ শব্দে নাগরদোলা উড়ে চলছে। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকা ছাড়িয়ে দূরে দূরে আরো দূরে। ঘুম ভেঙে দেখি চোখের জলে বালিশ ভিজে গেছে। চল্লিশ বছর বয়সে কেউ কি এমন করে কাঁদে?

আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি জরী। আজকাল খুব নীলগঞ্জে চলে যেতে ইচ্ছে

করে। ইচ্ছে করে আগের মতো সন্ধ্যাবেলা পুকুরঘাটে বসে জোনাকি পোকার আলো জ্বালা দেখি।

মস্কোতে আজ আমার শেষ রাত। আগামী কাল ভোর চারটায় রওনা হব রুমানিয়ায়। খুব কষ্ট করে এক মাসের ভিসা যোগাড় করেছি। এই এক মাস খুব ঘুরে বেড়াব। তারপর ফিরে যাব মন্ট্রিলে নিজ আস্তানায়। বেশ একটা গতির জীবন বেছে নিয়েছি, তাই না? অথচ ছোটবেলা এই আমিই হোস্টেলে যাবার সময় হলে কি মন খারাপ করতাম। হাসু চাচা আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসে লাল গামছায় ঘনঘন চোখ মুছত। ধরা গলায় বলত, বড় মিয়া চিঠি দিয়েন গো।

আমার মনে হতো— দূর ছাই, কী হবে পড়াশুনা করে। বাবা, হাসু চাচা এদের ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারব না।

প্রবল ঘরমুখো টান ছিল বলেই আজ হয়তো যাযাবর বৃত্তি বেছে নিতে হয়েছে। তাই হয়, তোমার জন্যে প্রবল তৃষ্ণা পুষেছিলাম বলেই কি তোমাকে পাইনি? টেনটেলাসের গল্প জান তো? তার চারদিকে পানির থৈ-থৈ সমুদ্র অথচ তাকেই কিনা আজীবন তৃষ্ণার্ত থাকতে হলো।

জরী, তোমার কি মনে আছে বিয়ের পরদিন তোমাকে নিয়ে যখন নীলগঞ্জ আসি তুমি ট্রেনের জানালায় মুখ রেখে খুব কেঁদেছিলে। তখন কার্তিকের শুরু। ধানিরঙের রোদে ঝলমল করছে চারদিক। হালকা হিমেল বাতাস। মনে আছে সে সব কথা? আমি বলেছিলাম, মধ্যাহ্ন ভেতরে টেনে নাও জরী। কয়লার গুঁড়ো এসে চোখে পড়বে। তুমি কলমে পড়ক।

কামরায় আমরা দু'টি মাত্র প্রাণী। বরযাত্রীরা আমাদের একা থাকবার সুযোগ দিয়ে অন্য কামরায় উঠেছে। ট্রেন ছুটে চলেছে ঝিকঝিক করে। বাতাসে তোমার লালচে চুল উড়ছে।

কি-একটা সেক্ট মেখেছ। চারপাশে তার চাপা সৌরভ। আমি গাড়ি স্বরে বলেছিলাম, ছিঃ! জরী এত কাঁদছ কেন? কথা বল। আমার কথায় তুমি কি মনে করেছিলে কে জানে। অনেকক্ষণ আমার চোখে চোখে তাকিয়ে কি মনে করে যেন হেসে ফেললে। হেসে ফেলেই লজ্জা পেয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললে। সেইদিন কি গভীর আনন্দ আমাকে অভিভূত করেছিল। মনে হয়েছিল রহস্যমণ্ডিত এই রমণীটিকে পেয়েছি।

গৌরীপুরে গাড়ি অনেকক্ষণ হল্ট করল। একজন অন্ধ ভিখারি একতারা বাজিয়ে আমাদের কামরার সামনে খুব গান গাইতে লাগল, “ও মনা এই কথাটি না জানলে প্রাণে বাঁচতাম না।”

তুমি অবাক হয়ে বললে, কী সুন্দর গায়! তারপর দু'টি টাকা বের করে দিলে। ট্রেন ছাড়তেই জানালা দিয়ে অনেকখানি মাথা বের করে বললে, দেখুন দেখুন, কতগুলি বক একসঙ্গে উড়ে যাচ্ছে।

বক নয়। শীতের শুরুতে ঝাঁক বেঁধে বালিহাঁস উড়ে আসছিল। আগে দেখনি কখনো, তাই খুব অবাক হয়েছিলে। আমি বলেছিলাম, বক নয় জরী। ওগুলি বালিহাঁস। আর শোন, আপনি আপনি করছ কেন? আমাকে তুমি করে বলবে।

ঐ হাঁসগুলি কোথায় যাচ্ছে?

বিলের দিকে।

আপনাদের নীলগঞ্জে বিল আছে?

আবার আপনি?

তুমি হেসে বললে, নীলগঞ্জে বিল আছে?

আমি বললাম, বল, তোমাদের নীলগঞ্জে বিল আছে?

তুমি মুখ ফিরিয়ে হাসতে শুরু করলে। আমার মনে হলো সুখ কোনো অলীক বস্তু নয়। এর জন্যে জীবনব্যাপী কোনো সাধনারও প্রয়োজন নেই। প্রভাতের সূর্যকিরণ বা রাতের জ্যোৎস্নার মতোই এও আপনাকেই আসে।

কিন্তু প্রিন্সেস তারাকনোভার ছবি দেখতে গিয়ে উল্টো কথা মনে হলো। মনে হতো সুখটুকু বলে কিছু নেই। নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ নিয়ে আমাদের কারবার। চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম হতাশ রাজকুমারী পিটার্সবার্গের নির্জন সেলে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন। হু-হু করে বন্যার জল ঢুকছে ঘরে। রাজকুমারীর ঠোঁটের কোনায় কান্নার মতো অদ্ভুত এক হাসি ফুটে রয়েছে।

ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় মনে হলো রাজকুমারীকে খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। জরীর মুখের আদল আসছে নাকি? পরমুহূর্তেই ভুল ভাঙল। না জরীর সঙ্গে এ মুখের কোনো মিল নাই। জরীর মুখ গোলগাল। একটু আদুরে ভাব আছে। আর রাজকুমারীর মুখটি লম্বাটে ও বিষণ্ণ। মনে আছে জরী, একবার তোমার একটি পোটেট করেছিলাম। কিছুতেই মন ভরে না। ব্রাশ ঘষি আবার চাকু দিয়ে চেঁছে রঙ তুলে ফেলি। দু'মাসের মতো সময় লাগল ছবি শেষ হতে। পোটেট দেখে তুমি হতভম্ব। অবাক হয়ে বললে, ও আল্লা চোখে সবুজ রঙ দিয়েছ কেন? আমার চোখ বুঝি সবুজ? আমি বললাম, একটু দূর থেকে দেখ।

তুমি অনেকটা দূরে সরে গেলে এবং চোঁচিয়ে বললে, কী সুন্দর! কী সুন্দর!

ছবি আঁকিয়ে হিসেবে জীবনে বহু পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু সেদিনকার সেই মুগ্ধ কণ্ঠ এখনো কানে বাজে।

সেই পোটেটটি অনেকদিন আমার কাছে ছিল। তারপর বিক্রি করে দিলাম। ছবি দিয়ে কী হয় বল? তার উপর সেবার খুব টাকার প্রয়োজন হলো। মিলানে গিয়েছি বন্ধুর নিমন্ত্রণে। গিয়ে দেখি বন্ধুর কোনো হৃদিস নেই। ক'দিন আগেই নাকি বিছানাপত্র নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। কী করি, কী করি! সঙ্গে সম্বলের মধ্যে আছে ত্রিশটি আমেরিকান ডলার আর মন্ড্রিলে ফিরে যাবার

একটি টুরিস্ট টিকিট। এর মধ্যে আবার আমার পুরানো অসুখ বুকে ব্যথা শুরু হলো। সস্তা দরের এক হোটেলে উঠলাম। তবুও দু'দিন যেতেই টাকাপয়সা সব শেষ। ছবি বিক্রি ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

এক সন্ধ্যায় বড় রাস্তার মোড়ে ছবি টাঙিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগলাম। কারোর যদি পছন্দ হয় কিনবে। ছবির মধ্যে আছে দু'টি ওয়াটার কালার আর তেল রঙে আঁকা তোমার পোট্রেট। ছবিগুলির মধ্যে 'নীলগঞ্জের জ্যোৎস্না' নামের অপূর্ব একটি ওয়াটার কালার ছিল। আমাদের বাড়ির পেছনে চার-পাঁচটা নারকেল গাছ। দেখনি তুমি? ঐ যে পুকুরপাড়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়েছিল। এক জ্যোৎস্না রাত্রিতে পুকুরের কালো জলে তাদের ছায়া পড়েছিল— তারই ছবি। চোখ ফেরানো যায় না এমন। অথচ বিক্রি হলো। শুধু তোমার পোট্রেটটি এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা কিনলেন। তিনি হুঁচকিতে বললেন, 'কেন এই পোট্রেটটা কিনলাম জান?'

'না ম্যাডাম।'

'আমি যখন কিশোরী ছিলাম তখন এই ছবিটিতে যে মেয়েটিকে তুমি এঁকেছ তার মতো সুন্দর ছিলাম, তাই কিনলাম।'

আমি হেসে বললাম, 'আপনি এখনো সুন্দর।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'এসো না আমার ঘরে। কফি করে খাওয়াব। এমন কফি সারা মিলান শহরে খুঁজেও পাবে না।'

ভদ্রমহিলা আশাতীত দাম দিলেন ছবির। শুধু কফি নয়, রাতের খাবার খাওয়ালেন। তাঁর অল্পবয়েসি নান্নন ছবি দেখালেন। সবশেষে পিয়ানো বাজিয়ে খুব করুণ একটি গান গাইলেন যার ভাব হচ্ছে— 'হে প্রিয়তম, বসন্তের দিন শেষ হয়েছে। ভালোবাসামিমা দিয়ে সে দিনকে দূরে রাখা গেল না।'

নিজের হাতে তোমার ছবি টানালাম। কোথাকার ইটালির মিলান শহরের এক বৃদ্ধা মহিলা। তাঁর ঘরে তোমার হাসিমুখের ছবি ঝুলতে লাগল। কেমন অবাক লাগে ভাবতে। একশ' বছর পর এই ছবিটি হয়তো অবিকৃতই থাকবে। বৃদ্ধার নাতি-নাতনীরা ভাববে, একটি কার পোট্রেট? এখানে কীভাবে এসেছে?

ফেরার পথে বৃদ্ধার হাতে চুমু খেললাম। মনে-মনে বললাম, আমার জরী যেন তোমার কাছে সুখে থাকে।

আমরা সব সময় সুখে থাকার কথা বলি। যতবার নীলগঞ্জ থেকে ঢাকার হোস্টেলে যেতাম— বাবা বলতেন, 'সুখে থাক'। তুমি যখন লাল বেনারসিতে মুখ ঢেকে ট্রেনে উঠলে তোমার মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, সুখে থাক।

জরী, আমার কাছে তুমি সুখে ছিলে না? কীসে একটি মানুষ সুখী হয়? নীলগঞ্জে আমাদের প্রকাণ্ড বাড়ি দেখে তোমার কি মন ভরে উঠেনি? তুমি কি অবাক হয়ে চোঁচিয়ে উঠনি, ওমা এ যেন রাজপ্রাসাদ! জ্যোৎস্না রাত্রিতে হাতধরাধরি করে যখন আমরা পুকুরপাড়ে বেড়াতে যেতাম তখন কি গভীর

আবেগ তোমাকে এতটুকু আচ্ছন্ন করেনি? তোমাকে আমি কী দেইনি জরী?
নিরবচ্ছিন্ন ভালোবাসার দেয়ালে তোমাকে ঘিরে রেখেছিলাম। রাখিনি?

তবু এক রাত্রিতে তুমি বিছানা ছেড়ে চুপিচুপি ছাদে উঠে গেলে। আমি দেখলাম, তুমি পাথরে মূর্তির মতো কার্নিস ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছ। বুক ধবক করে একটা ধাক্কা লাগল। বিস্মিত হয়ে বললাম, কী হয়েছে জরী?

তুমি খুব স্বভাবিক গলায় বললে, কই কিছু হয়নি তো। তারপর নিঃশব্দে নিচে নেমে এলে।

তোমার মধ্যে গভীর একটি শূন্যতা ছিল। আমি তা ধরতে পারিনি। শুধু বুঝতে পারছিলাম তোমার কোনো কিছুতেই মন লাগছে না। সে সময় ‘এসো নীপবনে’ নাম দিয়ে আমি চমৎকার একটি পেইন্টিং করছিলাম। আকাশে আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ। একটি ভাঙা বাড়ির পাশে একটি প্রকাণ্ড ছায়াময় কদমগাছ— এই নিয়ে আঁকা। আমার শিল্পীজীবনের ভালো ক’টি ছবির একটি। ভেবেছিলাম বিয়ের বছরটি ঘুরে এলে তোমাকে এই ছবি দিয়ে মুগ্ধ করব। কিন্তু ছবি তোমাকে এতটুকুও মুগ্ধ করল না। তুমি ক্লান্ত গলায় বললে, এক বছর হয়ে গেছে বিয়ের? ইশ কত তাড়াতাড়ি সময় যায়!

তোমার কণ্ঠে কি সেদিন একটি চাপা বিষাদ ধরমিত হয়ে উঠেছিল? ক্রমে-ক্রমে তুমি বিষণ্ণ হয়ে উঠতে লাগলে। প্রায়ই ঘুম ভাঙলে দেখতাম তুমি জেগে বসে আছ। অবাক হয়ে বলেছি, কী হয়েছে জরী?

কই? কিছু হয়নি তো।

ঘুম আসছে না?

আসছে।

বলেই তুমি আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লে। কিন্তু তুমি জেগে রইলে। অথচ ভান করতে লাগলে যেন ঘুমিয়ে আছ। আমি বললাম, জরী সত্যি করে বল তো তোমার কী হয়েছে?

কিছু হয়নি।

কোথাও বেড়াতে যাবে?

কোথায়?

কক্সবাজার যাবে? হোটেল ভাড়া করে থাকব।

উহঁ, ভাল্লাগে না।

তারও অনেকদিন পর এক সন্ধ্যায় ঘন ঘোর হয়ে মেঘ করল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ঝড়। দরাম শব্দে একেকবার আছড়ে পড়ছে জানালার পাট। বাজ পড়ছে ঘনঘন। ঘরের লাগোয়া জামগাছে শৌ-শৌ শব্দ উঠছে। দু’জনে বসে আছি চুপচাপ। তুমি হঠাৎ একসময় বললে, তোমাকে একটা কথা বলি, রাখবে?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কী কথা?

আগে বল রাখবে?

নিশ্চয়ই রাখব।

তুমি তখন আমাকে তোমার আনিস স্যারের গল্প বললে। যিনি কলেজে তোমাদের অঙ্কের প্রফেসর ছিলেন। খামখেয়ালির জন্যে যাঁর কলেজের চাকরিটি গেছে। এখন খুব খারাপ অবস্থায় আছেন। কোনো রকমে দিন চলে। তুমি আমাকে অনুরোধ করলে নীলগঞ্জ নতুন যে কলেজ হচ্ছে সেখানে তাঁকে একটি চাকরি যোগাড় করে দিতে।

তুমি উজ্জ্বল চোখে বললে, আনিস স্যার মানুষ নন। সত্যি বলছি ফেরেশতা। তুমি আলাপ করলেই বুঝবে।

আমি বললাম, নীলগঞ্জের কলেজের এখনো তো অনেক দেরি। মাত্র জমি নেয়া হয়েছে।

হোক দেরি। আনিস স্যার ততদিন থাকবে আমাদের এখানে। নিচের ঘর তো খালিই থাকে। একা মানুষ কোনো অসুবিধা হবে না।

একা মানুষ?

হঁ। মেয়ে আর বউ দু'জনের কেউই বেঁচে নেই। একদিনে দু'জন মারা গেছে কলেরায়। আর মজা কি জান? তার পরদিনই আনিস স্যার এসেছেন ক্লাস নিতে। প্রিন্সিপাল স্যার বললেন, আজ বাড়ি যান, ক্লাস নিতে হবে না। আনিস স্যার বললেন, বাড়িতে গিয়ে করবটা কী? কে আছে বাড়িতে?

আমি বললাম, চিঠি লিখলেই আমাদের স্যার আসবেন এখানে?

হ্যাঁ, আসবেন। আমি লিখলেই আসবেন। লিখব স্যারকে?

বেশ, লেখ।

তুমি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখতে উঠে গেলে। সে চিঠি শেষ হতে অনেক সময় লাগল। বসে বসে দেখলাম অনেক কাটাকুটি করলে। অনেক কাগজ ছিঁড়ে ফেললে। এবং একসময় চিঠি শেষ করে হাসিমুখে উঠে এলে। তোমাকে সে-রাতে ভীষণ উৎফুল্ল লাগছিল।

আহ! লিখতে লিখতে কেমন যেন লাগছে। এখন প্রায় মধ্যরাত্রি। তবু ইচ্ছে হচ্ছে রাস্তায় একটু হেঁটে বেড়াই। নিশি রাতে নির্জন রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে আমার বেশ লাগল। তুমি কি দস্তযোভঙ্কির 'রূপালি রাত্রি' পড়েছ? রূপালি রাত্রিতে আমার মতো একজন নিশি-পাওয়া লোকের গল্প আছে।

জরী, তোমাদের স্যার কবে যেন উঠলেন আমাদের বাড়িতে? দিন-তারিখ এখন আর মনে পড়ছে না। শুধু মনে পড়ছে মাঝবয়েসি একজন ছোটখাট মানুষ ভোরবেলা এসে খুব হইচই শুরু করেছিলেন। চৈঁচিয়ে রাগী ভঙ্গিতে ডাকছিলেন, সুলতানা, সুলতানা। তুমি ধমমড় করে জেগে উঠলে। 'ও আল্লা, কী কাণ্ড! স্যার এসে পড়েছেন'— এই বলে খালি পায়েই ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে গেলে। আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম তুমি পা ছুঁয়ে সালাম করছ, আর

তোমাদের স্যার বিরক্তিতে ঙ্গ কুঁচকে বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। খানিক পরে দেখলাম তিনি খুব হাসছেন। সেইসঙ্গে লাজুক ভঙ্গিতে তুমিও হাসছ।

তুমি খুশি হয়েছিলে তো? নিশ্চয়ই হয়েছিলে। আমি স্টুডিওতে বসে তোমার গভীর আনন্দ অনুভব করতে পারছিলাম। একটি তীব্র ব্যথা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সেদিন আমার আত্মহত্যার কথা মনে হয়েছিল।

অথচ তোমার স্যার ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। এমন সহজ, এমন নির্লোভ লোক আমি খুব কমই দেখেছি। কোনো কিছুর জন্যেই কোনো মোহ নেই। এমন নির্লিপ্ততা কল্পনাও করা যায় না। জরী, তুমি ঠিক লোকের প্রেমেই পড়েছিলে। এমন মানুষকে ভালোবেসে দুঃখ পাওয়াতেও আনন্দ। তোমার স্যার ফেরেশতা ছিলেন কিন্তু জরী আমি তো ফেরেশতা নই। আমার হৃদয়ে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি ও ঘৃণা আছে। আমি সত্যি একজন সাধারণ মানুষ।

সময় কাটতে লাগল। আমি শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। অনেকগুলি ছবি আঁকলাম সে-সময়। তোমার পোর্ট্রেটগুলো সে সময়ই করা। পোর্ট্রেটে সিটিং দেবার জন্যে ঘণ্টাখানিক বসতে হতো তোমাকে। তুমি হাসিমুখে এসে বসতে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরই হট্টমুখ হয়ে উঠতে, ‘এই রে, স্যারকে চা দেয়া হয়নি। একটু দেখে আমি। এক মিনিট, প্লিজ!’ আমি তুলি হাতে তোমার ফেরার প্রতীক্ষা করতাম। (এক) কাপ চা তৈরি করতে প্রচুর সময় লাগত তোমার।

মাঝে মাঝে আসতেন তোমার স্যার। অর্ধ সমাপ্ত ছবিগুলি দেখতেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এবং বলতেন, ছবি আমি ভালো বুঝি না। কিন্তু আপনি যে সত্যিই ভালো আঁকেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাঁর প্রশংসা আমার সহ্য হতো না।

আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকতাম। তিনি বলতেন, আপনি আঁকুন। আমি দেখি কি করে ছবি আঁকা হয়।

আমি কারো সামনে ছবি আঁকতে পারি না।

তবু তোমার স্যার বসে থাকতেন। তীব্র ঘৃণায় আমি কতবার তাঁকে বলেছি, এখানে বসে আছেন কেন? বাইরে যান।

কোথায় যাব?

নদীর ধারে যান। জরীকে সঙ্গে নিয়ে যান। কাজের সময় বিরক্ত করছেন কেন আপনি?

অপমানে তোমার মুখ কালো হয়ে উঠত। থমথমে স্বরে বলতে, চলুন স্যার আমরা যাই।

ক্রমে ক্রমেই তুমি সরে পড়তে শুরু করলে। পরিবর্তনটা খুব ধীরে হচ্ছিল। সে জন্যেই ঠিক বলতে পারব না কখন থেকে তুমি আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করলে। ব্যক্তিগত হতাশা ও বঞ্চনা— এই দুই মিলিয়ে মানসিক দিক দিয়ে

অনেক আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সে অসুখ ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। একনাগাড়ে জ্বর চলল দীর্ঘদিন। ঘুম হয় না, বুকের মধ্যে এক ধরনের ব্যথা অনুভব করি। তীব্র যন্ত্রণা।

অসুখ-বিসুখে মানুষ খুব অসহায় হয়ে পড়ে। সে-সময় একটি সুখকর স্পর্শের জন্যে মন কাঁদে। কিন্তু তুমি আগের মতোই দূরে দূরে রইলে। যেন ভয়ানক একটি ছোঁয়াচে রোগে আমি শয্যাশায়ী। ছোঁয়াচে বাঁচিয়ে না চললে সমূহ বিপদ।

তোমার স্যার আসতেন প্রায়ই। আমি তাঁর চোখে গভীর মমতা টের পেতাম। তিনি আমার কপালে হাত রেখে নরম গলায় বলতেন, একটি গল্প পড়ে শুনাই আপনাকে। আপনার ভালো লাগবে?

আমি রেগে গিয়ে বলতাম, একা থাকতেই আমার ভালো লাগবে। আপনি নিচে যান। কেন বিরক্ত করছেন?

এত অস্থির হচ্ছেন কেন? আমি একটু বসি এখানে। কথা বলি আপনার সঙ্গে?

না, না অসহ্য! আপনি জরীর সঙ্গে কথা বলুন।

আমার অসুখ সারে না কিছুতেই। বাবার বন্ধু শশধর ডাক্তার রোজ দু'বেলা আসেন আর গভীর হয়ে মাথা নাড়েন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, হাঁপানির টান উঠে না-কি বাবা? হাঁপানি তোমাদের রক্তশূন্য অসুখ। তোমার দাদার ছিল, তোমার বাবারও ছিল। শ্বাস নিতে কোনো কষ্ট টের পাও?

একটু যেন পাই।

ডাক্তার চাচা একটি মালিশের শিশি দিলেন। 'শ্বাসের কষ্ট হলে অল্প অল্প মালিশ করবে। সাবধানে, সুখে যেন না যায়। তীব্র বিষ।' ছোট্ট একটি শিশিতে ঘন কৃষ্ণবর্ণ তরল বিষ্ণু। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই শিশিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ডাক্তার চাচা চলে যেতেই তোমাকে ডেকে বললাম, জরী এই শিশিটিতে কী আছে জান?

জানি না কী আছে?

তীব্র বিষ। সাবধানে তুলে রাখ।

তোমাকে কেন বললাম এ-কথা কে জানে। কিন্তু বলবার পর দারুণ আত্মপ্রসাদ হলো। দেখলাম তুমি সরু চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলে আমার দিকে। কী ভাবছিলে?

অসুখ সারল না। ক্রমেই বাড়তে থাকল। চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়ল। জড়িসের রুগির মতো গায়ের চামড়া হলুদ হয়ে গেল। দিনরাত শুয়ে শুয়ে থাকি। কত কি মনে হয়। কত সুখ-স্মৃতি, কত দুঃখ-জাগানিয়া ব্যথা। শ্লথ সময় কাটে। এক এক রাতে ঘন ঘোর হয়ে বৃষ্টি নামে। ঝমঝম শব্দে গাছের

পাতায় অপূর্ব সঙ্গীত ধ্বনিত হয়। শুয়ে শুয়ে শুনি তুমি নিচের ঘরে বৃষ্টির সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান করছো। আহ! কীসব দিন কেটেছে।

একটি প্রশস্ত ঘর। তার এক প্রান্তে প্রাচীনকালের প্রকাণ্ড একটি পালঙ্ক। সেখানে শয্যা পেতে রাতদিন খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে থাকা। কী বিশ্রী জীবন। ডাক্তার চাচা কতবার আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলেছেন, কেন তোমার অসুখ সারে না? বল, কেন?

আমি কী করে বলব?

যাও হাওয়া বদল করে আস। বৌমাকে নিয়ে ঘুরে আস কল্লবাজার থেকে। আচ্ছা যাব।

আচ্ছা নয়, কালই যাও। সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ এক্সপ্রেসে।

এত তাড়া কীসের?

তাড়া আছে। আমি বলছি বৌমাকে সব ব্যবস্থা করতে।

ডাক্তার চাচা সেদিন অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে ডাকল, ও বৌমা বৌমা।

তুমি তো প্রায় সময়ই থাকতে না, সেদিনও ছিলে না।

ডাক্তার চাচা অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন সেদিন।

শুধু কি তিনি? এ বাড়ির সব ক'টি লোক কেঁতুইলী হয়ে দেখত আমাকে। আবুর মা গরম পানির বোতল আমার বিছানায় রাখতে রাখতে নেহায়েত যেন কথার কথা এমন ভঙ্গিতে বলত, বিবি সাহেব নদীর পাড়ে বেড়াইতে গেছেন।

আমি বলতাম না কিছুই। অল্পই বোধ হলে বিষের শিশিটির দিকে তাকাতাম। যেন সেখানে প্রচুর সন্ধান আছে।

জরী, আমাদের এ বংশে অনেক অভিশাপ আছে। আমার দাদা তাঁর অবাধ্য প্রজাদের হাতে খুন হয়েছিলেন। আমার মা'র মৃত্যুও রহস্যময়। লোকে বলে তাঁকে নাকি বিষ খাইয়ে মারা হয়েছিল। আমার সারাক্ষণ মনে হতো পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেও করতে হবে।

জরী, আমার জরী, আহ! কতদিন তোমাকে দেখি না। তোমার গোলগাল আদুরে মুখ কি এখনো আগের মতো আছে? না, তা কি আর থাকে? জীবন তো বহতা নদী। মাঝে মাঝে তোমার জন্যে খুব কষ্ট হয়। ইচ্ছে হয় আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে। ট্রেনে করে তুমি প্রথমবারের মতো নীলগঞ্জে আসছ সেখান থেকে। ঐ যে গৌরীপুরে ট্রেন থেমে থাকল অনেকক্ষণ। একজন অন্ধ ভিথিরি একতারা বাজিয়ে করুন সুরে গাইল,

ও মনা

এই কথাটি না জানলে

প্রাণে বাঁচতাম না।

ও মনা। ও মনা

তুমি ভিথিরিকে দু'টি টাকা দিলে।

তোমার কথা মনে হলেই কষ্ট হয়। ভালোবাসার কষ্ট, আমার চেয়ে বেশি কে আর জানবে বল? তোমার ব্যথা আমি সত্যি সত্যি অনুভব করেছিলাম।

তোমার স্যার যেদিন নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, 'সুলতানা, আমার স্যুটকেসটা গুছিয়ে দাও। আমি ভোরে যাচ্ছি।' তখন তোমার চোখে জল টলমল করে উঠল। তোমার স্যার সেদিকে লক্ষ্যও করলেন না। সহজ ভঙ্গিতে এসে বসলেন আমার বিছানার পাশে। গাঢ়স্বরে বললেন, আপনি জরীকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে কিছুদিন থাকুন। ভালো হয়ে যাবেন।

আমি বললাম, না— না আমি যাব না। সমুদ্র আমার ভালো লাগে না। আপনারা দু'জনে যান। সমুদ্রতীরে সব সময় দু'জন করে যেতে হয়। এর বেশিও নয়, এর কমও নয়।

তোমার স্যার তৃপ্তির হাসি হাসতে লাগলেন। তুমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলে। একটি কথাও বললে না। আমি দেখলাম, খুব শান্ত ভঙ্গিতে তুমি তোমার স্যারের স্যুটকেস গুছিয়ে দিলে। রাস্তায় ক্ষিপে চলে খাবার জন্যে একগাদা কি-সব তৈরি করে দিলে। তিনি বিদায় নিষেণ খুব সহজভাবেই। ঘর থেকে বেরিয়ে একবারও পিছনে ফিরে তাকালেন না। তুমি মূর্তির মতো গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলে।

জরী, তুমি ভুল লোকটিকে বেছে নিয়েছিলে। এইসব লোকের কোনো পিছুটান থাকে না। নিজ স্ত্রী-কন্যার মৃত্যুর পরদিন যে ক্লাস নিতে আসে তাকে কি আর ভালোবাসার শিকলে বাঁধা যায়?

তোমার স্যার চলে যাবার দিন আমি তোমাকে তীব্র অপমান করলাম। বিশ্বাস কর, ইচ্ছে করে করিনি। তোমার স্যার যখন বললেন, আপনার কাছে একটি জিনিস চাইবার আছে।

আমি চমকে উঠে বললাম, কী জিনিস?

আপনার আঁকা একটি ছবি আমি নিতে চাই। হাত জোড় করে প্রার্থনা করছি।

নিশ্চয়ই। আপনার পছন্দমতো ছবি আপনি উঠিয়ে নিন। যে-কোনো ছবি। যেটা আপনার ভালো লাগে।

তিনি ব্যস্ত হয়ে আমার স্টুডিওর দিকে চলে গেলেন। আমি তোমার চোখে চোখ রেখে বললাম, স্যার কোন ছবিটি নেবেন জান তুমি?

না।

স্যার নেবেন তোমার পোর্ট্রেট।

তিনি কিন্তু নিলেন অন্য ছবি। জলরঙে আঁকা 'এসো নীপবনে'। তাকিয়ে দেখি অপমানে তোমার মুখ নীল হয়ে গেছে। তীব্র ঘৃণা নিয়ে তুমি আমার দিকে তাকালে।

সেই সব পুরানো কথা তোমার কি মনে পড়ে? বয়স হলে সবাই তো নস্টালজিক হয়, তুমি হওনি? কুটিল সাপের মতো যে ঘৃণা তোমার বুকে কিলবিল করে উঠেছিল তার জন্যে তোমার কি কখনো কাঁদতে ইচ্ছা হয় না? তুমি কাঁদছ এই ছবিটি বড় দেখতে ইচ্ছে করে। তোমার স্যার চলে যাবার পর তুমি কি করবে তা কিন্তু আমি জানতাম জরী। তোমার তো এ ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। মিছিমিছি তুমি সারা জীবন লজ্জিত হয়ে রইলে।

আমি তোমাকে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যেতে চেয়েছি। তুমি বলেছ, 'না'। তোমাকে কিছুদিন তোমার বাবা-মা'র কাছে রেখে আসতে চেয়েছি। তুমি কঠিন স্বরে বলেছ, 'না।' কতবার বলেছি, বাইরে থেকে ঘুরে এলে তোমার মন ভালো থাকবে। তুমি শান্ত স্বরে বলেছ, আমার মন ভালোই আছে।

আমি জানতাম ঘৃণার দেয়ালে বন্দি হয়ে একজন মানুষ বেশিদিন থাকতে পারে না। তোমার সামনে দু'টি মাত্র পথ। এক— মরে যাওয়া, আর দুই...। কিন্তু মরে যাওয়ার মতো সাহস তোমার ছিল না। কাজেই দ্বিতীয় পথ যা তুমি বেছে নেবে তার জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম। এও এক ধরনের খেলা। আমি জানতাম তুমি এবারও পরাজিত হবে। পরাজয়ের মধ্যেই আসবে জয়ের মালা। উৎকণ্ঠায় দিন কাটতে লাগল। কখন আসবে সেই মুহূর্তটি? সেই সময় আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারব ভেবে

সেই মুহূর্তটির কথা তোমার কি মনে পড়ে কখনো? ঘন হয়ে শীত পড়ছে। শরীর খানিক সুস্থ বোধ হওয়ায় আমি কমল মুড়ি দিয়ে বসে আছি।

সন্ধ্যা মিলাতেই ঘরে আলো দিয়ে গেল। তারও কিছু পর তুমি এলে চা নিয়ে। চায়ের পেয়ালার দিকে গিয়ে চা ছলকে পড়ল মেঝেতে। বিড়বিড় করে তুমি কি যেন বললে। আমি তাকালাম টেবিলের দিকে। বিষের সেই শিশিটি নেই। তুমি অপলকে তাকিয়েছিলে আমার দিকে। আমি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলাম চায়ের পেয়ালার জন্যে। তুমি জ্ঞান হারিয়ে এলিয়ে পড়লে মেঝেতে। হেরে গেলে জরী।

তোমাকে এরপর খুব সহজেই জয় করা যেত। কিন্তু আমি তা চাইনি, সব ছেড়েছুঁড়ে চলে এলাম। অল্প ক'দিন আমরা বাঁচি। তবু এই সময়ে কত সুখ-দুঃখ আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। কত গ্লানি, কত আনন্দ আমাদের চারপাশে নেচে বেড়ায়। কত শূন্যতা বুকের ভেতরে হা হা করে।

জরী, এখন গভীর রাত্রি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পোর্টার এসে দরজায় নক করবে। বিমান কোম্পানির মিনিবাস এসে দাঁড়াবে দোরগোড়ায়। আবার যাত্রা শুরু।

আমার হয়তো কোনো এক পেইন্টিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে তোমার কথা

মনে পড়বে। আবার এ-রকম লম্বা চিঠি লিখব। কিন্তু সেসব চিঠি কখনো পাঠাবো না তোমাকে। যৌবনে হৃদয়ের যে উত্তাপ তোমাকে স্পর্শ করতে পারেনি, আজ কি আর তা পারবে? কেন আর মিছে চেষ্টা।



নিমধ্যমা

মতিনউদ্দিন সাহেবকে কেন জানি কেউ পছন্দ করে না। অফিসের লোকজন করে না, বাড়ির লোকজনও না। এর যে কী কারণ মতিন সাহেব জানেন না। প্রায়ই তাঁর ইচ্ছা করে পরিচিত কাউকে জিজ্ঞেস করেন— ‘আচ্ছা আপনি আমাকে পছন্দ করেন না কেন?’ জিজ্ঞেস করা হয় না। তাঁর লজ্জা লাগে। মনে-মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন— থাক কী হবে জিজ্ঞেস করে?

তাঁর স্ত্রীকে অবিশ্যি একদিন ভয় ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন। নাশতা খেতে খেতে অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘একটা কথা, তুমি আমাকে পছন্দ কর না কেন?’

মতিন সাহেবের স্ত্রী রাহেলা বেগম তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, ‘তুমি কী বললে?’

‘না— কিছু বলিনি।’

‘পছন্দের কথা কী যেন বললে?’

‘মানে জানতে চাচ্ছিলাম— তুমি আমাকে পছন্দ কর কি-না।’

‘তোমার কি ভিমরতি হয়ে গেল না-কি, আজেবাজে কথা জিজ্ঞেস করছ।’

‘আর করব না।’

তাঁর স্ত্রী যে তাঁকে দু’চোখে দেখতে পারেন না তা মতিন সাহেব জানেন। তিনি থাকেন একা একটা ঘরে। সেই ঘরটাও বাড়ির সবচেয়ে খারাপ ঘর। আলো-বাতাস দুকে না বললেই হয়। দিনের বেলায় বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হয়। হঠাৎ দেশের বাড়ি থেকে কোনো মেহমান চলে এলে এই ঘরও তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। তখন কোথায় শোবেন তাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বড় ছেলের ঘরটা সুন্দর। খাটটাও বড়। অনায়াসে দু’জন শোয়া যায়। কিন্তু শোয়া সম্ভব না— বড় ছেলে বিরক্ত হয়। ছোট দুই মেয়ে একঘরে শোয়, সেখানে জায়গা নেই।

তিনি খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত বসার ঘরের সোফায় ঘুমুতে যান। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

গত পূজার ছুটিতে বাসার সবাই ঠিক করল দল বেঁধে কক্সবাজার যাবে। তাঁকে অবিশ্যি কেউ বলল না। তিনি খাবার টেবিলে আলোচনা শুনলেন। সব খরচ দিচ্ছে তাঁর বড় ছেলে। ব্যবসায় তার ভালো লাভ হয়েছে। কিছু টাকা খরচ করতে চায়। সে হাসি মুখে বলল, ‘এখান থেকে একটা মাইক্রোস ভাড়া করে, মাইক্রোসে যাব। নিজেদের কন্ট্রোলে একটা গাড়ি থাকার খুব সুবিধা। ধর, কক্সবাজার থেকে টেকনাফ যেতে ইচ্ছা করল, হুট করে চলে গেলাম।’

মেজো মেয়ে নীতু বলল, ‘কিন্তু ভাইয়া ট্রেন জার্নির আলাদা মজা। একটা পুরো কামরা রিজার্ভ করে যদি যাই.... গাড়ি তুমি কক্সবাজারে ভাড়া কর। ওখানে ভাড়া পাওয়া যায় না?’

ছোট মেয়ে বলল, ‘আমার প্লেনে যেতে ইচ্ছা করছে ভাইয়া। ঢাকা থেকে চিটাগাং পর্যন্ত ট্রেনে, সেখান থেকে প্লেনে কক্সবাজার।’

এইসব আলোচনা শুনতে তাঁর খুব আনন্দ হচ্ছিল। অবিশ্যি তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন না। কারণ, তিনি জানেন কিছু বলতে গেলেই রাহেলা বলবেন, ‘চুপ কর তো, তুমি জান কী?’

মতিন সাহেব কিছু বললেন না ঠিকই কিছু যোগাড়-যন্ত্র করে রাখলেন। কাপড়-চোপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করিয়ে রাখলেন। অফিসে বড় সাহেবকে বললেন, ‘আমার কয়েক দিন ছুটি লাগবে সম্রাট। পরিবারের সবাই কক্সবাজার যাচ্ছি।’

বড় সাহেব বললেন, ‘হঠাৎ কক্সবাজার। ব্যাপার কী?’

‘বাচ্চারা ধরল— বেড়াতে যাবে। আমি বললাম, ঠিক আছে চল। ওদের আনন্দের জন্যে যাওয়া। অবিশ্যি আমি নিজেও কোনোদিন সমুদ্র দেখিনি। ভাবলাম দেখেই আছি...’

বলতে বলতে আনন্দে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। বড় সাহেব সাত দিনের ছুটি মঞ্জুর করলেন।

কক্সবাজার রওনা হবার আগের দিন রাহেলা এসে বললেন, ‘আমরা সবাই কক্সবাজার যাচ্ছি জান তো? তোমার তো আবার কোনো হুঁশ থাকে না। ঘরে কী আলোচনা হয় তাও জান না। কাল রওনা হচ্ছি। মাইক্রোসে যাচ্ছি। বাস চলে আসবে ভোর ছ’টায়।’

মতিন সাহেব হাসি মুখে বললেন, ‘জানি। আমি ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছি। অফিস থেকে সাত দিনের ছুটি নিয়েছি। আর্নড লিভ।’

রাহেলা অবাক হয়ে বললেন, ‘তোমাকে ছুটি নিতে কে বলল? আগ বাড়িয়ে যে এক একটা কাজ কর রাগে গা জ্বলে যায়। আমি কি বাসা খালি রেখে যাব না-কি? রোজ চুরি হচ্ছে। তুমি থাকবে এখানে।’

‘আচ্ছা।’

‘ফ্রিজে এক সপ্তাহের মতো গোশত রান্না করে রাখা হয়েছে। চারটা চাল ফুটিয়ে খেয়ে নেবে। পারবে না?’

‘পারব।’

‘শোবার আগে সব ঘর বন্ধ হয়েছে কি-না ভালো করে দেখবে। তোমার উপর কোনো দায়িত্ব দিয়েও তো নিশ্চিত হতে পারি না।’

এ জাতীয় ব্যাপার যে শুধু বাড়িতে ঘটে তাই না। অফিসেও নিয়মিত ঘটে। তাঁদের অফিসের এক সহকর্মী কোনো-এক সিনেমায় ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেছে। নায়িকার খুব জ্বর। ডাক্তার জ্বর দেখে বললেন— ‘হঁ, জ্বর একশ’ তিন। পেশেন্টকে এফুনি হাসপাতালে নিতে হবে।’ নায়িকা তখন কাতর গলায় বলে, ‘আমি বাঁচতে চাই না ডাক্তার। মৃত্যুই আমার জন্যে ভালো। পৃথিবীর এ আলো হাওয়া, এ আনন্দ আমি সহ্য করতে পারছি না।’ ডাক্তার তখন বললেন, ‘ছিঃ! এমন কথা বলবেন না।’

এইটুকু পার্ট। তবু তো সিনেমার পার্ট। পরিচিত একজন সিনেমায় পার্ট করছে এটা দেখায়ও আনন্দ। যে পার্ট করছে সে বলল, বৃহস্পতিবার সে সবার জন্যে পাস নিয়ে আসবে। অফিসের শেষে সবাই তার বাসায় চা-টা খেয়ে সন্ধ্যাবেলা একসঙ্গে ছবি দেখতে যাবে।’

মতিন সাহেব খুব আগ্রহ নিয়ে বৃহস্পতিবারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ছবিঘরে অনেকদিন ছবি দেখা হয় না। ছবি দেখা হবে। তা ছাড়া দলবল নিয়ে ছবি দেখার আনন্দও আছে। উত্তেজনায় বৃহস্পতিবারে তিনি অফিসের কাজও ঠিকমতো করতে পারলেন না। ছুটির পর সবাই একসঙ্গে বেরুচ্ছেন, সিনেমার ডাক্তার অভিনেতা মতিন সাহেবকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, একটা ভুল হয়ে গেছে। তেরোটা পাস এনেছি, এখন দেখি মানুষ চৌদ্দজন। কী করা যায় বলুন তো।

মতিন সাহেব কিছু বললেন না। তাঁর খুব যেতে ইচ্ছা করছে। নিজ থেকে বলতে ইচ্ছা করছে না, ‘আপনারা যান। আমি থাকি।’

‘শুনুন মতিন সাহেব, আপনি বরং থাকুন। আপনাকে পরে পাস এনে দেব। আর ছবিও খুব আজীবাজে। পুরা ছবি দেখলে হলের মধ্যে বমি করে দেবেন। না দেখাই ভালো।’

মতিন সাহেব বললেন, ‘আচ্ছা।’

‘মনে কিছু করলেন না তো আবার?’

‘জি-না।’

‘বাসা পর্যন্ত চলুন। একসঙ্গে চা খাই। অসুবিধা নেই তো?’

‘জি-না।’

শেষ পর্যন্ত বাসায় যাওয়া হলো না। একটা জীপ যোগাড় হয়েছিল, সেই জীপে সবার জায়গা হলো মতিন সাহেবের হলো না।

‘মতিন সাহেব, আপনি বরং একটা রিকশা নিয়ে চলে আসুন। ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। মালিবাগ চৌধুরী পাড়া। অসুবিধা হবে না তো?’

‘জি-না।’

ঠিকানা নিয়ে তিনি রিকশা করে মালিবাগে নামলেন। বাসা খুঁজে পেলেন না। কারণ, ঠিকানায় সবই দেয়া আছে, বাসার নম্বর দেয়া নেই। মতিন সাহেবের একবার ক্ষীণ সন্দেহ হলো— ইচ্ছা করেই বাসার নাম্বার দেয়নি। পরমুহূর্তেই সেই সন্দেহ তিনি ঝেড়ে ফেলে দিলেন। তা কী করে হয়! সন্ধ্যা না মেলানো পর্যন্ত তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করলেন বাড়ি খুঁজে বের করবার। পারলেন না।

দীর্ঘ ত্রিশ বছর চাকরির পর তিনি রিটায়ার করলেন। জুনিয়র অফিসার হিসেবে ঢুকেছিলেন, রিটায়ার করলেন সিনিয়র অফিসার হিসেবে। ত্রিশ বছরে একটিমাত্র প্রমোশন। বর্তমান অফিসের জেনারেল ম্যানেজার তাঁর সঙ্গেই চাকরিতে ঢুকেছিলেন। এখন তাঁকে স্যার ডাকতে হয়। মতিন সাহেবের লজ্জা লজ্জা করে। উপায় কী?

রিটায়ার করা উপলক্ষে অফিসে বিদায়সভার আয়োজন করা হয়েছে। অফিস শেষে বেলা সাড়ে পাঁচটায় সভা হবে। মতিন সাহেব কী বলবেন সব ভেবে রেখেছেন। ভেবে রাখা কথা সব বলতে পারবেন কি-না তা জানেন না। হয়তো চোখে পানি এসে যাবে, গলা ধরে যাবে। বিকাল পাঁচটা বাজতেই তিনি হলঘরে বসে রইলেন। আশ্চর্য তিনি একা— একটি লোকও নেই। ছ’টা পর্যন্ত তিনি একা একাই বসে রইলেন। লক্ষ করলেন অফিসের লোকজন একে-একে চলে যাচ্ছে। এদিকে কেউ উকিও দিচ্ছে না।

সন্ধ্যা সাড়ে ছুটায় জি.এম. অফিস থেকে বেরবার সময় বিস্মিত হয়ে বললেন, আরে মতিন সাহেব আপনি? বসে আছেন কেন? মতিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, বিদায়সভা হবে এইজন্যে...’

‘আজ তো হবে না। আজ আমি ব্যস্ত, এইজন্যে ক্যানসেল করে দিয়েছি। আপনি নোটিশ পাননি?’

‘জি-না।’

‘আরে বলেন কী? আচ্ছা বাড়ি চলে যান। পরে একসময় ফেয়ার ওয়েল হবে। আপনাকে খবর দেয়া হবে।’

‘জি-আচ্ছা স্যার।’

চাকরি জীবন শেষ হয়ে অবসর জীবন শুরু এই ভেবে মতিন সাহেব এক কেজি সন্দেশ কিনে ফেললেন। হেঁটে বাড়ি ফিরলেন। সন্ধ্যার দিকে হাঁটতে তাঁর ভালো লাগে। বাড়ি ফিরে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। বাড়ি খালি।

জনপ্রাণী নেই— আসবাবপত্র নেই। সব ধু-ধু করছে। রোগা একটা ছেলে বালতি ভর্তি পানি দিয়ে মেঝে ধুচ্ছে। মতিন সাহেব বললেন, ‘ওরা কোথায়?’

ছেলেটি বলল, ‘কারা?’

‘এই বাড়িতে যারা থাকত?’

‘বাড়ি ছাইড়া নতুন বাড়িতে গেছে।’

‘কোথায় গেছে?’

‘আমি ক্যামনে কই?’

বাড়িওয়ালায় কাছে খোঁজ নিয়ে জানলেন— তারা পল্লবীতে বাড়ি নিয়েছে। বড় বাড়ি। সে বাড়ির ঠিকানা তিনি জানেন না।

অনেক যন্ত্রণা করে রাত দশটায় পল্লবীর বাড়িতে তিনি উপস্থিত। রাহেলা খড়খড়ে গলায় বললেন, ‘এতক্ষণে তোমার সময় হলো? আজ বাড়ি বদল হচ্ছে, কোথায় সকাল সকাল ফিরবে। সাহায্য করবে। আর তুমি কি-না উদয় হয়েছে মাঝরাতে।’

‘বাড়ি বদল করছ জানতাম না। তুমি আমাকে কিছু বলনি।’

‘সবকিছু তোমাকে জানিয়ে তোমার অনুমতি নিয়ে করতে হবে?’

‘না— তা না। মানে আজি জানতাম না যে বাড়ি বদল করছ।’

‘রোজ এই নিয়ে কথা হচ্ছে। জিনিসপত্র ঝোঁড়াছাঁদা হচ্ছে— আর তুমি বলছ তুমি জানতে না।’

‘কিছু তো বলনি....’

‘আর কীভাবে বলব? মাইক ভাড়া করে বলতে হবে?’

‘নতুন বাড়ির ঠিকানাও জানতাম না— খুব যন্ত্রণা করে ঠিকানা বের করেছি।’

‘যন্ত্রণা করে ঠিকানা বের করতে হয়েছে? কী এমন যন্ত্রণা করেছ শুনি? হাতে ওটা কী?’

‘সন্দেশ।’

‘সন্দেশ কিনলে কেন?’

‘এম্মি কিনলাম।’

‘জান এই বাড়িতে মিষ্টি কেউ খায় না— তারপরেও সন্দেশ কিনে আনলে কী মনে করে?’

‘ভুল হয়ে গেছে।’

নতুন বাসায় মতিন সাহেবের ঘর হলো ছাদের চিলেকোঠায়। এই ঘরটা আগের চেয়েও ছোট তবে প্রচুর আলো-বাতাস। সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে যে-কোনো সময় ছাদে আসা যায়। রাতে কোনো কারণে তাঁর ঘুম ভাঙলেই তিনি ছাদে বসে থাকেন। তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবেন, কেন সবাই তাঁকে এত অপছন্দ করে? তিনি কি মানুষটা খারাপ?

তা তো না। কখনো কোনো অন্যায় করেছেন বলে তো মনে পড়ে না।
সংভাবে থেকেছেন। সৎ জীবনযাপন করেছেন।

তাহলে কি তাঁর চেহারা খারাপ? কিংবা চেহারাটা এমন যে দেখলেই সবার
রাগ লাগে?

তাও বোধহয় না। আয়নায় তিনি দীর্ঘ সময় নিজকে দেখেছেন। একবার
না, অনেকবার দেখেছেন। খারাপ বলে তো মনে হয় না। তা ছাড়া চেহারা কি
খুব বড় ব্যাপার? কত কুৎসিত-দর্শন মানুষ পৃথিবীতে আছে। তাদের প্রতি কত
ভালোবাসা সবাই দেখায়। তাঁদের অফিসেই তো একজন আছেন আছেন,
পরিমল বাবু। আগুনে পুড়ে মুখের একটা দিক ঝলসে গেছে, বাঁ চোখটা নষ্ট।
তাকালে শিউরে উঠতে হয়। অথচ সবার মুখে— পরিমলদা, পরিমলদা।
অফিসের পিকনিক হবে, ব্যবস্থা করবে পরিমলদা। নাটক দেখতে যাবে, ডাকো
পরিমলদাকে।

তাহলে ব্যাপারটা কী? তিনি খানিকটা বোকা বলেই কি সবাই তাকে
এড়িয়ে চলে? বোকাদের কেউ পছন্দ করে না— কিন্তু তিনি কি সত্যি বোকা?
কাউকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে। কাকে জিজ্ঞেস করবেন? জিজ্ঞেস করবার
মতো কোনো বন্ধু তাঁর নেই। কাজেই তিনি গভীর রাতে ছাদে বসে আকাশের
তারা গুণেন।

দিনের বেলাটা তাঁর অবিশ্যি খুব ভালো কাটে। সকালে নাশতা শেষ করেই
বের হয়ে পড়েন। এগারোটা পর্যন্ত হুঁটাইটি করেন। বাচ্চাদের স্কুলগুলির
সামনে দাঁড়ান। এক একদিন এক এক স্কুল। ছোট ছোট বাচ্চারা হইচই করে
স্কুলে ঢুকে। তাঁর দেখতে বড় ভালো লাগে। এগারোটার দিকে রোদ কড়া হয়ে
গেলে ঘুরতে আর ভালো লাগে না— কোনো-একটা পার্কে চলে যান। দুপুরটা
কাটে পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে শুয়ে। দুপুরের খাবার তিনি পার্কেই খান। এক
ছটাক বাদাম, এক গ্লাস পানি আর এক কাপ চা। কোনো কোনো দিন দু'টা
সিঙাড়া, একটা কলা। সবই পার্কে পাওয়া যায়। দুপুরে তিনি যে বাড়িতে খেতে
যান না এ নিয়ে কেউ তাকে কখনো কিছু বলে না।

রোদ একটু কমে গেলে বেলা চারটার দিকে তিনি আবার ঘুরতে বের হন।
বাসায় ফিরে যান সন্ধ্যার দিকে— এই হচ্ছে মতিন সাহেবের রুটিন। বাসায়
ফিরে জিজ্ঞেস করেন অফিস থেকে কোনো চিঠি এসেছে কি-না। বিদায়সভার
খবরের জন্যে তিনি এখনো মনে-মনে অপেক্ষা করেন।

এক রোববারের কথা। চৈত্র মাস। ঝাঁঝালো রোদ উঠেছে। মতিন সাহেব
যথারীতি রমনা পার্কে উপস্থিত হয়েছেন। পছন্দসই একটা বেঞ্চ বের করে লম্বা
হয়ে শুয়েছেন। আকাশ ঘন নীল— আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ
কেমন যেন হলো। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ ঝাঁকনি

অনুভব করলেন। পেটের নাড়িভুঁড়ি মনে হলো হঠাৎ একটা পাক দিয়েছে। মুখ ভর্তি হয়ে গেল লালায়। চোখের সামনে তীব্র নীল আলো ঝলসে উঠল।

তিনি চোখ বন্ধ করে তিনবার বললেন, ‘ইয়া মাবুদ। ইয়া মাবুদ, ইয়া মাবুদ।’

চোখ খুললেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। যা দেখলেন তার জন্যে তাঁর কোনো রকম মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। তিনি দেখলেন— তাঁর চারপাশে ছ’সাতটি শিশু। বয়স সাত থেকে বারোর মধ্যে। প্রতিটি শিশুর মুখ এত সুন্দর যে মনে হয় যেন তুলি দিয়ে আঁকা। গায়ের রঙ গোলাপি, পাতলা ঠোঁট, গা লাল রঙের। চোখের পল্লব দীর্ঘ। চোখগুলি বড় বড়। সেই চোখে মুগ্ধ বিস্ময়।

মতিন সাহেব চোখ মেলতেই সবগুলি বাচ্চা একসঙ্গে কলকল করে উঠল। তারা কথা বলছে। অতি বিচিত্র কোনো ভাষায় কথা বলছে। সেই বিচিত্র ভাষার এক বর্ণও তিনি বুঝতে পারছেন না। তারা কথা বলছে অতি মিষ্টি সুরে। খানিকটা টেনে টেনে। এক একটা বাক্য বলার পর আবার হাত চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে— এটাই বোধহয় এদের কথা বলার ভঙ্গি।

এরা যে মানবশিশু এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু কোথাকার মানবশিশু? এদের পোশাকও অতি বিচিত্র। সবারই গলা থেকে গায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা পোশাক। যার রঙ কোনো স্থায়ী রঙ না— ক্ষণে ক্ষণে তা বদলাচ্ছে।

মতিন সাহেব চোখ বন্ধ করে ফেললেন। বাচ্চাদের কলকল শব্দ সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। চারদিক পুরোপুরি স্তব্ধ। এধরনের নীরবতা সহ্য করাও মুশকিল। মতিন সাহেব চোখ মেললেন, সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চারা আবার কলকল শুরু করল। এরা সবাই উদ্ভিগ চোখে তাকিয়ে আছে। ব্যাপার কী ঘটছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মতিন সাহেব ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছেন। যদিও এই অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রাখা মুশকিল।

তিনি শুয়ে ছিলেন সিমেন্টের বেঞ্চে। এখন তিনি শুয়ে আছেন ঘাসের উপর। ঘাসগুলি অসিঁথি অন্য রকম। সবুজ নয়, হালকা নীল। ঘাসের পাতা সুতার মতো সূক্ষ্ম। সিমেন্টের বেঞ্চে যখন শুয়েছিলেন তখন সূর্য ছিল মাথার উপর। এখন কোনো সূর্য নেই। তিনি সূর্যের খোঁজে এদিকে-ওদিক তাকালেন। বাচ্চারাও তার মতো ওদিক-ওদিক দেখছে। তিনি হাতের ইশারায় বললেন— সূর্যটা কোথায়? বাচ্চারা কিছু বুঝতে পারল বলে মনে হলো না— তারাও অবিকল তাঁর মতো হাতের ইশারা করল। এরা যেন একদল পুতুল। তিনি যা করবেন এরাও তাই করবে। মতিন সাহেব বললেন, ‘তোমরা কারা?’

এরা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর সবাই একসঙ্গে মিষ্টি করে বলল, ‘তোমরা কারা?’

এর মানে কী? কী হচ্ছে এসব? তিনি কোথায়? আগে রমনা পার্কে শুয়ে ছিলেন— এখন যেখানে আছে এটাও মনে হয় কোনো পার্ক তবে একটা গাছও

চিনতে পারছেন না। অচেনা সব গাছ। তবে বড় গাছ না, সবই লতানো গাছ। পাতাগুলি বেশির ভাগই গোলাকার। প্রতিটি গাছ ফুলে ভর্তি। ফুলের রঙ নীল এবং বেগুনিতে মেশানো। চৈত্র মাসের ঝাঁঝালো রোদ নেই তবু চারদিক আলো হয়ে আছে। যে বাচ্চা ক'টি তাকে ঘিরে আছে তাদের কারো পায়ে জুতো নেই। এত সুন্দর পোশাক কিন্তু এরা দাঁড়িয়ে আছে খালি পায়ে। মতিন সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সব ক'টি বাচ্চা আগের মতো একসঙ্গে বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

মতিন সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বাচ্চারাও তাঁর মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। এদের সব ক'জন ছেলে না মেয়ে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। সবার চেহারাই দেখতে এক রকম। চুল ছোট ছোট করে কাটা।

মতিন সাহেব বুঝতে পারছেন— পুরো জায়গাটাই বিরাট একটা বাগান। এত বড় বাগানে এই ক'টি মাত্র শিশু। আর কেউ নেই। এরা গোল হয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখ হাসি-হাসি। চোখে মুগ্ধ বিস্ময়। এরা তাঁকে দেখে কী ভাবছে? কোনো জন্তু— যে দেখতে মানুষের মতো। এ-রকম হলে ছুটে গিয়ে বড় কাউকে নিয়ে আসা উচিত। তা তারা করছে না। কিংবা কে জানে হয়তো করেছে। তাদের ভেতর কেউ গেছে বড়দের খবর দিতে। এরা অপেক্ষা করছে। তবে এরা খুব যে ভয় পাচ্ছে তা না। ভয় পেলে এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকত না। দূর থেকে দেখত। চোখে চোখ পড়ামাত্র চোখ নামিয়ে নিত। মতিন সাহেব অপেক্ষা করতে লাগলেন। আসুক, বড় কেউ আসুক।

তাঁর ক্ষিধে পেয়ে গেল। আজ ভোরে তিনি নাশতা না খেয়ে বের হয়েছেন। দুপুরেও কিছু খাননি। দু'ছটাক বাদাম কিনেছিলেন। সেই বাদামের ঠোঙা এখনো হাতে আছে। দূর কাছ থেকে বাদাম কিনেছেন তাকে দাম পর্যন্ত দেননি। বাদামের ঠোঙাটা হাতে আছে। তিনি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে একটা বাদাম ভেঙে মুখে দিলেন। সবাই কৌতূহলী চোখে তাকে দেখছে। পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। মতিনউদ্দিন ঠোঙাটি ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'খাও বাদাম। ঝাল মরিচ দিয়ে খেতে খুব ভালো।'

এবার আর তাঁর কথা শুনে সবাই একসঙ্গে কথা বলে উঠল না। কেউ বাদামও নিল না। শুধু একজন একটু এগিয়ে এসে ঠোঙা থেকে বাদাম নিল। খোসা ছাড়িয়ে ভয়ে ভয়ে মুখে দিল। সে এত ভয় পাচ্ছিল যে তার হাত-পা রীতিমতো কাঁপছে। অন্য বাচ্চাগুলি শঙ্কিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। মতিন সাহেব ভেবে পেলেন না— এরা এত ভয় পাচ্ছে কেন। বাদাম কি তারা আগে কখনো দেখেনি?

যে সাহস করে বাদাম খেয়েছে তার দিকে তাকিয়ে মতিন সাহেব বললেন,

‘আমার নাম মতিনউদ্দিন। এই জায়গাটা কোথায় আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।’

বাচ্চাগুলি এবারও ঠিক আগের মতো করল। তিনি যা বললেন তারাও তাই বলল। তবে এবার একটু ব্যতিক্রম হলো। কথা শেষ হওয়ামাত্র তারা সরে গেল। অনেকটা দূরে সরে গেল। যে ছেলেটি বাদাম খেয়েছে শুধু সে দাঁড়িয়ে রইল। মতিন সাহেব তিনজন বয়স্ক মানুষকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন। এদের ভেতর দু’জন পুরুষ, একজন মহিলা। তাঁদের প্রত্যেকের হাতেই অদ্ভুত-দর্শন কিছু যন্ত্রপাতি। যন্ত্রগুলি থেকে মৌমাছির পাখা নাড়ার শব্দের মতো শব্দ আসছে। বয়স্ক মানুষ তিনটির চোখে-মুখে গভীর বিস্ময়।

মতিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বিনীত গলায় বললেন, ‘স্যার! আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এই জায়গাটা কী তাও জানি না। এখানে কী করে আসলাম তাও জানি না। যদি অপরাধ করে থাকি, আপনাদের কাছে করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করি।’

মতিন সাহেব দু’হাত জোড় করলেন। বয়স্ক মানুষ তিনজনের মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা গেল। তারা কি তাঁর কথা বুঝতে পেরে হাসছে না মতিন সাহেবকে হাত জোড় করতে দেখে হাসছে?’

‘স্যার! আমার বাসা পল্লবীতে। এখন রিটায়ার করেছি তো। কিছু করার নেই তাই ঘুরে বেড়াই। ঘুরতে-ঘুরতে (সময়) পার্কে এসে বেঞ্চিতে বসেছি— তারপরেই এই কাণ্ড। স্যার! এখন আমার অসম্ভব পানির তৃষ্ণা পেয়েছে। জানি আমার কথা আপনারা কিছুই বুঝতে পারছেন না তবু পানির তৃষ্ণার কথা না বলে পারলাম না।’

মতিন সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ করলেন— তিনি তাদের কোনো কথা বুঝতে না পারলেও তারা তাঁর কথা বুঝতে পারছে। কারণ, পানির কথা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই (কিছু) ছোট্ট খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাঁর কাঁধে ঝুলানো বস্ত্র, যাকে মতিন সাহেব যন্ত্রপাতি বলে ভাবছেন, তার এক ফাঁক দিয়ে দু’টি খুব ছোট ছোট কফির কাপের মতো বাটি বের করল। বাটি ভর্তি তরল পদার্থ যা পানি নয়। পানির চেয়ে অনেক হালকা। রঙ, হালকা সবুজ। খেতে চমৎকার। মুখে নেয়ামাত্র সমস্ত মুখে ঠাণ্ডা ভাব হলো। তৃষ্ণা দূর হয়ে গেল। মতিন সাহেব দু’টি কাপই শেষ করলেন। অন্য কাপটির তরল বস্তুর স্বাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঝাঁঝালো— টক টক।

মতিন সাহেব বললেন, ‘স্যার! আপনাদের ধন্যবাদ।’

পুরুষদের একজন এগিয়ে এসে মতিন সাহেবকে হাতের ইশারায় বলল, ‘তিনি যেন যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন।’

প্রথমবারেই মতিন সাহেব তা বুঝলেন। তবু সে বারবার এটা বুঝতে লাগল। মতিন সাহেব বললেন, ‘আপনার কথা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি।

আপনি যা বলবেন আমি তা-ই করব। শুধু যদি একটু বুঝিয়ে দেন আমি এখানে কীভাবে আসলাম, আপনারা কারা— তা হলে মনটা শান্ত হবে। আমার মনটা খুব অস্থির হয়ে আছে।’

তারা এই কথায় একসঙ্গে হাসল। মতিন সাহেব ভেবে পেলেন না— তিনি এমন কী বলেছেন যাতে এদের হাসি আসবে। বোঝাই যাচ্ছে তিনি কোনো ভয়ঙ্কর ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন। এতে হাসির তো কিছু নেই।

আরও তিনজন লোক এসে উপস্থিত হয়েছে। এরা আগের তিনজনের মতো হেঁটে আসেনি— গাড়িতে করে এসেছে। গাড়িগুলিকে কি গাড়ি বলা যায়? হাওয়া গাড়ি? কারণ গাড়িগুলো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এসেছে। গাড়ি-ভর্তি নানান ধরনের যন্ত্রপাতি। নতুন তিনজন মানুষ গাড়ি থেকে নেমেই মতিন সাহেবের চারদিকে যন্ত্রপাতি বসাতে লাগল। এমন সব বিকট আকৃতির যন্ত্র যে তাকালেই বুকে ধবক করে ধাক্কা লাগে।

মতিন সাহেবের চোখের ঠিক সোজাসুজি দশ ফুটের মতো দূরে টিভি পর্দার মতো পাতলা একটি পর্দা বসানো হয়েছে। মনে হচ্ছে এইটিই সবচেয়ে জটিল যন্ত্র। কারণ ছয়জন মানুষের মধ্যে চারজনই এটি নিয়ে ব্যস্ত।

মতিন সাহেব বাচ্চাগুলিকে কোথায়ও দেখতে পেলেন না। এরা নিঃশব্দে সরে গেছে। শুধু যে বাচ্চাটি বাদাম খেয়েছে সে দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত তাকেও নড়াচড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, তার চারপাশে গোল করে সাদা রঙের দাগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া এই দাগের বাইরে যাচ্ছে না। বাচ্চাটাকে এখন ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

মতিন সাহেব বললেন, ‘স্বামী! আমি কি বসতে পারি। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পায়ে ঝাঁ-ঝি ধরে গেছে।’

এরা তার কথা বুঝতে পারল। সম্ভবত যন্ত্রপাতিগুলি ভাষা অনুবাদ করে দিচ্ছে কিংবা কে জানে হয়তো তারা মনের কথা বুঝতে পারে।

সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটি তাঁকে বসতে ইশারা করল। মতিন সাহেব বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাদা পর্দাটা নিচে নেমে এল। চোখের সোজাসুজি স্থির হয়ে গেল। তিনি ডানদিকে ফিরলেন। পর্দাও ডানদিকে সরে গেল। মজার ব্যাপার তো!

বয়স্ক লোকটি ইশারায় বলল, পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকতে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে পর্দায় কিছু দেখা যাবে। অথচ তিনি কিছুই দেখছেন না। লোকগুলি মনে হয় এতে খুব হতাশ হচ্ছে। মতিন সাহেবের আবার পানির পিপাসা পেয়ে গেল। একটু আগে পানি চেয়েছেন। আবার চাইতে লজ্জা লাগছে। তা ছাড়া এরা সবাই পর্দাটা নিয়ে খুব ব্যস্ত। হাওয়া গাড়িতে আরো তিনজন মানুষ এল। এখানকার ছ’জন থেকে তিনজন ফিরে গেল। এই তিনজন সম্ভবত পর্দার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। এখন নতুন তিনজনই কাজ করছে। আগের

তিনজন একটু দূরে হতাশ মুখে দাঁড়ানো। মনে হচ্ছে পর্দাটা ঠিকঠাক করা তাদের কাছে খুব জরুরি।

মতিন সাহেব মাথায় আচমকা একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় ছবি দেখতে পেলেন। নিজের ছবি। দু' হাত মেলে দশটি আঙুল বের করে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। এর মানে কী?

মতিন সাহেব বললেন, 'স্যার! আমি ছবি দেখতে পাচ্ছি। নিজের ছবি।'

সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবি মুছে গেল। পর্দায় দেখা গেল তার পাশে বসে থাকা বাচ্চাটির ছবি। সেও আঙুল মেলে দাঁড়িয়ে আছে। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার— এই ছেলেটির প্রতি হাতে চারটি করে মোট আটটি আঙুল। তিনি পর্দা থেকে চোখ ফিরিয়ে পাশে বসে থাকা ছেলেটির দিকে তাকালেন। আসলেও তাই। এর হাতে চারটি করে আঙুল। পায়েও তাই।

তিনি চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির দিকে তাকালেন। এদেরও সবার হাতে চারটি করে আঙুল। পর্দার ছবির অর্থ এখন পরিষ্কার হচ্ছে— এরা বলতে চাচ্ছে— আমরা দেখতে অবিকল তোমাদের মতো হলেও কিছু পার্থক্য আছে। এই হচ্ছে সেই পার্থক্য।

এখন আরও সব পার্থক্য দেখানো হচ্ছে— এগুলি মতিন সাহেব কিছুই বুঝছেন না। তারা চলে গেছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ডিএনএ, আরএনএ তে। পুরো জিনিসটি যদিও দেখানো হচ্ছে ছবিতে তবু মতিন সাহেব কিছু বুঝলেন না। লাজুক গলায় বললেন,

'স্যার! আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি আর্টস-এর ছাত্র। বি.এ-তে আমার ছিল লজিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইসলামের ইতিহাস।'

পর্দার ছবি মুছে গেল। এখন অন্য ছবি আসছে। এই ছবিতে বাদাম খাওয়া বাচ্চাটিকে বাগানে হাটতে দেখা যাচ্ছে। এটাই সেই বাগান। বাচ্চাটি হঠাৎ থমকে দাঁড়ানো। মনে হচ্ছে সে কিছু-একটা দেখে ভয় পেয়েছে— সে উল্টো দিকে দৌড়াচ্ছে। আরো কয়েকটি শিশুর সঙ্গে তার দেখা হলো। এবার সে কিছুটা সাহস ফিরে পেয়েছে। অন্য শিশুরাও আসছে তার সঙ্গে সঙ্গে। তারা যে জিনিসটি দেখে ভয় পেয়েছে এবার সেটিকে দেখা যাচ্ছে— জিনিসটি হচ্ছে মতিন সাহেব।

পর্দায় দেখানো হচ্ছে মতিন সাহেবের এই জায়গায় আসার ছবি। মনে হচ্ছে দূরে ক্যামেরা বসিয়ে পুরো জিনিসটারই ছবি তোলা হয়েছে। এখন সে ছবি দেখানো হচ্ছে।

মতিন সাহেব দ্বিতীয় দফায় মাথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি এদের কথা বুঝতে পারলেন। পরিষ্কার শুনলেন মাথার ভেতরে কে যেন বলছে—

'আপনি কি আমাদের কথা বুঝতে পারছেন? আমরা নানানভাবে চেষ্টা

করছি যাতে আপনি আমাদের কথা বুঝেন। আমরা আপনার চিন্তাভাবনা বুঝতে পারছি না। শেষ চেষ্টা হিসাবে ইরিওক্রোম পর্দা ব্যবহার করছি। এই পর্দায় তীব্র শক্তির রেডিয়েশন ব্যবহৃত হয় যা আপনার মস্তিষ্কের নিওরনের জন্যে ক্ষতিকর। কাজেই এই পর্দা আমরা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারব না। আপনি কি আমাদের কথা বুঝতে পারছেন?’

‘পারছি।’

‘অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। আপনি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।’

‘আপনারা কারা?’

‘আপনি এবং আমরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুই প্রান্তের অধিবাসী। আপনার বাসস্থান যাকে আপনি পৃথিবী বলেন তার দূরত্ব আমাদের এখান থেকে প্রায় এক কোটি আলোকবর্ষ।’

‘আমি এখানে কী করে এলাম?’

‘এই প্রশ্নের জবাব আমাদের জানা নেই। বিজ্ঞানীরা একটি থিওরি দিয়েছেন— সেই থিওরি আপনি চাইলে আপনাকে বলতে পারি।’

‘আমি থিওরি বুঝব না— আমি বলতে গেলে একজন মূর্খ মানুষ। বি.এ. পাশ করেছি থার্ড ডিভিশনে। তাও প্রথমবারে পাস করতে পারিনি, ইংরেজিতে রেফার্ড ছিল।’

‘এই থিওরি যে-কেউ বুঝতে পারবে। আপনিও পারবেন। বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে নিজেদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে কিছু থিওরি তৈরি করেন। এটিও সে জাতের থিওরি। বিজ্ঞানীরা বলছেন— প্রকৃতির অতি সুশৃঙ্খল নিয়মেও মাঝে-মধ্যে ভুল হয়ে যায়। ভুল করে প্রকৃতি। আপনার ক্ষেত্রেও এ-রকম ভুল হয়েছে। যার জন্যে আমাদের দূরত্ব থেকে আপনি উপস্থিত হয়েছেন এখানে। তবে প্রকৃতি অতি দ্রুত তার ভুল ঠিক করে। আপনার ক্ষেত্রেও তা-ই করবে বলে আমাদের ধারণা। আপনি যেখানে থেকে এসেছেন আবার সেখানে ফিরে যাবেন। প্রকৃতি এই ব্যবস্থা করবে। আমাদের কিছু করার ক্ষমতা নেই। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান অতি উন্নত হওয়া সত্ত্বেও আমরা আপনাকে ফেরত পাঠাতে পারছি না।’

‘যদি প্রকৃতি তার ভুল ঠিক করতে না পারে তা হলে কী হবে?’

‘আপনাকে এখানেই থেকে যেতে হবে।’

‘স্যার! আমার কোনো অসুবিধা নেই। দেশ-বিদেশ দেখার আমার খুব শখ।’

‘আপনার এই শখ আমরা মেটানোর চেষ্টা করছি। পর্দায় আপনি আমাদের এই গ্রহ দেখতে পাবেন। তার প্রতিটি সুন্দর জায়গা আপনাকে দেখানো হবে। তবে যে কোনো মুহূর্তে আপনি হয়তো আপনার জায়গায় ফিরে যাবেন। দয়া

করে আমাদের কথা মনে রাখবেন। আপনার দেশের বিজ্ঞানীদের বলবেন আমাদের কথা।’

‘আমি বললে লাভ হবে না, স্যার। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। তা ছাড়া আমি কোনো বিজ্ঞানীকে চিনি না। একজনকে শুধু চিনি— আব্দুস সোবহান, খিলগাও হাইস্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক। বোটানিতে এম.এস.সি. ফার্স্ট ক্লাস।’

‘শুনুন মতিন সাহেব, আপনার এই গ্রহে আগমন একটি বিরাট ঘটনা। এই উপলক্ষে সমগ্র গ্রহে একদিনের ছুটি দেয়া হয়েছে। এই গ্রহের প্রতিটি প্রাণী বসে আছে ত্রিমাত্রিক টিভি সেটের সামনে। এই মুহূর্তে সবাই দেখছে আপনাকে। এই গ্রহে আপনার আগমন চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে এই গ্রহের সবচেয়ে বড় সড়কটির নাম রাখা হচ্ছে আপনার নামে— সড়কের দু’মাথায় থাকবে আপনার দুটি ইরিডিয়ামের মূর্তি।’

‘আমাকে লজ্জা দেবেন না, স্যার।’

‘লজ্জা দেয়ার কোনো ব্যাপার নেই। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার এই গ্রহে আগমন যে কত বড় ঘটনা তা বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছায়াপথে একই ধরনের দু’টি প্রাণের উদ্ভব হয়েছে— এটা যে কত বড় ঘটনা, আপনি অনুমানও করতে পারবেন না।’

‘একই ধরনের প্রাণী না স্যার! আঙুলে বেশকম আছে।’

‘এই তফাত সামান্য— অতি সামান্য।’

‘একটা ছোট কথা জিজ্ঞেস করি, স্যার?’

‘করুন।’

‘আপনি বলেছেন প্রকৃতি ভুল করে। প্রকৃতির কি ভুল করা উচিত?’

‘না উচিত নয়। ইয়াহুতা প্রকৃতি কোনো ভুল করেনি। সে ইচ্ছা করেই আপনাকে এখানে এনেছে। অন্য কোথাও আপনাকে নিতে পারত। তা নেয়নি। এমন এক গ্রহে এনেছে যার তাপমাত্রা আপনার পৃথিবীর মতো। যার অক্সিজেনের পরিমাণও আপনার গ্রহের অক্সিজেনের কাছাকাছি।’

মতিন সাহেব পর্দা থেকে দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্যে ফিরিয়ে নিলেন— তাকালেন চারদিকে। আশ্চর্য! কেউ নেই। শুধু বাদাম খাওয়া বাচ্চাটি বসে আছে। যে লোকগুলি যন্ত্র ঠিক করছিল তারাও নেই। চারদিকে সুনসান নীরবতা। মতিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘স্যার, ওরা কোথায়?’

‘সবাইকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।’

‘কেন?’

‘কারণ আমাদের বিজ্ঞানীদের ধারণা— আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। আপনার চারপাশের চৌম্বকক্ষেত্র পরিবর্তিত হচ্ছে। বায়ুতে আয়নের পরিমাণ বাড়ছে।’

‘ছোট বাচ্চাটিকে এখানে বসিয়ে রেখেছেন কেন?’

‘আপনাকে যখন এখানে পাঠানো হয় তখন ছোট বাচ্চাটি আপনার পাশে ছিল। অবিকল আগের অবস্থা বজায় রাখার জন্যে বাচ্চাটিকে আপনার পাশে রাখা হয়েছে।’

‘এর কোনো ক্ষতি হবে না তো?’

‘সম্ভবত না। আপনাকে আমাদের উচ্চতর বিজ্ঞানের কিছু কথা শিখিয়ে দিতে পারলে ভালো হতো। আপনি আপনার পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের তা শেখাতে পারতেন। ক্যানসারের চিকিৎসা কি শিখিয়ে দেব?’

‘দরকার নেই, স্যার। ওরা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না।’

‘তারচেয়েও বড় কথা আপনি কিছু মনে রাখতে পারবেন না।’

‘সত্যি কথা বলেছেন। আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল।’

‘চৌম্বকক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন হয়েছে— আপনি সম্ভবত চলে যাচ্ছেন। পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকুন। দেখুন, আমাদের গ্রহ দেখুন— শেষবারের মতো দেখুন।’

মতিন সাহেব পর্দার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে এই বিচিত্র গ্রহ দেখলেন— দেখলেন তার ভূগর্ভস্থ বিশাল আগ্নেয়গিরি, দেখলেন তুষারঢাকা পর্বতমালা, দেখলেন বনভূমি, দেখলেন এই গ্রহের প্রাণদায়িনী সূর্য— যার আলো কিঞ্চিৎ নীলাভ।

তাকে গুনানো হলো তাঁদের স্রষ্টার সঙ্গীত। দেখানো হলো মহান সব শিল্পকর্ম। আহ্ কী অপূর্ব অভিজ্ঞতা! মতিন সাহেব ইরিডিয়ামের তৈরি তাঁর দু’টি মূর্তিও দেখলেন। কী বিশাল মূর্তি! আগামী লক্ষ বছর এই মূর্তির কিছু হবে না। এই গ্রহের অসংখ্য সুন্দর মানুষগুলি তাঁর মূর্তির দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাবে।

‘হে ভিন গ্রহের মানুষ! আমাদের ধারণা আপনার বিদায়ের মুহূর্ত সমাগত। চৌম্বকক্ষেত্র সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। বিদায়, বিদায়।’

এই গ্রহের সব ক’টি মানুষ একসঙ্গে বলল— ‘বিদায়, বিদায়।’

মতিন সাহেব হঠাৎ এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করলেন। শরীরের প্রতিটি রক্ত কণিকা এক সঙ্গে কেঁপে উঠল। তারপর সব আগের মতো হয়ে গেল। তিনি দেখলেন রমনা পার্কের বেঞ্চিতে তিনি চুপচাপ বসে আছেন। হাতে বাদামের ঠোঙা। বাদামওয়ালা টাকার ভাংতি নিয়ে এসেছে। তিনি বাদামওয়ালাকে চারটা টাকা দিলেন। তাঁর রুটিনের ব্যতিক্রম হলো না। দুপুরে বেঞ্চিতে ঘুমালেন। বিকেলে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেন। সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে বাসায় ফিরলেন।

নামাজের সময় হয়েছে তিনি বারান্দায় বসে বদনার পানিতে অঙ্গু করছেন। তারা স্ত্রী চিৎকার করে উঠলেন— ‘ওকি! ওকি!’

মতিন সাহেব বললেন, ‘কী হলো?’

‘তোমার হাতে চারটা আঙুল কেন?’

মতিন সাহেব হাতের দিকে তাকালেন। আসলেই তাই। দু’টি হাতেই চারটি করে আঙুল। শুধু হাতে নয়। পায়েও তাই।

‘কী হয়েছে তোমার? এসব কী?’

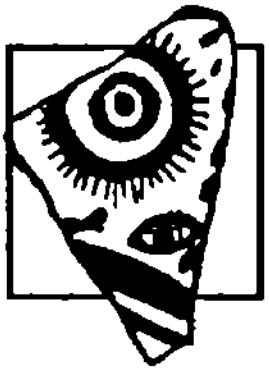
মতিন সাহেব উদাস গলায় বললেন, ‘জানি না।’

‘কী বলছ তুমি! কী সর্বনাশের কথা!’

মতিন সাহেব বললেন, ‘সর্বনাশের কী আছে? চারটা আঙুলে অসুবিধা তো হচ্ছে না।’

তিনি নির্বিকার ভঙ্গিতে অজু করে যাচ্ছেন। আঙুল চারটা হয়ে যাওয়ায় তাঁর মধ্যে কোনো ভাবান্তর হচ্ছে না। তিনি জানেন প্রকৃতি ভুল করে না। ঐ গ্রহ থেকে এখানে ফিরিয়ে আনার সময় প্রকৃতি এই সামান্য পরিবর্তন করেছে। নিশ্চয়ই তার প্রয়োজন ছিল। অন্তত তিনি নিজে তো বুঝছেন— তাঁর জীবনে যা ঘটেছে তা স্বপ্ন নয়— বাস্তবেই ঘটেছে। প্রকৃতি তার প্রমাণ রেখে গেল।

তা ছাড়া চার আঙুলে হাতটাকে দেখাচ্ছে সুন্দর।



AMARBOL.COM

শিকার

সে হাঁটে নিঃশব্দে।

যখন হাঁটে বাতাস পর্যন্ত কাঁপে না। নৈঃশব্দের চলাফেরা। কিন্তু মতি মিয়া টের পায়। অন্ধ মানুষদের এই একটি সুবিধা। এরা বাতাস শুঁকে অনেক কিছু বলে দিতে পারে। আজও পারল। মাথা ঘুরিয়ে বলল, ‘কেডা যায়? আজরফ নাহি?’

আজরফ জবাব দিল না। যে নিঃশব্দে হাঁটে সে ফস করে জবাব দেবে এটা আশা করা যায় না। মতি মিয়া আশাও করে না। দ্বিতীয়বার ডাকে, ‘আজরফ, ও আজরফ মিয়া।’ আজরফ এবারও জবাব দেয় না। জবাব দেয় তার পোষা

বক । বকটির বয়স মাত্র পাঁচ মাস কিন্তু সে নব্বুই বছরের বুড়োর মতো ডাকে
কক কক ককর । বড় কুৎসিত ডাক । মতি মিয়া নড়েচড়ে উঠে ।

‘আজরফ বক ধরতে যাস নাহি?’

‘হ ।’

‘যাইস না বাজান । সোনা চান আমার ।’

‘আজরফ চুপ করে থাকে ।’

‘পক্ষী ধরন বালা না । বদদোয়া লাগে । আমাকে দেইখ্যা বুঝস না? ও
আজরফ । আজরফ মিয়া ।’

‘কী?’

‘ব’ তুই । তরে একটা গফ কই । ক্যামনে বদদোয়া লাগে হেই গফ ।’

আজরফ বসে না । গল্পের প্রসঙ্গ আসায় খাঁচার বকটি সম্ভবত উৎসাহী হয় ।
সে ডানা ঝাপ্টায় এবং দ্বিতীয়বার ডাকে, কক কক কক । মতি মিয়া জুত হয়ে
বসে । কার্তিক মাসের নরম রোদ তার পিঠে । রোদের মধ্যে নেশা জাতীয় কিছু
কি আছে? কেমন যেন নেশা-নেশা ভাব হয় । বড় ভালো লাগে মতি মিয়ার ।
এই বয়সে শরীর বাড়তি উত্তাপ চায় । মতি মিয়ার সব রাতেই ইচ্ছা করে
চারপাশে আগুন করে মাঝখানে বসে থাকতে । কিন্তু এখন মাত্র কার্তিক মাস ।
শীতও ভালো করে পড়েনি ।

‘আজরফ আছস?’

‘হ ।’

‘বক পক্ষীর কথা কই । বড় হুরামি পক্ষী । বুঝছস?’

‘বুঝলাম ।’

‘যে বক ধরে তার চউখ থাকে না । চউখ তার যায় । আইজ হউক কাইল
হউক চউখ যায় । আমাকে দেইখ্যা বুঝস না?’

বক পক্ষীর হুরামিখানা বুঝাবার জন্যে মতি মিয়া তার বুজে যাওয়া চোখ
মেলতে চেষ্টা করে । মেলতে অবিশ্যি পারে না ।

‘অ আজরফ ।’

‘কও হুনতাছি ।’

‘ব’ আজরফ ।’

আজরফ বসে না । মতি মিয়ার পিঠে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে । মতি মিয়া
গানের মতো সুরে কথা বলে,

‘বক পক্ষী মরণঠোকর দেয় বুঝছস? আর ঠোকর দেয় জায়গামতো ।
পরথম ধাক্কায় যায় ডাইন চউখ, পরের ধাক্কায় বাঁও । দুনিয়া হয় আন্ধাইর ।
নয়নের মতো জিনিস নাই রে বাজান ।’

আজরফ শুনছে কিনা মতি মিয়া বুঝতে পারে না । খাঁচার বন্দি বক ডানা
ঝাপ্টায় । মতি মিয়া তাতেই উৎসাহ বোধ করে ।

‘বক-মারার চউখ থাকে না রে আজরফ। আমারে দেইখ্যা বিবেচনা কর। নেজামের ভাইস্তার কথা মনে আছে?’

‘কোন নেজাম?’

মতি মিয়া উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে। নেজামের ভাইস্তার গল্প সবিস্তারে শুরু করে। কথা বলতে তার বড় আরাম লাগে। তা ছাড়া পিঠের উপর কার্তিক মাসের রোদ। রোদের মতো ভালো জিনিস আছে? এক পর্যায়ে ঝিমুনি এসে যায় মতি মিয়ার।

আজরফ বসে থাকে উত্তর বন্দের নাবালে একটা জলা জায়গায়। তার এক হাতে বক ধরার ফাঁদ। কাঁচা বেতপাতা দিয়ে ঢাকা গোল করে বাঁধা একটা চাটাই। বক ক্ষীণ দৃষ্টির পাখি। ফাঁদটাকে তাদের কাছে মনোরম একটা ঝোপের মতো লাগে। দড়ি দিয়ে বাঁধা পোষা বকটি বসে থাকে চাটাইয়ের মাথায়। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘনঘন ডাকে। সেই ককখ ডাকে বকদের প্রতি কোনো করুণ আবেদন থাকে নিশ্চয়ই। কারণ, খুঁজে বকের দল তখন মাথার উপর চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। পোষা বকটি ক্রমাগত ডাকে। বকরা নিচে নেমে আসে। সন্দেহ ভরা চোখে তাকায়। তবু নেমে আসে। এবং একসময় পোষা বকটির পাশে এসে বসে। গভীর মমতায় কিছু হয়তো বলতে চায়। কিন্তু সে সুযোগ হয় না। বক-শিকারী এক হাতে খপ করে তার পা ধরে বিদ্যুৎগতিতে তাকে নামিয়ে এনে পুয়ের নিচে চাপা দেয়। দ্রুত তাকে হাত খালি করতে হয়। কারণ, অন্য আরেকটি বক নামতে শুরু করেছে। সময় নেই মোটেই। বক নিচে নামানোর সময়টাই ভয়াবহ। হকচকিত পাখিটি একবার হলেও মরণঠোকর দিতে চেষ্টা করে। সে তখন খুঁজে মানুষের চোখ। একটা নরম তুলতুলে জায়গা যেখানে ঠোট অনেকখানি বসিয়ে দেয়া যায়। বক মারার চোখ যায় বকের ঠোটে। প্রথমে ডানটি তারপর বাঁটি।

আজ পাখিরা আসছে না। বেলা হয়ে গেছে বোধহয়। রোদ চড়ে গেলে পাখিরা নিচে নামতে চায় না। আজরফ তাকাল আকাশের দিকে। আকাশ শূন্য এবং ঘন নীল। এমন নীল যে দৃষ্টি পিছলে যায়। তাকিয়ে থাকলে মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হয়। শূন্য নীল আকাশের মতো অদ্ভুত জিনিস আর আছে নাকি?

‘কিছু পাইছ আজরফ?’

আজরফ তাকিয়ে দেখল মেম্বার সাব। মেম্বার জাতীয় লোকরা সবার সঙ্গেই দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কথা বলে। এরা কথা বলতে বড় পছন্দ করে।

‘ওখনও মনে হয় কিছু পাও নাই?’

‘জি না।’

‘কেমন ধরা পড়ে, ও আজরফ?’

‘ঠিক নাই, কোনো দিন আট-দশটাও পাই।’

‘কও কি! দুই টেকা কইরা বেচলেও তো বিশ টাকা। কত কইরা বেচ?’

‘ঠিক নাই।’

আজরফের কথা বলতে ভালো লাগে না। সে তাকায় আকাশের দিকে। দূরে বহুদূরে একটি বক চক্কর খাচ্ছে। এটি কি নামবে? পোষা বকটি উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ডানা ঝাপটাচ্ছে। আজরফ নিজের মনেই বলে— আইতাছে। ডাক দেরে অনুফা। তর বন্ধুরে ডাক দে দেহী। পোষা বক (যার গোপন নাম অনুফা) ডাকে না, তৃষ্ণার্ত চোখে তাকায় আকাশের দিকে। মেম্বার সাহেবও তাকান। তারপর একসময় রবারের জুতায় জলাভূমিতে ছপছপ শব্দ তুলে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে গিয়ে উঠেন। সেখানে দাঁড়িয়ে ছাতা নেড়ে নেড়ে বলেন, যাইরে আজরফ।

আজরফ তাকায় তাঁর দিকে, ঠিক তখনই তাঁর বাঁ চোখ টনটন করে উঠে। চোখ দিয়ে পানি পড়তে শুরু করে। এটা খুব খারাপ লক্ষণ। এর মানে হচ্ছে বাঁ চোখটির সময় শেষ হয়ে এসেছে। ধরা পড়া বকগুলির কোনো-একটি ঠোকরে তুলে নেবে বাঁ চোখ। কিংবা হয়তো পোষা বকটি মরণ ঠোকর দেবে। বড় হারামী পাখি। আজরফ তাকাল অনুফার দিকে। ফাঁদের মাথায় শান্ত ভঙ্গিতে সে বসে আছে। আজরফের চোখে জল জমে আছে বলেই সবকিছু অন্য রকম দেখাচ্ছে। ছোট অনুফাকে দেখাচ্ছে একাও সারস পাখির মতো। তার ঠোট দু’টি সুবিশাল।

আজরফ শার্টের হাতায় চোখ মুছল, কিন্তু জল পড়া বন্ধ হলো না। যাবে, এবার বাঁ চোখটা যাবে। আজই বোধহয় যাবে।

সফদর আলির এরকম হলো। কথা নেই বার্তা নেই শুধু ডান চোখ দিয়ে জল পড়ে। সফদর ভাই দেখা হলেই বলতো, ‘ডাইন চউখটা এইবার যাইব। বুঝছস আজরফ? এইটা নিশানা।’

‘ক্যামনে কন?’

‘চউখের নিজের একটা জীবন আছে। হে বুঝে।’

কথা ঠিক। তাঁর চোখ সত্যি সত্যি গেল। ভয়াবহ ব্যাপার! সফদর ভাইয়ের ভয়ঙ্কর চিৎকারে নবীনগরের সমস্ত মানুষের বুক কাঁপতে লাগল। পাখিরা কি কিছু বুঝতে পারে? সফদর ভাইয়ের পোষা বক (যার নাম সোনা) ক্রমাগত ডাকতে লাগল, ‘কক কক কক।’ সেই ডাক বেদনার ডাক না আনন্দ-উল্লাসের ডাক? — কোনোদিন জানা যাবে না।

সদর হাসপাতাল নেত্রকোণায়। নৌকায় যেতে লাগে দু’দিন। ন্যাকড়া পোড়া ছাই দিয়ে চোখ বেঁধে নৌকায় তোলা হলো সফদর আলিকে। মাথার কাছে বসে রইল আজরফ আর সফদর আলির ছোট ছেলেটা, যার নামও

সোনা। বড় খারাপ যাত্রা ছিল সেটি। একেকবার মাথা তুলে হো হো করে চিৎকার করে উঠতো সফদর। তার ছেলেটাও তখন অবিকল বাবার মতো চোঁচাত, হো হো।

সদর হাসপাতালের বারান্দায় চারদিন শুয়ে থেকে পঞ্চম দিন সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হলো। চোখ বিষিয়ে গিয়েছিল।

আজরফ আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ কেন যেন ঘোলাটে হয়ে আসছে। দু'একটা সঙ্গীহীন বক উড়ে উড়ে যাচ্ছে। এরা এখন ঘুরবে। একা একা। ঝাঁক বাঁধার সময় এখনো হয়নি। ঝাঁক বাঁধা হবে আরো দু'মাস পর। তখন বকগুলি অন্য রকম হয়ে যাবে। পোষা বকের ডাকে আর নিচে নামবে না। কেন নামবে না? জগতে অনেক অমীমাংসিত রহস্য আছে। এ জগৎ বড় রহস্যময়। চোখ যাবার সময় হলে চোখ কাঁদে? আজরফ লুঙ্গির এক প্রান্ত টেনে চোখ মুছল। বড্ড জল পড়ছে। বেচারি কু কাঁদছে। বোধহয় ঘরতে চায় না।

অনুফা মাথাটা কাত করে তাকে দেখছে। তার ছোট্ট মোখ দুটি টকটকে লাল। সে হঠাৎ কক কক করে ডেকে উঠল। সে কি কিছু বুঝে ফেলেছে? বুঝে ফেলেছে যে আজ পাখি-মারা আজরফের বাঁ চোখটি যাবে। আর সে আসবে না ফাঁদ নিয়ে। উত্তর বন্দের নাবাল জমিটায় চুপচাপ এসে বসে থাকবে না।

পশু-পাখিরা অনেক কিছু বুঝতে পারে। মতি মিয়ার ধারণা— ওরা মানুষের চেয়েও অনেক বেশি জানে। বেশি জানে বলেই গৃহস্থের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে কুপাখি আসে। কুডাক ডেকে ধীরে ধীরে উড়ে উড়ে যায়। গৃহস্থের পোষা কুকুর কাঁদে উঁ-উঁ করে। দীর্ঘদিনের বাস্তবসাপ হঠাৎ করে ঘর ছেড়ে যায়। মতি মিয়া বলে, বুঝছস আজরফ, পশু-পাখি খুব বুঝদার। এইডা আমার কথা না, হজরত সোলায়মান আলিমুল্লিস সালামের কথা। তারা সব বুঝে। সব না বুঝলে চউক্ষে ক্যান ঠোকর দেয়? শইলে জায়গা তো আরো আছে। আছে না? তুই ক' দেহি?

আকাশের বকগুলি চক্কর দিতে দিতে নিচে নামতে শুরু করেছে। অনেকগুলি পাখি একসঙ্গে। এ-রকম তো হয় না। তা ছাড়া রোদ চড়ে গেছে। এই সময় ওরা নিচে নামে না। এখন নামছে কেন? ওরা কি সত্যি সত্যি টের পেয়েছে কিছু।

আজরফের মনে হলো আজ বেশ কিছু সাহসী পাখি স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্যে তৈরি হয়েই নিচে নামতে শুরু করেছে। এদের ঠোট অসম্ভব ধারাল এবং নিশানা অব্যর্থ। আজ এরা একের পর এক ধরা দেবে। কোনোই বাধা দেবে না। এতটুকুও চমকাবে না। তারপর তাদের একজন বিদ্যুৎগতিতে ঠোট বসাবে চোখের তরল মাংসে। সেই পাখিটি হবে সতেজ স্বাস্থ্যবান পাখি। তার বসার ভঙ্গি হবে ঝজু ও গর্বিত। তার পালক হবে দুধের মতো সাদা। আজরফের

পোষা বকটির মধ্যে অস্থিরতা দেখা গেল। সে ডাকল এবং ডাকতেই থাকল। পাখিরা চক্রাকারে নেমে আসছে। আজই সেই দিন। আজরফের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। তৃষ্ণা বোধ হলো। নিশ্বাস পড়তে লাগল ঘনঘন। পেটের মধ্যে কিছু-একটা পাক খাচ্ছে। বমি আসছে।

পাখি ধরা ছেড়ে দিলে কেমন হয়? ছেড়ে দেয়া কি যায় না? এই মুহূর্তেই তো সে অনুফার বাঁধন খুলে দিতে পারে। পারে না কি? ছেড়ে দিলেই অবিশ্যি অনুফা যাবে না। ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকবে। বন্দি জীবনেরও একটা মায়া আছে। গত বছরও সে একবার তার বক ছেড়ে দিয়েছিল। সেই বকটির নাম ছিল অম্ব। অম্ব ছাড়া পেয়েও উড়ে গেল না। ভীষণ অবাক হয়ে বারবার আজরফের মাথার উপর দিয়ে উড়তে লাগল। আজরফ বলল— যারে বেটা যা। পাখি ধরা ছাড়লাম। তুই যা।

অম্ব গেল না। চাটাইয়ের মাথায় বিষণ্ণ ভঙ্গিতে বসে থাকল। ‘যারে বেটা পাখি-মারার কাম করতাম না। তুই যা।’ অম্ব তবু বসেই রইল। তারপর একসময় খুবই অবাক হয়ে উড়ে গেল।

মতি মিয়ার ধারণা বকশিকারী কখনো শিকার ছাড়তে পারে না। বড় পাঁজী নেশা। জীবন্ত কিছু ধরে ফেলার মতো কড়া নেশা আর কিছু নেই। তাই প্রতিবছরই যে একবার বলত, ‘পাখি ধরা ছাড়লাম গো। আর না। বহুত হইছে।’ তারপর দিন কাটাত খুবই বিষণ্ণভাবে। কিছুতেই তখন আর মন বসে না। পরের বৈশাখে আবার সে বকের ছানা এনে পুষতে শুরু করত। কার্তিক মাসে সেই পোষমানা বক নিয়ে লাজুক ভঙ্গিতে ঘর ছেড়ে বের হতো। লোকজন বলত, ‘কি মিয়া আবার শুরু করলো?’

‘এই এটু।’

পাখি-মারার চোখ না যাওয়া পর্যন্ত ফিরতে পারে না। প্রথমে যায় একটি। নেশা তখন আরো বাড়ে। রক্তের মধ্যে ঝামঝম শব্দ হতে থাকে। কক কক ডাক শুনলেই স্নায়ু কাঁপতে থাকে উল্লাসে। তারপর যায় দ্বিতীয় চোখ। জগৎ অন্ধকার হয়। অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত এদের মুক্তি নেই। যখন সব অন্ধকার হয় তখন নেশা কেটে যায়। তখন তারা রাত জেগে পাখির ডানা ঝাপ্টানি শোনে। সুযোগ পেলেই তত্ত্ব কথা বলে। অন্ধরা তত্ত্ব কথা বলতে বড় ভালোবাসে।

আজরফ অনুফাকে ছেড়ে দিল। যা ভাবা গিয়েছিল তাই। অনুফা একটু উড়ে গিয়েই আবার এসে বসল চাটাইয়ের মাথায়। আজরফ ক্লান্ত স্বরে বলল, ‘হুস হুস যা ভাগ।’ অনুফা গেল না। তার বসার ভঙ্গি ঝজু ও গর্বিত। তার পালক দুধের মতো সাদা। একটি সতেজ স্বাস্থ্যবান পাখি।

‘যা ভাগ ভাগ। যা।’

‘কক কক।’

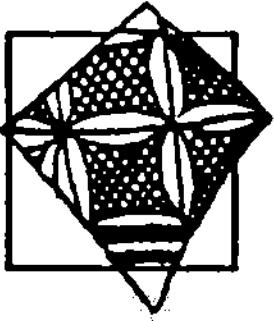
‘ভাগ ব্যাটা ভাগ ।’

‘কক কক ককর ।’

‘পাখি মারা ছাড়ছি, তুই যা ।’

‘কক কক ।’

অনুফা তার ধবধবে সাদা পালকে ঠোট ঘসল । এর মানে কী? এইটিই কি সেই পাখি? কড়া রোদ । আকাশ ঘোলাটে । অনেকগুলি পাখি চক্রাকারে উড়ছে । যেন সাহস দিচ্ছে অনুফাকে । আছি, আমরা আছি । আজরফের হৃদপিণ্ড লাফাতে লাগল । শরীর ঝনঝন করছে । স্নায়ু টানটান হয়ে উঠছে । সময় নেই । আজই সেই বোঝাপড়ার দিন । অতি দ্রুত এখন অনুফার হলুদ পা ঝাপ্টে ধরে ফেলতে হবে । বিদ্যুৎগতিতে নামিয়ে আনতে হবে নিচে । আজরফ ঘাড় উঁচু করে তাকাল । অনুফাও তাকাল । আজরফের চোখে আবার জল আসছে । পাখিটিকে আবার প্রকাণ্ড মনে হচ্ছে । যেন সাদা পালকের অতিকায় একটি অচেনা পাখি । এর জন্ম অদেখা এক ভুবনে । মাথার উপর উড়তে থাকিগ একগুলি দ্রুত নিচে নেমে আসছে । আজরফ হাত বাড়াল । আসছে ওরা নেমে আসছে । এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত কাঁপিয়ে তারা ডাকল— কক কক ।



অসুখ

নয়া পল্টনের এক গলিতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল । আমার রিফ্লেক্স অ্যাকশান খুব ভালো । চট করে একটা দোকানের আড়ালে চলে গেলাম । কিন্তু তিনি চেষ্টা করে উঠলেন, ‘আরে রঞ্জু না?’ তিনি এগিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন । আমি নিরীহ ভঙ্গিতে বললাম, ‘কেমন আছেন স্যার?’

অতিরিক্ত উত্তেজনায় স্যারের হাঁপানির টান এসে গেল । সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না । আকাশের দিকে তাকিয়ে শ্বাস টানতে লাগলেন । দম ফিরে পাওয়ামাত্র প্রথম যে কথাটি বললেন, তা হচ্ছে— ‘চল আমার সঙ্গে ।’

‘এখন তো স্যার যেতে পারব না । জরুরি কাজ আছে মতিঝিলে । একজন বসে থাকবে ।’

স্যার আরও জোরে আমার হাত চেপে ধরলেন। যেন আমি হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যাব। আমি বললাম, 'স্যার আমি বরং কাল সকালে একবার আসব। বাসায় থাকবেন তো? সকাল দশটার মধ্যে চলে আসব'।

'আমি তোমাকে অনেকদিন থেকে খুঁজছি। তুমি যে ঠিকানা দিয়েছিলে সেই ঠিকানায় কয়েক বার গেছি। সেখানে তো কেউ থাকে না।'

আমি জবাব দিলাম না। স্যার বললেন, 'খোকনের মা'র অবস্থা খুব খারাপ। তোমাকে খুঁজছি এইজন্যেই।'

'অসুখ বেছেড়ে নাকি?'

'বাড়া-কমা আর কি। বেশিদিন বাঁচবে না। মরাই এখন ভালো।'

আমি কিছু বললাম না। স্যার মৃদুস্বরে বললেন, 'এখন খুব বিরক্ত করে। চেষ্টামেচি করে। আর ভাল্লাগে না। তোমাকে অনেক খুঁজছি। কেউ ঠিকানা বলতে পারে না।'

তারপর আর না যাওয়া ভালো দেখায় না। আমি বিরক্ত মুখে হাঁটতে শুরু করলাম। মতিঝিলে ফজলু আমার জন্যে সত্যি সত্যি অপেক্ষা করবে। তার আমাকে নিয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যাওয়ার কথা। সেই ইঞ্জিনিয়ার নাকি ইচ্ছা করলেই দু'তিনটা চাকরি দিয়ে ফেলতে পারেন। এইসব গালগল্প আজকাল আমি আর বিশ্বাস করি না। তবু যে যা বলে করি। এখন যদি কেউ আমাকে বলে অমুক লোকের বাড়ির সামনে দিয়ে দশবার ডিগবাজি খেলে আমার একটি চাকরি হবে। আমি সম্ভবত তাও করব। ফজলু করবে তার চেয়েও বেশি। সে হয়তো ক্রীড়া ডিগবাজি খাবে।

আমরা হাঁটছি নিঃশব্দে। রাস্তায় হাঁটলেই আমার সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করে। এখন সেটা সম্ভব নয়। কারণ, আমার সঙ্গে পা মিলিয়ে যিনি হাঁটছেন তিনি স্কুলে আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। এবং তাঁর বড় ছেলেটির সঙ্গে এককালে আমার দায়িত্ব বন্ধুত্ব ছিল।

'স্যার, বাসার অন্য সবাই ভালো?'

স্যার জবাব দিলেন না। সম্ভবত এখন আর তিনি কানে তেমন ভালো শুনেন না। স্কুলে থাকতেও কম শুনতেন। একই কথা তিনবার চারবার বলতে হতো। আমি আরেকবার বললাম, 'বাসার সবাই ভালো তো স্যার?'

'ভালো।'

'নীলুর বিয়ে হয়েছে?'

'কী বললে?'

'নীলুর বিয়ে হয়েছে নাকি?'

'হয়েছে।'

‘ছেলে কী করে?’

‘ব্যবসা করে।’

আমার অল্প একটু মন খারাপ হলো। নীলু মেয়েটি অসম্ভব রূপসী। এককালে নীলুর জন্যে আমার বেশ দুর্বলতা ছিল। বেনামিতে কয়েকটি চিঠিও লিখেছিলাম। সেই সব আমার লেখা টের পেয়ে নীলু কেঁদে-কেটে অস্থির।

আমি ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেললাম। স্যার বললেন, ‘রিকশা নিব নাকি? হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?’

‘না, না কষ্ট কীসের। চাচীর চিকিৎসা করাচ্ছেন?’

‘মৃত্যুই এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা।’

‘বিলু কেমন আছে?’

‘ভালো। ওরও বিয়ে হয়েছে। জামাই সিলেটের চা বাগানে কাজ করে।’

‘খুব অল্প বয়সে বিয়ে দিলেন মনে হয়।’

‘অল্প কোথায়? তা ছাড়া ঝামেলা কমল। ঝামেলা এখন আর ভালো লাগে না।’

স্যার আমাকে বসার ঘরে বসিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। প্রায় দু’বছর পর এলাম এ বাড়িতে। কিছুই বদলায়নি। কিছু-কিছু বাড়ি আছে যেগুলি সব সময় আগের মতো থাকে। পর্দার বড় পর্দা পাল্টায় না। কিংবা হয়তো সব সময় একই রঙের পর্দা কেনা হয়।

আমাকে অবাক করে দিয়ে নীলু এসে ঢুকল। মায়ের কাছে বেড়াতে এসেছে হয়তো। বেশ সেজেগুজে আছে। বিয়ে হবার জন্যেই হোক কিংবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক তাকে দেখাচ্ছে আরো সুন্দর। নীলু এসেই ঝগড়ার ভঙ্গিতে বলল, ‘আপনি বাবাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছিলেন কেন?’

‘ভুল না। আমি এক ঠিকানায় বেশিদিন থাকি না।’

‘রঞ্জু ভাই, আপনি একটা মিথ্যা কথা বললেন।’

‘যে ঠিকানা দিয়েছিলেন সে ঠিকানায় রঞ্জু নামের কেউ কোনোদিন ছিল না।’

আমি চুপ করে রইলাম। নীলু বলল, ‘মা’র জন্যে তো অন্তত এক-আধবার আপনার আসা উচিত। উচিত না?’

‘সময় পাই না।’

‘সময় পান না কেন? কী এমন রাজকার্য?’

‘নানান ধাক্কায় থাকি।’

‘আজ কিন্তু সন্ধ্যার আগে যেতে পারবেন না। সন্ধ্যাবেলা আমার বর আসবে। সে আপনার সঙ্গে যাবে। দেখে আসবে আপনি কোথায় থাকেন।’

নীলু এমনভাবে বর কথাটি বলল যে, তাকে আরো সুখী-সুখী মনে হলো।

বোধহয় বেশ ভালো বিয়ে হয়েছে। গলায় ভারী একটা হার। হাতে মোটা মোটা বালা। ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করি, বেনামি চিঠিগুলির কথা মনে আছে?

জিজ্ঞেস করবার আগেই স্যার এসে ভেতরে নিয়ে গেলেন। মৃদুস্বরে বললেন, ‘কাপড়চোপড় এখন আর ঠিক থাকে না। ঠিকঠাক করতে সময় লাগে।’

ঘরটি অন্ধকার। কিছুই প্রায় চোখে পড়ে না। স্যার বললেন, ‘আলো সহ্য করতে পারে না তার জন্যে এই ব্যবস্থা।’

আমি বললাম, ‘চাচী, ভালো আছেন? কোনো উত্তর এল না।’

নীলু বলল, ‘মা চিনতে পারছ? ভাইয়ার বন্ধু। রঞ্জু ভাই।’

বিছানার উপর কিছু-একটা যেন নড়ল। পরিষ্কার গলায় চাচী বললেন, ‘জানালাটা খুলে দে নীলু।’

ঘরে আলো হয়ে উঠতেই অপ্রকৃতিস্থ মহিলাটিকে আমার দেখলাম। কী ঝকঝকে চোখ! বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। মাথা ঝিমঝিম করে উঠে। আমি দ্বিতীয়বার বললাম, ‘চাচী, আমাকে চিনতে পারছেন? আমি খোকনের বন্ধু।’

চাচী কোনো জবাব দিলেন না। স্যার বললেন, ‘রঞ্জু আগাগোড়াই খোকনের সঙ্গে ছিল। খোকন কীভাবে মারা গেছে সেটা শুখুব ভালো জানে। রঞ্জু তুমি বল তো খোকন কীভাবে মারা গেল?’

আমি চুপ করে রইলাম। নীলু বলল, ‘রঞ্জু ভাই আপনি বলুন। মা কথা সব বুঝতে পারেন। আর আপনাকে মা চিনতে পেরেছেন।’

যে গল্প আরো কয়েক বার এই অপ্রকৃতিস্থ মহিলাকে শুনিয়েছি সেই গল্প আবার শুরু করলাম। চাচী তাকিয়ে রইলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

‘মেথিকান্দা অপারেশনে খোকনের তলপেটে গুলি লাগে। ওকে নিয়ে আমরা পালিয়ে আসি। খোকন মারা যায় নৌকায়। নৌকায় করে আমরা পালাচ্ছিলাম।’

চাচী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, ‘এট কি সত্যি কথা?’

‘জি সত্যি।’

চাচীর গলা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে গেল, ‘এটা কি সত্যি?’

‘জি চাচী, সত্যি। শুধু শুধু মিথ্যা কথা বলব কেন?’

চাচী এবার কেঁদে উঠলেন। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, ‘তবে যে ওরা বলে খোকনকে মিলিটারিরা ধরে ফেলেছিল, তারপর মাঠের মধ্যে নিয়ে জবাই করেছে।’

‘চাচী, এটা মিথ্যা কথা।’

‘কেন আমার ছেলেকে নিয়ে মিথ্যা কথা বলে?’

‘যুদ্ধের সময় এ রকম মিথ্যা গুজব রটে চাটী। তা ছাড়া ওরা মানুষ কীভাবে জবাই করবে? ওরা নিজেরাও তো মানুষ।’

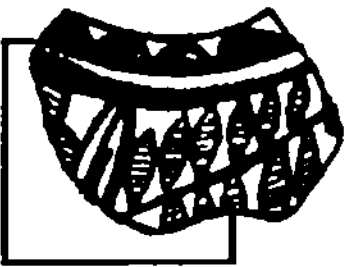
বলতে বলতে আমি ফ্যাকাশেভাবে হাসতে চেষ্টা করলাম। চাটী আর কিছু বললেন না। তাঁর উত্তেজনা কমে আসছে। এখন বেশ কিছুদিন শান্ত থাকবেন। কয়েক রাত তাঁর সুনিদ্রা হবে। তারপর আবার অস্থির হয়ে পড়বেন। স্যার খুঁজতে থাকবেন আমাকে।

মিথ্যা কথা বলতে আমার কখনো খারাপ লাগে না। একটি মা’কে প্রবোধ দেবার জন্যে আমি একলক্ষ মিথ্যা অনায়াসে বলতে পারি। কিন্তু তবুও কখনো এ বাড়িতে আসতে চাই না। অপ্রকৃতিস্থ এই মহিলাটির সামনে এসে বসলেই আমি নিজেও কিছু পরিমাণে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ি। সীমাহীন ক্রোধ আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে কোনো-একটি ভয়ঙ্কর অপরাধ করি। যে অপরাধের কথা এর আগে কেউ কখনো শুনেনি। কিন্তু আমি তা করতে চাই না।

আমি অন্য দশজন মানুষের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চাই। একটি ছোট ঘর। একজন মমতাময়ী নারী। একজন মানুষ খুব বেশি কিছু তো কখনো চায় না।

নীলু আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে খুব কাঁদল। নীলুর স্বামী এল আমার পিছু পিছু। আমি কোথায় থাকি তা জেনে আসবে। লোকটি ভালো মানুষ ধরনের। রাস্তায় নেমেই আমি তাঁকে বললাম, ‘নীলুর সঙ্গে যে আমার প্রেম ছিল সেটা আপনি জানেন নাকি ভাই?’ ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, ‘দারুণ লদকা-লদকি ছিল।’

আমি অপ্রকৃতিস্থ হতে শুরু করেছি।



খাদক

আমি লোকটির বয়স আন্দাজ করার চেষ্টা করছি। তার তেমন প্রয়োজন ছিল না। লোকটির বয়সে আমার কিছু যায়-আসে না। তবু প্রথম দর্শনেই কেন যেন বয়স জানতে ইচ্ছে করে। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, লোকটিকে বেশ ঘটা

করে আনা হয়েছে। দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে আমার সামনে। আমাদের ঘিরে মোটামুটি একটা ভিড়। লোকটি জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ হাসি হাসি। সেই হাসির আড়ালে গোপন একটা অহঙ্কারও আছে। কীসের অহঙ্কার কে জানে।

খোন্দকার সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় বললেন, ‘এই সেই লোক।’

আমি বললাম, ‘কোন লোক?’

‘খাদক।’

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ‘খাদক মানে?’

খোন্দকার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, ‘এর মধ্যেই ভুলে গেছেন? রাতে আপনাকে বললাম না— আমাদের গ্রামে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি আছে, নামকরা খাদক।’

আমার কিছুই মনে পড়ল না। খোন্দকার সাহেব লোকটি ক্রমাগত কথা বলেন। তাঁর সব কথা মন দিয়ে শোনা অনেক আগেই বন্ধ করেছি। কাল রাতে খাদক খাদক বলে কি সব যেন বলছিলেন। এ-ই তাহলে সেই বিখ্যাত খাদক।

‘ও আচ্ছা।’

আমি ভালো করে খাদকের দিকে তাকালুম।

রোগা বেঁটেখাটো একজন মানুষ। মাথার চুল নেই। সামান্য গোঁফ আছে। গোঁফ এবং ভুরুর চুল সবই পাক। পরিষ্কার একটা পাঞ্জাবি গায়ে। শুধু যে পরিষ্কার তাই না, ইঞ্জি করা। পায়ের লুঙ্গি গাঢ় নীল রঙের। পায়ে রবারের জুতা।

জুতো জোড়াও নতুন। সম্ভবত বাক্সে তুলে রাখা হয়। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পায়ে দেয়া হয়। যেমন আজ দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, ‘আপনার নাম কী?’

‘আমার নাম মতি। খাদক মতি।’

এই বলেই সে এগিয়ে এসে আমার পা ছুঁয়ে সালাম করল। বুড়ো একজন মানুষ আমার পা ছুঁয়ে সালাম করবে, আমি এমন কোনো সম্মানিত ব্যক্তি না। খুবই হকচকিয়ে গেলাম। অপ্রস্তুত গলায় বললাম, ‘এসব কী করছেন?’

লোকটি বিনয়ে নিচু হয়ে বলল, ‘আপনি জ্ঞানীলোক, আমি আপনার পায়ের ধুলা।’ বলেই সে হাত কচলাতে লাগল। তার বলার ধরন থেকেই বুঝা যাচ্ছে এ-জাতীয় কথা সে প্রায়ই বলে। অতীতে নিশ্চয়ই অনেককে বলেছে। ভবিষ্যতেও বলার ইচ্ছা রাখে।

‘হুজুর, আপনি অনুমতি দিলে পায়ের কাছে একটু বসি।’

‘আরে আসুন বসুন। অনুমতি আবার কীসের।’

লোকটি বসে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। একবারও চোখ তুলল না। তার বিনয় একটা দেখার মতো ব্যাপার।

আমার বিরক্তির সীমা রইল না। গত দু'দিন ধরে আমি এই অজপাড়াগাঁয়ে আটকা পড়ে আছি। লঞ্চে এখান থেকে আটপাড়া যাওয়ার কথা। লঞ্চার দেখা নেই। আছি খোন্দকার সাহেবের পাকা দালানে। ইনি এই অঞ্চলের একজন পয়সাওয়ালা মানুষ। নিজের মায়ের নামে স্কুল দিয়েছেন। খোন্দাকার সাহেব আমার অতি দূর-সম্পর্কের আত্মীয় কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আদর-যত্নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে গ্রামের দর্শনীয় বস্তুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার পালা। অনেক দর্শনীয় জিনিস এর মধ্যে দেখে ফেলেছি। ভাঙ্গা কালিমন্দির, যেখানে কিছুদিন আগেও নাকি নরবলি হয়েছে। একটা অচিন বৃক্ষ। সে অচিন বৃক্ষটি নাকি এক জাদুকর কামরূপ থেকে এনে পুঁতেছেন। যার ফল খেয়ে যৌবন স্থির থাকে। তবে এই ফল এখনো কেউ খায়নি, কারণ গাছটায় ফল হচ্ছে না। তেঁতুল গাছের মতো গাছ— দর্শনীয় কিছু নয়, তবু ভাব দেখালাম যে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য দেখছি।

একজন দর্শনীয় বস্তু এই মুহূর্তে আমার পায়ের কাছে মাথা নিচু করে বসে আছে। লোকটি নাকি বিখ্যাত খাদক। এক বৈঠকে আধমণ গোশত খেতে পারে।

আমি বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করছি না। কিন্তু খোন্দকার সাহেবের উৎসাহ সীমাহীন। তিনি অহঙ্কার মেশানো গলায় বললেন, 'মতি মেডেল পেয়েছে তিনটা। এই, প্রফেসর সাহেবকে মেডেল দেখা।'

মতি মিয়া পাঞ্জাবির পকেট থেকে মেডেল বের করল। মনে হচ্ছে মেডেল তার পকেটেই থাকে কিংবা আমাকে দেখানোর জন্যে সঙ্গে করে নিয়ে আসা হয়েছে। একটা মেডেল দিয়েছেন নেত্রকোনার সি.ও. রেভিনিউ, একটা আজিজিয়া স্কুলের হেড মাস্টার। অন্যটিতে নাম-ধাম কিছু লেখা নেই। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল— একজন লোক পরিমাণে বেশি খায় বলেই তাকে মেডেল দিতে হবে? দেশটা যাচ্ছে কোন দিকে?

খোন্দকার সাহেব বললেন, 'অনেক দূর দূর থেকে লোক এসে মতিনকে হায়ার করে নিয়ে যায়।'

'কেন?'

'বাজির খাওয়া হয়। মতি যায়, বাজি জিতে আসে। বরযাত্রীরা সাথে করে নিয়ে যায়। মতি সঙ্গে থাকলে মেয়ের বাড়িতে খাওয়া শর্ট পড়ে। মেয়ের বাপের একটা অপমান হয়। মেয়ের বাপের অপমান সবাই চায়।'

কিছু না বললে ভালো দেখায় না বলেই বললাম, 'ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।'

খোন্দকার সাহেব বললেন, 'মতির রোজগারও খারাপ না। হায়ার করতে

হলে তার রেট হচ্ছে কুড়ি টাকা। দূরে কোথাও নিতে হলে নৌকায় আনা নেয়ার খরচ দিতে হয়।’

আমি বললাম, ‘এইটাই কি প্রফেশন নাকি? আর কিছু করে না?’

জবাব দিল মতি মিয়া। বিনয় বিগলিত গলায় বলল, ‘খাওয়ার কাম ছাড়া কিছু করি না।’

‘কর না কেন?’

‘একসাথে দুই-তিনটা কাম করলে কোনোটাই ভালো হয় না। আল্লাহতালা একটা বিদ্যা দিচ্ছে। খাওনের বিদ্যা। অন্য কোনো বিদ্যা দেয় নাই।’

আল্লাহতালার প্রদত্ত বিদ্যার অহঙ্কার মতি মিয়ার চোখে চিকচিক করতে লাগল। আমি হাসব, না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। পাগলের প্রলাপ না-কি? খোন্দকার সাহেব দরাজ গলায় বললেন, ‘সন্ধ্যাবেলায় মতি মিয়ার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। নিজের চোখে দেখেন। শহরের দশজনের কাছে গল্প করতে পারবেন। গ্রামদেশেও দেখার জিনিস আছে প্রফেসর সাব।’

‘তা তো নিশ্চয়ই আছে। তবে ভাই, আমাকে দেখানোর জন্যে কিছু করতে হবে না। শুনেই আমার আক্কেল গুড়ুম।’

‘না দেখলে কিছু বুঝবেন না। আধমণ রান্না করা গোশত যে কতখানি সেটা দেখার পর বুঝবেন মতি মিয়া কোন পদের জিনিস। কি রে মতি, পারবি তো?’

মতি হাসি-মুখে বলল, ‘আপনাদের দশজনের দোয়া।’

‘খাওয়ার পর দুই সের চমচম ও খাবি। বিদেশী মেহমান আছে, দেখিস, বেইজ্জত যেন না হই। গ্রামের ইজ্জতের ব্যাপার।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। দরকার হইলে জেবন দিয়া দিমু।’

একটা লোক জীবন ব্যাজ রেখে খাবে আর আমি বসে বসে দেখব, এর মধ্যে আনন্দের কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ব্যাপারটা কুৎসিত। যদিও অনেক কুৎসিত দৃশ্য আমরা আগ্রহ করে দেখি। মেলায় বা সার্কাসে বিকলাঙ্গ বিকট দর্শন শিশুদের অনেকে আগ্রহ করে দেখতে আসে। এখানেও তাই হবে। মতি মিয়াকে ঘিরে ধরবে একদল মানুষ। তার সাথে আমাকেও বসে থাকতে হবে। উৎসাহ দিতে হবে। ভাগ্যিস সঙ্গে ক্যামেরা নেই। ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলতে হতো।

গ্রামে বেশ সাড়া পড়ল বলে মনে হলো। খোন্দকার সাহেব একটা গরু জবাইয়ের ব্যবস্থা করলেন। চমচম আনতে লোক চলে গেল। খোন্দকার সাহেব বললেন, ‘মতি আস্ত গরু খেতে পারবি? বিশিষ্ট মেহমান আছে। তাঁর সামনে একটা রেকর্ড হয়। ঢাকায় ফিরে উনি কাগজে লিখে দেবেন।’

আমি ভয় পেয়ে বললাম, ‘আস্ত গরু খাবার দরকার নেই। একটা কেলেকারি হবে।’

‘আরে না, মতিকে আপনি চেনেন না। ও ইচ্ছা করলে হাতি খেয়ে ফেলতে পারে। বিরাট খাদক। অতি ওস্তাদ লোক।’

‘এ-রকম ওস্তাদ বেশি না থাকাই ভালো। খেয়েই সব শেষ করে দেবে।’

‘আরে না, খাওয়াবে কে বলেন ভাই? খাওয়ানোর লোক আছে। লোক নেই। খাওয়া-খাদ্যও নেই। এই যে গরু জবাই দিলাম তার দাম তিন হাজার টাকা। দেশের অবস্থা খুব খারাপ রে ভাই।’

রান্নার আয়োজন চলছে। মতি মিয়া বসে আছে আমার সামনে। হাসি হাসি মুখে। মাঝে মাঝে বিড়ি খাবার জন্যে বারান্দায় উঠে যাচ্ছে আবার এসে বসছে। আমি বললাম, ‘এত যে খান, খাওয়ার টেকনিকটা কী?’

মতি মিয়া নড়েচড়ে বসল। উৎসাহের সঙ্গে বলল, ‘গোশ্ত চিপা দিয়া রস ফেলাইয়া দিতে হয়। কিছুক্ষণ পরপর একটু কাঁচা লবণ মুখে দিতে হয়। পানি খাওয়া নিষেধ।’

‘তাই নাকি?’

‘জি। আর চাবাইতে হয় খুব ভালো কইরা। গোশ্ত যখন মুখের মধ্যে তুলার মতো হয় তখন গিলতে হয়।’

‘কায়দা-কানুন তো অনেক আছে দেখি।’

‘বসারও কায়দা আছে। বসতে হয় সিঁধা হইয়া যেন পেটের উপর চাপ না পড়ে।’

‘এইসব শিখেছেন কোথেকে?’

‘নিজে-নিজে বাইর করছি জনাব। ওস্তাদ কেউ ছিল না। আমারে তুমি কইরা বলবেন। আমি আপনাদের গোলাম।’

মতি মিয়া খুব আগ্রহ নিয়ে নানা ধরনের গল্প শুরু করল। সবই খাদ্য বিষয়ক। দু’বছর আগে কোনো-এক প্রতিমন্ত্রী নাকি নেত্রকোনা এসেছিলেন। মতি মিয়া তাঁর সামনে আধমণ জিলেপি খেয়ে তাঁকে বিস্মিত করেছে।

‘খাইতে খুব কষ্ট হইছে জনাব।’

‘কষ্ট কেন?’

‘জিলাপির ভিতরে থাকে রস। রসটা গণ্ডগোল করে।’

মন্ত্রী সাহেব খুশি হয়েছিলেন?

‘জি খুব খুশি। ছবি তুলেছিলেন। দুই শ’ টেকাও দিছেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। বলছিলেন ঢাকায় নিয়া যাবেন, পেসিডেন সাহেবের সামনে খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। পেসিডেন সাহেবের খুশি করতে পারলে কপাল ফিরত। কথা ঠিক না?’

‘খুব ঠিক। আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব কবি মানুষ। খুশি হলে হয়তো আপনাকে নিয়ে কবিতাও লিখে ফেলতেন।’ মতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

আমি বললাম, ‘আপনার ছেলেমেয়ে কী? তারাও কি খাদক নাকি?’

‘জি-না। তারা না-খাওস্তির দল। খাইতে পায় না। কাজকাম তো কিছু করি না, খাওয়ামু কী? তারা হইল গিয়ে আফনের দেখক।’

‘সেটা আবার কী?’

‘তারা দেখে। আমি যখন খাই, তখন দেখে। দেখনের মধ্যেও আরাম আছে।’

মতি মিয়া বিমর্ষ হয়ে পড়ল। এই প্রথম বারান্দায় না গিয়ে আমার সামনেই বিড়ি ধরিয়ে খকখক করে কাশতে লাগল।

খাওয়া শুরু হলো রাত দশটার দিকে। একটা হাজার জ্বালিয়ে উঠোনে খাবার আয়োজন হয়েছে। এই প্রচণ্ড শীতে কাঁথা গায়ে গ্রাম-ভেঙ্গে লোকজন এসেছে। মতি মিয়া খালি গায়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে। ধ্যানস্থ মূর্তির মতি মিয়ার ছেলেমেয়েগুলিকেও দেখলাম। পেট বের হওয়া হাড় জিরজিরে কয়েকটি শিশু। চোখ বড় বড় করে বাবার খাবার দেখছে। শিশুগুলি ক্ষুধার্ত। হয়তো রাতেও কোনো কিছু খায় নি। মতি একবারও তার বাচ্চাগুলির দিকে তাকাচ্ছে না।

খোন্দকার সাহেব গ্রামের বিশিষ্ট কিছু লোকজনকে এই উপলক্ষে দাওয়াত করেছেন। স্কুলের হেডমাস্টার, গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার, থানার ও.সি. সাহেব, পোস্টমাস্টার সাহেব। সামাজিক মেলামেশার একটি উপলক্ষ। বিশিষ্ট মেহমানদের জন্যে খাসি জবেহ হয়েছে। দস্তুরখানা বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আলোচনার প্রধান বিষয় ইলেকশন। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খোন্দকার সাহেব ইলেকশনের ক্ষেত্র করেছেন। এর আগেরবার হেরেছেন। এবার হারতে চান না। জিততে চান এবং দেশের কাজ করতে চান।

অতিথিরা রাত বাইরেটার দিকে বিদেয় হলেন। জাঁকিয়ে শীতে পড়েছে। মতি মিয়াকে ঘিরে ঘারা বসে আছে তাদেরকে শীতে কাবু করতে পারছে না। খড়ের আগুন করা হয়েছে। সেই আগুনের চারপাশে সবাই বসে আছে। শুধু মতি মিয়ার ছেলেমেয়েরা তার বাবার চারপাশে বসে আছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার বাবার খাওয়া দেখছে। মতি মিয়া ফিরেও তাকাচ্ছে না। তার গা দিয়ে টপটপ করে ঘাম পড়ছে। চোখ দু’টি মনে হচ্ছে একটু ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। আমার মনে হয় পিতলের এই বিশাল হাঁড়ির মাংস শেষ করবার আগেই লোকটা মারা যাবে। আমি হব মৃত্যুর উপলক্ষ। মনটাই খারাপ হয়ে গেল। পুরো ব্যাপারটাই কুৎসিত। একদল ক্ষুধার্ত মানুষ একজনকে ঘিরে বসে আছে। সে খেয়েই যাচ্ছে।

খোন্দকার সাহেব এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে বললেন, ‘কেমন দেখছেন?’

‘ভালোই।’

‘বলছিলাম না বিরাট খাদক।’

‘তাই তো দেখছি।’

‘শুয়ে পড়েন। শেষ হতে দেরি হবে। সকাল দশটার আগে শেষ হবে না। এখন খাওয়া স্নো হয়ে যাবে।’

‘তাই নাকি?’

‘জি। শেষের দিকে এক টুকরো গোশত গিলতে দশ মিনিট সময় নেয়।’

আমি মতির দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘কি মতি খারাপ লাগছে?’

‘জে না।’

‘খারাপ লাগলে বাদ দাও। বাকিটা তোমার বাচ্চারা খেয়ে নেবে।’

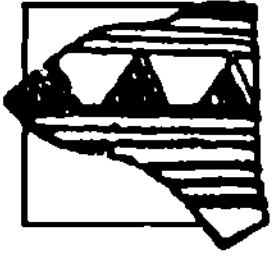
খোন্দকার সাহেব বললেন, ‘অসম্ভব— একটা রেকর্ড করছে দেখছেন না? তুমি চালিয়ে যাও মতি। ভাই আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন।’

আমি শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে অনেক চেষ্টা করলাম মতি মিয়ার চরিত্রে কিছু মানবিক গুণ ঢুকিয়ে দিতে। নানাভাবেই তা সম্ভব। রাত একটার দিকে যদি মতি মিয়া ঘোষণা করে— বাকি গোশত আমি আর খাব না। হার মানলাম। এখানে যারা আছে তারা থাক। তাহলেই হয়।

কিংবা দৃশ্যটা আরও হৃদয়স্পর্শী হয় যদি শেষ দৃশ্যটি এ-রকম হয়— মতি মিয়ার বাচ্চারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। একজন শুধু জেগে আছে। মতি মিয়া গোশতের শেষ টুকরাটি মুখে তুলে দিয়ে থমকে যাবে। মুখে না দিয়ে এগিয়ে দেবে শিশুটির দিকে। সবাই তখন চোঁচিয়ে উঠবে— করো কী করো কী? বাজিতে হেরে যাচ্ছ তুমি। এটাও খাও।

মতি মিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলবে— হারলে হারব।

আমি জানি বাস্তবে তা হবে না। সকাল দশটা হোক, এগারোটা হোক, মতি মিয়া খাওয়া শেষ করবে। কোনো দিকে ফিরেও তাকাবে না। এত কিছু দেখলে খাদক হওয়া যায় না।



ফেরা

খেতে বসে জরীর রাগ হয়ে গেল। ভাতের থালা সরিয়ে তেজি গলায় বলল, ‘মা আমি ভাত খাব না।’

দীপু বসেছিল জরীর পাশে। বড় আপা যা করে তারও তাই করা চাই। সেও হাত গুটিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, ‘মা আমিও ভাত খাব না।’

হাসিনা কিছু বলল না। জরীর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। জরী মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আগের মতো তেজী গলায় বলল, ‘রোজ রোজ এক জিনিস। ঘেন্না লাগে মা।’

বড় আপার দেখাদেখি দীপু বলল, ‘আমারও ঘেন্না লাগে। রোজ রোজ এক জিনিস।’

হাসিনার ভীষণ খিদে পেয়েছিল। দীপুর আশ্বাস কত রাতে ফিরে তার ঠিক নেই। হাসিনা খানিক ইতস্তত করে নিজের জন্যে ভাত বাড়ল। দীপুর মাথায় হাত রেখে কোমল স্বরে বলল, ‘ভাত খেয়ে ফেল, লক্ষ্মী সোনা।’

‘বড় আপা খাবে না?’

‘না। সে রাজকন্যা কি-না পোলাও-কোম্বা ছাড়া খেতে পারে না।’

‘আমিও পোলাও-কোম্বা খাব মা।’

‘আচ্ছা খেয়ো।’

দীপু আড়চোখে সোনের দিকে তাকিয়ে ভাত মাখতে শুরু করল। জরী বলল, ‘ডিম ভেজে দিলে খাব।’

‘ডিম নেই।’

‘তাহলে কিন্তু আমি খাব না।’

হাসিনা কিছু বলল না। জরী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফের বলল, ‘আমি কিন্তু মা কাল সকালেও কিছু খাব না।’

‘আচ্ছা, না খেলে কী করব আমি?’

‘আমি তাহলে ঘুমুতে যাচ্ছি।’

জরী প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল। হাসিনা ছোট একটি নিশ্বাস ফেলল। তাঁর এই মেয়েটি বড় অভিমানী হয়েছে। খাওয়া নিয়ে কেউ এ-রকম করে? অন্য ছেলেমেয়েগুলি খুব লক্ষ্মী। কোনো কিছু নিয়েই কোনো আদার নেই। গত ঈদে

দীপুকে কোনো কাপড় দিতে পারেনি। দীপুর আবার শুধু একজোড়া লাল মোজা দিয়েছিল ছেলেকে। তাই নিয়ে কী খুশি ছেলের! আর জরী গাল ফুলিয়ে বলেছে, ‘বাবা তোমাকে সিল্কের কাপড় আনতে বলেছি, তুমি এটা কী এনেছ? না, এ জামা আমি পরব না।’

সে-কী কান্না মেয়ের! দীপুর আবার ভীষণ মন খারাপ করেছিল সেবার। হাসিনাকে বলেছিল, ‘মরে যেতে ইচ্ছে করে গো! ছেলেমেয়েগুলির সামান্য শখও মেটাতে পারি না। ছিঃ ছিঃ!’

হাসিনা ভেবে পায় না জরী এমন অবস্থা হলো কি করে? বাবার রোজগারটাও তার চোখে পড়ে না? বছর না ঘুরতে মেট্রিক দিবে যে মেয়ে।

সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। দীপু বলল, ‘আজ তুমি আমাদের সঙ্গে ভাত খেয়েছ মা?’

‘হ্যাঁ।’

‘কী জন্যে খেয়েছ?’

‘তোমরা যে লক্ষ্মী সোনা— এজন্যে।’

‘ও বুঝেছি।’

দীপুটা এমন করে কথা বলে। বড় মায়া লাগে হাসিনার।

খাওয়া হয়ে যেতেই হাসিনা অসুস্থ পরীর জন্যে দুধ গরম করতে বসল। পরী খুব অসুখে ভোগে। কিছুদিন আগেই মাত্র হাম থেকে উঠল। এখন আবার জ্বর। বড় একজন ডাক্তারকে না দেখালেই নয়। দীপুর বাবাকে না জানিয়ে বড়দা’র কাছে চিঠি লিখলে কেমন হয়? এই ভাবতে ভাবতে হাসিনা পরীর কাছে গেল। পরী মা’কে দেখেই বলল, ‘একটু ভাত খাব মা। কাঁচা মরিচ দিয়ে ঝাল করে।’

‘কাল খেয়ো মাণিক।’

‘না মা, আজ ঝাল। অল্প, মাত্র তিন লোকমা।’

দীপু বলল, ‘মা, পরী আপার জন্যে আমি ভাত বেড়ে আনব?’

‘না, তুমি ঘুমাও।’

পরীকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে দুধ খাওয়াতে হলো। হাসিনার ঘুম পাচ্ছিল। ছেলেমেয়েরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এ অঞ্চলটায় খুব সকাল সকাল রাত বাড়ে। ন’টাও বাজেনি, এর মধ্যে কেমন নীরব হয়ে গেছে চারদিক। কুলিপট্রির দিকে মাঝে মাঝে হুল্লার শব্দ উঠছে— এ ছাড়া চারদিক ভীষণ নীরব।

রাত আরও বাড়তেই গুড়গুড় শব্দে মেঘ ডাকতে লাগল। বিজলি চমকাতে লাগল ঘনঘন। আজ সারা দিন খুব গুমোট গিয়েছে। ঝড়টড় হবে কিনা কে জানে। ঝাঁঝি ডাকছে। মেঘের ডাক আর ঝাঁঝির শব্দ এই দুই মিলিয়ে কেমন অদ্ভুত লাগছে। হাসিনা জেগে জেগে ঝাঁঝির ডাক শুনতে লাগল।

দীপুর বাবা এল ঠিক ঝড় আসার আগে আগে। আরেকটু দেরি হলে ভিজে চুপসে যেত। সে এসে ঘরে ঢুকছে ওম্নি ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি। দমকা বাতাস। হাসিনা বলল, ‘আর কিছুক্ষণ পরে এলেই গোসল সেরে আসতে পারতে।’

‘গোসল এখন সারব, তুমি ভাত চড়াও দেখি।’

হাসিনা অবাক হয়ে বলল, ‘ভাত চড়াব কি! ভাত তো রাঁধাই আছে।’

‘সে তো শুধু আমার জন্যে। সবাই মিলে আজ আবার খাব। দেখ কী এনেছি!’

হাসিনা দেখল বড়সড় একটি রুই মাছ দড়ি দিয়ে কানকোর সঙ্গে বাঁধা। হাসিনা বলল, ‘ওমা হঠাৎ এত বড় মাছ! কী ব্যাপার?’

‘আছে একটা ব্যাপার।’

দীপুর বাবা রহস্যময় হাসি হাসতে লাগল।

‘আজ থেকে আমার চল্লিশ টাকা বেতন বেড়েছে। তোল তোল সবাইকে ঘুম থেকে ডেকে তোল। ওরে ও জরী, ওঠ তো মা।’

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সব ক’টি ছেলেমেয়ে উদ্যোক্তার চারপাশে গোল হয়ে বসে আছে। অসুস্থ শরীরে পরীও উঠে এসে তার বাবার গায়ে হেলান দিয়ে বসেছে। দীপু বসেছে তার বাবার কোলে। পরী বলল, ‘আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে ভাত খাব বাবা।’

‘আচ্ছা খাবি।’

দীপু বলল, ‘আমরা আজ দু’বার করে খাব তাই না বাবা?’

‘হ্যাঁ।’

‘দু’বার করে কেন খাব বাবা?’

‘বড় মাছ এনেছি তো, সেই জন্যে।’

‘ও বুঝেছি।’

জরী মাছ ভেজে ভেজে থালায় রাখছিল। আনন্দে তার চোখ ঝলমল করছে। সে বলল, ‘রোজ এ-রকম বড় মাছ হলে বেশ হয়। তাই না বাবা?’

‘হুঁ। আমার জরী মা তাহলে খুব খুশি হয়।’

পরী বলল, ‘রঞ্জু মামা গত বছর এরচে’ বড় একটা মাছ এনেছিল না মা? সেটা আরো কত বড়।’

‘তোর বাবা একবার একটা চিতল মাছ এনেছিল। মাপ দিয়ে দেখেছি আমার চেয়েও লম্বা।’

দীপু চোখ কপালে তুলে বলল, ‘তুমি ভয় পেয়েছিলে, তাই না মা?’

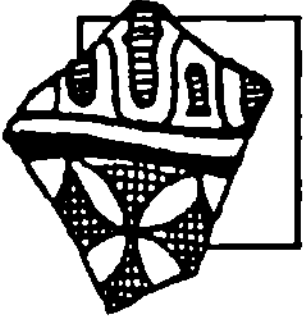
হেসে উঠল সবাই। ভাত তখনও হয়নি। কাজেই অনেকক্ষণ ধরে মাছ মারার গল্প হতে থাকল। দীপুর বাবা একসময় জিজ্ঞেস করলেন, ‘সবচেয়ে বড় মাছের কী নাম দীপু?’

‘চিতল মাছ বাবা ।’

জরী বলল, ‘দুর বোকা, তিমি মাছ ।’

রাত বাড়তেই থাকল । খাওয়া-দাওয়া অনেক আগেই সারা হয়েছে তবু ছেলেমেয়েরা বাবাকে ঘিরে বসে রয়েছে । সামান্য সব কথায় হা হা করে হেসে উঠছে ।

বাসন-কোসন কলতলায় রাখতে গিয়ে হাসিনা অবাক হয়ে দেখে মেঘ কেটে অপরূপ জ্যোৎস্না উঠেছে । বৃষ্টি-ভেজা গাছপালায় ফুটফুটে জ্যোৎস্না । সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকে । অকারণেই তার চোখে জল এসে যায় ।



তুচ্ছ

আমি মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটি । এর প্রধান সুবিধা হচ্ছে পরিচিত কারও সঙ্গে চোখাচোখি হবার সম্ভাবনা অনেকখানি কমে যায় । একজনের সঙ্গে অন্যজনের একটা স্বাভাবিক আড়াল তৈরি হয় । কেউ-কেউ তা বুঝতে পারেন না । ভদ্রতা দেখাবার জন্যে এগিয়ে এসে বলেন স্নামালিকুম, ভালো আছেন?

এসব ক্ষেত্রে আমি প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে না তাকিয়েই অল্প একটু হেসে বলি, ভালো । এই বলে আমি দাঁড়িয়ে থাকি । এতে প্রশ্নকর্তা একটা সমস্যায় পড়ে যান । আমাকে কী বলবেন ভেবে পান না । গায়ে পড়ে কথাবার্তা শুরু করার যন্ত্রণা আমি তাঁকে পেতে দেই । পরিষ্কার বুঝতে পারি ভদ্রলোক মনে-মনে বলছেন, কী যন্ত্রণা! কেন যে কথা বলতে গেলাম ।

সব সময় এই অবস্থা হয় তা নয় । কিছু-কিছু লোক আছেন যাঁরা কথা বলতে খুব পছন্দ করেন । ‘দেশের কী হচ্ছে বলুন দেখি ভাই?’ এই বলে নিজেই দেশের কী হচ্ছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে থাকেন । এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সহজ কোনো উপায় নেই ।

বদরুল আলম সাহেব এই রকম একজন মানুষ । সরকারি কর্মচারী । সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন । হঠাৎ এসে পড়া অবসর নিয়ে কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না । দু’টি কাজ খুব মন দিয়ে করেছেন— শরীরচর্চা এবং

দেশচর্চা। সকাল-বিকাল দু'বেলা জগিং করেন। জগিংয়ের জন্যে একটা পোশাকও তৈরি করেছেন— সাদা হাফ শার্ট, হাফ প্যান্ট এবং ক্রিকেটের আম্পায়ারদের মতো সাদা টুপি। দেশচর্চার মধ্যে আছে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা। দেখা হলেই বলবেন, 'প্রফেসর সাহেব, কিছু-একটা তো করতে হয়, কি বলেন? ভেজিটেবলের মতো বেঁচে থাকার তো কোনো মানে হয় না। কি বলেন?'

‘তা তো ঠিকই।’

‘প্রতিদিন পৃথিবীতে কতজন শিশু মারা যায় জানেন?’

‘জি না।’

‘চল্লিশ হাজার। বাংলাদেশে প্রতিদিন কতজন মারা যায় আন্দাজ করুন তো দেখি?’

‘আন্দাজ করতে পারছি না।’

‘ইউনিসেফের একটা রিপোর্ট আছে আমার কাছে। আপনার পড়তে দেব। পড়লে মাথা ঘুরে যাবে। ভয়াবহ অবস্থা। আমাদের কিছু একটা করা দরকার। কি বলেন?’

‘তা তো বটেই।’

‘এই যে ছোট-ছোট শিশু রাস্তার পাশে বসে ভিক্ষা করছে, এদের কাছে আমাদের জাবাবদিহি করতে হবে। হবে না?’

‘তা তো হবেই।’

‘আমি আমার স্ত্রীকে বলেছি, প্রতিদিন পঞ্চাশটা করে হাতে-গড়া রুটি তৈরি করে দেবে। আমি ডিসট্রিবিউট করব। সে রাজি হয়েছে। আপনাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। একার পক্ষে তো সম্ভব না। কি বলেন?’

‘তা তো বটেই।’

যত গর্জে তত বসে না— এটা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। বদরুল আলম সাহেবের বেলায় নিয়মের একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম। তিনি সত্যি-সত্যি রুটি বিতরণ সমিতি সংক্ষেপে ‘রুবিস’ স্থাপন করে বসলেন। সমিতির তিন-চারটা সভাও হয়ে গেল। আমি ঐ সমিতির একজিকিউটিভ কমিটির একজন সদস্য। পাড়ায় থাকতে গেলে কত রকম যন্ত্রণা যে সহ্য করতে হয়। এই জাতীয় সমিতিগুলির আয়ু লিটন ম্যাগাজিনের আয়ুর চেয়েও কম হয়— একটা হচ্ছে ভরসার কথা। দু'একদিন রুটি বিলিয়েই সবার উৎসাহ মরে যাবে এটা স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেয়া যায়।

আমাদের সমিতির সভায় ঠিক হলো ‘রুবিসে’র কার্যকলাপ বর্ষা মৌসুমে শুরু হবে। সেই সময়েই খাবার-দাবারের আকালটা একটু বেশি দেখা যায়। বর্ষার আগে পর্যন্ত সমিতির সদস্যরা রুটি বিতরণের পদ্ধতি সম্পর্কে খোঁজখবর করবেন এবং চিন্তাভাবনা করবেন।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বর্ষা আসতে দেরি আছে। ‘রুবিস’ ততদিন টিকবে না। বর্ষা বাদলায় রুটি নিয়ে বের হবার উৎসাহ কারও থাকার কথা না। তবে বদরুল আলম সাহেব যে রকম উৎসাহী ব্যক্তি— কিছুই বলা যায় না।

বৈশাখ মাসের কথা। বিকালের দিকে আকাশ অন্ধকার করে মেঘ করেছে। নির্ঘাৎ একটা কালবৈশাখী হবে। দ্রুত পা চালিয়ে বাসায় ফিরছি— দোয়েল চত্বরের কাছে এসে বদরুল আলম সাহেবের সঙ্গে দেখা। মাথা নিচু করে চলে যাব ভাবছি, সম্ভব হলো না। বদরুল আলম সাহেব গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, ভাই একটু এদিকে আসুন তো। বিরাট বিপদে পড়েছি।

গিয়ে দেখি সত্যি বিরাট বিপদ। চারজন শিশুর একটা দলের মধ্যে তিনি নার্সাস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। দলটির সঙ্গে বিছানা, একটা পাটি এবং হাঁড়ি-কুড়ি দেখে বোঝা যাচ্ছে এরা গ্রাম ত্যাগ করে সদ্য শহরে এসে পৌঁছেছে। চারদিকের কাণ্ডকারখানা দেখে ভয়ানক হকচকিয়ে গেছে। সবচেয়ে ছোটটি তিন-চার বছরের মেয়ে। সে ক্রমাগত ফ্রকের হাতায় ঘোঁষা মুছছে। সবচেয়ে বড়টিও মেয়ে। বারো-তেরো বছর হবে। এও কাঁদছে। মায়ের দু’টি ছেলে, এরা কাঁদছে না। আমি হাসিমুখে বললাম, ‘আলম সাহেব, আপনি মনে হচ্ছে আপনার রুটি বিতরণের সাবজেক্ট পেয়ে গেছেন।’

তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, ‘আরে ভাই, হাসবেন না। বিরাট ঝামেলা। আপনি এসেছেন ভালো হয়েছে। এদের সমস্যাটা একটু মন দিয়ে শুনুন। কোনো স্যালিউশন বের করা যায় কিনা দেখুন। আমি একটা সেকেন্ডও থাকতে পারছি না। জরুরি একটা এমার্জেন্টমেন্ট। অলরেডি আধা ঘণ্টা লেট। আকাশের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। কালবৈশাখী শুরু হয়ে যাবে।’

তিনি আমাকে দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ দিলেন না। অতি দ্রুত রাস্তার ও-পাশে তাঁর মরিস মাইনরের দিকে ছুটে গেলেন।

বাচ্চাগুলির সমস্যা তেমন বিচিত্র কিছু না। বরং বলা চলে খুবই সাধারণ সমস্যা। এদের বাড়ি ময়মনসিংহের ত্রিশালে। মা নেই। বাবার সঙ্গে থাকত। সেই বাবা একদিন কাউকে না বলে উধাও। কোনো খোঁজ নেই। বাচ্চাগুলি বুদ্ধি করে চলে গেল নবীনগর। তাদের মামার বাড়ি। সেই মামা বর্তমানে তাদের ঢাকায় নিয়ে এসেছে। মামা নাকি খোঁজ পেয়েছে এদের বাবা থাকে ঢাকা শহরে। পাকা সংবাদ। মামা বড় মেয়েটির হাতে একটা দশ টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বলেছে অপেক্ষা করতে। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে। এরা অপেক্ষা করছে কিন্তু মামার খোঁজ নেই। আমি বললাম, ‘মামা কখন গেছে?’

বড় মেয়েটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, ‘সকালে।’ মেয়েটি মন খারাপ করিয়ে দেবার মতো সুন্দর। ছোট বাচ্চাটিও পুতুলের মতো। এটা একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। এরা দেখতে কদাকার হলে কোনো কথাবার্তা না বলে চলে যাওয়া যেত। এখন যাওয়া যাচ্ছে না।

‘বাবা কী করত?’

‘গাতক।’

‘সেটা আবার কী?’

‘গান গায়। সারি গান, মুশির্দী গান।’

আরেক সমস্যা। সঙ্গীতজ্ঞের পরিবার। এদের বাবা যদি কামলা-টামলা জাতীয় কিছু হতো তা হলে মনের উপর চাপ পড়ত না। বাচ্চাগুলি এখনও বুঝতে পারছে না— মামা নামক মানুষটি এদের ফেলে পালিয়েছে। এখনও আশা করে আছে। আমি বললাম, ‘তোমরা খেয়েছ কিছু? বড় মেয়েটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে জানাল, তিন টাকার বাদাম কিনে সবাই মিলে খেয়েছে। হাতে এখনো সাত টাকা আছে। আমি পকেট থেকে দশটা টাকা বের করে বললাম, নাও রাখো।’

বড় মেয়েটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ভিক্ষা নিয়ে তাঁর হয়তো অভ্যাস নেই। বিপদের ওপর বিপদ। ছেলে দু’টিও কাঁদতে শুরু করেছে। বড় মেয়েটি একজনকে কোলে তুলে নিয়েছে। অন্য ছেলেটি বোনের ফ্রক ধরে আছে। খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। আমি শুকনো গলায় কিছু কথাবার্তা চালাবার চেষ্টা করলাম, যেমন— নাম কী? স্কুলে পড়ে কি-না। তারাও কি বাবার মতো গান জানে কি-না— এইসব। কোনো আলাপই বেশি দূর অগায় না। এরা হা করে চেয়ে থাকে এবং ক্রমাগতই চোখ মোছে। ছোট বাচ্চাটি কেঁদেই অস্থির।

একবার ইচ্ছা হলো মাথায় হাত ঝুলিয়ে একটু আদর করি। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিলাম। বাস্তব আদর দেখানো মানে নিজের ঘাড়ে ঝামেলা টেনে আনা। আকাশের অবস্থাও দ্রুত খারাপ হচ্ছে। হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে দৌড়ে আশ্রয় নেবারও জায়গা নেই। এ-কী মহা যন্ত্রণায় পড়া গেল!

আমি অত্যন্ত চিন্তিত মাথায় অপেক্ষা করতে লাগলাম— যদি কোনো ভদ্রলোক এই রাস্তায় আসে তাঁকে বলব, আমার একটা অত্যন্ত জরুরি কাজ আছে। আমি থাকতে পারছি না। একজন ডাক্তারের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট...।

সত্যি সত্যি একজনকে আসতে দেখা গেল। মাঝবয়সি এক ভদ্রলোক। ঝড় আসছে দেখে ছুটে যাচ্ছেন। আমাদের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘কী হয়েছে?’

আমি করুণ গলায় বললাম, ‘ওদের একটা সমস্যা হয়েছে। একটু কাইন্ডলি শুনুন। অ্যাঁই, তোমরা উনাকে বলো তো ব্যাপারটা কী?’

আমি আর দাঁড়ালাম না। লম্বা পা ফেলতে শুরু করলাম। বড় মেয়েটি খুবই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এতে অবাক হবার কী আছে কে জানে? মানুষের কাজ থাকবে না?

বদরুল আলম সাহেবের সঙ্গে পরদিন দেখা। বাজার করে ফিরছেন। আমাকে দেখে হাসিমুখে বললেন, ‘কি ভালো?’

আমিও হাসিমুখে বললাম, ‘জি ভালো।’

‘ইলিশ মাছ আজ খুব সস্তা যাচ্ছে। পঞ্চাশ টাকায় যে জিনিস এনেছি অন্যদিন তার দাম পড়ত এক শ’। এই দেখেন সাইজ।’

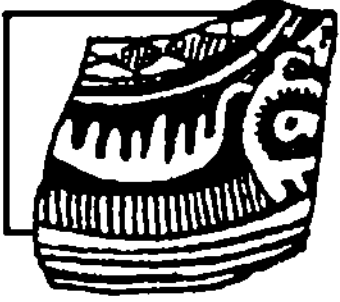
তিনি ইলিশ মাছ বের করে দেখালেন। বিশাল সাইজ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বদরুল আলম সাহেব বললেন, ‘রুবিসে’র কাজকর্ম তো শুরু করা উচিত। বর্ষা তো এসে গেল, তাই না?’

‘হ্যাঁ, তাই। এবার বর্ষা আগে-ভাগে নামবে।’

‘এ বছরেও ফ্লাড হলে তো সর্বনাশ। ফ্লাডের ব্যাপারটাও কনসিডারেশনে রাখতে হবে।’

আর কোনো কথা হলো না। তিনি ঐ বাচ্চাগুলির কথা কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। আমিও কিছু বললাম না। যেন ঐ জাতীয় কোনো ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটেনি। আর ঘটলেও সেটা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার।
তুচ্ছ কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় আমাদের?



দ্বিতীয় জন

প্রিয়াংকার খুব খারাপ ধরনের একটা অসুখ হয়েছে।

অসুখটা এমন যে কাউকে বলা যাচ্ছে না। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিংবা বিশ্বাস করার ভান করে আড়ালে হাসাহাসি করবে। একজনকে অবিশ্যি বলা যায়— জাভেদকে। জাভেদ তার স্বামী। স্বামীর কাছে কিছুই গোপন থাকা উচিত নয়। অসুখ-বিসুখের খবর সবার আগে স্বামীকেই বলা দরকার।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে জাভেদের সঙ্গে প্রিয়াংকার পরিচয় এখনো তেমন গাঢ় হয়নি। হবার কথাও নয়। তাদের বিয়ে হয়েছে একুশ দিন আগে। এখনো প্রিয়াংকার ‘তুমি’ বলা রপ্ত হয়নি। মুখ ফসকে ‘আপনি’ বলে ফেলে। এ-রকম গম্ভীর, বয়স্ক একজন মানুষকে ‘তুমি’ বলাও অবিশ্যি খুব সহজ নয়। মুখে কেমন বাধো বাধো ঠেকে। প্রিয়াংকা চেষ্টা করে ‘আপনি’ ‘তুমি’ কোনোটাই না

বলে চালাতে; যেমন— ‘তুমি চা খাবে? না বলে সে বলে— চা দেব?’ এইভাবে দীর্ঘ আলাপ চালানো যায় না, তার চেয়েও বড় কথা— মানুষটা খুব বুদ্ধিমান। ভাববাচ্যে কিছুক্ষণ কথা বলার পরই সে হাসিমুখে বলে, ‘তুমি বলতে কষ্ট হচ্ছে, তাই না?’

তুমি বলতে কষ্ট হওয়াটা দোষের কিছু না। প্রিয়াংকার বয়স মাত্র সতেরো। তাও পুরোপুরি সতেরো হয়নি। জুন মাসে হবে। এখনো দু’মাস বাকি। আর ঐ মানুষটার বয়স খুব কম ধরলেও ত্রিশ। তার বয়সের প্রায় দ্বিগুণ। সারাক্ষণ গম্ভীর থাকে বলে বয়স আরও বেশি দেখায়। বরের বয়স বেশি বলে প্রিয়াংকার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। বরদের চেংড়া দেখলে ভালো লাগে না। তা ছাড়া মানুষটা অত্যন্ত ভালো। ভালো এবং বুদ্ধিমান। কম বয়েসি বোকা বরের চেয়ে বুদ্ধিমান বয়স্ক বর ভালো।

বিয়ের রাতে নানা কিছু ভেবে প্রিয়াংকা আতঙ্কে অস্থির হয়েছিল। ধকধক করে বুক কাঁপছিল। কপাল রীতিমতো ঘামছিল। মানুষটা সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝে ফেলেছিল। কাছে এসে ভারী গলায় বলল, ‘ভয় করছে? ভয়ের কী আছে বলো তো?’

প্রিয়াংকার বুকের ধকধককানি আরও বেড়ে গেল। সে ‘হাঁ’ ‘না’ কিছুই বলল না। একবার মনে হলো সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। মানুষটা তখন নরম গলায় বলল, ‘ভয়ের কিছু নেই। ঘুমিয়ে পড়ো।’ বলেই প্রিয়াংকার গায়ে চাদর টেনে দিল। তাঁর গলার স্বরে কিছু-একটা ছিল। প্রিয়াংকার ভয় পুরোপুরি কেটে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক রাতে একবার ঘুম ভেঙ্গে দেখে লোকটি অন্যপাশ ঘিরে ঘুমুচ্ছে। খানিকক্ষণ জেগে থেকে প্রিয়াংকা আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়, লোকটি তখন পাশে নেই।

একটা মানুষকে সঠিক জেনে একুশ দিন খুব দীর্ঘ সময় নয়। তবু প্রিয়াংকার ধারণা মানুষটা ভালো, বেশ ভালো। এ-রকম একজন মানুষকে তার অসুখের কথাটা অবশ্যই বলা যায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অসুখটার সঙ্গে এই মানুষটার সম্পর্ক আছে। এই কারণেই তাঁকে বলা যাবে না। কিন্তু কাউকে বলা দরকার। খুব তাড়াতাড়ি বলা দরকার। নয়তো সে পাগল হয়ে যাবে। কিছুটা পাগল সে বোধহয় হয়েই গেছে। সারাক্ষণ অস্থির লাগে। সন্ধ্যা মেলাবার পর শরীর কাঁপতে থাকে। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। গ্লাসের পর গ্লাস পানি খেলেও তৃষ্ণা মেটে না। সামান্য শব্দে ভয়ঙ্কর চমকে ওঠে। সেদিন বাতাসে জানালার কপাট নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে অস্থির হয়ে গোঙ্গানির মতো শব্দ করল প্রিয়াংকা। হাতের চায়ের কাপ থেকে সবটা চা ছলকে পড়ল শাড়িতে। ভাগ্যিণী আশপাশে কেউ ছিল না। কেউ থাকলে নিশ্চয়ই খুব অবাক হতো। প্রিয়াংকার ছোট মামা যেমন অবাক হলেন।

তিনি প্রিয়াংকাকে দেখতে এসেছিলেন। তার দিকে তাকিয়েই বিস্মিত গলায় বললেন, 'তোর কী হয়েছে রে?'

প্রিয়াংকা হালকা গলায় বলল, 'কিছু হয়নি তো। তুমি কেমন আছ মামা?'

'আমার কথা বাদ দে। তোকে এমন লাগছে কেন?'

'কেমন লাগছে?'

'চোখের নিচে কালি পড়েছে। মুখ শুকনো। কী ব্যাপার?'

'কোনো ব্যাপার না মামা।'

'গালটাল ভেঙ্গে কী অবস্থা! তুই কথাও তো কেমন অন্য রকমভাবে বলছিস।'

'কী রকমভাবে বলছি?'

'মনে হচ্ছে তোর গলাটা ভাঙ্গা।'

'ঠাণ্ডা লেগেছে মামা।'

প্রিয়াংকা কয়েক বার কাশল। মামাকে বুঝাতে চাইল যে, তার সত্যি সত্যি কাশি হয়েছে, অন্য কিছু না। মামা আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। শীতল গলায় বললেন, 'আর কিছু না তো?'

'না।'

'ঠিক করে বল।'

'ঠিক করেই বলছি।'

প্রিয়াংকার কথায় তার মামা খুব আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হলো না। সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। মায়ের কাপে দু'টা চুমুক দিয়েই রেখে দিলেন। 'যাইরে মা।' বলেই কোমোদিকে না তাকিয়ে হনহন করে চলে গেলেন। মামা চলে যাবার এক ঘণ্টার ভেতরই মামি এসে হাজির। বোঝাই যাচ্ছে মামা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মামি প্রিয়াংকাকে দেখে আঁতকে উঠলেন। প্রায় চোঁচিয়েই বললেন, 'এক সপ্তাহ আগে তোকে কি দেখেছি আর এখন কি দেখছি? কী ব্যাপার! তুই খোলাখুলি বল তো? কী সমস্যা?'

প্রিয়াংকা শুকনো হাসি হেসে বলল, 'কোনো সমস্যা না।'

মামি কঠিন গলায় বললেন, 'তুই বলতে না চাইলে আমি কিন্তু জামাইকে জিজ্ঞেস করব। জামাই আসবে কখন?'

'ও আসবে রাত আটটার দিকে। ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না মামি। আমি বলছি।'

'বল। কিছু লুকুবি না।'

প্রিয়াংকা প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমি ভয় পাই, মামি।'

'কীসের ভয়?'

‘কী যেন দেখি।’

‘কী দেখিস?’

‘নিজেও ঠিক জানি না কী দেখি।’

‘ভাসা ভাসা কথা বলবি না। পরিষ্কার করে বল কী দেখিস।’

প্রিয়াংকা এক পর্যায়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, ‘মামি আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি! আমি কী সব যেন দেখি!’

সে কী দেখে তা তিনি অনেক প্রশ্ন করেও বের করতে পারলেন না। প্রিয়াংকা অন্য সব প্রশ্নের জবাব দেয় কিন্তু কী দেখে তা বলে না। এড়িয়ে যায় বা কাঁদতে শুরু করে।

‘তোর কি বর পছন্দ হয়েছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘সে কি তোকে ভয়-টয় দেখায়?’

‘কী যে তুমি বল মামি! আমাকে ভয় দেখাবে কেন?’

‘রাতে কি তোরা একসঙ্গে ঘুমাস?’

প্রিয়াংকা লজ্জায় বেগুনি হয়ে গিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ।’

‘সে কি তোকে অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখে?’

‘কী সব প্রশ্ন তুমি কর মামি?’

‘আমি যা বলছি তার জবাব দে।’

‘না, জাগিয়ে রাখে না।’

মামি অনেকক্ষণ থাকলেন। প্রিয়াংকাদের ফ্ল্যাটে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কাজের মেয়ে এবং কাজের ছেলেটির সঙ্গে কথা বললেন। কাজের মেয়েটির নাম মরিয়ম। দেশ খুলনা। ঘরের যাবতীয় কাজ সে-ই করে। কাজের ছেলেটির নাম জীতু মিয়া। আর মরিয়ম নয়-দশ। এদের দু’জনের কাছ থেকেও খবর বের করার চেষ্টা করা হলো।

‘আচ্ছা মরিয়ম তুমি কি ভয়-টয় পাও?’

‘না। ভয় পামু ক্যা?’

‘রাতে কিছু দেখ-টেখ না?’

‘কী দেখমু?’

‘আচ্ছা ঠিক আছে— যাও।’

প্রিয়াংকার মামি কোনো রহস্যভেদ করতে পারলেন না। তার খুব ইচ্ছা ছিল জাভেদের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করবেন, পরামর্শ করবেন। প্রিয়াংকার জন্যে পারা গেল না। সে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, ‘মামি তুমি যদি তাকে কিছু বলো তাহলে আমি কিন্তু বিষ খাব। আল্লাহর কসম বিষ খাব। নয়তো ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ব।’

তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কারণ, প্রিয়াংকা সত্যি বিষ-টিষ খেয়ে ফেলতে পারে। ‘আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়’— এই কথা লিখে একবার সে এক বোতল ডেটল খেয়ে ফেলেছিল। অনেক ডাক্তার-হাসপাতাল করতে হয়েছে। এই কাণ্ড সে করেছিল অতি তুচ্ছ কারণে। তার এক বান্ধবীর সঙ্গে ঝগড়া করে। এই মেয়ের পক্ষে সবই সম্ভব। তাকে কিছুতেই ঘাটানো উচিত নয়।

জাভেদ এল রাত সাড়ে আটটার দিকে। জাভেদের সঙ্গে খানিকক্ষণ টুকটাক গল্প করে প্রিয়াংকার মামি ফিরে গেলেন। তাঁর মনের মেঘ কাটল না। হলো কী প্রিয়াংকার? সে কী দেখে?

প্রিয়াংকা নিজেও জানে না তার কী হয়েছে। মামি চলে যাবার পর তার বুক ধবক-ধবক করা শুরু হয়েছে। অল্প অল্প ঘাম হচ্ছে। অসম্ভব গরম লাগছে। কিছুক্ষণ পরপর মনে হচ্ছে বোধহয় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

তারা খাওয়া-দাওয়া করে রাত সাড়ে দশটার দিকে ঘুমুতে গেল। জাভেদ বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। আজও তাই হলো। জাভেদ ঘুমুচ্ছে। তালে তালে নিশ্বাস পড়ছে। জেগে আছে প্রিয়াংকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার পানির পিপাসা পেল। প্রচণ্ড পানির পিপাসা। পানি খাবার জন্যে বিছানা ছেড়ে নামতে হবে। যেতে হবে পাশের ঘরে কিন্তু সে করবে না। অসম্ভব। কিছুতেই না। পানির তৃষ্ণায় মরে গেলেও না। এই পানি খেতে গিয়েই প্রথমবার তার অসুখ ধরা পড়েছিল। ভয়ে ঐদিনই সে মরে যেত। কেন মরল না? মরে গেলেই ভালো হতো। তার মতো ভীতু মেয়ের মরে যাওয়াই উচিত।

ঐ রাতে সে বেশ আরাম করে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ বৃষ্টি হবার জন্যে চারদিক বেশ ঠাণ্ডা। জানল্লি দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আসছে। ঘুমুবার জন্যে চমৎকার রাত। এক ঘুমে সে কখনো রাত পার করতে পারে না। মাঝখানে একবার তাকে উঠে পানি খেতে হয় কিংবা বাথরুমে যেতে হয়। সেই রাতেও পানি খাবার জন্যে উঠল। জাভেদ কাত হয়ে ঘুমুচ্ছে। গায়ে পাতলা চাদর দিয়ে রেখেছে। অদ্ভুত অভ্যাস মানুষটার। যত গরমই পড়ুক গায়ে চাদর দিয়ে রাখবে। প্রিয়াংকা খুব সাবধানে গায়ের চাদর সরিয়ে দিল। আহা আরাম করে ঘুমোক। কেমন ঘেমে গেছে।

স্বামীকে ডিঙিয়ে বিছানা থেকে নামল। স্বামী ডিঙিয়ে ওঠানামা করা ঠিক হচ্ছে না— হয়তো পাপ হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি! প্রিয়াংকা ঘুমায় দেয়ালের দিকে। খাট থেকে নামতে হলে স্বামীকে ডিঙাতেই হবে।

তাদের শোবার ঘর অন্ধকার, তবে পাশের ঘরে বাতি জ্বলছে। এই একটা বাতি সারারাতই জ্বলে। ঘরটা জাভেদের লাইব্রেরি-ঘর। এই ঘরেই জাভেদ

পরীক্ষার খাতা দেখে, পড়াশোনা করে। ঘরে আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। একটা বুক শেলফে কিছু বই, পুরনো ম্যাগাজিন। একটা বড় টেবিলের উপর রাজ্যের পরীক্ষার খাতা। একটা ইজিচেয়ার। ইজিচেয়ারের পাশে সাইড টেবিলে টেবিল ল্যাম্প।

দরজার ফাঁক দিয়ে স্টাডি রুমের আলোর কিছুটা প্রিয়াংকাদের শোবার ঘরেও আসছে তবুও ঘরটা অন্ধকার— স্যাভেল খুঁজে বের করতে অনেকক্ষণ মেঝে হাতড়াতে হলো। স্যাভেল পায়ে পরামাত্র পাশের ঘরে কীসের যেন একটা শব্দ হলো।

ভারী অথচ মৃদু গলায় কেউ-একজন কাশল, ইজিচেয়ার টেনে সরাল। নিশ্চয়ই মনের ভুল। তবু প্রিয়াংকা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। না— আর কোনো শব্দ নেই। শুধু সদর রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে ট্র্যাক যাওয়া-আসা করছে। তাহলে একটু আগে পাশের ঘরে কে শব্দ করছিল? অস্বাভাবিক নিশ্বাস নেবার শব্দ। প্রিয়াংকা দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকেই জমে থাকতে গেল। ইজিচেয়ারে জাভেদ বসে আছে। হাতে বই। জাভেদ বই থেকে মুখ তুলে তাকাল। নরম গলায় বলল, ‘কিছু বলবে?’

কতটা সময় পার হয়েছে? এক সেকেন্ডের এক শ’ ভাগের এক ভাগ না অনন্তকাল? প্রিয়াংকা জানে না। সে শুধু জানে সে ছুটে চলে এসেছে শোবার ঘরে— ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিছানায়। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে— সে কি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে? নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। ঘর দুলছে। চারদিকের বাতাস অসম্ভব ভারী ও উষ্ণ। জাভেদ জেগে উঠেছে। সে বিছানায় পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, ‘কী?’

প্রিয়াংকা বলল, ‘কিছু না।’

জাভেদ ঘুম জড়ানো স্বরে বলল, ‘ঘুমাও। জেগে আছ কেন?’ বলতে বলতেই ঘুমে জাভেদ এলিয়ে পড়ল। জাভেদকে জড়িয়ে ধরে সারারাত জেগে রইল প্রিয়াংকা। একটি দীর্ঘ ও ভয়াবহ রাত। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে প্রিয়াংকা শুয়ে আছে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় পাশের ঘরে। সে স্পষ্টই শুনছে ছোটখাটো শব্দ আসছে পাশের ঘর থেকে। নিশ্বাস ফেলার শব্দ, বইয়ের পাতা উল্টাবার শব্দ, ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালে যেমন ক্যাচক্যাচ শব্দ হয় সে রকম শব্দ, গলার শ্লেষ্মা পরিষ্কার করার শব্দ। শেষ রাতের দিকে শোনা গেল বারান্দায় পায়চারির শব্দ। কেউ-একজন বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। এইসব কি কল্পনা? নিশ্চয়ই কল্পনা। রাস্তা দিয়ে ট্র্যাক যাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ আসছে না।

ফজরের আযানের পর প্রিয়াংকার চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। ঘুম ভাঙল বেলা সাড়ে ন’টায়। ঘরের ভেতর রোদ ঝলমল করছে। জাভেদ চলে গেছে কলেজে।

মরিয়াম জীতু মিয়ার সঙ্গে তারস্বরে ঝগড়া করছে। প্রিয়াংকার সব ভয় কর্পূরের মতো উবে গেল। রাতে যে অসম্ভব ভয় পেয়েছিল এটা ভেবে এখন নিজেরই কেমন হাসি পাচ্ছে। সে স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না। মানুষ কত রকম দুঃস্বপ্ন দেখে। এও একটা দুঃস্বপ্ন। এর বেশি কিছু না। মানুষ তো এরচেয়ে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে। সে নিজেই কতবার দেখেছে। একবার স্বপ্নে দেখেছিল— সম্পূর্ণ নগ্ন গায়ে বাসে করে কোথায় যেন যাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ! কী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন!

প্রিয়াংকা বিছানা থেকে নামতে নামতে ডাকল, ‘মরিয়ম।’

‘জে আম্মা।’

‘ঝগড়া করছ কেন মরিয়ম?’

‘জীতু কাচের জগটা ভাইঙ্গা ফেলছে আম্মা।’

‘চিৎকার করলে তো জগ ঠিক হবে না। চিৎকার করবে না।’

‘জিনিসের উপর কোনো মায়া নাই ... মহব্বত নাই ...’

‘ঠিক আছে, তুমি চুপ করো। তোমার স্যার কি চলে গেছেন?’

‘জে।’

‘বাজার করে দিয়ে গেছেন?’

‘জে।’

‘কখন আসবেন কিছু বলে গেছেন?’

‘দুপুরে খাইতে আসবেন।’

‘আচ্ছা যাও। তুমি আমার জন্যে খুব ভালো করে এক কাপ চা বানিয়ে আনো।’

‘নাশতা খাইবেন আম্মা?’

‘না। তোমার স্যার নাশতা করেছে?’

‘জে।’

মরিয়ম চা আনতে গেল। প্রিয়াংকা মুখ ধুয়ে চায়ের কাপ নিয়ে বসল। এখন তার করার কিছুই নেই। দু’জন মানুষের সংসার। কাজ তেমন কিছু থাকে না। এ সংসারে কাজ-কর্ম যা আছে সবই মরিয়াম দেখে এবং খুব ভালোমতোই দেখে। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া প্রিয়াংকার কোনো কাজ নেই। এই ফ্ল্যাটে অনেক গল্পের বই আছে— গল্পের বই পড়তে প্রিয়াংকার ভালো লাগে না। ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষার জন্যে পড়াশোনা করা দরকার। পড়তে ভালো লাগে না। কারণ, প্রিয়াংকা জানে পড়ে লাভ হবে না। সে পাস করতে পারবে না। কোনো-একটা কলেজেই তাকে বি.এ পড়তে হবে। কে জানে হয়তো জাভেদের কলেজেই। যদি তাই হয় তাহলে জাভেদ কি তাকে পড়াবে? ক্লাসে তাকে কী ডাকবে— স্যার?

চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মরিয়ম তাকে একটা চিঠি দিল।

‘কীসের চিঠি মরিয়ম?’

‘স্যার দিয়া গেছে।’

চিঠি না— চিরকুট। জাভেদ লিখেছে— প্রিয়াংকা, তোমার গা-টা গরম মনে হলো। তৈরি হয়ে থেকো। আমি দুপুরে তোমাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

প্রিয়াংকার মনটা হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। মানুষটা ভালো। হৃদয়বান এবং বুদ্ধিমান। স্বামীদের কত রকম অন্যায় দাবি থাকে— তাঁর তেমন কিছু নেই। অন্যদের দিকেও খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রিয়াংকা কেন, আজ যদি জীতু মিয়ার জ্বর হয় তাকেও সে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। জাভেদ এমন একজন স্বামী যার ওপর ভরসা করা যায়।

যে যাই বলুক, এই মানুষটাকে স্বামী হিসেবে পেয়ে তার খুব লাভ হয়েছে। জাভেদের আগে একবার বিয়ে হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই অপরোধ নয়। বেচারার স্ত্রী মারা গেছে বিয়ের আট মাসের মাথায়। স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে বিয়ে করার জন্যেও অস্থির হয়ে পড়েনি। দু’বছর অপেক্ষা করেছে। মামা-মামি যে তাকে দোজবর একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন এই নিয়েও প্রিয়াংকার মনে কোনো ফ্লোভ নেই। মামা দরিদ্র মানুষ। তিনি আর কত করবেন। যথেষ্টই তো করেছেন। মামি নিজের গয়না জোগে তাকে গয়না করে দিয়েছেন। ক’জন মানুষ এ-রকম করে? আট ন’টা নতুন শাড়ি কিনে দিয়েছেন। এর মধ্যে একটা শাড়ি আছে বারোশ’ টাকা দামের।

জাভেদের আগের স্ত্রীর অনেক শাড়ি এই ঘরে রয়ে গেছে। ঐ মেয়েটির শাড়ির দিকে তাকালে মনে হয় খুব শৌখিন মেয়ে ছিল। ড্রেসিং টেবিলভর্তি সাজগোজের জিনিস। কিছুই ফেলে দেয়া হয়নি। বসার ঘরে মেয়েটির বড় একটি বাঁধানো ছবি আছে। খুব সুন্দর মুখ। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

এই ডাক্তার জাভেদের বন্ধু।

কাজেই ডাক্তার অনেক আজেবাজে রসিকতা করল— যেমন হাসিমুখে বলল, ‘ভাবিকে এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? সংসারে নতুন কেউ আসছে নাকি? হা-হা-হা। বুদ্ধিমান হয়ে ঠিক কাজটি করে ফেলেননি তো?’

দু’সপ্তাহও হয়নি যার বিয়ে হয়েছে তার সঙ্গে কি এ-রকম রসিকতা করা যায়? রাগে প্রিয়াংকার গা জ্বলতে লাগল।

ডাক্তার তাকে একগাদা ভিটামিন দিলেন এবং বললেন, ‘ভাবিকে মনে হচ্ছে রাতে ঘুমুতে-টুমুতে দেয় না? দুপুরে ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেবেন। নয়তো

শরীর খারাপ করবে— হা হা-হা ।’

প্রিয়াংকা বাড়ি ফিরল রাগ করে । সন্ধ্যা মেলাবার পর সেই রাগ ভয়ে রূপান্তরিত হলো । সীমাহীন ভয় তাকে গ্রাস করে ফেলল । এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে ভয় । বারান্দায় যেতে ভয় । হাতমুখ ধুতে বাথরুমে গিয়েছে— বাথরুমের দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আর সে দরজা খুলতে পারবে না । দরজা আপনা-আপনি আটকে গেছে । সে দরজা খোলার চেষ্টা না করেই কাঁপা গলায় ডাকতে লাগল— ‘মরিয়ম, ও মরিয়ম । মরিয়ম ।’

রাতে আবার ঐ দিনের মতো হলো । জাভেদ পাশেই প্রায় নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে আর প্রিয়াংকা স্পষ্টই শুনেছে স্যাভেল পরে বারান্দায় কে যেন পায়চারি করছে । প্রিয়াংকা নিজেকে বুঝাল— ও কেউ না, ও হচ্ছে মরিয়ম । মরিয়ম হাঁটছে । ছোট ছোট পা ফেলছে । মরিয়ম ছাড়া আর কে হবে? নিশ্চয়ই মরিয়ম । স্যাভেলে কেমন ফটফট শব্দ হচ্ছে । জাভেদ যখন স্যাভেল পায়ে হাঁটে তখন এ-রকম শব্দ হয় না । একবার কি বারান্দায় উঁকি দিয়ে দেখবে? কী হবে উকি দিলে? কিছুই হবে না । ভয়টা কেটে যাবে । রাত একটা বাজে— এমন কিছু রাত হয়নি । রাত একটায় ঢাকা শহরের অনেক দোকান-পাট খোলা থাকে । এই তো পাশের ফ্ল্যাটের বাচ্চাটা কাঁদছে । এখন নিশ্চয়ই বারান্দায় যাওয়া যায় ।

খুব সাবধানে জাভেদকে ডিঙিয়ে প্রিয়াংকা বিছানা থেকে নামল । তার হাত-পা কাঁপছে, তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে, কানের কাছে কেমন ঝাঁ-ঝাঁ শব্দ হচ্ছে । সব আগ্রহ করে বারান্দায় চলে এল । আর তার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়ানো মানুষটা বলল, ‘প্রিয়াংকা এক গ্লাস পানি দাও তো ।’

বিছানায় যে মানুষটা শুয়ে আছে এই মানুষটাই সেই জাভেদ । তার পরনে জাভেদের মতোই লুঙ্গি, হাতকাটা গেঞ্জি । মুখ গম্ভীর ও বিষণ্ণ ।

প্রিয়াংকা ছুটে শোবার ঘরে চলে এল । কোনোমতে বিছানায় উঠল— ঐ তো জাভেদ ঘুমুচ্ছে । গায়ে চাদর টানা— এতক্ষণ যা দেখেছি ভুল দেখেছি । যা শুনেছি তাও ভুল । কিছু-একটা আমার হয়েছে । ভয়ঙ্কর কোনো অসুখ । সকাল হলে আমার এই অসুখ থাকবে না । আল্লাহ, তুমি সকাল করে দাও । খুব তাড়াতাড়ি সকাল করে দাও । সব মানুষ জেগে উঠুক । সূর্যের আলোয় চারদিক ভরে যাক । সে জাভেদকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল । জাভেদ ঘুমঘুম গলায় বলল, ‘কী হয়েছে?’

সকাল বেলা সত্যি সত্যি সব স্বাভাবিক হয়ে গেল । রাত্রে এ রকম ভয় পাওয়ার জন্যে লজ্জা লাগতে লাগল । জাভেদ কলেজে চলে যাবার পর সে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মরিয়মকে তরকারি কাটায় সাহায্য করতে গেল । মরিয়ম বলল, ‘আফার শইল কি খারাপ?’

‘না।’

‘আফনের কিছু করণ লাগত না আফা। আফনে গিয়া হইয়া থাকেন।’

‘এইমাত্র তো ঘুম থেকে উঠলাম। এখন আবার কি শুয়ে থাকব?’

‘চা বানায়া দেই?’

‘দাও। আচ্ছা মরিয়ম, তোমার আগের আপাও কি আমার মতো চা খেত?’

‘হ। তয় আফনের মতো চুপচাপ থাকত না। সারা দিন হইচই করত। গান-বাজনা করত।’

‘মারা গেলেন কীভাবে?’

‘হঠাৎ মাথাডা খারাপ হইয়া গেল। উল্টা-পাল্টা কথা কওয়া শুরু করল— কী জানি দেখে।’

প্রিয়াংকা শঙ্কিত গলায় বলল, ‘কী দেখে?’

‘দুইটা মানুষ না-কি দেখে। একটা আসল একটা নকল। কোনটা আসল কোনটা নকল বুঝতে পারে না।’

‘তুমি কী বলছ তাও তো আমি বুঝতে পারছি না।’

‘পাগল মাইনুষের কথার কি ঠিক আছে আফা? মে-চা নেন।’

প্রিয়াংকা মাথা নিচু করে চায়ের কাপে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে। একবারও মরিয়মের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। তার ধারণা, তাকালেই মরিয়ম অনেক কিছু বুঝে ফেলবে। বুঝে ফেলবে যে প্রিয়াংকারও একই অসুখ হয়েছে। সে চায় না মরিয়ম কিছু বুঝুক। কারণ, তার কিছুই হয়নি। অসুখ করেছে। অসুখ কি মানুষের করে না? করে। আবার সেরেও যায়। তারটাও সারবে।

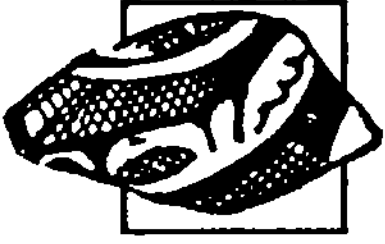
রাত গভীর হচ্ছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে টুপটুপ করে। খোলা জানালায় হাওয়া আসছে। প্রিয়াংকা জাভেদকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। তার চোখে ঘুম নেই।

পাশের ঘরে বাইরের পাতা ওল্টানোর শব্দ হচ্ছে। এই যে সিগারেট ধরাল। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসছে। ইজিচেয়ার থেকে উঠল— ক্যাচক্যাচ শব্দ হচ্ছে ইজিচেয়ারে।

প্রিয়াংকা স্বামীকে সজোরে জড়িয়ে ধরে কাঁপা গলায় ডাকল— ‘এই-এই।’

ঘুম ভেঙ্গে জাভেদ বলল, ‘কী?’

প্রিয়াংকা ফিসফিস করে বলল, ‘না কিছু না। তুমি ঘুমাও।’



সাদা গাড়ি

আমি যাদের পছন্দ করি না তাদের সঙ্গেই আমার ঘুরেফিরে দেখা হয়। হয়তো খুব জমিয়ে গল্প করছি— কাজের ছেলেটি এসে বলল, ‘কে জানি আইছে, আপনারে বুলায়।’ বাইরে উঁকি দিলে এমন একজনকে দেখা যাবে যার সঙ্গে একসময় খাতির ছিল। এখন নেই। তবু হাসির একটা ভাব করে উল্লাসের সঙ্গে বলতে হবে, আরে আরে কী খবর? তারপর কেমন চলছে? একসময় হয়তো এই লোকটির সঙ্গে তুই-তোকাকারি করতাম। এখন দূরত্ব রাখার জন্যে ভাববাচ্যে কথা বলতে হয়। বাংলা ভাষার ভাববাচ্য খুব উন্নত নয়। দীর্ঘসময় কথা চালানো যায় না।

আজকের ব্যাপারটাই ধরা যাক। আড্ডা জমে উঠেছে। বাংলা বানান নিয়ে খুব তর্ক বেধে গেছে। এমন সময় কাজের ছেলেটি এসে বলল আমাকে কে নাকি ডাকছে। বেরিয়ে দেখি সাব্বির। আমি হাসিমুখেই বললাম, ‘বাইরে কেন, ভেতরে এসে বসুন। সে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল।’

‘আসুন ভেতরে।’

‘না, না ঠিক আছে।’

‘আমার কয়েক জন বন্ধু-বান্ধব এসেছে। গল্প-গুজব হচ্ছে। আসুন পরিচয় করিয়ে দেই।’

‘অন্য আরেকদিন আসব।’

‘আজ অসুবিধা কীসের? আসুন ভেতরে।’

সাব্বির চোখ-মুখ লাল করে ভেতরে ঢুকল। পুরুষমানুষদের লজ্জায় এমন লাল হতে কখনো দেখিনি। নাকের পাতায় বিন্দু বিন্দু ঘাম।

ভেতরে তখন তুমুল উত্তেজনা। আজিজ ফজলুকে জিজ্ঞেস করছে, ‘ধূলি বানান কর দেখি? হ্রস্বউকার না দীর্ঘকার?’ রাগের চোটে ফজলু তোতলাচ্ছে। ক্রমাগত তার মুখ দিয়ে থুথু পড়ছে। বিশ্রী অবস্থা!

সাব্বির নার্ভাস ভঙ্গিতে রুমাল দিয়ে তার মুখ মুছল এবং মৃদুস্বরে বলল, ‘আজ যাই, অন্য আরেক দিন আসব?’

‘বসুন না। তাস হবে। তাস খেলতে পারেন তো?’

‘জি-না। আজ আমি যাই। আজ আমার একটা কাজ আছে।’

আমি সাব্বিরকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম। সেখানে সাদা রঙের প্রকাণ্ড একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মুশকো জোয়ান এক ড্রাইভার সাব্বিরকে দেখে স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে বের হলো এবং দ্রুত দরজা খুলে মূর্তির মতো হয়ে গেল। আমাদের বয়সি একটা ছেলের জন্যে এতটা আয়োজন আছে ভাবাই যায় না। আমি তীব্র একটা ঈর্ষা নিয়ে মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনলাম। ছুটির সকালে ঈর্ষার মতো জিনিস দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু এটা অনৈক্ষণ ধরে বুকে খচখচ করতে লাগল।

সাব্বিরের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রটা এ রকম— পুরানা পল্টনের এক ওষুধের দোকানে ঢুকেছি প্যারাসিটামল কিনতে। পয়সা দিয়ে বেরুবার সময় দেখলাম ঘটাঘট শব্দে সব দোকানের ঝাপ পড়ে যাচ্ছে। চারদিকে দারুণ ব্যস্ততা। কী হয়েছে কেউ কিছু বলতে পারছে না। সবাই ছুটছে। ট্রাকওয়ালাদের সঙ্গে বাসওয়ালাদের কি নাকি একটা ঝামেলা। একদল লোক নাকি রাম দা নিয়ে বের হয়েছে। ব্যাপারটা গুজব হবারই কথা। এ যুগে রাম দা নিয়ে কেউ বের হয় না। তবে সাবধানের মার নেই। দ্রুত পাশের গলিতে ঢুকে দেখি গলির মাথায় একটা পাঞ্জাবি গায়ে দারুণ ফর্সা ছেলে লম্বা লম্বা হয়ে পড়ে আছে। তার চশমা ছিটকে পড়েছে অনেকটা দূরে। আমি গিয়ে তাকে টেনে তুললাম। সে বিড়বিড় করে বলল, ‘চশমা ছাড়া আমি কিছু দেখতে পাই না। আমার মায়োপিয়া চোখের পাওয়ার সিক্স ডাইপটার।’ চশমার একটা কাচ খুলে পড়ে গিয়েছিল। এক কাচের চশমা পড়ে স্নি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তাকে বাড়ি না পৌঁছানো পর্যন্ত সে আমার বা হাত শক্ত করে ধরে রাখল। সম্ভবত ভয় পাচ্ছিল, আমি তাকে ফেলে রেখে চলে যাব।

কোনো পুরুষমানুষের এমন মেয়েদের মতো চেহারা হয় আমার জানা ছিল না। পাতলা ঠোঁট, কাম্বিহীন চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কাজল পরানো। কিশোরীদের মতো ছোট চিবুক। আমি বললাম, ‘আপনি কী করেন?’

‘ইংরেজিতে এম.এ পরীক্ষা দেব।’

‘তাই নাকি? ভালো।’

‘গত বছর পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। দেইনি। আমার হার্টের অসুখ, হার্টবিটের রিদমে গগুগোল আছে।’

‘চিকিৎসা করছেন তো?’

‘এর কোনো চিকিৎসা নেই।’

এই বলেই সে ফ্যাকাশেভাবে হাসতে লাগল। আমি সিগারেট বের করলাম, ‘নেন, সিগারেট নেন।’

‘আমি সিগারেট খাই না। নিকোটিন হার্টের মাসলে ক্ষতি করে। ফাইবারগুলি শক্ত করে দেয়।’

‘এতসব জানলেন কীভাবে?’

‘আমার মা ডাক্তার।’

নিউ ইস্কাটনের যে বাড়ির সামনে রিকশা থামল সেটাকে বাড়ি বলা ঠিক না। সেটা একটা হুলস্থূল ব্যাপার। আমরা রিকশা থেকে নামতেই চারদিকে ছোট্টাছুটি পড়ে গেল। সাব্বিরের মতো দেখতে একজন মহিলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, ‘কেন তুমি কাউকে কিছু না বলে বেরুলে। আর বেরুলেই যখন কেন গাড়ি নিলে না?’

সাব্বির অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। ভদ্রমহিলা অভিমানী স্বরে বললেন, ‘কেন তুমি আমাদের কষ্ট দাও?’

‘আর যাব না মা।’

‘তোমার দুর্বল হাট। যে কোনো সময় কিছু-একটা যদি হয়ে যেত। তখন?’

‘মা আর যাব না।’

এ ছেলেটাই সাব্বির।

রাত ৮ টার আগে আমি এদের বাড়ি থেকে বেরতে পারলাম না। সাব্বিরের বাবা এবং মা এমন একটা ভাব করতে লাগলেন যে আমি সাব্বিরকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। এ রকম বড় একটা কাজের যোগ্য পুরস্কার দিতে না পেরে তারা দু’জনেই অস্থির।

আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এবং বাড়ি চিনে আসবার জন্যে একজন লোক চলল আমার সঙ্গে। ছোট গলিতে বড় গাড়ি ঢুকবে না— এইজন্যে টেলিফোন করে একটা ছোট গাড়ি আনানো হলো।

সাব্বির মা-বাবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে আমাকে এগিয়ে দিতে এলো গেট পর্যন্ত। নিচু স্বরে বলল, ‘মা-বাবা-মা আমার জন্যে খুব ব্যস্ত। একটামাত্র ছেলে তো।’

‘আপনি একাই নাকি?’

‘জি। পাঁচ ভাইবোন ছিলাম আমরা। এখন আমি একা আছি।’

‘বাকিরা কোথায়?’

‘সবাই মারা গেছে। আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ বেশি দিন বাঁচে না। আমার এক চাচা ছিলেন। তাঁরও চার ছেলেমেয়ে ছিল। সবাই ত্রিশ হবার আগেই মারা গেছে।’

‘বলেন কি!’

‘জি। আমিও বাঁচব না।’

‘আরে, এসব কি বলছেন?’

‘জি, সত্যি কথাই বলছি। দেখেন না হাটের অসুখ হয়ে গেল।’

আমার বন্ধু-বান্ধবরা সব আমার মতো। পাস করবার পর সবাই কিছু-একটাতে ঢুকে পড়েছি। ব্যাংক, ট্রাভেল এজেন্সি, নাইট কলেজের পার্ট টাইম টিচার। একমাত্র আজিজ কোথাও কিছু না পেয়ে ল'তে ভর্তি হয়েছে। ছুটি-ছাটার দিনে তাস-টাস খেলি। মাঝে-মধ্যে পরিমলদের মামার বাড়িতে ভিসিআর দেখি এবং প্রায় সবদিনই আড্ডাটা শেষ হয় একটা ঝগড়ার মধ্যে। কোনো কোনো সময় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। তাতে অসুবিধা হয় না কিছু। আবার যখন দেখা হলো পুরনো কথা আর মনে থাকে না। বিয়ে করার আগে পর্যন্ত এই সময়টা বেশ ভালো। চায়ের দোকানে বসে বিশ্বাদ চায়ে চুমুক দেয়ামাত্র মনে হয় জীবনটা বড়ই সুখের। ফজলুদের ভাড়াটেদের ছোট মেয়ের হৃদয়হীনতা আমাদের ফজলুর চেয়েও বেশি আহত করে।

এ রকম সুখের সময় উপদ্রবের মতো মাঝে মাঝে উপস্থিত হয় সাব্বির। তাদের গাড়ির মুশকো ড্রাইভার চায়ের দোকান থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। সাব্বির লজ্জায় লাল হয়ে বলে, 'চা খাচ্ছিলেন সবাই মিলে?'

'হুঁ আড্ডা দিচ্ছি, আসুন না।'

'জি-না, আমি চা খাই না।'

'চা না খেলে না খাবেন, বসে গল্প করুন।'

'আরেকদিন আসব। আজ একটু কাজ আছে।'

কাজ থাকলে চলে গেলেই হয়। তানো অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। বিরক্তিতে আমার গা জ্বলে যায়, তবু ক্ষমতা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

'কী নিয়ে এত গল্প করেন?'

'গল্প করার টপিকের অভাব আছে নাকি? রাজনীতি, মেয়েমানুষ, সিনেমা, প্রেম। এসে শুনুন না। শুনতে না চাইলে বলুন।'

'কী বলব?'

'প্রেমের অভিজ্ঞতার কথা বলবেন।'

সাব্বির টেম্পোরারি মতো লাল হয়ে বলল, 'মেয়েদের বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা নেই। আমি কোনো মেয়ের সঙ্গে সামনা-সামনি বসে কথা বলিনি।'

'বলেন কি!'

'জি সত্যি। আমি একাই থাকি। মেয়েদের সঙ্গে মেশা আমার মা পছন্দ করেন না। আমার হার্টের অসুখ।'

'তাতে কী?'

'মানে ইয়ে— সামান্যতম এক্সাইটমেন্টে রিদমে গুগোল হয়। মেজর প্রবলেম হতে পারে।'

আমি ঝামেলামুক্ত হবার জন্যে বলি, 'আজ তাহলে যান। রোদ লাগছে।' সাব্বির তবু যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে। তার একটু দূরে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মুশকো ড্রাইভার। কুৎসিত ব্যাপার!

মেয়েলি চেহারার এই যুবকের সুখ-দুঃখের সাথে আমার সুখ-দুঃখের কোনো মিল নেই। এর সঙ্গে নরম স্বরে মিষ্টি কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। আমি সাব্বিরকে এড়িয়ে চলবার জন্যে নানা রকম কৌশল করি। ঘরে বসে থেকে কাজের ছেলেটিকে বলে পাঠাই— বাসায় নেই। কখন ফিরবে তারও ঠিক নেই। কোনো কোনো দিন নিজেই গিয়ে বলি, ‘আমি এফুনি বেরুব। হাসপাতালে এক বন্ধুকে দেখতে যাবার কথা, আজ তো কথা বলতে পারছি না।’

‘আসুন, হাসপাতালে পৌঁছে দেই। কোন হাসপাতাল?’

‘না না, তার দরকার নেই।’

‘আমার কোনো অসুবিধা হবে না, আসুন না।’

মহা বিরক্তিকর ব্যাপার। রাস্তায় কোনো সাদা রঙের গাড়ি দেখলেই মনে হয়— এই বুঝি গাড়ি থামিয়ে ফর্সা পাঞ্জাবি-পরা সাব্বির বেরিয়ে আসবে। মোটা কাচের আড়ালে যার চোখ ঢাকা বলে মনের ভার ঘোষাতে যাবে না। কথা বলবে এমন ভালো মানুষের মতো যে রাগ করা থাকবে না। আবার সহ্য করা যাবে না।

রাস্তায় বেরলেই একটা অস্পষ্ট অস্বস্তি লেগে থাকে। এই বুঝি দেখা হলো। অস্বস্তিটা সবচেয়ে বেশি হয় নীলু সন্নিহিত থাকলে। নীলু তার কারণ বুঝতে পারে না। সে বিরক্ত হয়ে বলে, ‘এ-রকম করো কেন? দেখা হলে কী হবে? আমার তো ভদ্রলোককে দেখতেই ইচ্ছা করছে।’ একদিন অবিশ্যি দেখা হলো। গ্রীন রোড দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছি। হঠাৎ রাস্তার পাশে সাদা গাড়িটি দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ির ভিতর থেকে সাব্বির অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমি না দেখার ভান করলাম। এবং অতি দ্রুত একটা রিকশা ঠিক করে নীলুকে নিয়ে উঠে পড়লাম। সাব্বিরই ভয় করতে লাগল এফুনি হয়তো সে গাড়ি নিয়ে সামনে এসে থামবে। লাজুক গলায় বলবে, ‘কোথায় যাবেন বলুন, নামিয়ে দি।’ সে রকম কিছু ঘটবে না। নীলু বিরক্ত হয়ে বলল, ‘হুট করে রিকশা নিলে কেন? আমি কতবার বলেছি পাশাপাশি রিকশায় চড়তে আমার ভালো লাগে না।’

‘ভালো লাগে না কেন?’

‘হুড তুলতে হয়। হুড তুললেই আমার কেন জানি দম বন্ধ হয়ে আসে।’

‘হুড না তুললেই হয়।’

‘পাগল, হুড না তুলে অবিবাহিত একটা ছেলের সঙ্গে আমি রিকশায় চড়ব!’

বিকালটা আমার চমৎকার কাটল। দু’জনে খুব ঘুরলাম। সন্ধ্যাবেলা ঢুকে পড়লাম একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে। নীলু সারাক্ষণই বলল, ‘ইশ, বাসার সবাই দুশ্চিন্তা করছে। তবু উঠবার কোনো তাড়া দেখাল না।’

নীলুকে শ্যামলীতে রেখে বাসায় ফিরে দেখি সাব্বির আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘কী ব্যাপার?’

‘কোনো ব্যাপার না, এম্মি এলাম। দিনে এলে তো আপনাকে পাওয়া যায় না।’

‘কোনো বিশেষ কাজে এসেছেন, না শুধু গল্প করবার জন্যে?’

‘না কোনো কাজে না, এম্মি।’

সাব্বির রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। আমি বললাম, ‘চা খান। চা দিতে বলি?’

‘জি না, চা-টা না। আমি এখন যাব। মা চিন্তা করছেন, এত রাত পর্যন্ত বাইরে কখনো থাকি না।’

‘আজই বা থাকলেন কেন?’

‘আপনাদের দু’জনকে আজ দেখলাম। বড় ভালো লাগল। সেইটা বলবার জন্যে।’

‘সাব্বির লজ্জায় বেগুনি হয়ে গেল।’

‘আমাকে আর নীলুকে দেখেছেন বুঝি?’

‘জি। বড় ভালো লাগল। আমি একবার ভুললাম এগিয়ে গিয়ে বলি, কোথায় যাবেন বলুন পৌছে দেই। আপনারা কি মনে করেন এই ভেবে গেলাম না।’

আমি নিঃশব্দে একটা সিগারেট ধরলাম। সাব্বির মৃদুস্বরে বলল, ‘আমি অবিশ্যি আপনাদের পেছনে পেছনে গিয়েছি।’

‘তাই নাকি?’

‘জি, ড্রাইভারকে বললাম দূর থেকে ঐ রিকশাটাকে ফলো করো।’

‘তারপর ফলো করলেন?’

‘জি। শাহবাগ পর্যন্ত। তারপর ড্রাইভার আর রিকশাটা লোকেট করতে পারল না। আপনি কি রাগ করছেন?’

‘না।’

‘আমি একবার ভেবেছিলাম আপনাকে বলব না। কিন্তু আপনাদের দু’জনকে এত সুন্দর লাগছিল। কী সুখী-সুখী লাগছিল! আমার মনে হলো এটা বলা উচিত, আপনি রাগ করেননি তো?’

আমি ঠাণ্ডা স্বরে বললাম, ‘না রাগ করিনি। রাত অনেক হয়ে গেছে এখন বাসায় যান। নয়তো আপনার মা আবার রাগ করবেন।’

‘জি তা ঠিক।’

সাব্বির চলে গেল কিন্তু আমার বিরক্তির সীমা রইল না। লোকটি কি নির্বোধ না অন্য কিছু? আমার মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ হলো। এ-রকম ঘটনা আবার ঘটবে— ও যদি আমাকে এবং নীলুকে আবার কখনো দেখে তাহলে

আবারও তার সাদা গাড়ি আসবে পেছনে পেছনে। কী অসহ্য অবস্থা!

ঘটলও তাই। দিন সাতেক পর সাব্বির এসে হাসিমুখে বলল, ‘আপনারা কি বুধবার বিকালে শিশু পার্কের সামনে ফুচকা খাচ্ছিলেন?’

‘মনে নেই।’

‘আপনার পরনে ছিল একটা চেক চেক শার্ট আর আপনার বান্ধবীর গায়ে লাল রঙের চাদর। হাতে একটা চটের ব্যাগ, মনে পড়েছে?’

‘হ্যাঁ, পড়েছে।’

‘আমি কিন্তু ফুচকা খাবার পর থেকে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এক ঘণ্টা আপনাদের ফলো করেছি।’

‘তাই নাকি?’

‘জি।’

‘এত ভালো লাগছিল আমার। ড্রাইভারকে বললাম ত্বরিত দেখতে পায় না এমনভাবে তাদের ফলো করো। আপনি অবিশ্যি একবার পেছনে তাকিয়েছেন। কিন্তু কিছু বুঝতে পারেননি।’

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, ‘নীলুর সঙ্গে থাকলে আমি একটু অন্যমনস্ক থাকি।’

সাব্বির গভীর আগ্রহে বলল, ‘আচ্ছা এলিফ্যান্ট রোডের ঐ দোকানটা থেকে কী কিনলেন আপনারা?’

আমি তার জবাব না দিয়ে গভীর হয়ে বললাম, ‘আসুন, আপনার সঙ্গে নীলুর পরিচয় করিয়ে দেই।’

‘না না, তার কোনো দরকার নেই। আপনাদের দু’জনকে একসঙ্গে দেখতেই আমার ভালো লাগে। কী রকম অদ্ভুত সুখী-সুখী চেহারা! জানেন আমি মা’কে আপনাদের কথা বলেছি।’

‘ভালো করেছেন।’

‘আমি যে মাঝে মাঝে আপনাদের পেছনে পেছনে যাই আপনি রাগ করেন না তো?’

আমি উত্তর না দিয়ে সিগারেট ধরলাম। একটা সাদা গাড়ি সর্বত্র আমাদের অনুসরণ করছে এটা ভাবতেই মন শক্ত হয়ে যায়।

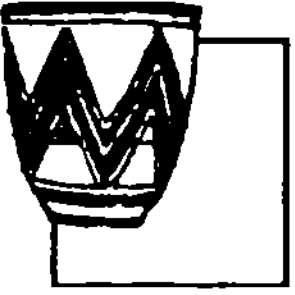
সাব্বির বসে আছে আমার সামনে। তার ফর্সা কিশোরীদের মতো মুখে উত্তেজনার ছাপ। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখ চক্চক্ করছে। বোধহয় কেঁদেই ফেলবে। সে অনেকখানি ঝুঁকে এসে বলল, ‘পৃথিবীর মানুষ এত সুখী কেন বলুন তো?’

সাব্বিরের সঙ্গে এটাই আমার শেষ দেখা। আর কখনো সে আমার কাছে

আসেনি। হয়তো শরীর খুব বেশি খারাপ। ঘর থেকে বেরোতে পারছে না। কিংবা গিয়েছে বাইরে। কিংবা অন্য কিছু। গিয়ে খোঁজ নেবার মতো ইচ্ছা কখনো হয়নি।

সাবির আর কখনো আসেনি কিন্তু তার সাদা গাড়িটি ঠিকই অনুসরণ করেছে আমাদের। যখনই নীলু মজার একটা-কিছু বলছে কিংবা যখনই আমার নীলুর হাত ধরতে ইচ্ছা হয়েছে তখনই বুঝতে পেরেছি বিশাল সাদা গাড়িটা আশপাশে কোথাও আছে। এর হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই।

নীলুর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আমার বিয়ে হয়নি। যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছি সে নীলুর মতো নয়। কিন্তু তার জন্যেও আমি প্রচণ্ড ভালোবাসা অনুভব করি। বৃষ্টির রাতে যখন হঠাৎ বাতি চলে যায়, বাইরে হাওয়ার মাতামাতি শুরু হয় আমি গভীর আবেগে হাত রাখি তার গায়ে। তখনই মনে হয় কাছেই কোথাও সাদা গাড়িটি বৃষ্টিতে ভিজছে। চশমা পরা অসুস্থ যুবক ভুরু কুঁচকে ভাবছে, মানুষ এত সুখী কেন?



অসময়

ঘরে ঢুকেই দেখি আমার ঘরের সোফায় হলুদ চাদর গায়ে দিয়ে কে যেন শুয়ে আছে। লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে রগ-উঠা ময়লা পা বের হয়ে আছে। সোফার হাতলে যে গোলাকার দাগ তা ঐ পা থেকে এসেছে, বলাই বাহুল্য। রাগে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। রান্নাঘরে জরী চা বানাচ্ছিল। আমাকে দেখেই হাসিমুখে বলল, 'চায়ের সঙ্গে কী খাবে? ঘরে কিছুই নেই। লুচি ভেজে দেব?'

আমি শুকনো গলায় বললাম, 'কে এসেছে?'

'আমি জানি না। মগবাজার থেকে এসে দেখি উনি শুয়ে আছেন। করিম দরজা খুলে দিয়েছে। তোমার নাকি কি রকম আত্মীয় হন।'

অনেকক্ষণ আমার মুখে কোনো কথা এল না। দু'দিন পরপর এ-কী যন্ত্রণা! গত সপ্তাহেই এসেছে দু'জন। এর মধ্যে একজনের আবার ফিরে যাওয়ার ভাড়া ছিল না। তাকে নেত্রকোনায় ফিরে যাওয়ার ভাড়া বাবদ ত্রিশ টাকা দিতে

হয়েছে। আমার হিসেব করা বেতনে ত্রিশ টাকার দাম আছে। মাসের বিশ তারিখে অফিস থেকে ফিরে নতুন একজন মেহমানকে দেখলে আমার সঙ্গত কারণেই মন খারাপ হয়।

‘তুমি হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় গিয়ে বসো। আমি চা নিয়ে আসছি।’

‘কতদিন থাকবেন কিছু জানো নাকি?’

‘না। তবে বিছানাপত্র নিয়ে এসেছেন। কাজেই দীর্ঘ পরিকল্পনা থাকা বিচিত্র নয়।’

জরী মুখ নিচু করে হাসল। এর মধ্যে হাসির কি আছে কে জানে। জরীকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

বিয়ের পর থেকেই সে মেহমানদারি করছে। সবই আমার গ্রামের বাড়ির গরিব আত্মীয়-স্বজন। কেউ চাকরির সন্ধানে, কেউ চিকিৎসার জন্যে। আবার কেউ-কেউ নিছক বেড়াবার জন্যে। নতুন এয়ারপোর্ট দেখবে, চিড়িয়াখানায় যাবে, শিশুপার্ক যাবে। জরী নির্বিকার। যেন এসব ঝামেলা বিচলিত হওয়ার মতো কোনো ঝামেলা নয়।

আমি প্রথম-প্রথম ভেবেছিলাম জরীর এই ব্যাপারটি লোক-দেখানো। আমার কাছে প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে, সে যদিও অনেক বড়লোকের বাড়ির মেয়ে তবু আমার গরিব আত্মীয়-স্বজনদের সে মোটেই অবহেলা করে না। এখন বুঝতে পারছি আমার ধারণা ঠিক নয়। কোনো এক বিচিত্র কারণে জরীর মধ্যে বিরক্ত হবার ক্ষমতা গড়ে ওঠেনি। আমি যখন দেখি আমার কোনো ফুপাত ভাই কিংবা খালাত ভাই কার্পেটের ওপর নাক ঝেড়ে টেবিলক্লেথে হাত মুছছে তখন আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়। অথচ জরীকে দেখি বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক— যেন কার্পেট নাক ঝাড়া তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

বারান্দায় ফুৎফুৎ হাওয়া। তবু আমার বিরক্ত ভাব কাটল না। জরী চা নিয়ে আসতেই বললাম, ‘এই রকম মেহমানদারি করলে তো চলবে না জরী।’

‘যতক্ষণ চলছে চলুক। তুমি চা খেয়ে ভদ্রলোককে ডেকে তুলে আলাপ-পরিচয় করো। রাগ করার কি আছে বলো?’

‘রাগ করার কিছু নেই?’

‘উহু।’

‘সময়-অসময় নেই স্পঞ্জের স্যাভেল পরে মাথায় একটা কাঁঠাল নিয়ে লোকজন আসতে থাকবে আর আমি গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরব?’

জরী খিলখিল করে হেসে উঠল। যেন এ-রকম মজার কথা সে বহুদিন শোনেনি। চা খেতে-খেতেই জানা গেল মেহমানের ঘুম ভেঙেছে এবং মেহমান আমার খোঁজ করেছেন। আমি গিয়ে দেখি হাসু চাচা! প্রায় এগারো বছর পরে দেখা। ডান গালে লাল জড়ুল না দেখলে চিনতেই পারতাম না। কী চেহারা

হয়েছে! মাথার চুল উঠে গেছে, সরু-সরু হাত-পা। আমাকে দেখেই বললেন, 'বিয়ে করলি, খবর তো দিস নাই।'

'আপনিও তো আমাকে কোনোদিন কোনো খবর দেননি চাচা?'

'তা ঠিক। খুব ঠিক কথা।'

'আপনার শরীরের এ-কী অবস্থা হয়েছে!'

'মরণ রোগ। মরবার সময় যে-সব অসুখ-বিসুখ হয় সেইসব। ভাবলাম মরবার আগে একবার দেখে যাই। বৌমাকেও দেখি। বৌমার খুব প্রশংসা শুনি লোকের কাছে।'

আমি জরীকে গিয়ে বললাম, 'ইনি আমাদের হাসু চাচা।'

'তুমি যার বাড়িতে থেকে মেট্রিক পাস করেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'এই প্রথমবার দেখলাম মেহমান দেখে বিরক্ত হওনি।'

'হাসু চাচা না থাকলে আমার পড়াশোনা হতো না জরী।'

জরী হাসতে হাসতে বলল, 'পড়াশোনা না হলে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হতো না। কাজেই আমাদের দু'জনের দেখা হওয়ার পেছনেও তোমার হাসু চাচা।'

রাতে হাসু চাচার অবস্থা খারাপ হলো। আকাশ-পাতাল জ্বর। আমাদের পাড়ার আফজল ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলাম রাত এগারোটায়। ডাক্তার বললেন, 'এতো সিরিয়াস রোগী হাসপাতালে নিতে হবে।'

হাসু চাচা শ্বাস টানতে-টানতে বহু কষ্টে বললেন, 'হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন নাই।'

'প্রয়োজন নেই বললে তো হবে না। জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন।'

জরী আমাকে আঙুলে ডেকে নিয়ে বলল, 'ইনার আত্মীয়-স্বজনদের খবর দেয়া প্রয়োজন মনে হয়। কেমন করে তাকাচ্ছেন দেখো না। তুমি আমার ফুপার কাছেও একবার যাও। ফুপাকে নিয়ে এসো সঙ্গে করে।'

ফুপা অবিশ্যি এলেন না। জরীর আত্মীয়-স্বজনরা কেউ কখনো আসেন না আমার এখানে। তবে তিনি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। রাগী গলায় বললেন, 'শুধু-শুধু বাড়িতে ঝামেলা করবেন না। হাসপাতালে দিন। আমি বলে দেবো ভালো খোঁজখবর করবে।'

বাসায় ফিরে দেখি হাসু চাচার অবস্থা আর খারাপ হয়েছে। আমাকে চিনতে পারেন না, কথা বললে জবাব দেন না, মাথা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে চারদিকে তাকান।

জরী একবার পানির গ্লাস নিয়ে ঢুকতেই অবাক হয়ে ডাকতে লাগলেন, 'ও মিনু! ও মিনু!'

জরী ফ্যাকাশে হয়ে বলল, 'মিনু কে?'

আমি বললাম, ‘হাসু চাচার মেয়ে। অনেকদিন আগে মারা গেছে।’

হাসু চাচা টেনে টেনে বললেন, ‘ও মিনু! ও মিনু! বেটি কাছে আয়। আয় না।’

রাত একটার সময় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত দু’টা বেজে গেল। জরী দেখি একা একা জেগে বসে আছে। তার মুখ রক্তশূন্য। একদিনের পরিশ্রমে চোখের নিচে কালি পড়েছে।

‘অবস্থা কী তাঁর?’

‘বেশি ভালো না। স্যালাইন দিচ্ছে।’

‘তুমি কি চা খাবে এক কাপ?’

‘না, এত রাতে ইচ্ছা করছে না।’

‘খাও না। আমার খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় গিয়ে বসো। আমি নিয়ে আসছি।’

আমরা ঘুমুতে গেলাম প্রায় শেষরাতে। বাতি নিভিয়ে বিছানায় উঠতেই জরী মৃদুস্বরে বলল, ‘তোমার হাসু চাচার যে একটি মেয়ে ছিল মিনু— এই কথা কিন্তু তুমি আমাকে কখনো বলোনি।’

‘এটা এমন কোনো দরকারি কথা না জরী।’

জরী অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। তারপর হঠাৎ বলল, ‘মাঝে মাঝে তুমি যখন আমাকে খুব আদর করো তখন কিন্তু আমাকে ‘মিনু’ ডাকো।’

আমি কোনো জবাব দিলাম না। জরী বলল, ‘হাসু চাচার মেয়েটি কখন মারা গিয়েছিল?’

‘ক্লাস নাইনে পড়ার সময়।’

‘মেয়েটি কেমন ছিল দেখতে?’

আমি জবাব দিলাম না। দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে জরী আমার হাত ধরল। ভালোবাসার গরম স্পর্শ। বাইরের অস্পষ্ট আলোয় জরীর মুখ অবিকল সেই বালিকা মিনুর মুখের মতো দেখাতে লাগল। সেই মুখ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।



পাখির পালক

‘হ্যালো জরী?’

‘হ্যাঁ।’

‘কেমন আছ?’

‘আপনি কে বলছেন?’

আমি একটু থমকে গেলাম। জরী কি সত্যি সত্যি আমরা গলা চিনতে পারছে না? তা কেমন করে হয়?

‘হ্যালো, কথা বলছেন না যে? কে আপনি?’

‘আমি। আমি আনিস।’

‘ও, তাই বলুন। আপনার কি ঠাণ্ডা লেগেছে?’

‘না তো।’

‘গলার স্বর ভারী।’

আমি ছোট্ট একটি নিশ্বাস গোপন করলাম। আমার গলার স্বর ঠিকই থাকে কিন্তু জরীর কাছে কখনো মনে হয় ভারী, কখনো ভাঙা ভাঙা। কোনোদিন চিনতে পারে না।

‘হ্যালো জরী, তুমি কি আজ বাসায় থাকবে?’

‘কখন বলুন তো?’

‘এই ধর বিকেলে?’

‘উঁহু, বিকেলে থাকিব না। কেন?’

‘একটু দরকার ছিল। সন্ধ্যাবেলা থাকবে?’

‘না, সন্ধ্যাবেলা জুন্সু খালাদের বাসায় যাব।’

‘কখন ফিরবে?’

‘তা কি করে বলব? জুন্সু খালা কি সহজে ছাড়বে। রাত হয়তো ফিরবই না।’

জরী খিলখিল করে হাসল। যেন রাতে না ফেরাটা খুব-একটা হাসি-তামাশার ব্যাপার।

‘হ্যালো আনিস ভাই, একটু ধরুন তো, কে যেন আমাকে ডাকছে। আসছি এম্মুনি।’

আমি টেলিফোন কানে লাগিয়ে বসে রইলাম। গ্রীন ফার্মেসির ছেলেটা আড়চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। তার মুখে বিরক্তির রেখা গাঢ় হতে শুরু করেছে। সে গম্ভীর স্বরে বলল, ‘কতক্ষণ ফোন ধরে বসে থাকবেন? ইম্পটেন্ট কল-টল আসতে পারে। লাইন আটকে রাখলে চলে নাকি?’

‘এই যে ভাই একটু।’

‘একটু একটু করে তো এক ঘণ্টা নিয়ে নিলেন।’

আমি না শোনার ভান করে সামান্য ঘুরে দাঁড়িলাম। লাইনের ও-পাশ থেকে কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথম কিছুক্ষণ পৌ-পৌ শব্দ হচ্ছিল। এখন তাও নেই চারদিকে অখণ্ড নীরবতা। জরী নিশ্চয়ই ভুলে বসে আছে। জরীর মা হয়তো রিসিভার উঠিয়ে রেখেছেন। ঘণ্টা খানেক পর আবার করলে কেমন হয়?

‘কি রে ভাই, আপনার হয়েছে না কানে নিয়ে আঙুল খানিকক্ষণ বসে থাকবেন?’

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। একটা ময়লা এক টাকার নোটও বাড়িয়ে দিলাম। পয়সা দিয়ে ফোন করি, তবু এমন যন্ত্রণা। ইচ্ছা করছিল একটা চড় দিয়ে ছেলেটার মুখে আঙুলের দাগ বসিয়ে দেই। হারামজাদা ছোটলোক। কিন্তু সে রকম কিছুই করি না। সারা মুখে একটা তেলতেলে ভাব এনে নরম সুরে বলি, ‘বিজনেস বেমেদ? সে জবাব দেয় না।’

‘নির্ন, একটা সিগারেট নিব।’

সে নিতান্ত অবহেলায় সিগারেট ধরায়। আমার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। রহমানকে বলে এই শালাকে একটা ধোলাই দিলে দিয়ে কেমন হয়?

আজ আমার কিছু করার নেই। কোনোদিনই অবিশ্যি থাকে না। তবে আজ আমি বিশেষ রকম ফ্রি। বাজার করতে যেতে হয়নি। বাবা বাজারে গিয়েছেন। তিনি সপ্তাহে দু’দিন বাজারে যান। আজ হচ্ছে সেই দু’দিনের একদিন। আজ তিনি দুপুর পর্যন্ত মাছের বাজারে ঘুরবেন। অসংখ্য মাছ টিপে টিপে দেখবেন এবং শেষ পর্যন্ত কিছু পচা মাছ কিনে অন্ধকার মুখে বাড়ি ফিরবেন। লেবু পাতা দিয়ে সেই মাছ রান্না হবে। বাড়িওয়ালার একটি লেবু গাছ আছে। তার পাতাগুলি আমরা পচা মাছ দিয়ে দ্রুত খেয়ে ফেলছি। সেদিন বাড়িওয়ালার মেয়ে চৈঁচিয়ে চৈঁচিয়ে বলেছে, ‘এ কী গোটা গাছটাই দেখি মুড়িয়ে ফেলেছ! এখন থেকে কেউ গাছে হাত দিতে পারবে না। এইসব সহ্য হবে না। গাছ তোলা সহজ ঝামেলা?’

বাড়িওয়ালার এই মেয়েটা দারুণ ক্যাটক্যাট করে। মেয়েটার অনেক বয়স। কিন্তু রোগা এবং বেঁটে বলে বয়সটা চোখে পড়ে না। মেয়েটির দাঁত ভাসা তবে

গায়ের রং দারুণ ফর্সা। ফর্সা রঙের যে-কোনো মেয়ে দেখলেই আমার মা মনে-মনে সেই মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেন। এবং মা'র চোখে তার নানা'রকম গুণাবলি ধরা পড়তে থাকে। এই পুরুষালি মেয়েটি সম্পর্কে মা'র মন্তব্য হচ্ছে— 'বড় তেজী মেয়ে। আজকালকার যুগে তেজী মেয়েই দরকার, পুতুপুতু মেয়ে দিয়ে কাজ হয় না। আর চুল দেখেছিস? হাঁটু পর্যন্ত। একবার চুল বাঁধতেই এই মেয়ের আধা সের তেল লাগে।'

বাড়িওয়ালার এই মেয়েটির সঙ্গে আমার কোনো কথাবার্তা হয় না। সে আমাকে বখাটে ছেলে হিসেবে জানে। চোখে চোখ পড়লেই সে একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। আমি গায়ে মাখি না। এই যুগে কোনো কিছু গায়ে মাখতে নেই। এটা হচ্ছে গায়ে না-মাখার যুগ। সফিকের ভাষায়, 'মুমে লাথ মার ফিন ভি হাসে জি।' সে ইদানীং উর্দুতে বাতচিত করছে। কখন যে পাবলিকের হাতে মার খাবে। দিনকাল খারাপ। পাবলিক আজকাল সহজেই চেতে যায়।

আমি মতিঝিলের দিকে রওনা হলাম। গতকাল জরীর অফিস। সেখানে থেকেই জরীকে আবার একটা ফোন করা যাবে। মা'র গাদাগাদি ভিড়। সবগুলি মানুষের গা থেকে ঘামের গন্ধ আসছে। হানসে হর্স পাওয়ারের গন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করে। তবু তার মধ্যেই জরীর সঙ্গে কথাবার্তাগুলি রিহার্সেল দিয়ে রাখলাম।

'হ্যালো জরী?'

'হ্যাঁ, ইশ টেলিফোন রেখে দিয়েছিলেন কেন? আমার যা রাগ লাগছিল।'

'লাইনটা হঠাৎ করে কেটে গেল।'

'আমি তখন থেকে ফোনের সামনে বসে আছি।'

'সে কি! কোথায় যে যাবার কথা ছিল। যাওনি?'

'যাব কীভাবে? আপনি যদি ফোন করেন।'

'শোনো জরী, হ্যালো।'

'বলুন, শুনছি।'

আমার পাশের লোকটি হঠাৎ করেই তার কোমর ঝাঁকুনি দিল। কাল্পনিক ফোনের কথাবার্তা থেমে গেল। জরীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় আমার মনটা অস্বাভাবিক তরল অবস্থায় থাকে বলে আমি কিছুই বললাম না। তবে আমার পাশের রোগামতো লোকটি ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'ভাইজান, আপনার পাছাটা সামলে রাখেন। বেশি নড়াচড়া করছে।' পাছা নাড়ানো লোকটি চোখ লাল করে তাকাল। লোকটি বিশাল। সে থমথমে স্বরে বলল, 'কী কইলেন?'

'শুনলেন তো কী বললাম। পাছা সামলান।'

‘খবরদার।’

‘কাকে খবরদার বলেন? ঘাড় ধরে নামিয়ে দেব, বুঝলেন? এটা পাবলিক বাস। আপনার মামার গাড়ি না।’

পাছা দুলানো লোকটি থমকে গেল। রোগা লোকটির সাহসের তারিফ করতে হয়। মুক্তিযোদ্ধা ছিল বোধহয়। আমি একটু সরে গিয়ে ওদের জায়গা করে দিলাম। বোঝাপড়া করতে চাইলে করুন। কিন্তু মোটা লোকটি ভড়কে গেছে। লোকটির দেহটাই বিশাল, সাহস নেই। সে প্রেসক্রাবে অন্য একজনের পা মাড়িয়ে নেমে গেল।

জলিল অফিসেই ছিল। সাধারণত থাকে না। এটা তার নিজের অফিস। নিজের অফিসে না থাকলে কিছু যায় আসে না। জলিল আমাকে দেখেই জ্র কুঁচকাল। এটা সে নতুন শিখেছে। পয়সা হবার পর মানুষ যে জিনিসটা প্রথম শেখে তা হচ্ছে জ্র কুঁচকানো। তারপর শিখে কাঁধ কাঁকানো। জলিল কাঁধও কাঁকাল। এটা বিশেষ ভালো হলো না। ঠিকমতো শিখে উঠতে পারেনি বোধহয়।

‘কি রে, তুই কী মনে করে?’

‘আসলাম।’

‘তা তো দেখতেই পাচ্ছি। চাস কী?’

‘চাই না কিছু।’

‘টাকাপয়সা চাইলে পাবি না। বন্ধুবান্ধবদের ধার দেয়া বন্ধ করে দিয়েছি।’

‘তাই নাকি?’

‘হ্যাঁ। ঐদিন শফিক এসে দু’শ’ টাকা নিয়ে গেল। না দিয়ে পারলাম না। খুব ঝোলাঝুলি।’

‘দিয়ে ভালোই করেছিস।’

‘আর ভালো। ঐ পয়সা কি আর ফেরত পাব? জলে গেছে।’

‘এত পয়সা তোর। যাক না কিছু জলে।’

জলিল খুশি হলো। এই প্রথম তার মুখে হাসির একটা আভাস দেখলাম। জলিলকে খুশি করবার সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে ওর টাকাপয়সা নিয়ে কথা বলা।

‘কী লাল হয়ে যাচ্ছিস!’

‘দূর, কী যে বলিস! বহু কষ্টে পাঁচ লাখ টাকার একটা কাজ ম্যানেজ করেছি। একটা কালভার্ট। তবে মারজিন থাকবে না। নানান লোকদের খাওয়াতে হবে।’

‘শালা তুইই উঠে গেলি আমাদের মধ্যে।’

উঠে গেল কথাটা ঠিক না। জলিল বরাবর উঠেই ছিল। তাদের দু’পুরুষের

ব্যবসা। ইটের ব্যবসা। তিন-চারটা নাকি ব্রিক ফিল্ড আছে। ব্যবসাদারের ছেলেপুলেরাও পড়াশোনা করে। এবং দেখা গেল ভালোই করে। এম.এ-তে দিব্যি সেকেন্ড ক্লাস ম্যানেজ করে ফেলল। তারপর একদিন শুনলাম বিজনেস শুরু করেছে। মতিঝিলে অফিস। শফিককে নিয়ে দেখতে এলাম। তেমন কিছু না। ময়লা ময়লা আসবাব। সোফার গদি ছেঁড়া। একটা স্টেনো আছে, শাকচুন্নীর মতো দেখতে। কথা বলে নাকে। তবে জলিল জমিয়ে ফেলল। ওদের রক্তের মধ্যে ব্যবসা। ধাই ধাই করে উঠে গেল। শাকচুন্নীর মতো স্টেনোটা পর্যন্ত সুন্দর হয়ে গেল। শফিক একদিন বলেই ফেলল, বেটি দেখতে খারাপ না। লদকা লদকি করব? প্রথম লদকা লদকি তারপর হাম তোম। তবে স্টেনোটা আমাদের মোটে পাত্তা দিল না। তার বড় সাহেবের আমরা হচ্ছি বোসম ফ্রেন্ড। তাতে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। চোখ তুলে তাকায় না পর্যন্ত। শালী।

জলিল বলল, ‘চা টা কিছু খাবি?’

‘দিতে বল।’

‘নাকি কফি দিতে বলব? ভালো কফি আছে।’

‘শালা কফি ধরেছিস নাকি?’

‘ধরতে হয়। নানান ধরনের লোকজন আসে। বাংলাদেশে ব্যবসা করা মুশকিল আছে।’

‘মুশকিল থাকবেই। মাগনা কেউ পয়সা দেবে নাকি?’

জলিল সিগারেট বের করে ধরল। দামি জিনিস। কিন্তু প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়াল না। ইচ্ছা হলে তুলে নিতে পারো এই ভাব। নিজ থেকে দেবে না। ইঙ্গিতও করবে না। এই কায়দাটিও সে নতুন শিখেছে। ইউনিভার্সিটিতে দেদার বিলাতো। তার সঙ্গে আমাদের খাতিরের মূল কারণই ছিল ফ্রি সিগারেট।

কফি চলে এলো। আমি অন্যদিকে তাকিয়ে ওর প্যাকেট থেকে সিগারেট নিলাম। জলিল গম্ভীর হয়ে বলল, ‘করছিস কী এখন?’

‘কিছু করছি না।’

‘না করলে হবে নাকি? কিছু-একটায় লেগে পড়।’

‘দেখি।’

‘দেখতে-দেখতে তো চুল পাকিয়ে ফেলেছিস। পাবলিক ওয়ার্কসের ঐ চাকরিটা কি হলো? হয় নাই?’

‘এটাতে আমার ইন্টারেস্ট নাই। বোগাস জিনিস।’

‘বোগাস কেন?’

আমি জবাব না দিয়ে বললাম, ‘একটা টেলিফোন করব। জলিল সঙ্গে সঙ্গে মুখ অন্ধকার করে ফেলল।’

‘আমার এখানে যেই আসে তারই দেখি টেলিফোন করা লাগে। ঐদিন শফিক এসে চিটাগাংয়ে কল করল। এটা কি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ নাকি?’

‘পয়সা দেব শালা। মাগনা করব না।’

‘পয়সার গাছ হয়েছে তো তোর। কোথায় করবি? সেই তোর জরিনা না কি যেন— তার কাছেই নাকি?’

আমি জবাব দিলাম না।

‘কেন খামাখা বুলাবুলি করছিস। ঐ মেয়ে তোর সাথে ভিড়বে নাকি? শুধু খেলাবে।’

‘বুঝলি কি করে খেলাবে?’

‘ঐসব বোঝা যায়।’

জলিল হাই তুলল। শালা হামবাগ দু’টা পয়সা হাতে আসতেই সবকিছু বুঝে ফেলছে। জলিল বলল, ‘ঐসব চিন্তা বাদ দে। তোর বুঝে কোনো-একটা কিছুতে লেগে পড়। বিজনেস করতে চাস তো সুযোগ সন্ধান দিতে পারি।’

‘চুপ থাক। বিজনেস আমি করব না। ছোটলোকের কাজ। ঐসব পোষায় না।’

জলিল মুখ কালো করে ফেলল। রাতটাকে আরেকটু ঘায়েল করবার জন্যে আমি সরু গলায় বললাম, ‘বিজনেস ঐশালাকে বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া দেয় না। মেয়ের বাপ মেয়ে দেয় না। বাংলাদেশে বিজনেসম্যানরা হচ্ছে শিডিউল কাস্ট। কই দেখি টেলিফোনটা।’ জলিল ফোন এগিয়ে দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল। তার মুখ কালো। আমি তার আঁতে ঘা দিয়েছি। নীলুফার নামের একটি মেয়ের প্রতি তার কিছু রস সঞ্চার হয়েছিল। মেয়ের বাবা রাজি হননি। সোজা বলে দিয়েছেন— বিজনেসম্যানের কাছে মেয়ে দেব না। মাসখানেক জলিল খুব গম্ভীর ছিল। অফিসে গেলে কথা বলত না। চা খাওয়াতে বললে বলত— চা হবে না, চিনি নেই। খসরুকে একদিন তো চূড়ান্ত অপমান করল। খসরু ঘরে ফিরবার জন্যে দশটা টাকা চেয়েছিল রিকশা ভাড়া। জলিল বলেছে, ‘হেঁটে হেঁটে বাড়ি যা। ভিক্ষার পয়সায় রিকশা চাপতে লজ্জা লাগে না।’

‘ভিক্ষা কোথায়? ফেরত দেব।’

‘বড় বড় বাত দিয়ে লাভ নাই। ফেরত দেবার মুরোদ তোর নেই।’

‘তাই নাকি?’

‘হ্যাঁ। ভিক্ষাই করবি সারা জীবন। ভিক্ষা করবি আর ভিক্ষার পয়সায় রিকশা চড়বি। তোদের আমার চেনা আছে।’

‘মুখ সামলে কথা বল শালা । একটা ফটি নাইন বসিয়ে দেব মুখে ।’
‘সেটা পারলেও তো কাজ হতো । সেটাও পারবি না । চোটপাট যা করবার মুখেই করবি । তোদের আমি চিনি ।’

সহজেই লাইন পাওয়া গেল । আমি বললাম, ‘হ্যালো জরী?’

‘হ্যাঁ । কে কথা বলছেন?’

‘আমি, আমি আনিস ।’

‘বুঝতে পারছি । কিছু বলবেন?’

‘তুমি আমাকে টেলিফোন ধরিয়ে রেখে কোথায় গেলে, তারপর আর এলে না ।’

‘ওমা কখন?’

আমি ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেললাম । সত্যি কি তার মনে নেই? না ইচ্ছা করে ভান করছে । জরী ভান করার মেয়ে নয় ।

‘হ্যালো জরী?’

‘বলুন ।’

‘তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল ।’

‘কথা থাকলে বলুন । শুনছি ।’

‘টেলিফোন বলা যাবে না ।’

‘এমন কী কথা যা টেলিফোনে বলা যাবে না?’

‘আমি সামনা-সামরি করতে চাই । কবে তুমি ফ্রি থাকবে বলো তো ।’

‘আমি ফ্রি নেই । বাড়ি-ভর্তি মেহমান, নানান ঝামেলা । এদিকে এ সপ্তাহে নেপাল যাচ্ছি ।’

‘কোথায় যাচ্ছে?’

‘নেপাল । দুলাভাই নিয়ে যাচ্ছেন । প্রথমে কথা ছিল কক্সবাজার যাব । পরে হিসাব করে দেখলাম কক্সবাজার যেতে যে খরচ, নেপাল যেতেও একই খরচ । শেষে নেপাল যাওয়া ঠিক হলো ।’

‘কতদিন থাকবে?’

‘বেশিদিন থাকা যাবে না । এক সপ্তাহ । ওখানে থাকার খরচ খুব বেশি । টুরিস্ট স্পট তো । আমেরিকানরা এসে এসে সব জিনিসের দাম বাড়িয়ে ফেলেছে । আচ্ছা রাখি?’

‘হ্যালো জরী?’

‘বলুন । একটু তাড়াতাড়ি বলুন, মা আমাকে ডাকছে । হ্যালো, বলুন কি বলবেন । হ্যালো ।’

আমি কিছু বললাম না। ঠিক সেই মুহূর্তে বলার কিছু পাওয়া গেল না।
জলিল বলল, 'কী কথা শেষ?'

'হুঁ।'

আমি টেলিফোন রাখতেই জলিল বিরস মুখে বলল, 'কী করবি এখন? বাড়ি
যাবি?'

'হুঁ।'

আমি উঠে পড়লাম। জলিল বলল, 'চল নিউ মার্কেট পর্যন্ত লিফ্ট দেই।
সোবাহান, গাড়ি বের করতে বল তো।'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

'গাড়ি কিনেছিস নাকি?'

'এখনো পুরোপুরি কিনিনি। ট্রায়াল দিয়ে দেখছি। এক সপ্তাহের জন্যে
ট্রায়াল দিতে এনেছি। তবে বোধহয় কিনব।'

'দাম কত?'

'এক লাখ চায়। পুরনো গাড়ি, কিছু কমাবে। আমি সন্তুষ্ট আছি। এর বেশি
হলে— নো। খুব টাইট অবস্থা আমার।'

জলিল আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল। গাড়িতে উঠে নিজ থেকেই সিগারেটের
প্যাকেট বাড়িয়ে দিল।

'দেখিস ভাই গাড়িতে ছাই ফেলিস না। একটু টিপটপ কন্ডিশনে রাখতে
চাই। দেখ, হাতলের কাছে ছাইদানি আছে।'

আমি খুব সাবধানে ছাইদানিতে ছাই ফেলতে লাগলাম। জলিল গম্ভীর
গলায় বলল, 'সোবাহান ময়োদাটা দাও তো।'

দারুণ আরামের শাড়ি। আরামে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। জলিল বলল,
'কালারটা কেমন দেখছিস? সোবার না?'

'হুঁ। খুব সোবার।'

'আরেকটা পেয়েছিলাম লাল। লাল আমার পছন্দ না। এত দাম দিয়ে
একটা জিনিস কিনব, কি বলিস?'

'তা তো ঠিকই।'

'এই লাইনে গাড়িটা হচ্ছে একটা নেসিসিটি। নানান ধরনের পার্টির কাছে
যেতে হয়। সব জায়গায় রিকশা চেপে গেলে মান থাকে না।'

'তা তো ঠিকই। তুমি এখন মানী লোক।'

'ঠাটা করছিস নাকি?'

'না ঠাটা করব কেন?'

'সরোদ কেমন লাগছে?'

'ভালোই।'

‘ভালো বললে হয় না। বুঝলি ক্লাসিক জিনিস।’

‘হুঁ।’

‘নে নে আরেকটা সিগারেট নে।’

‘থাক। এইমাত্র তো খেলাম।’

‘তাহলে রেখে দে একটা। ভাত খাওয়ার পর খাস।’

জলিল আমাকে যথেষ্ট খাতির করল। বাসার সামনে এনে নামিয়ে দিল।

খেতে বসে দেখি বাবা আজ ভালোই বাজার করেছেন। মাছ পচা নয়। টাকটা সরপুঁটি। মা হাসিমুখে বললেন, ‘বাজারে আজ মাছ সস্তা গেছে।’

‘তাই নাকি?’

‘হুঁ। খুব সস্তা।’

‘বাবা আজ অফিসে যাননি দেখলাম।’

‘তাঁর শরীরটা ভালো না।’

‘কী হয়েছে?’

‘বুকে নাকি ব্যথা করছে। শুয়ে আছেন। বয়স হয়েছে তো।’

দুপুরে খাওয়াটা ভালোই হলো। তবে বেচারী বাবা খেতে পারলেন না। বিছানায় উবু হয়ে শুয়ে রইলেন। মা বললেন, ‘বিকালে তোর বাবাকে মগবাজারে নিয়ে যাস।’

‘ঠিক আছে। নিয়ে যাব।’

মগবাজারে আমার এক স্বাক্ষর থাকেন। ডাক্তার। বিনা পয়সায় আমাদের চিকিৎসা করেন। চিকিৎসা ভালোই করেন। রোগ সারে।

‘পান খাবি?’

‘দাও একটা।’

মা পান এনে দিলেন। তাঁকে হাসি-খুশিই মনে হলো। তিনি বিছানায় পা উঠিয়ে বসলেন, ‘বাড়িওয়ালীর বউ এসেছিল আজকে, বুঝলি।’

‘কেন?’

‘নানান গল্প-গুজব করল। শেষে বলল আমার মেয়েটার জন্যে একটা ছেলে দেখেন না আপা। ভালো পরিবারের শিক্ষিত ছেলে হলেই হবে। চাকরি-বাকরি ব্যবসাবাণিজ্যের একটা-কিছু ব্যবস্থা আমরাই করব। নজরটা তোর দিকে বুঝলি তো?’

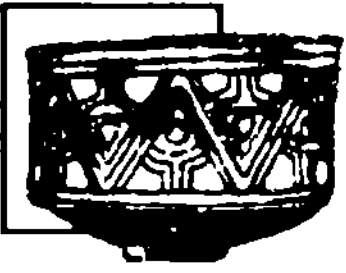
‘তুমি কী বললে?’

‘আমি কিছু বলি নাই। আগ বাড়িয়ে কিছু বললে ভাববে আমাদের গরজ। কী দরকার?’

আমি চুপ করে রইলাম। মা বললেন, ‘কথায় কথায় আবার শুনিয়ে দিল মেয়ের নামে পঁচিশ হাজার টাকা জমা আছে। তা আছে ঠিকই। টাকার কুমির।’

মা তৃপ্তির হাসি হাসলেন। আমি বারান্দায় গিয়ে জলিলের সিগারেটটা ধরলাম। খাবার পর একটা দামি সিগারেট বেশ লাগে। মনের মধ্যে অনেক উচ্চ শ্রেণীর ভাব আসে।

বাড়িওয়ালার মেয়েটা বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে আছে। দূর থেকে তার ফর্সা হাত দেখা যাচ্ছে। চুলগুলি ছাড়া। মা ঠিকই বলেছেন লম্বা চুল মেয়েটির। জরীর চুলও কি লম্বা? আমি কখনো লক্ষ্য করিনি। জরীর মতো মেয়েদের কখনো খুঁটিয়ে দেখা যায় না। এদের সঙ্গে দেখা হয় স্বপ্নে। স্বপ্ন সব সময়ই অস্পষ্ট।



বেবি রুথ

আমার পাশের ঘরের বাসিন্দা— সত্তর বছরের বুড়ি, এলিজাবেথ এন্ডারসন একটা সাপ কিনে এনেছে। সে নাকি পুষবে। প্রথমে প্রথমে খবরটা বিশ্বাস করিনি— বুড়ির ঘরে ঢুকতেই দেখি সত্যি সত্যিই সাপ। চৌকো ধরনের কাচের বাক্সে অজগর সাপের মতো দেখতে প্রকাণ্ড এক সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। আমেরিকানদের কোনো কাণ্ডকারখানায় অবাক হব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সিদ্ধান্ত ভুলে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

বুড়ি হাসিমুখে বলল, 'কত দিয়ে কিনেছি বলো তো?'

আমি শীতল গলায় বললাম, 'এই সাপ তুমি কিনে এনেছ?'

'হ্যাঁ, বিনে পয়সায় আমাকে কে দেবে?'

আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। পাশের ঘরে অজগর সাপ বাস করবে ভাবতেই বুক শুকিয়ে আসছে, এ কী যন্ত্রণায় পড়লাম!

'আহমেদ, তুমি কি ভয় পাচ্ছ?'

'ভয় না পাওয়ার কোনো কারণ আছে কি?'

'অবশ্যই আছে। নির্বিষ সাপ। তুমি ওর গায়ে হাত দাও— দেখবে কিছুই করবে না। ওর স্বভাব-চরিত্র শান্ত ধরনের। দাও, গায়ে হাত দাও।'

আমি শুকনো গলায় বললাম, 'তুমি কিছু মনে করো না, সাপের গায়ে হাত দিতে আমার ইচ্ছা করছে না।'

বুড়ি উজ্জ্বল চোখে বলল, ‘কত সস্তায় কিনলাম তোমাকে বলি। মাত্র কুড়ি ডলার। অবিশ্যি এই কুড়ি ডলারে কাচের বাক্সটা পড়ছে না। বাক্স ফেরত দিতে হবে।’

‘বাক্স ফেরত দিলে সাপ রাখবে কোথায়?’

‘পোষা সাপ তো, ঘুরেফিরে বেড়াবে।’

‘বলো কি!’

আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে গেল। কী সর্বনাশের কথা! আমি শুকনো গলায় বললাম, ‘বাড়িওয়ালী কি তোমাকে সাপ পুষতে দেবে?’

‘অবশ্যই দেবে। তার সঙ্গে রুমিং হাউস ভাড়া নেবার সময় যে কনট্রাক্ট হয়েছিল তাতে কোথাও লেখা নেই— সাপ পোষা যাবে না।’

‘তাই বুঝি?’

‘হ্যাঁ, তাই। তোমরা তো কনট্রাক্টে কি লেখা থাকে না পড়েই সই দিয়ে দাও। ভালোমতো পড়ে তারপর সই দিতে হয়। ধরো, এখন তুমি যদি সাপের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে দিতে চাও— তোমাকে ছ’মাসের ভাড়া পেনাল্টি হিসেবে দিতে হবে।’

‘এই কথা লেখা আছে?’

‘অবশ্যই লেখা আছে। ছ’পয়েন্টের টাইপে লেখা। চোখে না পড়ার মতো।’

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়া ছাড়া আমার গতি রইল না। ক্যাম্পাসের কাছে এবং অসম্ভব সস্তা দেখে এই রুমিং হাউসে থাকছি। একতলায় বাড়িওয়ালী, দোতলার পাঁচটি রুমে আমরা পাঁচজন। শুধু শোবার ব্যবস্থা। রান্নার ব্যবস্থা নেই। খাওয়া-দাওয়া সেরে রাতে এসে ঘুমিয়ে থাকা। এর নাম— রুমিং হাউস।

আমি থাকি বাথরুমের মুখোমুখি ঘরে। আমার পাশের ঘরে থাকে ভারতীয় ছাত্র অনন্ত নাগ। একটা করিডোরের মতো আছে। করিডোরের ওপাশে ফিলিপিনো ছাত্রী তোহা। অসম্ভব রূপবতী। তার দিকে তাকালে আপনা থেকেই দীর্ঘ নিশ্বাস উঠে আসে। তোহার পাশের কামরায় থাকে কোরিয়ান ছাত্র হান। ‘ইয়েস’ এবং ‘নো’ ছাড়া অন্য কোনো ইংরেজি শব্দ সে গত ছ’মাসে শিখতে পারেনি— এ-রকম ধারণা প্রচলিত আছে। হানের মুখোমুখি ঘরটায় এলিজাবেথের বাস। এতদিন এলিজাবেথ একাই থাকত। এখন এলিজাবেথের সঙ্গে থাকবে প্রকাণ্ড এক সাপ, যার নাম মেক্সিকান পাইথন।

বিপজ্জনক জীবজন্তু পোষার ব্যাপারে আমেরিকানদের নামডাক আছে। এদেশে বেশকিছু মানুষ আছে যারা কাচের বোতলে ব্ল্যাক উইডো মাকড়সা পোষে। এই মাকড়সাগুলো ভয়ঙ্কর বিষাক্ত। মানুষকে কামড়ানো মানেই মৃত্যু।

যারা এদের পোষে তাদের ক্লাবের মতো আছে— ক্লাব উইডো ক্লাব। সেই ক্লাব থেকে নিয়মিত পত্রিকা বের হয়। অনেকের আছে বিষাক্ত সাপ পোষার হবি। কুমির পোষা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। কবে যেন পত্রিকায় পড়লাম পোষা কুমির কামড়ে ঠ্যাং খেয়ে ফেলেছে। আমেরিকান ছোট-বড় সব শহরেই ‘পেট হাউস’ আছে, যেখানে তক্ষক থেকে শুরু করে মাকড়সা পর্যন্ত কিনতে পাওয়া যায়।

বুড়ি সাপ কিনে আনার পর রুমিং হাউসের সদস্যদের মধ্যে বিষাদের ছায়া নেমে এল। কেউ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারছে না আবার থাকতেও ভরসা পাচ্ছে না। প্রথম রাতে আমার এক ফোঁটা ঘুম হলো না। এদেশে মশারি বলে কিছু নেই। মশারি থাকলে মশারি ফেলে খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করতাম। সারারাত বিছানায় বসে পার করে দিলাম। প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছিল, এই বুঝি মেক্সিকান পাইথন গা বেয়ে উঠে আসছে।

দ্বিতীয় দিনের ঘটনা। ফিলিপিনো তরুণী তোহা বাথরুম থেকে চুঁচিয়ে কি যেন বলতে লাগল। তার নিজস্ব টেগালোগ ভাষা, আমরা কিছুই বুঝছি না। তবে চিৎকারের ধরন দেখে মনে হচ্ছে— ‘বাবারে, মাঝে, খেয়ে ফেলল রে।’

দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢোকা হবে কিনা ঠাণ্ডা ভাবা হচ্ছে, তখন তোহা নিজেই দরজা খুলে ঝড়ের বেগে বের হয়ে এল। গায়ে কাপড়ের বংশও নেই। তোহা হড়হড় করে বলল, ‘আমি শাওয়ার নেয়ার জন্যে বাথটাবে নেমেই দেখি পানিতে গা ডুবিয়ে মেক্সিকান পাইথন শুয়ে আছে।’

অনন্ত নাগ দাঁত বের করে বলল, ‘দয়া করে ঘটনাটা আরেকবার বলো। কাপড় পরার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। বিনা কাপড়েই তোমাকে ভালো দেখাচ্ছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে অন্যদের জিজ্ঞেস করো।’

তোহা একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। সম্বিত ফিরে পেয়ে ছুটে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। অনন্ত নাগ বলল, ‘ঘরে একটা সাপ থাকা নেহায়েত মন্দ না। কি বলো তোমরা? সাপ না থাকলে এই জিনিস দেখতে পেতে?’

আমাদের দিন এবং রাত কাটতে লাগল দুঃস্বপ্নের মধ্যে। সাপটাকে অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় পাওয়া যেতে লাগল। হান একদিন ওভারকোট গায়ে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে— হঠাৎ তার মনে হলো, গা বেয়ে হড়হড় করে কি যেন নেমে যাচ্ছে।

অনন্ত নাগ এক রাতে জেগে উঠে দেখে, সে কোলবালিশ জড়িয়ে শুয়ে আছে। তার হঠাৎ মনে হলো আমেরিকায় তো কোলবালিশ থাকার কথা না, তারপরই তার বিকটা চিৎকার শোনা যেতে লাগল।

আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম, একমাত্র এলিজাবেথেরই কোনো বিকার নেই।

সাপ যতই যন্ত্রণা করে, সে ততই মধুর ভঙ্গিতে বলে— ‘মাই নটি গার্ল। মাই নটি গার্ল।’ ‘নটি গার্ল’ বলার কারণ— সাপটি স্ত্রী জাতীয়।

বুড়ি তার ‘নটি গার্ল’ নিয়ে নানার ধরনের আহ্বাদও করতে লাগল। সেই আহ্বাদের একটা নমুনা হচ্ছে ইনস্যুরেন্স। সাপের জন্যেও যে ইনস্যুরেন্স কিনতে পাওয়া যায় তা আমাদের জানা ছিল না। এই বিচিত্র দেশে সবই সম্ভব।

আমি ঠিক করে ফেললাম, ছ’মাসের পেনাল্টি দিতে হলেও আমি এই রুমিং হাইসে থাকব না। সারাক্ষণ আতঙ্কের মধ্যে বাস করা যায় না। অনন্ত নাগ এবং হানেরও একই মত। শুধু তোহা বলল, সাপটা বড় হলেও তার মুখটা ছোট। সেই মুখ দিয়ে সাপটা তাকে গিলে খেতে পারবে না। কাজেই অসুবিধা কি, থাকুক না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে মাসখানেক যেতেই আমাদেরও তোহার মতোই মনে হতে লাগল— সাপ এমন ভয়াবহ কিছু না। বরং প্রাণী হিসেবে বেশ মজার।

সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর মস্তিষ্ক অতি ক্ষুদ্র হয়। সে কারণে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিম্নপর্যায়ের হওয়ারই কথা। দেখা গেল আমাদের এই সাপের বুদ্ধিবৃত্তি বেশ উচ্চপর্যায়ের। সে টিভি দেখে। আমাদের মধ্যে একমাত্র তোহার ঘরেই টিভি আছে। টিভি অন করামাত্র মেক্সিকান পাইথন উপস্থিত হয়। সুবিধামতো একটা জায়গা সে কুণ্ডলী পাকিয়ে গুয়ে থাকে। যতক্ষণ টিভি চলে ততক্ষণ সেখান থেকে নড়ে না। তোহার ধারণা, টিভির কিছু বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রাম যেমন— ‘বার্নি মিলার’, ‘থি ইজ কোম্পানি’ তাকে খুব পছন্দ। এই সময় তাকে বেশ উত্তেজিত মনে হয়। ফোঁস ফোঁস করে জাতীয় শব্দ করতে থাকে।

এলিজাবেথ তার পোষা সাপের নাম রাখল রুথ। রুথ বলে ডাকলে সে অবিশ্যি ছুটে উপস্থিত হয় না। তবে মেঝেতে আঙ্গুল দিয়ে কয়েক বার টোকা দিলেই ছুটে আসে।

রুথের রসবোধ বেশ প্রখর বলেই আমাদের মনে হলো। তার রসবোধের উদাহরণ না দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। ধরা যাক, বাইরের কোনো গেস্ট এসেছে, পা নামিয়ে বসে জমিয়ে গল্প করছে, তার নজর এড়িয়ে ধীরে ধীরে তার দিকে অগ্রসর হবে। তার পায়ের কাছে এসে হঠাৎ নিমিষের মধ্যে গেস্ট বেচারার দু’পা সে তার শরীর দিয়ে জড়িয়ে ফেলবে। গেস্ট বেচারা ভয়ে-আতঙ্কে যতই চেষ্টা করে, আমরা ততই হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ব।

অন্যান্য প্রাণী পোষার চেয়ে সাপ পোষার ঝঞ্ঝাট অনেক কম— এ সত্যও সহজেই টের পেলাম। তাকে খাওয়ানোর যন্ত্রণা নেই। সপ্তাহে একদিন সে একটা ইঁদুর খায়। সে ইঁদুর আমাদের খাওয়াতে হয় না। আমরা তাকে ‘পেট-সপে’ নিয়ে যাই। পেট-সপের কর্মচারীরা খাইয়ে দেয়। বিনিময়ে এক ডলার দিতে হয়। চমৎকার ব্যবস্থা!

স্প্রিং কোয়ার্টার শেষ হবার আগে আগে রুথ উধাও হয়ে গেল। আমরা

খোঁজাখুঁজির চূড়ান্ত করলাম— লাভ হলো না। রুমিং হাউসের সদস্যদের যে কি পরিমাণ মন খারাপ হলো বলার না। সবচেয়ে মন খারাপ করল তোহা। প্রায় নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দেয়ার মতো অবস্থা। সে গির্জায় মোম জ্বালিয়ে এল। রুথ ফিরল না।

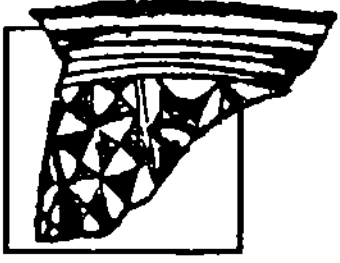
রুথের উপস্থিতিতে যেমন অভ্যস্ত হয়েছিলাম, অনুপস্থিতিতেও একসময় অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। রুমিং হাউসের সদস্যদের মধ্যে হান চলে গেল নিজের দেশে। হানের জায়গায় থাকতে এল আমেরিকান ছাত্র কার্ল। তোহা এক আমেরিকান কোটিপতিকে বিয়ে করে চলে গেল আটলান্টায়। দিন আগের মতোই কাটতে লাগল। বুড়ি এলিজাবেথ ব্যাঞ্জো নামের একটা বাদ্যযন্ত্র কিনে নিয়ে এল। সময়ে অসময়ে সে যন্ত্র বেজে ওঠে। বিরক্তির একশেষ। আমার কোয়ার্টার ফাইনাল মাথার ওপর। দম ফেলার সময় নেই। বেবি রুথের কথা আমরা ভুলে গেলাম। মনে রাখার ক্ষমতার মতো ভুলে যাবার ক্ষমতাও মানুষের অস্বাভাবিক।

এক সন্ধ্যায় পড়ার টেবিলে উবু হয়ে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটি জটিল সমাধান করার চেষ্টা করছি— একেক বার একেক উত্তর হচ্ছে। নিজেকেই নিজে গাধা বলে গালাগালি করছি। তখন বিকট হুইচই শুরু হলো। বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে সবাই যেমন একসঙ্গে চোঁচাতে থাকে সেরকম অবস্থা। বই বন্ধ করে ঘরের বাইরে এসে থমকে গেলাম। রুথ ফিরে এসেছে, তবে একা ফেরেনি। তার সঙ্গে কিলবিল করছে গোটা বিশেক সাপের ছানা। সব ক’টি প্রায় এক ফুটের মতো লম্বা। কোথাও যাচ্ছে, রুথ কোথাও গিয়ে ডিম দিয়েছে। বাচ্চা ফুটিয়ে তাদের খানিকটা বড় করে নিয়ে এসেছে আমাদের দেখাতে।

সাপের ছানাগুলো ঘুরঘুর ছড়িয়ে পড়ল। আমরা সবাই বিছনায় পা উঠিয়ে বসে ঠকঠক করে কাঁপছি। এলিজাবেথ নিজে ‘হেল্প, হেল্প’ বলে চিৎকার করে গলা ভেঙ্গে ফেলল। বাড়িওয়ালী দমকল বাহিনীকে টেলিফোন করল— আমাদের উদ্ধার করার জন্যে।

দমকল বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে চলে এল।

সাপ ধরার কলাকৌশল তাদের জানা নেই। তারা খবর দিয়ে অন্য কাদের যেন আনল। সাপ ধরে ধরে পলিথিনের ব্যাগে ভরা শুরু হলো। রুথ কোনো রকম প্রতিবাদ করল না। সে হয়তো গভীর ভালোবাসায় তার বাচ্চাগুলোকে আমাদের দেখাতে এনেছিল। বেচারি জানে না— মানুষ শুধু মানুষের ভালোবাসাই গ্রহণ করতে পারে— অন্য কারোর ভালোবাসা গ্রহণ করার ক্ষমতা মানুষের নেই।



চোখ

ভোর ছ'টায় কেউ কলিং বেল টিপতে থাকলে মেজাজ বিগড়ে যাবার কথা। মিসির আলির মেজাজ তেমন বিগড়াল না। ভোর দশটা পর্যন্ত কেন জানি তাঁর মেজাজ বেশ ভালো থাকে। দশটা থেকে খারাপ হতে থাকে, চূড়ান্ত রকমের খারাপ হয় দু'টার দিকে। তারপর আবার ভালো হতে থাকে। সন্ধ্যার দিকে অসম্ভব ভালো থাকে। তারপর আবার খারাপ হতে শুরু করে। ব্যাপারটা শুধু তাঁর বেলায় ঘটে না সবার বেলায়ই ঘটে, তা তিনি জানেন না। প্রায়ই ভাবেন একে ওকে জিজ্ঞেস করবেন— শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠে না। তাঁর চরিত্রের বড় রকমের দুর্বল দিকে হচ্ছে পরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে না। অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলতে পারেন, কথা বলতেও ভালো লাগে। সেদিন রিকশা করে আসতে আসতে রিকশাওয়ালার সঙ্গে অতি উচ্চ শ্রেণীর কিছু কথাবার্তা চাৰিয়ে গেলেন। রিকশাওয়ালার বক্তব্য হচ্ছে— পৃথিবীতে যত অশান্তি সবার মূলে আছে মেয়েছেলে।

মিসির আলি বললেন, 'এই রকম মনে হওয়ার কারণ কী?'

রিকশাওয়ালা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'চাচামিয়া এই দেহেন আমারে। আজই আমি রিকশা চলাই। এর কারণ কী? এর কারণ বিবি হওয়া। বিবি হওয়া যদি কুবুদ্ধি দিয়া বাবা আদমরে গন্ধম ফল না খাওয়াইত তা হইলে আইজ আমি থাকতাম বেহেশতে। বেহেশতে তো আর রিকশা চালানীর কোনো বিষয় নাই, কি কন চাচামিয়া? গন্ধম ফল খাওয়ানির কারণেই তো আইজ আমি দুনিয়ায় আইসা পড়লাম।'

মিসির আলি রিকশাওয়ালার কথাবার্তায় চমৎকৃত হলেন। পরবর্তী দশ মিনিট তিনি রিকশাওয়ালাকে যা বললেন, তার মূল কথা হলো— নারীর কারণে আমরা যদি স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে থাকি তাহলে নারীই পারে আবার আমাদের স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

রিকশাওয়ালা কি বুঝল কে জানে। তার শেষ বক্তব্য ছিল— 'যাই কন চাচামিয়া, মেয়ে মানুষ আসলে সুবিধার জিনিস না।'

কলিং বেল আবার বাজছে।

মিসির আলি বেল টেপার ধরন থেকে অনুমান করতে চেষ্টা করলেন— কে হতে পারে?

ভিথিরি হবে না। ভিথিরিরা এত ভোরে বের হয় না। ভিক্ষাবৃত্তি যাদের পেশা তারা পরিশ্রান্ত হয়ে গভীর রাতে ঘুমুতে যায়, ঘুম ভাঙতে সেই কারণেই দেরি হয়। পরিচিত কেউ হবে না। পরিচিতরা এত ভোরে আসবে না। তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে পারে এমন ঘনিষ্ঠতা তাঁর কারও সঙ্গেই নেই।

যে এসেছে, সে অপরিচিত। অবশ্যই মহিলা। পুরুষরা কলিং বেলের বোতাম অনেকক্ষণ চেপে ধরে থাকে। মেয়েরা তা পারে না। মেয়েটির বয়স অল্প তাও অনুমান করা যাচ্ছে। অল্পবয়স্ক মেয়েদের মধ্যে এক ধরনের ছটফটে ভাব থাকে। তারা অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েক বার বেল টিপবে। নিজেদের অস্থিরতা ছড়িয়ে দেবে কলিং বеле।

মিসির আলি, পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে দরজা খুললেন। বিস্মিত হয়ে দেখলেন, তাঁর অনুমান সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে মাঝবয়েসি এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। বেঁটেখাটো একজন মানুষ। গায়ে সাফারি। চোখে সানগ্লাস। এত ভোরে কেউ সানগ্লাস পরে না। এই লোকটি কেন পরেছে কে জানে।

‘স্যার স্লামালিকুম।’

‘ওয়ালাইকুম সালাম।’

‘আপনার নাম কি মিসির আলি?’

‘জি।’

‘আমি কি আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলতে পারি?’

মিসির আলি কী বলবেন মনস্থির করতে পারলেন না। লোকটিকে তিনি পছন্দ করছেন না, তবে তার মধ্যে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করছেন— যা তাঁর ভালো লাগছে। আত্মবিশ্বাসের ব্যাপারটা আজকাল আর দেখাই যায় না।

লোকটি শান্ত গলায় বলল, ‘আমি আপনার কিছুটা সময় নষ্ট করব ঠিকই তবে তার জন্যে আমি পে করব।’

‘পে করবেন?’

‘জি। প্রতিঘণ্টায় আমি আপনাকে এক হাজার করে টাকা দেব। আশা করি আপনি আপত্তি করবেন না। আমি কি ভেতরে আসতে পারি?’

‘আসুন’

লোকটি ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, ‘মনে হচ্ছে আপনার এখনো হাত-মুখ ধোয়া হয়নি। আপনি হাত-মুখ ধুয়ে আসুন, আমি অপেক্ষা করছি।’

মিসির আলি বললেন, ‘ঘণ্টা হিসেবে আপনি যে আমাকে টাকা দেবেন—সেই হিসেব কি এখন থেকে শুরু হবে? না-কি হাত-মুখ ধুয়ে আপনার সামনে বসার পর থেকে শুরু হবে?’

লোকটি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ‘টাকার কথায় আপনি কি রাগ করেছেন?’

‘রাগ করিনি। মজা পেয়েছি। চা খাবেন?’

‘খেতে পারি। দুধ ছাড়া।’

মিসির আলি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, ‘এক কাজ করুন— রান্নাঘরে চলে যান। কেতলি বসিয়ে দিন। দু’কাপ বানান। আমাকেও এক কাপ দেবেন।’

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, ‘আমাকে ঘণ্টা হিসেব পে করবেন বলে যেভাবে হকচকিয়ে দিয়েছিলেন, আমিও ঠিক একইভাবে আপনাকে হকচকিয়ে দিলাম। বসুন, চা বানাতে হবে না। সাতটার সময় রাস্তার ওপাশের রেস্টুরেন্ট থেকে আমার জন্যে চা-নাশতা আসে। তখন আপনার জন্যেও চা আনিয়ে দেব।’

‘থ্যাংক ইউ স্যার।’

‘আপনি কথা বলার সময় বারবার বাঁ দিকে ঘুরছেন। আমার মনে হচ্ছে আপনার বাঁ চোখটা নষ্ট। এইজন্যেই কি কালো চশমা পরে আছেন?’

ভদ্রলোক সহজ গলায় বললেন, ‘জি। আমার বাঁ চোখটা পাথরের।’

ভদ্রলোক সোফার এক কোণে বসলেন। মিসির আলি লক্ষ করলেন, লোকটি শিরদাঁড়া সোজা করে বসে আছে। চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এলে ক্যানডিডেটরা যে ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে, অবিকল সেই ভঙ্গি। মিসির আলি বললেন, ‘আজকের খবরের কাগজ এখানে আসেনি। গত দিনের কাগজ দিতে পারি। যদি আপনি চোখ বুলাতে চান।’

‘আমি খবরের কাগজ পড়ি না। একা একা বসে থেকে আমার অভ্যাস আছে। আমার জন্যে আপনার ব্যস্ত হতে হবে না। শুরুতে টাকা দেয়ার কথা বলে যদি আপনাকে আহত করে থাকি তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।’

মিসির আলি টুথব্রাশ হাতে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। লোকটিকে তার বেশ ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে। তবে কোনো গুরুতর সমস্যা নিয়ে এসেছে বলে মনে হয় না। আজকাল অকারণেই কিছু লোকজন এসে তাঁকে বিরক্ত করা শুরু করেছে। মাসখানেক আগে একজন এসেছিল ভূতবিশারদ। সে না-কি গবেষণাধর্মী একটি বই লিখছে, যার নাম ‘বাংলা ভূত’। এ দেশে যত ধরনের ভূত পেত্নী আছে সবার নাম, আচার-ব্যবহার বইয়ে লেখা। মেছো ভূত, গেছো ভূত, জলা ভূত, শাকচুন্নি, কন্ধকাটা, কুনী ভূত, আঁধি ভূত...। সর্বমোট একশে’ ছ’রকমের ভূত।

মিসির আলি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, ‘ভাই আমার কাছে কেন? আমি সারাজীবন ভূত নেই এইটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি...।’

সেই লোক মহা উৎসাহী হয়ে বলল, ‘কোন কোন ভূত নেই বলে প্রমাণ

করেছেন— এইটা বলুন। আমার কাছে ক্যাসেট প্লেয়ার আছে। আমি টেপ করে নেব।’

সানগ্লাস পরা বেঁটে ভদ্রলোক সেই পদের কেউ কিনা কে বলবে?

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মিসির আলি বললেন, ‘ভাই বলুন কী ব্যাপার।’

‘প্রথমেই আমার নাম বলি— এখনো আমি আপনাকে আমার নাম বলিনি। আমার নাম রাশেদুল করিম। আমেরিকার টেক্সাসের এম অ্যান্ড এন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের আমি একজন অধ্যাপক। বর্তমানে এক বছরে স্যাবোটিক্যাল লিভে দেশে এসেছি। আপনার খোঁজ কীভাবে এবং কার কাছে পেয়েছি তা কি বলব?’

‘তার দরকার নেই। কী জন্যে আমার খোঁজ করেছেন সেটা বলুন।’

‘আমি কি ধূমপান করতে পারি? সিগারেট খেতে খেতে কথা বললে আমার জন্যে সুবিধা হবে। সিগারেটের ধোঁয়া এক ধরনের আড়াল সৃষ্টি করে।’

‘আপনি সিগারেট খেতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই।’

‘হাই কোথায় ফেলব? আমি কোনো এ্যাশট্রে দেখতে পাচ্ছি না।’

‘মেঝেতে ফেলুন। আমার গোটা বাড়িটাই একটা এ্যাশট্রে।’

রাশেদুল করিম সিগারেট ধরিয়েই কথা বলা শুরু করলেন। তাঁর গলার স্বর ভারী এবং স্পষ্ট। কথাবার্তা খুব গেলিছানো। কথা শুনে মনে হয় তিনি কী বলবেন তা আগেভাগেই জানেন। কোন বাক্যাটির পর কোন বাক্য বলবেন তাও ঠিক করা। যেন ক্লাসের বক্তৃতা। আগে থেকে ঠিকঠাক করা। প্রবাসী বাঙালিরা একনাগাড়ে বাংলায় কথা বলতে পারেন না— ইনি তা পারছেন।

‘আমার বয়স এ নভেম্বরে পঞ্চাশ হবে। সম্ভবত আমাকে দেখে তা বুঝতে পারছেন না। আমার মাথার চুল সব সাদা। কলপ ব্যবহার করছি গত চার বছর থেকে। আমার স্বাস্থ্য ভালো। নিয়মিত ব্যায়াম করি। মুখের চামড়ায় এখনো ভাঁজ পড়ে নি। বয়সজনিত অসুখ-বিসুখ কোনোটাই আমার নেই। আমার ধারণা শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে আমার কর্মক্ষমতা এখনো একজন পঁয়ত্রিশ বছরের যুবকের মতো। এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। আজ আমার গায়ে হলুদ। মেয়েপক্ষীয়রা সকাল ন’টায় আসবে। আমি ঠিক আটটায় এখান থেকে যাব। আটটা পর্যন্ত সময় কি আমাকে দেবেন?’

‘দেব। ভালো কথা, এটা নিশ্চয়ই আপনার প্রথম বিয়ে না। এর আগেও আপনি বিয়ে করেছেন?’

‘জি। এর আগে একবার বিয়ে করেছি। এটি আমার দ্বিতীয় বিয়ে। আমি আগেও বিয়ে করেছি তা কি করে বললেন?’

‘আজ আপনার গায়ে হলুদ তা খুব সহজভাবে বললেন দেখে অনুমান করলাম। বিয়ের তীব্র উত্তেজনা আপনার মধ্যে দেখতে পাইনি।’

‘সব মানুষ তো এক রকম নয়। একেক জন একেক রকম। উত্তেজনার ব্যাপারটি আমার মধ্যে একেবারেই নেই। প্রথমবার যখন বিয়ে করি তখনও আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা ছিল না। সেদিনও আমি যথারীতি ক্লাসে গিয়েছি। গ্রুপ থিওরির উপর এক ঘণ্টার লেকচার দিয়েছি।’

‘ঠিক আছে আপনি বলে যান।’

রাসেদুল করিম শান্ত গলায় বললেন, ‘আপনার ভেতর একটা প্রবণতা লক্ষ্য করছি— আমাকে আর দশটা মানুষের দলে ফেলে বিচার করার চেষ্টা করেছেন। দয়া করে তা করবেন না। আমি আর দশজনের মতো নই।’

‘আপনি শুরু করুন।’

‘অঙ্ক শাস্ত্রে এম.এ ডিগ্রি নিয়ে আমি আমেরিকা যাই পিএইচ.ডি করতে। এম.এ-তে আমার রেজাল্ট ভালো ছিল না। টেনেটুয়ে সেকেন্ড ক্লাস। প্রাইভেট কলেজে কলেজে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছি, তখন কিছুদের দেখাদেখি জি-আর-ই পরীক্ষা দিয়ে ফেললাম। জি-আর-ই পরীক্ষা কি তা কি আপনি জানেন? গ্রাজুয়েট রেকর্ড একজামিনেশন। আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে গ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হতে হলে এই পরীক্ষা দিতে হয়।’

‘আমি জানি।’

‘এই পরীক্ষায় আমি অসম্মত ভালো করে ফেললাম। আমেরিকান তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার কাছে আমন্ত্রণ চলে এল। চলে গেলাম। পিএইচ.ডি. করলাম প্রফেসর হোবিলের সঙ্গে। আমার পিএইচ.ডি. ছিল গ্রুপ থিওরির একটি শাখায়— নন এ্যাবেলিয়ান ফাংশানের ওপর। পিএইচ.ডি.-র কাজ এতই ভালো হলো যে আমি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলাম। অঙ্ক নিয়ে বর্তমানকালে যারা নাড়াচাড়া করেন তাঁরা সবাই আমার নাম জানেন। অঙ্ক শাস্ত্রের একটি ফাংশান আছে যা আমার নামে পরিচিত। আর কে এক্সপোনেনশিয়াল। আর কে হচ্ছে রাসেদুল করিম।’

পিএইচ.ডি.-র পরপরই আমি মন্টানা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনার কাজ পেয়ে গেলাম। সেই বছরই বিয়ে করলাম। মেয়েটি মন্টানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টসের ছাত্রী— স্প্যানিশ আমেরিকান। নাম, জুডি বারনার।’

‘প্রেমের বিয়ে?’

‘প্রেমের বিয়ে বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না। বাছাবাছির বিয়ে বলতে পারেন। জুডি অনেক বাছাবাছির পর আমাকে পছন্দ করল।’

‘আপনাকে পছন্দ করার কারণ কী?’

‘আমি ঠিক অপছন্দ করার মতো মানুষ সেই সময় ছিলাম না। আমার একটি চোখ পাথরের ছিল না। চেহারা তেমন ভালো না হলেও দু’টি সুন্দর চোখ ছিল। আমার মা বলতেন, রাশেদের চোখে জন্ম-কাজল পরানো। সুন্দর চোখের ব্যাপারটা অবশ্য ধর্তব্য নয়। আমেরিকান তরুণীরা প্রেমিকদের সুন্দর চোখ নিয়ে মাথা ঘামায় না— তারা দেখে প্রেমিক কী পরিমাণ টাকা করেছে এবং ভবিষ্যতে কী পরিমাণ টাকা সে করতে পারবে। সেই দিক দিয়ে আমি মোটামুটি আদর্শস্থানীয় বলা চলে। ত্রিশ বছর বয়সে একটি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি পজিশন পেয়ে গেছি। ট্যানিউর পেতেও কোনো সমস্যা হবে না। জুডি স্বামী হিসেবে আমাকে নির্বাচন করল। আমার দিক থেকে আপত্তির কোনো কারণ ছিল না। জুডি চমৎকার একটি মেয়ে। শত বছর সাধনার ধন হয়তো নয় তবে বিনা সাধনায় পাওয়ার মতো মেয়েও নয়।

বিয়ের সাতদিনের মাথায় আমরা হানিমুন করতে চলে গেলাম সানফ্রান্সিসকো। উঠলাম হোটেল বেডফোর্ডে। দ্বিতীয় রাতের ঘটনা। ঘুমুচ্ছিলাম। কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখি জুডি পাশে নেই। ঘড়িতে রাত তিনটা দশ বাজছে। বাথরুমের দরজা বন্ধ। সেখান থেকে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ আসছে। আমি বিস্মিত হয়ে উঠে গেলাম। দরজা ধাক্কা দিয়ে বললাম, ‘কী হয়েছে? জুডি কী হয়েছে? কান্না থেমে গেল। তবে জুডি কোনো জবাব দিল না।’

অনেক ধাক্কাধাক্কির পর সে দরজা খুলে হতভম্ব হয়ে আমাকে দেখতে লাগল। আমি বললাম, ‘কী হয়েছে?’

সে ক্ষীণ স্বরে বলল, ‘ভয় পেয়েছি।’

‘কীসের ভয়?’

‘জানি না কীসের ভয়।’

‘ভয় পেয়েছ তো আমাকে ডেকে তোলোনি কেন? বাথরুমে দরজা বন্ধ করে ছিলে কেন?’

জুডি জবাব দিল না। একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, ‘ব্যাপারটা কী আমাকে খুলে বলো তো?’

‘সকালে বলব’।

‘না, এখনি বলো। কী দেখে ভয় পেয়েছ?’

জুডি অস্পষ্ট স্বরে বলল, ‘তোমাকে দেখে।’

‘আমাকে দেখে ভয় পেয়েছ মানে? আমি কী করেছি?’

জুডি যা বলল তা হচ্ছে— রাতে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। হোটেলের ঘরে নাইট লাইট জ্বলছিল, এই আলোয় সে দেখে তার পাশে যে শুয়ে আছে সে কোনো জীবন্ত মানুষ নয়। মৃত মানুষ। যে মৃত মানুষের গা থেকে শবদেহের গন্ধ বেরুচ্ছে। সে ভয়ে কাঁপতে থাকে তবু সাহসে হাত বাড়িয়ে মানুষটাকে স্পর্শ করে। স্পর্শ করেই চমকে ওঠে, কারণ মানুষটার শরীর বরফের মতোই শীতল। সে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে যায় যে আমি মারা গেছি। তার জন্যে এটা বড় ধরনের শক হলেও সে যথেষ্ট সাহস দেখায়— টেবিল ল্যাম্প জ্বলে দেয় এবং হোটেল ম্যানেজারকে টেলিফোন করবার জন্যে টেলিফোন সেট হাতে তুলে নেয়। ঠিক তখন সে লক্ষ করে মৃতদেহের দু'টি বন্ধ চোখের একটি ধীরে ধীরে খুলছে। সেই একটিমাত্র খোলা চোখ তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। জুডি টেলিফোন ফেলে দিয়ে ছুটে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। এই হলো ঘটনা।

রাশেদুল করিম কথা শেষ করে সিগারেট ধরালেন। হাতের ঘড়ি দেখলেন। আমি বললাম, 'থামলেন কেন?'

'সাতটা বেজেছে। আপনি বলেছেন সাতটার সময় আপনার জন্যে চা আসে। আমি চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছি। চা খেয়ে শুরু করব। আমার গল্প শুনতে আপনার কেমন লাগছে?'

'ইন্টারেস্টিং। এই গল্প কি আপনি অনেকের সঙ্গে করেছেন? আপনার গল্প বলার ধরন থেকে মনে হচ্ছে, অনেকের সঙ্গেই এই গল্প করেছেন।'

'আপনার অনুমান সঠিক। ছয় থেকে সাতজনকে আমি বলেছি। এর মধ্যে সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন। পুলিশের লোক আছে।'

'পুলিশের লোক কেন?'

'গল্প শেষ করলেই বুঝতে পারবেন পুলিশের লোক কী জন্যে।'

চা চলে এল। চায়ের সঙ্গে পরোটা-ভাজি। মিসির আলি নাশতা করলেন। রাশেদুল করিম সাহেব পরপর দু'কাপ চা খেলেন।

'আমি কি শুরু করব?'

'জি, শুরু করুন।'

'আমাদের হানিমুন মাত্র তিনদিন স্থায়ী হলো। জুডিকে নিয়ে পুরনো জায়গায় চলে এলাম। মনটা খুবই খারাপ। জুডির কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না। রোজ রাতে সে ভয়ঙ্কর চিৎকার করে ওঠে। ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। আমি যখন জেগে উঠে তাকে সান্ত্বনা দিতে যাই তখন সে এমনভাবে তাকায় যেন আমি একটা পিশাচ কিংবা মূর্তিমান শয়তান। আমার দুঃখের কোনো সীমা রইল না। সেই সময় নন এবেলিয়ান গ্রুপের ওপর একটা জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিলাম। আমার দরকার ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার মতো

পরিবেশ। মানসিক শান্তি। সব দূর হয়ে গেল। অবিশ্যি দিনের বেলায় জুডি থাকে স্বাভাবিক। সে বদলাতে শুরু করে সূর্য ডোবার পর থেকে। আমি তাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গেলাম।

সাইকিয়াট্রিস্ট প্রথম সন্দেহ করলেন সমস্যা ড্রাগঘটিত। হয়তো জুডি ড্রাগে অভ্যস্ত। সেই সময় বাজারে হেলুসিনেটিং ড্রাগ এলএসডি প্রথম এসেছে। শিল্প সাহিত্যের লোকজন শখ করে এই ড্রাগ খাচ্ছেন। বড় গলায় বলছেন— মাইন্ড অলটারিং ট্রিপ নিয়ে এসেছি। জুডি ফাইন আর্টসের ছাত্রী। ট্রিপ নেয়া তার পক্ষে খুব অস্বাভাবিক না।

দেখা দেখা ড্রাগঘটিত কোনো সমস্যা তার নেই। সে কখনো ড্রাগ নেয়নি। সাইকিয়াট্রিস্টরা তার শৈশবের জীবনে কোনো সমস্যা ছিল কি-না তাও বের করতে চেষ্টা করলেন। লাভ হলো না। জুডি এসেছে গ্রামের কৃষক পরিবার থেকে। এ ধরনের পরিবারে তেমন কোনো সমস্যা থাকে না। তাদের জীবনযাত্রা সহজ এবং স্বাভাবিক।

সাইকিয়াট্রিস্ট জুডিকে ঘুমের অযুধ দিলেন। কড়া ডোজের ফেনোবারবিটন। আমাকে বললেন, আপনি সম্ভবত লেখাপড়া নিয়ে থাকেন। স্ত্রীর প্রতি বিশেষ করে নববিবাহিত স্ত্রীর প্রতি যতটা সময় দেয়া দরকার তা দিচ্ছে না। আপনার প্রতি আপনার স্ত্রীর এক ধরনের ক্ষোভ জন্মগ্রহণ করেছে। সে যা বলছে তা ক্ষোভেরই বহির্প্রকাশ।

জুডির কথা একটাই— আমি ঘুমের পর আমার দেহে প্রাণ থাকে না। একজন মৃত মানুষের শরীর যেমন অসাড় পড়ে থাকে আমার শরীরও সে রকম পড়ে থাকে। ঘুমের মধ্যে মানুষ হাত নাড়ে, পা নাড়ে— আমি তার কিছুই করি না। নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলি না। শরীর হয়ে যায় বরফের মতো শীতল। একসময় গা থেকে মৃত মানুষের শরীরের পচা গন্ধ বেরুতে থাকে এবং তখন আচমকা আমার বাঁ চোখ খুলে যায়, সেই চোখে আমি একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। সেই চোখের দৃষ্টি সাপের মতো কুটিল।

জুডির কথা শুনে আমার ধারণা হলো হতেও তো পারে। জগতে কত রহস্যময় ব্যাপারই তো ঘটে। হয়তো আমার নিজেরই কোনো সমস্যা আছে। আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম। স্লিপ এ্যানালিস্ট। জানার উদ্দেশ্য একটাই— ঘুমের মধ্যে আমার কোনো শারীরিক পরিবর্তন হয় কি-না। ডাক্তাররা পুজ্জানুপুজ্জ পরীক্ষা করলেন। একবার না বারবার করলেন। দেখা গেল আমার ঘুম আর দশটা মানুষের ঘুমের চেয়ে আলাদা নয়। ঘুমের মধ্যে আমিও হাত-পা নাড়ি। অন্য মানুষদের যেমন ঘুমের তিনটি স্তর পার হতে হয়, আমারও হয়।

ঘুমের সময় আর দশটা মানুষের মতো আমার শরীরের উত্তাপও আধ ডিগ্রি হ্রাস পায়। আমিও অন্য সবার মতো স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন দেখি।

জুডি সব দেখে শুনে বলল, ‘ডাক্তাররা জানে না। ডাক্তাররা কিছুই জানে না। আমি জানি। তুমি আসলে মানুষ না। দিনের বেলা তুমি মানুষ থাক— সূর্য ডোবার পর থাক না।’

‘আমি কী হই?’

‘তুমি পিশাচ বা এই জাতীয় কিছু হয়ে যাও।’

আমি বললাম, ‘এভাবে তো বাস করা সম্ভব না। তুমি বরং আলাদা থাকো।’

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, জুডি তাতে রাজি হলো না। অতি তুচ্ছ কারণে আমেরিকানদের বিয়ে ভাঙ্গে। স্বামীর পছন্দ হলুদ রঙের বিছানার চাদর, স্ত্রীর পছন্দ নীল রং। ভেঙ্গে গেল বিয়ে। আমাদের এত বড় সমস্যা কিন্তু বিয়ে ভাঙল না। আমি বেশ কয়েক বার তাকে বললাম, জুডি তুমি আলাদা হয়ে যাও। ভালো দেখে একটা ছেলেকে বিয়ে করো। সারা জীবন তোমার সামনে পড়ে আছে। তুমি এভাবে জীবনটা নষ্ট করতে পারো না।

জুডি প্রতিবারই বলে, ‘যা-ই হোক, বড় সমস্যাই হোক আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না, I love you. I love you.’

আমি গল্পের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। শেষ অংশটি বলার আগে আমি আপনাকে আমার চোখের দিকে তাকাতে অনুরোধ করব। দয়া করে আমার চোখের দিকে তাকান।

রাশেদুল করিম সানগ্লাস খুলে ফেলবেন। মিসির আলি তৎক্ষণাৎ বললেন, ‘আপনার চোখ সুন্দর। সত্যি সুন্দর। আপনার মা যে বলতেন— চোখে জন্ম-কাজল, ঠিকই বলতেন।’

রাশেদুল করিম বললেন, ‘পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর চোখ কার ছিল জানেন?’

‘ক্লিওপেট্রার’।

‘অধিকাংশ মানুষের তাই ধারণা। এ ধারণা সত্যি নয়। পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর চোখ ছিল বুদ্ধদেবের পুত্র কুনালের। ইংরেজ কবি শেলীর চোখও খুব সুন্দর ছিল। আমার স্ত্রীর ধারণা, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর চোখ আমার। জুডি বলত এই চোখের কারণেই সে কোনোদিন আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না।’

রাশেদুল করিম সানগ্লাস চোখে দিয়ে বললেন, ‘গল্পের শেষ অংশ’ বলার আগে আপনাকে ক্ষুদ্র ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছি।’

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘কী জন্যে বলুন তো?’

‘কাউকে যখন আমি আমার চোখের দিকে তাকাতে বলি, সে আমার পাথরের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আপনি প্রথম ব্যক্তি যিনি একবারও আমার পাথরের চোখের দিকে তাকান নি। আমার আসল চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। So nice of you, Sir.’

রাশেদুল করিমের গলা মুহূর্তের জন্যে হলেও ভারী হয়ে গেল। তিনি অবিশ্যি চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, ‘আটটা প্রায় বাজতে চলল, গল্পের শেষটা বলি—

জুড়ির অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। কড়া ডোজের ঘুমের অশুধ খেয়ে ঘুমুতে যায়, দু-এক ঘণ্টা ঘুম হয়, বাকি রাত জেগে বসে থাকে। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

এমনি এক রাতের ঘটনা। জুলাই মাস। রাত সাড়ে তিনটার মতো হবে। জুড়ির মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেল— সে আমার বাঁ চোখটা গেলে দিল।

আমি ঘুমুচ্ছিলাম, নারকীয় যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম। সেই ভয়াবহ কষ্টের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।’

রাশেদুল করিম চুপ করলেন। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল।

মিসির আলি বললেন, ‘কী দিয়ে চোখ গেলে দিলেন?’

‘সুঁচালো পেনসিল দিয়ে। আমার মাথার বালিশের নিচে প্যাড এবং পেনসিল থাকে। তখন গ্রুপ থিওরি নিয়ে গভীর চিন্তায় ছিলাম। মাথায় যদি হঠাৎ কিছু আসে— তা লিখে ফেলার জন্যে বালিশের নিচে প্যাড এবং পেনসিল রাখতাম।’

‘আপনার স্ত্রী এ ঘটনা প্রসঙ্গে কি বক্তব্য দিয়েছেন।’

‘তার মাথা পুরোপুরি মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। সে কিছুই বলেনি, শুধু চিৎকার করেছে। তার একটিই বক্তব্য— এই লোকটা পিশাচ। আমি প্রমাণ পেয়েছি। কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমার কাছে প্রমাণ আছে।’

‘কী প্রমাণ আছে তা-কি কখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে?’

‘না। একজন উন্মাদকে প্রশ্ন করে বিপর্যস্ত করার কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া আমি তখন ছিলাম হাসপাতালে। আমি হাসপাতালে থাকতে থাকতেই জুড়ির মৃত্যু হয়।’

‘স্বাভাবিক মৃত্যু?’

‘না। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। সে মারা যায় ঘুমের অশুধ খেয়ে। এইটুকুই আমার গল্প। আমি আপনার কাছে একটাই অনুরোধ নিয়ে এসেছি, আপনি সমস্যাটা কী বের করবেন। আমাকে সাহায্য করবে। আমি যদি পিশাচ হই তাও আমাকে বলবেন। এই ফাইলের ভেতর জুড়ির একটা স্কেচ বুক আছে। স্কেচ বুকে নানান ধরনের কমেন্টস লেখা আছে। এই কমেন্টসগুলি পড়লে

জুড়ির মানসিক অবস্থা আঁচ করতে আপনার সুবিধা হতে পারে। আটটা বাজে, আমি তাহলে উঠি?’

‘আবার কবে আসবেন?’

‘আগামী কাল ভোর ছ’টায়। ভালো কথা, আমার এই গল্পে কোথাও কি প্রকাশ পেয়েছে জুড়িকে আমি কতটা ভালোবাসতাম?’

‘না— প্রকাশ পায় নি।’

‘জুড়ির প্রতি আমার ভালোবাসা ছিল সীমাহীন। আমি এখন উঠছি।’

‘ছিল বলছেন কেন? এখন কি নেই?’

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না।

রাশেদুল করিম চলে যাবার পর মিসির আলি ফাইল খুললেন। ফাইলের শুরুতেই একটা খাম। খামের ওপর মিসির আলির নাম লেখা।

মিসির আলি খাম খুললেন। খামের ভেতর ইংরেজিতে একটা চিঠি লেখা। সঙ্গে চারটি এক শ’ ডলারের নোট। চিঠি খুবই সংক্ষিপ্ত।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার সার্ভিসের জন্যে সম্মানী বাক্য সামান্য কিছু দেয়া হলো। গ্রহণ করলে খুশি হব।

বিনীত
আর করিম।

২.

মিসির আলি স্কেচ বুকটির প্রতিটি পাতা সাবধানে ওল্টালেন। চারকোলা এবং পেনসিলে স্কেচ আঁকা প্রতিটি স্কেচের নিচে আঁকার তারিখ। স্কেচের বিষয়বস্তু অতি তুচ্ছ, সবই ঘরোয়া জিনিস— এক জোড়া জুতা, মলাট ছেঁড়া বই, টিভি, বুক শেলফ। স্কেচ বুকটির শেষের দিকে শুধুই চোখের ছবি। বিড়ালের চোখ, কুকুরের চোখ, মাছের চোখ এবং মানুষের চোখ। মানুষের চোখের মডেল যে রাশেদুল করিম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। না বললেও ছবির নিচের মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে। মন্তব্যগুলি বেশ দীর্ঘ। যেমন একটি মন্তব্য—

আমি খুব মন দিয়ে আমার স্বামীর চোখ লক্ষ করছি। মানুষের চোখ একেক সময় একেক রকম থাকে। ভোরবেলার চোখ এবং দুপুরের চোখ এক নয়। আরও একটি জিনিস লক্ষ করলাম চোখের আইরিশের ট্রান্সপারেন্সি মুড়ের ওপর বদলায়। বিষাদগ্রস্ত মানুষের চোখের আইরিশ থাকে অস্বচ্ছ। মানুষ যতই আনন্দিত হতে থাকে তার চোখের আইরিশ ততই স্বচ্ছ হতে থাকে। আমার এই অবজারভেশন কতটুকু সত্য তা বুঝতে পারছি না।

মেয়েটি মাঝে মাঝে তার মনের অবস্থাও লিখেছে— অনেকটা ডায়েরি লেখার ভঙ্গিতে। মনে হয় হাতের কাছে ডায়েরি না থাকায় স্কেচ বুকে লিখে রেখেছে। সব লেখাই পেনসিলে। প্রচুর কাটাকুটি আছে। কিছু লাইন রবার ঘষে তুলেও ফেলা হয়েছে।

১৮.৪.৮২

আমি ভয়ে অস্থির হয়ে আছি। নিজেকে বুঝানোর চেষ্টা করছি— এই ভয় অমূলক। বুঝাতে পারছি না। আমি আমার স্বামীকে ভয় পাচ্ছি এই তথ্য স্বভাবতই স্বামী বেচারার জন্যে সুখকর না। সে নানাভাবে আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। কিছু কিছু চেষ্টা বেশ হাস্যকর। আজ আমাকে বলল, ‘জুড়ি আমি ঠিক করেছি— এখন থেকে রাতে ঘুমুব না। আমার অঙ্কের সমস্যা নিয়ে ভাবব। লেখালেখি করব। তুমি নিশ্চিত হয়ে ঘুমাও। আমি দিনের বেলায় ঘুমুব। একজন মানুষের জন্যে চার ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। নেপোলিয়ান মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমুতেন।’

আমি এই গম্ভীর, স্বল্পভাষী লোকটিকে ভালোবাসি। ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি। আমি চাই না, আমার কোনো কারণে সে কষ্ট পাক। কিন্তু সে কষ্ট পাচ্ছে। খুব কষ্ট পাচ্ছে। হেঁ দিখর, তুমি আমার মন শান্ত করো। আমার ভয় দূর করে দাও।

২১.৪.৮২

যে জিনিস খুব সুন্দর তা কত দ্রুত অসুন্দর হতে পারে— বিস্মিত হয়ে আমি তাই দেখছি। রাশেদের ধারণা আমি অসুস্থ। সত্যি কি অসুস্থ? আমার মনে হয় না। কারণ, এখনো ছবি আঁকতে পারছি। একজন অসুস্থ মানুষ আর যাই পারুক— ছবি আঁকতে পারে না। গত দু’দিন ধরে ওয়াটার কালারে বাসার সামনের চেরী গাছের ফুল ধরতে চেষ্টা করছিলাম। আজ সেই ফুল কাগজে বন্দী করেছি। অনেকক্ষণ ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভালো হয়েছে। রাশেদ ছবি তেমন বুঝে বলে মনে হয় না— সেও মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ দেখল। তারপর বলল, আমি যখন বুড়ো হয়ে যাব, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেব, তখন তুমি আমাকে ছবি আঁকা শিখিয়ে দেবে। এই কথাটি সে আজ প্রথম বলেনি। আগেও বলেছে। আন্তরিক ভঙ্গিতে বলেছে। কেউ যখন আন্তরিকভাবে কিছু বলে তখন তা টের পাওয়া যায়। আমার মনে হয় না সে কোনোদিন ছবি আঁকবে। তার মাথায় অঙ্ক ছাড়া কিছুই নেই।

২১.৫.৮২

আমি ছবি আঁকতে পারছি না। যেখানে নীল রঙ চড়ানো দরকার সেখানে গাঢ় হলুদ রঙ বসাবি। ডাক্তার ডিডেটিভের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সারাক্ষণ মাথা ঝিম ধরে থাকে। কেন জানি খুব বমি হচ্ছে।

আজ দুপুরে অনেকক্ষণ ঘুমুলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সুন্দর একটা স্বপ্নও দেখে ফেললাম। সুন্দর স্বপ্ন আমি অনেকদিন দেখি না। অনেকদিন দেখি না। অনেকদিন দেখি না। অনেকদিন দেখি না। আচ্ছা, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? শুনেছি পাগলরাই একই কথা বারবার লেখে। কারণ, তাদের মাথায় একটি বাক্যই বারবার ঘুরপাক খায়।

বৃহস্পতিবার কিংবা বুধবার

আজ কত তারিখ আমি জানি না। বেশ কয়েক দিন ধরেই দিন-তারিখে গণ্ডগোল হচ্ছে। আজ কত তারিখ তা জানার কোনো রকম আগ্রহ বোধ করছি না। তবে মনের অবস্থা লেখার চেষ্টা করছি যাতে পরবর্তী সময়ে কেউ আমার লেখা পড়ে বুঝবে যে মাথা খারাপ হবার সময় একজন মানুষ কী ভাবে? কী চিন্তা করে?

মাথা খারাপের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, আলো সহ্য হওয়া। আমি এখন আলো সহ্য করতে পারি না। দিনের বেলায় দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখি। ঘর অন্ধকার বলেই প্রায় অনুমানের ওপর নির্ভর করে আজকের এই লেখা লিখছি। দ্বিতীয় লক্ষণ হচ্ছে, সারাক্ষণ শরীরে এক ধরনের জ্বালা অনুভব করা। মনে হয় সব কাপড় খুলে বাথটাবে শুয়ে থাকতে পারলে ভালো লাগত। আমার আগে যারা পাগল হয়েছে তাদেরও কি এমন হয়েছে? জানার জন্যে পাবলিক লাইব্রেরিতে টেলিফোন করেছিলাম। আমি খুব সহজভাবে বললাম, ‘আচ্ছা আপনাদের এখানে পাগলের লেখা কোনো বই আছে?’

যে মেয়েটি টেলিফোন ধরেছিল সে বিস্মিত হয়ে বলল, ‘পাগলের লেখা বই বলতে কী বুঝাচ্ছেন?’

‘মানসিক রুগিদের লেখা বই।’

‘মানসিক রুগিরা বই লিখবে কেন?’

‘কেন লিখবে না। আমি তো লিখছি, বই অবিশ্যি নয়— ডায়েরির আকারে লেখা।’

‘ও আচ্ছা। ঠিক আছে আপনার বই ছাপা হোক। ছাপা হবার পর অবশ্যই আমরা আপনার বই-এর কপি সংগ্রহ করব।’

আমি মনে-মনে হাসলাম। মেয়েটি আমাকে উন্মাদ ভাবছে। ভাবুক উন্মাদকে উন্মাদ ভাববে না তো কী ভাববে?

রাত দু'টা দশ

আমার মা, এই কিছুক্ষণ আগে টেলিফোন করলেন। দুপুর রাতে তাঁর টেলিফোন করার বদঅভ্যাস আছে। আমার মা'র অনিদ্রা রোগ আছে। কাজেই তিনি মনে করেন পৃথিবীর সবাই অনিদ্রা-রুগি। যাই হোক, আমি জেগে ছিলাম। মা বললেন, 'জুডি তুই আমার কাছে চলে আয়।' আমি বললাম, 'না রাশেদকে ফেলে আমি যাব না।'

মা বললেন, 'আমি তো শুনলাম ওকে নিয়েই তোর সমস্যা।'

'ওকে নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই মা। I Love him, I love him, I love him.'

'চিৎকার করছিস কেন?'

'চিৎকার করছি না মা। টেলিফোন রাখি। কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। রাশেদকে ফেলে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আমার ধারণা রাশেদ নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেও এখন রাতে ঘুমায় না। গ্রুপ থিওরির যে সমস্যাটি নিয়ে সে ভাবছিল, সেই সমস্যার সমাধান অন্য কে না-কি বের করে ফেলেছে। জার্নালে ছাপা হয়েছে। সে গত পরশু ঐ জার্নাল পেয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়েছে। শুধু তাই না, বারান্দার এক কোনায় বসে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে শুরু করেছে। আমি সান্ত্বনা দেবার জন্যে তার কাছে গিয়ে চমকে উঠলাম। সে কাঁদছে ঠিকই কিন্তু তার বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। ডান চোখ শুকনো।

আমি তাকে কিছু বললাম না। কিন্তু সে আমার চাউনি থেকেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলল। নিচু গলায় বলল, 'জুডি, ইদানীং এই ব্যাটারটা হচ্ছে— মাঝে মাঝেই দেখছি বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়ে।'

কথাগুলি বলার সময় তাকে এত অসহায় লাগছিল যে আমার ইচ্ছা করছিল তাকে জড়িয়ে ধরে বলি — I love you, I love you, I love you.

হে ঈশ্বর! হে পরম করুণাময় ঈশ্বর! এই ভয়াবহ সমস্যা থেকে তুমি আমাদের দু'জনকে উদ্ধার করো।

স্কেচ বুকের প্রতিটি লেখা বারবার পড়ে মিসির আলি খুব বেশি তথ্য বের করতে পারলেন না, তবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা জানা গেল তা হচ্ছে— মেয়েটি তার স্বামীকে ভালোবাসে। যে ভালোবাসায় এক ধরনের সারল্য আছে।

স্কেচ বুকে কিছু স্প্যানিশ ভাষায় লেখা কথাবার্তাও আছে। স্প্যানিশ ভাষা না জানার কারণে তার অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হলো না। তবে এই লেখাগুলি যেভাবে সাজানো তাতে মনে হচ্ছে— কবিতা কিংবা গান হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মডার্ন ল্যান্ডস্কেপ ইনস্টিটিউটে স্কেচ বুক নিয়ে গেলেই ওরা পাঠোদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেবে— তবে মিসির আলির মনে হলো তার প্রয়োজন নেই। যা জানার তিনি জেনেছেন। এর বেশি কিছু জানার নেই।

৩.

রাশেদুল করিম ঠিক ছ'টায় এসেছেন। মনে হচ্ছে বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। ঠিক ছ'টা বাজার পর কলিং বেলে হাত রেখেছেন। মিসির আলি দরজা খুলে বললেন, 'আসুন।'

রাশেদুল করিমের জন্যে সামান্য বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তার জন্যে টেবিলে দুধ ছাড়া চা। মিসির আলি বললেন, 'আপনি কাঁটায় কাঁটায় ছ'টায় আসবেন বলে ধারণা করেই চা বনিয়ে রেখেছি। লিকার কড়া হয়ে গেছে বলে আমরা ধারণা। খেয়ে দেখুন তো।'

রাশেদুল করিম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ।'

মিসির আলি নিজের কাপ হাতে নিতে নিতে বললেন, 'আপনাকে একটা কথা শুরুতেই বলে নেয়া দরকার। আমি মাঝে মাঝে নিজের শখের কারণে— সমস্যা নিয়ে চিন্তা করি। তার জন্যে কখনো অর্থ গ্রহণ করি না। আমি যা করি তা আমার পেশা না— নেশা বলতে পারেন। আপনার ডলার আমি নিতে পারছি না। তা ছাড়া অধিকাংশ সময়ই আমি সমস্যার কোনো সমাধানে পৌঁছতে পারি না। আমার কাছে পেমেন্ট শ' পৃষ্ঠার একটা নোটবই আছে। ঐ নোটবই ভর্তি এমন সব সমস্যা— আর সমাধান আমি বের করতে পারিনি।'

'আপনি কি আমার সমস্যার কিছু সমাধান বের করেছেন?'

'সমস্যার পুরো সমাধান বের করতে পারিনি— আংশিক সমাধান আমার কাছে আছে। আমি স্টেমসমুটিভাবে একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করিয়েছি। সেই সম্পর্কে আপনাকে আমি বলব, আপনি নিজে ঠিক করলেন— আমার হাইপোথিসিসে কী কী ত্রুটি আছে। তখন আমরা দু'জন মিলে ত্রুটিগুলি ঠিক করব।'

'শুনি আপনার হাইপোথিসিস।'

'আপনার স্ত্রী বলেছেন, ঘুমবার পর আপনি মৃত মানুষের মতো হয়ে যান। আপনার হাত-পা নড়ে না। পাথরের মূর্তির মতো বিছানায় পড়ে থাকেন। তাই না?'

'হ্যাঁ-তাই।'

'স্লিপ এ্যানালিস্টরা আপনাকে পরীক্ষা করে বলেছেন— আপনার ঘুম সাধারণ মানুষের ঘুমের মতোই। ঘুমের মধ্যে আপনি স্বাভাবিক নড়াচড়া করেন।'

‘জি— কয়েক বারই পরীক্ষা করা হয়েছে।’

‘আমি আমার হাইপোথিসিসে দু’জনের বক্তব্যই সত্য ধরে নিচ্ছি। সেটা কীভাবে সম্ভব? একটিমাত্র উপায়ে সম্ভব— আপনি যখন বিছানায় শুয়ে ছিলেন তখন ঘুমুচ্ছিলেন না, জেগে ছিলেন।’

রাশেদুল করিম বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘কী বলছেন আপনি?’

মিসির আলি বললেন, ‘আমি গত কালও লক্ষ করেছি— আজও লক্ষ করছি আপনার বসে থাকার মধ্যেও এক ধরনের কাঠিন্য আছে। আপনি আরাম করে বসে নেই— শিরদাঁড়া সোজা করে বসে আছেন। আপনার দুটো হাত হাঁটুর উপর রাখা। দীর্ঘ সময় চলে গেছে আপনি একবারও হাত বা পা নাড়ান নি। অথচ স্বাভাবিকভাবেই আমরা হাত-পা নাড়ি। কেউ-কেউ পা নাচান।’

রাশেদুল করিম চুপ করে রইলেন। মিসির আলি বললেন, ‘ঐ রাতে আপনি বিছানায় শুয়েছেন— মূর্তির মতো শুয়েছেন। চোখ বন্ধ করে ভাবছেন আপনার অঙ্কের সমস্যা নিয়ে। গভীরভাবে ভাবছেন। মানুষ যখন গভীরভাবে কিছু ভাবে তখন এক ধরনের ট্রেন্স স্টেটে ভাবজগতে চলে যায়। গভীরভাবে কিছু ভাবা হচ্ছে এক ধরনের মেডিটেশন। রাশেদুল করিম সাহেব।’

‘জি।’

‘অঙ্ক নিয়ে ঐ ধরনের গভীর চিন্তা কি আপনি প্রায়ই করেন না।’

‘জি, করি।’

‘আপনি কি লক্ষ করেছেন এই সময় আশপাশে কি ঘটছে তা আপনার খেয়াল থাকে না।’

‘লক্ষ করেছি।’

‘আপনি নিশ্চয়ই আরও লক্ষ করেছেন যে, এই অবস্থায় আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দিচ্ছেন। লক্ষ করেননি?’

‘করেছি।’

‘তাহলে আমি আমার হাইপোথিসিসকে ফিরে আসি। আপনি বিছানায় শুয়ে আছেন। আপনার মাথায় অঙ্কের জটিল সমস্যা। আপনি ভাবছেন, আর ভাবছেন। আপনার হাত-পা নড়ছে না। নিশ্বাস এত ধীরে পড়ছে যে মনে হচ্ছে আপনি মৃত।’

রাশেদুল করিম সাহেব সানগ্লাস খুলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মিসির আলি বললেন, ‘ভালো কথা। আপনি কি লেফ্ট হ্যান্ডেড পারসন? ন্যাটা?’

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ, কেন বলুন তো?’

‘আমার হাইপোথিসিসের জন্যে আপনার লেফট হ্যান্ডেড পারসন হওয়া খুবই প্রয়োজন।’

‘কেন?’

‘বলছি। তার আগে— শুরুতে যা বলছিলাম সেখানে ফিরে যাই। দৃশ্যটি আপনি দয়া করে কল্পনা করুন। আপনি এক ধরনের ট্রেন্স অবস্থায় আছেন। আপনার স্ত্রীর জেগে আছেন— ভীত চোখে আপনাকে দেখছেন। আপনার এই অবস্থার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। তিনি ভয়ে অস্থির হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা হলো আপনি মারা গেছেন। তিনি আপনার গায়ে হাত দিয়ে আরও ভয় পেলেন। কারণ, আপনার গা হিমশীতল।’

‘গা হিমশীতল হবে কেন?’

‘মানুষ যখন গভীর ট্রেন্স স্টেটে চলে যায় তখন তার হার্ট বিট কমে যায়। নিশ্বাস-প্রশ্বাস ধীরে বয়। শরীরের টেম্পারেচার দুই থেকে তিন ডিগ্রি পর্যন্ত নেমে যায়। এইটুকু নেমে যাওয়া মানে অনেকখানি নেমে যাওয়া। যাই হোক আপনার স্ত্রী আপনার গায়ে হাত দেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি তাকালেন, তাকালেন কিন্তু এক চোখ মেলে। বাঁ চোখে। ডান চোখটি তখনও বন্ধ।’

‘কেন?’

‘ব্যাখ্যা করছি। রাইট হ্যান্ডেড পারসন যারা আছে তাদের এক চোখ বন্ধ করে অন্য চোখে তাকাতে বললে তারা বাঁ চোখ বন্ধ করে ডান চোখে তাকাবে। ডান চোখ বন্ধ করে বাঁ চোখে তাকানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা সম্ভব শুধু যারা ন্যাটা তাদের জন্যেই। আপনি লেফট হ্যান্ডেড পারসন— আপনি এক ধরনের গভীর ট্রেন্স স্টেটে আছেন। আপনার স্ত্রী আপনার গায়ে হাত রেখেছেন। আপনি কী হচ্ছে জানতে চাচ্ছেন। চোখ মেলছেন। দু’টি চোখ মেলতে চাচ্ছেন না। গভীর আলস্যে একটা চোখ কোনোমতো মেললেন— অবশ্যই সেই চোখ হবে বাঁ চোখ। আমার যুক্তি কি গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?’

রাশেদুল করিম ‘হ্যাঁ-না’ কিছু বললেন না।

মিসির আলি বললেন, ‘আপনার স্ত্রী আরও ভয় পেলেন। সেই ভয় তার রক্তে মিশে গেল। কারণ, শুধুমাত্র একবার এই ব্যাপার ঘটেনি, অনেকবার ঘটেছে। আপনার কথা থেকেই আমি জেনেছি সেই সময় অঙ্কের একটি জটিল সমাধান নিয়ে আপনি ব্যস্ত। আপনার সমগ্র চিন্তা-চেতনায় আছে— অঙ্কের সমাধান— নতুন কোনো থিওরি। নয়-কি?’

‘হ্যাঁ’।

‘এখন আমি আমার হাইপোথিসিসের সবচেয়ে জটিল অংশে আসছি। আমার হাইপোথিসিস বলে আপনার স্ত্রী আপনার চোখ গেলে দেননি। তাঁর পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। তিনি আপনার চোখের প্রেমে পড়েছিলেন। একজন শিল্পী মানুষ কখনো সুন্দর কোনো সৃষ্টি নষ্ট করতে পারেন না। তবুও যদি ধরে নেই তাঁর মাথায় হঠাৎ রক্ত উঠে গিয়েছিল এবং তিনি এই ভয়াবহ কাণ্ড করছেন— তাহলে তাঁকে এটা করতে হবে ঝাঁকের মাথায়— আচমকা।’

আপনার চোখ গেলে দেয়া হয়েছে পেনসিলে— যে পেনসিলটি আপনার মাথার বালিশের নিচে রাখা। যিনি ঝাঁকের মাথায় একটা কাজ করবেন তিনি এত যত্নগা করে বালিশের নিচ থেকে পেনসিল নেবেন না। হয়তোবা তিনি জানতেনও না বালিশের নিচে পেনসিল ও নোট বই নিয়ে আপনি ঘুমান।’

রাশেদুল করিম বললেন, ‘কাজটি তাহলে কে করেছে?’

‘সেই প্রসঙ্গে আসছি, আপনি কি আরেক কাপ চা খাবেন? বানিয়ে দেব?’
‘না।’

‘এ্যাকসিডেন্ট কিভাবে ঘটল তা বলার আগে আপনার স্ত্রীর লেখা ডায়েরির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, আপনার বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়ত। কথাটা কি সত্যি?’

‘হ্যাঁ, সত্যি।’

‘কেন পানি পড়ত? একটি চোখ কেন কাঁদত? আপনার কী ধারণা?’

রাশেদুল করিম বললেন, ‘আমার কোনো ধারণা নেই। আপনার ধারণাটা বলুন। আমি অবিশ্যি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ডাক্তার বলেছেন এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। যে গ্ল্যান্ড চোখের জল নিয়ন্ত্রণ করে সেই গ্ল্যান্ড বাঁ চোখে বেশি কর্মক্ষম ছিল।’

মিসির আলি বললেন, ‘এটা একটা মজার ব্যাপার। হঠাৎ কেন বাঁ চোখের গ্ল্যান্ড কর্মক্ষম হয়ে পড়ল। আপনি মনে-মনে এই চোখকে আপনার সব রকম অশান্তির মূল বলে চিহ্নিত করার জন্যেই কি এটা হলো? আমি ডাক্তার নই। শরীরবিদ্যা জানি না। তবে আমি দু’জন বড় ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা বলেছেন, এটা হতে পারে। মোটেই অস্বভাবিক নয়। গ্ল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ক। একটি চোখকে প্রশ্রয়ও করছে মস্তিষ্ক।’

‘তাতে কী প্রমাণ হচ্ছে?’

মিসির আলি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, ‘তাতে একটি জিনিসই প্রমাণিত হচ্ছে— আপনার বাঁ চোখ আপনি নিজেই নষ্ট করেছেন।’

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে রাশেদুল করিম ভাঙ্গা গলায় বললেন, ‘কী বলছেন আপনি!’

‘কনসাস অবস্থায় আপনি এই ভয়ঙ্কর কাজ করেননি। করেছেন সাব কনসাস অবস্থায়। কেন করেছেন তাও বলি, আপনি আপনার স্ত্রীকে অসম্ভব ভালোবাসেন। সেই স্ত্রী আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। কেন দূরে সরে যাচ্ছেন? কারণ তিনি ভয় পাচ্ছেন আপনার বাঁ চোখকে। আপনি আপনার স্ত্রীকে হারাচ্ছেন বাঁ চোখের জন্যে। আপনার ভেতর রাগ, অভিমান জমতে শুরু করেছে। সেই রাগ আপনার নিজের একটি প্রত্যঙ্গের ওপর। চোখের ওপর। এই রাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রচণ্ড হতাশা। আপনি যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন সেই গবেষণা অন্য একজন করে ফেলেছেন। জার্নালে তা প্রকাশিত

হয়ে গেছে। আপনার চোখ সমস্যা তৈরি না করলে এমনটা ঘটত না। নিজেই গবেষণাটা শেষ করতে পারতেন। সবকিছুর জন্যে দায়ী হলো চোখ।’

মিসির আলি আরেকটি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, ‘আমার এই হাইপোথিসিসের পেছনে আরেকটি শক্ত যুক্তি আছে। যুক্তিটি বলেই আমি কথা শেষ করব।’

‘বলুন।’

‘আপনার স্ত্রী পুরোপুরি মস্তিষ্কবিকৃত হবার পরে যে কথাটা বলতেন, তা হলো— এই লোকটা পিশাচ। আমার কাছে প্রমাণ আছে। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু প্রমাণ আছে। তিনি এই কথা বলতেন কারণ পেনসিল দিয়ে নিজের চোখ নিজেই গেলে দেয়ার দৃশ্য তিনি দেখেছেন। আমার হাইপোথিসিস আমি আপনাকে বললাম। এর বেশি আমার কিছু বলার নেই।’

রাশেদুল করিম দীর্ঘ সময় চুপ করে রইলেন।

মিসির আলি আরেকবার বললেন, ‘ভাই চা করব? চা খাবেন?’

তিনি এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। উঠে দাঁড়ালেন। চোখে সানগ্লাস পরলেন। শুকনো গলায় বললেন, ‘যাই?’

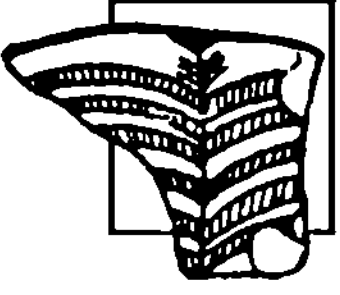
মিসির আলি বললেন, ‘মনে হচ্ছে আমি আপনাকে আহত করেছি— কষ্ট দিয়েছি। আপনি কিছু মনে করবেন না। নিজের উপরেও রাগ করবেন না। আপনি যা করেছেন— প্রচণ্ড ভালোবাসা থেকেই করেছেন।’

রাশেদুল করিম হাত বাড়িয়ে মিসির আলির হাত ধরে ফেলে বললেন, ‘আমার স্ত্রী বেঁচে থাকলে তার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতাম— আপনি দেখতেন সে কী চমৎকার একটি মেয়ে ছিল। এবং সেও দেখতো— আপনি কত অসাধারণ একজন মানুষ। ঐ দুর্ঘটনার পর জুডির প্রতি তীব্র ঘৃণা নিয়ে আমি বেঁচে ছিলাম। আপনি এই অন্যায় ঘৃণা থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছেন। জুডির হয়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’

ভদ্রলোকের গলা ধরে এল। তিনি চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে ফেলে বললেন, ‘মিসির আলি সাহেব! ভাই দেখুন— আমার দু’টি চোখ থেকেই এখন পানি পড়ছে। চোখ পাথরের হলেও চোখের অশ্রুগ্রন্থি এখনো কার্যক্ষম। কুড়ি বছর পর এই ঘটনা ঘটল। আচ্ছা ভাই, যাই।’

দু’ মাস পর আমেরিকা থেকে বিমান ডাকে মিসির আলি বড় একটা প্যাকেট পেলেন। সেই প্যাকেটে জল রঙে আঁকা একটা চেরি গাছের ছবি। অপূর্ব ছবি।

ছবির সঙ্গে একটি নোট। রাশেদুল করিম সাহেব লিখেছেন, আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি আপনাকে দিতে চাচ্ছিলাম। এই ছবিটির চেয়ে প্রিয় কিছু এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই। কোনোদিন হবে বলেও মনে হয় না।



একজন ক্রীতদাস

কথা ছিল পারুল ন'টার মধ্যেই আসবে।

কিন্তু এল না। বারোটো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম এক একা। চোখে জল আসবার মতো কষ্ট হতে লাগল আমার। মেয়েগুলি বড্ড খেয়ালী হয়।

বাসায় এসে দেখি ছোট চিরকুট লিখে ফেলে গেছে। 'সন্ধ্যায় ৬৯৭৬২১ নম্বরে ফোন করো— পারুল।' তাদের পাশের বাড়ির ফোন। আগেও অনেকবার ব্যবহার করেছি। কিন্তু আজ তাকে ফোনে ডাকতে হবে কেন? অনেক আলাপ-আলোচনা করেই কি ঠিক করা হয়নি আজ সন্ধ্যার বেলা দশটায় দু'জন টাঙ্গাইল চলে যাব। সেখানে হারুনের বাসা আমাদের বিয়ে হবে।

সারা দুপুর শুয়ে রইলাম। হোটেল থেকে ভাত এসেছিল। সেগুলি স্পর্শও করলাম না। ছোটবেলায় যে রকম রাগ করে ভাত না খেয়ে থেকেছি আজও যেন রাগ করবার মতো সে রকম একটি ছেলেমানুষি ব্যাপার হয়েছে। 'পারুলের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়েছে'—এই ভাবতে ভাবতে নিজেকে খুব তুচ্ছ ও সামান্য মনে হতে লাগল। সন্ধ্যাবেলা টেলিফোন করবার জন্যে যখন বেরিয়েছি তখন অভিমানে আমার ঠোট ফুলে রয়েছে। গ্রীন ফার্মেসীর মালিক আমাকে দেখে আঁতকে উঠে বললেন, 'অসুখ নাকি ভাই?'

আমি শুকনো গলায় বললাম, 'একটা টেলিফোন করব।'

পারুল আশপাশেই ছিল। রিনরিনে ছয়-সাত বছর বয়েসের ছেলেদের মতো গলা যা শুনলে বুকের মধ্যে সুখের মতো ব্যথা হয়।

'হ্যালো শোনো, কিভারগার্টেনের মাস্টারিটা পেয়েছি। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? বড্ড ডিস্টার্ব হচ্ছে লাইনে।'

পারুলের উৎফুল্ল সতেজ গলা শুনে আমি ভয়ানক অবাক হয়ে গেলাম। তোতলাতে তোতলাতে কোনোরকমে বললাম, 'আজ ন'টায় সময় তোমার আসবার কথা ছিল...।'

'মনে আছে, মনে আছে। শোনো তারিখটা একটু পিছিয়ে দাও। এখন তো আর সে রকম ইমার্জেন্সি নেই। তা ছাড়া...'

'তা ছাড়া কী?'

‘তোমার ব্যবসার এখন যা অবস্থা বিয়ে করলে দু’জনকেই একবেলা খেয়ে থাকতে হবে।’

হড়বড় করে আরও কি কি যেন সে বলল। হাসির শব্দও শুনলাম একবার। আমি বুঝতে পারলাম পারুল আর কখনোই আমাকে বিয়ে করতে আসবে না। কাল তাকে নিয়ে ঘর সাজাবার জিনিসপত্র কিনেছি। সারা নিউ মার্কেট ঘুর ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সে কেনাকাটা করেছে। দোকানিকে ডবল বেডশিট দেখাতে বলে সে লজ্জায় মুখ লাল করেছে। এবং আজ সন্ধ্যাতেই খুব সহজ সুরে বলছে, ‘তোমার ব্যবসার এখন যা অবস্থা!’ আঘাতটি আমার জন্যে খুব তীব্র ছিল। আমার সাহস কম, নয়তো সে রাতেই আমি বিষ খেয়ে ফেলতাম কিংবা তিনতলা থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়তাম। আমি বড় অভিমানী হয়ে জন্মেছি।

সে বছর আরও অনেকগুলি দুর্ঘটনা ঘটল। ইরফানের কাছে আমার চার হাজার টাকা জমা ছিল। সে হঠাৎ মারা গেল। রামগঞ্জে এক ওয়াগন লবণ বুক করেছিলাম। সেই ওয়াগনটি একেবারে উধাও হয়ে গেল। পারুলকুচি সাপ্লাইয়ের কাজটায় বড় রকমের লোকসান দিলাম। ভদ্রভাবে থাকবার মতো পয়সাতেও শেষ পর্যন্ত টান পড়ল। মেয়েরা বেশ ভালো আদর্শ করে। পারুল সত্যি সত্যি আমার ভবিষ্যৎটা দেখে ফেলেছিল। পারুলের সঙ্গে যোগাযোগ কমে গেল। আমি নিজে কখনো যেতাম না তার কাছে। তবু তার সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখা হয়ে যেত। হয়তো বাস স্টপে দু’জন একমুগ্ধ এসে দাঁড়িয়েছি। পারুল আমাকে দেখামাত্রই আন্তরিক সুরে বলেছে, ‘কী আশ্চর্য! তুমি! এ কী স্বাস্থ্য হয়েছে তোমার! ব্যবসাপত্র কেমন চলছে?’

‘চলছে ভালোই।’

‘ইস বড় রোগা হয়ে গেছ তুমি। চা খাবে এক কাপ? এসো তোমাকে চা খাওয়াব।’

দুপুরবেলা সিনেমা হলের সামনে একদিন দেখা হয়ে গেল। আমি তাকে দেখতে পাইনি এ-রকম একটা ভান করে রাস্তায় নেমে পড়লাম। কিন্তু সে পেছন থেকে চোঁচিয়ে ডাকল, ‘এই এই। সিনেমা দেখতে এসেছিলে নাকি?’

‘না।’

‘শোনো, একটা কথা শুনে যাও।’

‘কী?’

‘আমার এক বান্ধবীর ছেলের আজ জন্মদিন। প্লিজ একটা উপহার আমাকে চয়েস করে দাও। চলো আমার সাথে।’

পারুলকে যতবার দেখি ততবারই অবাক লাগে। তিন শ’ টাকার স্কুল-মাস্টারি তাকে কেমন করে এতটা আত্মবিশ্বাসী আর অহঙ্কারী করে তুলেছে, ভেবে পাই না। ভুলেও সে আমাদের প্রসঙ্গ তোলে না। এক সোমবারে আমরা

যে একটি বিয়ের দিন ঠিক করেছিলাম তা যেন বাস্তবীর ছেলের জন্মদিনের চেয়েও অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। তার উজ্জ্বল চোখ, দ্রুত কথা বলার ভঙ্গি স্পষ্টই বুঝিয়ে দেয় জীবন অনেক অর্থবহ ও সুরভিত হয়ে হাত বাড়িয়েছে তার দিকে।

এপ্রিল মাসের তেরো তারিখে পারুলের বিয়ে হয়ে গেল। নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠিয়ে সে যে আমাকে তার আর একটি নিষ্ঠুরতার নমুনা দেখায়নি সেই জন্যে আমি তাকে প্রায় ক্ষমা করে ফেললাম। সেদিন সন্ধ্যায় আমি একটি ভালো রেস্টুরেন্টে খেয়ে অনেকদিন পর সিনেমা দেখতে গেলাম। সিনেমার শেষে বন্ধুর বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত হুটমনে গল্প করতে লাগলাম। এমন একটা ভাব করতে লাগলাম যেন পারুলের বিয়েতে আমার বিশেষ কিছুই যায়-আসে না। একজনের সঙ্গে বিয়ের কথা ঠিক করে অন্য একজনকে বিয়ে করা যেন খুব একটা সাধারণ ব্যাপার, অহরহই হচ্ছে।

সে-রাতে ঘরের বাতাস আমার কাছে উষ্ণ ও আর্দ্র মনে হতে লাগল। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে ক্রমাগত ভাবলাম ব্যবসার অবস্থাটা অল্প একটু ভালো হলেই একটি সরল দুঃখী-দুঃখী চেহারা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলব। এবং সেই মেয়েটির সঙ্গে পারুলের হৃদয়হীনতার গল্প করতে করতে হা হা করে হাসব।

কিন্তু দিন-দিন আমার অবস্থা আরও খারাপ হলো। একটা ছোট-খাটো কন্ট্রাক্ট নিয়েছিলাম। তাতে সঞ্চিত টাকার সবটাই নষ্ট হয়ে গেল। একেবারে ডুবে যাবার মতো অবস্থা। চাকর ছেলেকে ছাড়িয়ে দিতে হলো। দু'-একটি শৌখিন জিনিসপত্র (একটি থি ব্রাউ ফিলিপস্ ট্রানজিস্টার, একটি ন্যাশনাল রেকর্ড প্লেয়ার, একটি দামি টেবিল ঘড়ি) যা বহু কষ্ট করে কৃপণের মতো পয়সা জমিয়ে জমিয়ে কিনেছি, বিক্রি করে দিলাম। এবং তারপরও আমাকে একদিন শুধু হাফ পাউন্ডের একটি পাউরুটি খেয়ে থাকতে হলো।

সহায়-সম্বলহীন একটি ছেলের কাছে এ শহর যে কী পরিমাণ হৃদয়হীন হতে পারে তা আমার চিন্তার বাইরে ছিল! নিষ্ঠুর এবং অকরণ এই শহরে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সে সময় সারাক্ষণই খিদের কষ্ট লেগে থাকত। ফুটপাথের পাশে চটের পর্দার আড়ালে ভাতের দোকানগুলি দেখলেই মন খাপ হয়ে যেত। দেখতাম রিকশাওয়ালা শ্রেণীর লোকরা উবু হয়ে বসে গ্রাস পাকিয়ে মহাআনন্দে ভাত খাচ্ছে। চুম্বকের মতো সেই দৃশ্য আমাকে আকর্ষণ করত। 'আহ ওরা কী সুখেই না আছে!'— এই রকম মনে করে আমার চোখ ভিজে উঠত। আমি বেঁচে থাকার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে যেতে লাগলাম। 'নিউ ইংক' কালি কোম্পানির সেলসম্যানের চাকরি নিলাম একবার। একবার কাপড়কাটা সাবানের বিজ্ঞাপন লেখার কাজ নিলাম। পারুলকে আমার মনেই রইল না। বেমালুম ভুলে গেলাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলা। মোহাম্মদপুর বাজারে কাছ দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি পারুল। সঙ্গে ফুটফুটে একটি বাচ্চা। পায়ে লাল জুতো, মুখটি ডল পুতুলের মতো গোলগাল। পারুলের শাড়ির আঁচল ধরে টুকটুক করে হাঁটছে। পারুল যাতে আমাকে দেখতে না পায় সেই জন্যেই আমি সুঁট করে পাশের গলিতে ঢুকে পড়লাম। অথচ তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। পারুলের সমস্ত ইন্দ্রিয় তার মেয়েটিতে নিবদ্ধ ছিল। মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হলো এই চমৎকার ডল পুতুলের মতো মেয়েটি আমার হতে পারত। কিন্তু পরক্ষণেই সোবহান মিয়া হয়তো আমাকে কাজটা দেবে না— এই ভাবনা আমাকে অস্থির করে ফেলল।

আমার ভাগ্য ভালো। কাজটা হয়ে গেল। রোজ সকালে সেগুন বাগিচা থেকে হেঁটে হেঁটে মোহাম্মদপুরে আসি। সমস্ত দিন সোবহান মিয়ার ইন্ডেন্টিং ফার্মের হিসাব-নিকাশ দেখে অনেক রাতে সেগুন বাগিচায় ফিরে যাই। নিরানন্দ একঘেঁয়ে ব্যবস্থা। গভীর রাতে মাঝেমধ্যে ঘুম ভেঙে গেলে মরে যেতে ইচ্ছে করে।

রাস্তায় আমি মাথা নিচু করে হাঁটি। পরিচিত কেউ আমাকে দেখে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে উঠুক তা এখন আর চাই না। কিন্তু তবু পারুলের সঙ্গে আরও দু'বার আমার দেখা হয়ে গেল। একবার দেখলাম হুড-ফেলা রিকশায় সে বসে, চোখে বাহারি সানগ্লাস। তারপাশে চমৎকার চেহারার একটি ছেলে (খুব সম্ভব এই ছেলেটিকেই সে বিয়ে করেছে কারণ সফিকের কাছে শুনেছি পারুলের বর হ্যান্ডস্যাম এবং বেশ ভালো চাকরি করে)। দ্বিতীয়বার দেখলাম অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে হাসতে হাসতে যাচ্ছে। কোনোবারই সে আমাকে দেখতে পায়নি। অবিশ্যি দেখতে পেলেও সে আমাকে চিনতে পারত না। অভাব, অনাহার ও দুর্ভাবনা আমার চেহারাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিল। তা ছাড়া পুরনো বন্ধুদের করুণা ও কৌতূহল থেকে বাঁচবার জন্যে আমি দাড়ি রেখেছিলাম। লম্বা দাড়ি ও ভাঙা চোয়ালই আমার পরিচয়কে গোপন রাখবার জন্যে যথেষ্ট ছিল। তবু আমি হাত দুলিয়ে অন্য রকম ভঙ্গিতে হাঁটা অভ্যাস করলাম। যার জন্যে সফিক (যার সঙ্গে এক বিছানায় অনেকদিন ঘুমিয়েছি) পর্যন্ত আমাকে চিনতে পারেনি। চেহারা পরিচিত মনে হলে মানুষ যে রকম পিটপিট করে দু'একবার তাকায় তাও সে তাকায়নি।

আমি নিশ্চিত, পারুলের সঙ্গে কোনো একদিন চোখাচোখি হবে। এবং সেও চিনতে না পেরে সফিকের মতো ব্যস্ত ভঙ্গিতে চলে যাবে। কিন্তু পারুল একদিন আমাকে এক পলকে চিনে ফেলল। আমাকে দেখে সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে

পড়ল। দু'-এক মুহূর্ত সে কোনো কথা বলতে পারল না। আমি খুব স্বাভাবিক গলায় বললাম, 'ভালো আছ পারুল? অনেকদিন পরে দেখা। আমার খুব একটা জরুরি কাজ আছে। যাই তাহলে কেমন?'

পারুল আশ্চর্য ও দুঃখিত চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে! আমি যখন চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি তখন সে কথা বলল, 'তোমার এমন অবস্থা হয়েছে!'

আমি অল্প হাসির ভঙ্গি করে হাল্কা সুরে বলতে চেষ্টা করলাম, 'ব্যবসাটা ফেল মেরেছে পারুল। আচ্ছা যাই তাহলে?'

পারুল সে-কথার জবাব দিল না। আমি বিস্মিত হয়ে দেখি তার চোখে পানি এসে পড়েছে। সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল।

পারুলকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। যে জীবন আমার শুরু হয়েছে সেখানে প্রেম নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু সামান্য কয়েক ফোঁটা মূল্যহীন চোখের জলের মধ্যে পারুল নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করল। সমস্ত দুঃখ ছাপিয়ে তাকে হারানোর দুঃখই নতুন করে অনুভব করলাম।

আমার জন্যে এই দুঃখটার বড় বেশি প্রয়োজন ছিল।



অপরূহ

রিকশাওয়ালাটাকে ইসহাক সাহেবের পছন্দ হলো না।

কেমন উদ্ধত ভাবভঙ্গি। ঘামে ভেজা চক্চকে মুখ। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল। দেখেই মনে হচ্ছে এ নির্বিকার ভঙ্গিতে ট্রাকের সামনে রিকশা নিয়ে চলে যাবে। লালবাতির দিকে ফিরেও তাকাবে না এবং ভাড়া নিয়ে গণ্ডগোল করবে। ভাড়া দেয়ামাত্র তেড়িয়া হয়ে বলবে, সাত টেকা ঠিক কইরা পাঁচ টেকা দেন কেন?

অবিশ্যি এই লোক এ-রকম নাও করতে পারে। মানুষের চেহারা দেখে তার মনের ভাব টের পাওয়া কঠিন কাজ। কিন্তু লোকটির চুল লম্বা। লম্বা চুল মানেই একটা ফ্যাশনের ব্যাপার। একজন রিকশাওয়ালা যখন ফ্যাশন করে, তখন বুঝতে হবে তার ভেতরে কোনো ঝামেলা আছে।

ইছহাক সাহেব বললেন, ‘ঝিকাতলা কত নিবে? রিকশাওয়ালা পিচ করে তার ঠিক সামনেই থুথু ফেলে বলল, যা নায্য ভাড়া হয় দিবেন।’

‘নায্য ভাড়াটা কত, শুনি।’

রিকশাওয়ালা বিরক্ত মুখে তাকাল। কোনো উত্তর দিল না। পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে সে ঝামেলাটা করবে নায্য ভাড়া নিয়ে। যখন তাকে ভাড়া দেয়া হবে সে থমথমে গলায় বলবে, এইটা কী দিলেন? এমন হইচই শুরু করবে যে চারদিকে লোক জমে যাবে।

ইসহাক সাহেব কঠিন স্বরে বললেন, ‘পাঁচ টাকা দেব— যাবে?’

রিকশাওয়ালা ‘হ্যাঁ-না’ কিছুই বলল না। পিচ করে আবার থুথু ফেলল। মনে হচ্ছে তার যাবার ইচ্ছা নেই।

আকাশে জুন মাসের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। আগে এই রোদে রাস্তার পিচ গলে যেত। এখন গলে না। এরা বোধহয় রাস্তায় নতুন ধরনের কোনো পিচ ব্যবহার করে।

‘কি যাবে নাকি?’

‘উঠেন।’

পাঁচ টাকায় রাজি হওয়া একটা সন্দেহজনক ব্যাপার। এই কড়া রোদে ভাড়া পাঁচ টাকার বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু এ ব্যাটা রাজি হয়ে গেল কেন? অন্য কোনো মতলব আছে নাকি? একবার তিনি গুলিস্তান থেকে নিউ মার্কেট যাবেন— রিকশাওয়ালা তিন টাকায় রাজি হয়ে গেল। রহস্যটা টের পেলেন কিছুদূর যাবার পর। রিকশাওয়ালা বিরাট এক কাহিনী ফেঁদে বসল। যে কাহিনী বিশ্বাস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আজই নাকি তার মেয়ের বিয়ে। সন্ধ্যাবেলা বরযাত্রী আসবে। তাদের দু’টা ডালভাত খাওয়াতে হবে। কিন্তু সেই পয়সা এখনো যোগাড় হয়নি। রিকশার জমার টাকা উঠতে এখনো বাকি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

যত ফালতু কথা। তবু ইসহাক সাহেব তাকে একটা চকচকে দশ টাকার নোট দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, এখন থেকে যারা কম ভাড়ায় যেতে চায় তাদের রিকশায় উঠবেন না।

এই ব্যাটও কম ভাড়ায় যেতে রাজি হয়েছে। এর কারণটা কী? ইসহাক সাহেব মনে মনে গল্পের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। গল্পটা শুরু হবে কখন? কিন্তু শুরু হচ্ছে না। রিকশাওয়ালা মাথা নিচু করে, মাথার বাবরির চুল হাওয়ায় উড়িয়ে এক মনে চালাচ্ছে। লোকটা হয়তো খারাপ নয়। ইসহাক সাহেব বললেন, ‘এই তোমার নাম কী? রিকশাওয়ালা মাথা ঘুরাল।’

‘আমারে কন?’

‘হ্যাঁ। কী নাম?’

‘ইসহাক।’

বলে কি এ! এর নামও ইসহাক? ইসহাক সাহেবের অস্বস্তি হতে লাগল। যদিও অস্বস্তি বোধ করার কোনোই কারণ নেই। মুসলমানদের নামের সংখ্যা অল্প। অল্প কিছু নামই ঘুরেফিরে আসে। একবার এক বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়ে দেখেন বাবুর্চির নাম ইসহাক। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে সেই ইসহাকের সঙ্গে তাঁর চেহারারও খানিকটা মিল ছিল। বড়ই অস্বস্তির ব্যাপার। অবিশ্যি এই রিকশাওয়ালার সঙ্গে তাঁর আর কোনো মিল নেই।

‘বাড়ি কোথায় তোমার?’

‘আমারে কন?’

‘হ্যাঁ। কোথায় তোমার বাড়ি?’

‘বাড়ি-ঘর কিছু নাই। বাড়ি-ঘর থাকলে কি রিকশা চালাই?’

‘ঘুমাও কোথায়? রিকশার উপর তো নিশ্চয়ই ঘুমাও না।’

রিকশাওয়ালা জবাব দিল না। পিচ করে থুথু ফেলল। এই ব্যাটার থুথু ফেলার রোগ আছে। অসম্ভব রোদ। ব্যাটার রিকশা দিনতে কষ্ট হচ্ছে। ইসহাক সাহেবের অস্বস্তি বাড়তে লাগল। অস্বস্তির কারণ কি দু’জনের একই নাম? নামের প্রতি আমাদের কি অন্য এক ধরনের মমতা আছে? হয়তোবা।

‘তোমার ছেলেপুলে আছে নাকি ইসহাক মিয়া?’

‘আছে।’

‘কয়জন?’

‘দুই মাইয়া।’

কী সর্বনাশ! বলে কি এই লোক! তাঁরও দুই মেয়ে, লোপা এবং ইন্দ্রাণী। তিনি দারুণ উৎকর্ষ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এদের নাম কী?’

‘নাম দিয়া কী করবেন?’

‘আহ্ বল না।’

‘একজনের নাম হইল গিয়া...’

বলতে বলতে সে রাস্তার পাশে হঠাৎ রিকশা দাঁড় করিয়ে দিল।

‘এ্যাই কী হয়েছে?’

‘শইলটা খারাপ। পেটে ব্যথা।’

নতুন ধরনের কোনো চাল নাকি? শরীর খারাপের অজুহাতে বাড়তি কিছু লাভের চেষ্টা? হয়তো এই রোদে তার আর যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ইসহাক সাহেবকে এখানেই নেমে যেতে হবে এবং পুরো পাঁচ টাকাই দিতে হবে। বিচিত্র কিছু না। এরা হাড়ে হাড়ে বজ্জাত।

ইসহাক সাহেব একটা সিগারেট ধরিয়ে আড়চোখে রিকশাওয়ালার দিকে

লক্ষ রাখতে লাগলেন। শরীর খারাপের কতটা ভান কতটা সত্যি এটা ধরতে চান। তিনি দেখলেন সে ফুটপাথে শুয়ে পড়েছে। দু'হাতে খামচি দিয়ে তার পেট ধরে রেখেছে। কোনো রকম শব্দ বা চিৎকার করছে না। কাজেই সম্ভবত ভান নয়। ভান হলে উঃ আঃ করে লোক জমিয়ে ফেলত। এখানে কোনো লোকজন জমছে না। পাঁচ ছ' বছর বয়সের একটি টোকাই শ্রেণীর বালিকা কৌতূহলী চোখে দেখছে। বালিকাটির মুখ হাসি হাসি, যেন সে খুব মজা পাচ্ছে।

ইসহাক সাহেব রিকশা থেকে নামলেন। কী যন্ত্রণায় পড়া গেল! পাঁচটা টাকা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে যাবেন কি? এ রকম হৃদয়হীন কোনো কাজ করা সম্ভব নয়।

‘তোমার অসুবিধাটা কী?’

‘পেটে ব্যথা।’

‘এ রকম আগেও হয়েছে?’

‘জি, হইছে।’

‘এমন অসুখ নিয়ে রিকশা চালাও কেন? পাগল মাকি?’

রিকশাওয়ালা লাল চোখে তাকাল। চোখে দু'টি এখন লাল হয়েছে না আগেই লাল ছিল তিনি লক্ষ করেননি।

‘সাব, আপনে আমার রিকশাটা দেখবেন। গরিব মানুষ রিকশা গেলে সর্বনাশ।’

‘রিকশা যাবে কেন?’

‘সাব একটু দেখবেন। রিকশাটা দেখবেন সাব। আপনার পায়ে ধরি।’

বলতে বলতে সত্যি সত্যি তার পায়ে ধরবার জন্যে রিকশাওয়ালা এগিয়ে আসতে চেষ্টা করল। তিনি চমকে পেছনে সরে গেলেন। ঠিক তখন লোকটি একগাদা রক্তবমি করল। ইসহাক সাহেব কপালের ঘাম মুছে কাঁপা গলায় ডাকলেন, ‘এ্যাই এ্যাই। এ্যাই ইসহাক মিয়া।’

‘সাব আমার রিকশা। আমার রিকশা।’

দেখতে-দেখতে চারদিকে ভিড় জমল। মানুষের হৃদয় থেকে মমতা বোধহয় পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়নি। দু'টি যুবক ছেলে তাকে ধরাধরি করে বেবিট্যাক্সিতে তুলল। নিয়ে যাবে পিজিতে। তার রিকশার দায়িত্ব নিতে অনেককেই আগ্রহী দেখা গেল। ইসহাক সাহেব কাউকে সে দায়িত্ব দিতে রাজি হলেন না। জুন মাসের প্রচণ্ড রোদে নিজেই রিকশা টেনে টেনে নিয়ে গেলেন সায়েন্স ল্যাবরেটরির পুলিশ ফাঁড়িতে। এমন বিপদেরও মানুষ পড়ে? রিকশা জমা দিয়ে যে বাসায় চলে যাবেন সে উপায় নেই। যেতে হবে পিজিতে। ইসহাক মিয়াকে বলতে হবে—রিকশা জায়গামতো আছে। সে সুস্থ হয়ে ফিরে

এলে তার রিকশা ফেরত পাবে। অথচ আজ তাঁর সকাল সকাল বাসায় ফেরা দরকার। ইন্দ্রাণীর দাঁত ব্যথা। ছ'টার সময় তাকে ডেনটিস্টের কাছে নিতে হবে।

মানুষ হয়ে জন্মানোর অনেক যন্ত্রণা। ইসহাক সাহেব পুলিশ ফাঁড়ি পর্যন্ত যেতেই ঘেমে নেয়ে উঠলেন। তাঁর বড় বড় নিশ্বাস পড়তে লাগল। খালি রিকশা এত ভারী হয় তাঁর ধারণা ছিল না। কৌতূহলী লোকজন দু'পাশ থেকে তাঁকে দেখছে। ঢাকা শহরের মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। একটা গর্ত খুঁড়ে রাখলেও তার চারদিকে ভিড় জমে যায়। কর্মহীন লোকজন গভীর আশ্রয়ে গর্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন এই মুহূর্তে গর্তের ভেতর থেকে অদ্ভুত কোনো জন্তু লাফিয়ে বের হবে। ইসহাক সাহেবের পানির পিপাসা পেয়ে গেল। বুক খাঁ খাঁ করতে লাগল। আহ্ কী যন্ত্রণা! পরিচিত কেউ না দেখলে বাঁচা যায়। চেনা-জানা কারও সঙ্গে দেখা হলে খুব কম করে হলেও এক লক্ষ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। অফিসের নিজামুদ্দিনের সঙ্গে যদি দেখা হয় সে নির্যাৎ বলবে, আপনি অফ টাইমে রিকশা চালান তা তো জানতাম না। হা হা হা। এখান থেকে আজিমপুর যেতে কত নেবেন? নিজামুদ্দিনের মতাবই হচ্ছে বদ রসিকতা করা। ছোটলোক কোথাকার! ইসহাক সাহেব 'স্বিচ' করে থুথু ফেললেন এবং দারুণ চমকে উঠলেন। তিনিও রিকশাওয়ালা মতো থুথু ফেলতে শুরু করেছেন। কী সর্বনাশের কথা!

পিজিতে ইসহাক মিয়াকে খুঁজি বের করতে দেরি হলো না। ইমার্জেন্সিতে একটি বেঞ্চের ওপর তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মাথার ওপর একটা ফ্যান। ফ্যান প্রবল বেগে ঘুরছে এবং বাতাসে ইসহাক মিয়ার লম্বা চুল উড়ছে। দীর্ঘ সময় তিনি তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর গেলেন অল্প বয়েসি এক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার ছেলেটি ক্লান্ত এবং কোনোকিছু নিয়ে খুবই চিন্তিত। তার বিরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তবু তিনি বললেন, 'ঐ রিকশাওয়ালা কখন মারা গেছে?'

'ডাক্তার ছেলেটি ঠাণ্ডা গলায় বলল, জানি না কখন।'

'ওর রিকশাটি আমি থানায় দিয়েছি। এখন কী করব? কাকে খবর দেব?'

'আমাকে এসব বলছেন কেন?'

তিনি বারান্দায় সরে এলেন। মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে রইলেন একা একা। রোদ মরে আসছে। আকাশে মেঘ। তিনি হাসপাতাল থেকে বের হয়ে ঠাণ্ডা এক বোতল পেপসি খেলেন। ছ'টা বাজতে দেরি নেই। ইন্দ্রাণীকে ডেনটিস্টের কাছে নিতে হবে। তিনি একটা রিকশায় উঠে পড়লেন।

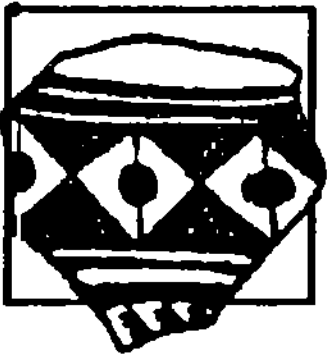
রিকশাওয়ালাটির বয়স খুবই কম। উৎসাহ বেশি। সে রিকশা নিয়ে ছুটছে।

অকারণে বেল বাজাচ্ছে। খুব কায়দা করে সে দু'টি রিকশা ওভারটেক করে দাঁত বের করে হাসল। ইসহাক সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, 'নাম কী তোমার?'

‘সামসু।’

ইসহাক সাহেব কোমল স্বরে বললেন, ‘তুমি কেমন আছ সামসু?’

সামসু অবাক হয়ে পেছনে তাকাল। কোনো জবাব না দিয়ে দ্রুত প্যাডেল চাপতে লাগল। সামনেই ট্রাফিক সিগন্যাল। অনেকক্ষণ সবুজ বাতি জ্বলছে। ওটি লাল হবার আগেই তাকে পার হয়ে যেতে হবে। যাত্রীদের আজীবাজে প্রশ্নের জবাব দেবার তার সময় নেই।



জিন-কফিল

জায়গাটার নাম, ধুন্দুলনাড়া।

নাম যেমন অদ্ভুত, জায়গা তেমন জঙ্গলে। একবার গিয়ে পৌঁছলে মনে হবে সভ্য সমাজের বাইরে চলে এসেছি। সেখানে যাবার ব্যবস্থাটা বলি— প্রথমে যেতে হবে ঠাকরাকোনা। ময়মনসিংহ-মোহনগঞ্জ ব্রাঞ্চ লাইনের ছোট্ট স্টেশনে। ঠাকরাকোনা থেকে গঙ্গার নৌকা যায় হাতির বাজার পর্যন্ত। যেতে হবে হাতির বাজারে। ভাগ্য ভালো হলে হাতির বাজারে কেরায়া নৌকা পাওয়া যাবে। যদি পাওয়া যায় সেই নৌকায় শিয়ালজানি খাল ধরে মাইল দশেক উত্তরে যেতে হবে। বাকি পথ পায়ে হেঁটে। পেরুতে হবে মাঠ, ডোবা, জলাভূমি। জুতা খুলে হাতে নিয়ে নিতে হবে। পা কাটবে ভাঙ্গা শামুকে। গোটা বিশেক জোঁক ধরবে। বিশ্রী অবস্থা। কতটা হাঁটতে হবে তারো অনুমান নেই। একেকজন একেক কথা বলবে। একটা সময় আসবে যখন লোকজন হাসিমুখে বলবে— ধুন্দুলনাড়া? ঐ তো দেখা যায়। তখন বুঝতে হবে আরও মাইল সাতেক বাকি।

বছর পাঁচেক আগে এই জঙ্গলে জায়গায় আমাকে জনৈক সাধুর সন্ধানে যেতে হয়েছিল। সাধুর নাম কালু খাঁ। মুসলমান নাম হলেও সাধু হিন্দু ব্রাহ্মণ। বাবা-মা তাঁকে শৈশবেই পরিত্যাগ করেন। তিনি মানুষ হন মুসলিম পরিবারে।

কালু খাঁ নাম তাঁর মুসলমান পালক বাবার দেয়া। যৌবনে তিনি সংসার-ত্যাগী হয়ে শ্মশানে আশ্রয় নেন। তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা, বিভূতির কোনো সীমা সংখ্যা নেই। তিনি কোনো রকম খাদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁর গা থেকে সব সময় কাঁঠালচাঁপা ফুলের তীব্র গন্ধ বের হয়। পূর্ণিমার সময় সেই গন্ধ এত তীব্র হয় যে, কাছে গেলে বমি এসে যায়। নাকে রুমাল চেপে কাছে যেতে হয়।

সাধু-সন্ন্যাসী, তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা— এইসব নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাই না। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি ব্যাখ্যার অতীত কোনো ক্ষমতা প্রকৃতি মানুষকে দেয়নি। কোনো সাধু যদি আমার চোখের সামনে শূন্যে ভাসতে থাকেন আমি চমৎকৃত হব না। ধরে নেব এর পেছনে আছে ম্যাজিকের সহজ কিছু কলাকৌশল যা এই সাধু আয়ত্ত্ব করেছেন। কাজেই আমার পক্ষে সাধুর খোঁজে ‘ধুন্দুলনাড়া’ নামের অজ অজ অজপাড়াগাঁয় যাবার প্রশ্নই আসে না। যেতে হয়েছিল সফিকের কারণে।

সফিক আমার বাল্যবন্ধু। সে বিশ্বাস করে না এমন জিনিস নেই। ভূত-প্রেত থেকে সাধু-সন্ন্যাসী সবকিছুতেই তার অসীম বিশ্বাস। বিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও সে বিশ্বাস করে যে সাপের মাথায় মণি আছে। কৃষ্ণপক্ষের রাতে এই মণি সে উগড়ে ফেলে। চারদিক আলো হয়ে যায় আলোয় আকৃষ্ট হয়ে পোকা মাকড় আসে। সাপ তাদের ধরে ধরে খায়। ভোজন পর্ব শেষ হলে মণিটি আবার গিলে ফেলে।

সাধু কালু খাঁর খবর সফিকই নিয়ে এলো এবং এমন ভাব করতে লাগল যেন অবতারের সন্ধান পেয়ে গেছে— যে অবতারের সঙ্গে দেখা না হলে জীবন বৃথা।

আমি সফিকের সঙ্গে রওনা হলাম দু’টি কারণে। এক, সফিককে আমি অত্যন্ত পছন্দ করি। তাকে একা একা ছেড়ে দেয়ার প্রশ্ন ওঠে না। দুই, সাধু খোঁজা উপলক্ষে গ্রামের দিকে খানিকটা হলেও ঘোরা হবে। মাঝে মাঝে এরকম ঘুরে বেড়াতে মন্দ লাগে না। নিজেকে পরিব্রাজক-পরিব্রাজক মনে হয়। যেন আমি ফা’হিয়েন। বাংলার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

খুব আগ্রহ নিয়ে রওনা হলেও আগ্রহ হাতির বাজারে পৌঁছবার আগেই শেষ হয়ে গেল। অমানুষিক পরিশ্রম হলো। হাতির বাজার থেকে যে কেরায়া নৌকা নিলাম সে নৌকাও এখন ডোবে তখন ডোবে অবস্থা। নৌকার পাটাতনের ফুটো দিয়ে বিজবিজ করে পানি উঠছে। সারাক্ষণ সেই পানি সৈঁচতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সফিকের মতো পাগলেরও ধৈর্যচ্যুতি হলো। কয়েক বার বলল, ‘বিরাত বোকামি হয়েছে। খেট মিসটেক। এরচে’ কঙ্গো উৎস বের করা সহজ ছিল।’

আমি বললাম, ‘এখনো সময় আছে। ফিরে যাবি কি-না বল্।’

‘আরে না! এতদূর এসে ফিরে যাব মানো। ভালো জিনিসের জন্যে কষ্ট

করতেই হবে। জাস্ট চিন্তা করে দেখ একজন মানুষের গা থেকে ভুরভুর করে কাঁঠালচাঁপা ফুলের গন্ধ বেরুচ্ছে। ভাবতেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। হাউ এক্সাইটিং!’

সন্ধ্যার পরপর ধুন্দুলনাড়া গ্রামে উপস্থিত হলাম। কাদায় পানিতে মাখামাখি। তিনবার বৃষ্টিতে ভিজছি। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় জীবন বের হবার উপক্রম। বিদেশী মানুষ দেখলেই গ্রামের লোকজন সাধারণত খুব আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসে। এইখানে উল্টো নিয়ম দেখলাম। আমাদের ব্যাপারে কারও কোনো আগ্রহ নেই। কোথেকে এসেছি! যাব কোথায়? এইটুকু দায়িত্ব পালন করার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেই সবাই চলে যাচ্ছে। এ কী যন্ত্রণা!

সাধু কালু খাঁ-কে দেখেও খুব হতাশ হতে হলো। বন্ধ উন্মাদ একজন মানুষ। শ্মশানে একটা পাকুড় গাছের নিচে ন্যাংটা অবস্থায় বসা। আমাদের দেখেই গালাগালি শুরু করল। গালাগালি যে এত নোংরা হতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। আমাকে এবং সফিককে কালু খাঁ সবচেয়ে ভদ্র কথা যা বলল তা হচ্ছে— বাড়িতে যা। বাড়িত গিয়া খাবলাইয়া খাবলাইয়া ‘গু’ খা।

আমি হতভম্ব। ব্যাটা বলে কি!

সফিকের দিকে তাকালাম। সে ভাবগদগদ করে বলল, ‘লোকটার ভেতর জিনিস আছে বলে মনে হচ্ছে।’

আমি বললাম, ‘কী করে বুঝলি? আমাদের ‘গু’ খেতে বলেছে এইজন্যে?’

‘আরে না। সে আমাদের এড়াতে চাচ্ছে। মানুষের সংসর্গ পছন্দ নয়। মানুষের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার এটা একটা সহজ টেকনিক।’

‘লোকটি যে বন্ধ উন্মাদ তাঁর মনে হচ্ছে না?’

‘তাও মনে হচ্ছে, তবে একটা প্রবাবিলিটি আছে যে সে উন্মাদ না।’

গ্রামের কয়েক জন বয়স্ক মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন। সাধুর প্রতি তাঁদের ভক্তি-শ্রদ্ধাও সফিকের মতোই। তাঁদের একজন বললেন, ‘বাবার মাথা এখন একটু গরম।’

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, ‘মাথা ঠাণ্ডা হবে কখন?’

‘ঠিক নাই। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ।’

‘তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ মানে?’

‘অমাবস্যা-পূর্ণিমায় মাথা গরম থাকে।’

এই ব্যাপারেও মতভেদ দেখা গেল। একজন বলল, ‘অমাবস্যা-পূর্ণিমাতেই মাথাটা ঠাণ্ডা থাকে। অন্য সময় গরম। বাবার কাছে মাসের পর মাস পড়ে থাকতে হয়। অপেক্ষা করতে হয়, কখন বাবার মাথা ঠাণ্ডা হবে।’

আমি বললাম, ‘সফিক, বাবার গা থেকে ফুলের গন্ধ তো কিছু পাচ্ছি না। আমাদের যে দ্রব্য খেতে বলছিল তার গন্ধ পাচ্ছি। তুই কি পাচ্ছিস?’

সফিক জবাব দেবার আগেই আমাদের সঙ্গী মানুষদের একজন ভীত গলায় বলল, ‘একটু দূরে যান। বাবা এখন টিল মারব। আইজ মনে হইতাছে বাবার মিজাজ বেশি খারাপ।’

কথা শেষ হবার আগেই টিলবৃষ্টি শুরু হলো। দৌড়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলাম। বাবার কাণ্ডকারখানায় সফিকের অবিশ্যি মোহভঙ্গ হলো না। সে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বলল, ‘দু’টা দিন থেকে দেখি। এতদূর থেকে আসা। ভালোমতো পরীক্ষা না করে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।’

‘আর কী পরীক্ষা করবি?’

‘মানে উনার মাথা যখন ঠাণ্ডা হবে তখন দু’একটা কথা-টথা জিজ্ঞেস করলে...’

আমি হাল ছেড়ে দেয়া গলায় বললাম, ‘থাকবি কোথায়?’

‘স্কুল ঘরে শুয়ে থাকব। খানিকটা কষ্ট হবে। কি আর কুয়া। কষ্ট বিনে কেষ্ট মেলে না।’

জানা গেল এই গ্রামে কোনো স্কুল নেই। পাশের গ্রামে প্রাইমারি স্কুল আছে— এখান থেকে ছ’মাইলের পথ। তবে গ্রামে পাকা মসজিদ আছে। অতিথি মোসাফির এলে মসজিদে থাকে। মসজিদের পাশেই ইমাম সাহেব আছেন। তিনি অতিথিদের খোঁজখবর করেন। প্রয়োজনে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

আমি খুব-একটা উৎসাহ বোধ করলাম না। গ্রামের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ইমাম সাহেব লোক কেমন?’

সে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দার্শনিকের মতো বলল, ‘ভালোয়-মন্দয় মিলাইয়া মানুষ। কিছু ভালো কিছু মন্দ।’ এই উত্তরও আমার কাছে খুব সন্দেহজনক মনে হলো। উপায় নেই। আকাশে আবার মেঘ জমতে শুরু করেছে। রওনা হলুম মসজিদের দিকে। গ্রামের লোকগুলো অভদ্রের চূড়ান্ত। কেউ সঙ্গে এলো না। কীভাবে যেতে হবে তা বলেই ভাবল আমাদের জন্যে অনেক করা হয়েছে।

মসজিদ খুঁজে বের করতেও অনেক সময় লাগল।

অন্ধকার রাত। পথ-ঘাট কিছুই চিনি না। সঙ্গে টর্চলাইট ছিল— বৃষ্টিতে ভিজে সেই টর্চলাইটও কাজ করছে না। অন্ধের মতো এগুতে হচ্ছে। যাকেই জিজ্ঞেস করি সেই খানিকটা জেরা করে, জুম্মাঘরে যাইতে চান ক্যান? কার কাছে যাইবেন? আপনার পরিচয়?

শেষ পর্যন্ত মসজিদ পাওয়া গেল। গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে একটা খালের পাশে মসজিদ। মসজিদের বয়স খুব কম হলেও দু’শ’ বছরের কম হবে

না। বিশাল স্তূপের মতো একটা ব্যাপার। সেই স্তূপের সবটাই শ্যাওলায় ঢাকা।
গা বেয়ে উঠেছে বটগাছ। সব মিলিয়ে কেমন গা-ছমছমানি ব্যাপার আছে।

আমাদের সাড়া-শব্দ পেয়ে হারিকেন হাতে ইমাম সাহেব চলে এলেন।
ছোটখাটো মানুষ। খালি গা। কাঁধে গামছা চাদরের মতো জড়ানো। বয়স
চল্লিশের মতো হবে। দাড়িতে তাকে খানিকটা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো
দেখাচ্ছে। আমার ধারণা ছিল মসজিদে রাত্রি যাপন করব শুনে তিনি বিরক্ত
হবেন। হলো উল্টোটা। তাঁকে আনন্দিত মনে হলো। নিজেই বালতি করে পানি
এনে দিলেন। গামছা আনলেন। দু'জোড়া খড়ম নিয়ে এলেন। সফিক বলল,
'ভাই, আমাদের খাওয়া-দাওয়া দরকার। সারা দিন উপোস। টাকাপয়সা নিয়ে
যদি খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'ব্যবস্থা হবে জনাব। আমার বাড়িতেই গরিবি
হালতে ডাল-ভাতের ব্যবস্থা।'

'নাম কী আপনার?'

'মুনশি এরতাজ উদ্দিন।'

'থাকেন কোথায়, আশেপাশেই?'

'মসজিদের পেছনে— ছোট্ট একটা টিনের ঘর আছে।'

'কে-কে থাকেন?'

'আমার স্ত্রী, আর কেউ না।'

'ছেলেমেয়ে নাই জনাব। আল্লাহপাক সন্তান দিয়েছিলেন, তাদের হায়াত
দেন নাই। হায়াত-মউত সবই আল্লাহপাকের হাতে। আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে
বিশ্রাম করেন, আমি আসতেছি।'

ভদ্রলোক ছোট ছোট পা ফেলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সফিক
বসল, ইমাম সাহেবকে মিতান্ত ভদ্রলোক বসে মনে হচ্ছে। মাই ডিয়ার টাইপ।
মনে হচ্ছে আমাদের দেখে খুশি হয়েছেন।

আমি বললাম, 'ভদ্রলোক জঙ্গুলে জায়গায় একা পড়ে আছেন— আমাদের
দেখে সেই কারণেই খুশি। এই মসজিদে নামাজ পড়তে কেউ আসে বলে
আমার মনে হয় না।'

'বুঝলি কী করে?'

'লোকজনের যাতায়াত থাকলে পায়ে চলার পথ থাকত। পথ দেখলাম না।'

সফিক হাসতে হাসতে বলল, 'মিসির আলির সঙ্গে থেকে থেকে তোর
অবজারভেশন পাওয়ার বেড়েছে বলে মনে হয়।'

'কিছুটা তো বেড়েছেই। ইমাম সাহেব আমাদের বসিয়ে রেখে যে চলে
গেলেন, কী নিয়ে ফিরবেন জানিস?'

'কী নিয়ে?'

‘দু’হাতে দু’টা কাটা ডাব নিয়ে ।’

‘এই তোর অনুমান?’

আমি হাসিমুখে বললাম, ‘মিসির আলি থাকলে এই অনুমানই করতেন । অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে গ্রামে প্রচুর ডাব গাছ । অতিথিদের ডাব দেয়া সনাতন রীতি ।’

‘লজিক তো ভালোই মনে হচ্ছে ।’

আমার লজিক ভুল প্রমাণ করে মুনশি এরতাজ উদ্দিন ট্রে হাতে উপস্থিত হলেন । ট্রেতে দু’কাপ চা । একবাটি তেল-মরিচ মাখা মুড়ি । এই অতি পাড়াগাঁ জায়গায় অভাবনীয় ব্যাপার তো বটেই । মফস্বলের চা অতিরিক্ত গরম, অতিরিক্ত মিষ্টি এবং অতিরিক্ত কড়া হয় । তবু চা হচ্ছে চা । চব্বিশ ঘণ্টা পর প্রথম চায়ে চুমুক দিলাম । মনটা ভালো হয়ে গেল । চমৎকার চা! বিস্মিত হয়ে বললাম, ‘চা কে বানিয়েছে? আপনার স্ত্রী?’

ইমাম সাহেব লাজুক মুখে বললেন, ‘জি । তার চায়ের অভ্যাস আছে । শহরের মেয়ে । আমার শ্বশুর সাহেব হচ্ছেন নেকেকোনার বিশিষ্ট মোক্তার মমতাজ উদ্দিন । নাম শুনেছেন বোধহয় ।’

আমরা এমন ভঙ্গি করলাম যে নামটা আমাদের কাছে অপরিচিতি নয় । আগে অনেকবার শুনেছি ।

ইমাম সাহেব বললেন, ‘আমি চা খাই না । আমার স্ত্রীর চায়ের অভ্যাস আছে । শহর থেকে ভালো চায়ের পাতা এনে দিতে হয় । বিরাট খরচান্ত ব্যাপার ।’

‘আপনি কি ইমামতি ছাড়া আর কিছু করেন?’

‘জি না । সামান্য জমিজমা আছে । আধি নেই । আমার শ্বশুর সাহেব তাঁর মেয়ের নামে নেকেকোনা শহরে একটা ফার্মেসি দিয়েছেন, সানরাইজ ফার্মেসি । তার আয় মাসে মাসে আসে । রিজিকের মালিক আল্লাহপাক । তাঁর ইচ্ছায় চলে যায় ।’

‘ভালো চলে বলেই তো মনে হচ্ছে ।’

‘জি জনাব, ভালোই চলে । সংসার ছোট । ছেলেপুলে নাই ।’

এশার নামাজের সময় হয়ে গিয়েছিল । ইমাম সাহেব আযান দিয়ে নামাজ পড়তে গেলেন । কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নামাজে আসতে দেখলাম না । ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করে জানলাম— লোক এমনিতেই হতো না । দু’বছর ধরে একেবারেই হচ্ছে না । শুধু জুম্মাবারে কিছু মুসল্লি আসেন ।

লোকজন না হওয়ার কারণও বিচিত্র । মসজিদ সম্পর্কে গুজব রটে গেছে— এখানে জিন থাকে । নাপাক অবস্থায় নামাজ পড়লে জিন তার সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয় । নানান ধরনের যন্ত্রণা করে ।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ‘জিন কি সত্যি সত্যি আছে?’

‘অবশ্যই আছে। আল্লাহপাক কোরান মজিদে বলেছেন। একটা সুরা আছে— সুরায়ে জিন।’

‘সেই কথা জিজ্ঞেস করছি না— জানতে চাচ্ছি, জিন গিয়ে বিরক্ত করে এটা সত্যি কি-না?’

‘জি জনাব সত্য। তবে লোকজন জিনের ভয়ে মজজিদে আসে না এটা ঠিক না— আসলে সাপের ভয়ে আসে না।’

‘সাপের ভয়ে আসে না? কী বলছেন আপনি?’

‘একবার নামাজের মাঝখানে সাপ বের হয়ে গেল। দাঁড়াশ সাপ। অবশ্য কাউকে কামড়ায় নাই। বাস্তু সাপ কামড়ায় না। মাঝে-মধ্যে ভয় দেখায়।’

সফিক আঁতকে উঠে বলল, ‘মাই গড! যখন-তখন সাপ বের হলে এইখানে থাকব কীভাবে?’

‘ভয়ের কিছু নাই। কার্বলিক এসিড ছড়িয়ে দিব।’

‘কার্বলিক এসিড আছে?’

‘জি। নেত্রকোনার ফার্মেসি থেকে তিন বোতল নিয়ে আসছি। আমার স্ত্রীরও খুব সাপের ভয়। এই অঞ্চলে সাপখোপ একটু বেশি।’

মসজিদের সামনে উঁচু চাতাল মতো জায়গায় বসে আছি। সাপের ভয়ে খানিকটা আতঙ্কগ্রস্ত। আকাশে ষেষ্ণু উড়ছে। বড় ধরনের বর্ষণ মনে হচ্ছে আসন্ন। ইমাম সাহেব বললেন, ‘প্রাণ দিতে একটু দেরি হবে। আমার স্ত্রী সব একা করছে, লোকজন নাই।’

‘ভাব দেখে মনে হচ্ছে— বিরাট আয়োজন।’

‘জি না। আয়োজন কিছু না, দরিদ্র মানুষ। আপনারা এসেছেন শুনে আমার স্ত্রী খুব খুশি। কেউ আসে না। আমি বলতে গেলে একা থাকি। সবাই আমাকে ভয় করে।’

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ‘কেন?’

‘সবার একটা ধারণা হয়েছে আমি জিন পুষি। জিনদের দিয়ে কাজকর্ম করাই...’

‘বলেন কি!’

‘সত্য না জনাব। তবে মানুষ অসত্যকে সহজে বিশ্বাস করে। অসত্য বিশ্বাস করা সহজ, কারণ— শয়তান অসত্য বিশ্বাসে সাহায্য করে।’

ইমাম সাহেব বেশ মন খারাপ করে চুপ হয়ে গেলেন। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, ‘সাধু কালু খাঁ সম্পর্কে কী জানেন?’

ইমাম সাহেব বললেন, ‘তেমন কিছু জানি না। তবে আপনাদের মতো দূর

দূর থেকে উনার কাছে লোকজন আসে এইটা দেখেছি। বিশিষ্ট ভদ্রলোকরাই আসে বেশি। ময়মনসিংহের ডিসি সাহেবে উনার পত্নীকে নিয়ে এসেছিলেন।’

‘উনার ক্ষমতা-টমতা কিছু আছে?’

‘মনে হয় না। কুৎসিত গালাগালি করেন। কামেল মানুষের এই রকম গালিগালাজ করার কথা না। তা ছাড়া কালু খাঁর কারণে অনেক বেদাতি কাণ্ডকারখানা হয়, এইগুলাও ঠিক না।’

‘কী কাণ্ডকারখানা হয়?’

‘উনি নগ্ন থাকেন— এইজন্যে অনেকের ধারণা, নগ্ন অবস্থায় তাঁর কাছে গেলে তাঁর মেজাজ ঠিক থাকে। অনেকেই নগ্ন অবস্থায় যান।’

‘সে-কি!’

‘উনি পাগল মানুষ। সমস্যার কারণে যারা তাঁর কাছে আসেন তাঁরাও এক অর্থে পাগল। পাগল মানুষের কাজকর্ম তো এই রকমই হয়। সমস্যা হলে তার পরিত্রাণের জন্যে আল্লাহপাকের দরবারে কান্নাকাটি করতে হয়। মানুষ তা করে না, সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-ফকির খোঁজে।’

ইমাম সাহেবের কথাবার্তায় আমি অবাক হলাম। পরিষ্কার চিন্তাভাবনা। গ্রাম্য মসজিদের ইমামের কাছ থেকে এমন যুক্তি-নির্ভর কথা আশা করা যায় না। লোকটিও প্রতি আমার এক ধরনের প্রজ্ঞাবোধ তৈরি হলো। তা ছাড়া ভদ্রলোকের আচার-আচরণেরও সহজ মারল্য আছে— যে সারল্যের দেখা সচরাচর পাওয়া যায় না।

রাত ন’টার দিকে ইমাম সাহেব বললেন, ‘চলেন যাই, খানা বোধহয় এর মধ্যে তৈরি হয়েছে। ডাল-ভাত-এর বেশি কিছু না। নিজ গুণে ক্ষমা করে চারটা মুখে দিবেন।’

ইমাম সাহেবের বাড়িটা ছোট টিনের দু’কামরার বাড়ি। একচিলতে উঠোন। বাড়ির চারদিকে দরমার বেড়া। আমাদের ঘরে নিয়ে বসানো হলো। মেঝেতে শতরঞ্জি বিছানো। থালা-বাসন সাজানো। আমরা সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসে গেলাম। খাবারের আয়োজন অল্প হলেও ভালো। সবজি, ছোট মাছের তরকারি, ডাল এবং টক জাতীয় একটা খাবার। ইমাম সাহেব আমাদের সঙ্গে বসলেন না। খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন। খাবারের শেষ পর্যায়ে আমাদের অবাক করে দিয়ে ইমাম সাহেবের স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। এবং শিশুর মতো কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটল যে আমি বেশ হকচকিয়ে গেলাম। অজপাড়াগাঁয়ে এটা অভাবনীয়। কঠিন পর্দাপ্রথাই আশা করেছিলাম। আমি খানিকটা সঙ্কুচিত হয়েই রইলাম। ইমাম সাহেবেকেও দেখলাম খুব অপ্রস্তুত বোধ করছেন।

সফিক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনি কেমন আছেন?’

ইমাম সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘ভালো নাই। আমার সঙ্গে একটা জিন থাকে। জিনটার নাম কফিল। কফিল আমারে খুব ত্যক্ত করে।’

সফিক হতভম্ব হয়ে বলল, ‘আপনি কি বললেন বুঝলাম না।’

মেয়েটি যন্ত্রের মতো বলল, ‘আমার সঙ্গে একটা জিন থাকে। জিনটার নাম কফিল। কফিল আমারে বড় যন্ত্রণা করে।’

সফিক অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি নিজেও বিস্মিত। ব্যাপার কি কিছু বুঝতে পারছি না। ইমাম সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘লতিফা, তুমি একটু ভিতরে যাও।’

ভদ্রমহিলা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, ‘ক্যান? ভিতরে ক্যান? থাকলে কি অসুবিধা?’

‘উনাদের সঙ্গে কিছু কথা বলব। তুমি না থাকলে ভালো হয়। সব কথা মেয়েছেলেদের শোনা উচিত না।’

লতিফা তীব্র চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল। খাওয়া বন্ধ করে আমরা হাত গুটিয়ে বসে রইলাম। এ কী সমস্যা!

লতিফা মেয়েটি রূপবতী। শুধু রূপবতী নয়, চোখে পড়ার মতো রূপবতী। হাল্কা-পাতলা শরীর। ধবধবে ফর্সা গায়ের রং। ঝলঝল মুখ। বয়সও খুব কম মনে হচ্ছে। দেখাচ্ছে আঠারো-উনিশ বছরের তরুণীর মতো। এত কম বয়স তার নিশ্চয় নয়। যার স্বামীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি তার বয়স আঠারো-উনিশ হতে পারে না। আরও একটি লক্ষ করার মতো ব্যাপার হলো— মেয়েটি সাজগোজ করেছে। চুল বেঁধেছে, চোখে কাজল দিয়েছে— কপালে লাল রঙের টিপ। আমার মেয়েরা কপালে টিপ দেয় বলেও জানতাম না।

ইমাম সাহেব আবার বললেন, ‘লতিফা ভিতরে যাও।’

মেয়েটি উঠে চলে গেল।

ইমাম সাহেব গলার স্বর নিচু করে বললেন, ‘লতিফার মাথা পুরোপুরি ঠিক না। এর দু’টা সন্তান নষ্ট হয়েছে। তার পর থেকে ও এ রকম। তার ব্যবহারে আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি তার হয়ে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই। কিছু মনে করবেন না— আল্লাহর দোহাই।’

আমি বললাম, ‘কিছুই মনে করিনি। তা ছাড়া মনে করার মতো কিছু তো উনি করেননি।’

ইমাম সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, ‘জিনের কারণে এ-রকম করে। জিনটা তার সঙ্গে সঙ্গে আছে। মাঝে মাঝে মাস খানিকের জন্যে চলে যায়। তখন ভালো থাকে। গত এক মাস ধরে তার সাথে আছে।’

‘আপনি এসব বিশ্বাস করেন?’

‘বিশ্বাস করব না কেন? বিশ্বাস না করার তো কিছু নাই। বাতাস আমরা

চোখে দেখি না কিন্তু বাতাস বিশ্বাস করি। কারণ, বাতাসের নানান আলামত দেখি। সেই রকম জিন কফিলেরও নানান আলামত দেখি।’

‘কী দেখেন?’

‘জিন যখন সঙ্গে থাকে তখন লতিফা খুব সাজগোজ করে। কথায় কথায় হাসে। কথায় কথায় কাঁদে।’

‘জিন তাড়াবার ব্যবস্থা করেননি?’

‘করেছি। লাভ হয় নাই। কফিল খুব শক্ত জিন। দীর্ঘদিন লতিফার সঙ্গে আছে। প্রথম সন্তান যখন গর্ভে আসলো তখন থেকেই কফিল আছে।’

‘জিন চায় কী?’

ইমাম সাহেব মাথা নিচু করে বসে রইলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি কোনো কারণে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আমরা মনে ক্ষীণ সন্দেহ হলো— জিন বোধহয় লতিফা মেয়েটিকেই স্ত্রী হিসেবে চায়। বিংশ শতাব্দীতে এই ধরনের চিন্তা মাথায় আসছে দেখে আমি নিজের ওপরও বিরক্ত হলাম। ইমাম সাহেব বললেন, ‘এই জিনটা আমার দুইটা বাচ্চা মেরে ফেলেছে। আবার যদি বাচ্চা হয় তারেও মারবে। বড় মনোকষ্টে আছি জনাব। দিনরাত আল্লাহরে ডাকি। আমি গুনাহগার মানুষ। আল্লাহপাক আমার কথা শুনে না।’

‘আপনার স্ত্রীকে কোনো ডাক্তার দেখিয়েছেন?’

‘ডাক্তার কী করবে? ডাক্তারের কোনো বিষয় না। জিনের ওষুধ ডাক্তারের কাছে নাই।’

‘তবু একবার দেখালে হতো না?’

‘আমার শ্বশুর সাহেব দেখিয়েছিলেন। একবার লতিফাকে বাপের বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। শ্বশুর সাহেব তারে ঢাকা নিয়ে গেলেন। চিকিৎসা-টিকিৎসা করালেন। লাভ হলো না।’

বারান্দা থেকে গুনগুন শব্দ আসছে। উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। খুবই মিষ্টি গলায় টেনে টেনে গান হচ্ছে— যার কথাগুলোর বেশির ভাগই অস্পষ্ট। মাঝে মাঝে দু’একটা লাইন বোঝা যায় যার কোনো অর্থ নেই। যেমন: ‘এতে না দেহে না দেহে না এতে না।’

ইমাম সাহেব উঁচু গলায় বললেন, ‘লতিফা চুপ করো। চুপ করো বললাম।’

গান থামিয়ে লতিফা বলল, ‘তুই চুপ কর। তুই থাম্ শ্বশুরের বাচ্চা।’

অবিকল পুরুষের ভারী গলা। আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। সেই পুরুষকণ্ঠ থমথমে স্বরে বলল, ‘চুপ কইরা থাকবি। একটা কথা কইলে টান দিয়া মাথা আলাগা করুম। শইল থাকব এখানে মাথা আরেকখানে। শ্বশুরের বাচ্চা আমারে চুপ করতে কয়।’

আমরা হাত ধুয়ে উঠে পড়লাম। এত কাণ্ডের পর খাওয়া-দাওয়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব না।

এ জাতীয় যন্ত্রণায় পড়ব কখনো ভাবিনি।

সফিক নিচু গলায় বলল, ‘বিরিট সমস্যা হয়ে গেল দেখি। ভয় ভয় লাগছে। কী করা যায় বলো তো?’

মসজিদের ভেতর এর আগে কখনো রাত্রি-যাপন করিনি। অস্বস্তি নিয়ে ঘুমুতে গেলাম। কেমন যেন দমবন্ধ দমবন্ধ লাগছে। মসজিদের একটা মাত্র দরজা— সেটি পেছন দিকে। ভেতরে গুমোট ভাব। ইমাম সাহেব যত্নের চূড়ান্ত করেছেন। স্ত্রীর অস্বাভাবিক অচরণজনিত লজ্জা হয়তো-বা ঢাকার চেষ্টা করছেন। আমাদের দু’জনের জন্যে দুটো শীতল পাটি, পাটির চারপাশে কার্বলিক এসিড ছড়ানো হয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা দু’টা মশারি খাটানো হয়েছে।

ইমাম সাহেব বললেন, ‘ভয়ের কিছু নাই। হারিকেন জ্বালানো থাকবে। আলোতে সাপ আসে না। দরজা বন্ধ। সাপ ঢোকায়ও পথ নাই।’

আমি খুব যে ভরসা পাচ্ছি— তা না। চৌকি এনে ঘুমুতে পারলে হতো। মসজিদের ভেতর চৌকি পেতে শোয়া— ভাবাই যায় না।

সফিকের হচ্ছে ইচ্ছাঘুম। শোয়ামাত্র লোক ডাকতে শুরু করেছে। বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মসজিদের ভেতর আগরবাতির গন্ধ। যে গন্ধ সব সময় মৃত্যুকে মনে করিয়ে দেয়। সব মিলিয়ে গা-ছমছমানো ব্যাপার।

আমি ইমাম সাহেবকে বললাম, ‘আপনি চলে যান, আপনি এখানে বসে আছেন কেন? আপনার স্ত্রী একা তাঁর শরীরও ভালো না।’

ইমাম সাহেব বললেন, ‘আমি মসজিদেই থাকব। এবাদত-বন্দেগি করব। ফজরের নামাজ শেষ করে বাসায় গিয়ে ঘুমুব।’

‘কেন?’

‘লতিফা এখন আমাকে দেখলে উন্মাদের মতো হয়ে যাবে। মেঝেতে মাথা ঠুকবে।’

‘কেন?’

‘ওর দোষ নাই কিছু। সঙ্গে জিন আছে— কফিল। এই জিনই সবকিছু করায়। বেচারির কোনো দোষ নাই।’

আমি চুপ করে রইলাম। ইমাম সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, ‘এমনিতে তেমন উপদ্রব করে না। সন্তানসম্ভবা হলেই কফিল ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা করে। বাচ্চাটা মেরে না ফেলা পর্যন্ত থামে না। দুইটা বাচ্চা মেরেছে— এইটাও মারবে।’

‘আপনার স্ত্রী কি সন্তানসম্ভবা?’

‘জি।’

‘আপনি কি নিশ্চিত যে পুরো ব্যাপারটা জিন করছে। অন্য কিছু না?’

‘জি নিশ্চিত। জিনের সঙ্গে আমার মাঝে-মধ্যে কথা হয়।’

‘অবিশ্বাস্য সব কথাবার্তা বলছেন আপনি।’

‘অবিশ্বাসের কিছু নাই। একদিনের ঘটনা বলি তাহলে বুঝবেন। ভাদ্র মাস। খুব গরম। একটা ভেজা গামছা শরীরে জড়িয়ে এশার নামাজে দাঁড় হয়েছি। মসজিদে আমি একা। আমি ছাড়া আর কেউ নাই। হঠাৎ দপ করে হারিকেনটা নিভে গেল। চমকে উঠলাম। তারপর শুনি মসজিদের পেছনের দরজার কাছে ধূপধূপ শব্দ। খুব ভয় লাগল। নামাজ ছেড়ে উঠতে পারি না। নামাজে মনও দিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরপর পিছনের দরজায় ধূপধূপ শব্দ। যেন কেউ কিছু-একটা এনে ফেলছে। সেজদায় যাবার সময় কফিলের গলা শুনলাম— টেনে টেনে বলল, তোরে আইজ পুড়াইয়া মারব। তোরে আইজ পুড়াইয়া মারব। তারপর ধপ করে আগুন জ্বলে উঠল। দাউদাউ আগুন। নামাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়লাম। দেখি দরজার কাছে গাদা করা শুকনো লাকড়ি। আগুন জ্বলছে, আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম, বাঁচাও বাঁচাও। আমার চিৎকার শুনে লতিফা পানির বালতি হাতে ছুটে আসল। পানি দিয়ে আগুন নিভায়ে আমারে মসজিদ থেকে টেনে বার করল। আমার স্ত্রীর কারণে সেই যাত্রা বেঁচে গেলাম। লতিফা সময়মতো না আসলে মারা পড়তাম।’

‘জিন মসজিদের ভেতরে ঢুকল না কেন?’

‘খারাপ ধরনের জিন। আল্লাহর ঘরে এরা ঢুকতে পারে না। আমি এইজন্যেই বেশিরভাগ সময় মসজিদে থাকি। মসজিদে আমি নিশ্চিত হয়ে ঘুমাতে পারি। ঘরে পারি না।’

‘কফিল আপনাকে খুন করতে চায়?’

‘তাও ঠিক না— একবারই চেয়েছিল। তারপর আর চায় নাই।’

‘খুন করতে চেয়েছিল কেন?’

ইমাম সাহেব চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, ‘আপনার যদি আপত্তি না থাকে পুরো ঘটনাটা বলুন। আপত্তি থাকলে বলার দরকার নেই।’

‘না। আপত্তির কী আছে? আপত্তির কিছু নাই। আমি লতিফার অবস্থা একটু দেখে আসি।’

‘যান দেখে আসুন।’

ইমাম সাহেব চলে গেলেন। আমি ভয়ে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভূত-প্রেত, জিন-পরী কখনো বিশ্বাস করিনি, এখনো করছি না তবু আতঙ্কের আধমরা হয়ে গেছি। সফিক জেগে থাকলে খানিকটা ভরসা পাওয়া যেত। সে ঘুমুচ্ছে মড়ার মতো। একেই বলে পরিবেশ। ইমাম সাহেব দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন। বিরস গলায় বললেন, ‘ভালোই আছে, তবে ভীষণ চিৎকার করছে।’

‘তালা বন্ধ করে রেখেছেন?’

‘জি না। তালা বন্ধ করে তাকে রাখা সম্ভব না। কফিল ওর সঙ্গে থাকে— কাজেই ওর গায়ের জোর থাকে অসম্ভব। না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না।’

ইমাম সাহেব মন খারাপ করে বসে রইলেন। আমি বললাম, ‘গল্পটা শুরু করুন ভাই।’

তিনি নিচু গলায় বললেন, ‘আমার স্ত্রীর ডাকনাম বুড়ি।’

কথা পুরোপুরি শেষ করতে পারলেন না। মসজিদে প্রচণ্ড শব্দে ঢিল পড়তে লাগল। ধূপধূপ শব্দ। সেইসঙ্গে মনে হচ্ছে কয়েকজন মানুষ যেন চারদিকে ছোট্টাছুটি করছে। আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম, ‘কী ব্যাপার?’

ইমাম সাহেব বললেন, ‘কিছু না। কফিল চায় না আমি কিছু বলি।’

‘থাক ভাই, বাদ দিন। গল্প বলার দরকার নেই।’

‘অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢিল ছোড়া বন্ধ হবে। ভয়ের কিছুই নাই।’

সত্যি সত্যি বন্ধ হলো। বৃষ্টির বেগ বাড়তে লাগল। ইমাম সাহেব গল্প শুরু করলেন। আমি তাঁর গল্পটাই বলছি। তাঁর ভাষাতে। তবে আঞ্চলিকতাটা সামান্য বাদ দিয়ে।

গল্পের মাঝখানেও একবার তুমুল ঢিল ছোড়া হলো। ইমাম সাহেব একমনে আয়াতুল কুরসি পড়লেন। আমার জীবনে সে এক ভয়াবহ রাত।

২

নেত্রকোনা শহরের বিশিষ্ট মোক্তার মমতাজউদ্দিন সাহেবের বাড়িতে তখন আমি থাকি। উনার সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তা সম্পর্ক নাই। লোকমুখে শুনেছিলাম— বিশিষ্ট উদ্রলোক। কেউ কোনো বিপদে পড়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি যথাসাধ্য করবেন। আমার তখন মহাবিপদ। একবেলা খাই তো এক বেলা উপোস দেই। সাহসে ভর করে তাঁর কাছে গেলাম চাকরির জন্যে। উনি বললেন, ‘চাকরি যে দিবো পড়াশোনা কী জানো?’

আমি বললাম, ‘উলা পাস করেছি।’

উনি বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘মাদ্রাসা পাস করা লোক, তোমারে আমি কী চাকরি দিব। আই.এ., বি.এ. পাস থাকলে একটা কথা ছিল। চেষ্টা-চরিত্র করে দেখতাম। চেষ্টা করারও তো কিছু নাই।’

আমি চুপ করে রইলাম। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বড় আশা ছিল কিছু হবে। একটা পয়সা সঙ্গে নাই। উপোস দিচ্ছি। রাতে নেত্রকোনা স্টেশনে ঘুমাই।

মমতাজ সাহেব বললেন, ‘তোমাকে চাকরি দেয়া সম্ভব না। নেও, এই

বিশটা টাকা রাখো। অন্য কারও কাছে যাও। মসজিদে খোঁজ-টোজ নাও—
ইমামতি পাও কি-না দেখো।’

আমি টাকাটা নিলাম। তারপর বললাম, ‘ভিক্ষা নেয়া আমরা পক্ষে সম্ভব
না। যদি ঘরের কোনো কাজকর্ম থাকে বলেন করে দেই।’

তিনি অবাক হয়ে বললেন, ‘কী কাজ করতে চাও?’

‘যা বলবেন করব। বাগানের ঘাসগুলো তুলে দেই?’

‘আচ্ছা দাও।’

আমি বাগান পরিষ্কার করে দিলাম। গাছগুলোতে পানি দিলাম। দু’-এক
জায়গায় মাটি কুপিয়ে দিলাম। সন্ধ্যাবেলা কাজ শেষ করে বললাম, ‘জনাব
যাই। আপনার অনেক মেহেরবানি। আল্লাহপাকের দরবারে আমি আপনার
জন্যে দোয়া করি।’

মমতাজ সাহেব বললেন, ‘এখন যাবে কোথায়?’

‘ইস্টিশনে। রাতে নেত্রকোনা ইস্টিশনে আমি ঘুমাই।’

‘এক কাজ করো। রাতটা এইখানেই থাকো। তারপর দেখি।’

আমি থেকে গেলাম।

একদিন দুইদিন তিনদিন চলে গেল। উনি কিছু বলেন না। আমিও কিছু
বলি না। বাংলাঘরের এক কোনায় থাকি। বাগান দেখাশোনা করি। চাকরির
সন্ধান করি। ছোট শহর, আমার কোনো চিনা-পরিচয়ও নাই। কে দিবে চাকরি?
ঘুরাঘুরি সার হয়। মোক্তার সাহেবের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে দেখা হয়। আমি বড়ই
শরমিন্দা বোধ করি। উনিও এমন ভাব করেন যেন আমাকে চেনেন না।
মাসখানেক এইভাবে চলে গেছে। আমি মোটামুটি তাদের পরিবারের একজন
হয়ে গেলাম। মোক্তার সাহেবের স্ত্রীকে ‘মা’ ডাকি। ভেতরের বাড়িতে খেতে
যাই। তাঁদের কোনো একটা উপকার করার সুযোগ পেলে প্রাণপণে করার চেষ্টা
করি। বাজার কল থেকে পানি তুলে দেই।

মোক্তার সাহেবের তিন মেয়ে। বড় মেয়ে বিধবা হয়ে বাবার সঙ্গে আছে।
তার দুই বাচ্চাকে আমি আমপারা পড়াই। বাজার-সদাই করে দেই। টিপকল
থেকে রোজ ছয় সাত বালতি পানি তুলে দেই। মোক্তার সাহেবের কাছে যখন
মক্কেলরা আসে তখন তিনি ঘন-ঘন তামাক খান। সেই তামাকও আমি সেজে
দেই। চাকর-বাকরের কাজ। আমি আনন্দের সঙ্গেই করি। মাঝে মাঝে মনটা
খুবই খারাপ হয়। দরজা বন্ধ করে একমনে কোরান শরিফ পড়ি। আল্লাহপাকের
ডেকে বলি— হে আল্লাহ, আমার একটা উপায় করে দেও। কত দিন আর
মানুষের বাড়িতে অনুদাস হয়ে থাকব।

আল্লাহপাক মুখ তুলে তাকালেন। সিদ্দিকুর রহমান সাহেব বলে এক
ব্যবসায়ী বলতে গেলে সেধে আমাকে চাকরি দিয়ে দিলেন। চালের আড়তে
হিসাবপত্র রাখা। মাসিক বেতন পাঁচ শ’ টাকা।

মোক্তার সাহেবকে সালাম করে খবরটা দিলাম। উনি খুবই খুশি হলেন। বললেন, ‘তোমাকে অনেকদিন ধরে দেখতেছি। তুমি সৎ স্বভাবের মানুষ। ঠিকমতো কাজ করো, তোমার আয়-উন্নতি হবে। আর রাতে তুমি আমার বাড়িতেই থাকো। তোমার কোনো অসুবিধা নাই। খাওয়া-দাওয়াও একইখানেই করবে। তোমাকে আমি ঘরের ছেলের মতোই দেখি।’

আনন্দে মনটা ভরে গেল। চোখে পানি এসে গেল। আমি মোক্তার সাহেবের কথামতো তাঁর বাড়িতেই থাকতে লাগলাম। ইচ্ছা করলে চালের আড়তে থাকতে পারতাম। মন টানল না। তা ছাড়া মোক্তার সাহেবের বাগানটা নিজের হাতে তৈরি করেছি। দিনের মধ্যে কিছুটা সময় বাগানে না থাকলে খুব অস্থির লাগে।

এক মাস চাকরির পর প্রথম বেতন পেলাম। পাঁচ শ’ টাকার বদলে সিদ্দিকুর রহমান সাহেব ছ’শ’ টাকা দিয়ে বললেন, ‘তোমার কাজকর্ম ভালো। এইভাবে কাজকর্ম করলে বেতন আরও বাড়িয়ে দিবো।’

আমার মনে বড় আনন্দ হলো। আমি তখন একটা কাজ করলাম। পাগলামিও বলতে পারেন। বেতনের সব টাকা খরচ করে মোক্তার সাহেবের স্ত্রী এবং তার তিন মেয়ের জন্যে। তিনটা শাড়ি কিনে ফেললাম। টাঙ্গাইলের সুতি শাড়ি। মোক্তার সাহেবের জন্যে একটি খদ্দরের চাদর।

মোক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন, ‘তোমার কি মাথাটা খারাপ? এইটা তুমি কী করলা? বেতনের প্রথম টাকা তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্যে জিনিস কিনবা, বাড়িতে টাকা পাঠাইরা।’

আমি বললাম, ‘মা আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নাই। আপনারাই আমার আত্মীয়-স্বজন।’

তিনি খুবই অবাক হয়ে বললেন, ‘কই কোনোদিন তো কিছু বলো নাই।’

‘আপনি জিজ্ঞেস করেন নাই— এইজন্যে বলি নাই। আমার বাবা-মা খুব ছোটবেলায় মারা গেছেন। আমি মানুষ হয়েছি এতিমখানায়। এতিমখানা থেকেই উলা পাস করেছি।’

উনি আমার কথায় মনে খুব কষ্ট পেলেন। উনার মনটা ছিল পানির মতো। সব সময় টলটল করে। উনি বললেন, ‘কিছু মনে নিও না। আমার আগেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। তুমি আমারে ‘মা’ ডাকো আর আমি তোমার সম্পর্কে কিছুই জানি না। এইটা খুবই অন্যায় কথা। আমার খুব অন্যায় হইছে।’

তিনি তাঁর তিন মেয়েকে ডেকে বললেন, ‘তোমরা এরে আইজ থাইক্যা নিজের ভাইয়ের মতো দেখবা। মনে করবা তোমরার এক ভাই। তার সামনে পর্দা করার দরকার নাই।’

এর মধ্যে একটা বিশেষ জরুরি কথা বলতে ভুলে গেছি— মোক্তার সাহেবের ছোট মেয়ে লতিফার কথা। এই মেয়েটা পরীর মতো সুন্দর। একটু পাগল ধরনের। নিজের মনে কথা বলে। নিজের মনে হাসে। যখন-তখন বাংলাঘরে চলে আসে। আমার সঙ্গে দুই-একটা টুকটাক কথাও বলে। অদ্ভুত সব কথা। একদিন এসে বলল, ‘এই যে মৌলানা সাব, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে আসছি। আচ্ছা বলেন তো, শয়তান পুরুষ না মেয়েছেলে?’

আমি বললাম, ‘শয়তান পুরুষ।’

লতিফা বলল, ‘আল্লা মেয়ে শয়তান তৈরি করেন নাই কেন?’

আমি বললাম, ‘তা তো জানি না। আল্লাহপাকের ইচ্ছার খবর কেমনে জানবো? আমি অতি তুচ্ছ মানুষ।’

‘কিন্তু শয়তান যে পুরুষ তা আপনি জানেন?’

‘জানি।’

‘আপনে ভুল জানেন। শয়তান পুরুষও না স্ত্রীও না। শয়তান আলাদা এক জাত।’

আমি মেয়েটার বুদ্ধি দেখে খুবই অবাক হই। এই রকম সে প্রায়ই করে। একদিনের কথা। ছুটির দিন। দুপুরবেলা। বাংলাঘরে আমি ঘুমাচ্ছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। অবাক হয়ে দেখি লতিফা আমার ঘরে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। লতিফা বলল, ‘আপনেরে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে আসছি। আচ্ছা বলেন তো—

হেন কোনো গাছ আছে এ ধরায়
স্থলে জলে কভু তাহা নাহি জন্মায়।’

আমি ধাঁধার জবাব না দিয়ে বললাম, ‘তুমি কখন আসছো?’

লতিফা বলল, ‘অনেকক্ষণ হইছে আসছি। আপনে ঘুমাইতেছিলেন, আপনারে জাগাই নাই। এখন বলেন— ধাঁধার উত্তর দেন,

হেন কোনো গাছ আছে এ ধরায়
স্থলে জলে কভু তাহা নাহি জন্মায়।’

আমি বললাম, ‘এইটার উত্তর জানা নাই।’

‘উত্তর খুব সোজা। উত্তর হইলো— পরগাছা। আচ্ছা আরেকটা ধরি বলেন দেখি...

পাকলে খেতে চায় না, কাঁচা খেতে চায়
এ কেমন ফল বল তো আমায়?’

মেয়েটার কাণ্ডকারখানায় আমায় ভয় ভয় লাগতে লাগল। কেন সে এই রকম করে? কেন বারবার আমার ঘরে আসে? লোকের চোখে পড়লে নানান কথা রটবে। মেয়ে যত সুন্দর তারে নিয়া রটনাও তত বেশি।

লতিফা আমার বিছানায় বসতে বসতে বলল, ‘কই বলেন এটার উত্তর কী—
পাকলে খেতে চায় না, কাঁচা খেতে চায়
এ কেমন ফল বল তো আমায়?’

বলতে পারলেন না! এটা হলো— শশা। পাকা শশা কেউ খায় না। সবাই
কাঁচা শশা চায়। আচ্ছা আপনার বুদ্ধি এত কম কেন? একটাও পারেন না।
আপনি একটা ধাঁধা ধরেন আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে দেব।’

‘আমি ধাঁধা জানি না লতিফা।’

‘আপনি কী জানেন? শুধু আল্লাহ আল্লাহ করতে জানেন, আর কিছু
জানেন?’

‘লতিফা তুমি এখন ঘরে যাও।’

‘ঘরেই তো আছি। এইটা ঘর না? এইটা কি বাহির?’

‘যখন-তখন তুমি আমার ঘরে আসো— এটা ঠিক না।’

‘ঠিক না কেন? আপনি কি বাঘ না ভালুক?’

আমি চুপ করে রইলাম। আধা-পাগল এই মেরেকে আমি কি বলব? এই
মেয়ে একদিন নিজে বিপদে পড়বে, আমাকেও বিশ্বদে ফেলবে। লতিফা বলল,
‘আমি যে মাঝে-মধ্যে আপনার এখানে আসি— সেইটা আপনার ভালো লাগে
না— ঠিক না?’

‘হ্যাঁ ঠিক।’

‘ভালো লাগে না কেন?’

‘নানান জনে নানান কথা বলতে পারে?’

‘কী কথা বলতে পারে? আপনার সঙ্গে আমার ভালোবাসা হয়ে গেছে? চুপ
করে আছেন কেন বলেন?’

‘তুমি এখন যাও লতিফা।’

‘আচ্ছা যাই। কিন্তু আমি আবার আসব। রাত দুপুরে আসব। তখন
দেখবেন— কী বিশ্বদে!’

‘কেন এই রকম করতেছো লতিফা?’

লতিফা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘যে ভয় পায় তাকে ভয় দেখাতে
আমার ভালো লাগে। এইজন্যে এ-রকম করি। আচ্ছা মৌলানা সাহেব, যাই।
আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বরকাতুহু হি-হি-হি।’

ভাই, আপনার কাছে সত্য কথা গোপন করব না। সত্য গোপন করা বিরাট
অন্যায়। আল্লাহপাক সত্য গোপনকারীকে পছন্দ করেন না। চাকরি পাওয়ার
পরেও আমি মোক্তার সাহেবের বাড়িতে থেকে গেলাম শুধু লতিফার জন্যে।
তারে দেখার জন্যে মনটা ছটফট করত। মনে-মনে অপেক্ষা করতাম কোন
সময় তারে একনজর হলেও দেখব। তার পায়ের শব্দ শুনলেও বুক ধড়ফড়
করত। রাত্রে ভালো ঘুম হতো না। শুধু লতিফার কথা ভাবতাম। বলতে খুব

শরম লাগছে ভাইসাব তবু বলি— লতিফার চুলের একটা কাঁটা আমি সব সময় আমার সঙ্গে রাখতাম। আমার কাছে মনে হতো এইটা চুলের কাঁটা না। সাতরাজার ধন। আমি আল্লাহপাকের দরবারে কান্নাকাটি করতাম। বলতাম, ‘হে পরোয়ারদিগার, হে গাফুরুর রহিম, তুমি আমাকে একী বিপরে ফেললাদ। তুমি আমারে উদ্ধার করো।’

আল্লাহপাক আমাকে উদ্ধার করলেন। লতিফার বিবাহের প্রস্তাব আসলো। ছেলে এমবিবিএস ডাক্তার। বাড়ি গৌরিপুর। ভালো বংশ। খান্দানি পরিবার। ছেলে নিজে এসে মেয়ে দেখে গেল। মেয়ে তার খুব পছন্দ হলো। পছন্দ না হওয়ার কোনো কারণ নাই। লতিফার মতো রূপবতী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। ছেলেও দেখতে শুনতে ভালো। শুধু গায়ের রংটা একটু ময়লা। কথায়-বার্তায়ও ছেলে অতি ভদ্র। বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেল। বারোই শ্রাবণ। শুক্রবার দিবাগত রাতে বিবাহ পড়ান হবে।

আমার মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। আমি জানি এই মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কোথায় সে, আর কোথায় আমি। চাকর-শ্রেণীর আশ্রিত একজন মানুষ আমি। জমিজমা নাই, আত্মীয়-স্বজন নাই, সহায়-সম্বল নাই। তার জন্যে আমি কোনোদিন আফসোস করি নাই। আল্লাহপাক যাকে যা দেন তাই নিয়াই সন্তুষ্ট থাকতে হয় আমিও ছিলাম। কিন্তু যেদিন লতিফার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেল সেদিন কী যে কষ্ট লাগল বলে আপনাকে বুঝাতে পারব না! সারাক্ষতি শহরের পথে পথে ঘুরলাম। জীবনে কোনোদিন নামাজ ক্বাজা করি নাই। এই প্রথম এশার নামাজ ক্বাজা করলাম। ফজরের নামাজ ক্বাজা করলাম। এতদিন পরে বলতে লজ্জা লাগছে— আমার প্রায় মাথা খারাপের মতো হয়ে গিয়েছিল। ভোরবেলা মোক্তার সাহেবের বাসায় গেলাম। সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এইখানে আর থাকব না। বাজারে চালের আড়তে থাকব। মোক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন, ‘এখন যাবে কেন বাবা? মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। কত কাজকর্ম। কাজকর্ম শেষ করে তারপর যাও।’

আমি মিথ্যা কথা বলি না। প্রথম মিথ্যা বললাম। আমি বললাম, ‘মা, সিদ্দিকুর রহমান সাহেব আমাকে আজই দোকানে গিয়ে উঠতে বলেছেন— উনি আমার মনিব। অনুদাতা। উনার কথা না রাখলে অন্যায় হবে। বিয়ের সময় আমি চলে আসব। কাজকর্মের কোনো অসুবিধা হবে না, মা।’

সবার কাছ থেকেই বিদায় নিলাম। লতিফার কাছ থেকে বিদায় নিতে পারলাম না। সে যখন সামনে এসে দাঁড়াল তখন চোখ তুলে তার দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারলাম না।

লতিফা বলল, ‘চলে যাচ্ছেন?’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’

‘কেন, আমরা কি কোনো দোষ করেছি?’

‘ছিঃ ছিঃ! দোষ করবে কেন?’

‘আচ্ছা, যাওয়ার আগে এই ধাঁধাটা ভাঙিয়ে দিয়ে যান। বলেন দেখি—

ছাই ছাড়া শোয় না,

লাথি ছাড়া উঠে না।

এই জিনিস কি?’

‘জানি না লতিফা।’

‘এত সহজ জিনিস পারলেন না? এটা হলো কুকুর। আচ্ছা যান। দোষ-ঘাট
হলে— ক্ষমা করে দি়েন।’

আমি আড়তে চলে আসলাম।

রাত আটটার দিকে মোক্তার সাহেব লোক পাঠিয়ে আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে
গেলেন। তিনি শোবার ঘরে চেয়ারে বসে ছিলেন। আমাকে সেইখানে নিয়ে
যাওয়া হলো। আমি খুবই অবাক হলেম। একটু ভয় ভয়ও করতে লাগল।
তাকিয়ে দেখি— মোক্তার সাহেবের স্ত্রী খাটে বসে আছেন। নিঃশব্দে কাঁদছেন।
আমি কিছুই বুঝলাম না। বুক ধড়ফড় করতে লাগল। না জানি কী হয়েছে।

মোক্তার সাহেব বললেন, ‘তোমাকে আমি পুত্রের মতো স্নেহ করেছি। তার
বদলে তুমি এই করলে? দুধ দিয়ে কামসাপ পোষার কথা শুধু শুনেছি। আজ
নিজের চোখে দেখলাম।’

আমি মোক্তার সাহেবের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘মা, আমি কিছুই
বুঝতেছি না।’

মোক্তার সাহেব চোখা করে বললেন, ‘বোকা সাজার দরকার নাই। বোকা
সাজবা না। তুমি যা করেছো তা তুমি ভালোই জানো। তুমি পথের কুকুরেরও
অধম।’

আমি বললাম, ‘আমার কী অপরাধ দয়া করে বলেন।’

মোক্তার সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, ‘মেথরপড়িতে যে শূয়ের
থাকে তুই তার চেয়েও অধম, তুই নর্দমার ময়লা— বলতে বলতে তিনিও
কেঁদে ফেললেন।’

মোক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন, ‘লতিফা সবই আমাদের বলেছে— কিছুই
লুকায় নাই। এখন এই অপমান, এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়
লতিফার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেয়া। তুমি তাতে রাজি আছ? না মেয়ের সর্বনাশ
করে পালানোই তোমার ইচ্ছে?’

আমি বললাম, ‘মা, আপনি কী বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না!
লতিফা কী বলেছে আমি জানি না। তবে আপনারা যা বলবেন— আমি তা-ই

করব। আল্লাহপাক উপরে আছেন। তিনি সব জানেন, আমি কোনো অন্যায় করি নাই, মা।’

মোক্তার সাহেব চিৎকার করে বললেন, ‘চুপ থাক্ শূয়োরের বাচ্চা। চুপ থাক।’

সেই রাতেই কাজী ডাকিয়ে বিয়ে পড়নো হলো। বাসররাতে লতিফা বলল, ‘আমি একটা অন্যায় করেছি— আপনার সাথে যেন বিবাহ হয় এইজন্যে বাবা-মাকে মিথ্যা করে বলেছি— আমার পেটে সন্তান আছে। বিরাট অপরাধ করেছি, আপনার কাছে ক্ষমা চাই।’

আমি বললাম, ‘লতিফা আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করলাম। তুমি আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা চাও।’

‘আপনি ক্ষমা করলেই আল্লাহ ক্ষমা করবেন। তা ছাড়া আমি তেমন বড় অপরাধ তো করি নাই। সামান্য মিথ্যা বলেছি। আপনাকে বিবাহ করার জন্যে অনেক বড় অপরাধ করার জন্যেও আমি তৈরি ছিলাম। আমি এখন বলেন এই ধাঁধাটির মানে কী—

আমার একটা পাখি আছে
যা দেই সে খায়।
কিছুতেই মরে না পাখি
জলে মারা যায়।’

বুঝলেন ভাই সাহেব, আল্লাহ আমার চোখে পনি এসে গেল। এই আনন্দের কোনো সীমা নাই। আমার মতো নাদান মানুষের জন্যে আল্লাহপাক এত আনন্দ রেখে দিয়েছেন আমি কল্পনাও করি নাই। আমি কতবার যে বললাম, আল্লাহপাক আমি তোমার নেয়ামত স্বীকার করি। আমি তোমার নেয়ামত স্বীকার করি।

বিয়ের পর আমি শ্বশুরবাড়িতেই থেকে গেলাম। আমার এবং লতিফার বড় দুঃখে সময় কাটতে লাগল। শ্বশুরবাড়ির কেউ আমাদের দেখতে পারে না। খুবই খারাপ ব্যবহার করে। আমার শাণ্ডি দিনরাত লতিফাকে অভিশাপ দেন, ‘মর্ মর্। তুই মর্।’

আমার শ্বশুর সাহেব একদিন আমাকে ডেকে বললেন, ‘সকাল বেলায় তুমি আমার সামনে আসবা না। সকাল বেলায় তোমার মুখ দেখলে আমার দিন খারাপ যায়।’

শ্বশুরবাড়ির কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। তারা একসঙ্গে খেতে বসে। সেখানে আমার যাওয়া নিষেধ। সবার খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে লতিফা থালায় করে আমার জন্যে ভাত নিয়ে আসে। সেই ভাত আমার গলা দিয়ে নামতে চায় না।

লতিফা রোজ বলে, ‘চলো, অন্য কোথাও যাই গিয়া।’

আমি চুপ করে থাকি। কই যাব বলেন? আমার কি যাওয়ার জায়গা আছে? যাওয়ার কোনো জায়গা নাই। লতিফা খুব কান্নাকাটি করে।

একদিন খুব অপমানের মধ্যে পড়লাম। আমার শ্বশুর সাহেবের পাঞ্জাবির পকেট থেকে এক হাজার টাকা চুরি গেছে। তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, ‘এই যে দাড়িওয়ালা, তুমি কি আমার টাকা নিয়েছ?’

আমার চোখে পানি এসে গেল। এ-কী অপমানের কথা! আমি দরিদ্র। আমার যাওয়ার জায়গা নাই— সবই সত্য, কিন্তু তাই বলে আমি কি চোর? ছিঃ ছিঃ!

শ্বশুর সাহেব বললেন, ‘কথা বলো না কেন?’

আমি বললাম, ‘আমারে অপমান কইরেন না। যত ছোটই হই আমি আপনার কন্যার স্বামী।’

শ্বশুর সাহেব বললেন, ‘চুপ কর। চোর আবার ধর্মের কথা বলে।’

লতিফা সেইদিন থেকে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিলো। সে বলল, ‘এই বাড়ির ভাত সে মুখে দিবে না।’

আমার শাশুড়ি বললেন, ‘ঢং করিস্ না। এই বাড়ির ভাত ছাড়া তুই ভাত পাবি কই?’

দুই দিন দুই রাত গেল লতিফা পানি ছাড়া কিছুই মুখে দেয় না। আমাকে বলে, ‘তুমি আমারে অন্য কোথাও নিয়ে চলো। দরকার হইলে গাছতলায় নিয়ে চলো। এই বাড়ির ভাত আমি মুখে দিবো না।’

আমি মহাবিপদে পড়লাম।

সারারাত আল্লাহের অকলাম। ফজরের নামাজের শেষে আল্লাহপাকের দরবারে হাত উঠিয়ে বললাম, ‘হে মাবুদ! হে পাক পরোয়ারদিগার-! তুমি ছাড়া আমি কার কাছে যাব? আমার দুঃখের কথা কারে বলব? কে আছে আমার? তুমি আমারে বিপদ থাইক্যা বাঁচাও।’

আল্লাহপাক আমার প্রার্থনা শুনলেন।

ভোরবেলায় চালের আড়তে গিয়েছি। সিদ্দিকুর রহমান সাহেব আমারে ডেকে বললেন, ‘এই যে মৌলানা, আমার একটা উপকার করতে পারবে?’

আমি বললাম, ‘জি জনাব বলেন।’

‘ময়মনসিংহ শহরে আমি নতুন বাড়ি করেছি। এখন থেকে ঐ বাড়িতে থাকব। সপ্তাহে সপ্তাহে এইখানে আসব। নেত্রকোনায় আমার যে বাড়ি আছে— তুমি কি সেই বাড়িতে থাকতে পারবে? নেত্রকোনার বাড়ি আমি বিক্রি করতে চাই না। শুনলাম তুমি বিবাহ করেছ— তুমি এবং তোমার স্ত্রী দু’জন মিলে থাকো।’

আমি বললাম, ‘জনাব আমি অবশ্যই থাকব।’

‘তাহলে তুমি এক কাজ করো, আজকেই চলে আসো। একতলার কয়েকটা ঘর নিয়ে তুমি থাকো। দু’তলার ঘর তালাবন্ধ থাকুক।’

‘জি আচ্ছা।’

‘বাড়িটা শহর থেকে দূরে। তবে ভয়ের কিছু নেই, একজন দারোয়ান আছে। চব্বিশ ঘণ্টা থাকবে। দারোয়ানের নাম— বলরাম। ভালো লোক।’

‘জনাব আমি আজকেই উঠব।’

সেইদিন বিকালেই সিদ্দিক সাহেবের বাড়িতে এসে উঠলাম। বিরাট বাড়ি। বাড়ির নাম ‘সরজুবালা হাউস।’ হিন্দুবাড়ি ছিল। সিদ্দিক সাহেবের বাবা কিনে নিয়েছিলেন।

আট ইঞ্চি ইটের দেয়ালে বাড়ির চারদিক ঘেরা। দোতলা পাকা দালান। বিরাট বড় বড় বারান্দা। দেয়ালের ভেতরে নানান জাতের গাছগাছড়া। দিনের বেলায়ও অন্ধকার হয়ে থাকে।

আমি লতিফাকে বললাম, ‘বাড়ি পছন্দ হয়েছে লতিফা?’

লতিফা আনন্দে কেঁদে ফেলল। দুইদিন খাওয়া-দাওয়া না করায় লতিফার শরীর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চোখ ছোট ছোট, ঠোঁট কালচে। মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। এই অবস্থাতেই সে রান্নাবান্না করছে। অতি সামান্য আয়োজন। ভাত ডাল পেঁপে ভাজা। খেতে অমৃতের মতো লাগল ভাই সাহেব।

খাওয়া-দাওয়ার পর দু’জনে হাতধরাধরি করে বাগানে হাঁটলাম। হাসবেন না ভাইসাব, তখন আমাদের বয়স ছিল অল্প। মন ছিল অন্য রকম। হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হলো এই দুনিয়াতে আল্লাহপাক আমার মতো সুখী মানুষ তৈরি করেন নাই। আনন্দে ঝরঝর চোখে পানি এসে যাচ্ছিল ভাই সাহেব।

ক্লান্ত হয়ে একসময় একটা লিচুগাছের নিচে আমরা বসলাম। লতিফা বলল, ‘আমি যে মিথ্যা কথা বলিলা আপনেনে বিবাহ করছি এই জন্যে কি আমার উপর রাগ করছেন?’

আমি বললাম, ‘না লতিফা। আমার মতো সুখী মানুষ নাই।’

‘যদি সুখী হন তাহলে এই ধাঁধাটা পারেন কিনা দেখেন। বলেন দেখি—

কাটলে বাঁচে, না কাটলে মরে

এমন সুন্দর ফল কোন গাছেতে ধরে?’

‘পারলাম না লতিফা।’

‘ভালোমতো চিন্তা কইরা বলেন। এইটা পারা দরকার। খুব দরকার—

কাটলে বাঁচে, না কাটলে মরে

এমন সুন্দর ফল কোন গাছেতে ধরে?’

‘পারব না লতিফা। আমার বুদ্ধি কম।’

‘এইটা হইলো সন্তানের নাড়ি কাটা। সন্তানের জন্মের পর নাড়ি কাটলে সন্তান বাঁচে। না কাটলে বাঁচে না। আচ্ছা, এই ধাঁধাটা আপনাদের কেন জিজ্ঞেস করলাম বলেন তো?’

‘তুমি বলো। আমার বিচার-বুদ্ধি খুবই কম।’

‘এইটা আপনাদের বললাম— কারণ আমার সন্তান হবে।’

লতিফা লজ্জায় দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। কী যে আনন্দ আমার হলো ভাই সাহেব! কী যে আনন্দ!

সেই রাতে লতিফার জ্বর আসলো।

বেশ ভালো জ্বর। আমি জ্বরের খবর রাখি না। ঘুমুচ্ছি। লতিফা আমাকে ডেকে তুলল। বলল, ‘আমার খুব ভয় লাগতেছে। একটু উঠেন তো।’

আমি উঠলাম। ঘর অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। হারিকেন জ্বালিয়ে রেখে শুয়েছিলাম। বাতাসে নিভে গেছে। হারিকেন জ্বালালাম।

তাকিয়ে দেখি লতিফার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। সে ফিসফিস করে বলল, ‘ছাদের বারান্দায় কে যেন হাঁটে।’

আমি শোনার চেষ্টা করলাম। কিছু শুনলাম না।

লতিফা বলল, ‘আমি স্পষ্ট শুনেছি। একবার না অনেকবার শুনেছি। জুতা পায়ে দিয়া হাঁটে। জুতার শব্দ হয়। হাঁটার শব্দ হয়।’

‘বোধহয় দারোয়ান।’

‘না দারোয়ান না। অন্য কেউ।’

‘কী করে বুঝলো অন্য কেউ?’

‘বললাম না— জুতার শব্দ। দারোয়ান কি জুতা পরে?’

‘তুমি থাকো। আমি খোজ নিয়া আসি?’

‘না, না। এইখানে একা থাকলে আমি মরে যাব।’

আমি লতিফার হাত ধরে বসে রইলাম। এই প্রথম বুঝলাম লতিফার খুব জ্বর। জ্বর আরও বাড়ল। একসময় জ্বর নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন আমি নিজেই শব্দটা শুনলাম। ঝনঝন শব্দ। জুতার শব্দ না। অন্যরকম শব্দ। ঝন-ঝন-ঝন-ঝন।

একমনে আয়াতুল কুরসি পড়লাম।

তিনবার আয়াতুল কুরসি পড়ে হাত তালি দিলে— সেই হাত তালির শব্দ যতদূর যায় ততদূর কোনো জিন-ভূত আসে না। হাত তালি দেয়ার পর ঝনঝন শব্দ কমে গেল, তবে পুরোপুরি গেল না। আমি সারারাত জেগে কাটলাম।

ভোরবেলা সব স্বাভাবিক।

রাতে যে এত ভয় পেয়েছিলাম মনেই রইল না। লতিফার গায়েও জ্বর

নাই। সে ঘর-দুয়ার গুছাতে শুরু করল। একতলার সর্বদক্ষিণের দু'টা ঘর আমরা নিয়েছি। বারান্দা আছে। কাছেই কলঘর। লতিফা নিজের সংসার ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দারোয়ান বলরাম সাহায্য করার জন্যে চলে আসলো। বলরামের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। আদি বাড়ি নেপালে। দশ বছর বাংলাদেশে এসেছে। আর ফিরে যায়নি। এখন পুরোপুরি বাঙালি। বাঙালি একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল। সে মেয়ে মরে গেছে। বলরামের এক ছেলে আছে। খুলনার এক ব্যাংকের দারোয়ান। ছেলে বিয়ে-শাদি করেছে। বাবার কোনো খোঁজখবর করে না।

বলরামের সঙ্গে অতি অল্প সময়ে লতিফার ভাব হয়ে গেল। বলরাম লতিফাকে মা ডাকা শুরু করল। আমি নিশ্চিত হয়ে দোকানে চলে গেলাম। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বাড়িতে ঢুকে দেখি বারান্দায় পা ছড়িয়ে লতিফা বসে আছে। তার মুখ শুকনা। আমি বললাম, 'কী হয়েছে?'

'ভয় লাগছে।'

'কীসের ভয়?'

'বিকেলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।'

'কী স্বপ্ন?'

'দেখলাম আমি ঘুমাচ্ছি। একটা পল্লী, কালো এবং খুব মোটা লোক ঘরে ঢুকল। লোকটার সারা শরীরে বড় বড় লোম। কোনো দাঁত নেই। চোখগুলো অসম্ভব ছোট ছোট, দেখাই যায় না—এ রকম। হাতের খাবাগুলিও খুব ছোট। বাচ্চা ছেলেদের মতো। আমি লোকটাকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। সে বলল, এই ভয় পাস কেন? আমার নাম কফিল। আমি তো তোর সাথেই থাকি। তুই টের পাস না? তুই বিয়ে করেছিস আমি কিছু বলি নাই। এখন আবার সন্তান হবে। ভালোমতো শুনে রাখ—তোর সন্তানটাকে আমি শেষ করে দিবো। এখনি শেষ করতাম। এখন শেষ করলে তোর ক্ষতি হবে। এইজন্যে কিছু করছি না। সন্তান জন্মের সাতদিনের ভিতর আমি তারে শেষ করব। এই বলেই সে আমারে ধরতে আসলো। আমি চিৎকার করে জেগে উঠলাম। তারপর থেকে এইখানে বসে আছি।'

আমি বললাম, 'স্বপ্ন হলো স্বপ্ন। কত খারাপ খারাপ স্বপ্ন মানুষ দেখে। সবচেয়ে বেশি খারাপ স্বপ্ন দেখে পোয়াতি মেয়েছেলে। তাদের মনে থাকে মৃত্যুভয়।'

কথাবার্তা বলে লতিফাকে মোটামুটি স্বাভাবিক করে তুললাম। সে ঘরের কাজকর্ম করতে লাগল। রান্না করল। আমরা সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া

করলাম। তারপর বাগানে হাঁটতে বের হলাম। লতিফা বলল, ‘এই বাড়িতে একটা দোষ আছে সেইটা কি আপনি জানেন?’

‘কী দোষ?’

‘এই বাড়িতে একটা খারাপ কুয়া আছে। সিদ্দিক সাহেবের চার বছর বয়সের একটা ছোট মেয়ে কুয়ায় পড়ে মারা গিয়েছিল। কুয়াটা দোষী।’

‘কী যে তুমি বলো! কুয়া দোষী হবে কেন? বাচ্চা মেয়ে খেলতে খেলতে পড়ে গেছে।’

‘তা না, কুয়াটা আসলেই দোষী।’

‘কে বলেছে?’

‘বলরাম বলেছে! কুয়াটার মুখ সিদ্দিক সাহেব টিন দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। সেই টিনে রাতের বেলা ঝনঝন শব্দ হয়। মনে হয় ছোট কোনো বাচ্চা টিনের উপরে লাফায়। তুমি গত রাতে কোনো ঝনঝন শব্দ শোনো নাই?’

আমি মিথ্যা করে বললাম, ‘না।’

‘আমি কিন্তু শুনেছি।’

আমি বলরামের ওপর খুব বিরক্ত হলাম। এইসব গল্প বলে ভয় দেখানোর কোনো মানে হয়? ঠিক করলাম ভোরবেলায় আঁকে ডেকে শক্তভাবে ধমক দিয়ে দেব।

রাতে ঘুমুতে যাবার সময় লক্ষ করলাম লতিফার জ্বর এসেছে। সে কেমন ঝিম মেরে গেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। হারিকেন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমুতে গেলাম। গভীর রাতে গুম ভাঙল। লতিফা আমাকে ঝাঁকাচ্ছে। ঘর অন্ধকার। লতিফা বলল, ‘হারিকেন আপনা-আপনি নিভে গেছে। আমার বড় ভয় লাগতেছে।’

আমি হারিকেন জ্বাললাম। আর তখনই ঝনঝন শব্দ পেলাম। একবার না, বেশ কয়েক বার।

লতিফা ফিসফিস করে বলল, ‘শব্দ শুনলেন?’

আমি জবাব দিলাম না। লতিফা কাঁদতে লাগল।

যতই দিন যেতে লাগল লতিফার অবস্থা ততই খারাপ হতে লাগল। রোজ সে কফিলকে স্বপ্ন দেখে। কফিল তাকে শাসিয়ে যায়। বারবার মনে করিয়ে দেয়— বাচ্চা হওয়ার সাতদিনের মধ্যে সে বাচ্চা নিয়ে নিবে। মনের শান্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল।

আমি লতিফাকে তার বাবার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলাম, সে রাজি হলো না। প্রয়োজনে সে এইখানেই মরবে কিন্তু বাবার বাড়িতে যাবে না। আমি তার জন্যে তাবিজ-কবচের ব্যবস্থা করলাম, বাড়ি বন্ধের ব্যবস্থা করলাম। আমি

দরিদ্র মানুষ। তবু একটা কাজের মেয়ের ব্যবস্থা করলাম যেন সে সারাক্ষণ লতিফার সঙ্গে থাকে।

কিছুতেই কিছু হলো না।

এক সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে দেখি— লতিফা খুব সাজগোজ করেছে। লাল একটা শাড়ি পড়েছে। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করেছে। বেণী করে চুল বেঁধেছে। বেণীতে চার-পাঁচটা জবা ফুল। সে পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে আছে। একটু দূরে বলরাম এবং কাজের মেয়েটা। তারা দু'জন ভীত চোখে তাকিয়ে আছে লতিফার দিকে।

আমাকে দেখেই লতিফা খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসি আর থামতেই চায় না। আমি বললাম, 'কী হয়েছে লতিফা?' লতিফা হাসি থামাল এবং আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে পুরুষের গলায় বলল, 'মৌলানা আসছে। মৌলানারে অজুর পানি দেও। নামাজের পাটি দেও। কেবলা কোন দিকে দেখাইয়া দাও। টুপি দেও, তসবি দেও।'

আমি বললাম, 'এই রকম করতেছো কেন লতিফা?'

লতিফা আবার হাসতে হাসতে ভেসে পড়ে বলল, 'ওমা, মেয়েছেলের সঙ্গে দেখি মৌলানা কথা বলে। হিঃ হিঃ হিঃ! মৌলানার লজ্জা নাই।'

আমি আয়তুল কুরসি পড়া শুরু করলাম।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে লতিফা পট্টাঙ্কর করে বলল, 'চুপ করো। আমার নাম কফিল। তোর মতো মৌলানা আমি দশটা হজম কইরা রাখছি। গোটা কোরান শরিফ আমার মুখস্থ। আমার সঙ্গে পাল্লা দিবে? আয়, পাল্লা দিলে আয়। প্রথম থাইকা শুরু করি... হি-হি-হি। ভয় পাইছস? ভয় পাওনেরই কথা। বেশি ভয় পাওনের দরকার নাই। তোরে আমি কিছু বলব না। তোর বাচ্চাটারে শেষ করব। তুই মৌলানা মানুষ। তুই বাচ্চা দিয়া কি করবি? তুই থাকবি মসজিদে। মসজিদে বইস্যা তুই তোর আল্লারে ডাকবি। পুলাপান না থাকাই তোর জন্যে ভালো। হি-হি-হি-।'

একটা ভয়ঙ্কর রাত পার করলাম ভাইসাব। সকালে দেখি সব ঠিকঠাক। লতিফা ঘরের কাজকর্ম করেছে। এইভাবে দিন পার করতে লাগলাম। কখনো ভালো, কখনো মন্দ।

লতিফা যখন আট মাসের পোয়াতি তখন আমি হাতে-পায়ে ধরে আমার শাশুড়িকে এই বাড়িতে নিয়া আসলাম। লতিফা খানিকটা শান্ত হলো। তবে আগের মতো সহজ স্বাভাবিক হলো না। চমকে চমকে ওঠে। রাতে ঘুমাতে পারে না। ছটফট করে। মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে। সেই দুঃস্বপ্নে

কফিল এসে উপস্থিত হয়। কফিল চাপা গলায় বলে, দেরি নাই, আর দেরি নাই। পুত্রসন্তান আসতাছে। সাতদিনের মধ্যে নিয়ে যাব। কান্দাকাটি যা করার কইরা নেও। ঘুম ভেঙে লতিফা জেগে ওঠে। চিৎকার করে কাঁদে। আমি চোখে দেখি অন্ধকার। কী করব কিছুই বুঝি না।

শ্রাবণ মাসের তিন তারিখে লতিফার একটি সন্তান হলো। কী সুন্দর যে ছেলেটা হলো ভাইসাহেব, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না! চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রং। টানাটানা চোখ। আমি এক শ' রাকাত শোকরানা নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে আমার সন্তানের হায়াত চাইলাম। আমার মনের অস্থিরতা কমলো না।

আঁতুর ঘরের বাইরে একটা বেঞ্চ পেতে রাতে শুয়ে থাকি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন আমার শাণ্ডি আর আমার স্ত্রীর দূর-সম্পর্কের এক খালাত বোন। পালা করে কেউ না কেউ সারারাত জেগে থাকি।

লতিফার চোখে এক ফোঁটাও ঘুম নাই। সন্তানের মা সারাক্ষণ বাচ্চা বুকের নিচে আড়াল করে রাখে। এক মুহূর্তের জন্যে চোখের আড়াল করে না। আমার শাণ্ডি যখন বাচ্চা কোলে নেন তখনও লতিফা বাচ্চাটার গায়ে হাত দিয়ে রাখে যেন কেউ নিয়ে যেতে না পারে।

ছয় দিনের দিন কি হলো শোনে।

ঘোর বর্ষা। সারা দিন বৃষ্টি হয়েছে। সন্ধ্যার পর আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল। এ-রকম বর্ষা আমি আমার জীবনে দেখি নাই।

লতিফা আমাকে বলল, 'আইজ রাইতটা আপনে জাগনা থাকবেন। আমার কেমন জানি লাগতেছে।'

আমি বললাম, 'কেমন লাগতেছে?'

'জানি না। একটু পরে পরে শরীর কাঁপতেছে।'

'তুমি নিশ্চিত হইয়া থাকো। আমি সারা রাইত জাগনা থাকবো।'

'আপনে একটু বলরামরেও খবর দেন। সেও যেন জাগনা থাকে।'

আমি বলরামকে খবর দিলাম। লতিফা বাচ্চাটারে বুকের নিচে নিয়া শুইয়া আছে। আমি একমনে আল্লাহপাকেরে ডাকতেছি। জীবন দেয়ার মালিক তিনি। জীবন নেয়ার মালিকও তিনি।

রাত তখন কত আমি জানি না ভাই সাহেব। ঘুমায়ে পড়েছিলাম। লতিফার চিৎকারে ঘুম ভাঙল। সে আসমান ফাটাইয়া চিৎকার করতেছে। আমার বাচ্চা কই গেল। আমার বাচ্চা কই। দুইটা হারিকেন জ্বালানো ছিল। দুইটাই নিভানো। পুরা বাড়ি অন্ধকার। কাঁপতে কাঁপতে হারিকেন জ্বালালাম। দেখি, সত্যি বাচ্চা নাই। আমার শাণ্ডি ফিট হয়ে পড়ে গেলেন।

লতিফা ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ছুটে গেল কুয়ার দিকে।

কুয়ার উপর টিন দিয়া ঢাকা ছিল। তাকায়ে দেখি টিন সরানো। লতিফা চিৎকার করে বলছে— আমার বাচ্চায়ে কুয়ার ভিতর ফলাইয়া দিছে। আমার বাচ্চা কুয়ার ভিতরে। লতিফা লাফ দিয়ে কুয়াতে নামতে চাইল। আমি তাকে জড়ায়ে ধরলাম।

ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন। কপালের ঘাম মুছলেন। আমি বললাম, ‘বাচ্চাটা কি সত্যি কুয়াতে ছিল?’

‘জি।’

‘আর দ্বিতীয় বাচ্চা। সেও কি এইভাবে মারা যায়?’

‘জি-না জনাব। আমার দ্বিতীয় সন্তান বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে।’

‘সিদ্দিক সাহেবের ঐ বাড়ি তাহলে আপনি ছেড়ে দেন?’

‘জি। তাতে অবশ্য লাভ হয় না। কফিলের মজুরি কমে না। দ্বিতীয় সন্তানটাকেও সে মারে। জন্মের চারদিনের দিন..’

আমি আঁতকে উঠে বললাম, ‘থাক ভাই আমি শুনতে চাই না। গল্পগুলো আমি সহ্য করতে পারছি না।’

ইমাম সাহেব বললেন, ‘আল্লাহপাক আরেকটা সন্তান দিতেছেন। কিন্তু এই সন্তানটাকেও বাঁচাতে পারব না। শিশুটা বড়ই খারাপ ভাই সাহেব। বড়ই খারাপ। আমি কতবার চিৎকার করে বলেছি— কফিল, তুমি আমারে মেরে ফেলো। আমার সন্তানরে মেরো না। এই সুন্দর দুনিয়া তারে দেখতে দাও।’

ইমাম সাহেব কাঁদতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্তব্ধ হলো। ইমাম সাহেব ফজরের নামাজের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

সেইদিন ভোরেই আমি সফিককে নিয়ে ঢাকায় চলে এলাম। সফিকের আরও কিছুদিন থেকে কালু খাঁ রহস্যভেদ করে আসার ইচ্ছা ছিল। আমি তা হতে দিলাম না। ইমাম সাহেবের সঙ্গে আরও কিছু সময় থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

৩

সাধারণত আমি আমার জীবনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার গল্প মিসির আলির সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র বলি। মজার ব্যাপার হচ্ছে— ইমাম সাহেবের এই গল্প তাকে বলা হলো না।

ঢাকায় ফেরার তিনদিনের মাথায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। নানান কথাবার্তা হলো, এটা বাদ পড়ে গেল।

দু'মাস পর মিসির আলি আমার বাসায় এলেন। রাতে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলাম। তিনি প্রায় দু'ঘণ্টা কাটিয়ে বাড়ি চলে গেলেন— ইমাম সাহেবের গল্প বলা হলো না। তিনি চলে যাবার পর মনে হলো, ইমাম সাহেবের গল্পটা তো তাঁকে শোনানো হলো না।

আমি আমার মেয়েকে বলে রাখলাম যে, এরপরে যদি কখনো মিসির আলি সাহেব আমাদের বাসায় আসেন সে যেন আমার কানের কাছে 'ইমাম' বলে একটা চিৎকার দেয়। আমার এই মেয়ের স্মৃতিশক্তি বেশ ভালো। সে যে যথাসময়ে 'ইমাম' বলে চিৎকার দেবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

হলোও তাই। অনেকদিন পর মিসির আলি সাহেব এসেছেন। তাঁর সঙ্গে গল্প করেছি, আমার মেয়ে কানের কাছে এসে বিকট চিৎকার দিলো। এমন চিৎকার যে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। মেয়েকে কড়া শাস্তি দিলাম। মেয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, 'তুমি তো বলেছিলে মিসির আলি এলে— 'ইমাম' বলে চিৎকার করতে।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কানের পর্দা ঘষটিয়ে দিতে তো বলিনি। যাও, এখন যাও তো।'

মিসির আলি বললেন, 'ব্যাপারটা কী?'

আমি বললাম, 'তেমন কিছু না। আপনাকে একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাচ্ছিলাম। একজন ইমাম সাহেবের গল্প। আপনার সঙ্গে দেখা হয় কিন্তু গল্পটা বলার কথা মনে থাকে না। মেয়েকে মনে করিয়ে দিতে বলেছি। সে এমন চিৎকার দিয়েছে, এখন মনে হচ্ছে বাঁ কানে কিছু শুনতে পারছি না।'

মিসির আলি বললেন, 'গল্পটা কী বলুন শুন।'

'আজ থাক। আরেকদিন বলবো। একটু সময় লাগবে। লম্বা গল্প।'

মিসির আলি বললেন, 'আরেক কাপ চা দিতে বলুন। চা খেয়ে বিদেয় হই।'

চায়ের কথা বলে মিসির আলির সামনে এসে বসলাম। মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'ইমাম সাহেবের গল্পটা আপনি আমাকে কখনোই বলতে পারবেন না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

'আপনার মস্তিষ্কের একটা অংশ আপনাকে গল্পটা বলতে বাধা দিচ্ছে। যে কারণে অনেকদিন থেকেই আপনি আমাকে গল্পটা বলতে চান অথচ বলা হয় না। আপনার মনে থাকে না। আজ আপনাকে মনে করিয়ে দেয়া হলো। এবং

মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে আপনি রেগে গেলেন। তার চেয়ে বড় কথা— মনে করে দেবার পরেও আপনি গল্পটি বলতে চাচ্ছেন না অজুহাত বের করেছেন, বলছেন লম্বা গল্প। আমি নিশ্চিত, আপনার অবচেতন মন চাচ্ছে না— এই গল্প আপনি আমাকে বলুন। আপনার সাব-কনসাস মাইন্ড আপনাকে বাধা দিচ্ছে।’

‘আমার সাব-কনসাস মাইন্ড আমাকে বাধা দিচ্ছে কেন?’

‘আমি তা বুঝতে পারছি না। গল্পটা শুনে বুঝতে পারব। চা আসুক। চা খেতে খেতে আপনি বলা শুরু করুন। আমার সিগারেটও ফুরিয়েছে। কাউকে দিয়ে কয়েকটা সিগারেট আনিয়ে দিন।’

আমি আর কোনো অজুহাতে গেলাম না। গল্প শেষ করলাম। গল্প শেষ হওয়ামাত্র মিসির আলি বললেন, ‘আবার বলুন।’

‘আবার কেন?’

‘মানুষ যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গল্প বলে তখন মূল গল্পটি দ্রুত বলার দিকে ঝাঁক থাকে বেশি। গল্পের ডিটেইলসে যেতে চায় না। একই গল্প দ্বিতীয়বার বলার সময় বর্ণনা বেশি থাকে। কারণ, মূল কাহিনী বলা হয়ে গেছে। কথক তখন না বলা অংশ বলতে চেষ্টা করেন। আপনিও তাই করবেন। প্রথমবার শুনে কয়েকটা জিনিস বুঝতে পারিনি। দ্বিতীয়বারে বুঝতে পারব। শুরু করুন।’

আমি শুরু করলাম, ‘বেশ সময় নিয়ে বললাম।’

মিসির আলি বললেন, ‘কবে গিয়েছিলেন খুন্দুলনাড়া? তারিখ মনে আছে?’

‘আছে।’

আমি মিসির আলিকে তারিখ বললাম। তিনি শান্ত গলায় বললেন, ‘আপনার তারিখ অনুযায়ী মেয়েটির বাচ্চা এখন হবে কিংবা হয়ে গেছে। আপনি বলছেন দশ মাস আগের কথা। মেয়েটির বাচ্চা হয়ে গিয়ে থাকলে তাকে যে হত্যা করা হয়েছে সেই সম্ভাবনা নিরানব্বই ভাগেরও বেশি। আর যদি এখনো হয়ে না থাকে তাহলে বাচ্চাটিকে বাঁচানো যেতে পারে। এখন ক’টা বাজে দেখুন তো।’

আমি ঘড়ি দেখলাম, ‘ন’টা বাজে।’

মিসির আলি বললেন, ‘রাত সাড়ে দশটায় ময়মনসিংহে যাওয়ার একটা ট্রেন আছে। চলুন রওনা হই।’

‘সত্যি যেতে চান?’

‘অবশ্যই যেতে চাই। আপনার অসুবিধা থাকলে কিভাবে যেতে হবে আমাকে বলে দিন। আমি ঘুরে আসি।’

‘আমার অসুবিধা আছে। তবু যাব। এখন বলুন তো জিন কফিলের

ব্যাপারটা আপনি বিশ্বাস করছেন?’

‘না।’

‘আপনার ধারণা বাচ্চাগুলোকে খুন করা হয়েছে?’

‘তা তো বটেই।’

‘কে খুন করেছে?’

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, ‘কে খুন করেছে তা আপনিও জানেন। আপনার সাব-কনসাস মাইন্ড জানে। জানে বলেই সাব-কনসাস মাইন্ড গল্পটি বলতে আপনাকে বাধা দিচ্ছিল।’

‘আমি কিছুই জানি না।’

মিসির আলি হাসতে হাসতে বললেন, ‘আপনার সাব-কনসাস মাইন্ড জানে কিন্তু সে এটি আপনার কনসাস মাইন্ডকে জানায়নি বলেই আপনার মনে হচ্ছে আপনি জানেন না।’

আমি বললাম, ‘কে খুন করেছে?’

‘লতিফা। দু’টি বাচ্চাই সে মেরেছে। তৃতীয়টিও মারবে।’

‘কী বলছেন এসব!’

‘চলুন রওনা হয়ে যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে। ট্রেনে যেতে-যেতে ব্যাখ্যা করব।’

মিসির আমি বললেন, ‘লতিফা যে পুরো ঘটনাটা ঘটচ্ছে তা পরিষ্কার হয়ে যায় শুরুতেই, যখন ইমাম সাহেব আপনাকে বলেন কিভাবে জিন কফিল তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল।’

পুরনো ধরনের মসজিদ, একটামাত্র দরজা। এই ধরনের মসজিদে বসে থাকলে বাইরের চিৎকার শোনা যাবে না। ভেতর থেকে চিৎকার করলেও বাইরের কেউ শুনবে না। কারণ, সাউন্ড ওয়েভ চলার জন্যে মাধ্যম লাগে। মসজিদের দেয়াল সেখানে বাধার মতো কাজ করছে।

আপনি এবং ইমাম সাহেব মসজিদে ছিলেন। ইমাম সাহেব একসময় স্ত্রীর খোঁজ নিতে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, ‘লতিফা খুব চিৎকার করছে। তাই না?’

‘জি তাই।’

‘মসজিদের ভেতরে বসে সেই চিৎকার আপনি শুনতে পাননি। তাই না?’

‘জি।’

‘অথচ ইমাম সাহেব যখন আগুন দেখে ভয়ে চাঁচালেন, ‘বাঁচাও বাঁচাও’, তখন লতিফা পানির বালতি নিয়ে ছুটে এলো। প্রথমত, ইমাম সাহেবের চিৎকার লতিফার শোনার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, শুনে থাকলেও লতিফা কি করে

বুঝল আগুন লেগেছে? সে পানির বালতি নিয়ে ছুটে এলো কেন?’ ‘আগুন, আগুন’ বলে চিৎকার করলেও আমরা চিৎকার শুনে প্রথমে খালি হাতে ছুটে আসি, তারপর পানির বালতি আনি। এটাই স্বাভাবিক। এই মেয়েটি শুরুতেই পানির বালতি নিয়ে ছুটে এসেছে। কারণ, পানির বালতি হাতের কাছে রেখেই সে আগুন ধরিয়েছে। আমার এই যুক্তি কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?’

‘হুঁ, হুঁ।’

‘প্রথম শিশুটি মারা গেল। শিশুটিকে ফেলা হলো কুয়ায়। এই খবর মেয়েটি জানে। কারণ সে পাগলের মতো ছুটে গেছে কুয়ার দিকে— অন্য কোথাও নয়। তার বাচ্চাটিকে কুয়াতে ফেলা হয়েছে এটা সে জানল কিভাবে? জানল কারণ সে নিজেই ফেলেছে। এই যুক্তি কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?’

‘হ্যাঁ, হুঁ, হুঁ।’

‘আপনাকে কি আরও যুক্তি দিতে হবে? আমার কাছে আরও ছোটখাটো যুক্তি আছে।’

‘আর লাগবে না। শুধু বলুন কুয়ার উপরের টিনে ঝনঝন শব্দ হতো কেন? যে শব্দ ইমাম সাহেব নিজেও শুনেছেন।’

‘কুয়ার টিনটা না দেখে বলতে পারব না। আমার ধারণা বাতাসে টিনটা কাঁপে, ঝনঝন শব্দ হয়। দিনের বেলায় এই শব্দ শোনা যায় না। কারণ, আশপাশে অনেক ধরনের শব্দ থাকে। রাত যতই গভীর হয়ে চারপাশ নীরব হতে থাকে। সামান্য শব্দই বড় হয়ে কানে আসে।’

‘আপনার এই যুক্তিও গ্রহণ করলাম। এখন বলুন লতিফা এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ড কেন করছে?’

‘মেয়েটা অসুস্থ। মনোবিকার ঘটেছে। ইমাম সাহেব লোকটি তাদের আশ্রিত। তাদের পরিবারে চাকর-বাকররা যে কাজ করে সে তাই করত। মেয়েটি ভাগ্যের পরিহাসে এমন একজন মানুষের প্রেমে পড়ে যায়। প্রচণ্ড মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়। পরিবারের সবার কাছে ছোট হয়। অপমানিত হয়। এত প্রচণ্ড চাপ সহ্য করার ক্ষমতা তার ছিল না। তার মনোবিকার ঘটে। পোয়াতি অবস্থায় মেয়েদের হরমোনাল ব্যালান্স এদিক-ওদিক হয়। সেই সময় মনোবিকার তীব্র হয়। মেয়েটির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মেয়েটি দরিদ্র ইমামকে বিয়ে করে কঠিন মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়েছে। একই সঙ্গে সে লোকটিকে প্রচণ্ড ভালোবাসে, আবার প্রচণ্ড ঘৃণাও করে। কী ভয়াবহ অবস্থা!’

‘মেয়েটি ইমামকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে এটা কেন বলছেন?’

‘ইমামতি পেশা মেয়েটির পছন্দ না। পছন্দ না বলেই মেয়েটি কফিলের গলায় বলেছে— ইমাম আসছে। অজুর পানি দে, জায়নামাজ দে, কেবলা কোনদিকে বলে দে। এক ধরনের রসিকতা করার চেষ্টা করছে।’

‘মনোবিকার এমন ভয়াবহ রূপ নিল কেন? সে নিজের বাচ্চাকে হত্যা করেছে কেন?’

‘বড় ধরনের বিকারে এ-রকম হয়। সে নিজেকে ধ্বংস করতে চাইছে। নিজের সন্তান হত্যার মাধ্যমে সেই ইচ্ছারই অংশবিশেষ পূর্ণ হচ্ছে। আরও কিছু থাকতে পারে। না দেখে বলতে পারব না।’

৪

ধুন্দুলনাড়া গ্রামে সন্ধ্যায় পর পৌঁছলাম। পৌঁছেই খবর পেলাম পাঁচদিন হয় ইমাম সাহেবের একটি কন্যা হয়েছে। কন্যাটি ভালো আছে। বড় ধরনের স্বস্তি বোধ করলাম।

ইমাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম মসজিদে। তিনি আমাদের দেখে বড়ই অবাক হলেন। আমি বললাম, ‘আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?’

ইমাম সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, ‘ভালো না। ভালো না। খুব খারাপ। কফিল তার সঙ্গে সঙ্গে আছে। কফিল আছে, ষাটদিনের মাথায় মেয়েটাকে মেরে ফেলবে। খুব কষ্টে আছি ভাই সাহেব। অক্লিহপাকের কাছে আমার জন্যে খাস দিলে একটু দোয়া করবেন।’

আমি বললাম, ‘আমি আমার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। উনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কিছু কথা বলবেন।’

ইমাম সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘কেন?’

‘যাতে আপনার বাচ্চাটা ভালো থাকে। সুস্থ থাকে। উনি খুব বড় একজন সাইকিয়াট্রিস্ট। অনেক কিছু বুঝতে পারেন। যা আমরা বুঝতে পারি না। উনার কথা শুনলে আপনার মঙ্গল হবে। এইজন্যেই উনাকে এনেছি।’

‘অবশ্যই আমি উনার কথা শুনব। অবশ্যই শুনব।’

ইমাম সাহেব আমাদের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে অনেক লোকজন ছিল। তাদের সরিয়ে দেয়া হলো।

মিসির আলি বললেন, ‘আমি কিছু কথা বলব যা শুনতে ভালো লাগবে না তবু দয়া করে শুনুন।’

লতিফা চাপা গলায় বলল, ‘আমার সাথে কী কথা?’

‘আপনার বাচ্চাটির বিষয়ে কথা। বাচ্চাটি যাতে বেঁচে থাকে, ভালো থাকে, সে জন্যেই আমার কথাগুলি আপনাকে শুনতে হবে।’

লতিফা তার স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, ‘বলেন, কী বলবেন।’

মিসির আলি খুবই নিরাসক্ত গলায় কথা বলতে শুরু করলেন। কথা বলার সময় একবারও লতিফার দিকে তাকালেন না। লতিফা তার শিশুকে বুকের কাছে নিয়ে খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার মাথায় লম্বা ঘোমটা। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে তার তীব্র চোখের দৃষ্টি নজরে আসছে। ইমাম সাহেব তার স্ত্রীর পাশে বসে আছেন। মিসির আলির ব্যাখ্যা যতই গুনছে ততই তার চেহারা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে।

মিসির আলি কথা শেষ করে লতিফার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনি কি আমার ব্যাখ্যা বিশ্বাস করলেন?’

লতিফা জবাব দিলো না। মাথার ঘোমটা সরিয়ে দিলো। কী সুন্দর শান্ত মুখ! চোখের তীব্রতা এখন আর নেই। মনে হচ্ছে অশ্রু টলমল করছে।

মিসির আলি কঠিন গলায় বললেন, ‘আমার ব্যাখ্যা আপনি বিশ্বাস না করলেও শিশুটির দিকে তাকিয়ে তার মঙ্গলের জন্যে শিশুটিকে আপনি অন্যের কাছে দিন। সে যেন কিছুতেই আপনার সঙ্গে না থাকে। আমার যা বলবার বললাম, বাকিটা আপনার ব্যাপার। আচ্ছা, আজ তাহলে যাই। আমরা রাতেই রওনা হব। নৌকা ঠিক করা আছে।’

আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আমি বললাম, ‘মিসির আলি সাহেব আপনার কি মনে হয় মেয়েটি আপনার কথা বিশ্বাস করেছে?’

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে বললেন, ‘হ্যাঁ, করেছে। এবং বিশ্বাস করার কারণেই তার দ্রুত রোগশক্তি ঘটবে। আমার ধারণা মেয়েটি নিজেও খানিকটা হলেও এই সন্দেহই করছিল। মেয়েটি অসম্ভব বুদ্ধিমতী। চলুন রওনা দেয়া যাক। এই গ্রামে রাত কাটাতে চাই না।’

আমি বললাম, ‘ইমাম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে যাবেন না?’

‘না। আমার কাজ শেষ। বাকিটা ওরা দেখবে।’

রওনা হবার আগে আগে ইমাম সাহেব ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। শিশুটি তাঁর কোলে। তিনি বললেন, ‘লতিফা মেয়েটাকে দিয়ে দিয়েছে। সে খুব কাঁদতেছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। মেহেরবানি করে একটু আসেন।’

আমরা আবার ঢুকলাম। বিস্মিত হয়ে দেখলাম লতিফা ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। মিসির আলি কোমল গলায় বললেন, ‘আপনি কি কিছু বলবেন?’

লতিফা কাঁদতে কাঁদতে বলল, ‘আল্লাহ আপনার ভালো করবে। আল্লাহ আপনার ভালো করবে।’

‘আপনি কোনো রকম চিন্তা করবেন না। আপনার অসুখ সেরে গেছে। আর কোনোদিন হবে না।’

লতিফা তার স্বামীর কানে কানে কি যেন বলল।

ইমাম সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, ‘জনাব কিছু মনে করবেন না। লতিফা আপনারে একটু ছুঁইয়ে দেখতে চায়।’

মিসির আলি হাত বাড়িয়ে দিলেন। লতিফা দু’হাতে সেই হাত জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

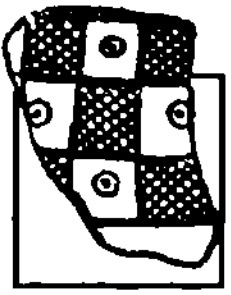
নৌকায় উঠছি।

ইমাম সাহেব আমাদের তুলে দিতে এলেন। নৌকা ছাড়ার আগমুহূর্তে নিচু গলায় বললেন, ‘ভাই সাহেব আমি অতি দরিদ্র মানুষ, আপনাদের যে কিছু দিবো আল্লাহপাক আমাকে সেই ক্ষমতা দেন নাই। এই কোরান শরিফটা আমার দীর্ঘদিনের সঙ্গী। যখন মন খুব খারাপ হয় তখন পড়ি— মন শান্ত করি। আমি খুব খুশি হব যদি কোরান মজিদটা আপনি নেন। আপনি নেবেন কিনা তা অবশ্য জানি না।’

মিসির আলি বললেন, ‘অবশ্যই নেব। খুব আনন্দের সঙ্গে নেব।’

‘ভাই সাহেব, আমার মেয়েটার একটা নাম কি আপনি ঠাইখা যাইবেন?’

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, ‘হ্যাঁ যাব। আপনার মেয়ের নাম রাখলাম লাভণ্য। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় এই নামের একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। মেয়েটা আমাকে একেবারেই ধোঁতা দেয়নি। মাঝে মাঝেই মেয়েটার কথা আমার মনে হয়। মনটা খারাপ হয়ে যায়। ভাই যাই।’



কবি

টাউন প্রেসের মালিক সিরাজুল ইসলাম রাগী রাগী মুখ করে বসে ছিলেন। তাঁর রাগের অনেকগুলি কারণ ছিল। গ্রুফ রিডার জোবেদ আলী এখনো এসে পৌঁছায়নি। মেশিনম্যান কাজ ছাড়া বসে আছে। তা ছাড়া আকাশের অবস্থা ভালো নয়। ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। ঝড়-বৃষ্টি হলে সিরাজুল ইসলাম সাহেবকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। আজ তাঁর খুব শখ ছিল বিস্তির ওখানে রাত কাটাবেন। তিনি মাসে একবার বিস্তির ওখানে কিছুটা সময় থাকেন। এই মেয়েটি ভালো। বাজে ঝামেলা করে না। এই বয়সে বাজে ঝামেলা তাঁর সহ্য হয় না।

রাত আটটার দিকে সত্যি সত্যি চেপে বৃষ্টি এল। তার কিছুক্ষণ পর ভিজতে ভিজতে জোবেদ আলী এসে উপস্থিত।

‘একটু দেরি হয়ে গেল ইসলাম সাহেব, মেয়েটার জ্বর।’

সিরাজুল ইসলাম উত্তর দিলেন না। তিনি অন্য কথা ভাবছিলেন।

‘ডাক্তার গাদাখানিক ওষুধ দিয়েছে।’

তাই নাকি?

‘জি।’

‘অসুখটা কী?’

জোবেদ আলী দীর্ঘ সময় নিয়ে অসুখ সম্পর্ক বলতে লাগল।

সিরাজুল ইসলাম সাহেবের শোনার আগ্রহ ছিল না। তবু তিনি আগ্রহের একটা ভাব চোখে-মুখে ফুটিয়ে রাখলেন। জোবেদ আলী বলল, ‘আজ একটু তাড়াতাড়ি বাসায় যাব স্যার।’

‘আর সর্বনাশ কী বলেন! কাল সকালে ডেলিভারি দিতে হবে। পাটি দুইবার তাগাদা দিয়ে গেছে। চা খান, চা খেয়ে বসে যান।’

জোবেদ আলী বসে গেল। লোকটি প্রফ দেখার কাজে ওস্তাদবিশেষ। ন’টার আগেই এক ফর্মার মতো দেখা হয়ে গেল।

‘জোবেদ আলী।’

‘জি স্যার।’

‘কি মনে হয়, বৃষ্টি ধরবে?’

‘বলা তো মুশকিল।’

‘মুশকিল হবে কেন? বৃষ্টি-বাদলা নিয়েই তো আপনাদের কারবার— কবি মানুষ।’

জোবেদ আলীর মুখে অস্পষ্ট একটা হাসির রেখা দেখা গেল।

আপনারা আছেন সুখে। বৃষ্টির মতো একটা বাজে ঝামেলা নিয়েও লিখে ফেলেন মহাকাব্য।

জোবেদ আলীর মুখের হাসি স্পষ্ট হলো। সিরাজুল ইসলাম লোকটাকে সে মনেপ্রাণে অপছন্দ করে। কিন্তু এই একটি লোকই তাকে কবি বলে খোঁচা দেয়। খোঁচাটিও বড় মধুর মনে হয়।

‘স্যার, একটু সকাল-সকাল যাওয়া দরকার। মেয়েটি স্যার—’

‘যাবেন যাবেন, কতক্ষণ আর লাগবে? শেষ করে ফেলেন। বানানগুলিও দেখবেন।’

জোবেদ আলী গভীর মনোযোগে বানান দেখে। সিরাজুল ইসলাম দেখেন বৃষ্টি। মাসের বিশেষ বিশেষ ফুর্তির দিনগুলিতে বৃষ্টি-বাদলা হয় কেন এই

রহস্যের তিনি মীমাংসা করতে পারেন না। তাঁর কাছে জগতের অমীমাংসিত রহস্যের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

বিস্তি মেয়েটির গায়ের রং কালো। কালো মেয়েগুলি সাধারণত মায়াবতী হয়। একটি কালো মায়াবতী যুবতীর জন্যে তার এক ধরনের ক্ষুধা বোধ হয়। তাঁর স্ত্রীর গায়ের রং ফর্সা। দারুণ ফর্সা। শুধু গায়ের রঙের জন্যে তার সঙ্গে বিয়েটা হয়ে যায়। মেয়েটির উঁচু দাঁত তখন চোখে পড়েনি। কিংবা দাঁত হয়তো সে সময় উঁচু ছিল না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দাঁত আরও উঁচু হচ্ছে। এবং গায়ের রং হচ্ছে আরও সাদা। এখন তাকে শ্বেতী রোগীর মতো লাগে।

‘স্যার বাকিটা কাল সকালে দেখে দিব।’

‘আরে পাগল নাকি? সকালেই পার্টি আসবে। শেষ করে ফেলেন। কতক্ষণ ভ্রার লাগবে? চা খাবেন?’

‘জি না।’

‘খান খান। এই চা দে তো। তারপর কবি সাতের মতুন কবিতা কী লিখলেন?’

‘একটা ছোট লিরিকের মতো লিখলাম গত রাতে।’

‘বলেন কি!’

‘শুনবেন স্যার?’

‘থাক থাক কাজ করেন। কাজের সময় কাব্যচর্চা ঠিক না।’

জোবেদ আলী প্রফের উপর চোখ রেখে অস্পষ্ট স্বরে বলল, ‘দেশের মাটি’তে ছাপা হবে।’

‘তাই নাকি?’

‘জি। সম্পাদক সাতের খুব প্রশংসা করলেন।’

‘ভালো ভালো। এইবার বই বের করে ফেলেন।’

বলতে বলতে সিরাজুল ইসলামের মনে হলো বৃষ্টি ধরে আসছে। সিরাজুল ইসলাম রক্তের মধ্যে এক ধরনের চঞ্চলতা অনুভব করলেন। বিস্তি মেয়েটি কথা বলে টেনে টেনে। যশোর-টশোরের দিকে বাড়ি নিশ্চয়ই। তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেননি। এই জাতীয় মেয়েদের সঙ্গে বাড়তি খাতির রাখা ঠিক না। দূরে দূরে থাকতে হয়।

জোবেদ আলী কাজ শেষ করে উঠে পড়ল। এবং মুখ কালো করে মাথা চুলকাতে লাগল। এই ভঙ্গিটি সিরাজুল ইসলামের চেনা। কাজেই তিনি ভারী গলায় বললেন, ‘পার্টির কাছ থেকে আদায়পত্র কিছু হয় নাই। বিজনেস তুলে দিতে হবে, বুঝলেন?’

‘দশটা টাকা হবে? মেয়েটা কলা নিয়ে যেতে বলেছিল।’

সিরাজুল ইসলাম অপ্রসন্ন মুখে একটা নোট বের করে দিলেন। মাসের মাঝামাঝি টাকা দিতে তাঁর ভালো লাগে না।

‘যাই স্যার।’

সিরাজুল ইসলাম জবাব দিলেন না। তাঁর মুখ অপ্রসন্ন। কারণ, বড় বড় ফোঁটায় আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

জোবেদ আলী বাসায় ফিরে দেখেন মেয়ের জ্বর কমে গিয়েছে। মেয়ে অপেক্ষা করছে বাবার জন্যে। কলা এলে দুধ-কলা দিয়ে ভাত খাবে। কিন্তু রাত বেড়ে গিয়েছিল। কলা পাওয়া যায়নি। জোবেদ আলীর বেশ খারাপ লাগল।

‘কাল সকালে কলা নিয়ে আসব।’

‘আচ্ছা।’

‘সবরি কলা না সাগর কলা?’

‘যেটা তোমার ইচ্ছা।’

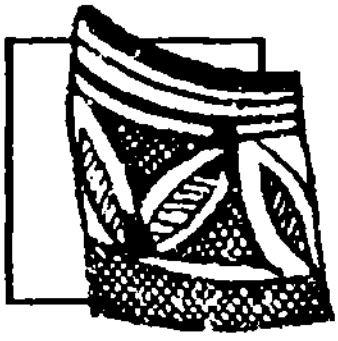
‘ঠিক আছে।’

জোবেদ আলী খেয়ে-দেয়ে তার খাতা নিয়ে বসল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই একটা সুবিধা হয়েছে, গভীর রাতে বই-খাতা নিয়ে বসলেও কেউ কিছু বলে না।

ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। এ রকম বড়-বৃষ্টির রাতে ঘুমিয়ে কাটানোর কোনো মানে হয় না।

জোবেদ আলীর মেয়েটি ঘুমাচ্ছে না। তার জ্বর আসছিল। সে কাঁথা গায়ে দিয়ে চোখ বড় বড় করে বাবাকে দেখতে লাগল। একবার ফিসফিস করে ডাকল, ‘বাবা’। জোবেদ আলী গুনতে পেলেন না। তাঁর মনে অদ্ভুত সুন্দর একটা লাইন এসেছে—‘কী সুন্দর বৃষ্টি আজ রাতে!’ অন্য লাইনগুলি আর মনে আসছে না। এই একটি লাইনই ঘুরেফিরে আসছে। গভীর আবেগে তাঁর চোখ ভিজে উঠল।

মেয়েটির জ্বর বাড়ছে। সে আবার ডাকল—‘বাবা।’ বাইরে ঝড়-বৃষ্টির শব্দে সে ডাক চাপা পড়ে গেল। মেয়েটি জ্বরতপ্ত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তার কবি-বাবার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। সে কিছুই বুঝতে পারল না। শিশুরা অনেক কিছুই বুঝতে পারে, আবার অনেক কিছুই বুঝতে পারে না।



রহস্য

রহস্যজাতীয় ব্যাপারগুলিতে আমার তেমন বিশ্বাস নেই। তবু প্রায়ই এ-রকম কিছু গল্প-টল্প শুনতে হয়। গত মাসে ঝিকাতলার এক ভদ্রলোক আমাকে বললেন, তাঁর ঘরে একটি তক্ষক আছে— সেটি রোজ রাত ১ টা ২৫ মিনিটে তিনবার ডাকে। আমি বহু কষ্টে হাসি সামলালাম। এ-রকম সময়নিষ্ঠ তক্ষক আছে নাকি এ যুগে? ভদ্রলোক আমার নির্বিকার ভঙ্গি দেখে বললেন, ‘কি ভাই বিশ্বাস করলেন না?’

‘জি না।’

‘এক রাত থাকেন আমার বাসায়। নিজের চোখে দেখেন তক্ষকটা। ঘড়ি ধরে বসে থাকবেন। দেখবেন ঠিক ১ টা ২৫ মিনিটে তিনবার ডাকবে।’

‘আরে দূর, কী যে বলেন!’

ভদ্রলোক মুখ কালো করে উঠে গেলেন। চারদিন পর তাঁর সঙ্গে আবার দেখা। পৃথিবীটা এ-রকম যার সঙ্গে দেখা হবার তার সঙ্গে দেখা হয় না। ভুল মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। আমাকে দেখেই ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বললেন, ‘আপনি কি দৈনিক বাংলার সাপ্তাহিক সাহেবকে চেনেন?’

‘হ্যাঁ চিনি।’

‘তাঁকে বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি নিজের কানে শুনেছেন— বলেছেন একটা নিউজ করবেন।’

‘ভালোই তো। নিউজ হবার মতোই খবর।’

‘আপনি আসেন না ভাই, থাকেন এক রাত। নিজের কানে শুনবেন।’

‘আমাকে শোনাতে কী হবে?’

‘আরে ভাই, আপনারা ইউনিভার্সিটির টিচার। আপনাদের কথার একটা আলাদা দাম।’

‘তাই নাকি?’

‘আপনারা একটা কথা বললে কেউ ফেলবে না।’

‘এই জিনিসটা নিয়ে খুব হইচই করছেন মনে হচ্ছে।’

‘না, হইচই কোথায়? অনেকেই অবিশ্যি শুনে গেছেন। বাংলাদেশ টিভির

ক্যামেরাম্যান নজমুল হুদাকে চেনেন?’

‘জি না।’

‘উনিও এসেছিলেন। খুব মাইডিয়ার লোক। আপনি আসুন না।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে, একদিন যাওয়া যাবে।’

ভদ্রলোকের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি মুখভর্তি করে হাসলেন।
টেনে-টেনে বললেন, ‘চলেন চা খাই।’

‘না, চা খাব না।’

‘আরে ভাই, আসেন না। প্রফেসর মানুষ, আপনাদের সঙ্গে থাকাটা ভাগ্যের
ব্যাপার।’

ভদ্রলোক হা-হা করে হাসতে লাগলেন। যেতে হলো চায়ের দোকানে।

‘চায়ে সঙ্গে আর কিছু খাবেন? চপ?’

‘না।’

‘আরে ভাই খান না। এই এদিকে দু’টো চপ দে ছোন। এখন ভাই বলেন,
কবে যাবেন?’

‘আপনার সঙ্গে তো প্রায়ই দেখা হয়। বলে দেব একদিন।’

চা খেতে-খেতে ভদ্রলোক দ্বিতীয় একটি রেস্যুর কথা শুরু করলেন।
নাইনটিন সিক্সটিতে তিনি বরিশালের পিরোজপুরে থাকতেন। তাঁর বাসার কাছে
একটা বিরাট কাঁঠালগাছ ছিল। অমাবস্যার রাতে নাকি সেই কাঁঠালগাছ থেকে
কান্নার শব্দ ভেসে আসত। আমি গাছটার হয়ে বললাম, ‘সেই কান্নারও কি কোনো
টাইম ছিল? নির্দিষ্ট সময়ে কাঁদত? আপনার তক্ষকের মতো?’

ভদ্রলোক আহত স্বরে বললেন, ‘আমার কথা বিশ্বাস করলেন না?’

‘বিশ্বাস করব না কেন?’

‘আমি কান্নার শব্দ গোটাটা টেপ করে রেখেছি। একদিন শোনাব
আপনাকে।’

‘ঠিক আছে।’

‘বরিশালের ডিসি সাহেবও শুনেছেন। চেনেন উনাকে? আসগর সাহেব।
সিএসপি। খুব খান্দানি ফ্যামিলির।’

‘না, চিনি না।’

‘ডিসি সাহেবের এক ভাই আছেন বাংলাদেশ ব্যাংকে। বিরাট অফিসার।’

‘তাই বুঝি?’

‘জি। উনার বাসায় একদিন গিয়েছিলাম। খুব খাতির-যত্ন করলেন।
গুলশানে বাসা। তিন তলা। উনি থাকেন এক তলায়। ওপরের দু’টো তলা
ভাড়া দিয়েছেন।’

ভদ্রলোক আমার প্রায় এক ঘণ্টা সময় নষ্ট করে বিদায় হলেন। আমার মায়াই লাগল। ইন্ডেন্টিং ফার্মে সামান্য একটা চাকরি করেন। দেখেই বোঝা যায় অভাবে পর্যুদস্ত। চোখের দৃষ্টি ভরসাহারা। বয়স এখান হয়তো ত্রিশ হয়নি কিন্তু বুড়াটে দেখায়। বিচিত্র চরিত্র!

মাসখানেক তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলো না। তার প্রধান কারণ, যে সব জায়গায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবার সম্ভাবনা সে সব জায়গা আমি এড়িয়ে চলতে শুরু করেছি। নিউ মার্কেটে আড্ডার জায়গাটিতে যাই না। কি দরকার ঝামেলা বাড়িয়ে? এই লোকটি পিচ্ছিল পদার্থ, সে গায়ের সঙ্গে সঁটে যাবে। আর ছাড়ানো যাবে না। কিন্তু তবু দেখা হলো। একদিন শুনলাম সে ইউনিভার্সিটি ক্লাবে এসে খোঁজ নিচ্ছে। ক্লাবের বেয়ারা বলল, গত কিছুদিন ধরে নাকি সে নিয়মিতই আসছে। কী মুসিবত!

একদিন আর এড়ানো গেল না। ভদ্রলোক বাসায় এসে হাজির।

‘কী ভাই, আপনি তো আর এলেন না।’

‘কাজের ব্যস্ততা...’

‘আজ আপনাকে নিতে এসেছি।’

‘সে কি! কবি শামসুল আলম সাহেবও আসবেন।’

‘তাই বুঝি?’

‘জি। চিনেন তো শামসুল আলম সাহেবকে? দুটো কবিতার বই বেরিয়েছে। ‘পাখির পালক’ আর ‘অন্ধকার জ্যোৎস্না’।’

‘তাই বুঝি?’

‘জি। আমাকে দুটো বই-ই দিয়েছেন। খুবই বন্ধু মানুষ। বাড়ি হচ্ছে আপনার ময়মনসিংহ, নৈরাকোনা।’

‘ও।’

‘উনার ছোট ভাইও গল্প-টল্প লেখেন। আরিফুল আলম।’

গেলাম তাঁর বাসায়। ঝিকাতলায় এক গলিতে ঘুপচি মতো দু’কামরার বাড়ি। আমার মেজাজ খুবই খারাপ। রাত দেড়টা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে সময়নিষ্ঠ তক্ষকের ডাক শোনার জন্যে। কত রকম যন্ত্রণা যে আছে পৃথিবীতে।

ভদ্রলোক আমাকে ঘরে বসিয়ে অতি ব্যস্ততার সঙ্গে ভেতরে চলে গেলেন। বসার ঘরটি সুন্দর করে সাজানো। মহিলার হাতের সযত্ন স্পর্শ আছে। ভদ্রলোক বিবাহিত জানতাম না। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কখনো কথা হয়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর স্ত্রী ঘরে এসে ঢুকলেন। অল্প বয়েসি তরুণী এবং অসম্ভব রূপসী। আমি প্রায় হকচকিয়ে গেলাম।

‘আমার স্ত্রী লীনা। আর লীনা, উনি হুমায়ূন আহমেদ। ঐ কথা তো তোমাকে বলেছি। উনি লেখেন-টেখেন। ছাপা হয়।’

লীনা হাসিমুখে বলল, ‘জি, আপনার কথা প্রায়ই বলে।’

লীনা চলে গেল ভেতরে। ভদ্রলোক নিচু গলায় বললেন, ‘লীনার গল্প-উপন্যাস লেখার শখ আছে। কয়েক দিন আগে সাপ নিয়ে ও একটা গল্প লিখেছে। মারাত্মক গল্প ভাই। আপনাকে পড়ে শোনাতে বলব। আমি বললে পড়বে না। আপনিও কাইভলি একটু বলবেন। রিকোয়েস্ট করবেন।’

আমি বললাম, ‘গুণী মহিলা তো।’

ভদ্রলোকের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

‘তা ভাই, কথাটা অস্বীকার করব না। গানও জানে। নজরুলগীতি। ভালো গায়। বাড়িতে টিচার রেখে শিখেছে।’

‘তাই নাকি?’

‘জি, শোনাবে আপনাকে। একটু প্রেসার দিতে হবে আর কি? আপনি একটু রিকোয়েস্ট করলেই শোনাবে। কাইভলি একটু রিকোয়েস্ট করবেন।’

‘ঠিক আছে, করব।’

চা এসে পড়ল। চায়ের সঙ্গে বড়া জাতীয় জিনিস। বেশ খেতে। আমি বললাম, ‘কীসের বড়া এগুলি? ডালের নাকি?’

ভদ্রলোক উচ্চৈঃস্বরে হাসলেন, ‘দুধের ভাই, ফুলের বড়া। হা-হা-হা। কত রকম অদ্ভুত রান্না যে লীনা জবাবে। মাঝে মাঝে এত সারপ্রাইজ্‌ড হই। খেতে কেমন হয়েছে বলেন? চমৎকার না?’

‘ভালো, বেশ ভালো।’

‘আরেক দিন আসবেন, চাইনিজ স্যুপ খাওয়াব। চিকেন কর্ন স্যুপ। চাইনিজ-রেস্টুরাঁর চেয়ে যদি ভালো না হয় তাহলে কান কেটে ফেলবেন। হা-হা-হা। থাই স্যুপও জানে।’

আমি মেয়েটির লেখা একটি ছোটগল্প শুনলাম। দু’টি কবিতা শুনলাম। তিনটি নজরুলগীতি শুনলাম। ভদ্রলোক মুগ্ধ ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন। বারবার বললেন, ‘ইশ শামসুল আলম সাহেব আসলেন না। দারুণ মিস্ করলেন, কি বলেন ভাই?’

রাত এগারোটার দিকে বললাম, ‘তাহলে আজ উঠি?’

‘তক্ষকের ডাক শুনবেন না?’

‘আরেক দিন শুনব।’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে। ভুলবেন না যেন ভাই। আসতেই হবে।’

ভদ্রলোক আমাকে এগিয়ে দিতে এলেন। রাস্তায় নেমেই বললেন, ‘আমার

স্ত্রীকে কেমন দেখলেন ভাই?’

‘খুব গুণী মহিলা।’

ভদ্রলোকের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ধরা গলায় বললেন, ‘বান্দরের গলায় মুক্তার মালা। ঠিক না ভাই?’

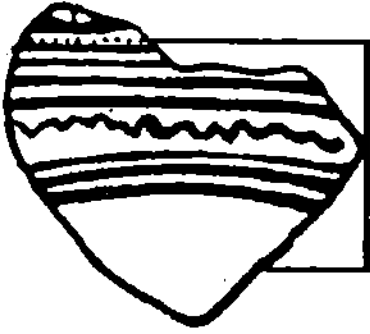
আমি কিছু বললাম না। ভদ্রলোক কাঁপা গলায় বললেন, ‘গরিব মানুষ, স্ত্রীর জন্যে কিছুই করতে পারি না। কিন্তু এসব নিয়ে লীনা মোটেই মাথা ঘামায় না। বড় ফ্যামিলির মেয়ে তো। ওদের চালচলনই অন্য রকম। আমরা খুব সুখী।’

আমি রিকশায় উঠতে উঠতে বললাম, ‘খুব ভাগ্যবান আপনি।’

ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরলেন। যেন আবেগে কেঁদে ফেলবেন।

‘ভাই, আরেক দিন কিন্তু আসতে হবে। তক্ষকের ডাক শুনতে হবে। আসবেন তো? প্লিজ। লোকজন এলে লীনা খুব খুশি হয়।’

তক্ষকের ডাকের মতো কত রহস্যময় ব্যাপারই না আছে পৃথিবীতে।



বীনার অসুখ

বীনার বয়স একুশ।

সে লালমাটিয়া কলেজে বি.এ. সেকেন্ড ইয়ারে পড়ত। বীনার মামা ইদরিশ সাহেব একদিন হঠাৎ বললেন, ‘বীনা তোর কলেজে যাবার দরকার নেই। বাসায় থেকে পড়াশোনা কর। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিলেই হবে। কলেজে আজকাল কি পড়াশোনা হয় তা তো জানাই আছে। যাওয়া না-যাওয়া একই।’

বীনা ঘাড় নেড়ে ক্ষীণ স্বরে বলল, ‘জি আচ্ছা।’

মামার কথার ওপর কথা বলার সাহস বীনার নেই। তার পড়াশোনার যাবতীয় খরচ মামা দেন। গত বছর গলার একটা চেন বানিয়ে দিয়েছেন। তা ছাড়া তার বিয়ের কথা হচ্ছে। বিয়ে যদি ঠিকঠিক হয় সেই খরচও মামাকেই দিতে হবে। বীনার বাবা প্যারালিসিস হয়ে দেশের বাড়িতে পড়ে আছেন। তাঁর পক্ষে একটা টাকাও খরচ করা সম্ভব না। তিনি সবার কাছ থেকে টাকা নেন।

কাউকে কিছু দেন না।

ইদরিশ সাহেব বললেন, ‘বীনা, তুই আমাকে এক গ্লাস শরবত বানিয়ে দে। আর শোন, কলেজে না-যাওয়া নিয়ে মন-টন খারাপ করিস না। মন খারাপের কিছু নাই।’

‘জি, আচ্ছা মামা।’

বীনা শরবত আনতে চলে গেল। তার মনটা অসম্ভব খারাপ। কলেজ বন্ধ করে দেবার কোনো কারণ সে বুঝতে পারছে না। জিজ্ঞেস করার সাহসও নেই। দিনের পর দিন ঘরে বসে থেকেই বা সে কি করবে? শরবত বানাতে বানাতে তার মনে হলো— হয়তো তার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে। গফরগাঁওয়ার ঐ ছেলে শেষ পর্যন্ত হয়তো রাজি হয়েছে। হয়তো ওরা বলেছে— মেয়েকে কলেজে পাঠাবেন না। বিয়ে ঠিকঠাক হলে ছেলেপক্ষের লোকজন অদ্ভুত অদ্ভুত শর্ত দিয়ে দেয়।

গফরগাঁওয়ার ঐ ছেলেটাকে বীনার একেবারেই পছন্দ হয়নি। কেমন যেন পশু পশু চেহারা। সোফায় বসে ছিল দুই হাঁটুতে দু’হাত রেখে। মুখ একটু হা হয়ে ছিল। সেই হা করা মুখের ভেতর কলো কুচকুচে জিহ্বা। বীনার দিকে এক পলক তাকাতেই বীনার বুক ধক করে উঠল। মনে হলো একটা পশু জিভ বের করে বসে আছে। তার নাকে ঝাঁঝাল গন্ধও এসে লাগল। গন্ধ ঐ লোকটার গা থেকে আসছিল। টক দুধ এবং পোড়কাঠের গন্ধ একত্রে মেশালে যে রকম গন্ধ হয় সে রকম একটা গন্ধ। গা কেন্দ্রীয় ঝিমঝিম করে।

লোকটা তাকে কোনো প্রশ্ন করল না। শুধু পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল। বীনার একবার মনে হলো, লোকটার চোখে হয়তো পাতা নেই। সাপের যেমন চোখের পাতা থাকে না সে রকম। লোকটার সঙ্গে বয়স্ক যে দু’জন মানুষ এসেছিলেন তারা অনবরত কথা বলতে লাগলেন। একজন বীনাকে ডাকতে লাগলেন— আন্টি। চুল-দাড়ি পাকা বয়স্ক একজন লোক যদি আন্টি ডাকে তখন ভয়ঙ্কর রাগ লাগে। কোনো কথারই জবাব দিতে ইচ্ছা করে না। বীনা অবিশ্যি সব প্রশ্নের জবাব দিল। কারণ, মামা তার পাশেই বসে আছেন। মামা বসেছেন সোফায় ডানদিকে, সে বাঁ দিকে। প্রশ্নের জবাব না দেয়ার কোনো উপায়ই নেই।

‘তারপর আন্টি রবিঠাকুর কত সনে নোবেল পুরস্কার পান তা জানা আছে?’

‘জি না।’

‘উনিশশ তেরো। অবিশ্যি উনি উনিশ শ’ তেরোতে না পেয়ে উনিশ শ’ একত্রিশে পেলেও কিছু যেত আসত না। তবু তারিখটা জানা দরকার। এটা হচ্ছে জেনারেল নলেজ। মেয়েরা শুধু রান্নাবান্না করবে তা তো না— তাদের

পৃথিবীতে কী হচ্ছে না-হচ্ছে তাও তো জানতে হবে। কি বলেন আন্টি?’

‘জি।’

‘আন্টি, আপনি খবরের কাগজ পড়েন?’

‘না।’

‘এইটা হচ্ছে মেয়েদের একটা কমন দোষ। কোনো মেয়ে খবরের কাগজ পড়েন না। আপনি কেন খবরের কাগজ পড়েন না, না পড়ার কারণটা কী আমাদের একটু বলুন তো আন্টি?’

বীনা কিছু বলল না। মামা পাশে বসে আছেন এই ভয়েই বলল না— কারণ মামা খবরের কাগজ রাখেন না বলেই খবরের কাগজ পড়ে না। এই তথ্যটা এঁদের জানান নিশ্চয়ই ঠিক হবে না। মামা রাগ করবেন।

ইদরিশ সাহেব বললেন, ‘মা বীনা ইনাদের চা-মিষ্টি দাও।’ চার-পাঁচ জাতের মিষ্টি টেবিলে সাজানো। বীনা প্লেটে উঠিয়ে সবার দিকে এগিয়ে দিল। লোকটাকে যখন দিতে গেল তখন লোকটা অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ করল। থাবার মতো বিশাল হাত বাড়িয়ে মিষ্টির থালা নিল। বীনা লক্ষ করল লোকটির আঙুলের নখ কালচে ধরনের। নখের মাথা পাখির নখের মতো ছুঁচাল। বীনার গায়ে সত্যি সত্যি কাঁটা দিয়ে উঠল। সে মনে মনে বলল, আল্লা এই লোকটা যেন আমাকে পছন্দ না করে। আল্লা এই লোকটা যেন আমাকে পছন্দ না করে।

লোকটা বীনাকে পছন্দ করল কি করল না কিছুই বোঝা গেল না। ইদরিশ সাহেব এই প্রসঙ্গে বাসার কারও সঙ্গেই কোনো আলাপ করলেন না। ইদরিশ সাহেবের এই হলো স্বভাব। বাসার কারোর সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলবেন না। নিজে যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন।

এই যে তিনি আজ বীনার কলেজে যাওয়া বন্ধ করলেন— এর কারণ তিনি কাউকে বলবেন না। ইদরিশ সাহেবের জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে, নারী জাতির সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ না করা। নারী জাতির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার ফল এটাই— সময় নষ্ট। কী দরকার সময় নষ্ট করার?

ইদরিশ সাহেবের বাসায় তিনি ছাড়া সবই মেয়ে। সব মিলিয়ে সাতজন মেয়ে। ইদরিশ সাহেবের স্ত্রী, চার কন্যা, তাঁর এক ছোট বোন এবং কাজের একটি মেয়ে। তাঁর বাসায় দুটো বিড়াল থাকে। এই বিড়াল দুটিও মেয়ে-বিড়াল। সঙ্গত কারণেই ইদরিশ সাহেব বাসায় যতক্ষণ থাকেন মনমরা হয়ে থাকেন। চারদিকে মেয়েজাতি নিয়ে বাস করতে তাঁর ভালো লাগে না। তিনি তাঁর ব্যবসা, তাঁর পরিকল্পনা কিছুই কাউকে বলেন না।

দিন পনেরো বীনার খুব ভয়ে-ভয়ে কাটল। কে জানে হয়তো লোকটা তাকে পছন্দ করে ফেলেছে। তার চেহারা এমন কিছু খারাপ না, পছন্দ করতেও

পারে। রং মোটামুটি ফর্সা। চোখ দুটো মায়ামায়া, লম্বা হালকা-পাতলা শরীর। সাজলে তাকে ভালোই দেখায়। পছন্দ করে ফেললে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বীনা বেশ কয়েক বার লজ্জার মাথা খেয়ে তার মামিকে জিজ্ঞেস করেছে, মামি, মামা কি কিছু বলেছে?

বীনার মামি হাসিনা পৃথিবীর সরলতম মহিলা। অতি সহজ কথাও তিনি বোঝেন না। একটু ঘুরিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে এমনভাবে তাকান যে, মনে হয় অঁথে জলে পড়েছেন। বীনার সহজ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘কীসের কথা রে?’

‘ঐ যে শুক্রবারে যে আসল?’

‘কে আসল শুক্রবারে?’

‘তিনজন লোক আসল না?’

‘তিনজন লোক আবার কখন আসল?’

‘বিয়ের আলাপ নিয়ে আসল না?’

‘ও আচ্ছা— মনে পড়েছে। না, কিছু বলে নাই। তোর মামা কি কখনো কিছু বলে? হঠাৎ একদিন শুনিবি বিয়ের দিন-তারিখ হয়ে গেছে। তোর মামা আগে-ভাগে কিছু বলবে? কোনোদিনও না।’

মাসখানেক কেটে যাবার পরেও বীনার ভয় কাটল না। মামা তাকে কোনো কারণে ডাকলেই মনে হতো এই বুঝি বুলবেন, বীনা তোর বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেললাম। শ্রাবণ মাসের বারো, মঙ্গলবার। তুই তোর বাবাকে চিঠি লিখে দে।

বীনা আতঙ্কে আতঙ্কে ভ্রূব্রূ কিছু দুঃস্বপ্নও দেখল। এই দুঃস্বপ্নগুলির প্রতিটিতে তার বিয়ে হয় সুন্দর একটা ছেলের সঙ্গে। বাসরঘরে সে আর ছেলেটা থাকে আর সুখই চলে যায়। লজ্জায় সে মাথা নিচু করে থাকে। তখন তার স্বামী আদুরে গলায় বলে— লজ্জায় দেখি মরে যাচ্ছ। এই, তাকাও না আমার দিকে। তাকাও। সে তাকায়। তাকাতেই তার গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। মানুষ কোথায়, একটা কুকুরের মতো পশু থাবা গেড়ে বসে আছে। হা-করা মুখের ভেতর কুচকুচে কালো একটা জিহ্বা। জিহ্বা মাঝে মাঝে মুখের ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে। পশুটার মুখ ছুঁচাল। তার গায়ে থেকে টক দৈ আর পোড়া কাঠের গন্ধ ভেসে আসছে। স্বপ্নে মানুষ গন্ধ পায় না। কিন্তু বীনা এই জাতীয় স্বপ্নে গন্ধ পেত। তীব্র কটুগন্ধেই একসময় ঘুম ভেঙ্গে যেত।

প্রায় দেড় মাস এ রকম আতঙ্কে কাটল। তারপর আতঙ্ক হঠাৎ করেই কেটে গেল। কারণ, ইদরিশ সাহেব এক ছুটির দিনের দুপুরে ভাত খেতে খেতে

বললেন, ‘বিয়েটা ভেঙ্গে দিলাম।’

হাসিনা বললেন, ‘কার বিয়ে ভেঙ্গে দিলে?’

‘বীনার। ঐ যে তিনজন এসেছিল শুক্রবারে। খুব চাপচাপি করছিল। মেয়ে না-কি তাদের খুব পছন্দ। ওদের বাড়ির অবস্থা ভালো। গফরাগাঁওয়ে কাপড়ের ব্যবসা আছে। গ্রামের বাড়িতে ধান-ভাঙ্গা কল দিয়েছে। বড় বড় আত্মীয়স্বজন।’

‘তাহলে বিয়ে ভেঙ্গে দিলে কেন?’

‘ছেলের গায়ে বিশ্রী গন্ধ। ঘোড়ার আস্তাবলে গেলে যেমন গন্ধ পাওয়া যায় সেই রকম। যে ক’বার এই ছেলে আমার কাছে এসেছে এ-রকম গন্ধ পেয়েছি। কী দরকার?’

হাসিনা দুঃখিত মুখ করে বললেন, ‘আহা গন্ধের জন্যে বিয়েটা বাতিল করে দিলে। ভালোমতো সাবান দিয়ে গোসল দিলেই তো গন্ধ চলে যায়।’

ইদরিশ সাহেব কড়া গলায় বললেন, ‘যা বোঝ না তা নিষে কথা বলবে না। তুমি রোজ গিয়ে গোসল করিয়ে আসবে না-কি? মেয়েছেলে মেয়েছেলের মতো থাকবে। সবকিছুর মধ্যে কথা বলবে না।’

‘রাগ করছ কেন? রাগ করার মতো কী বললাম?’

‘চুপ। আর একটা কথাও না।’

ইদরিশ সাহেবের দুর্ব্যবহারে কাঁদতে বসেন তবে বীনার আন্দের সীমা থাকে না। যাক শেষ পর্যন্ত লোকটির সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না। মামার প্রতি কৃতজ্ঞতায় বীনার মন ভরে যায়। মামা কথা না বললেও মানুষ খারাপ না। কে জানে এই যে তাকে কলেজে যেতে নিষেধ করেছেন এরও কোনো ভালো দিক নিশ্চয়ই আছে। মামা যদি গুরু কারণটা বলত। কিন্তু মামা বলবে না। অদ্ভুত মানুষ।

নিতান্তই আকস্মিকভাবে বীনা তার কলেজ বন্ধ হবার রহস্য জেনে ফেলল।

ইদরিশ সাহেব বীনার বাবাকে চিঠিতে কারণটা জানিয়েছেন। খামে ভরার আগে এই চিঠি বীনা পড়ে ফেলল।

পাকজনাবেষু

দুলাভাই,

আমার সালাম জানিবেন। পর সমাচার এই যে, বীনার কলেজে যাওয়া একটি বিশেষ কারণে বন্ধ করিতে হইয়াছে। বীনা ইহাতে কিঞ্চিৎ মনে কষ্ট পাইয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য উপায় দেখিলাম না। এখন আপনাকে কারণ বলিতেছি—

জোবেদ আলী নামক গফরাগাঁয়ের জনৈক যুবকের সহিত

বীনার বিবাহের আলাপ হইয়াছিল। পাত্রপক্ষের বিশেষ করিয়া পাত্রের বীনাকে খুবই পছন্দ হইয়াছিল। একটি বিশেষ কারণে বিবাহের প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিতে হইয়াছে। এখন কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়াছে। উক্ত জোবেদ আলী প্রায়শই বীনাকে অনুসরণ করিয়া কলেজ পর্যন্ত যায়। ইহা আমার কাছে অত্যন্ত সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইল। আজকালকার ছেলেদের মতিগতির কোনো ঠিক নাই। একবার যদি অ্যাসিড জাতীয় কিছু দেয় তাহা হইলে সর্বনাশের কোনো শেষ থাকিবে না। যাহা হউক আপনি তাহার বি.এ. পরীক্ষা নিয়া কোনো চিন্তা করিবেন না। আমি কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সহিত আলাপ করিয়াছি। তিনিও বলিয়াছেন কোনো অসুবিধা হইবে না। আগেরকার মতো কলেজগুলি পার্সেন্টেজ নিয়া ঝামেলা করে না। আপনার শরীরের হাল অবস্থা এখন কী? শরীরের যত্ন নিবেন। বীনাকে লইয়া অথবা চিন্তাগ্রস্ত হইবেন না।’

চিঠি পড়ে বীনার গাঁ কাঁপতে লাগল। কী সর্বনাশের কথা! ঐ লোক তার পেছনে পেছনে যায়। কৈ সে তো একদিনও টের ধায়নি। আর তার মামার কি উচিত ছিল না ঘটনাটা তাকে জানানো? সে এখন কলেজে যাচ্ছে না ঠিকই কিন্তু অন্য জায়গায় তো যাচ্ছে। আগে জানলে কী যেত না। ঘরে বসে থাকত। অবশ্যই মামার উচিত ছিল ঘটনাটা তাকে জানানো।

বীনাকে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে হলা ঠিক হবে না। সে যদি বুদ্ধিমতী মেয়ে হতো তাহলে চট করে বুঝে ফেলত তাকে ঘটনাটা জানানোর জন্যেই ইদরিশ সাহেব খামে ভরার আগে চিঠিটা দীর্ঘ সময় টেবিলে ফেলে রেখেছিলেন। এই জাতীয় ভুল তিনি কখনো করেন না।

বীনা বাড়ি থেকে বের হওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। আগের ভয়ের স্বপ্নগুলি আবার দেখতে লাগল। এবারের স্বপ্নে আরও সব কুৎসিত ব্যাপার ঘটতে লাগল। এমন হলো যে, ঘুমুতে পর্যন্ত ভয় লাগে।

হাসিনা বলেন, ‘কী হয়েছে তোর বল তো?’

বীনা ফ্যাকাসে হাসি হেসে বলে, ‘কই কিছু হয়নি তো?’

‘তুই তো শুকিয়ে চটি জুতা হয়ে যাচ্ছিস। তোর তা আর বিয়েই হবে না। এ-রকম শুকনো মেয়েকে কে বিয়ে করবে বল? গায়ে গোশত না থাকলে ছেলেরা মেয়েদের পছন্দ করে না। ছেলেগুলি হচ্ছে বদের বদ। ঝাঁটা মারি এদের মুখে।’

বীনার বন্দীজীবন কাটতে লাগল। মেয়েরা যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে খুব সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বীনাও খাপ খাইয়ে নিল। সারা

দিন তিন কামরার ঘরেই সময় কাটে। বাইরের বারান্দায় ভুলেও যায় না। বাইরে বারান্দায় দাঁড়ালে রাস্তার অনেকটা চোখে পড়ে। তার ভয় বারান্দায় দাঁড়ালে যদি লোকটাকে দেখে ফেলে। এত সাবধানতার পরও একদিন দেখা হয়ে গেল। বারান্দায় কাপড় শুকাতে দেয়া হয়েছে। হাসিনা বললেন, 'বৃষ্টি এসেছে, কাপড়গুলি নিয়ে আয় তো বীনা।' বীনা কাপড় আনতে গিয়ে পাথরের মতো জমে গেল। বাড়ির সামনের রাস্তাটার অপর পাশে জারুল গাছের নিচে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে বীনার দিকে। মুখ হা করে আছে। দাঁড়িয়ে আছে খানিকটা কুঁজো হয়ে। বীনাকে দেখেই সে দ্রুত রাস্তা পার হয়ে এপাশে চলে এল। হাত ইশারা করে কি যেন বলল। বীনা চিৎকার করে ঘরে ঢুকল। ঘণ্টাখানেক মধ্যে তার জ্বর উঠে গেল এক শ' তিন।

হাসিনা বললেন, 'এই কেমন কথা। লোকটা তো বাঘও না, ভালুকও না। তাকে দেখে এত ভয় পাওয়ার কী আছে?'

বীনা বিড়বিড় করে বলল, 'আমি জানি না মামি। কেন এত ভয় লাগছে আমি জানি না। আপনি আমাকে ধরে বসে থাকেন। কেন এত ভয় লাগছে মামি।'

ইদরিশ সাহেব সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে সব শুনলেন। কাউকে কিছুই বললেন না। সহজ ভঙ্গিতে খাওয়া-দাওয়া করলেন। বড় মেয়েকে অঙ্ক দেখিয়ে দিলেন। রাত সড়ে ন'টার সময় বললেন, 'একটা স্যুটকেস বীনার কাপড় গুছিয়ে দাও তো। রাত এগারোটায় বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেস। বীনাকে দেশের বাড়িতে রেখে আসি।'

হাসিনা হতভম্ব হয়ে বললেন, 'আজ রাতে?'

ইদরিশ সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'আজ রাতে নয় তো কি পরশু রাতে না-কি? জোবেদ হারামজাদা বড় বিরক্ত করছে। আমি আরও কয়েক দিন দেখেছি।'

'আজ রাতে যাওয়ার দরকার কী, কাল যাও।'

'কাল যেতে পারলে আজ যেতে অসুবিধা কী? তোমরা মেয়ে মানুষরা যা বোঝ না শুধু সেটা নিয়ে কথা বলো। কাপড় গুছিয়ে দিতে বলেছি, গুছিয়ে দাও।'

'বীনার জ্বর।'

'জ্বরের সঙ্গে কাপড় গোছানোর সম্পর্ক কি? কাপড় তো তুমি গোছাবে। তোমার গায়ে তো জ্বর নেই।'

হাসিনা কাপড় গুছিয়ে দিলেন। তার স্বামীকে তিনি চেনেন। কথাবার্তা বলে লাভ হবে না। বীনা এক শ' দুই পয়েন্ট ফাইভ জ্বর নিয়ে বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেসে উঠল। বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছাতে সেই জ্বর বেড় হলো এক শ' চার পয়েন্ট ফাইভ।

ইদরিশ সাহেব ছুটি নিয়ে যাননি। বীনাকে রেখে পরদিনই তাঁকে চলে আসতে হলো। বীনা সপ্তাহখানি জুরে ভুগে কক্ষালের মতো হয়ে গেল। মুখে রুচি নেই। যা খায় তাই বমি করে ফেলে দেয়। রাতে ঘুম হয় না। প্রায় রাতই জেগে জেগে কাটিয়ে দেয়। চোখের পাতা এক হলেই ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখে।

এই সময় তার ভয়ের অসুখ হয়। সারাক্ষণই ভয় লাগে। কোনো কারণ ছাড়াই বাতাসে জানালার পাট নড়ে উঠল— বীনার হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করে। সে আতঙ্কে অস্থির হয়ে যায়। প্রচণ্ড ঘাম হয়।

বীনাদের এই বসতবাড়িটা খুবই পুরনো। বীনার দাদা এক হিন্দু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে খুব সস্তায় এই বাড়ি কিনে নিয়েছিলেন। অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাড়ি। পুরো জায়গাটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সংস্কারের অভাবে দেয়াল জায়গায়-জায়গায় ভেঙ্গে পড়েছে। দোতলার ঘরের বেশির ভাগই ব্যবহারের উপযোগী নয়। একতলার তিনটা ঘর শুধু ব্যবহৃত হয়। দু'তলার ঘর তালাবদ্ধ থাকে।

একটা ঘরে বীনার বাবা এমদাদ সাহেব থাকেন। পান্ডিত্যবিশারদের কারণে এই ঘর থেকে বের হবার তাঁর কোনো উপায় নেই। অন্য একটা ঘরে বীনা এবং বীনার দূর সম্পর্কের মামি মরিয়ম থাকেন। ঘরের কাজকর্ম করার জন্যে বাতাসী নামের কম বয়েসি এটা মেয়ে থাকে। তার চোখে অসুখ আছে। রাতে সে কিছুই দেখে না।

বাড়িতে মানুষ বলতে এই চারটি প্রাণী। সন্ধ্যার পর থেকেই বীনার ভয়-ভয় করে। দোতলার বারান্দায় কীসের যেন শব্দ হয়। মনে হয় খড়ম পড়ে কেউ যেন হাঁটে। বীনা জানে ইঁদুর শব্দ করছে— তবু তার ভয় কাটে না। দুর্বল নার্ভের কারণেই হয়তো আতঙ্কে তার শরীর কাঁপতে থাকে। সে ফিসফিস করে বলে— ‘কীসের শব্দ মামি?’

মামি ঘরে কাজ করতে করতে নির্বিকার গলায় বলেন, ‘জানি না।’

‘মনে হয় ইঁদুরের শব্দ তাই না মামি?’

‘হইতেও পারে।’

‘অন্য কিছু কি?’

‘সইক্যা বেলায় এরার নাম নেওন নাই মা। খারাপ বাতাস হইতে পারে।’

‘খারাপ বাতাস?’

‘কতদিনের পুরানো বাড়ি। উপরের ঘরগুলান খালি পইড়া থাকে। কেউ বাতি দেয় না। ঘরে বাতি না দিলে খারাপ বাতাসের আনাগোনা হয়।’

‘বাতি দেয় না কেন? বাতি দিলেই তো হয়। কাল থেকে রোজ সন্ধ্যায় বাতি দিবেন মামি।’

‘আইচ্ছা দিমনে। অখন ঘুমাও।’

বীনা শুয়ে থাকে। ঘুমে আসে না। রাত যতই বাড়তে থাকে দোতলার শব্দ ততই বাড়তে থাকে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয় বীনার বাবার গোঙানি। গভীর রাতে

তিনি হাঁটুর ব্যথায় গোঙানির মতো শব্দ করেন। সেই শব্দও বীনার কানে অমানুষিক শব্দ বলে মনে হয়। যেন বীনার বাবা নয় অন্য কেউ শব্দ করছে। সেই অন্য কেউ মানুষগোত্রীয় নয়। এক ধরনের চাপা হাসিও শোনা যায়।

বীনাদের স্নানঘর মূল ঘর থেকে অনেকটা দূরে। স্নানঘর বীনার খুব প্রিয়। শ্যাওলা ধরা দেয়াল ঘেরা ছোট চারকোনা একটা জায়গা। ভেতরে চৌবাচ্চা আছে। স্নানঘরের ছাদটা ছিল টিনের। গত আশ্বিন মাসের ঝড়ে টিনের ছাদ উড়ে গেছে। সেই ছাদ আর ঠিক করা হয়নি। গোসলের সময় মাথার উপর থাকে খোলা আকাশ। ঠিক দুপুরবেলায় সূর্যের ছায়া পড়ে চৌবাচ্চার পানিতে। মগ ডুবালেই চৌবাচ্চা থেকে আলো ঠিকরে পড়ে চারদিকের সবুজ দেয়ালে। বীনার বড় ভালো লাগে। দুপুরবেলা বীনার অনেকখানি সময় এই গোসলখানায় কেটে যায়। রোজই মনে হয় গ্রামের বাড়িতে এসে ভালোই হয়েছে। রাতের তীব্র আতঙ্কের কথা তখন আর মনে থাকে না।

এক দুপুরবেলায় এই গোসলখানাতেই অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার ঘটল। বীনা গোসল করছে। চারদিক সুনসান নীরবতা। ঘন নীল আকাশের ছায়া পড়েছে চৌবাচ্চায়। বীনার চমৎকার লাগছে। শরীরটা আগের মতো দুর্বল লাগছে না। সে আপন মনে খানিকক্ষণ গুন গুন করল।

বীনা মাথায় পানি ঢালল। ঠাণ্ডা পানি। শরীর কেঁপে উঠল। আর তখনই সে অদ্ভুত একটা গন্ধ পেল। অদ্ভুত হলোও গন্ধ চেনা, এই গন্ধ সে আগেও পেয়েছে। বীনা আতঙ্কে অতিভূত হয়ে পড়ল। নির্জন গোসলখানায় এই গন্ধ এল কোথেকে? পোড়া কাঠকয়লার সঙ্গে মেশা নষ্ট দুধের মিশ্র গন্ধ। বীনা মগ ছুঁড়ে ফেলে গোসলখানার দরজায় আছড়ে পড়ল। দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে যেতে হবে। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা যাবে না। এক মুহূর্তও না।

আশ্চর্যের ব্যাপার! বীনা দরজা খুলতে পারল না। ছিটকিনি নামান হয়েছে। বীনা প্রাণপণে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে অথচ দরজা এক চুলও নড়ছে না। যেন কেউ তাকে আটকে ফেলেছে। বীনা চিৎকার করবার চেষ্টা করল। গলা দিয়ে গদ বেরুল না। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা তো নড়লই না, কোনো শব্দ পর্যন্ত হলো না। অথচ ঘরে অন্য এক রকম শব্দ হচ্ছে। যেন কি একটা পড়ছে চৌবাচ্চায়। টুপটাপ শব্দ। বৃষ্টির ফোঁটার মতো।

কী পড়ছে? কীসের শব্দ হচ্ছে?

বীনা হতভম্ব হয়ে দেখল টকটকে লালবর্ণের রক্ত পড়ছে চৌবাচ্চায়। চৌবাচ্চার পানি ক্রমেই ঘোলা হয়ে উঠছে। কেউ-একজন খোলা ছাদে বসে আছে। রক্ত পড়ছে তার গা থেকে।

বীনা সেই দৃশ্য দেখতে চায় না। সে কিছুতেই উপরে দিকে তাকাবে না। সে জানে উপরের দিকে তাকালেই ভয়ঙ্কর কিছু দেখবে। এমন ভয়ঙ্কর কিছু— যা ব্যাখ্যার অতীত, অভিজ্ঞতার অতীত।

কেউ-একজন খোলা ছাদে বসে আছে। রক্ত পড়ছে তার গা থেকে। ভারী, শ্লেষ্মা-জড়িত স্বরে সে ডাকল— ‘বীনা, ও বীনা।’ শব্দ উপর থেকে আসছে। কেউ-একজন বসে আছে গোসলখানার দেয়ালে। যে বসে আছে তাকে বীনা চেনে। না দেখেও বীনা বলতে পারছে কে বসে আছে।

‘ও বীনা, বীনা।’

বীনা তাকাল। হ্যাঁ, ঐ লোকটিই বসে আছে। তবে লোকটির মুখ পশুর মতো নয়। মায়া মাখা একটি মুখ। বড় বড় চোখ দুটি বিষণ্ণ ও কালো। লোকটি পা ঝুলিয়ে বসে আছে। পা দুটি অস্বাভাবিক— খঁগাতলান। চাপচাপ রক্ত সেই খঁগাতলান পা বেয়ে চৌবাচ্চার জড়ে পড়ছে। লোকটি ভারী শ্লেষ্মাজড়িত স্বরে ডাকল— ‘বীনা, ও বীনা।’

বীনা জ্ঞান হারাল।

তার জ্ঞান ফিরল তৃতীয় দিনে জামালপুর সদর হাসপাতালে। চোখ মেলে দেখল আরো অনেকের সঙ্গে বিছনার পাশে ইদরিশ সাহেব বসে আছেন। তাঁকে টেলিগ্রাম করে আনান হয়েছে।

ইদরিশ সাহেব গভীর মমতার সঙ্গে বললেন, ‘কী হয়েছে রে মা?’

বীনা ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলল, ‘ভয় পেয়েছি মামা।’

ইদরিশ সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, ‘ভয় পাবারই কথা। ঐ জংলা বাড়িতে আমি নিজেই ভয় পাই, আর তুই পাবি না? এখানে থাকার দরকার নেই। চল আমার সঙ্গে ঢাকায়। ঢাকায় গিয়ে আবার কলেজে যাওয়া-আসা শুরু কর। ঐ ছেলে আর তোকে বিরক্ত করবে না। বেচারি ট্রাক এ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।’

বীনা চোখ বন্ধ করে ফেলল।

ইদরিশ সাহেব নিজের মনেই বললেন, ‘পায়ের উপর দিয়ে ট্রাক চলে গেছিল। দু’টা পা-ই ছাতু হয়ে গেছে। হাসপাতালে নেয়ার আঠারো ঘণ্টা পরে মারা গেছে। খবর পেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। না গেলে অভদ্রতা হয়।’

ইদরিশ সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ‘ছেলেটা খারাপ ছিল না। বুঝলি? খামোকাই আজীবনে সন্দেহ করেছি। অতি ভদ্র ছেলে। তোর কথা জিজ্ঞেস করল। বেশ কয়েক বার জিজ্ঞেস করল।’

বীনার খুব ইচ্ছা করল বলতে— আমার কথা কী জিজ্ঞেস করল মামা? সে বলতে পারল না।

ইদরিশ সাহেব বললেন, ‘ছেলেটার এ্যাকসিডেন্টের খবর তার অঞ্চলে পৌঁছামাত্র সেখানে সব লোক এসে উপস্থিত। হাজার হাজার মানুষ। হাউমাউ করে কাঁদছে। দেখবার মতো একটা দৃশ্য। বুঝলি বীনা, আমরা মানুষের বাইরেরটাই শুধু দেখি। অন্তর দেখি না। এটা খুবই আফসোসের ব্যাপার। তোর যাতে ভালো বিয়ে হয় এইজন্যে আমাকে কিছু টাকাও দিয়ে গেছে। না করতে পারলাম না। একটা মানুষ মারা যাচ্ছে, কি করে ‘না’ বলি। ঠিক না?’



অয়োময়

বদরুল আলম সাহেব তারাবির নামাজ পড়তে খাবেন— কি মনে করে যেন বাংলাঘরে উঁকি দিলেন। ঘর অন্ধকার। অথচ তিনি সন্ধ্যাবেলায় মাগরেবের নামাজে দাঁড়াবার আগেই বলেছিলেন বাংলাঘরে যেন বাতি দেয়া হয়। এরা কেউ কথা শোনে না। রাগে তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। ইদানীং তাঁর এই সমস্যা হয়েছে, রেগে গেলে শরীর কাঁপে।

বাংলাঘরে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব ব্যাপার। বিকট দুর্গন্ধ! মানুষের শরীর পচে গেলে এমন অসহ্য ব্যাপার হয় কে জানত। দুর্গন্ধ নাকের ভিতর দিয়ে ঘ্যাৎ করে মাথার দিকে যায়। মাথা ঝিমঝিম করে। তারপরই বমিবমি ভাব হয়। বদরুল আলম সাহেব রুমাল দিয়ে নাক ঢাকলেন। ঘরে ঢোকান আগেই ঢাকা উচিত ছিল। দেরি হয়ে গেছে। তাঁর মেজাজ আরো খারাপ হলো। বাংলাঘরে ঢোকা উচিত হয়নি। কিছুক্ষণ আগে ভাত খেয়েছেন, খাবার-দাবার বমি হয়ে যেতে পারে। তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন এখন ভাত না দিতে। তারাবি পড়ে খাবেন। এটা শুনল না। কেউ আজকাল তাঁর কথা শুনছে না।

তিনি নাকে রুমাল চাপা দিয়েই ডাকলেন, ‘এ্যাই, এ্যাই।’

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। মরে গেছে না-কি? আশ্চর্য, একটা মানুষ অর্ধেকটা শরীর পচে গেছে তবু মরার নাম নেই। উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছে। বলেছে, হাসপাতালে রেখে কী করবেন। বড়জোর দুই দিন, বাড়িতে নিয়ে যান। বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের মাঝখানে আরাম করে মরবে।

আর গাধাগুলি তাকে নিয়ে এসে তাঁর বাংলা ঘরে শুইয়ে দিয়েছে। কী যন্ত্রণা! এটা কি তার বাড়িঘর? গাধাগুলির সাহস দেখে তিনি স্তম্ভিত। বাংলাঘর দশ কাজে ব্যবহার হয়। লোকজন আসে। সেখানে আধা পচা মানুষ এনে শুইয়ে দিল। বিকট গন্ধে বাংলাঘরের ত্রিসীমানায় এখন কেউ যেতে পারে না। নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসে।

তিনি আরো উঁচু গলায় ডাকলেন, 'এ্যাই, এ্যাই।'

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। তিনি কিছুক্ষণ কান পেতে রইলেন। নিশ্বাস ফেলার শব্দও আসছে না। নড়াচড়ার শব্দও নেই। মারা গেছে বোধহয়। আশ্চর্য এই বাড়ির লোকজনের কাণ্ডজ্ঞান। এখন মরে তখন মরে একটা মানুষ, তার ঘরে সন্ধ্যাবেলা বাতি দেয়নি। অথচ তিনি নিজে জায়নামাজে দাঁড়াবার আগে বলেছেন যেন বাতি দেয়া হয়। কতক্ষণ আগে মরেছে কে জানে। অন্ধকার ঘর, কে জানে শিয়াল-কুকুরে টেনে নিয়ে গিয়ে হয়তো খেয়ে ফেলেছে।

তিনি নাক থেকে রুমাল সরাতেই ভক্ করে আরও খানিকটা গন্ধ ঢুকে গেল। তিনি বিশেষ গ্রাহ্য করলেন না। দেয়াশলাইয়ের কাঠি ধরালেন। ঘর খানিকটা আলো হলো।

না মরেনি। পিটপিট করে তাকাচ্ছে। ডাক্তার বলে দিয়েছে দু'দিনের বেশি টিকবে না। আজ হলো তেরো দিন। আজিকালি ডাক্তারগুলির কি রকম বিদ্যা-বুদ্ধি! যে রুগির দু'দিন বাঁচার কথা পেতে তেরো দিন বাঁচে কী করে!

বদরুল আলম সাহেব বললেন, 'খুঁচে আছ?'

ইউনুস বলল, 'জে আছি।'

'যখন এ্যাই বললাম, তখন কথা বললে না কেন?'

ইউনুস জবাব দিল না। সে কথা বলেনি ভয়ে। বদরুল আলম সাহেবকে সে বড় ভয় পায়। তা ছাড়া সে এই বাড়ির কামলাও না। সে কাজ করত পুৰ-পাড়ায়। তারা তাকে রাখতে রাজি না হওয়ায় সবাই মিলে এই বাড়িতে রেখে গেছে। বদরুল আলম সাহেবও রাখতে রাজি হননি। দু'দিনের বেশি টিকবে না শুনে কিছু বলেননি। তা ছাড়া রমজান মাস।

বদরুল আলম সাহেব রাগী বলায় বললেন, 'ঘরে বাতি দেয় নাই?'

'দিছিল, নিভ্যা গেছে।'

কুপির বাতি। বাতাসে নিভে যাওয়ারই কথা। বাংলা ঘরে এখন কেউ আসে না, কাজেই হারিকেন দেয়া বিপজ্জনক। চোর এসে নিয়ে যাবে। এই লোক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে, কিছু করতে পারবে না।

'ভাত দিয়েছে?'

'জে দিছে।'

‘আচ্ছা ঠিক আছে।’

ঘর থেকে বেরবার আগে তিনি আবার কুপি জ্বেলে দিয়ে গেলেন। যতক্ষণ থাকে থাকুক।

মসজিদে সবাই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। তিনি যাওয়ামাত্র তারাবির নামাজ শুরু হলো। নামাজ শেষ হতে তেমন সময় লাগল না। কিন্তু দোয়া আর যেন শেষ হতেই চায় না। এক দোয়ায় বাংলা, উর্দু, আরবি— নানান ভাষা। এই মৌলানা সাহেবের চাকরি এখনো স্থায়ী হয়নি। রমজান মাসে তাঁর কাজকর্ম দেখে তারপর স্থায়ী করা হবে তেমন কথা হয়েছে।

ব্যাটা সে কারণেই দোয়ার মাধ্যমে কাজকর্ম দেখাচ্ছে। দোয়ার শেষ পর্যায়ে আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। বড়ই বিরক্তিকর।

বদরুল আলম সাহেব ঠিক করে রাখলেন আজ মৌলানাকে দু’একটা কথা বলবেন। তিনি মসজিদ কমিটির সভাপতি। তাঁর পক্ষে এইসব বলা ভালো দেখায় না, তবু বলতে হবে। মানুষের কাজকর্ম আছে। সারাদিন জেগে দোয়া পড়লে তো হবে না। মৌলানা সাহেব দোয়ার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছেন— ‘ওগো পেয়ারা নবির পেয়ারা দোস্ত, তোমার কাছে হাত না তুললে আমরা কার কাছে হাত তুলব? কারণ তুমি নিজেই তো কোরান মজিদে বলেছ— মারাজ্বালে বাহরাইনি ইয়ালতাক্বিইয়া-ন

অর্থাৎ- তিনি বহমান রেখেছেন দুটি বিশাল জলরাশিকে...

বাইনহুমা-বারযাখু

অর্থাৎ- তাদের দু’য়ের মাঝে রয়েছে কুদরতি পর্দা...

বদরুল আলম সাহেবের বিরক্তির সীমা রইল না।

আজ রাতে দোয়া মনে হচ্ছে শেষ হবে না। মৌলানাকে সাবধান করে দিতে হবে। কিছু না বলায় লাই পেয়ে যাচ্ছে।

দোয়া শেষ হলো। বদরুল আলম সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, মৌলানা সাহেব আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল। তাঁর গলার স্বরেই মৌলানা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তিনি কী বলবেন তা না শুনেই বলল, ‘আপনের কথামতো আমি গেছিলাম। সে রাজি হয় না। এই কাজ তো জবরদস্তিতে হয় না। যদি বলেন আইজ না হয় আরেকবার যাব।’

‘আপনে কীসের কথা বলতেছেন?’

‘আপনে যে বলছিলেন তওবা করাইতে। তওবা করতে রাজি হয় না।’

এতক্ষণে বদরুল আলম সাহেবের মনে পড়ল। মৌলানাকে গত সপ্তাহে বলেছিলেন যেন ইউনুসকে দিয়ে তওবা করানো হয়। একবার তওবা করে ফেললে তিনদিনের ভেতর ঘটনা ঘটে যায়। তাঁর ধারণা ছিল, মৌলানা তওবা করিয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে তওবা করায়নি।

‘তওবা করতে চায় না কেন?’

‘ভয় পায়। মরতে চায় না।’

‘তওবার সাথে বাঁচা-মরার কী সম্পর্ক? জন্ম-মৃত্যু তো আল্লাহর হাতে। আপনি এখনই চলেন। তওবা করিয়ে দেন। আমি সামনে থাকলে অরাজি হবে না।’

‘জি আচ্ছা।’

‘তা ছাড়া এখন মৃত্যু হলে তা তার জন্যে শুভ। রমজান মাসে মৃত্যু সরাসরি জান্নাতের দরজা— কি বলেন আপনারা?’

সবাই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। একজন বলল, ‘এর জন্যে আপনি যা করছেন তা বাপ-মা’ও করত না। বাপ-মা’র অধিক করছেন আপনি।’

বদরুল আলম সাহেব উদাস গলায় বললেন, ‘আমি তো করার কেউ না। যার করার তিনিই করেন। আমরা হলাম উপলক্ষ। ঐ দিব্য ঘিয়া বাড়ির কুদ্দুস সাহেব আসছিলেন। তিনি বললেন, আপনি করছেন কি? অথবা অন্য কোনোখানে ফালায়ে দিয়ে আসেন। আমি বললাম, রমজান মাসে এই রকম কথা মুখে আনবেন না কুদ্দুস সাহেব।’

ইউনুসকে এক ধমক দিতেই সে তওবা করতে রাজি হয়ে গেল। মৌলানা সাহেব বললেন, ‘এইবার আল্লাহপাক তেমাকে আজাব থেকে মুক্তি দিবেন। তা ছাড়া তুমি এখন সাত দিনের শিশুর মতো পবিত্র। সরাসরি জান্নাতে দাখিল হবে। বুঝতে পারলো?’

‘জে পারছি।’

‘কারো উপরে কোনো দাবি-দাওয়া রাখবে না। দাবি-দাওয়া তুইল্যা নাও।’

‘জে-আচ্ছা।’

‘বললে তো হুঁসে না। বলো কারো উপরে কোনো দাবি-দাওয়া নাই।’

‘কারো উপরে কোনো দাবি-দাওয়া নাই।’

মৌলানা সাহেব থাকেন মসজিদে। মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে মসজিদের পাশেই একটা ঘর তুলে দেয়ার কথা। এখনো তোলা হয়নি। সবই অবশ্য নির্ভর করছে বদরুল আলম সাহেবের উপর। তিনি একবার হ্যাঁ বললেই হয়। মৌলানা সাহেব মসজিদে যাবার আগে বদরুল আলম সাহেবের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। বদরুল আলম সাহেব বললেন, ‘তওবা ঠিকঠাক হয়েছে?’

‘জি।’

‘অবস্থা কী দেখলেন?’

‘সময় ঘনিয়ে আসছে। তওবার পরে তিন দিনের বেশি টিকে না। তবে এ তাও টিকবে না। হয়েছে কী?’

‘জানি না। শরীর পচে যাচ্ছে এতো দেখি। গন্ধে থাকা মুশকিল। এদিকে সাতাশ রোজায় মেয়ে, মেয়ে-জামাই আসতেছে।’

মৌলানা দৃঢ় স্বরে বলল, ‘এ এক-দুই দিনের বেশি নাই।’

তওবা পড়ানোর চতুর্থ দিনেও দেখা গেল ইউনুস বেঁচে গেছে। প্রশ্ন করলে চিঁ-চিঁ করে জবাব দেয়। তবে অবস্থা যে খুব খারাপ তা বোঝা যায়। আগে শরীরের পচা দুর্গন্ধ বাংলাঘরের আশপাশেই সীমাবদ্ধ ছিল— এখন তা ভেতর বাড়ি পর্যন্ত গেছে।

সেনিটারি ইন্সপেক্টরের পরামর্শে ঘরের চারদিকে প্রচুর ফিনাইল দিয়েছেন, তাতেও গন্ধ যাচ্ছে না। তা ছাড়া বাংলাঘরের চারপাশে এখন শিয়াল ঘুরাফিরা করে। মানুষ-পচা গন্ধের আকর্ষণ এড়াতে পারে না।

বদরুল আলম সাহেব নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দেখতে গেলেন, ‘কী রে অবস্থা কী?’

‘জে ভালো।’

‘ভালো হলেই ভালো।’

‘রাইতে বড় ভয় লাগে।’

‘ভয় লাগে কেন?’

‘কী যেন চাইরপাশে ঘুরাফিরা করে। চট্টাফে দেখি না, খালি কথা শুনি।’

মৌলানা সাহেব এসব শুনে বললেন, ‘সময় ঘনিয়ে আসছে। আজরাইল চাইরপাশে ঘুরাফিরা করে।’

মৌলানার উপর বিরক্তিতে বদরুল আলম সাহেবের গা জ্বলে যায়। কী সব কথা, আজরাইল ঘুরাফিরা করে! ব্যাটা তওবাটা ঠিকমতো পড়িয়েছে কি-না কে জানে।

‘মৌলানা সাহেব?’

‘জি।’

‘তওবা কি ঠিকঠাক পড়ানো হয়েছে?’

‘জি— তা হইছে।’

‘দেখেন আরেকবার পড়াবেন কি-না। কষ্ট পাচ্ছে এইজন্যে বলতেছি, অন্য কিছু না।’

‘আইজ আরেকবার পড়িয়ে দিব। কোনো অসুবিধা নাই। তওবা দিনের মধ্যে দুইবারও পড়ানো যায়। কোনো অসুবিধা নাই। এই প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহর একটা হাদিস আছে। পেয়ারা নবি বলছেন...’

‘আচ্ছা থাক। আরেকদিন শুনব।’

মৌলানা সাহেব বললেন, ‘অনেক সময় মনের মধ্যে কোনো আফসোস

থাকলে জ'ব বাইর হইতে চায় না। জিজ্ঞেস কইরা দেখা দরকার কিছু খাইতে চায় কি-না। কাউরে দেখতে চায় কি-না।'

‘আচ্ছা এটা খোঁজ নিব।’

দ্বিতীয়বার তওবার কথা শুনে ইউনুস বেশ অবাক হলো। চিঁ-চিঁ করে বলল, ‘একবার তো করছি। তওবার পরে কোনো পাপ কাজ করি নাই।’

মৌলানা সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, ‘নাফরমানী কথা বলবা না। পাপ কাজ করছ কি কর নাই তার বিচার তোমার উপরে না, আল্লাহ পাকের উপরে।’

আবার তওবা পড়ানো হলো। বদরুল আলম সাহেব তওবা পড়ানোর শেষে খোঁজ নিতে এলেন, ‘কী-রে শইল কেমন?’

‘জে ভালো।’

‘কিছু খাইতে মনে চায়?’

‘জে না।’

‘মনে চাইলে বল।’

‘তেঁতুলের পানি দিয়া ভাত খাইতে মনে চায়।’

তাকে তেঁতুলের পানি দিয়ে ভাত খেতে দেয়া হলো। ভাত খাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। বুকের হাড়ের মতো উঠানামা করছে। চোখ মনে হয় বের হয়ে আসছে। বদরুল আলম সাহেব মৌলানাকে খবর দিয়ে রাখলেন। ভালোমন্দ কিছু হলে দিনের মধ্যেই দাফন-কাফন শেষ করতে হবে।

দিনে কিছুই হলো না। রাতে শ্বাসকষ্ট মনে হলো খানিকটা কমে এসেছে।

মৌলানা সাহেব ঘুমুতে গেলেন। যাবার আগে বদরুল আলম সাহেবকে বলে গেলেন, আরো একটা দিন দেখতে হবে।

বদরুল আলম সাহেব কোনো গলায় বললেন, ‘আর একদিন পরে কী?’

‘অমাবস্যা লাগতেছে। অমাবস্যার টান সহ্য হবে না।’

বদরুল আলম সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, ‘একদিকে বলেন আজরাইলের কথা, আরেকদিকে বলেন অমাবস্যার কথা। আজরাইল কি পূর্ণিমা-অমাবস্যা দেখে ঘুরাফিরা করে?’

অমাবস্যার রাতে ইউনুসের অবস্থা খুবই খারাপ হলো। বুকের ভেতর থেকে গৌঁ-গৌঁ শব্দ বেরুচ্ছে। মুখে ফেনা ভাঙছে। রাত যে কাটবে না, তা বোঝাই যাচ্ছে। বদরুল আলম সাহেবের স্ত্রীও শাড়ির আঁচলে মুখ চেপে একসময় ইউনুসকে দেখে গেলেন। খাবার প্লেটে পড়ে আছে। ইউনুস ছুঁয়েও দেখেনি। তিনি বললেন, ‘এর মুখে তোমরা পানি দাও, দেখছ না ঠোট চাটতেছে। আহা রে!’

ভোরবেলা বদরুল আলম সাহেব খোঁজ নিতে গেলেন।

‘কী রে অবস্থা কী?’

ইউনুস চিঁ চিঁ করে বলল, ‘জে ভালো।’

‘শ্বাসকষ্ট নাই?’

‘জে না।’

বদরুল আলম সাহেবের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ইউনুস বলল, ‘রাইতে একটা শিয়াল ঢুকছিল। পাও হাতে কামড় দিচ্ছে। আইজ আপনে বইল্যা দিবেন হাতের কাছে যেন একটা লাঠি দেয়। আর একটা হারিকেন।’

বদরুল আলম সাহেব কিছুই বললেন না। তাঁর মেজাজ রোজার সময় এমনিতেই চড়া থাকে। আজ সেই মেজাজ আকাশে চড়ে গেল।

তিনি ইফতারি সময় মজনুকে বলে দিলেন, ইউনুসের হাতের কাছে যেন একটা লাঠি দেয়া হয়। আর একটি হারিকেন। মজনু এ বাড়ির কামলা। তার উপর দায়িত্ব ইউনুসকে খাবার-দাবার দিয়ে আসা। এই কাজটা তার খুবই না-পছন্দ, কারণ ইউনুস এখন আর নিজে-নিজে খেতে পারে না। খাবার মুখে তুলে দিতে হয়। ঘেন্নায় মজনুর বমি আসার উপক্রম হয়।

মজনু বলল, ‘ইউনুস হারামজাদা বিরাট বজ্জাত।’

বদরুল আলম সাহেব তাকালেন। কেন বজ্জাত সেটা গুনতে চান।

মজনু বলল, ‘মৌলানা সাব যে দুই-দুইবার তওবা করাইলেন, কোনোবারই এই হারামজাদা তওবা করে নাই। মৌলানা সাব তারে যে কথা বলছেন, হে মনে-মনে উল্টা কথা বলেছে।’

‘তোকে বলেছে কে?’

‘হে নিজেই বলেছে। তওবা করলে জেবন শেষ এইজন্যে।’

‘বলিস কি!’

‘হারামজাদা বিরাট বজ্জাত।’

মাগরেবের নামাজের পর বদরুল আলম সাহেব ইউনুসকে দেখতে গেলেন। ইউনুসের হাতের কাছে লাঠি। হারিকেন জ্বলছে।

‘কিরে তুই না-কি তওবা করস নাই?’

ইউনুস চুপ করে রইল।

‘ক্যান করস নাই? আল্লাহর সাথে মশকরা? হারামজাদা, তুই তো বিরাট বদ।’

ইউনুস ক্ষীণ স্বরে বলল, ‘মরতে চাই না’।

দীর্ঘ সময় বদরুল আলম সাহেব ইউনুসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার একটা পা ফুলে কোলবালিশের মতো হয়ে গেছে। এই পায়েই বোধহয় শিয়াল কামড়েছে।

ইউনুস বলল, ‘আপনে যদি বলেন তাইলে আরেকবার ঠিকমতো তওবা করি।’

‘থাক, তার আর দরকার নাই। তোর যখন অতই বাঁচনের শখ, দেখি একটা চেষ্টা কইরা। চল, তোরে ময়মনসিং নিয়া যাই। দেখি কী অবস্থা।’

ইউনুস মনে হয় কথাগুলি ঠিক বুঝতে পারে না। ঘোরা লাগা চোখে তাকিয়ে থাকে।

বদরুল আলম সাহেব রাতেই মহিষের গাড়ির ব্যবস্থা করেন। প্রথমে যেতে হবে নেত্রকোনা, নেত্রকোনা থেকে ময়মনসিংহ। সেখানে ডাক্তাররা জবাব দিলে নিতে হবে ঢাকা।

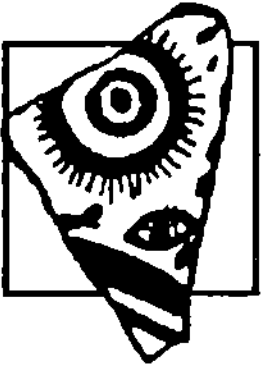
মহিষের গাড়ি রওনা হলো রাত আটটায়। অঞ্চলের সমস্ত মানুষকে অবাক করে দিয়ে তিনিও সঙ্গে চললেন। অনেক দৌড়াদৌড়ি ছোট্টাছুটির ব্যাপার আছে। ছেলে-ছোকরাদের ওপর ভরসা করা যায় না।

‘ইউনুস?’

‘জে।’

‘ঝুলে থাক। হাল ছাড়িস না, আমি আছি।’

ইউনুসের চোখ দিয়ে পানি পড়ে। সে প্রাণপণে ঝুলে থাকতে চেষ্টা করে। মহিষের গাড়ি দ্রুত এগিয়ে যায়।



AMARBOL.COM

সঙ্গিনী

মিসির আলি বললেন, ‘গল্প শুনবেন না-কি?’

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত মন্দ হয়নি। দশটার মতো বাজে। বাসায় ফেরা দরকার। আকাশের অবস্থাও ভালো না। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে। আষাঢ় মাস। যে-কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে।

আমি বললাম, ‘আজ থাক। আরেকদিন শুনব। রাত অনেক হয়েছে। বাসায় চিন্তা করবে।’

মিসির আলি হেসে ফেললেন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ‘হাসছেন কেন?’

মিসির আলি হাসতে হাসতেই বললেন, ‘বাসায় কে চিন্তা করবে? আপনার স্ত্রী কি বাসায় আছেন? আমার তো ধারণা তিনি রাগ করে বাচ্চাদের নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে গেছেন।’

মিসির আলির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং সামান্য সূত্র ধরে সিদ্ধান্তে চলে যাবার প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার সঙ্গে আমি পরিচিত। তবুও বিস্মিত হলাম। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আজ দুপুরেই বড় ধরনের ঝগড়া হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় সে স্যুটকেস গুছিয়ে বাবার বাড়ি চলে গেছে। একা একা খালি বাড়িতে থাকতে অসহ্য বোধ হচ্ছিল বলে মিসির আলির কাছে এসেছি। তবে এই ঘটনার কিছুই বলিনি। আগ বাড়িয়ে পারিবারিক ঝগড়ার কথা বলে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না।

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, ‘ঝগড়া হয়েছে বুঝলেন কী করে?’

‘অনুमानে বলছি।’

‘অনুমানটাই বা কী করে করলেন?’

‘আমি লক্ষ করলাম, আপনি আমার কাছে কোনো কাজে আসেননি। সময় কাটাতে এসেছেন। গল্প করছেন এবং আমার গল্প শুনছেন। কোনো কিছুতেই তেমন আনন্দ পাচ্ছেন না। অর্থাৎ, কোনো কারণে মন বিক্ষিপ্ত। আমি বললাম, ‘ভাবী কেমন আছেন?’ আপনি বললেন, ‘ভালো।’ কিন্তু বলার সময় আপনার মুখ কঠিন হয়ে গেল। অর্থাৎ, ভাবীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। আমি তখন নিশ্চিত হবার জন্যে বললাম, ‘আমার সঙ্গে চারটা ভাত খান।’ আপনি রাজি হয়ে গেলেন। আমি ধরে নিলাম—রূপারাগি হয়েছে এবং আপনার স্ত্রী বাসায় নেই। আপনার একা একা লুপে গেলেই আপনি এসছেন আমার কাছে। এই সিদ্ধান্তে আসার জন্যে শার্লক হোমস হতে হয় না। একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বুঝা যায়।

আমি কিছু বললাম না। মিসির আলি বললেন, ‘চা চড়াচ্ছি। চা খেয়ে গল্প শুনুন। তারপর এইখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। খালি বাসায় একা রাত কাটাতে ভালো লাগবে না। তা ছাড়া বৃষ্টি নামতে পারে।’

‘এটাও কি আপনার লজিক্যাল ডিডাকশান?’

‘না—এটা হচ্ছে উইসফুল থিংকিং। গরমে কষ্ট পাচ্ছি—বৃষ্টি হলে জীবন বাঁচে। তবে বাতাস ভারী, বৃষ্টির দেরি নেই বলে আমার ধারণা।’

‘বাতাসের আবার হাক্কা-ভারী কী?’

‘আছে। হাক্কা-ভারীর ব্যাপার আছে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যখন বেড়ে যায় বাতাস হয় ভারী। সেটা আমি বুঝতে পারি মাথার চুলে হাত দিয়ে। জলীয় বাষ্পের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে মাথার চুল নরম বা শক্ত

হয়। শীতকালে মাথার চুলে হাত দিয়ে দেখবেন এক রকম, আবার গরম কালে যখন বাতাসে হিউমিডিটি অনেক বেশি তখন অন্যরকম।’

‘আমার কাছে তো সব সময় এক রকম লাগে।’

মিসির আলি ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন। ভাবটা এ রকম যেন এরচে’ মজার কথা আগে শুনেিনি। আমি বোকার মতো বসে রইলাম। অস্বস্তিও লাগতে লাগল। খুব বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে গল্প করার মধ্যেও এক ধরনের অস্বস্তি থাকে। নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হয়।

মিসির আলি স্টোভে চায়ের পানি বসিয়ে দিলেন। শৌ-শৌ শব্দ হতে লাগল। এই যুগে স্টোভ প্রায় চোখেই পড়ে না। মিসির আলি এই বস্তু কোথেকে যোগাড় করেছেন কে জানে। কিছুক্ষণ পরপর পাম্প করতে হয়। অনেক যন্ত্রণা।

চায়ের কাপ হাতে বিছানায় এসে বসামাত্র বৃষ্টি শুরু হলো। তুমুল বর্ষণ। মিসির আলি বললেন, আমার বেহেশতে যেতে ইচ্ছা করে না কেন জানেন?

‘জানি না।’

‘বেহেশতে যেতে ইচ্ছা করে না কারণ সেখানে ঝড়-বৃষ্টি নেই। এয়ারকুলার বসানো একটা ঘরের মতো সেখানকার আবহাওয়া। তাপ বাড়বেও না, কমবেও না। অনন্তকাল একই থাকবে। কোনো মানে হয়?’

‘আপনি কি বেহেশত-দোজখ এইসব নিয়ে মাথা ঘামান?’

‘না ঘামাই না।’

‘সৃষ্টিকর্তা নিয়ে মাথা ঘামান?’

‘হ্যাঁ ঘামাই। খুব চিন্তা করি, কোনো কূলকিনারা পাই না। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থ কী বলে জানেন? বলে— সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর পারেন না এমন কিছুই নেই। তিনি সব পারেন। অথচ আমার ধারণা তিনি দু’টা জিনিস পারেন না যা মানুষ পারে।’

‘আমি অবাক হয়ে বললাম, উদাহরণ দিন।’

‘সৃষ্টিকর্তা নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন না। মানুষ পারে। আবার সৃষ্টিকর্তা দ্বিতীয় একজন সৃষ্টিকর্তা তৈরি করতে পারেন না। মানুষ কিন্তু পারে, সে সন্তানের জন্ম দেয়।’

‘আপনি তাহলে একজন নাস্তিক?’

‘না আমি নাস্তিক না। আমি খুবই আস্তিক। আমি এমন সব রহস্যময় ঘটনা আমার চারপাশে ঘটতে দেখেছি যে বাধ্য হয়ে আমাকে আস্তিক হতে হয়েছে। ব্যাখ্যাভীত সব ঘটনা। যেমন স্বপ্নের কথাটাই ধরুন। সামান্য স্বপ্ন অথচ ব্যাখ্যাভীত একটা ঘটনা।’

‘ব্যাখ্যাশীল হবে কেন? ফ্রয়েড তো চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন বলে শুনেছি।’

‘মোটাই চমৎকার ব্যাখ্যা করেন নি। স্বপ্নের পুরো ব্যাপারটাই তিনি অবদমিত কামনার উপর চাপিয়ে দিয়ে লিখলেন— Interpretations of dream; তিনি শুধু বিশেষ এক ধরনের স্বপ্নই ব্যাখ্যা করলেন। অন্যদিক সম্পর্কে চুপ করে রইলেন। যদিও তিনি খুব ভালো করে জানতেন মানুষের বেশ কিছু স্বপ্ন আছে যা ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি এই নিয়ে প্রচুর কাজও করেছেন কিন্তু প্রকাশ করেননি। নষ্ট করে ফেলেছেন। তাঁর ছাত্র প্রফেসর জাং কিছু কাজ করেছেন— মূল সমস্যায় পৌঁছাতে পারেন নি। বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, কিছু-কিছু স্বপ্ন মানুষ কেন দেখে তা বলা যাচ্ছে না। যেমন ‘একটা’ লোক স্বপ্ন দেখল— হঠাৎ মাথার উপর সিলিং ফ্যানটা খুলে পড়ে গেল। স্বপ্ন দেখার দু’দিন পর দেখা গেল সত্যি সত্যি সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে গেছে। এই ধরনের স্বপ্নকে বলে পিকগনিশন ড্রিম (Precognition dream)। এর একটাই ব্যাখ্যা— স্বপ্নে মানুষ ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে। যা সম্ভব নয়। কাজেই এ জাতীয় স্বপ্ন ব্যাখ্যাশীল।’

আমি বললাম, ‘এমনো তো হতে পারে যে, কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে।’

‘হতে পারে। প্রচুর কাকতালীয় ব্যাপার পৃথিবীতে ঘটছে। তবে কাকতালীয় ব্যাপারগুলিকে একটা স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রবাবিলিটির ভেতর থাকতে হবে। Precognition dream-এর ক্ষেত্রে তা থাকে না।’

‘বুঝতে পারছি না।’

‘বোঝানো একটু কঠিন। আমি বরং স্বপ্ন সম্পর্কে গল্প বলি— শুনতে চান?’

‘বলুন শুনি— ভৌতিক কিছু?’

‘না— ভৌতিক না— তবে রহস্যময় তো বটেই। আরেক দফা চা হয়ে যাক।’

‘হোক।’

‘কী ঠিক করলেন? থেকে যাবেন? বৃষ্টি কিন্তু বাড়ছে।’

আমি থেকে যাওয়াই ঠিক করলাম। মিসির আলি চা নিয়ে বিছানায় পাতুলে বসলেন। গল্প শুরু হলো।

‘ছোটবেলায় আমাদের বাসায় ‘খাবনামা’ নামে একটা স্বপ্নতথ্যের বই ছিল। কোন স্বপ্ন দেখলে কি হয় সব ঐ বইয়ে লেখা। আমার মা ছিলেন বইটার বিশেষ ভক্ত। ঘুম থেকে উঠেই বলতেন, ও মিসির বইটা একটু দেখ তো। একটা স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নের মানে কী বল।’

‘আমি বই নিয়ে বসতাম।’

‘দেখ তো বাবা গরু স্বপ্ন দেখলে কী হয়।’

আমি বই উল্টে জিজ্ঞেস করলাম, কী রঙের গরু মা? সাদা না কালো?

‘এই তো মুশকিলে ফেললি, সাদা না কালো খেয়াল নেই।’

‘সাদা রঙের গরু হলে— ধনলাভ। কালো রঙের গরু হলে— বিবাদ।’

‘কার সঙ্গে বিবাদ? তোর বাবার সাথে?’

‘লেখা নাই তো মা।’

মা চিন্তিত হয়ে পড়তেন। স্বপ্ন নিয়ে চিন্তার তাঁর কোনো শেষ ছিল না। আর কত বিচিত্র স্বপ্ন যে দেখতেন! একবার দেখলেন— দু’টা অন্ধ চড়ুইপাখি। খাবনামায় অন্ধ চড়ুইপাখি দেখলে কী হয় লেখা নেই। কবুতর দেখলে কি হয় লেখা আছে। মা’র কারণেই খাবনামা ঘাঁটতে ঘাঁটতে একসময় পুরো বইটা আমার মুখস্থ হয়ে গেল। স্বপ্ন-বিশারদ হিসেবে আমার নাম রটে গেল। যে যা দেখে আমাকে এসে অর্থ জিজ্ঞেস করে। এই করতে গিয়ে জামলাম কত বিচিত্র স্বপ্নই না মানুষ দেখে। সেইসঙ্গে মজার মজার কিছু জিনিসও লক্ষ করলাম। যেমন অসুস্থ মানুষরা সাধারণত বিকট সব দুঃস্বপ্ন দেখে। বোকা মানুষদের স্বপ্নগুলি হয় সরল ধরনের। বুদ্ধিমান মানুষরা খুব জটিল স্বপ্ন দেখে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির একটা স্বপ্ন প্রায়ই দেখে সেটা হচ্ছে কোনো একটি অনুষ্ঠানে সে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে উপস্থিত হয়েছে। সবার গায়ে ভালো পোশাক-আশাক। শুধু সেই পুরোপুরি নগ্ন। কেউ তা লক্ষ করছে না।’

মিসির আলি সাহেব কথা বলা করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এই জাতীয় স্বপ্ন কি আপনি কখনো দেখেছেন?’

‘আমি বললাম, না। একটা স্বপ্নই আমি বারবার দেখি— পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিতে বসেছি। খুব সহজ প্রশ্ন, সবগুলির উত্তর আমার জানা। লিখতে গিয়ে দেখি কলম দিয়ে কালি বেরুচ্ছে না। কলমটা বদলে অন্য কলম নিলাম, সেটা দিয়েও কালি বেরুচ্ছে না। এদিকে ঘণ্টা পড়ে গেছে।’

‘এই স্বপ্নটাও খুব কমন। আমিও দেখি। একবার দেখলাম বাংলা পরীক্ষা— প্রশ্ন দিয়েছে অঙ্কের। কঠিন সব অঙ্ক। বাঁদরের তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে উঠার অঙ্ক। একটা বাঁদরের জায়গায় দু’টা বাঁদর। একটি খানিকটা উঠে অন্যটা তার লেজ ধরে টেনে নিচে নামায়— খুবই জটিল ব্যাপার। বাঁশের সবটা আবার তৈলাক্ত না, কিছুটা তেল ছাড়া..’

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ‘সত্যিই কি এমন স্বপ্ন দেখেছেন?’

‘জি-না। ঠাটা করে বলছি— জটিল সব অঙ্ক ছিল এইটুকু মনে আছে। যাই হোক, ছোটবেলা থেকেই এইসব কারণে স্বপ্নের দিকে আমি ঝুঁকলাম। দেশের বাইরে যখন প্যারাসাইকোলজি পড়তে গেলাম তখন স্পেশাল টপিক

নিলাম ‘ড্রিম’। ড্রিম ল্যাবোরেটরিতে কাজও করলাম। আমার প্রফেসর ছিলেন ড. সুইন হার্ন। দুঃস্বপ্নের ব্যাপারে যাকে পৃথিবীর সেরা বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে। দুঃস্বপ্ন এ্যানালিসিসের তিনি একটা টেকনিক বের করেছেন— যার নাম সুইন হার্ন এ্যানালিসিস। সুইন হার্ন এ্যানালিসিসে ব্যাখ্যা করা যায় না এমন সব দুঃস্বপ্নের একটা ফাইল তাঁর কাছে ছিল। সেই ফাইল তিনি তাঁর গ্রাজুয়েট ছাত্রদের দিতেন না। আমাকে তিনি খুবই পছন্দ করতেন। সম্ভবত, সে কারণেই সেই ফাইল ঘাটার সুযোগ হয়ে গেল। ফাইল পড়ে আমি হতভম্ব। ব্যাখ্যাতেই সব ব্যাপার। একটা উদাহরণ দেই নিউ ইংল্যান্ডের একটি তেইশ বছর বয়েসি মেয়ে দুঃস্বপ্ন দেখা শুরু করল। তার নাভিমূল থেকে একটা হাত বের হয়ে আসছে। স্বাভাবিক হাতের চেয়ে সরু— লম্বা লম্বা আঙুল। হাতটার রঙ নীলচে— খুব তুলতুলে। দুঃস্বপ্নটা। সে প্রায়ই দেখতে লাগল। প্রতিবারই স্বপ্ন ভাঙতো বিকট চিৎকারে। তাকে ড্রিম ল্যাবোরেটরিতে ভর্তি করা হলো। প্রফেসর সুইন হার্ন রুগিণীর মনোবিশ্লেষণ করলেন। অস্বাভাবিক কিছুই পেলেন না। মেয়েটিকে পাঠিয়ে দেয়া হলো নিউ ইংল্যান্ডে। তার কিছুদিন পর মেয়েটি লক্ষ করল তার নাভিমূল ফুলে উঠেছে— এক ধরনের নন ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ হচ্ছে। এক মাসের মধ্যে সেই টিউমার মানুষের হাতের আকৃতি ধারণ করল। টিউমারটির মাথায় মানুষের হাতের আঙুলের মতো পাঁচটি আঙুল...

আমি মিসির আলিকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ‘ভাই এই গল্পটা থাক। শুনতে ভালো লাগছে না। ঘেন্না লাগছে।’

‘ঘেন্না লাগার মতোই ব্যাপার। ছবি দেখলে আরো ঘেন্না লাগবে। মেয়েটির ছবি ছাপা হয়েছে নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিনে। ছবি দেখতে চান?’

‘জি-না।’

‘পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম, পিএইচ. ডি. না করেই ফিরতে হলো। প্রফেসরের সঙ্গে ঝামেলা হলো। যে লোক আমাকে এত পছন্দ করতো সে-ই বিষ নজরে দেখতে লাগল। এম. এস. ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট টাইম টিচিং-এর একটা ব্যবস্থা হলো। ছাত্রদের এবনরমাল বিহেভিয়ার পড়াই। স্বপ্ন সম্পর্কেও বলি। স্বপ্নের সঙ্গে মানুষের অস্বাভাবিক আচরণের একটা সম্পর্ক বের করার চেষ্টা করি। ছাত্রদের বলি, তোমরা যদি কখনো কোনো ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখ তাহলে আমাকে বলবে।’

ছাত্ররা প্রায়ই এসে স্বপ্ন বলে যায়। ওদের কোনো স্বপ্নই তেমন ভয়ঙ্কর না। সাপে তাড়া করছে, আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে— এই জাতীয় স্বপ্ন। আমার ইচ্ছা ছিল দুঃস্বপ্ন নিয়ে গবেষণার কিছু কাজ করব। সেই ইচ্ছা সফল হলো না। দুঃস্বপ্ন দেখছে এমন লোকজনই পাওয়া গেল না। আমি গবেষণার

কথা যখন ভুলে গেলাম তখন এলো লোকমান ফকির ।

লোকমান ফকিরের বাড়ি কুমিল্লার নবীনগরে । বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ । শিপিং করপোরেশনে মোটামুটি ধরনের চাকরি করে । দু'কামরার একটা বাড়ি ভাড়া করেছে কাঁঠালবাগানে । বিয়ে করেনি, তবে বিয়ের চিন্তাভাবনা করেছে । তার এক মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে । মেয়েটিকে তার পছন্দ নয় । তবে অপছন্দের কথা সে সরাসরি বলতেও পারছে না । কারণ, তার এই মামা তাকে পড়াশোনা করিয়েছেন ।

ছেলেটি এক সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এল । আমি তাকে দেখে চমকে উঠলাম । মুখ পাণ্ডুর বর্ণ, মৃত মানুষের চোখের মতো ভাবলেশহীন চোখ । যৌবনের নিজস্ব যে জ্যোতি যুবক-যুবতীর চোখে থাকে তার কিছুই নেই । ছেলেটি হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে । কিছুক্ষণ পরপরই চমকে উঠছে । সে ঘরে ঢুকেই বিনা ভূমিকায় বলল, 'স্যার আপনি আমাকে বাঁচান ।'

আমি ছেলেটিকে বসালাম । পরিচয় নিলাম । হাল্কা কিছু কথাবার্তা বলে তাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলাম । তাতে খুব লাভ হলো বলে মনে হলো না । তার অস্থিরতা কমল না । লক্ষ করলাম, সে স্থির হয়ে বসতেও পারছে না । খুব নড়াচড়া করছে । আমি বললাম, 'তোমার সমস্যাটা কী?'

ছেলেটি রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে প্রায় অস্পষ্ট গলায় বলল, 'স্যার আমি দুঃস্বপ্ন দেখি । ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন ।'

আমি বললাম, 'দুঃস্বপ্ন দেখে না এমন মানুষ তুমি খুঁজে পাবে না । সাপে তাড়া করছে, বাঘে তাড়া করছে, আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়া— এগুলি খুবই কমন স্বপ্ন । সাধারণত হজমের অসুবিধা হলে লোকজন দুঃস্বপ্ন দেখে । ঘুমের অসুবিধা হলেও দেখে । তুমি শুয়ে আছ, মাথার নিচ থেকে বালিশ সরে গেল— তখনো এরকম স্বপ্ন তুমি দেখতে পার । শারীরিক অস্বস্তির একটা প্রকাশ ঘটে দুঃস্বপ্নে । আগুনে পোড়ার স্বপ্ন মানুষ কখন দেখে জান? যখন পেটে গ্যাস হয় সেই গ্যাসে বুক জ্বালাপোড়া করে, তখন সে স্বপ্ন দেখে— তাকে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেয়া হয়েছে ।'

'স্যার আমার স্বপ্ন এ রকম না অন্য রকম ।'

'ঠিক আছে, গুছিয়ে বল । শুনে দেখি কি রকম ।'

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে কথা শুরু করল । মুখস্থ বলে যাবার মতো বলে যেতে লাগল । মনে হয় আগে থেকে ঠিকঠাক করে এসেছে এবং অনেকবার রিহার্সেল দিয়েছে ।

কথা বলার সময় একবারও আমার চোখের দিকে তাকাল না । যখন প্রশ্ন করলাম তখনো না ।

‘প্রথম বার স্বপ্নটা দেখি বুধবার রাতে। এগারোটার দিকে ঘুমুতে গেছি। আমার ঘুমের কোনো সমস্যা নেই। শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়তে পারি। সে রাতেও তাই হলো। বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়েছি। সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্নটা দেখেছি।’

‘কী করে বুঝলে শোয়ামাত্র স্বপ্ন দেখেছ?’

‘জেগে উঠে ঘড়ি দেখেছি, এগারোটো দশ।’

‘স্বপ্নটা বল।’

‘আমি দেখলাম খোলামেলা একটা মাঠের মতো জায়গা। খুব বাতাস বইছে। শৌ-শৌ শব্দ হচ্ছে। রীতিমতো শীত লাগছে। আমার চারদিকে অনেক মানুষ কিন্তু ওদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। এদের কথা শুনতে পাচ্ছি। হাসির শব্দ শুনছি। একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে তাও শুনছি। বুড়ামতো একটা লোকের কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে কিন্তু কাউকে আবছাভাবেও দেখতে পাচ্ছি না। একবার মনে হলো আমি বোধহয় অন্ধ হয়ে গেছি। চারদিকে খুব তীক্ষ্ণ চোখে তাকলাম— মাঠ দেখতে পাচ্ছি, কুয়াশা দেখতে পাচ্ছি— কিন্তু মানুষজন দেখছি না অথচ তাদের কথা শুনছি। হঠাৎ ওদের কথাবার্তা সব থেমে গেল। বাতাসের শৌ-শৌ শব্দও বন্ধ হয়ে গেল। মনে হলো কেউ যেন এসেছে। তার ভয়ে সবাই চুপ করে গেছে। আমার নিজেরাও প্রচণ্ড ভয় লাগল। এক ধরনের অন্ধ ভয়।’

তখন শ্লোম্মা-জড়িত মোটা গলায় কে-একজন বলল, ‘ছেলেটি তো দেখি এসেছে। মেয়েটা কোথায়?’

কেউ জবাব দিল না। খানিকক্ষণের জন্যে বাচ্চা ছেলেটির কান্না শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে থেমেও গেল। মনে হলো কেউ যেন তার মুখে হাত চাপা দিয়ে কান্না বন্ধ করার চেষ্টা করছে। ভারী গলায় লোকটা আবার কথা বলল, ‘মেয়েটা দেরি করছে কেন? কেন এত দেরি? ছেলেটিকে তো বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। এর ঘুম পাতলা হয়ে এসেছে। ও জেগে যাবে।’

হঠাৎ চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। একসঙ্গে সবাই বলে উঠল— এসেছে, এসেছে, মেয়েটা এসেছে। আমি চমকে উঠে দেখলাম আমার পাশে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুব রোগা একটা মেয়ে। অসম্ভব ফর্সা, বয়স আঠারো-উনিশ। এলোমেলো-ভাবে শাড়ি পরা। লম্বা চুল। চুলগুলি ছেড়ে দেয়া, বাতাসে উড়ছে। মেয়েটা ভয়ে থর-থর করে কাঁপছে। আমি অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছি। সে অসংকোচে আমার হাত ধরে কাঁপা গলা বলল, ‘আমার ভয় করছে। আমার ভয় করছে।’

আমি বললাম, ‘আপনি কে?’

সে বলল, ‘আমার নাম নারগিস। আপনি যা দেখছেন তা স্বপ্ন। ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। একটু পরই বুঝবেন। আগে এই স্বপ্নটা শুধু আমি একা দেখতাম। এখন মনে হয় আপনিও দেখবেন।’

মেয়েটা কাঁদতে শুরু করল। আতঙ্কে অস্থির হয়ে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমার ভয় লাগছে বলেই আমি এভাবে দাঁড়িয়ে আছি। এরা প্রতিমাসে একবার করে আমাকে এই স্বপ্নটা দেখায়।

আমি বললাম, ‘এরা কারা?’

‘জানি না। কিছু জানি না। আপনি থাকায় কেন জানি একটু ভরসা পাচ্ছি। যদিও জানি আপনি কিছুই করতে পারবেন না। কিছুই না, কিছুই না, কিছুই না...’

মেয়েটি হাঁপাতে শুরু করল আর তখন সেই ভারী এবং ঘোঁষা জড়ানো কণ্ঠ চিৎকার করে বলল, ‘সময় শেষ। দৌড়াও, দৌড়াও, দৌড়াও...।’

সেই চিৎকারের মধ্যে ভয়ঙ্কর পৈশাচিক কিছু ছিল। আমার শরীরের প্রতিটি স্নায়ু থরথর করে কাঁপতে লাগল। চোখের সামনে কুয়াশা কেটে যেতে লাগল। চারদিকে তীব্র আলো। এত তীব্র যে চোখ ধোঁধিয়ে যায়— যাদের কথা শুনছিলাম অথচ দেখতে পাচ্ছিলাম না; এই আলোয় সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম— এরা এরা এরা...

‘এরা কী?’

এরা মানুষ না, অন্য কিছু— লম্বাটে পশুর মতো মুখ, হাত-পা মানুষের মতো। সবাই নগ্ন। একা অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ করতে লাগল। আমার কানে বাজতে লাগল— দৌড়াও দৌড়াও, ... আমরা দৌড়াতে শুরু করলাম। আমাদের পেছনে সেই জন্তুর মতো মানুষগুলিও দৌড়াচ্ছে।

আমরা ছুটছি মাঠের উপর দিয়ে। সেই মাঠে কোনো ঘাস নেই। সমস্ত মাঠময় অযুত নিযুত লক্ষ কোটি ধারালো ব্লেড সারি সারি সাজানো। সেই ব্লেডে আমার পা কেটে ছিন্নছিন্ন হয়ে যাচ্ছে— তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা। চিৎকার করে উঠলাম, আর তখনই ঘুম ভেঙে গেল। দেখি ঘামে সমস্ত বিছানা ভিজ়ে গেছে।

‘এই তোমার স্বপ্ন?’

‘জি।’

‘দ্বিতীয় স্বপ্ন কখন দেখলে?’

‘ঠিক একমাস পর।’

‘সেই মেয়েটিও কি দ্বিতীয় স্বপ্নে তোমার সঙ্গে ছিল?’

‘জি।’

‘একই স্বপ্ন? না— একটু অন্য রকম?’

‘একই স্বপ্ন।’

‘দ্বিতীয়বারও কি তুমি মেয়েটির হাত ধরে দৌড়ালে?’

‘জি।’

‘প্রথমবার যেমন তার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল? দ্বিতীয়বারও হলো?’

‘জি।’

‘দ্বিতীয়বারও কি মেয়েটি পরে এসেছে? তুমি আগে এসে অপেক্ষা করছিলে?’

‘জিনা— দ্বিতীয়বারে মেয়েটি আগে এসেছিল। আমি পরে এসেছি।’

‘দ্বিতীয়বারের স্বপ্ন তুমি রাত ক’টায় দেখেছো?’

‘ঠিক বলতে পারব না তবে শেষরাতের দিকে। ঘুম ভাঙার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফজরের আযান হলো।’

‘দ্বিতীয়বারও স্বপ্নে মোটা গলার লোকটি কথা বলল?’

‘জি।’

লোকমান ফকির রুমালে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। সে অসম্ভব ঘামছে। আমি বললাম, পানি খাবে? পানি এনে দেব?

‘জি স্যার, দিন।’

আমি পানি এনে দিলাম, সে এক নিশ্বাসে পানি শেষ করে ফেলল। আমি বললাম, ‘স্বপ্ন ভাঙার পর তুমি দেখলে তোমার দু’টি পা-ই ব্লেডে কেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে— তাই না?’

লোকমান হতভম্ব হয়ে বলল, ‘জি স্যার। আপনি কী করে বুঝলেন?’

‘তুমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরে ঢুকলে সেখান থেকে অনুমান করেছি। তা ছাড়া তোমার পা স্বপ্ন দেখার পর কেটে যাচ্ছে বলেই স্বপ্নটা ভয়ঙ্কর। পা যদি না কাটতো তাহলে স্বপ্নটা ভয়ঙ্কর হতো না বরং একটা মধুর স্বপ্ন হতো। কারণ, স্বপ্নে একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার দেখা হচ্ছে যে তোমার গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে। আঠারো-উনিশ বছরের রূপবতী একটি মেয়ে, হাত ধরে তোমার সঙ্গে দৌড়াচ্ছে।’

আমার কথার মাঝখানেই লোকমান ফকির পায়ের জুতা খুলে ফেলল, মোজা খুলল। আমি হতভম্ব হয়ে দেখলাম পায়ের তলা ফালা ফালা করে কাটা। এমন কিছু সত্যি সত্যি ঘটতে পারে আমি ভাবিনি।

লোকমান ক্ষীণ গলায় বলল, ‘এটা কী করে হয় স্যার?’

‘আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে স্বপ্নের ব্যাপারে পড়াশোনা যা করেছি তার থেকে তোমাকে একটা কথা বলতে পারি— Invert reaction বলে

একটা ব্যাপার আছে। ধর তোমার একটা আঙুল পুড়ে গেল— সেই খবর স্নায়ুর মাধ্যমে যখন তোমার মস্তিষ্কে পৌঁছবে তখন তুমি তীব্র ব্যথা পাবে। Invert reaction-এ কী হয় জান? আগে মস্তিষ্কে আঙুল পোড়ার অনুভূতি পায়, তারপর সেই খবর আঙুলে পৌঁছে। তখন আঙুলটি পোড়া পোড়া হয়ে যেতে পারে। স্বপ্নের পুরো ব্যাপারটা হয় মস্তিষ্কে। সেখান থেকে Invert reaction-এ শরীরে তার প্রভাব পড়তে পারে।

এক লোক স্বপ্নে দেখতো তার হাতে কে যেন পিন ফুটাচ্ছে। ঘুম ভাঙার পর তার হাতে সত্যি সত্যি পিন ফোটার দাগ দেখা যেত। তোমার ক্ষেত্রেও হয়তো তাই ঘটেছে। তবে এমন ভয়াবহভাবে পা কাটা Invert reaction-এ সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।’

‘তাহলে কী?’

‘আমি বুঝতে পারছি না।’

লোকমান ক্লান্ত স্বরে বলল, ‘এক মাস পরপর আমি স্বপ্নটা দেখি। কারণ, পায়ের ঘা শুকাতে এক মাস লাগে।’

আমি লোকমান ফকিরের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, ‘তুমি এখন থেকে একটা কাজ করবে— ঘুমুতে ঘাবের জুতা পায়ে দিয়ে। স্বপ্নে যদি তোমাকে দৌড়াতেও হয়— তোমার পায়ে থাকবে জুতা। রোড তোমাকে কিছু করতে পারবে না।’

‘সত্যি বলছেন?’

‘আমার তা-ই ধারণা। আমার মনে হচ্ছে, জুতা পরে ঘুমুলে তুমি স্বপ্নটাই আর দেখবে না।’

লোকমান ফকির চলে গেল। খুব ভরসা পেল বলে মনে হলো না। আমি তাকে বলে দিয়েছিলাম, ‘এক মাস পর স্বপ্ন দেখা হয়ে গেলে সে যেন আসে। সে এল দেড় মাস পর।’

তার মুখ আগের চেয়েও শুকনো। চোখ ভাবলেশহীন। অথর্ব মানুষের মতো হাঁটছে। আমি বললাম, ‘স্বপ্ন দেখেছো?’

‘জি-না।’

‘জুতা পায়ে ঘুমুচ্ছে?’

‘জি স্যার। জুতা পায়ে দেয়ার জন্যেই স্বপ্ন দেখছি না।’

আমি হাসিমুখে বললাম, ‘তাহলে তো তোমার রোগ সেরে গেল। এত মন খারাপ কেন? মনে হচ্ছে বিরাট সমস্যায় পড়েছো। সমস্যাটা কী?’

লোকমান নিচু গলায় বলল, ‘মেয়েটার জন্যে মন খারাপ স্যার। বেচারি একা একা স্বপ্ন দেখছে। এত ভালো একটা মেয়ে কষ্ট করছে। আমি সঙ্গে

থাকলে সে একটু ভরসা পায়। নিজের জন্যে কিছু না। মেয়েটার জন্যে খুব কষ্ট হয়।’

লোকমানের চোখে প্রায় পানি এসে গেল। আমি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সে বলে কি!

‘স্যার আমি ঠিক করছি। জুতা পরব না। যা হবার হবে। নারগিসকে একা একা যেতে দেব না। আমি থাকব সঙ্গে। মেয়েটার জন্যে আমার খুব কষ্ট হয় স্যার। এত চমৎকার একটা মেয়ে। আমি স্যার থাকব তার সঙ্গে।’

‘সেটা কি ভালো হবে?’

‘জি স্যার, আমি তাকে ছাড়া বাঁচব না।’

‘সে কিন্তু স্বপ্নের একটি মেয়ে।’

‘সে স্বপ্নের মেয়ে নয়। আমি যেমন, সেও তেমন। আমরা দু’জন এই পৃথিবীতেই বাস করি। সে হয়তো ঢাকাতেই কোনো-এক বাসায় থাকে। তার পায়ে র্লেডের কাটা। আমি যেমন সারাক্ষণ তার কথা ভাবি, সেও নিশ্চয়ই ভাবে। শুধু আমাদের দেখা হয় স্বপ্নে।’

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ‘গল্পটি এই পর্যন্তই।’

আমি চেষ্টা করে বললাম, ‘এই পর্যন্ত মানে? শেষটা কী?’

‘শেষটা আমি জানি না। ছেলেটি ক্ষতিবিক্ষিত পা নিয়ে একবার এসেছিল। সে বলল, জুতা খুলে ঘুমানো মাত্রই সে আবার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে মেয়েটির দেখা পায়। তারা দু’জন খানিকক্ষণ গল্প করে। দু’জন দু’জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। এক সময়— মানুষের মতো জন্তুগুলি চেষ্টা করে বলে— দৌড়াও, দৌড়াও। তারা দৌড়াতে শুরু করে।’

‘ছেলেটি আপনার কাছে আর আসেনি?’

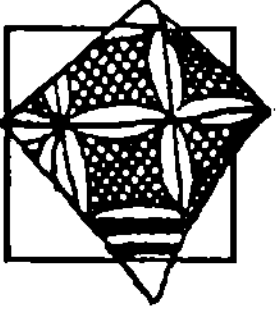
‘জি-না।’

‘ছেলেটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন?’

‘না, জানি না। তবে অনুমান করতে পারি। ছেলেটি জানে জুতা পায়ে ঘুমলে এই দুঃস্বপ্ন সে দেখবে না, তারপরেও জুতা পায়ে দেয় না। কারণ, মেয়েটিকে একা ছেড়ে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রেমের ক্ষমতা যে কি প্রচণ্ড হতে পারে প্রেমে না পড়লে তা বুঝা যায় না। ছেলেটির পক্ষে এই জীবনে তার স্বপ্ন সঙ্গিনীর মায়া কাটানো সম্ভব না। সে বাকি জীবনে কখনো জুতা পায়ে ঘুমবে না। সে আসলে দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি চায় না। দুঃস্বপ্ন হলেও এটি সেইসঙ্গে তার জীবনের মধুরতম স্বপ্ন।’

‘আপনার কি ধারণা নারগিস নামের কোনো মেয়ে এই পৃথিবীতে সত্যি সত্যি আছে?’

মিসির আলি নিচু গলায় বললেন, ‘আমি জানি না। রহস্যময় এই পৃথিবীর খুব কম রহস্যের সন্ধানই আমি জানি। তবে মাঝে মাঝে আমাদের কেন জানি এই মেয়েটির হাত ধরে একবার দৌড়াতে ইচ্ছা করে। আরেক দফা চা হবে? পানি কি গরম করব?’



অন্ধ শ্লোক

পাখির ডাকে যে সত্যি সত্যি ঘুম ভাঙতে পারে এই ধারণা আমার ছিল না। শহরে পাখি তেমন নেই আর থাকলেও তারা সম্ভবত ভোরবেলায় এত ডাকাডাকি পছন্দ করে না।

ভাটি অঞ্চলে এসে প্রথম পাখির ডাকে জেগে উঠলাম এবং বেশ হকচকিয়ে গেলাম। নানান ধরনের পাখি যখন একসঙ্গে ডাকাডাকি করতে থাকে তখন খুব যে মধুর অবস্থায় সৃষ্টি হয় তা নয়। আমি বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললাম, ‘ব্যাপার কী? কীসের হইচই?’

আমার বন্ধু করিম ঘুমঘুম গলায় বলল, ‘পাখি ডাকছে। এরা বড় যন্ত্রণা করে। তুই চাদরে মুখ ঢেকে শুয়ে থাক।’

করিমের সঙ্গে গত রাতে এই অঞ্চলে এসে পৌঁছেছি। আমি ঘরকোনা ধরনের মানুষ। বেড়াতে পছন্দ করি যদি বেড়ানোটা খুব আরামের হয়। দু’দিন নৌকায় করে, জীবন হাতে নিয়ে হাওর পাড়ি দেয়ার ব্যাপারে আমার উৎসাহ কম। করিম বলতে গেলে জোর করে আমাকে নিয়ে এসেছে। তার একটাই কথা, তোর লেখালেখিতে সুবিধা হবে। দু’একটা চরিত্রও পেয়ে যেতে পারিস। কিছুই বলা যায় না।

কোথাও বেড়াতে গিয়ে চরিত্র খোঁজা আমার স্বভাব না। ঢাকা ছেড়ে বাইরে গেলেই মানুষের চেয়ে প্রকৃতি আমাকে অনেক বেশি টানে। মানুষ তো সব সময় দেখছি, প্রকৃতি দেখার সুযোগ কই। যেখানেই যাই প্রচুর বই সঙ্গে নিয়ে যাই। আমি লক্ষ্য করেছি নতুন পরিবেশে আরামদায়ক আলস্যে বই পড়ার মতো মজা আর কিছুতেই নেই। হট করে কেউ বেড়াতে আসবে না, বিকট শব্দে টেলিফোন

বেজে উঠবে না। চেনা জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অন্য রকম আনন্দ আছে। একে বোধহয় বলে শিকল ছেঁড়ার আনন্দ।

করিম আমাকে বলেছিল, তোকে দোতলা দালানের বিরাট একটা ঘর ছেড়ে দেব। সামনে বিশাল বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়ালেই দেখবি বিশাল হাওর। ঘাটে পানসি নৌকা থাকবে, মাঝি থাকবে। যখন ইচ্ছা নৌকায় চড়ে বসবি। আমি তোকে মোটেও বিরক্ত করব না। তুই থাকবি তোর মতো।

মোটামুটি লোভনীয় একটা ছবি তুলে ধরল তবে এও বলল, প্রকৃতি দেখতে প্রথম কয়েক দিন তোর ভালো লাগবে তারপর বোর হয়ে যাবি। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। দৃশ্যের কোনো ভেরিয়েশন নেই। অবিশ্যি কোনোমতে এক সপ্তাহ কাটাতে পারলে দেখবি নেশা ধরে গেছে। তখন আর ফিরে যেতে মন চাইবে না।

করিমের সব কথাই মিলে গেল। অষ্টম দিনে আমাদের ঢাকা ফেরার কথা। আমি বললাম, ‘আরো কয়েকটা দিন থেকে যাই।’ করিম বলল, ‘যতদিন ইচ্ছা থাক। আমি এই ফাঁকে আমার মামার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। একটা হাওর পরেই আমার মামার বাড়ি। তোকে নিতে চাচ্ছি না। কারণ, আমি মামার বাড়ি যাচ্ছি ঝগড়া করার জন্যে। তুই থাক এখানে।’

আমি থেকে গেলাম।

দিনের বেশির ভাগ সময় কাটতে লাগল পানসি নৌকায়। বিশাল নৌকা। নৌকার ভেতরই গোসলখানা এবং রান্নাঘর। নৌকার ছাদে শুয়ে থেকে দুলতে দুলতে আকাশ দেখা যায়। একসময় মনে হয় আমি স্থির হয়ে আছি, আকাশ দুলছে। অপার্থিব অনুভূতি। দালান-কোঠার শহরে এই অনুভূতি কল্পনা করা সম্ভব নয়।

এক বিকেলে নৌকার ছাদে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যা মেলানোর পর। উঠে বসতেই ভারী গলায় কে যেন বলল, ‘ভাই সাহেব কেমন আছেন? আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আসছি। আমার নাম জালালুদ্দিন বি.এ., বি.টি। আমি ভাটিপাড়া মডেল হাই স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক। আপনি অসময়ে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। এটা স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর।’ আমি অত্যন্ত বিরক্ত হলাম। ঘুম ভাঙতেই উপদেশ শুনতে কারোরই ভালো লাগার কথা নয়। শিক্ষক সম্প্রদায়ের স্বভাব হচ্ছে যখন-তখন উপদেশ দিয়ে বেড়ানো।

ভদ্রলোক আগের চেয়েও ভারী গলায় বললেন, ‘আপনার বিনা অনুমতিতে একটা কার্য করেছি। নৌকার মাঝিকে চা বানাতে বলেছি। নিজে এক পেয়ালা খেয়েছি। এখন আপনার সঙ্গে আরেক পেয়ালা খাব। যান, মুখ ধুয়ে আসুন। শহরের বেশির ভাগ লোক মুখ না ধুয়ে চা খায়। এটা স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর।’ স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর বিষয়গুলি যিনি এত ভালো জানেন তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভালো দেখলাম না। রোগা কাঠি। মুখ ভর্তি কাঁচা পাকা দাড়ি। যক্ষ্মা রুগির

চোখের মতো উজ্জ্বল চোখ। বয়স পঞ্চাশের উপর। পায়জামার উপর কালো রঙের পাঞ্জাবি।

আমি বললাম, ‘আপনি কি কোনো বিশেষ কাজে এসেছেন— না এমনি গল্প-গুজব করতে এসেছেন?’

‘কাজে এসেছি। গল্প-গুজব করে নষ্ট করার সময় আমার নাই। আপনারও নিশ্চয়ই নাই। লোকমুখে শুনেছি, আপনি গল্প-উপন্যাস লেখেন। অবশ্য পড়া হয় নাই। সময়ের বড়ই অভাব।’

একবার ভাবলাম বলি, আমাদের কাজের অভাব আছে। সময়ের অভাব নেই। আমাদের সবার অটেল সময়। বললাম না। কথাবার্তা বলে এই মানুষটিকে প্রশ্ন দেয়া ঠিক হবে না। শিক্ষক শ্রেণীর কেউ কথা বলার প্রশ্ন পেলো অনবরত কথা বলবে। ফরিদপুরে একবার এমন একজনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তিনি সন্ধ্যাবেলায় কথা শুরু করলেন। একনাগাড়ে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত বললেন। কেউ কিছু বলতে গেলেই হাত তুলে বলেন, ‘এক মিনিট। আমি আমার কথাটা শেষ করে নিই। তারপর যা বলার বলবেন।’

এই জালালুদ্দিন বি.এ., বি.টি.ও সেই ধরনের কোনো মানুষ কি-না কে জানে। আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, ‘আপনি কি সিগারেট খান মাস্টার সাহেব?’ তিনি বিরক্তমুখে বললেন, ‘স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর জিনিস পরিহার করি। চা পরিহার করতে পারি নাই। লেখালেখি করি এইজন্যে চা-টা প্রয়োজন হয়।’

আমি অত্যন্ত শঙ্কিত বোধ করলাম।

অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছিলাম-গঞ্জে যেসব লেখক আছেন তাঁরা শহরের শ্রোতা পেলো সহজে ছাড়েন না। জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেন।

জালালুদ্দিন বি.এ., বি.টি. বললেন, ‘আমি কাব্যচর্চা করি।’

আমি চুপ করে রইলাম। এইসব ক্ষেত্রে উৎসাহসূচক কোনো কথাই বলা উচিত না।

আপনার মনে হয়তো প্রশ্নের উদয় হয়েছে অঙ্কের শিক্ষক হয়ে কাব্যচর্চা কেন করি।

আমার মনে এই জাতীয় কোনো প্রশ্নের উদয় হয়নি। অঙ্কের শিক্ষক কাব্যচর্চা করতে পারবেন না এমন কোনো কথা নেই।

‘সঠিক বলেছেন। তবে আমি প্রথাগত কবি নই। আমি গোটা পাটীগণিত কাব্যে রূপান্তরিত করছি।’

‘বলেন কি!’

‘আপনি হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেই। পাটীগণিতের একটি অঙ্ক আছে এই রকম, ক একটি কাজ পনেরো দিনে সম্পন্ন

করিতে পারে। খ সেই কাজ ৩০ দিনে সম্পন্ন করে। ক ও খ মিলিতভাবে সেই কাজটি কতদিনে সম্পন্ন করিবে? এই অঙ্কটি আমি কাব্যে রূপান্তরিত করেছি। আপনি কি শুনবেন?’

‘অবশ্যই শুনব।’

জালালুদ্দিন বি.এ., বি.টি. গম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করলেন:

‘করিম রহিম ছিল সহোদর ভাই
করিমের যে শক্তি রহিমের তা নাই।
করিম যে কর্ম মাত্র পনেরো দিনে করে
সেই কর্ম রহিম করে এক মাস ধরে।
এখন বালকগণ চিন্তা কর ধীরে,
দুই ভ্রাতা সেই কর্ম কতদিনে করে॥’

আমার মুখে কোনো কথা জোগাল না। অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ‘ভাইসাব কেমন লাগল?’

‘জি ভালো।’

‘অন্তর থেকেই বলছেন তো?’

‘অন্তর থেকেই বলছি।’

‘শুনে প্রীত হলাম। আরেকটা শুনুন চৌবাচ্চা অঙ্ক। আবৃত্তি করব?’

‘জি করুন।’

‘চৌবাচ্চা ছিল এক একগুণ বিশাল
দুই নলে পানি আসে সকাল, বিকাল।
এক নলে পূর্ণ হয় কুড়ি মিনিট লাগে
অন্য নলে পূর্ণ হয় না অর্ধঘণ্টার আগে॥
চৌবাচ্চা পূর্ণের সময় করহ নির্ণন,
দুই নল খুলে দিলে লাগবে কতক্ষণ?’

আমি নিজের বিস্ময় গোপন করে বললাম, ‘এ জাতীয় কবিতা মোট কতগুলি লিখেছেন?’

‘তিন হাজার ছয়শত এগারোটা লেখা হয়েছে। এইসব কবিতার আমি নাম দিয়েছি অঙ্ক শ্লোক। পরিকল্পনা আছে দশ হাজার পূর্ণ করে পুস্তকাকারে ছাড়ব।’

আমি নিতান্ত আনাড়ির মতো বললাম, ‘এতে লাভ কী হবে?’

তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, ‘লাভ কী হবে তাও ব্যাখ্যা করতে হবে? ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কভীতি প্রবল। কবিতায় সে অঙ্কগুলি পড়লে ভীতি দূর হবে। তা ছাড়া মেধাবী ছাত্ররা অঙ্কগুলি মুখস্থ করে ফেলতে পারবে। পারবে না?’

‘হ্যাঁ পারবে।’

‘বাঁদরের শ্লোকটা শুনুন। তৈলাক্ত বাঁশ ও বাঁদরের শ্লোক। আমার গ্রন্থে শ্লোক নাম্বার দু’হাজার তিন:

একটি বাঁদর ছিল
দুই প্রকৃতির
তৈলাক্ত বাঁশ দেখে
হয়ে গেল স্থির॥
বাঁশ বেয়ে উপরে সে উঠিবার চায়,
পিচ্ছিলতার কারণে পড়ে পড়ে যায়॥
এক মিনিটে বেচারা উঠে যতখানি
অর্ধপথ নেমে যায় পরাভব মানি
বংশ দণ্ড কুড়ি ফিট লম্বা যদি হয়
উপরে উঠিবার সময় করহ নির্ণয় ।’

আবৃত্তি শেষ করে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। শান্ত গলায় বললেন,
‘উঠলাম। আপনাকে আর বিরক্ত করব না।’

‘বসুন আরেকটু।’

‘জি-না, সময় অল্প— কাজ প্রচুর। দোয়া করবেন যেমত কাজটা শেষ করে
যেতে পারি। বেশিদিন বাঁচব না। আপনি করিমের বন্ধু। তাকে আমার কথা
বলবেন। বললেই সে চিনবে। সলামালিকুম।’

ভদ্রলোক আমাকে দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নৌকা থেকে নেমে
গেলেন। নিজে ছোট ডিঙি নৌকার মতো নৌকা নিয়ে এসেছিলেন। অন্ধকারে
শুধুমাত্র নক্ষত্রের আলো সম্বল করে নৌকা ভাসিয়ে দিলেন।

আমার নৌকার মাঝি বলল ইনার নাম পাগলা মাস্টার। একলা একলা
থাকে। রাইতদিন বিড়বিড় কইবা কি যেন বলে। আন্ধাইর রাইতে একলা একলা
নাও নিয়া ঘুরে।’

‘ছেলেপুলে নাই?’

‘একটাই মেয়েছিল, মইরা গেছে।’

আমি লোকটির প্রতি এক ধরনের মমতা অনুভব করলাম। ভুল কাজে
জীবন উৎসর্গ করে দেয়ার অনেক নজির আছে। ইনিও তেমন একজন। এদের
মমতা দেখানো চলে; এর বেশি কিছু না।

করিম এল তার পরদিন।

তাকে জালালুদ্দিন বি.এ. বি.টি.-র কথা জিজ্ঞেস করতেই বলল, ‘তোরা
কাছে এসেছিলেন না-কী? তাঁকে কী ডাকা হতো জানিস? মুসলমান যাদব।
অন্ধের জাহাজ ছিলেন। যে-কোনো পাটীগণিতের অঙ্ক মুখে-মুখে করতে
পারতেন।’

‘এখন পারেন না?’

‘পারেন বোধহয়। তবে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দিনরাত কবিতা-টবিতা
লেখেন— অঙ্ক শ্লোক। মেয়েটা মারা যাবার পর মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। খুব

আদরের ছিল মেয়েটি। নাইনে পড়তো। অঙ্কে কাঁচা ছিল বলে বাবার কাছে খুব বকা খেত। মেয়েটা বাবাকে অসম্ভব ভয় করতো। মেয়েটা মরবার আগে বাবাকে বলল, এখন তোমাকে কেন জানি ভয় লাগছে না বাবা। আগে ভয় লাগত। অঙ্ক ভয় লাগত সেইসঙ্গে তোমাকেও লাগত। এখন একটুও ভয় লাগছে না।

মেয়েটার মৃত্যু স্যারকে খুবই এফেক্ট করে। মাথায় একটা চিন্তা ঢুকে যায়— কি করে ছাত্রদের অঙ্কভীতি দূর করা যায়। আন্তে-আন্তে মাথাটাই খারাপ হয়ে যায়। ঢাকায় যাবার আগে তাকে একদিন নিয়ে যাব স্যারের কাছে।’

গেলাম একদিন উনার সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে চিনতে পারলেন। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো কথাবার্তা বললেন। খুব আশ্চর্য করে অঙ্ক শ্লোকের বিশাল খাতা এনে দেখালেন। গাঢ় স্বরে বললেন, ‘গ্রন্থটির নাম রেখেছি— “নুরুন্ন নাহার”। আমার কন্যার নামে নাম। বেচারির মত অঙ্কভীতি ছিল। গোপনে কাঁদতো। বইটা আরো পনেরো বছর আগে যদি লিখতে পারতাম!’

জালালুদ্দিন সাহেবের চোখ দিয়ে টপ-টপ করে পানি পড়তে লাগল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন। আমার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, ‘একটু দোয়া রাখবেন। কাজটা যেন শেষ করতে পারি।’



AMARBOL.COM

বান

মাঝরাতে বাতাসীর ভয়ার্ত গলা শোনা গেল— ‘ও রহমান; ও রহমান।’

রহমান তার আগেই জেগেছে। সে জবাব দিল না। কান পেতে শুনল। কলকল করে ঘরে পানি ঢুকছে। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে নদীর শৌ-শৌ আওয়াজ আসছে। বাতাসী হাহাকার করে উঠল, ‘পানি আসে ও রহমান।’

রহমান মরার মতো পড়ে রইল যেন সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

‘ও রহমান, ওরে রহমান।’

রহমান ঠাণ্ডা গলায় ধমক দিল, ‘প্যানপ্যান করবা না। কুপি জ্বালো। খামাখা চিল্লাইও না।’

‘পানি আসে যে রহমান।’

‘আসুক।’

বাতাসী কান্নার মতো করে। রহমান শক্ত ধমক লাগায়, ‘খবরদার কানবা না। ভাল্লাগে না।’

কুপি জ্বালাতে গিয়ে বাতাসীর হাত কাঁপে। বুকের মধ্যে ধক্ধক্ শব্দ হয়। কুপি জ্বালানোও মুশকিল। দেয়াশলাইয়ের কাঠি বারবার নিভে যায়। কুপির ঘোলাটে আলোয় বাতাসী দেখতে পায় রহমান চুপচাপ বসে আছে চৌকিতে। তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে যেখানে ঘোলাটে পানি ক্রমে ক্রমেই বেড়ে উঠছে। বাতাসী চেষ্টা করে উঠল, ‘পুতির ডাক দে রহমান। অভাগীর বেটি এখনো ঘুমায়।’

‘তুমি চুপ থাকো। খামাখা চিল্লানী।’

বাতাসী চুপ করে যায়। দরজা খুলতেই হাওয়ায় দপ করে কুপি নিভে যায়। ছপছপ শব্দ করে রহমান উঠোনে নেমে পড়ে। ঘুটঘুটি অন্ধকার চারদিকে। একটানা বৃষ্টি পড়ছে। নদীর পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাড়িঘরগুলি জেগে উঠেছে। দূরে দূরে কুপির আলোর ব্যস্ত নাড়াচাড়া দেখা পড়ে। মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে একজন আরেকজনকে গলা ফাটিয়ে ডাকছে— ‘কলিম ভাই! ও কলিম ভাই!’ একজন ডাকলেই সাড়া দিচ্ছে অধিক। অনেকটা জায়গা জুড়ে হুই হুই শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে রহমান হাঁক পাড়ে—

‘কুপি ধরাও গো মা, ভেন্দার মতো চাইয়া থাইক্য না।’

কুপি হাতে বাইরে আসতেই আবার ফস করে কুপি নিভে যায়।

রহমান গাল পাড়ে, ‘আসবে বেকুব বেটি বুদ্ধি-শুদ্ধি ছটাকটাও নাই।’

ছপছপ শব্দ তুলে হাতড়ে হাতড়ে রহমান এগোয়। পানি এর মধ্যেই হাঁটু ছাপিয়ে উঠেছে। গেয়াল ঘর অনেকটা নীচুতে। গরু দু’টির গলার দড়ি কেটে দেয়া উচিত। কোনো সাড়া-শব্দ আসছে না। কে জানে কেন। এর মধ্যেই ডুবে মরেছে নাকি?

ঘরের ভেতর পুতি জেগে উঠেছে। পুতি ঘুমায় তার দাদির সঙ্গে। সেও জেগে উঠে চেষ্টা করে, ‘ও দাদি! ও দাদি!’

‘পুতি কী হইছেরে? ও পুতি কী হইছে?’

পুতি বলল, ‘বান ডাকছে গো দাদি।’

বুড়ি কানে শুনতে পায় না। সে কিছুই বুঝল না। পুতির ছোট ভাই কাদের আলী নেংটো হয়ে ঘুমিয়েছিল। বহু ডাকাডাকি করেও পুতি তার ঘুম ভাঙাতে পারল না।

বাইরে থেকে রহমান বলল, ‘মুরগি কয়টা বেবাক মরছে গো মা।’

‘গরুর দড়ি কাটছস বাপধন?’

‘হ। কাটছি।’

‘তয় দেরি করস ক্যান?’

‘আইতাছি।’

পুতি ঘরের আঙিনায় এসে দাঁড়ায়। ভয়ে ভয়ে বলে, ‘পানি কদুর ভাইজান?’

‘বুক পানি। জবর টান।’

রহমানকে দেখতে পেয়ে বধির দাদি গলা ছেড়ে কেঁদে উঠে। রহমান বিরক্ত হয়ে বলে, ‘কী হইছে?’

‘পুতি আমারে গাল পাড়ে রহমান।’

‘দুত্তেরি খালি বাজে ঝামেলা।’

‘পুতি আমারে হাত দিয়া ঠেলা দিচ্ছে।’

রহমান উত্তর না দিয়ে ঘুমন্ত কাদের আলীর গালে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দেয়।

‘হারামজাদা এখনো ঘুমায়, পানিতে সব নিল।’

বুড়ি ঘ্যানঘ্যান করে, ‘পুতিরে একটা চড় দে, ও রহমান, পুতি আমারে গাইল দিছে।’

কাদের আলী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে পানির দিকে। কাঁদতেও ভুলে যায়। রহমানের দাদি ফোকলা মুখে পান চিবোয়।

রহমান তার মায়ের দিকে পেছনে ফিরে তামাক টানে। অনেকটা রাত পড়ে আছে সামনে। ভোর না হাওয়া পর্যন্ত কাওয়া যাবে না কোথাও। কিন্তু পানি যে হারে বাড়ছে কতক্ষণ চৌকির উপর বসে থাকা যাবে কে জানে।

‘ও রহমান জাগন আছ? ও রহমান।’

রহমান হুঁকা রেখে বোরিয়ে এল। কলাগাছের ভেলায় করে হাসু চাচা এসেছেন। তাঁর ছোট ছোটটাও সঙ্গে আছে। ভিজ়ে চুপসে গেছে দু’জনেই। হাসু চাচা ফ্যাসফ্যাস পলায় বললেন, ‘রহমান জিনিস-পত্তর গোছগাছ কইরা রাখ। পানি আরো বাড়ব। আমি নৌকা আনতে যাই। রাইতে রাইতে বেবাক মানুষ রেল সড়কও তুলন লাগবো।’

রহমান বলল, ‘তামুক খাইবেন চাচা?’

‘নাহ্। করিম মনে লয় বানে ভাইস্যা গেছে। হুনছস?’

নাহ্। হুনি নাই।

তার বউটা খুব চিল্লাইতেছে।

এটু তামুক খান চাচা।

নাহ্ যাই। তরা জিনিসপত্র ঠিকঠাক কর।

বাতাসী ও পুতি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ছোট ছোট পুঁটলি তৈরি করতে থাকে। রহমান চৌকির উপর চুপচাপ বসে থাকে। তার দৃষ্টি নিরাসক্ত যেন কোনো কিছুর সঙ্গেই তার কোনো যোগ নেই। ঘরের ভেতরের পানি ক্রমাগত

বাড়তে থাকে। পুতির চোখে জল টলটল করে। নিচু গলায় বলে, ‘বড় ডর লাগে ভাইজান।’

‘ডর লাগনের কিছু নাই। কাম কর।’

কোমর ছাপিয়ে পানি উঠে আসবার পরই সবাইকে নিয়ে চালে উঠে রহমান। বৃষ্টিও তখন নামে জোরেসোরে। রহমানের দাদি গলা ছেড়ে কাঁদতে বসে।

‘ও রহমান ভিজলাম যে রে।’

বুড়ির সঙ্গে গলা মিলিয়ে কাঁদে কাদের আলী।

বাতাসী আক্ষেপের সুর বের করে, ‘ধান-চাউল সব গেল রে! ও রহমান! ও বাপধন!’

রহমান ধমক লাগায়, ‘খবরদার প্যানপ্যান করবা না।’

অন্ধকার রাত। অঝোরে পড়ছে বৃষ্টি। চারদিকে ফুলে-ফেঁপে উঠছে। রাত্রির মতোই অন্ধকার জলরাশি। দূরে দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাড়িঘর থেকে চিৎকার ও কোলাহল শোনা যাচ্ছে। নদীর শৌ-শৌ আওয়াজের সঙ্গে সে কোলাহল মিশে অদ্ভুত শব্দ হয়।

স্রোতের প্রবল টানে রহমানের বহুদিনের পুরানো চালাঘর নড়বড় করে কাঁপে। ভয়-পাওয়া গলায় পুতি ডাকে, ‘ভাইজান! ও ভাইজান!’

রহমানের দাদি ভাঙা গলায় বলে, ‘ও দাদা বড় শীত লাগে।’ এবং একসময় পুতি গুনতে পায় তার ছানিকণ বহরের জোয়ান দাদা ছেলেমানুষের মতো কাঁদছে। তার বড় ইচ্ছা করে যে দাদার পাশে বসে। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। দাদাকে তারা সবাই বড় ভয় করে।



শঙ্খমালা

অনেক রাতে খেতে বসেছি, মা ধরা গলায় বললেন, ‘খবর শুনেছিস ছোটন?’

‘কী খবর?’

‘পরী এসেছে।’

আমি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। মা থেমে থেমে বললেন, পরীর একটি মেয়ে হয়েছে।’

মায়ের চোখে এইবার দেখা গেল জল। আমি বললাম, ‘ছিঃ! মা, কাদেন কেন?’

মা সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, ‘না কাঁদি না তো; আর দুটি ভাত নিবি?’

আমি দেখলাম মার চোখ ছাপিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। মায়েরা বড় দুঃখ পুষে রাখে।

ছ’বছর আগের পরী আপাকে ভেবে আজ কি আর কাঁদতে আছে? হাত ধুতে বাইরে এসে দেখি ফুটফুটে জ্যোৎস্না নেমেছে। চারদিকে কী চমৎকার আলো! উঠোনের লেবু গাছের লম্বা কোমল ছায়া সে আলোয় ভাসছে। কতদিনের চেনা ঘর-বাড়ি কেমন অচেনা লাগছে আজ।

বারান্দায় ইজি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে আছেন আমার অন্ধ বাবা। তাঁর পাশে একটি শূন্য টুল। ঘরের সমস্ত কাজ সেরে আমার মা এসে বসবেন সেখানে। ফিসফিস করে কিছু কথা হবে। দু’জনেই তাকিয়ে থাকবেন বাইরে। একজন দেখবেন উথাল-পাতাল জ্যোৎস্না, অন্যজন অন্ধকার।

বাবা মৃদু স্বরে ডাকলেন, ‘ছোটন, ও ছোটন’ আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি তাঁর অন্ধ চোখে তাকালেন আমার দিকে। অস্পষ্ট স্বরে বললেন, ‘পরী এসেছে শুনেছিস?’

‘শুনেছি।’

‘আচ্ছা যা।’

আজ আমাদের বড় দুঃখের দিন। পরী আপা আজ এসেছেন। কাল খুব ভোরে তাদের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই হয়তো দেখা যাবে তিনি হাসি-হাসি মুখে শিমুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। শিমুল তুলো উড়ে এসে পড়ছে তাঁর চোখে-মুখে। আমাদের দেখে হয়তো খুশি হবেন। হয়তো বা হবেন না। পরী আপাকে বড় দুঃখের ইচ্ছে করে।

আমরা খুব দুঃখ পুষে রাখি। হঠাৎ হঠাৎ এক একদিন আমাদের কত পুরানো কথা মনে পড়ে। বুকের ভেতর আচমকা ধাক্কা লাগে। চোখে জল এসে পড়ে। এমন কেন আমরা?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, আমার মা হাত ধুতে কলঘরে যাচ্ছেন। মাথার কাপড় ফেলে তিনি একবার আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর অনেক সময় নিয়ে অজু করলেন। একসময় এসে বসলেন শূন্য টুলটায়। বাবা ফিসফিস করে বললেন, ‘খাওয়া হয়েছে তোমার?’

‘হুঁ। তোমার বুকে তেল মালিশ করে দেব?’

‘না।’

‘সিগারেট খাবে? দেব ধরিয়ে?’

‘না।’

তারপর দু'জনে নিঃশব্দে বসেই রইলেন, বসেই রইলেন। লেবু গাছের ছায়া ক্রমশ ছোট হতে লাগল। এত দূরে থেকে বুঝতে পারছি না কিন্তু মনে হচ্ছে আমার মা কাঁদছেন। বাবা তাঁর শীর্ণ হাতে মার হাত ধরলেন। কফ-জমা অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'কাঁদে না, কাঁদে না।'

বাবা তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রীকে আজ আবার ত্রিশ বছর আগের মতো ভালোবাসুক। আমার মা'র আজ বড় ভালোবাসার প্রয়োজন। আমি তাঁদের ভালোবাসার সুযোগ দিয়ে নেমে পড়লাম রাস্তায়। মা ব্যাকুল হয়ে ডাকলেন, 'কোথায় যাস ছোটন?'

'এই একটু হাঁটব রাস্তায়।'

'দেরি করবি না তো?'

'না।'

মা কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, 'ছোটন তুই কি পরীদের বাসায় যাচ্ছিস?'

আমি চুপ করে রইলাম। বাবা বললেন, 'যেতে চার পাশ না। যাক।'

রাস্তাঘাট নির্জন। শহরতলির মানুষরা সব সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। তারস্বরে ঝিঁঝিঁ ডাকছে চারপাশে। গাছে-গাছে নিশি পাওয়া পাখিদের ছটফটানি। তবু মনে হচ্ছে চারপাশ কি চুপচুপ।

রাস্তায় চিনির মতো সাদা ধুলো চিকমিক করে। আমি একা একা হাঁটি। মনে হয় কত যুগ আগে যেন অন্য কোনো জনে এমন জ্যোৎস্না হয়েছিল। বড়দা আর আমি গিয়েছিলাম পরী আপাদের বাসায়। আমার লাজুক বড়দা শিমুল গাছের আড়াল থেকে মৃদুস্বরে ডেকেছিলেন, 'পরী, ও পরী।'

লঠন হাতে বেরিয়ে এসেছিলেন পরীর মা। হাসিমুখে বলছিলেন, 'ওমা তুই কবে এলি রে? কলেজ ছুটি হয়ে গেল?'

'ভালো আছেন খালস? পরী ভালো আছে?'

খবর পেয়ে পরী হাওয়ার মতো ছুটে এসেছিল ঘরের বাইরে। এক পলক তাকিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছিল, 'ইশ! কত দিন পর কলেজ ছুটি হলো আপনার।'

আমার মুখচোরা লাজুক দাদা ফিসফিসিয়ে বলছিলেন, 'পরী, তুমি ভালো আছ?'

'হ্যাঁ। আপনি কেমন আছেন?'

'ভালো। তোমার জন্যে গল্পের বই এনেছি পরী।'

এসব কোন জনের কথা ভাবছি? হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছে— এসব কি সত্যি সত্যি কখনো ঘটেছিল? একজন বৃদ্ধা মা একজন অন্ধ বাবা— এরা ছাড়া কোনো কালে কি কেউ ছিল আমার?

পরী আপার বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়িলাম। খোলা উঠানে চেয়ার পেতে

পরী আপা চুপচাপ বসে আছেন। পাশে একটি শূন্য চেয়ার। পরী আপার বর হয়তো উঠে গেছেন একটু আগে। পরীর আপা আমাকে দেখে স্বাভাবিক গলায় বললেন, ‘ছোটন না?’

‘হ্যাঁ।’

‘উহ! কতদিন পর দেখা। বোস এই চেয়ারটায়।’

‘আপনি ভালো আছেন পরী আপা?’

‘হ্যাঁ, আমার মেয়ে দেখবি? বোস নিয়ে আসছি।’

লাল জামা গায়ে ডল পুতুলের মতো একটি ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে করে ফিরে আসলেন তিনি।

‘দেখ, অবিকল আমার মতো হয়েছে, তাই না?’

‘হ্যাঁ, কী নাম রেখেছেন মেয়ের?’

‘নীরা। নামটা তোর পছন্দ হয়?’

‘চমৎকার নাম।’

অনেকক্ষণ বসে রইলাম আমি। একসময় পরী আপা বললেন, ‘বাড়ি যা ছোটন। রাত হয়েছে।’

বাবা আর মা তেমনি বসে আছেন। বাবার মাথা সামনে ঝুঁকে পড়েছে। তাঁর সারা মাথায় দুধের মতো সাদা চুল। মা দেয়ালে ঠেস দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরে। পায়ের শব্দে চমকে উঠে বাবা বললেন, ‘ছোটন ফিরলি?’

‘জি।’

‘পরীদের বাসায় গিয়েছিলি?’

‘হ্যাঁ।’

অনেকক্ষণ আর কোনো কথা হলো না। আমরা তিনজন চুপচাপ বসে রইলাম।

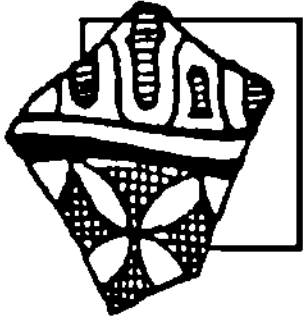
একসময় বাবা বললেন, ‘পরী কিছু বলেছে?’

‘না।’

মা’র শরীর কেঁপে উঠল। একটি হাহাকারের মতো তীক্ষ্ণ স্বরে তিনি ফুঁপিয়ে উঠলেন, ‘আমার বড় খোকা। আমার বড় খোকা।’

এনড্রিন খেয়ে মরা আমার অভিমানী দাদা যে প্রগাঢ় ভালোবাসা পরী আপার জন্যে সঞ্চিত করে রেখেছিলেন তার সবটুকু দিয়ে বাবা আমার মাকে কাছে টানলেন। ঝুঁকে পড়ে চুমু খেলেন মার কুঞ্চিত কপালে। ফিসফিস করে বললেন, ‘কাঁদে না, কাঁদে না।’

ভালোবাসার সেই অপূর্ব দৃশ্যে আমার চোখে জল আসল। আকাশভরা জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে আমি মনে-মনে বললুম, ‘পরী আপা, আজ তোমাকে ক্ষমা করেছি।’



নিউটনের ভুল সূত্র

রূপেশ্বর নিউ মডেল হাইস্কুলের সায়েন্স টিচার হচ্ছেন অমর বাবু।

অমর নাথ পাল, বি.এসসি. (অনার্স, গোল্ড মেডাল)।

খুব সিরিয়াস ধরনের শিক্ষক। স্কুলের স্যারদের আসল নামের বাইরে একটা নকল নাম থাকে। ছাত্র মহলে সেই নামেই তাঁরা পরিচিত হন। অমর বাবু স্কুলে ‘ঘড়ি স্যার’ নামে পরিচিত। তাঁর বুক পকেটে একটা গোল ঘড়ি আছে। ক্লাসে ঢোকান আগে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘড়িতে সময় দেখে নেন। ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়ামাত্র আবার ঘড়ি বের করে সময় দেখেন। তখন যদি তাঁর ভুরু কুঞ্চে যায় তাহলে বুঝতে হবে ঘণ্টা ঠিকমতো পড়েনি। দু’এক মিনিট এদিক-ওদিক হয়েছে।

তাঁর ক্লাসে নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকতে হবে। হাসা যাবে না, পেনসিল দিয়ে পাশের ছেলের পিঠে খোঁচা দেয়া চলবে না, খাতায় কাটাকুটি খেলা চলবে না। মনের ভুলেও যদি কেউ হেসে ফেলে তিনি হতভম্ব চোখে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলবেন, ‘সায়েন্স ছেলেখেলা নয়। হাসাহাসির কোনো ব্যাপার এর মধ্যে নেই। সায়েন্স পড়ানোর সময় তুমি হেসেছ, তার মানে বিজ্ঞানকে তুমি উপহাস করেছ। মহা অন্যায় করেছ। তার জন্যে শাস্তি হবে। আজ ক্লাস শেষ হবার পর বাড়ি যাবে না। পাটীগণিতের সাত প্রশ্নমালার ১৭, ১৮, ১৯ এই তিনটি অঙ্ক করে বাড়ি যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার?’

অপরাধী গুচ্ছ মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। তার লাঞ্ছনা দেখে অন্য কেউ হয়তো ফিক করে হেসে ফেলল। অমর স্যার থমথমে গলায় বলবেন, ‘ও-কি! তুমি হাসছ কেন? হাস্যকর কিছু কি বলেছি? তুমি উঠে দাঁড়াও। অকারণে হাসার জন্যে শাস্তি হিসেবে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবে।’

অমর বাবু পকেট থেকে ঘড়ি বের করবেন। পাঁচ মিনিট তিনি একদৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইবেন। ছাত্ররা মূর্তির মতো বসে থাকবে।

অমর বাবুর বয়স পঞ্চাশ। স্ত্রী, দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে— এই নিয়ে তাঁর সংসার। দুটি ছেলেই বড় হয়েছে— রূপেশ্বর বাজারে একজনের কাপড়ের ব্যবসা, অন্যজনের ফার্মেসি আছে। ভালো টাকা রোজগার করে। একটি মেয়ের

বিয়ে হয়ে গেছে। অন্য মেয়েটির বিয়ের কথা হচ্ছে। এদের কারোর সঙ্গেই তাঁর বনে না। স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাদের তিনি সহ্য করতে পারেন না। অনেক দিন হলো বাড়িতেও থাকেন না। স্কুলের দোতলায় একটা খালি ঘরে বাস করেন। সেখানে বিছানা বালিশ আছে। একটা স্টোভ আছে। গভীর রাতে স্টোভে চা বানিয়ে খান।

রূপেশ্বর স্কুলের হেড স্যার তাঁকে বলেছিলেন, ‘আপনার ঘর-সংসার থাকতে আপনি স্কুলে থাকেন, এটা কেমন কথা?’

অমর বাবু গম্ভীর গলায় বললেন, ‘রাত জেগে পড়াশোনা করি, একা থাকতেই ভালো লাগে। তা ছাড়া ওদের সঙ্গে আমার বনে না। তবে স্কুলে রাত্রিযাপন করে যদি আপনাদের অসুবিধার কারণ ঘটিয়ে থাকি তাহলে আমাকে সরাসরি বলুন, আমি ভিন্ন ব্যবস্থা দেখি।’

হেড স্যার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘আরে না— এই কথা হচ্ছে না। আপনার যেখানে ভালো লাগবে আপনি সেখানে থাকবেন।’

তিনি অমর বাবুকে ঘটালেন না। কারণ, অমর বাবু অসম্ভব ভালো শিক্ষক। অঙ্কের ডুবোজাহাজ! ডুবোজাহাজ বলার অর্থ তাঁকে দেখে মনে হয় না তিনি অঙ্ক জানেন। ভাবুক ভাবুক ভাব আছে। ক্লাসে কোনো অঙ্ক তাকে করতে দিলে এমন ভাব করেন যেন অঙ্কটা মাথাতেই ঢুকছে না। তারপর পকেট থেকে গোল ঘড়ি বের করে ঘড়ির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, চোখ বন্ধ করে মুখে-মুখে অঙ্কটা করে দেন। স্কুলের অনেক ছাত্রের ধারণা এই ঘড়িতে রহস্য আছে। ঘড়ি অঙ্ক করে দেয়। ব্যাপার তখনই। তাঁর ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটাটায় গুণগোল আছে। কখনো দ্রুত যার কখনো আস্তে তবে গড়ে সমান থাকে। এইটাই তিনি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করেন।

অমর বাবুকে ভালো মানুষ বলা যেতে পারে তবে তিনি অমিষ্টক, কথাবার্তা প্রায় বলেন না বললেই হয়। কারোর সাথে-পাঁচেও থাকেন না। টিচার্স কমন রুমে জানালার পাশের চেয়ারটায় চুপচাপ বসে থাকেন। ঘণ্টা পড়লে ক্লাসে রওনা হন। স্কুলের আরবি শিক্ষক মৌলানা ইদরিস আলি তাঁকে নিয়ে মাঝে-মধ্যে ঠাট্টা-তামাশা করার চেষ্টা করেন। বিশেষ লাভ হয় না। তিনি ঠাট্টা-তামাশা পছন্দ করেন না। কেউ ঠাট্টা করলে কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকেন।

আজ বৃহস্পতিবার, হাফ স্কুল। আগামী কাল ছুটি। ছাত্র-শিক্ষক সবার মধ্যেই একটা ছুটি ছুটি ভাব চলে এসেছে। থার্ড পিরিয়ডে অমর বাবুর ক্লাস নেই। তিনি জানালার কাছের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন। ইদরিস সাহেব তাঁর সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, ‘তারপর অমর বাবু, আপনার সায়েন্সের কী খবর?’

অমর বাবু কিছু বললেন না, তবে চোখ তুলে তাকালেন। মনে-মনে রসিকতার জন্যে প্রস্তুত হলেন। বিজ্ঞান নিয়ে এই লোকটি কঠিন রসিকতা করে যা তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না।

ইদরিস সাহেব পানের কৌটা থেকে পান বের করতে করতে বললেন, ‘অনেকদিন থেকে আমার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরছে। রোজই ভাবি আপনাকে জিজ্ঞেস করব’।

‘জিজ্ঞেস করলেই পারেন।’

‘ভরসা হয় না। আপনি তো আবার প্রশ্ন করলে রেগে যান।’

‘বিজ্ঞান নিয়ে রসিকতা করলে রাগি। এমনিতে রাগী না— আপনার প্রশ্নটা কী?’

ইদরিস সাহেব পান চিবুতে চিবুতে বললেন, পৃথিবী যে ঘুরছে এই নিয়ে প্রশ্ন। পৃথিবী তো ঘুরছে, তাই না?

‘জি। পৃথিবীর দু’রকম গতি—নিজের অক্ষের উপর ঘুরছে, আবার সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।’

‘বাই বাই করে ঘুরছে?’

‘জি?’

‘তাই যদি হয় তাহলে আমাদের মাথা কেন ঘুরে না? মাথা ঘোরা উচিত ছিল না? এমনিতে তো মাঠে দু’টা চক্কর দিলে মাথা ঘুরতে থাকে। ওকি, এ-রকম করে তাকাচ্ছেন কেন? রাগ করছেন না-কি?’

‘বিজ্ঞান নিয়ে রসিকতা আমি পছন্দ করি না।’

‘রসিকতা কি করলাম?’

অমর বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। ক্লাসের সময় হয়ে গেছে। ঘণ্টা পড়বার আগেই ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এই তাঁর নিয়ম। পৃথিবী কোনো কারণে হঠাৎ উল্টে গেলেও নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না।

আজ পড়ার বিষয়বস্তু হলো আলো। আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ। বড় চমৎকার বিষয়। আলো হচ্ছে একই সঙ্গে তরঙ্গ ও বস্তু। কী অসাধারণ ব্যাপার! ক্লাস টেনের ছেলেগুলি অবিশ্যি এসব বুঝবে না। তবে বড় হয়ে যখন পড়বে তখন চমৎকৃত হবে।

অমর বাবু ক্লাসে ঢুকেই বললেন, ‘আলোর গতিবেগ কত— কে বলতে পার?’ সাতজন ছেলে হাত তুলল। তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। তাঁর ধারণা ছিল সবাই হাত তুলবে। ছেলেগুলি কি সায়েন্সে মজা পাচ্ছে না? তা কি করে হয়? পৃথিবীতে মজার বিষয় তো একটাই। সায়েন্স।

‘তুমি বল, আলোর গতিবেগ কত?’

‘প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।’

‘ভেরি গুড। এখন তুমি বল, আলোর গতি কি এর চেয়ে বেশি হতে পারে?’

‘জি-না স্যার।’

‘কেন পারে না?’

‘এটাই স্যার নিয়ম। প্রকৃতির নিয়ম।’

‘ভেরি গুড। ভেরি ভেরি গুড। প্রকৃতির কিছু নিয়ম আছে যে নিয়মের কখনো ব্যতিক্রম হবে না। হতে পারে না। যেমন মাধ্যাকর্ষণ। একটা আম যদি গাছ থেকে পড়ে তাহলে তা মাটিতেই পড়বে, আকাশে উড়ে যাবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার?’

‘জি-স্যার।’

‘মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জনক কে?’

‘নিউটন।’

‘নামটা তুমি এইভাবে বললে যেন নিউটন হলেন একজন রাম-শ্যাম, যদু-মধু, রহিম-করিম। নাম উচ্চারণে কোনো শ্রদ্ধা নাই—বল মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন।’

ছাত্রটি কাঁচুমাচু মুখে বলল, ‘মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন।’

‘একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীর নামে অশ্রদ্ধার সঙ্গে বলার জন্যে তোমার শাস্তি হবে। ক্লাস শেষ হলে বাড়ি যাবেন না, পাটীগণিতের বার নম্বর প্রশ্নমালার একুশ আর বাইশ এই দু’টি অঙ্ক করে তারপর যাবেন। ইজ ইট ক্লিয়ার?’

ছেলেটির মুখ আরো শুকিয়ে গেল।

অমর বাবুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। ছেলেগুলি তাঁর মন খারাপ করিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করছে। অশ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ছে। খুবই দুঃখের কথা।

সন্ধ্যার পর তিনি স্কুল লাইব্রেরিতে খানিকক্ষণ পড়াশোনা করলেন। বিজ্ঞানী নিউটনের জীবনকথা। মনের অশান্ত ভাব একটু কমল। তিনি স্কুলের দোতলায় নিজের ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর ছোট ছেলে রতন টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে এসেছে। মুখ কাঁচুমাচু করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে তার বাবাকে স্কুলের ছাত্রদের চেয়েও বেশি ভয় করে।

‘রতন কিছু বলবি?’

‘মা বলছিলেন, অনেকদিন আপনি বাড়িতে যান না।’

‘তাতে অসুবিধা তো কিছু হচ্ছে না।’

‘মা’র শরীরটা ভালো না। জ্বর।’

‘ডাক্তার ডেকে নিয়ে যা। আমাকে বলছিস কেন? আমি কি ডাক্তার?’

রতন মাথা নিচু করে চলে গেল। অমর বাবুর মনে হলো আরেকটু ভালো

ব্যবহার করলেই হতো। এতটা কঠিন হবার প্রয়োজন ছিল না। কঠিন না হয়েই বা কি করবেন— গাধা ছেলে, মেট্রিকটা তিনবারেও পাস করতে পারেনি। জগতের আনন্দময় বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি কিছুই জানল না— আলো কী সেই সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। আলো কী জিজ্ঞেস করলে নির্ঘাৎ বলবে— এক ধরনের তরকারি, ভর্তা করেও খাওয়া যায়। ছিঃ ছিঃ!

ঘড়ি ধরে ঠিক ন'টায় তিনি রাতের খাবার শেষ করলেন। খাওয়া শেষ করতেই ঝোঁপে বৃষ্টি নামল। খোলা জানালা দিয়ে হু-হু করে হাওয়া আসতে লাগল। মেঘ ডাকতে লাগল। অমর বাবু দরজা-জানালা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলেন। তাঁর ঘুমুতে যাবার সময় বাঁধা আছে রাত দশটা কুড়ি। এখনো অনেক বাকি আছে। এই সময়টা তিনি চুপচাপ বসে নানা বিষয় ভাবেন। ভাবতে ভালো লাগে। আগে পড়াশোনা করতেন। এখন চোখের কারণে হারিকেনের আলোয় বেশিক্ষণ পড়তে পারেন না। মাথার যন্ত্রণা হয়। ঢাকায় গিয়ে ভালো ডাক্তার দিয়ে চোখ দেখান দরকার।

তিনি বিছানায় পা তুলে উঠে বসলেন। শীত শীত লাগছিল, গায়ে একটা চাদর জড়াবেন কি-না যখন ভাবছেন তখন হঠাৎ শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল। তিনি খানিকটা নড়ে উঠলেন। আর তখন অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার হলো— তিনি লক্ষ করলেন বিছানা ছেড়ে তিনি উপরে উঠে যাচ্ছেন। প্রায় হাত তিনেক উঠে গেলেন এবং সেখানেই স্থির হয়ে গেলেন। চোখের ভুল? অবশ্যই চোখের ভুল। মহাবিজ্ঞানী নিউটনের সূত্র অনুযায়ী এটা হতে পারে না। হতে পারে না। হতে পারে না। নিতান্তই অসম্ভব। সূর্য পশ্চিম দিকে উঠা যেমন অসম্ভব, এটাও তেমন অসম্ভব। এ হতেই পারে না।

কিন্তু হয়েছে। তিনি খানিক থেকে তিন হাত উপরে স্থির হয়ে আছেন। ঘরের সবকিছু আগের মতো আছে, শুধু তিনি শূন্যে ভাসছেন। অমর বাবু চোখ বন্ধ করে মনে-মনে বললেন, হে ঈশ্বর। দয়া কর। দয়া কর। শরীরে কেমন যেন অনুভূতি হলো। হয়তো এবার নিচে নেমেছেন। তিনি চোখ খুললেন, না আগের জায়গাতেই আছেন। এটা কী করে হয়?

প্রচণ্ড শব্দে বিদ্যুৎ চমকাল আর তার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ধপ করে নিচে পড়লেন। খানিকটা ব্যথাও পেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় গুয়ে পড়লেন। চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে দিলেন। কী ঘটেছে তা নিয়ে তিনি আর ভাবতে চান না। ঘুমুতে চান। নিশ্চিন্ত ঘুম। ঘুম ভেঙে যাবার পর হয়তো সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

রাতে তাঁর ভালো ঘুম হলো। শেষ রাতের দিকে তিনি একবার জেগে উঠে বাথরুমে যান। আজ তাও গেলেন না, এক ঘুমে রাত পার করে দিলেন। যখন ঘুম ভাঙল— তখন চারদিকে দিনের কড়া আলো, রোদ উঠে গেছে। তাঁর দীর্ঘ

জীবনে এই প্রথম সূর্য উঠার পর ঘুম ভাঙল। রাতে কী ঘটেছিল তা মনে করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। দুঃস্বপ্ন, নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন। বদহজম হয়েছিল। বদহজমের কারণে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এরকম হয়। মানুষ খুব ক্লান্ত থাকলে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। ঘুমের মধ্যেই স্বপ্ন দেখেছেন। দীর্ঘ স্বপ্নের স্থায়িত্বকাল হয় খুব কম। হয়তো এক সেকেন্ডের একটা স্বপ্ন দেখেছেন। এই হবে— এ ছাড়া আর কী? স্বপ্ন, অবশ্যই স্বপ্ন। অমর বাবুর মন একটু হালকা হলো।

পরের দিনের কথা। প্রথম পিরিয়ডে অমর বাবুর ক্লাস নেই। টিচার্স কমন রুমে চুপচাপ বসে আছেন। ইদরিস সাহেব যথারীতি তাঁর পাশে এসে বসলেন। পানের কৌটা বের করতে করতে বললেন, ‘অমর বাবুর শরীর খারাপ না-কি?’

‘জি-না।’

‘দেখে কেমন-কেমন জানি লাগছে। মনে হচ্ছে অসুস্থ। গায়ে কি জ্বর আছে?’

‘জি-না।’

‘রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল?’

‘হুঁ, তবে দুঃস্বপ্ন দেখেছি।’

‘কী দুঃস্বপ্ন দেখেছেন?’

অমর বাবু ইতস্তত করে বললেন, ‘দেখলাম শূন্যে ভাসছি।’

‘আরে ভাই এটা কি দুঃস্বপ্ন? শূন্যে ভাসা, আকাশে উড়ে যাওয়া— এইসব স্বপ্ন তো আমি রোজই দেখি। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি অনেক উঁচু থেকে ধূপ করে মাটিতে পড়ে গেছি। খুব টেনশানের স্বপ্ন।’

অমর বাবু নিচু গলায় বললেন, ‘ঠিক স্বপ্ন না, মনে হয় জাগ্রত অবস্থায় দেখেছি।’

‘কী বললেন? জাগ্রত অবস্থায়? জেগে জেগে দেখলেন আপনি শূন্যে ভাসছেন?’

‘জি।’

‘জাগ্রত অবস্থায় দেখলেন শূন্যে ভাসছেন?’

অমর বাবু জবাব দিলেন না। মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইলেন। ইদরিস সাহেব বললেন, ‘রাত-দিন সায়েন্স সায়েন্স করে আপনার মাথা ইয়ে হয়ে গেছে। বিশ্রাম দরকার। আপনি এক কাজ করুন— ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যান। আজ ক্লাস নেয়ার দরকার নেই। আমি হেড স্যারকে বলে আসি?’

‘না না, আমার শরীর ঠিকই আছে।’

অমর বাবু যথারীতি ক্লাসে গেলেন। তাঁর পড়াবার কথা আলোর ধর্ম। তিনি শুরু করলেন মাধ্যাকর্ষণ।

‘দু’টি বস্তু আছে। একটির ভর m_1 অন্যটির ভর m_2 তাদের মধ্যে দূরত্ব r হচ্ছে তাহলে মাধ্যাকর্ষণ বলের পরিমাণ হবে—

$$\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

এটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। স্যার আইজাক নিউটনের বিখ্যাত সূত্র। এর কোনো নড়চড় হবে না। হতে পারে না। বাবারা বুঝতে পারছ?’

ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আজ পড়াবার কথা আলোর ধর্ম, প্রতিফলন, প্রতিসরণ; স্যার মাধ্যাকর্ষণ পড়াচ্ছেন কেন?

‘বাবারা কি বলছি বুঝতে পারছ?’

ছাত্ররা জবাব দিল না।

‘যদি কেউ বুঝতে না পার হাত তোল।’

কেউ হাত তুলল না। একসময় ঘণ্টা পড়ে গেল। কোশাদিনও যা হয় না তাই হলো। অমর বাবু ঘণ্টা পড়ার পরেও চুপচাপ বসে রইলেন। পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখলেন না বা উঠেও গেলেন না। চোখ বন্ধ করে মূর্তির মতো বসে রইলেন। ছাত্রদের বিস্ময়ের কোনো সীমা রইল না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অমর বাবু স্কুল লাইব্রেরিতে বসে আছেন। হাতে একটা বই। নাম— ‘মৌমাছিদের বিচিত্র জীবন’ পড়তে বড় ভালো লাগছে। কত ক্ষুদ্র প্রাণী অথচ কী অসম্ভব বুদ্ধি! কী অসম্ভব জ্ঞান! মৌচাকের ভেতরের তাপমাত্রা তারা একটা নির্দিষ্ট স্থানে স্থির করে রাখে। বাড়তেও দেয় না, কমতেও দেয় না। এই কাজটা তারা করে অতি দ্রুত পাখা কাঁপিয়ে। তাপমাত্রা এক হাজার ভাগের এক ভাগও বেশ-কম হয় না। মানুষের পক্ষেও যা বেশ কঠিন।

তিনি রাত আটটার দিকে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। শরীরটা ভালো লাগছে না। একটু জ্বর জ্বর লাগছে। টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার দিয়ে গেছে। তিনি কিছু খাবেন না বলে ঠিক করলেন। না খাওয়াই ভালো হবে। অনেক সময় পেটের গুগুগোল থেকে মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়। তাতে আজীবনে স্বপ্ন দেখার ব্যাপারটা ঘটতে পারে। না খেলে তা হবে না। লেবুর শরবত বানিয়ে এক গ্লাস শরবত খেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন।

কাল শীত শীত লাগছিল, আজ আবার গরম লাগছে। জানালা খোলা, সামান্য বাতাস আসছে। সেই বাতাস মশারির ভেতর ঢুকছে না। তিনি মশারি খুলে ফেললেন। মশা কামড়াবে। কামড়াক। গরমের চেয়ে মশার কামড় খাওয়া ভালো।

মশারি খুলে ফেলে বিছানায় শোয়া মাত্র আবার গত রাতের মতো হলো।

তিনি ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে যেতে লাগলেন। দেখতে-দেখতে তাঁর মাথা ঘরের ছাদ স্পর্শ করল।

তিনি হাত দিয়ে সেই ছাদে ধাক্কা দেয়া মাত্র খানিকটা নিচে নেমে আবার উপরে উঠতে লাগলেন। একী অদ্ভুত কাণ্ড! আবারো কি স্বপ্ন? না, স্বপ্ন না। আজকেরটা স্বপ্ন না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তার উপর কাজ করছে না। পৃথিবীর ভর যদি হয় m_1 তিনি যদি হন m_2 এবং তাঁর ভর m_2 যদি হয় শূন্য তাহলে মাধ্যাকর্ষণ বল হবে শূন্য। তাঁর ভর কি এখন শূন্য? তিনি পাশ ফিরলেন, শরীরটা চমৎকারভাবে ঘুরে গেল। সাঁতার কাটার মতো করলেন। তেমন লাভ হলো না। যেখানে ছিলেন সেখানেই রইলেন। এটাই স্বাভাবিক, বাতাস অতি হালকা। হালকা বাতাসে সাঁতার কাটা যাবে না।

ব্যাখ্যা কী? এর ব্যাখ্যা কী? একটা মানুষের ভর হঠাৎ শূন্য হয়ে যেতে পারে না। নিচে নামার উপায় কী? মনে-মনে আমি যদি চিন্তা করি নিচে নামব তাহলে কি নিচে নামতে পারব? তিনি মনে-মনে চিন্তা করলেন— নেমে যাচ্ছি, দ্রুত নেমে যাচ্ছি। লাভ হলো না। যেখানে ছিলেন সেখানেই রইলেন।

আচ্ছা তিনি যদি থুথু ফেলেন তাহলে থুথুটার কী হবে? মাটিতে পড়ে যাবে না শূন্যে ঝুলতে থাকবে? তিনি থুথু ফেললেন। থুথু স্বাভাবিকভাবে থুথু মাটিতে পড়ল। গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলে ছেড়ে দিলে সেটিও কি শূন্যে ভাসতে থাকবে? না-কি নিচে পড়ে যাবে? অতি সহজেই এই পরীক্ষা করা যায়। তিনি গায়ের পাঞ্জাবি খুলে ফেললেন। ছেড়ে দিতেই দ্রুত তা নিচে নেমে গেল। তার মানে এই অদ্ভুত ব্যাপাটির সঙ্গে শুধুমাত্র তিনিই জড়িত। তাঁর গায়ের পোশাকের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। তিনি চোখ বন্ধ করে চিন্তা করছেন মাধ্যাকর্ষণ বল যদি হয় F তাহলে—

$$F = \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

m_1 পৃথিবীর ভর। m_2 তাঁর নিজের ভর। r হচ্ছে তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব। m_2 যদি '0' হয়, F হবে শূন্য। কিংবা r যদি হয় অসীম তাহলেও F হবে '0' কোনো বিচিত্রি কারণে কি তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব অসীম হয়ে যাচ্ছে? ভাবতে ভাবতে অমর বাবুর ঘুম পেয়ে গেল। একসময় মাটি থেকে ছ'ফুট উঁচুতে সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লেন। গভীর ঘুম। তাঁর নাকও ডাকতে লাগল। ঘুমের মধ্যেই তিনি পাশ ফিরে গুলেন। কোনো রকম অসুবিধা হলো না।

ঘুম ভাঙলো ভোরবেলা।

অনেক বেলা হয়েছে। ঘরে রোদ ঢুকেছে। তিনি পড়ে আছেন মেঝেতে। কখন মাটিতে নেমে এসেছেন তিনি জানেন না। গায়ে কোনো ব্যথা বোধ নেই, কাজেই ধপ করে পড়েন নি— আস্তে-আস্তে নেমে এসেছেন।

অমর বাবু স্বাভাবিক মানুষের মতো হাত-মুখ ধুলেন। মুড়ি গুড় দিয়ে সকালের নাশতা সারলেন। পুকুর থেকে গোসল শেষ করে যথাসময়ে স্কুলে গেলেন। আজ প্রথম পিরিয়ডেই তাঁর ক্লাস। তিনি ক্লাস না নিয়ে নিজের চেয়ারে মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইলেন। মনে হলো ঘুমুচ্ছেন। আসলে ঘুমুচ্ছিলেন না, ভাবার চেষ্টা করেছিলেন— তার জীবনে এসব কী ঘটছে?

ব্যাপারটা শুধু রাতেই ঘটছে। দিনে ঘটছে না। আচ্ছা তিনি যদি তাঁর নিজের ঘরে না ঘুমিয়ে অন্য কোথাও থাকেন তাহলেও কি এই ব্যাপার ঘটবে? রাতে খোলা মাঠে যদি ঘুমিয়ে থাকেন তাহলে কি ভাসতে ভাসতে মহাশূন্যে চলে যাবেন? মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি বা সূর্যের কাছাকাছি কিংবা আরো দূরে— এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ... সুদূর কোনো ছায়াপথে...?

‘স্যার।’

অমর বাবু চমকে তাকালেন। দপ্তরি কালিপদ দাঁড়িয়ে আছে।

‘হেড স্যার আপনারে বুলায়।’

হেড স্যার তাঁকে কেন ডেকে পাঠালেন তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। ইদরিস সাহেব কি হেড স্যারকে কিছু বলেছেন? বলতেও পারেন। পেট পাতলা মানুষ। — বলাটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা ব্যাপারটা কি তিনি নিজে গুছিয়ে হেড স্যারকে বলবেন? বলা যেতে পারে। মানুষ ভালো। গুরুতেই অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন না।

হেড স্যার বললেন, ‘কেমন আছেন অমর বাবু?’

‘জি ভালো।’

‘দেখে তো ভালো মনে হচ্ছে না। বসুন। চা খাবেন?’

‘চা তোর স্যার আমি খাই না।’

‘এক-আধবার খেলে কিছু হয় না। খান। কালিপদকে চা দিতে বলেছি।’

কালিপদ চা দিয়ে থার্ড পিরিয়ডের ঘণ্টা দিতে গেল। হেড স্যার বললেন, শুনলাম গত কাল ক্লাস নেননি। আজও ফাস্ট পিরিয়ড মিস গেছে।

‘ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে স্যার।’

‘ও আচ্ছা। আপনার তো সব ঘড়ি-ধরা। ঘুম ভাঙতে দেরি হলো কেন?’

অমর বাবু চুপ করে রইলেন।

‘পারিবারিক কোনো সমস্যা যাচ্ছে না-কি?’

‘জি-না।’

‘আপনার মেয়ে গত কাল আমার কাছে এসেছিল। খুব কান্নাকাটি করল। আপনি বাড়িতে থাকেন না। এই নিয়ে বেচারির মনে খুব দুঃখ। দুঃখ হওয়াটাই স্বাভাবিক।’

‘আমি একা থাকতেই পছন্দ করি।’

‘নিজের পছন্দকে সব সময় খুব বেশি গুরুত্ব দিতে নেই। অন্যদের কথাও ভাবতে হয়। আমরা সামাজিক জীব...’

‘স্যার উঠি?’

‘বসুন খানিকক্ষণ। গল্প করি— অমর বাবু আমি বলি কি যদি অসুবিধা না থাকে তা হলে, আপনার সমস্যাটা আমাকে বলুন। ইদরিস সাহেব স্বপ্নের কথা কি সব বলছিলেন—’

অমর বাবু ইতস্তত করে বললেন, ‘বিজ্ঞানের সূত্র মিলছে না স্যার।’

হেডমাস্টার সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘কোন সূত্র মিলছে না?’

‘স্যার আইজ্যাক নিউটনের সূত্র— মধ্যাকর্ষণ সূত্র।’

‘আপনার ধারণা সূত্রটা ভুল?’

অমর বাবু জবাব দিলেন না। হেডমাস্টার সাহেব বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। একসময় বললেন, ‘আচ্ছা আপনি বসে বাড়িতে চলে যান। আপনাকে দশ দিনের ছুটি দিয়ে দিলাম। বিশ্রাম করুন। বিশ্রাম দরকার। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মাঝে মাঝে মানুষের মাথা ঝুলেমেলা হয়ে যায়।’

‘স্যার, আমার মাথা ঠিকই আছে।’

‘অবশ্যই ঠিক আছে। কথার কথা বললাম। যান, বাসায় চলে যান... বাড়ির সবাই অস্থির হয়ে আছে।’

অমর বাবু বাড়ি ফেরলেন না। কমন রুমে নিজের চেয়ারে এসে বসলেন। হাতে একটা ফুল স্ক্যাপ কাগজ। সেই কাগজে নিউটনের সূত্র নতুনভাবে লিখলেন—

$$F = k. \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

এখানে k-এর মান ১ তবে মাঝে মাঝে ‘k’ এর মান হচ্ছে শূন্য। যেমন তাঁর ক্ষেত্রে হচ্ছে। একসময় কলম দিয়ে নির্মমভাবে সব কেটেও ফেললেন। নিউটন যে সূত্র দিয়ে গেছেন— তাঁর মতো সামান্য মানুষ সেই সূত্র পাল্টাতে পারেন না।

অমর বাবু টিফিন পিরিয়ডে অনেক সময় নিয়ে ইংরেজিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার চেয়ারম্যানকে একটি চিঠি লিখলেন। চিঠির বাংলা অনুবাদ অনেকটা এই রকম—

জনাব,

আমি রূপেশ্বর হাইস্কুলের বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক। নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া আপনাকে পত্র দিতেছি। সম্প্রতি আমার জীবনে এমন এক ঘটনা ঘটিতেছে যাহার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমি খুঁজিয়া না পাইয়া আপনার দ্বারস্থ হইলাম। আমি শূন্যে ভাসিতে পারি। আপনার নিকট খুব অদ্ভুত মনে হইলেও ইহা সত্য। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়া বলিতেছি— আপনাকে যাহা বলিলাম সবই সত্য। কোনো রকম চেষ্টা ছাড়াই আমি শূন্যে উঠিতে পারি এবং ভাসমান অবস্থায় দীর্ঘ সময় কাটাইতে পারি। জনাব, বিষয়টি কী, বুঝিবার ব্যাপারে আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন তাহা হইলে এই অধম আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। আপনি বলিলেই ঢাকায় আসিয়া আমি আপনাকে শূন্যে ভাসার ব্যাপারটি চাক্ষুষ দেখাইব। জনাব, আপনি আমার প্রতি দয়া করুন— বিষয়টি বুঝিতে আমাকে সাহায্য করুন।

বিনীত

অমর দাস পাল

B.Sc. (Hon's)

দশ দিনের পুরোটাই তিনি নিজের ঘরে কাটালেন— বাড়িতে গেলেন না। তাঁকে নিতে তাঁর ছোট মেয়ে অতসী এসেছিল। তাকে ধমকে বিদায় করলেন। এই মেয়েটা পড়াশোনায় ভালো ছিল— তাকে এত করে বললেন সায়েন্স পড়তে, সে ভর্তি হওয়া আর্টস-এ। কোনো মানে হয়? তাকে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সূত্র কী জিজ্ঞেস করলে সে হা করে তাকিয়ে থাকবে। কী দুঃখের কথা!

অতসীকে ধমকে ঘর থেকে বের করে দিলেও সে গেল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। তিনি বাইরে এসে বিরক্ত গলায় বললেন, ‘কাঁদছিস কেন?’

সে ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলল, ‘তোমার শরীর খারাপ বাবা। তুমি বাড়িতে চল।’

‘শরীর খারাপ তোকে কে বলল?’

‘সবাই বলাবলি করছে। তুমি না-কি কি সব স্বপ্ন-টপ্প দেখ।’

‘কোনো স্বপ্ন দেখি না। আমি ভালো আছি। নির্জনে একটা পরীক্ষা করছি। পরীক্ষা শেষ হোক— তোদের সঙ্গে এসে কয়েক দিন থাকব।’

‘কীসের পরীক্ষা।’

‘কীসের পরীক্ষা বললে তো তুই বুঝবি না। হা করে তাকিয়ে থাকবি। এত করে বললাম সায়েন্স পড়তে।’

‘অঙ্ক পারি না যে।’

‘অঙ্ক না পারার কী আছে! যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ— অঙ্ক তো এর বাইরে না। কাঁদিস না। বাসায় যা। আমি ভালো আছি।’

তিনি যে ভালো আছেন তা কিন্তু না।

রোজ রাতে একই ব্যাপার ঘটছে। খেয়ে-দেয়ে ঘুমুতে যান— মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে দেখেন শূন্যে ভাসছেন। তখন আতঙ্কে অস্থির হওয়া ছাড়া পথ থাকে না। তিনি ইচ্ছে করলেই নিচে নামতে পারেন না।

নিচে কীভাবে নামেন তাও জানেন না। রাতটা তাঁর অঘুমের কাটে। তিনি ঘুমুতে যান দিনে। এমন যদি হত তিনি দিনরাত সারাক্ষণই শূন্যে ভাসছেন তাহলেও একটা কথা ছিল। নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারতেন যে, কোনো-এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় তাঁর ভর শূন্য হয়ে গেছে। ব্যাপারটা সে রকম না। এমন কেউ এখানে নেই যে তিনি সাহায্যের জন্যে তাঁর কাছে যাবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার চেয়ারম্যান সাহেবও কিছু লিখেছেন না। হয়তো ভেবেছেন পাগলের চিঠি। কে আর কষ্ট করে পাগলের চিঠির জবাব দেয়?

ন’ দিনের মাথায় অমর বার চিঠির জবাব পেলেন। অতি ভদ্র চিঠি। চেয়ারম্যান সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডে লিখেছেন—

জনাব,

আপনার চিঠি কৌতূহল নিয়ে পড়লাম। আপনি বিজ্ঞানের শিক্ষক। কাজেই বুঝতে পারছেন আপনি যে বিষয়ের অবতারণা করেছেন তা বিজ্ঞান স্বীকার করে না। আপনি যদি আমার অফিসে এসে শূন্যে ভাসতে থাকেন তাহলেও আমি বিশ্বাস করব না। ভাবব এর পেছনে ম্যাজিকের কোনো কৌশল কাজ করছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন জাদুকররা শূন্যে ভাসার খেলা সব সময়ই দেখায়।

যাই হোক, আপনার চিঠি পড়ে আমার ধারণা হয়েছে যে আপনার সমস্যাটি মানসিক। আপনি মনে-মনে ভাবছেন— শূন্যে ভাসছেন। আসলে ভাসছেন না। সবচেয়ে ভালো হয় যদি একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। একমাত্র তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। আমি আপনাকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারছি না বলে

আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ
করছি।

বিনীত

এস. আলি

M.Sc. Ph.D., F.R.S.

অমর বাবু মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাবার ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব
দিলেন না। কারণ, তিনি জানেন বিষয়টা সত্যি। তিনি দু'-একটা ছোটখাট
পরীক্ষা করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন। যেমন স্কুল থেকে লাল রঙের চক
নিয়ে এসেছিলেন। শূন্যে উঠে যাবার পর সেই লাল রঙের চক দিয়ে ছাদে বড়
বড় করে লিখলেন,

হে পরম পিতা ঈশ্বর, তুমি আমাকে দয়া কর।
তোমার অপার রহস্যের খানিকটা আমাকে দেখতে দাও।
আমি অন্ধ, তুমি আমাকে পথ দেখাও।
জ্ঞানের আলো আমার হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত কর।
পথ দেখাও পরম পিতা।

আরো অনেক কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল, চক ফুরিয়ে যাওয়ায় লেখা হলো না।
এই লেখাটা ছাদে আছে। তিনি তাকালেই দেখতে পান। এমন যদি হতো
লেখাটা তিনি একা দেখতে পাচ্ছেন তাহলেও বোঝা যেত সমস্যাটা মনে। কিন্তু
তা তো না। অন্যরাও লেখা পড়তে পারছে। গত কাল বিকেলে হেড মাস্টার
সাহেব তাঁকে দেখতে এসে হঠাৎ করেই বিস্মিত গলায় বললেন, 'ছাদে এইসব
কী লেখা?'

অমর বাবু নিচু গলায় বললেন, 'প্রার্থনা সংগীত।'

'প্রার্থনা সংগীত ছাদে লিখলেন কেন?'

'শুয়ে শুয়ে যাতে পড়তে পারি এইজন্যে।'

'লিখলেন কীভাবে? মই দিয়ে উঠেছিলেন না-কি?'

অমর বাবু জবাব দিলেন না। হেড মাস্টার সাহেব জবাবের জন্যে
খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, 'আপনার ছুটি তো শেষ হয়ে গেল, আপনি
কি ছুটি আরো বাড়াতে চান?'

'জি-না।'

'আপনি বরং আরো কিছুদিন ছুটি নিন। শরীরটা এখনো সেরেছে বলে মনে
হয় না। আপনাকে খুব দুর্বল লাগছে।'

'আমার শরীর যা আছে তা-ই থাকবে স্যার। আর ভালো হবে না।'

'এইসব কী ধরনের কথা! কোনো ডাক্তারকে কি দেখিয়েছেন?'

'জি-না।'

‘ডাক্তার দেখাতে হবে। ডাক্তার না দেখালে কীভাবে হবে? বিধু বাবুকে দেখান। বিধু বাবু এল.এম.এফ. হলেও ভালো ডাক্তার। যে কোনো বড় ডাক্তারের কান কেটে নিতে পারে। বিধু বাবুকে দেখানোর কথা মনে থাকবে?’

‘জি স্যার, থাকবে।’

‘না আপনার মনে থাকবে না। আমি বরং নিয়ে আসব। আমার ছোট মেয়েটার জ্বর। বিধু বাবুকে বাসায় আসতে বলেছি। এলে, আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।’

‘জি-আচ্ছা।’

‘এখন তাহলে উঠি অমর বাবু?’

‘একটু বসুন স্যার।’

হেড মাস্টার সাহেব উঠতে গিয়েও বসে পড়লেন। তিনি খানিকটা বিস্মিত, কারণ অমর বাবু একদৃষ্টিতে ছাদের লেখাগুলির দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁকে অসম্ভব চিন্তিত মনে হচ্ছে। অমর বাবু নিচু গলায় বললেন, ‘আপনাকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি স্যার— যদি কিছু মনে না করেন।’

‘বলুন কী বলবেন। মনে কড়াকড়ির কী আছে?’

অমর বাবু প্রায় ফিসফিস করে বললেন, ‘আমি শূন্যে ভাসতে পারি।’

‘বুঝতে পারলাম না কী বলছেন।’

‘আমি আপনা-আপনি শূন্যে উঠে যেতে পারি।’

‘ও আচ্ছা।’

হেড মাস্টার সাহেব ‘ও আচ্ছা’ এমন ভঙ্গিতে বললেন যেন শূন্যে ভেসে থাকবার ব্যাপারটা রোজই ঘটছে। তবে তার চোখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি খুব চিন্তিত বোধ করছেন।

‘ছাদের লেখাগুলি শূন্যে ভাসতে ভাসতে লেখা।’

‘ও আচ্ছা।’

‘আপনার কি আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?’

হেড মাস্টার সাহেব জবাব দিলেন না। অমর বাবু বললেন, ‘আমি স্যার এই জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। ছেলেবেলায় হয়তো বলেছি, জ্ঞান হবার পর থেকে বলিনি।’

‘আমি বিধু বাবুকে পাঠিয়ে দেব।’

‘জি আচ্ছা।’

হেড মাস্টার সাহেব ইতস্তত করে বললেন, ‘উনাকে শূন্যে ভাসার ব্যাপারটা বলার দরকার নেই। জানাজানি হবে। ইয়ে মানে— লোকজন হাসাহাসি করতে পারে।’

‘আমি আপনাকেই খোলাখুলি বলেছি। আর কাউকে বলিনি।’

‘ভালো করেছেন। খুব ভালো করেছেন।’

বিধু বাবু এসে খানিকক্ষণ গল্পটল্ল করে যাবার সময় ঘুমের অশুধ দিয়ে গেলেন। বললেন, ‘দুঃস্বপ্ন না দেখার একটাই পথ। গভীর নিদ্রা। নিদ্রা পাতলা হলেই মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে। আমি ফোনোবারবিটন ট্যাবলেট দিয়ে যাচ্ছি। শোবার আগে দু’টা করে খাবেন।’

অমরবাবু দুটো ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমুতে গেলেন। তবে ঘুমুতে যাবার আগে এক কাণ্ড করলেন— কালিপদকে বললেন, ‘লম্বা একগাছি দড়ি নিয়ে তাঁকে খুব ভালো করে চৌকির সঙ্গে বেঁধে রাখতে।’

কালিপদ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল।

অমর বাবু বিরক্ত মুখে বললেন, ‘আমার মাথা খারাপ হয়নি, মাথা ঠিক আছে। তোমাকে যা করতে বলেছি কর। ব্যাপারটা কি পরে বুঝিয়ে বলব। লম্বা দেখে একগাছি দড়ি আন। শক্ত করে আমাকে চৌকির সঙ্গে বাঁধ।’

কালিপদ তাই করল। তবে করল খুব অনিচ্ছার সঙ্গে।

অমর বাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের ট্যাবলেটের কারণে তাঁর গাঢ় নিদ্রা হলো। ঘুম ভাঙল বেলা উঠার পর। তিনি দেখলেন— একগাছি চৌকির সঙ্গে বাঁধা আছেন তবে চৌকি আগের জায়গায় নেই, ঘরের সামান্যটা চলে এসেছে। তার একটাই মানে— চৌকি নিয়েই তিনি শূন্যে ভেসেছেন। নামার সময় চৌকি আগের জায়গায় নামেনি। স্থান পরিবর্তন হয়েছে।

তিনি সেদিনই বিছানাপত্র দিয়ে বাড়িতে চলে এলেন। অতসী তাঁকে দেখে কেঁদে ফেলল। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, ‘নাকে কাঁদছিস কেন? কী হয়েছে?’

অতসী কাঁদতে কাঁদতেই বলল, ‘তোমার শরীর এত খারাপ হয়েছে কেন বাবা? কী ভয়ঙ্কর রোগা হয়ে গেছে!’

‘ভালো ঘুম হচ্ছে না, এইজন্যে শরীর খারাপ হয়েছে, এতে নাকে কাঁদার কী হলো?’

‘সবাই বলাবলি করেছে তোমার না-কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কালিপদ নাকি রোজ রাতে দড়ি দিয়ে তোমাকে বেঁধে রাখে।’

‘কী যন্ত্রণা! একবারই বাঁধতে বলেছিলাম— এর মধ্যে এই গল্প ছড়িয়ে গেছে?’

‘তোমার কী হয়েছে বাবা বল?’

‘কিছু হয়নি।’

অমর বাবু ছ’দিন বাড়িতে থাকলেন। এই ছ’দিনে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করলেন। শূন্যে ভাসার ব্যাপারটা তিনি একা একা থাকার সময়ই ঘটে। অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে ঘুমুলে ঘটে না। যে ক’রাত তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে ঘুমিয়েছেন সে ক’রাত তিনি শূন্যে ভাসেননি। দু’রাত ছিলেন একা একা, দু’রাতেই শূন্যে উঠে গেছেন।

পূজার ছুটির পর স্কুল নিয়মিত শুরু হলো। তিনি স্কুলে গেলেন না। লম্বা

ছুটির দরখাস্ত করলেন। আবার বাড়ি ছেড়ে বাস করতে শুরু করলেন স্কুলের ঘরে। দীর্ঘদিন বাড়িতে থাকতে তাঁর ভালো লাগে না।

শূন্যে ভাসার ব্যাপারটা রোজ ঘটতে লাগল। আগের চেয়ে অনেক বেশি ঘটতে লাগল। এখন বিছানায় শোয়ামাত্র শূন্যে উঠে যান। সারারাত সেখানেই কাটে। শেষ রাতের দিকে নিচে নেমে আসেন। ব্যাপারটা ঘটে শুধু রাতে, দিনে ঘটে না। কখনো না। এবং অন্য কোনো ব্যক্তির সামনেও ঘটে না।

হেড স্যার এবং ইদরিস স্যার পরপর দু'রাত অমর বাবুর ঘরে জেগে বসে ছিলেন। দেখার জন্যে ব্যাপারটা কী। তাঁরা মুহূর্তের জন্যেও চোখের পাতা এক করেননি। লাভ হয়নি, কিছুই দেখেননি। হেড স্যার বললেন, 'ব্যাপারটা পুরোপুরি মানসিক।'

অমর বাবু দুঃখিত গলায় বললেন, 'আপনার কি ধারণা আমি পাগল হয়ে গেছি?'

'না, তা না। পাগল হবেন কেন? তবু আমার ধারণা ব্যাপারটা আপনার মনে ঘটছে। একবার ঢাকায় চলুন না, একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলি।'

'না'

'ক্ষতি তো কিছু নেই। চলুন না।'

'আমি যেতে চাচ্ছি না স্যার, কারণ আমি জানি ব্যাপারটা সত্যি। সত্যি না হলে ছাদে এই লেখাগুলি আমি কীভাবে লিখলাম। দেখেছেন তো ঘরে কোনো মই নেই।'

হেড স্যার চুপ করে রইলেন। অমর বাবু বললেন, 'আপনারা ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ান, আমি আবার শূন্যে উঠে ছাদে একটা লেখা লিখব।'

হেড স্যার বললেন, 'তাঁর দরকার নেই কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি আমাদের সামনে ব্যাপারটা পুনরাবৃত্তি করেন না কেন?'

'আমি জানি না। জানলে বলতাম। জানার চেষ্টা করছি, দিন-রাত এটা নিয়েই ভাবছি।'

'এত ভাবাবাবির দরকার নেই, আপনি আমার সঙ্গে ঢাকা চলুন। দু'দিনের ব্যাপার। যাব, ডাক্তার দেখাব, চলে আসব। আমার একটা অনুরোধ রাখুন। প্লিজ। আপনার হয়তো লাভ হবে না কিন্তু ক্ষতি তো কিছু হবে না।'

অমর বাবু ঢাকায় গেলেন।

একজন অতি বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দীর্ঘ সময় ধরে তাকে নানান প্রশ্ন করলেন। পরপর কয়েক দিন তাঁর কাছে যেতে হলো। শেষ দিনে বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার যা হয়েছে তা একটা রোগ। এর উৎপত্তি হচ্ছে অবসেসনে। বিজ্ঞানের প্রতি আপনার তীব্র অনুরাগ। সেই অনুরাগ রূপান্তরিত

হয়েছে অবসেসনে। কেউ যখন বিজ্ঞানকে অবহেলা করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলে তখন আপনি তীব্র আঘাত পান। এই আঘাত আপনি পেয়েছেন আপনার অতি নিকটজনের কাছ থেকে। যেমন ধরুন আপনার কন্যা। সে বিজ্ঞান পড়েনি। আর্টস পড়ছে। এই তীব্র আঘাত আপনার মন গ্রহণ করতে পারেনি। আপনার অবচেতন মন ভাবতে শুরু করেছে— বিজ্ঞানের সূত্র অশ্রান্ত নয়। ভুল সূত্রও আছে। মাধ্যাকর্ষণ সূত্রও ভুল। একসময় অবচেতন মনের ধারণা সঞ্চারিত হয়েছে চেতন মনে। বুঝতে পারছেন?’

‘জি না, বুঝতে পারছি না।’

‘মোদা কথা হলো, আপনার রোগটা মনে।’

‘না— আমি নিজে বিজ্ঞানের শিক্ষক। আমি খুব ঠাণ্ডা মাথায় বিচার-বিবেচনা করেছি। আমি যে শূন্যে উঠতে পারি এটা ভুল না। পরীক্ষিত সত্য।’

‘মোটোও পরীক্ষিত সত্য নয়। আপনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি দেখেনি যে আপনি শূন্যে ভাসছেন। দেখলেও কথা ছিল, কেউ কি দেখেছে?’

‘জি-না।’

‘আমি ট্রাংকুলাইজার জাতীয় কিছু অষুধ দিচ্ছি। নিয়মিত খাবেন, ব্যায়াম করবেন। মন প্রফুল্ল রাখবেন। বিজ্ঞান নিয়ে কোনো পড়াশোনা করবেন না।’

অমর বাবু দুঃখিত গলায় বললেন, ‘আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেননি কিন্তু আমি যা বলছি সত্য বলছি—।’

‘ব্যাপারটা হয়তো আপনার কাছে সত্যি। কিন্তু সবার কাছে নয়। আপনি খুব ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করলেও এই সিদ্ধান্তে আসবেন।’

অমর বাবু ভগ্নহৃদয়ে কুশেখরে ফিরে এলেন। স্কুলে যোগ দিলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই মাথা ঝরাপের সব লক্ষণ তাঁর মধ্যে একে-একে দেখা দিতে লাগল। বিড়বিড় করে কথা বলেন, একা একা হাঁটেন। হাঁটার সময় দৃষ্টি থাকে আকাশের দিকে। নিতান্ত অপরিচিত কাউকে দেখলে থমকে দাঁড়িয়ে যান, শান্ত গলায় বলেন, ‘কিছু মনে করবেন না। আপনি কি নিউটনের গতিসূত্র জানেন?’

পাগলের অনেক রকম চিকিৎসা করানো হলো। কোনো লাভ হলো না। বরং লক্ষণগুলি আরো প্রকট হওয়া শুরু করল। গভীর রতে ছাত্রদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে উঁচু গলায় ডাকেন, ‘জব্বার, ও জব্বার, উঠে আয় তো বাবা। খুব দরকার।’

জব্বার উঠে এলে তিনি কারণ গলায় বলেন, ‘নিউটনের সূত্র মনে আছে? ভালো করে পড়। এস.এস.সি তে আসবে। সাথে অঙ্ক থাকবে— ‘ভূমি থেকে দশ ফুট উচ্চতায় ১ গ্রাম ভর বিশিষ্ট একটি আপেল ছাড়িয়া দিলে তার গতিবেগ পাঁচ ফুট উচ্চতায় কত হইবে? অঙ্কটা চট করে কর। মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ কত মনে আছে তো?’

আমাদের সমাজ পাগলদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে। অমর বাবুর ক্ষেত্রেও

তার ব্যতিক্রম হলো না। বছরখানিক না ঘুরতেই দেখা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে দেখে বলছে— ‘নিউটনের সূত্রটা কি যেন?’ অমর বাবু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে এদের তাড়া করছেন। তারা মজা পেয়ে খুব হাসছে। কারণ, তারা জানে পাগলরা শিশুদের তাড়া করে ঠিকই— কখনো আক্রমণ করে না।

পৌষের শুরু। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। এই শীতেও খালি গায়ে শুধুমাত্র একটা ধুতি কোমরে পেঁচিয়ে অমর বাবু রাস্তায় রাস্তায় হাঁটেন। নিউটনের সূত্র মনে আছে কি-না এই প্রশ্ন তিনি এখন আর কোনো মানুষকে করেন না। পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গদের করেন। তারা প্রশ্নের উত্তর সংগত কারণেই দেয় না। তিনি তখন ক্ষেপে যান।

রাত দশটার মতো বাজে। কনকনে শীত।

অমর বাবু দাঁড়িয়ে আছেন একটা কাঁঠাল গাছের নিচে। কাঁঠাল গাছের ডালে কয়েকটা বাদুড় বুলছে। তিনি বাদুড়গুলিকে নিউটনের সূত্র সম্পর্ক বলছেন। তখনই দেখা গেল— হারিকেন হাতে হেড স্যার আসছেন। কাঁঠাল গাছের কাছে এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। অমর বাবুর দিকে তাকিয়ে দুঃখিত গলায় বললেন, ‘কে অমর?’

‘জি স্যার।’

‘কী করেছেন?’

‘বাদুরগুলির সঙ্গে কথা বলছিলাম স্যার।’

‘ও আচ্ছা।’

‘এদের সঙ্গে কথা বললে মনটা হালকা হয়। ওদের নিউটনের সূত্রগুলি বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম।’

‘এই শীতে বাইরে ঘুরছেন। বাসায় গিয়ে ঘুমান।’

‘ঘুম আসে না স্যার।’

হেড মাস্টার সাহেব ইতস্তত করে বললেন, ‘ইয়ে অমর বাবু, এখনো কি আপনি শূন্যে ভাসেন?’

‘জি-না। ঢাকা থেকে আসার পর আর ভাসিনি। যদি আবার কখনো ভাসতে পারি— আপনাকে বলব। আমার এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। ভাসতে ভাসতে দূরে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে।’

‘দূরে কোথায়?’

‘মহাশূন্যে— অসীম দূরত্বে। চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সব ছাড়িয়ে...’

‘ও আচ্ছা।’

‘যাবার আগে আমি আপনাকে খবর দিয়ে যাব।’

‘আচ্ছা।’

শীত কেটে গিয়ে বর্ষা এসে গেল। অমর বাবু লোকালয় প্রায় ত্যাগ করলেন। বেশির ভাগ সময় বনে-জঙ্গলে থাকেন। রূপেশ্বরের পাশের গ্রাম হলদিয়ায় ঘন বন আছে। এখন ঐ বনেই তাঁর আস্তানা। তাঁর মেয়ে অতসী প্রায়ই তাঁকে খুঁজতে আসে। পায় না। মেয়েটা বনে বনে ঘুরে এবং কাঁদে। তিনি চার-পাঁচদিন পরপর একবার বের হয়ে আসেন। তাঁকে দেখে আগের অমর বাবু বলে চেনার কোনো উপায় নেই। যেন মানুষ না— প্রেত বিশেষ। মাথাভর্তি বিরাট চুল, বড় বড় দাড়ি। হাতের নখগুলি বড় হতে হতে পাখির ঠোঁটের মতো বেঁকে গেছে। স্বভাব-চরিত্র হয়েছে ভয়ঙ্কর। মানুষ দেখলে কামড়াতে আসেন। ইট-পাথর ছুঁড়েন। একবার স্থানীয় পোস্টমাস্টারকে গলা টিপে প্রায় মেরে ফেলতে বসেছিলেন। সবাই তাকে এড়িয়ে চলে। অতসীর বিয়ে হয়ে গেছে, সেও এখন আর বাবার খোঁজ আসে না।

দেখতে-দেখতে এক বছর পার হয়ে গেল। কার্তিক মাস। অল্প অল্প শীত পড়ছে। এগারোটার মতো বাজে। হেড স্যার খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েছেন, হঠাৎ শুনলেন উঠান থেকে অমর বাবু ডাকছেন, ‘স্যার! স্যার! স্যার জেগে আছেন?’

‘কে?’

‘স্যার আমি অমর। একটু বাইরে আসবেন?’

হেড স্যার অবাক হয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, ‘খবদার, তুমি বেরুতে পারবে না। পাগল মানুষ— কি না কি করে বসে। ঘুমাও।’

অমর বাবু আবার কাতর গলায় বললেন, ‘একটু বাইরে আসুন স্যার! খুব দরকার। খুব বেশি দরকার।’

হেড স্যার ভয়ে ভয়ে বাইরে এলেন। বিস্মিত হয়ে দেখলেন তাঁর বাড়ির সামনের আমগাছের সম্মুখ উচ্চতায় অমর বাবু ভাসছেন। অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় দৃশ্য। একটা মানুষ অবলীলায় শূন্যে ভাসছে। তার জন্যে পাখিদের মতো তাঁকে ডানা ঝাপ্টাতে হচ্ছে না।

‘স্যার দেখুন আমি ভাসছি।’

হেড স্যার জবাব দিতে পারছেন না। প্রথম কয়েক মুহূর্ত মনে হচ্ছিল চোখের ভুল। এখন তা মনে হচ্ছে না। ফকফকা চাঁদের আলো। দিনের আলোর মতো সব দেখা যাচ্ছে। তিনি পরিষ্কার দেখছেন— অমর বাবু শূন্যে ভাসছেন। এই তো ভাসতে ভাসতে খানিকটা এগিয়ে এলেন। সাঁতার কাটার মতো অবস্থায় মানুষটা শুয়ে আছে। কী আশ্চর্য!

‘স্যার দেখতে পাচ্ছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আজ হঠাৎ করে শূন্যে উঠে গেলাম। বন থেকে বের হয়ে রূপেশ্বরের

দিকে আসছি হঠাৎ শরীরটা হালকা হয়ে গেল। দেখতে-দেখতে দশ-বারো ফুট উঠে গেলাম। প্রথমেই ভাবলাম আপনাকে দেখিয়ে আসি। ভাসতে ভাসতে আসলাম।’

‘আর কেউ দেখেনি?’

‘না। কয়েকটা কুকুর দেখেছে। ওরা ভয় পেয়ে খুব চিৎকার করছিল। এরকম দেখে তো অভ্যাস নেই। আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে স্যার?’

‘হ্যাঁ, হচ্ছে।’

‘আমি ঠিক করেছি— ভাসতে ভাসতে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাব।’

‘ও আচ্ছা।’

‘আমার মাথাটা বোধহয় খারাপ হয়ে গিয়েছিল— সারাক্ষণ ব্যথা করত। এখন ব্যথাও নেই। আগে কাউকে চিনতে পারতাম না। এখন পারছি।’

‘শুনে ভালো লাগছে অমর বাবু।’

‘অন্য একটা কারণেও মনে খুব শান্তি পাচ্ছি। কারণটা বলি— মহাশূন্যে ভাসার রহস্যটাও ধরতে পেরেছি।’

হেড মাস্টার সাহেব আশ্চর্যের সঙ্গে বললেন, ‘রহস্যটা কী?’

‘রহস্যটা খুব সাধারণ। এতদিন কেন ধরতে পারিনি কে জানে। তবে স্যার আপনাকে রহস্যটা বলব না। বললে আপনি খিঁচি খাবেন। তখন দেখা যাবে সবাই শূন্যে ভাসছে। এটা ঠিক না। প্রকৃতি ভাঙে না। স্যার যাই?’

অমর বাবু উপরে উঠতে লাগলেন। অনেক অনেক উঁচুতে। একসময় তাঁকে কালো বিন্দুর মতো দেখাতে লাগল।

হেড স্যারের স্ত্রী হারিকেন হাটে বারান্দায় এসে ভীত গলায় বললেন, ‘কী ব্যাপার? পাগলটা কোথায়?’

‘চলে গেছে।’

‘তুমি বাইরে কেন? ভেতরে এসে ঘুমাও।’

তিনি ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন।

অমর বাবুকে এর পর আর কেউ এই অঞ্চলে দেখেনি। হেড স্যার সেই রাতের কথা কাউকেই বলেননি। কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করবে না। সবাই পাগল ভাববে। আর একবার পাগল ভাবতে শুরু করলে শেষ পর্যন্ত পাগল হতেই হয়— এটা তো তিনি নিজের চোখেই দেখেছেন।



মন্ত্রীর হেলিকপ্টার

মন্ত্রী হবার পর তিনি (আব্দুল কাদের জোয়ারদার) এই প্রথমবার গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন। বেড়াতে যাওয়া নয়— সরকারি সফর। গ্রামের উন্নয়ন দেখবেন, স্কুলের মাঠে একটা বজ্রতা দেবেন, মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। অনেক প্রোগ্রাম।

নিজ গ্রামে যাবার ব্যাপারটিতে বড় রকমের জাঁকজমক করার তাঁর খুব ইচ্ছা। কিন্তু এই ইচ্ছাটি পূর্ণ হবে কি-না বোঝা যাচ্ছে না। হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা এখনো হয়নি। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি (সোলায়মান) এখনো চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু জোয়ারদার সাহেব খুব-একটা ভরসা করতে পারছেন না। সোলায়মান ছেলেটি ভ্যাবদা ধরনের। আগের সিএসপি-দের সেই ধারালো ভাবের কিছুই তার মধ্যে নেই। আজকাল সব ছেলেপুলে এখন সিভিল সার্ভিসে চলে আসছে। চেহারা দেখলে মনে হয় প্রাইভেট টিউশ্যানি করে জীবন চালায়।

একটা হেলিকপ্টারের খুবই দরকার। প্রথমবার যাচ্ছেন। সেই যাওয়াটার মধ্যে কিছু নাটকীয়তা থাকবে না? বিকট শব্দ হবে হেলিকপ্টারের— অঞ্চল ভেঙে লোকজন আসবে। তবেই না ব্যাপারটা জমবে।

তিনি গম্ভীর ভঙ্গিতে হেলিকপ্টার থেকে নামবেন। পুলিশের একটা দল তাঁকে গার্ড অব অনার দেবে। এইসব জিনিস গওগ্রামের লোকজন আগে দেখেনি। মুগ্ধ হয়ে দেখবে। পুলিশ ক'জন আসবে কে জানে? সোনাদিয়ায় পুলিশ স্টেশন নেই। তবু জনাদশেক নিশ্চয়ই থাকবে। আজকালকার পুলিশগুলিও ল্যাডল্যাডা। বিনা ইস্তির পোশাকেই নিশ্চয়ই চলে আসবে। অথচ গার্ড অব অনারের অনুষ্ঠানটিতে দরকার কিছু স্মার্ট পুলিশ। দেশ থেকে স্মার্টনেস উঠেই গিয়েছে।

জোয়ারদার সাহেব বিরক্ত মুখে বেল টিপে পি.এস.-কে আসতে বললেন। পি.এস.-কে দেখে তাঁর বিরক্তি আরো বেড়ে গেল। সে আজ এসেছে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে। এটা কি কবি সম্মেলন?

‘স্যার ডেকেছেন?’

‘আজ দেখি নতুন জামাইয়ের ড্রেস পরে চলে এসেছেন।’

পি.এস. দাঁত বের করে হাসল। যেন খুব মজার কথা কিছু শুনল।

‘সোলায়মান সাহেব।’

‘জি স্যার!’

‘পায়জামা-পাঞ্জাবি ড্রেসটা অফিসের কাজের জন্যে ঠিক সুইটেবল নয়। বিদেশে পায়জামা-পাঞ্জাবি লোকজন পরে ঘুমুতে যাবার সময়। তারা এটাকে বলে স্লিপিং স্যুট।’

‘এটা তো বিদেশ না।’

জোয়ারদার সাহেব বহু কষ্টে নিজেকে সামলালেন। এই ছোকরার মুখে-মুখে কথা বলার একটা বদঅভ্যাস আছে। আগেও লক্ষ করেছেন। ম্যানার্স এক বস্তু এ জানেই না— যেন মন্ত্রীসঙ্গে কথা বলছে না। কথা বলছে ইয়ার বন্ধুর সঙ্গে। হোয়াট ইজ দিস?

‘সোলায়মান সাহেব।’

‘জি স্যার।’

‘যাবার ব্যবস্থা কি করেছেন?’

‘সব ফাইন্যাল করা হয়েছে স্যার।’

‘কী ফাইন্যাল করলেন দয়া করে বলুন। আমি শুনছি। অবিশ্যি আপনার যদি তকলিফ না হয়।’

কথাগুলি আঘাত করার জায়গায় বলা। কিন্তু পি.এস. সেটা ধরতে পারল না। হাসিমুখে বলতে লাগল।

এখান থেকে ময়মনসিংহ যাব ট্রেনে করে। সেলুনের ব্যবস্থা হয়েছে। ময়মনসিংহ থেকে যাব গাড়িতে করে। গাড়ির ব্যবস্থা ময়মনসিংহের ডি.সি. করবেন। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই কথা হয়েছে।

‘হেলিকপ্টারের কী হলো?’

‘ব্যবস্থা করা যায়নি। আর্মি হেলিকপ্টার সবই এনগেজড।’

‘এনগেজড মানে? দেশে কি এখন যুদ্ধ চলছে নাকি?’

পি.এস. চুপ করে রইল। জোয়ারদার সাহেব থমথমে গলায় বললেন, ‘আপনি একজন ইনএফিসিয়েন্ট অফিসার— এটা বোধহয় আপনি নিজেও জানেন না।’

‘গাড়িতে যেতে খুব কষ্ট হবে না স্যার। রাস্তা ভালো।’

‘রাস্তা ভালো হলে গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে ফেলুন। পুরোপুরি দেশীয় একটা ব্যাপার হবে। মন্ত্রী গরুর গাড়িতে করে এসেছেন। নিউজ হবে।’

পি.এস চুপ করে রইল। তাকে দেখে মনে হলো না সে খুব চিন্তিত।

সামান্য একটা কাজ করতে পারেনি অথচ তার জন্যে কোনো অনুশোচনা পর্যন্ত নেই।

‘আপনি প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে দিন। হেলিকপ্টার পাওয়া গেলে যাব, নয় তো যাব না। ট্রেনে-মোটরে গেলে সমস্তটা দিন নষ্ট হবে। নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই। বুঝতে পারছেন?’

‘জি স্যার।’

‘দাঁড়িয়ে আছেন কেন? চলে যান।’

জোয়ারদার সাহেব বিমর্ষ মুখে সিগারেট ধরিয়ে খানিকক্ষণ টানলেন। একটা ফাইলে চোখ বুলাতে চেষ্টা করলেন। কিছুতেই মন বসল না।

দুপুরে লাঞ্চ খেতে গিয়ে লক্ষ করলেন ক্ষিধে হয়নি। মন্ত্রী হবার পর তাঁর এই রোগ হয়েছে— ক্ষিধে হয় না। যা খান তাই বদহজম হয়ে যায়। দু’দিন আগে একটা চপ খেয়েছিলেন। এখনো ঢেকুরের সঙ্গে সেই চপের গন্ধ আসছে। কুৎসিত ব্যাপার। অথচ তিনি যে পরিশ্রম করেন না তাও না। সারা দিন বলতে গেলে ছোট্টাছুটির মধ্যেই কাটে।

‘স্যার আসবো?’

জোয়ারদার সাহেব চোখ ছোট করে তাকালেন। পি.এস. ব্যাটা উঁকি দিচ্ছে। একে দেখলেই এখন কেমন গা জ্বালা করছে। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু তবু তিনি সহজভাবেই বললেন, ‘কী ব্যাপার?’

‘হেলিকপ্টার যোগাড় হয়েছে স্যার। সিভিল এভিয়েশনের।’

‘ভেরি গুড।’

‘প্রোগ্রাম তাহলে স্যার ঠিক রইল। বিকাল চারটায় রওনা হবে। ফিরবে ছ’টায়।’

‘ঠিক আছে।’

‘আর কোনো ম্যাসেজ কি স্যার দিতে চান?’

‘দাঁড়ান, চিন্তা করে দেখি। আপনার খাবার খাওয়া হয়েছে?’

‘জি-না, এখন গিয়ে খাব।’

‘আমার সঙ্গে বসে পড়ুন। খাবার যথেষ্টই আছে। খেতে খেতে ডিসকাস করা যাবে। না-কি কোনো অসুবিধা আছে?’

‘জি-না স্যার, অসুবিধা আবার কি?’

পি.এস. ছেলেটিকে এখন আর সে রকম খারাপ লাগছে না। লম্বা এবং ফর্সা চেহারার কারণেই হয়তো পায়জামা-পাঞ্জাবিতে সুন্দর মানিয়েছে। তার মেয়েগুলির জন্যে এ রকম ছেলে পাওয়া গেলে ভালো হতো। কিন্তু মন্ত্রী হবার আগেই সবক’টি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এলেবেলে ধরনের বিয়ে। কাউকে

বলার মতো কিছু না। ইশ্, আর ক'টা দিন যদি অপেক্ষা করা যেত।

‘সোলায়মান সাহেব।’

‘জি স্যার।’

‘আপনি হয়তো ভাবছেন আমি হেলিকপ্টার দিয়ে গ্রামের লোকদের ভড়কে দিতে চাই। একটা কায়দা করতে চাই।’

‘আমি এ রকম কিছুই ভাবছি না স্যার।’

‘ভাবলেও কোনো ক্ষতি নেই, কারণ আসলেই আমি একটু কায়দা করতে যাচ্ছি। গ্রামের লোকজন এসব জিনিস খুব পছন্দ করে। এই হেলিকপ্টারের গল্লই তারা একমাস ধরে করবে। করবে না?’

‘অবশ্যই করবে।’

‘ভড়ংয়ের দরকার আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভড়ং করেছেন আর আমরা তো...’

‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভড়ং করেছেন নাকি?’

‘নিশ্চয়ই করেছেন। আলখাল্লা গায়ে দিয়ে বেড়াতে না? আলখাল্লাটাই তাঁর ভড়ং। বুঝতে পারছেন?’

‘পারছি স্যার।’

‘আমি আরেকটা কাজ করতে চাই। ফোরার পথে একজন রুগিকে ঢাকায় নিয়ে আসতে চাই চিকিৎসার জন্যে।’

‘কেন স্যার?’

‘এতে ডাবল পারপাস সত্তা হবে। নাম্বার ওয়ান—গ্রামের মানুষদের প্রতি আমার মমতা প্রকাশ পাবে। নাম্বার টু—একজন দরিদ্র ব্যক্তি হেলিকপ্টারে ঘুরবে। এই গল্ল সে বাকি জীবন সবার সঙ্গে করবে।’

‘তাতে স্যার, আপনার কী লাভ?’

‘সব সময় লোভ-লোকসানটাকে বড় করে দেখেন কেন? হৃদয়টাকে প্রসারিত করুন। তার দরকার আছে।’

‘জি স্যার আছে।’

‘আপনি ওয়ারল্যাসে রুগি খুঁজে রাখতে বলে দিন।’

‘কী ধরনের রুগির কথা বলব স্যার?’

‘তার মানে?’

‘যে কোনো রুগি হলেই তো হবে না। বেশ জমকালো ধরনের রুগি দরকার। আপনি নিশ্চয়ই একজন আমাশার রুগি ঢাকায় আনতে চান না।’

‘আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?’

‘জি না স্যার।’

‘করবেন না। রসিকতা জিনিসটা আমার পছন্দ নয়। এখন যান, ব্যবস্থা করুন।’

‘লাঞ্ছের জন্যে ধন্যবাদ স্যার।’

ব্যবস্থা ভালো হলো।

জোয়ারদার সাহেব যা আশা করেছিলেন তার চেয়ে ভালো। লোকে লোকারণ্য। সবাই নিশ্চয়ই হেলিকপ্টার দেখতে আসেনি। কেউ-কেউ বক্তৃতা শুনতেও এসেছে। তিনি একটি চমৎকার বক্তৃতা দিলেন। ঘনঘন তালি পড়ল। পায়ে হেঁটে পরিচিত-অপরিচিত অনেক বাড়িতে গেলেন। স্কুলের স্যারদের পা ছুঁয়ে সালাম করলেন। এই দুর্লভ সম্মানে স্যার অভিভূত হলেন। একজন কেঁদে ফেললেন। গ্রামের মাতব্বর শ্রেণীর কিছু লোক ব্যান্ড পাটি নিয়ে এসেছিলেন। তারা সারাক্ষণই বাজাতে লাগল— হলুদ বাট, মেন্দি বাট, বাট ফুলের মউ। তারা এই একটি সুরই জানে।

জোয়ারদার সাহেব বড়ই খুশি হলেন। ফিরতি পথে হেলিকপ্টারে ওঠার সময় দেখলেন একজন রুগিকেও তোলা হয়েছে। রুগির মা সঙ্গে থাকার জন্যে কান্নাকাটি শুরু করেছিল। কিন্তু জায়গার মিনাটেনি। জোয়ারদার সাহেব ধরা গলায় বললেন— কোনো চিন্তা করবেন না, মা। দায়িত্ব আমার। মনে করুন আমিও আপনার এক ছেলে।

এই বলে তিনি আশপাশে তাকালেন। তাঁর ধারণা ছিল একটা হাততালি পাবেন। তা পেলেন না। সম্ভবত হাততালি দিতে দিতে লোকজন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

হেলিকপ্টার ছেড়ে দিল। মিনিট দশেক যাবার পর পি.এস. মুখ কালো করে বলল, একটা ঝামেলা হয়ে গেছে স্যার।

জোয়ারদার সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, ‘কী ঝামেলা?’

‘রুগি তো স্যার খাবি খাচ্ছে।’

‘খাবি খাচ্ছে মানে?’

‘বড় বড় করে শ্বাস টানছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ঢাকা পৌছবার আগেই কিছু-একটা হয়ে যাবে। ঘাটের মরা তুলে দিয়েছে স্যার।’

‘ঘাটের মরা তুলে দিয়েছে তো আপনারা ছিলেন কোথায়? দেখতে পারলেন না?’

‘পি.এস. চুপ করে গেলেন।’

‘ঢাকায় এই ডেডবডি নিয়ে আমি করবোটা কী? ঝামেলাটা বুঝতে পারছেন? না, পারছেন না?’

‘পারছি স্যার ।’

‘বিরট একটা কেলেকারি হয়ে যাবে ।’

‘কেলেকারির কী আছে স্যার? আপনি চেষ্টা করেছিলেন সেটাই বড় কথা ।’

‘এই ডেডবডির ঝামেলার কথা ভাবেন । এটা আবার গ্রামে ফেরত পাঠাতে হবে না? ’

রুগি ঘড়ঘড় শব্দ করছে । হেলিকপ্টারের পাখার আওয়াজ ছাপিয়েও সেই শব্দ কানে আসছে । হঠাৎ করে সেই শব্দ থেমে গেল । জোয়ারদার সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, ‘মরে গেল নাকি?’

‘জি-না । এখনো শ্বাস টানছে, তবে প্রায় হয়ে এল ।’

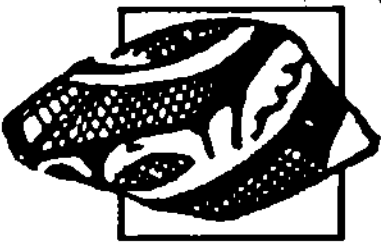
জোয়ারদার সাহেব মুখ বিকৃত করে বললেন, ‘হা করে বসে আছেন কেন? কী করবেন বলুন ।’

‘আমরা বরং আবার গ্রামেই ফিরে যাই । ঝামেলা নাশিয়ে দিয়ে আসি । বললেই হবে অবস্থার খুব খারাপ দেখে মা-বাবার কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে এলাম । মৃত্যু মায়ের কোলে হওয়া ভালো ।’

‘যা ভালো বুঝেন করেন । আপনাদের ওপর নির্ভর করাটাই বোকামি ।’

হেলিকপ্টার আবার নামল স্কুলের মাঠে । রুগি মারা গেল তারো কিছুক্ষণ পর । নামাজের জানাজার শেষে মন্ত্রী সাহেব অসাধারণ একটি বক্তৃতা দিলেন । অনেকেই কেঁদে ফেলল ।

ফেরার পথে তিনি পি.এস.-কে বললেন, ‘প্রোগ্রামটা শেষ পর্যন্ত ভালোই হয়েছে, কি বলেন? সব ভালো যার শেষ ভালো ।’



ভয়

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কীভাবে পরিচয় হলো আগে বলে নিই ।

কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার এগজামিনার হয়ে পাড়া-গাঁ ধরনের এক শহরে গিয়েছি (শহর এবং কলেজের নাম বলার প্রয়োজন দেখছি না । মূল গল্পের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই । নামগুলি প্রকাশ করতেও কিছু অসুবিধা আছে) । এই অঞ্চলে আমি আগে কখনো আসিনি । পরিত্যক্ত এক রাজবাড়িকে

কলেজ বানানো হয়েছে। গাছ-গাছড়ায় চারদিক আচ্ছন্ন। বিশাল কম্পাউন্ড। কিন্তু লোকজন নেই। পরীক্ষার জন্যে কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। খা-খা করছে চারদিক। আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম।

একটা সময় ছিল যখন এগজামিনারদের আলাদা খাতির-যত্ন ছিল। কলেজের প্রিন্সিপাল নিজের বাসায় রাখতেন। সকাল-বিকাল নানান ধরনের খাবার। জাল ফেলে পাকা রুই ধরা হতো। যত্নের চূড়ান্ত যাকে বলে। এখন সেই দিন নেই। কেউ পাত্তাই দেয় না। বিরক্ত চোখে তাকায়।

আমার জায়গা হলো কেমিস্ট্রি ল্যাবোরেটরির পাশের একটা খালি কামরায়। প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, 'আপনাকে হোস্টেলেই রাখতে পারতাম কিন্তু বুঝতেই পারছেন চারদিকে থাকবে ছাত্র। আপনি অস্বস্তি বোধ করবেন। ছাত্ররা তো আর আগের মতো নেই। মদটদ খায়। একবার একটা বাজে মেয়ে নিয়ে এসে নানান কীর্তি করেছে। বিশ্রী ব্যাপার। তবে আপনার খাওয়া-দাওয়ার কোনো অসুবিধা হবে না। আমার বাসা থেকে খাবার যাবে।'

থাকার ঘর দেখে চমকে উঠলাম। আগে বোধহয় স্টোর রুম ছিল। একটা মাত্র জানালা। রেলের টিকিট দেয়ার জানালার মতো ছোট। ঘর ভর্তি মাকড়সার ঝুল। দুটি বিশাল এবং কুৎসিত মাকড়সা পেটে ডিম নিয়ে বসে আছে। এই নিরীহ প্রাণীটিকে আমি অসহ্য ভয় পাই। এদের ছায়া দেখলেও আমার গা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ঝাড়দারকে পাঁচটা টাকা দিলাম মাকড়সা এবং মাকড়সার ঝুল পরিষ্কার করবার জন্যে। সে কী করল কে জানে! ঘর যেমন ছিল তেমনই রইল। দুটির জায়গায় এখন দেখছি তিনটি মাকড়সা। তৃতীয়টির গায়ের রঙ কালো। চোখ জুলজুল করছে।

সন্ধ্যাবেলা হারিস নামের একজন লোক একটা হারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। অথচ দিনের বেলায় ইলেকট্রিসিটি আছে দেখছি। হারিস বলল, 'রাত দশটার পর কারেন্ট আসে।' আমার বিস্ময়ে সীমা রইল না। রাত দশটার পর আমি কারেন্ট দিয়ে করব কী?

সন্ধ্যার পর এলেন কেমিস্ট্রির ডেমনেস্ট্রেটর সিরাজউদ্দিন। ঐর সঙ্গে আমার সকালে একবার দেখা হয়েছে। তখন বোধহয় তেমন মনোযোগ দিয়ে দেখিনি। মুখ ভর্তি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো চাপ দাড়ি। মাথায় টুপী। চোখে সুরমা। গা থেকে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে। বেঁটেখাট একজন মানুষ। বয়স পঞ্চাশের মতো হলেও চমৎকার স্বাস্থ্য। এই গরমেও গায়ে ঘিয়া রঙের একটা চাদর। তিনি কথা বলেন খুব সুন্দর করে।

'স্যার কেমন আছেন?'

'ভালোই আছি।'

‘আপনার খুব তকলিফ হলো স্যার।’

‘না, তকলিফ আর কি!’

‘আগে এগজামিনার সাহেবরা এলে প্রিন্সিপাল স্যারের বাসায় থাকতেন। কিন্তু তাঁর এক ছেলের মাথার দোষ হয়েছে। প্রিন্সিপাল স্যার এখন আর কাউকে বাসায় রাখেন না। ছেলেটা বড় ঝামেলা করে।’

আমি বললাম, ‘আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।’

সিরাজউদ্দিন সাহেব ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, ‘স্যার, ভেতরে এসে একটু বসব?’

‘নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আসুন গল্প করি।’

সিরাজউদ্দিন সাহেব বসতে বসতে বললেন, ‘এখানে ডিসস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের একটা ডাকবাংলা আছে। আপনাকে সেখানে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে রেভিনিউর সিও তাঁর ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। কোয়ার্টারের খুব অভাব।’

বুঝতে পারছি। এই নিয়ে আপনি ভাববেন না। দিনের বেলাটা তো কলেজেই কাটবে। রাতে এসে শুধু ঘুমানো। বইপত্র নিয়ে এসেছি। সময় কাটানো কোনো সমস্যা না।

সিরাজউদ্দিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, ‘রাতে ঘর থেকে বেরুতে হলে একটু শব্দ-টব্দ করে তারপর বেরুবেন। খুব সাপের উপদ্রব।’

‘তাই নাকি?’

‘স্যার। এখন সাপের সময়। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গর্ত থেকে বের হয়। হাওয়া খায়।’ আমার গা তিমি হয়ে গেল। এ তো মহাযন্ত্রণা! প্রায় দু’শ’ গজ দূরে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে বাথরুম। আমার আবার রাতে কয়েক বার বাথরুমে যেতে হয়।

‘তবে স্যার ঘরের মধ্যে কোনো ভয় নেই। চারদিকে কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে দিয়েছি। সাপ আসবে না।’

‘না এলেই ভালো।’

‘যদি স্যার আপনি অনুমতি দেন পা উঠিয়ে বসি।’

‘বসুন বসুন। যেভাবে আপনার আরাম হয় সেভাবেই বসুন।’

ভদ্রলোক পা উঠিয়ে বসলেন এবং একের পর এক সাপের গল্প শুরু করলেন। সেইসব গল্পও সত্যি বিচিত্র। রাতে ঘুম ভেঙেছে, হঠাৎ তাঁর মনে হলো নাভির উপর চাপ পড়ছে। চোখ মেললেন। ঘরে চাঁদের আলো। সেই আলোয় লক্ষ করলেন একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে তাঁর নাভির উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে। আসল সাপ। শঙ্কচূড়।

একসময় আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, ‘সাপের গল্প আর শুনে ইচ্ছা করছে না। দয়া করে অন্য গল্প বলুন।’

ভদ্রলোক সম্ভবত সাপের গল্প ছাড়া অন্য কোনো গল্প জানেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুরু করলেন সাপের সঙ্গম দৃশ্যের বর্ণনা।—চৈত্র মাসের এক জ্যোৎস্নায় তিনি এই দৃশ্য দেখেছেন। বর্ণনা শুনে আমার গা ঘিনঘিন করতে লাগল। সিরাজউদ্দিন সাহেব বললেন, ‘সাপ যে জায়গায় এইসব করে তার মাটি কবচে ভরে কোমরে রাখলে পুরুষত্ব বাড়ে।’

বিজ্ঞানের একজন শিক্ষকের মুখে কী অদ্ভুত কথা! আমি ঠাট্টা করে বললাম, ‘আপনি সেখানকার মাটি কিছু সংগ্রহ করলেন?’

তিনি আমার ঠাট্টা বুঝতে পারলেন না। সরল ভঙ্গিতে বললেন, ‘জি না স্যার।’

লোকটি নির্বোধ। নির্বোধ মানুষের সঙ্গে আমার কথা বলতে ভালো লাগে না। কিন্তু এই লোক উঠছে না। মুক্তি পাবার জন্যে একসময় বলেই ফেললাম, ‘সারা দিনের জানিতে টায়ার্ড হয়ে এসেছি। যদি কিছু মনে না করেন বাতি-টাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ব।’

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, ‘কী বলছেন স্যার! ভাত না খেয়ে ঘুমাবেন? ভাত তো এখনো আসেনি। দেহি হচ্ছে। আমি প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসা থেকে খোঁজ নিয়ে তারপর আপনার কাছে এসেছি। আমি যাওয়ার পর রান্না চড়িয়েছে। গোশত রান্না হচ্ছে।’

‘তাই নাকি?’

‘জি। আপনি গরু খান ভোজ।’

‘জি খাই।’

‘এখানে কসাইখানা নাই। মাঝে মাঝে গরু কাটা হয়। আজ হাটবার। তাই গরু কাটা হয়েছে। প্রিন্সিপাল সাহেব দুই ভাগ নিয়েছেন।’

‘ও আচ্ছা।’

‘পঁচিশ টাকা করে ভাগ।’

‘তাই বুঝি?’

‘প্রিন্সিপাল স্যারের স্ত্রীর রান্না খুব ভালো।’

‘তাই নাকি?’

‘জি। তবে আজ রান্না করছে তাঁর ছেলের বৌ। যে ছেলেটা পাগল তার বৌ।’

‘ও আচ্ছা।’

‘বিরাত অশান্তি চলছে প্রিন্সিপাল স্যারের বাড়িতে। ছেলে বটি নিয়ে তার মাকে কোপ দিতে গেছে। বৌ গিয়ে মাঝখানে পড়ল। এখন ছেলেকে বেঁধে রেখেছে। এইজন্যেই রান্নার দেহি হচ্ছে।’

‘কোনো হোটেলে গিয়ে খেয়ে এলেই হতো। ওদের দুঃসময়ে...’

‘কী যে বলেন স্যার! আপনি আমাদের মেহমান না? তা ছাড়া ভদ্রলোকের খাওয়ার মতো হোটেল এই জায়গায় নাই। নিতান্তই গণ্ডাম। হঠাৎ সাব-ডিভিশন হয়ে গেল। ভালো একটা চায়ের দোকান পর্যন্ত নাই।’

রাত সাড়ে দশটায় খাবার এল। দুটি প্লেট, সিরাজউদ্দিন সাহেবও আমার সঙ্গে খেতে বসলেন। হাত ধুতে ধুতে বললেন, ‘প্রিন্সিপাল স্যার আমাকে আপনার সঙ্গে খেতে বলেছেন। আপনি হচ্ছেন আমাদের মেহমান। আপনি একা একা খাবেন, তা কি হয়?’

প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলের বৌ অনেক কিছু রান্না করেছে। অসাধারণ রান্না। সামান্য সব জিনিসও রান্নার গুণে অপূর্ব হয়েছে। মেয়েটার জন্যে আমার কষ্ট হতে লাগল। বেচারি হয়তো চোখের জল ফেলতে ফেলতে রৈঁধেছে। আজ রাতে সে হয়তো কিছু খাবেও না।

‘সিরাজউদ্দিন সাহেব।’

‘জি স্যার।’

‘প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলের বৌকে বলবেন, আমি এত ভালো রান্না খুব কম খেয়েছি। দ্রৌপদী এরতে ভালো রাঁধতো বলে আমার মনে হয় না।’

‘জি স্যার, বলব। তবে প্রিন্সিপাল স্যারের স্ত্রীর রান্নার কাছে এ কিছুই না। আছেন তো কিছুদিন, নিজেই বুঝবেন।’

প্রিন্সিপাল সাহেবকে বেশ বিচক্ষণ লোক বলে মনে হলো। তিনি একটা টর্চ লাইট পাঠিয়েছেন। ফ্লাস্ক ভর্তি চা পাঠিয়েছেন। পান-সুপারি-জর্দাও আছে একটা কৌটায়।

খাওয়া-দাওয়ার পরও সিরাজউদ্দিন সাহেব অনেকক্ষণ বসে রইলেন। চা খেলেন, পান খেলেন, দীর্ঘ একটা সাপের গল্প বললেন। বিদায় নিলেন রাত এগারোটোর পর। যে লোকটি ক্রমাগতই সাপের কথা বলেছে তার দেখলাম তেমন ভয়-টয় নেই। টর্চ বা লাঠি ছাড়াই দিব্যি হনহন করে চলছে।

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলাম। নতুন জায়গায় চট করে ঘুম আসবে না। শুয়ে শুয়ে হান্কা ধরনের কিছু বই পড়া যায়। হারিকেনের এই আলোয় সেটা সম্ভব হবে না। আমি সিগারেট ধরিয়ে স্যুটকেস খুললাম। বই বের করব। ঠিক তখনই একটা কাণ্ড হলো। প্রচণ্ড ভয় লাগল। অথচ ভয়ের কোনোই কারণ ঘটেনি। তবু আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল। যেন বন্ধ দরজার ও-পাশেই অশরীরী কিছু দাঁড়িয়ে আছে। যেন এক্ষুনি সেই অশরীরী অতিথি ভয়ঙ্কর কিছু করবে। নিজের অজান্তেই আমি চৈঁচিয়ে উঠলাম— ‘কে কে?’ আর তখনই শুনলাম থপথপ শব্দে একজন কেউ যেন দূরে চলে যাচ্ছে। ছোট্ট একটা কাশির শব্দও শুনলাম।

ভয়টা যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ চলে গেল। আমি খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়িলাম। চাঁদের আলোয় চারদিক থৈ-থৈ করছে। কোথাও কেউ নেই। হঠাৎ এই অস্বাভাবিক ভয় আমাকে অভিভূত করল কেন? এখনো গা ঘামে ভেজা। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। আমি শারীরিকভাবে পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। হাল্কা বাতাস দিচ্ছে। বেশ লাগছে দাঁড়িয়ে থাকতে। লুঙ্গি পরা খালি গায়ের একটি লোক বিড়ি টানতে টানতে আসছে। আমাকে দেখেই বিড়ি লুকিয়ে ফেলে বলল, ‘আদাব স্যার।’

‘আদাব। তুমি কে?’

‘আমার নাম কালিপদ। আমি কলেজের দারোয়ান।’

‘তুমি কিছুক্ষণ আগে কি এইখানেই ছিলে?’

‘জি স্যার। লাইব্রেরি-ঘরের সামনে বসে ছিলাম।’

‘কাউকে যেতে দেখেছ?’

‘আজ্ঞে না। কেন স্যার? কী হইছে?’

‘না, এমনি।’

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইলেকট্রিসিটি চলে এল। আমি নিশ্চিত মনে বই নিয়ে গুতে গেলাম। স্টিফান কিংয়ের লেখা ভৌতিক উপন্যাস। দারুণ রগরগে ব্যাপার। একবার পড়তে শুরু করলে ছাড়তে ইচ্ছা করে না। ভয়-ভয় লাগে, আবার পড়তেও ইচ্ছা করে। পুরোপুরি ঘুমুতে গেলাম একটার দিকে। বারবার মনে হতে লাগল কিছুক্ষণ আগে এই অস্বাভাবিক ভয়টা কেন পেলাম? রহস্যটা কী?

আমি খুব-একটা সাহসী মানুষ এ-রকম দাবি করি না। কিন্তু অকারণে এত ভয় পাবার মতো মানুষও আমি নই। একা একা বহু রাত কাটিয়েছি। সে রাতে আমার ভালো ঘুম হলো না।

দিনের বেলাটা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। একুশজন ছেলে পরীক্ষা দেবে। যোগাড়যন্ত্র কিছুই নেই। ল্যাবোরেটরির অবস্থা শোচনীয়। একটামাত্র ‘ব্যালেন্স’, তাও ঠিকমতো কাজ করছে না। প্রয়োজনীয় কেমিক্যালসও নেই। সে-নিয়ে কারো মাথাব্যথাও নেই। কেমিস্ট্রির দু’জন টিচার। ওরা নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে আছেন। একজন আমাকে বলে গেলেন, কলেজের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। ক্লাস-ট্রাসও তেমন হয়নি। একটু দেখে শুনে নিবেন স্যার। পাস মার্কটা দিয়ে দিবেন।’

আমি হেসে বললাম, ‘কী করে দেব বলুন। দেবার তো একটা পথ লাগবে। এরা তো মনে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কাজ কিছুই করেনি।’

‘কী করে করবে বলেন, স্ট্রাইক-ফেস্ট্রাইক লেগেই আছে। জিনিসপত্রও কিছু নেই।’

একমাত্র সিরাজউদ্দিন সাহেবকে দেখলাম ব্যস্ত হয়ে ছোট্টাছুটি করছেন। চেষ্টা করছেন কীভাবে ছাত্রদের খানিকটা সাহায্য করা যায়। একুশজন ছাত্র-ছাত্রীর কেউ তাকে এক মুহূর্তের জন্যে চোখের আড়াল করতে রাজি নয়। একটি মেয়ে সল্ট এ্যানলিসিসে কিছুই না পেয়ে তাদের স্বভাবমতো কাঁদতে শুরু করেছে। সিরাজউদ্দিন সাহেব তাকে একটা ধমক দিলেন, ‘খবরদার কাঁদবি না। কাঁদলে চড় খাবি। গোড়া থেকে কর। ড্রাই টেস্টগুলি আগে কর। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে করবি।’

এগজামিনারদের একটা দায়িত্ব হচ্ছে লক্ষ রাখা যেন ছাত্ররা তাদের নিজেদের কাজগুলি নিজেরাই করে। কিন্তু সব সময় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। দেখেও না দেখার ভান করতে হয়। এখন যেমন করছি। ছাত্রদের জন্যে আমার খানিকটা মমতাও লাগছে। যন্ত্রপাতি নেই, কেমিক্যালস নেই, স্যারদের কোনো আগ্রহ নেই, ছেলেরা করবে কী?

দুপুরবেলা প্রিন্সিপাল সাহেব দেখতে এলেন পরীক্ষা কেমন হচ্ছে। ভদ্রলোককে মনে হলো বিপর্যস্ত। কিছুক্ষণ মুখ কুচকে রেখে বললেন, ‘দেন, সব ক’টিকে ফেল করিয়ে দেন। ঝামেলা চুকে যাক।’

কোনো প্রিন্সিপালকে এ-রকম কথা বলতে শুনি নি। আমি হেসে ফেললাম। প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, ‘রাতে অনুশিষ্টা হয়নি তো?’

‘জি না, হয়নি।’

‘সিরাজউদ্দিনকে আপনার খোঁজখবর রাখতে বলেছি। কোনো কিছুর দরকার হলেই তাকে বলবেন। সঙ্কোচ করবেন না।’

‘না করব না।’

‘সাপের গল্প বলে মাথা খারাপ করিয়ে দেবে। পাত্তা দেবেন না। এখানে সাপের উপদ্রব একেবারেই নেই।’

‘তাই নাকি?’

‘আপনাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে বোধহয়? আমাকেও দিয়েছিল। প্রথম যখন আসি এমন অবস্থা ঘর থেকে বেরুবার আগে হারিকেন, লাঠি এইসব নিয়ে বের হতাম। হা হা হা।’

প্রিন্সিপাল সাহেব বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না। আগামী কাল সন্ধ্যায় চা খাবার দাওয়াত দিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে চলে গেলেন।

পাঁচটায় পরীক্ষা শেষ হবার কথা। শেষ হলো রাত নটায়। সিরাজউদ্দিন সাহেবের বিধ্বস্ত অবস্থা। আমি হাসতে হাসতে বললাম, ‘পরীক্ষা তো আপনার ছাত্ররা দেয়নি, দিয়েছেন আপনি। মনে হচ্ছে ভালোই দিয়েছেন।’

আমার সঙ্গেই তিনি ঘরে ফিরলেন। খাওয়া-দাওয়া করে নিজের জায়গায় ফিরে যাবেন। অতিরিক্ত ক্লান্ত থাকার জন্যেই বোধহয় আজ আর সাপের গল্প শুরু হলো না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে তিনি উঠে পড়লেন।

‘স্যার যাই। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েন। রাত-বিরাতে বেরুবার সময় একটু খেয়াল রাখবেন। শব্দ করে পা ফেলবেন। সাপেরই এখন সিজন।’

‘খুব খেয়াল রাখব।’

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসামাত্র ঠিক আগের মতো হলো। তীব্র একটা ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। থরথর করে হাত-পা কাঁপছে। নিশ্বাস নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে এফুনি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাব। দরজার কড়ায় টন করে একটা শব্দ হলো। যেন কেউ কড়া নাড়তে গিয়েও কড়া নাড়ল না। ঠিক তখনই ভয়টা চলে গেল। আমি পুরোপুরি স্বাভাবিক।

জগ থেকে ঢেলে এক গ্লাস পানি খেলাম। দরজা খুলে বাইরে এলাম। চারদিকে ফকফকা জ্যোৎস্না। গলা উচিয়ে ডাকলাম, ‘কালিপদ, কালিপদ।’ কেউ সাড়া দিল না। আজ বোধহয় সে ডিউটি দিচ্ছে না।

বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে এনে বসলাম। সিগারেট ধরলাম। আকাশে অল্প মেঘ। মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। অপূর্ব আলো-আঁধারি। ঢাকা শহরে বসে এই দৃশ্য ভাবাই যায় না। তবে বড় বেশি নির্জন। ঝাঁঝি ডাকছে, কিন্তু সেই ঝাঁঝির ডাকও ম্যাজিকের মতো হঠাৎ করে থেমে যাচ্ছে। শুভ্রতা ভালো লাগে।

ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে নিয়ে আবার এসে বসলাম বারান্দায়। আর তখন দেখলাম কালিপদ আসছে। তার হাতে একগাদা এঁটো বাসন-কোসন। সম্ভবত পুকুরে ধোবে।

‘এই কালিপদ।’

‘আদাব স্যার।’

‘একটু শুনে যাও তো।’

কালিপদ এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। হিন্দুদের প্রণামের এই ভঙ্গিটি বেশ সুন্দর।

‘রাতদুপুরে বাসন ধুতে যাচ্ছ নাকি?’

‘হ স্যার।’

‘আচ্ছা, তুমি কি সিরাজউদ্দিন সাহেবের বাসা চেন?’

‘আজ্ঞে চিনি।’

‘কত দূর?’

‘দুই মাইলের উপরে হইব।’

‘কালিপদ, তুমি একটা কাজ করতে পারবে?’

‘নিশ্চয়ই পারব স্যার, বলেন।’

‘তুমি কি আমাকে ওর বাসায় নিয়ে যেতে পারবে?’

কালিপদ অবাক হয়ে বলল, ‘এখন?’

‘হ্যাঁ এখন। তুমি তোমার কাজ সেরে আস, তারপর যাব।’

‘আমি উনারে ডাইক্যা নিয়া আসি?’

‘না, ডেকে আনতে হবে না। আমিই যাব। তোমার কোনো অসুবিধা আছে?’

‘আজ্ঞে না, অসুবিধা নাই। আমি আসতাছি।’

সিরাজউদ্দিনের বাসায় যাবার ব্যাপারটা যে আমি ঝোঁকের মাথায় করলাম তা না। আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে, সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে আমার হঠাৎ ভয় পাবার একটা সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কটা বের করতে আজ রাতেও আমার ঘুম হবে না। আধিভৌতিক কোনো ব্যাপারেই আমার বিশ্বাস নেই। কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়া এ পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না। বস্তুজগতের প্রতিটি চক্রকেই নিউটনের গতিসূত্র মানতে হয়।

ডাল ভাঙা ক্রোশ বলে একটা কথা ঝুঁপিয়ে পড়েছি। আজ রাতে সেটা বাস্তবে জানা গেল। হাঁটছি তো হাঁটছিই মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছি, কালিপদ আর কতদূর? সে তার উত্তরে ঘোঁড়াটায় একটা শব্দ করছে। লোকটি কথা কম বলে। কথাবার্তা হ্যাঁ না-র মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিংবা কে জানে গ্রাম-ট্রামের দিকে হয়তো চলতি অবস্থায় কথা কম বলার নিয়ম তার উপর লক্ষ্য করলাম লোকটা একটু ভীতু টাইপের। কোনো শব্দ হতেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আমি এখন বলছি, কী হলো কালিপদ? তখন আবার হাঁটা শুরু করছে। আমি আগেও দেখেছি দারোয়ানরা সব সময় ভীতু ধরনের হয়।

একসময় আমরা ছোটখাট একটা নদীর ধারে চলে এলাম। বর্ষাকালে এর চেহারা রমরমা থাকলেও থাকতে পারে। এখন দেখাচ্ছে সরু ফিতার মতো। পায়ের পাতাও হয়ত ভিজবে না। ‘কালিপদ নদীর নাম কী?’

‘বিরুই নদী।’

‘বিরুই চরের কথা শুনেছি। এই নামে যে নদীও আছে কে জানত।’

‘নদী পার হতে হবে?’

‘আজ্ঞে না।’

‘এসে পড়েছি নাকি?’

‘হঁ।’

সে হ বলেও থামছে না। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না কোথাও থামবে।

মনে হচ্ছে এটা আমাদের অনন্ত যাত্রা। সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে কথাবার্তা কী বলব কিছুই ঠিক করিনি। আগে থেকে ঠিকঠাক করে গেলে কোনো লাভ হয় না। আসল কথা বলবার সময় ঠিক-করে-রাখা কথা একটাও মনে আসে না। কতবার এ রকম হয়েছে। যৌবনে জরী নামের একজন কিশোরীর সঙ্গে বেশ ভালো পরিচয় ছিল। খুব সাহসী মেয়ে। সে নিজ থেকেই একবার আমাকে খবর পাঠাল আমি যেন সন্ধ্যাবেলায় তাদের বাড়ির ছাদে অপেক্ষা করি। সারা দিন ভাবলাম ছাদের নির্জনতায় কি সব কথা বলব। কতটুকু আবেগ থাকবে। কোন পর্যায়ে হাতে হাত রাখব। বাস্তবে তার কিছুই হলো না। প্রচণ্ড ঝগড়া বেঁধে গেল। জরী কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, ‘ছোটলোক।’ আমি কড়া গলায় বললাম, ‘আমি ছোটলোক না, ছোটলোক হচ্ছে তুমি। শুধু তুমি একা না, তোমাদের বাড়ির সবাই ছোটলোক। এবং তোমার বড় মামা একটা ইতর।’ আবেগ ভালোবাসার একটি কথাও দু’জনের কেউ বললাম না।

‘স্যার এই বাড়ি।’

আমি থমকে দাঁড়ালাম। ছোট্ট একটা টিনের ঘর। কল্যাণগাছ দিয়ে ঘেরা। খড় পোড়ানো গন্ধ আসছে। পরিষ্কার ঝকঝকে উঠোন। উঠোনে দাঁড়াতেই কুকুর ডাকতে লাগল। চোর ভেবেছে বোধহয়। ভিতর থেকে সিরাজউদ্দিন চোঁচাল, ‘কে কে?’

কালিপদ বলল, ‘দরজাটা খুলেন (আমি কালিপদ।’

দরজা সঙ্গে সঙ্গে খুলল না। হারিকেন জ্বালানো হলো। তাতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। সিরাজউদ্দিন একটি লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বের হয়ে এল। চোখ কপালে তুলে বলল, ‘স্যার আপনি!’

‘দেখতে এলাম আপনাকে।’

‘কেন?’

‘কোনো কারণ নেই। ঘুম আসছিল না। ভাবলাম, দেখি রাতের বেলা গ্রাম কেমন দেখা যায়। আপনি বোধহয় শুয়ে পড়েছিলেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?’

‘জি।’

‘খুব লজ্জিত। কিছু মনে করবেন না।’

‘আসেন, ভিতরে এসে বসেন।’

সিরাজউদ্দিন সাহেবের বিস্ময় এখনো কাটেনি। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, ‘কোনো ঝামেলা হয়েছে স্যার?’

‘না না, ঝামেলা কী হবে? বেড়াতে এসেছি। একটু অসময়ে চলে এলাম এই আর কি!’

‘স্যার একটু চা করি?’

‘অসুবিধা না হলে করুন।’

‘না, না। কোনো অসুবিধা নাই। কোনো অসুবিধা নাই।’

সিরাজউদ্দিন সাহেব ছোট্টাছুটি শুরু করলেন। উঠানে চুলা জ্বালানো হলো। কালিপদ দেখলাম টাকা নিয়ে আবার ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। হয়তো চা বা চিনি নেই, আনতে গেছে। এই রাতদুপুরে কোথায় এসব পাবে কে জানে।

‘সিরাজউদ্দিন সাহেব।’

‘জি স্যার।’

‘লোকজন দেখছি না যে। আপনি একাই থাকেন নাকি?’

‘বিয়ে-শাদী তো করি নাই।’

‘করেননি কেন?’

‘ভাগ্যে ছিল না। কষ্টের সংসার ছিল। নিজেই খেতে পেতাম না।’

‘এখন তো বোধহয় অবস্থা সে-রকম না।’

‘জি, এখন মাশাআল্লাহ সামলে উঠেছি। কিছু জমিজমাও করেছি।’

‘তাই নাকি?’

‘অতি অল্প। ধানিজমি।’

‘একা একা থাকেন, ভয় লাগে না?’

‘ভয় লাগবে কেন?’

সিরাজউদ্দিন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ভয়ের ব্যাপারটা নিয়েই আমি আলাপ করতে চাই। কিন্তু কীভাবে সেটা করা যায়? আমি ইতস্তত করে বললাম, ‘আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?’

‘জি না। এইসব হচ্ছে কুসংস্কার। এই গ্রামেই একটা রেন্টি গাছ আছে। লোকে নানান কথা বলে। কি কি নাকি দেখে। আমি কোনোদিন দেখি নাই। রাত-বিরাতে কত ফাওয়া-আসা করেছি।’

চা তৈরি হয়েছে। চিনি ছিল না। খেজুর রসের চা। চমৎকার পায়ের পায়ের গন্ধ। কাপে চুমুক দিতে দিতে সিরাজউদ্দিন বললেন, ‘তবে জিন বলে একটা জিনিস আছে।’

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, ‘আপনি বিশ্বাস করেন?’

‘করব না কেন? কোরান শরিফে পরিষ্কার লেখা—জিন এবং ইনসান। হাশরের দিনে মানুষের যেমন বিচার হবে জিনেরও হবে।’

‘আপনি জিন দেখেছেন কখনো?’

‘জি না। সাধারণ লোকে দেখে না।’

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। সিরাজউদ্দিন লোকটি আসলেই সাধারণ। কোনো রকম বিশেষত্ব নেই। আমার হঠাৎ ভয়ের সঙ্গে এই লোকটিকে কিছুতেই

জড়ানো যাচ্ছে না। সরাসরি এই প্রসঙ্গটা আনাও মুশকিল। তবু একবার বললাম, ‘আপনি চলে আসার পর ঐ রাতে কেমন যেন হঠাৎ করে ভয় পাই।’

সিরাজউদ্দিন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন; ‘সাপ জিনিসটা তো ভয়েরই। ভয় পাওয়াটা ভালো। তাহলে সাবধানে চলাফেরা করবেন। অসাবধান হলেই সর্বনাশ। রাতে বের হলে চট লাইটটা সঙ্গে রাখবেন। শব্দ করে পা ফেলবেন।’

বিদায় নিতে নিতে রাত একটা বেজে গেল। সিরাজউদ্দিন আমার সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে দিতে এলেন। তিনি এলেন বিরুই নদী পর্যন্ত। চাঁদের আলো আছে। চারদিকে স্পষ্ট দেখা যায়। তবু তিনি জোর করে কালিপদের হাতে একটা হারিকেন ধরিয়ে দিয়ে উল্টো দিকে রওনা হলেন। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। যেই মুহূর্তে তিনি বাঁশবনের আড়ালে পড়লেন ঠিক সেই মুহূর্তে আবার সেই রকম হলো। অন্ধ যুক্তিহীন ভয়। যেন ভয়ঙ্কর অশুভ একটা-কিছু আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ছুটে আসছে। সেই অশুভ জিনিসটাকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু আমি রক্তের প্রতি কণিকায় তাকে অনুভব করছি। এর ক্ষমতা অসাধারণ। এ অন্য জগতের কেউ। এ জগতে তাকে কেউ জাবে না। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় কাঁপিয়ে দিয়ে ভয়টা চলে গেল। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে লক্ষ করলাম আমি মাটিতে বসে আছি। কালিপদ আমার মুখের উপর ঝাঁক পড়ে বলছে, ‘কী হইল স্যার? কী হইল?’

‘কিছু হয়নি। মাথাটা কেমন যেন করল।’

‘মাথা ধুইবেন স্যার? নদীর পানি দিয়া...।’

‘মাথা ধুতে হবে না। চল রওনা দেই।’

বলেও রওনা দিতে পারলাম না। ভয় একেবারেই নেই কিন্তু শরীর অবসন্ন। অসম্ভব ঘুম পাচ্ছে।

‘কালিপদ!’

‘জে আজে।’

‘একটু আগে তোমার কি কোনো ভয়-টয় লেগেছে?’

‘জে না।’

‘ও আচ্ছা! চল আস্তে-আস্তে হাঁটি।’

কালিদপ বারবার মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখছে। পাগল ভাবছে কি-না কে জানে। ভাবলেও তাকে দোষ দেয়া যায় না। যে লোক মাঝরাাত্রিতে বেড়াতে বের হয়, অকারণে ভয় পেয়ে আধমরা হয়ে যায় সে আর যাই হোক খুব সুস্থ নয়।

পরের দিনটা আমার খুব খারাপ কাটল। কিছুতেই মন বসাতে পারি না।

ভাইভা শুরু হয়েছে। ছাত্রদের প্রশ্নের জবাবগুলিও ঠিকমতো শুনছি না। বি.এস.সি. পরীক্ষা দিতে এসে একজন দেখি সোডিয়াম ক্লোরাইডের ফরমুলাতে দুটি ক্লোরিন এটম দেখাচ্ছে। প্রচণ্ড রাগ হবার কথা। রাগও হচ্ছে না। পাস নাম্বার দিয়ে বিদায় করে দিচ্ছি। কেমিস্ট্রির হেড বললেন, ‘আপনার কি শরীর খারাপ?’

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, ‘হ্যাঁ। কিছুতেই মন বসছে না। খুব টায়ার্ড লাগছে।’

‘রাতে ঘুম কেমন হয়েছে?’

‘ঘুম ভালো হয়েছে।’

‘যদি হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন তাহলে এক ডোজ অম্ল দিতে পারি।’

আমি বিরক্ত স্বরে বললাম, ‘আপনি কি হোমিওপ্যাথিও করেন?’

‘জি। ছোটখাট একটা ডিসপেনসারি আছে। রুগি-টুগি ভালোই হয়।’

মফস্বল কলেজের টিচারদের এই এক জিনিস একটিমাত্র পেশায় তাঁরা খুশি নন। প্রত্যেকের দ্বিতীয় কোনো পেশা আছে। কোন পেশাটি প্রধান বোঝা মুশকিল।

‘কি স্যার, হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস আছে?’

‘জি না, ভূত-প্রেত এবং হোমিওপ্যাথি— এই তিন জিনিস আমি বিশ্বাস করি না। আপনি কিছু মনে করবেন না।’

ভদ্রলোক মুখ কালো করে বললেন, ‘হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস করেন না কেন? এটা তো হাইলি সাইন্টিফিক ব্যাপার। হ্যানিম্যান সাহেবের কথাই ধরেন। উনি নিজে একজন পাস-করা ডাক্তার ছিলেন।’

হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে আমি একগাদা কথা বলতে পারতাম। টু হানড্রেড পাওয়ারের একটি অম্লধে যে আসলে কোনো অম্লই থাকে না সেটি মোলার কনসানট্রেশন এবং এ্যাভাগড্রো নাম্বার দিয়ে সহজেই প্রমাণ করা যেত। তর্কের ক্ষেত্রে সব সময় তাই করি। আজ ইচ্ছা করছে না। পাঁচটা বাজতেই উঠে পড়লাম। পরীক্ষা তখনও চলছে, চলতে থাকুক। আমি বললাম, ‘আপনারা ভাইভা শেষ করে দিন। আমি ঘরে চলে যাব।’

‘প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসায় আপনার না চা খাওয়ার কথা?’

ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়ায় মেজাজ আরো খারাপ হলো। কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। তবু যেতে হবে।

প্রিন্সিপাল সাহেবও দাওয়াতের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আমাকে দেখে অনেকক্ষণ অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, ‘ও আচ্ছা আচ্ছা। আসুন

আসুন। চা খেতে বলেছিলাম তাই না? কিছু মনে নেই। আসুন বারান্দায় বসি। নানান ঝামেলায় আছি ভাই।’

তিনি আমাকে বসিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেলেন। অনেকক্ষণ তাঁর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। দরজা ধরে পাঁচ-ছ’ বছর বয়সের মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ে কৌতূহলী চোখে আমাকে দেখছে। এর সঙ্গে দু’-একটা কথা বলা উচিত কিন্তু ইচ্ছা করছে না। বাড়ির ভেতর থেকে হিংস্র পশুর গর্জনের মতো গর্জন কানে আসছে। একটি মেয়েও কাঁদছে। কখনো-কখনো কান্না থেমে যাচ্ছে, আবার শুরু হচ্ছে। এই রকম অবস্থায় চায়ের জন্যে অপেক্ষা করাটাও অপরাধ।

‘অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। ছেলেটা বড় ঝামেলা করছে। শুনেছেন বোধহয়?’

‘জি শুনেছি।’

‘ভালো খবর কেউ কখনো শুনে না। কিন্তু এইসব খবর সবাই শুনে ফেলে। নিতান্ত অপরিচিত লোকও এসে গায়ে পড়ে বিচিত্র সব চিকিৎসার কথা বলে।’

আমি চুপ করে রইলাম। প্রিন্সিপাল সাহেব তিষ্ঠ গলায় বললেন, ‘সেই জাতীয় চিকিৎসা এখন হচ্ছে। সাত নদীর পানিতে গোসল। ঠাণ্ডা গোসল দিয়ে নিউমোনিয়া বাঁধাবে।’

‘ডাক্তারি চিকিৎসা করাচ্ছেন না?’

‘তাও আছে। বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সব রকম চিকিৎসাই চলছে। কোনোটাই লাগছে না।’

‘অসুখটা শুরু হলো কীভাবে?’

প্রিন্সিপাল সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে হয়তো তাঁর ইচ্ছা করছে না। চা চলে এল। শুধু চা নয়। মিষ্টি, সিঙ্গড়া, কচুরি।

‘নিন চা নিন। ক্ষিধে না থাকলে এই খাবারগুলি খাবেন না। সবই দোকানের কেনা। এদিকে আবার খুব ডাইরিয়া হচ্ছে।’

চা-টা চমৎকার। এক চুমুক দিয়েই মাথাধরাটা অনেকখানি সেরে গেলে। প্রিন্সিপাল সাহেব অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন, ‘কী করে অসুখটা শুরু হলো সত্যি জানতে চান?’

‘বলতে ইচ্ছে না করলে থাক।’

‘না না, শুনুন। গত বছর গরমের সময় আমার এই ছেলে তার বউকে নিয়ে এখানে আসে। আমি অনেকদিন থেকেই আসতে বলছিলাম। ছুটি পায় না, আসতে পারে না। ব্যাংকের চাকরি, ছুটিছাটা কম। সাতদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। আমি এখানে এসেছি দু’বছর আগে। ছেলে প্রথম এল। আমরাও খুব খুশি।’

রাত্রিবেলা বেশ গল্পগুজব করছি। সিরাজউদ্দিন এসেছে। সাপের গল্প-টল্প করছে। রাত দশটার দিকে সিরাজউদ্দিন চলে যেতেই ছেলে যেন কেমন হয়ে গেল। থরথর করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। কোনোমতে বলল, তার নাকি অসম্ভব ভয় লাগছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্বাভাবিক হয়ে গেল। হাসি-তামাশা করতে লাগল। তখন কিছু বুঝতে পারিনি। এখন বুঝছি ঐ রাতেই তার পাগলামির প্রথম শুরু।

প্রিন্সিপাল সাহেব চুপ করলেন। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে শুনি। আমার শরীর দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। পিপাসায় বুক শুকিয়ে কাঠ। প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, ‘কয়েক দিন পর আবার এ-রকম হলো। সেও রাতের বেলা। কলেজের কিছু প্রফেসরকে খেতে বলেছিলাম। তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করে চলে যাবার পর আবার আমার ছেলে ঐ রকম করতে লাগল।’

আমি ক্ষীণস্বরে বললাম, ‘সিরাজউদ্দিন সাহেবেরও দাওয়াত ছিল?’

‘হ্যাঁ ছিল। কলেজ স্টাফের সবাইকে বলেছিলাম।’

‘তারপর কী হলো, বলুন।’

‘আর বলার কিছু নেই। রোজই ওরকম হতে লাগল।’

‘কখন হতো?’

‘রাত দশটা সাড়ে দশটা।’

আমি কোনো কথা না বলে পরপর দু’টা সিগারেট শেষ করলাম। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমার চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু যেতে পারছি না। আমি নিতান্ত অগ্রাসঙ্গিকভাবে বললাম, ‘সিরাজউদ্দিন সাহেব কি প্রায়ই আসেন এখানে?’

‘আসে। আমার ছোট ছেলেটাকে প্রাইভেট পড়ায়। সিনসিয়ার লোক। রোজ সাতটার সময় আসে, রাত দশটা সাড়ে দশটার আগে যায় না।’

‘আমি কি আপনার ছেলেটাকে একটু দেখতে পারি?’

তিনি বেশ অবাক হলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আসুন আমার সঙ্গে।’

আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। না গেলেই ভালো করতাম। সাতাশ-আটাশ বছরের একটা ছেলে। দড়ি দিয়ে বাঁধা। কী যে অসহায় লাগছে! ছেলেটি আমার দিকে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, ‘ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা করান।’

‘ঢাকাতেই তো ছিল। কোনো রকম উন্নতি হয় না। টাকার শ্রাদ্ধ। এখানে বরঞ্চ ভালো আছে। সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে বেশ খাতির। সে এলে শান্ত থাকে। প্রায় স্বাভাবিক আচরণ করে।’

‘তাই নাকি?’

‘জি। কয়েক দিন ধরে সিরাজ আসছে না। আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত। তাই ছেলেটার উগ্র স্বভাব হয়ে গেছে। গত পরশু বটি নিয়ে তার মাকে কাটতে গিয়েছিল।’

‘সিরাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কথা-টথা বলে?’

‘না, কথা-টথা কিছু না। চুপচাপ থাকে। ও এলে খুশি হয় এইটা বুঝি। মুচকি মুচকি হাসে। সিরাজউদ্দিন গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে একেবারে শান্ত হয়ে যায়।’

আমি তাকিয়ে আছি ছেলেটির দিকে। সে গোঙানির মতো একটা চাপা শব্দ করছে। মুখ থেকে অনরত লালা বেরুচ্ছে। মুখ ঈষৎ হা হয়ে আছে। একটু আগেই যাকে অসহায় লাগছিল এখন সে রকম লাগছে না। বরং কেমন যেন ভয়ঙ্কর লাগছে। আমি ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললাম, ‘প্রিন্সিপাল সাহেব, আমাকে আজ রাতেই ঢাকা চলে যেতে হচ্ছে।’

‘কী বললেন?’

‘আমি কিছুতেই থাকতে পারছি না। কেন পারছি না সেই কারণও আপনার কাছে ব্যাখ্যা করতে পারছি না। কোনোদিন পারব বলেও মনে হয় না।’

‘আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।’

‘আপনি পরীক্ষা কয়েক দিন পিছিয়ে দিন। নতুন এগজামিনার এসে বাকিটা শেষ করবেন।’

‘অসম্ভব কথা আপনি বলছেন।’

‘তা বলছি। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।’

সেই রাতেই আমি ঢাকা চলে আসি। এই অস্বাভাবিক ঘটনাটি স্মৃতি থেকে পুরোপুরি মুছে যেছিল। নিজেকে বোঝাই যে সমস্তটাই ছিল উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। গ্রামের নির্জনতা কোনো-না-কোনোভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছিল।

এই ঘটনার প্রায় চার বছর পর সিরাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা। আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। তিনি বায়তুল মোকাররমের ফুটপাথ থেকে উলেন সুয়েটার কিনছিলেন। তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।

‘স্যার আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি সিরাজ।’

‘চিনতে পেরেছি।’

‘ঐবার স্যার কাউকে কিছু না বলে ছুট করে চলে গেলেন। পরীক্ষা এক মাস পিছিয়ে গেল। কী দুর্দশা ছাত্রদের! গরিবের ছেলেপুলে।’

আমি কঠিন স্বরে বললাম, ‘আপনারা সবাই ভালো তো?’

‘জি ভালো।’

‘প্রিন্সিপাল সাহেব, উনি ভালো আছেন?’

‘উনার খবরটা জানি না। ছেলেটা মারা যাওয়ার পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে জামালপুর চলে গেলেন।’

‘ছেলেটা মারা গেছে বুঝি?’

‘জি। বড়ই দুঃখের কথা। পাগল মানুষ—বাড়ি থেকে বের হয়ে কোথায় চলে গেল। নানান জায়গায় খোঁজাখুঁজি। তিনদিন পর নদীতে লাশ ভেসে উঠেছে। আমিই খুঁজে পাই। আমার বাড়ির পাশের ঘাটে গিয়ে লেগেছিল।’

‘তাই বুঝি?’

‘জি স্যার। খুবই আফসোসের কথা।’

‘এখন কি নতুন প্রিন্সিপাল এসেছেন?’

‘জি। ভালো লোক। প্রায়ই যাই উনার বাসায়। আমাকে খুব আদর করেন। উনার সঙ্গে গল্প-গুজব করি।’

‘ভালো কথা।’

‘তবে স্যার অদ্ভুত ব্যাপার কি জানেন? নতুন প্রিন্সিপাল সাহেবের স্ত্রী মাঝে মাঝে বিনা কারণে ভয় পেয়ে চিৎকার, চৈচামেটি করেন। অবিকল আগের প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলের মতো অবস্থা। মনে হয় বাড়িটার একটা দোষ আছে।’

আমি কঠিন চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সিরাজউদ্দিন বলল, ‘আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় ভালো লাগছে স্যার। আপনার কথা আমার প্রায়ই মনে হয়।’ সিরাজউদ্দিন হাসল। তার হাসিতে শিশুর সারল্য। চোখ দুটি মমতায় আর্দ্র।



অচিন বৃক্ষ

ইদরিশ বলল, ‘ভাইজান ভালো কইর্যা দেহেন। এর নাম অচিন বৃক্ষ।’

বলেই থু করে আমার পায়ের কাছে একদলা থুথু ফেলল। লোকটির কুৎসিত অভ্যাস, প্রতিটি বাক্য দু’বার করে বলে। দ্বিতীয়বার বলার আগে একদলা থুথু ফেলে।

‘ভাইজান ভালো কইরা দেহেন, এর নাম অচিন বৃক্ষ।’

অচিন পাখির কথা গানের মধ্যে প্রায়ই থাকে, আমি অচিন বৃক্ষের কথা এই প্রথম শুনলাম এবং দেখলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এরা সবাই বৃক্ষ শব্দটা উচ্চারণ করছে শুদ্ধভাবে। তৎসম শব্দের উচ্চারণে কোনো গুণগোল হচ্ছে না। অচিন বৃক্ষ না বলে অচিন গাছও বলতে পারত, তা বলছে না। সম্ভবত গাছ বললে এর মর্যাদা পুরোপুরি রক্ষিত হয় না।

ইদরিশ বলল, ‘ভালো কইরা দেহেন ভাইজান, ত্রিভুবনে এই বৃক্ষ নাই।’

‘তাই না-কি?’

‘জে। ত্রিভুবনে নাই।’

ত্রিভুবনে এই গাছ নাই শুনেও আমি তেমন চমৎকৃত হলাম না। গ্রামের মানুষদের কাছে ত্রিভুবন জায়গাটা খুব বিশাল নয়। এদের ত্রিভুবন হচ্ছে আশেপাশের আট-দশটা গ্রাম। হয়তো আশপাশে এ-রকম গাছ নেই।

‘কেমন দেখতাহেন ভাইজান?’

‘ভালো।’

‘এই রকম গাছ আগে কোনোদিন দেখছেন?’

‘না।’

ইদরিশ বড়ই খুশি হলো। থু কয়ে বড় একদলা থুথু ফেলে খুশির প্রকাশ ঘটাল।

‘বড়ই আচানক, কি বলেন ভাইজান?’

‘আচানক তো বটেই।’

ইদরিশ এবার হেসে ফেলল। পান খাওয়া লাল দাঁত প্রায় সব ক’টা বের হয়ে এল। আমি মনে মনে বললাম, কী যন্ত্রণা! এই অচিন বৃক্ষ দেখার জন্যে আমাকে মাইলের উপরে হাঁটতে হয়েছে। বর্ষাকবলিত গ্রামে দু’মাইল হাঁটা যে কি জিনিস, যারা কোনোদিন হাটেননি তাঁরা বুঝতে পারবেন না। জুতা খুলে খালি পায়ে হাঁটতে হয়েছে। হুক ওয়ার্মের জীবাণু যে শরীরে ঢুকে গেছে সে বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত।

‘গাছটা দেখতাহেন কেমন কন দেহি ভাইজান?’

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। এরা শুধু গাছ দেখিয়ে খুশি নয়, প্রশংসূচক কিছুও শুনতে চায়। আমি কোনো বৃক্ষ-প্রেমিক নই। সব গাছ আমার কাছে এক রকম মনে হয়।

আশপাশের মানুষদেরই আমি চিনি না, গাছ চিনব কী করে? মানুষজন তাও কথা বলে, নিজেদের পরিচিত করার চেষ্টা করে। গাছেরা তেমন কিছুই করে না।

‘অচিন বৃক্ষ কেমন দেখলেন ভাইজান?’

আমি ভালো করে দেখলাম। মাঝারি সাইজের কাঁঠাল গাছের মতো উঁচু, পাতাগুলি তেঁতুল গাছের পাতার মতো ছোট ছোট, গাছের কাণ্ড পাইন গাছের কাণ্ডের মতো মসৃণ। গাছ প্রসঙ্গে কিছু না বললে ভালো দেখায় না বলেই বললাম, ‘ফুল হয়?’

ইদরিশ কথা বলার আগেই, পাশে দাঁড়ানো রোগা লোকটা বলল, ‘জে না-ফুল ফুটনের টাইম হয় নাই। টাইম হইলেই ফুটবে। এই গাছে ফুল আসতে মেলা টাইম লাগে।’

‘বয়স কত এই গাছের?’

‘তা ধরেন দুই হাজারের কম না। বেশিও হইতে পারে।’

বলেই লোকটা সমর্থনের আশায় চারদিকে তাকাল। উপস্থিত জনতা অতি দ্রুত মাথা নাড়তে লাগল। যেন এই বিষয়ে কারো মনেই সন্দেহের লেশমাত্র নেই। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হলাম। গ্রামের লোকজন কথাবাতা বলার সময় তাল ঠিক রাখতে পারে না। হুট করে বলে দিল দু’হাজার বছর। আর তাতেই সবাই কেমন মাথা নাড়ছে। আমি ইদরিশের দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘ইদরিশ মিয়া, গাছ তো দেখা হলো, চল যাওয়া যাক।’

আমার কথায় মনে হলো সবাই খুব অবাক হচ্ছে।

ইদরিশ হতভম্ব গলায় বলল, ‘প্রথম যাইবেন কি! গাছ তো দেখাই হইল না। তার উপরে, মাস্টার সাহেব খুব দেওয়া হইছে। আসতাছে।’

আমার চারপাশে সতেরো-আঠারোজন মানুষ আর একপাল উলঙ্গ শিশু। অচিন বৃক্ষের লাগোয়া ঘাড় থেকে বৌ-ঝিরা উঁকি দিচ্ছে। একজন এক কাঁদি ডাব পেড়ে নিয়ে এল। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, কালো রঙের বিশাল একটা চেয়ারও একজন মাথায় করে আনছে। এই গ্রামের এটাই হয়তো একমাত্র চেয়ার। অচিন বৃক্ষ যাঁরা দেখতে আসেন তাদের সবাইকে এই চেয়ারে বসতে হয়।

অচিন বৃক্ষের নিচে চেয়ার পাতা হলো। আমি বসলাম। কে একজন হাতপাখা দিয়ে আমাকে প্রবল বেগে হাওয়া করতে লাগল। স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব চলে এলেন। বয়স অল্প, তবে অল্প বয়সেই গালটাল ভেঙে একাকার। দেখেই মনে হয় জীবনযুদ্ধে পরাজিত একজন মানুষ। বেঁচে থাকতে হয় বলেই বেঁচে আছেন। ছাত্র পড়াচ্ছেন। হেডমাস্টার সাহেবের নাম মুহম্মদ কুদ্দুস। তাঁর সম্ভবত হাঁপানি আছে। বড় বড় করে শ্বাস নিচ্ছেন। নিজেকে সামলে কথা বলতে অনেক সময় লাগল।

‘স্যারের কি শইল ভালো?’

‘জি ভালো ।’

‘আসতে একটু দেরি হইল । মনে কিছু নিবেন না স্যার ।’

‘না মনে কিছু নিচ্ছি না ।’

‘বিশিষ্ট লোকজন শহর থাইক্যা অচিন বৃক্ষ দেখতে আসে, বড় ভালো লাগে । বিশিষ্ট লোকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয় ।’

‘আপনি ভুল করছেন ভাই । আমি বিশিষ্ট কেউ নই ।’

‘এই তোমরা স্যারকে হাত-পা ধোয়ার পানি দেও নাই, বিষয় কী?’

‘হাত-পা ধুয়ে কী হবে? আবার তো কাদা ভাঙতে হবে ।’

হেডমাস্টার সাহেব অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, ‘খাওয়া-দাওয়া করবেন না? আমার বাড়িতে পাক-শাক হইতেছে । চাইরটা ডাল-ভাত বিশেষ কিছু না । গেরাম দেশে কিছু যোগাড়যন্ত্রও করা যায় না । বিশিষ্ট মেহমানরা আসেন । গত বৎসর ময়মনসিংহের এ ডি সি সাহেব আসছিলেন । এ ডি সি রেভিনিউ । বিশিষ্ট ভদ্রলোক । অচিন বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে এক হাজার টাকা দেওয়ার ওয়াদা করলেন ।’

‘তাই না-কি?’

‘জি । অবিশ্যি টাকা এখনো পাওয়া যায় নাই । এরা কাজের মানুষ । নানান কাজের চাপে ভুলে গেছেন আর কি! আমাদের মতো তো না যে কাজকর্ম কিছু নাই । এদের শতক কাজ । তবু ভারতের একটা পত্র দিব । আপনে কি বলেন?’

‘দিন । চিঠি দিয়ে মনে করিয়ে দিন ।’

‘আবার বিরক্ত হন কিনা কে জানে । এরা কাজের মানুষ, চিঠি দিয়ে বিরক্ত করাও ঠিক না । এই চায়ের কি হইল?’

‘চা হচ্ছে না-কি?’

‘জি, বানাতে বলে এসেছি । চায়ের ব্যবস্থা আমার বাড়িতে আছে । মাঝে-মধ্যে হয় । বিশিষ্ট মেহমানরা আসেন । এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর সাহেব এসেছিলেন, বিরাট জ্ঞানী লোক । এদের দেখা পাওয়া তো ভাগ্যের কথা, কি বলেন স্যার?’

‘তা তো বটেই ।’

চা চলে এল ।

চা খেতে খেতে এই গ্রামের অচিন বৃক্ষ কী করে এল সেই গল্প হেডমাস্টার সাহেবের কাছে শুনলাম । এক ডাইনি না-কি এই গাছের উপর ‘সোয়ার’ হয়ে আকাশপথে যাচ্ছিল । হঠাৎ তার পানির পিপাসা হয় । এইখানে সে নামে । পানি খেয়ে তৃষ্ণা নিবারিত করে । পানি ছিল বড়ই মিঠা । ডাইনি তখন সন্তুষ্ট হয়ে গ্রামের লোকদের বলে, তোমাদের মিঠা পানি খেয়েছি, তার প্রতিদানে এই গাছ

দিয়ে গেলাম। গাছটা যত্ন করে রাখবে। অনেক অনেক দিন পরে গাছে ফুল ধরবে। তখন তোমাদের দুঃখ থাকবে না। এই গাছের ফুল সবরোগের মহৌষধ। একদিন উপাস থেকে খালি পেটে এই ফুল খেলেই হবে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, ‘আপনি এই গল্প বিশ্বাস করেন?’

হেডমাস্টার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, ‘বিশ্বাস করব না কেন? বিশ্বাস না করার তো কিছু নাই।’

‘যে যুগে মানুষ চাঁদে হাঁটাইটি করেছে সেই যুগে আপনি বিশ্বাস করছেন গাছে চড়ে ডাইনি এসেছিল?’

‘জগতে অনেক আচানক ব্যাপার হয় জনাব। যেমন ধরেন ব্যাঙের মাথায় মণি। যে মণি সাত রাজার ধন। অন্ধকার রাতে ব্যাঙ এই মণি শরীর থেকে বের করে। তখন চারদিক আলো হয়ে যায়। আলো দেখে পোকারা আসে। ব্যাঙ সেই পোকা ধরে ধরে খায়।’

‘আপনি ব্যাঙের মণি দেখেছেন?’

‘জি জনাব। নিজের চোখে দেখা। আমি তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।’

আমি চুপ করে গেলাম। যিনি ব্যাঙের মণি বিজে দেখেছেন বলে দাবি করেন তাঁর সঙ্গে কুসংস্কার নিয়ে তর্ক করা বুথা। তা ছাড়া দেখা গেল ব্যাঙের মণি তিনি একাই দেখেননি— আমার আশপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের অনেকেও দেখেছে।

দুপুরে হেডমাস্টার সাহেবের বাসায় খেতে গেলাম। আমি এবং ইদরিশ। হেডমাস্টার সাহেবের হতদরিদ্র অবস্থা দেখে মনটাই খারাপ হয়ে গেল। প্রাইমারি স্কুলের একজন হেডমাস্টার সাহেবের যদি এই দশা হয় তখন অন্যদের না-জানি কী অবস্থা! অথচ এর মধ্যেই পোলাও রান্না হয়েছে। মুরগির কোরমা করা হয়েছে। দরিদ্র মানুষটির অনেকগুলি টাকা বের হয়ে গেছে এই বাবদে।

‘আপনি এসেছেন বড় ভালো লাগতেছে। অজপাড়াগাঁয়ে থাকি। দু’ একটা জ্ঞানের কথা নিয়ে যে আলাপ করব সেই সুবিধা নাই। চারদিকে মূর্খের দল। অচিন বৃক্ষ থাকায় আপনাদের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তির আসেন। বড় ভালো লাগে। কিছু জ্ঞানের কথা শুনতে পারি।’

বেচারি জ্ঞানের কথা শুনতে চায়। কোনো জ্ঞানের কথাই আমার মনে এল না। আমি বললাম, ‘রান্না তো চমৎকার হয়েছে। কে রেঁধেছে, আপনার স্ত্রী?’

‘জি না জনাব। আমার কনিষ্ঠ ভগ্নি। আমার স্ত্রী খুবই অসুস্থ। দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী।’

‘সে-কি!’

‘হার্টের বালের সমস্যা। টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তাররা বলেছেন, লাখ দুই টাকা খরচ করলে একটা-কিছু করা যাবে। কোথায় পাব এত টাকা বলেন দেখি।’

আমি চুপ করে গেলাম।

হেডমাস্টার সাহেব সহজ ভঙ্গিতে বললেন, ‘আপনি যখন আসছেন আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিব। সে শহরের মেয়ে। মেট্রিক পাস।’

‘তাই না-কি?’

‘জি। মেট্রিকে ফাস্ট ডিভিশন ছিল। টোটাল মার্ক ছয়শ’ এগারো। জেনারেল অঙ্কে পেয়েছে ছিয়াত্তর। আর চারটা নম্বর হলে লেটার হতো।’

হেডমাস্টার সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

‘ওর আবার লেখালেখির শখ আছে।’

‘বলেন কি!’

‘শরীরটা যখন ভালো ছিল তখন কবিতা লিখত। তা এই মূর্খের জায়গায় কবিতার মতো জিনিস কে বুঝবে বলেন? আপনি আসছেন দু’-একটা পড়ে দেখবেন।’

‘জি নিশ্চয়ই পড়ব।’

‘মহসিন সাহেব বলে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি একটি কবিতার কপি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন অনেক পত্রিকার সাথে তাঁর যোগাযোগ আছে, ছাপিয়ে দিবেন।’

‘ছাপা হয়েছে?’

‘হয়েছে নিশ্চয়ই। কবিতাটা ভালো ছিল, নদীর উপরে লেখা। পত্রিকা-টত্রিকা তো এখানে কিছু আসে না। জানার উপায় নাই। একটা পত্রিকা পড়তে হলে যেতে হয় মশাখালির বাজার। চিন্তা করেন অবস্থা। শেখ সাহেবের মৃত্যুর খবর পেয়েছি দু’দিন পরে, বুঝলেন অবস্থা।’

‘অবস্থা তো খারাপ বলেই মনে হচ্ছে।’

‘তাও অচিন বৃক্ষ থাকায় দুনিয়ার সাথে একটা যোগাযোগ আছে। আসেন ভাইসাব, আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা বলেন। সে শহরের মেয়ে। ময়মনসিংহ শহরে পড়াশোনা করেছে।’

আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। অপরিচিতি অসুস্থ একজন মহিলার সঙ্গে আমি কী কথা বলব? ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে অচিন বৃক্ষ দেখতে যাঁরা আসেন তাঁদের সবাইকে এই মহিলার সঙ্গেও দেখা করতে হয়।

মহিলার সঙ্গে দেখা হলো।

মহিলা না বলে মেয়ে বলাই উচিত। উনিশ-কুড়ির বেশি বয়স হবে না। বিছানার সঙ্গে মিশে আছে। মানুষ নয় যেন মিশরের মমি। বিশিষ্ট অতিথিকে দেখে তার মধ্যে কোনো প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ করা গেল না। তবে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। হেডমাস্টার সাহেব তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়লেন। পরক্ষণেই হাসি মুখে বললেন, আপনাকে সালাম দিচ্ছে।

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। কিছু-একটা বলতে হয় অথচ বলার মতো কিছু পাচ্ছি না। মেয়েটি আবার বিড়বিড় করে কী যেন বলল। হেডমাস্টার সাহেব বললেন, ‘রেণু বলছে আপনার খাওয়া-দাওয়ার খুব কষ্ট হলো। ওর কথা আর কেউ বুঝতে পারে না। আমি পারি।’

আমি বললাম, ‘চিকিৎসা হচ্ছে তো? না-কি এমনি রেখে দিয়েছেন?’

হেডমাস্টার সাহেব এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। মেয়েটি বিড়বিড় করে আবারো কী যেন বলল। হেডমাস্টার সাহেব বুঝিয়ে দিলেন ও জিজ্ঞেস করছে অচিন বৃক্ষ দেখে খুশি হয়েছেন কি-না।

আমি বললাম, ‘হয়েছি। খুব খুশি হয়েছি।’

মেয়েটি বলল, ‘ফুল ফুটলে আরেকবার আসবেন। ঠিকানা দিয়ে যান। ফুল ফুটলে আপনাকে চিঠি লিখবে।’

মেয়েটি এই কথাগুলি বেশ কপট করে বলল, আমার বুঝতে কোনো অসুবিধা হলো না।

আমি বললাম, ‘আপনি বিশ্রাম করুন। আমি যাই।’

হেডমাস্টার সাহেব আমাকে এগিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। আমি রাজি হলাম না। এই ভদ্রলোকের এমন উচিত তার স্ত্রীর কাছে থাকা। যত বেশি সময় সে তার স্ত্রীর পাশে থাকবে ততই মঙ্গল। এই মেয়েটির দিনের আলো যে নিভে এসেছে তা যে-কেউ বলে দিতে পারে।

আমি এবং ইদরিশ ফিরে যাচ্ছি।

আসার সময় যতটা কষ্ট হয়েছিল ফেরার সময় ততটা না। আকাশে মেঘ করায় রৌদ্রের হাত থেকে রক্ষা হয়েছে। তার উপর ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। ইদরিশের সঙ্গে গল্প করতে করতে এগুচ্ছি।

আমি বললাম, ‘হেডমাস্টার সাহেব তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা করাচ্ছে না?’

‘করাইতাছে। বিষয়-সম্পত্তি যা ছিল সব গেছে পরিবারের পিছনে। এখন বাড়ি-ভিটা পর্যন্ত বন্দক।’

‘তাই না-কি?’

‘জি। এই মানুষটা পরিবারের জন্যে পাগল। সারা রাইত ঘুমায় না। স্ত্রীর ধারে বইস্যা থাকে। আর দিনের মধ্যে দশটা চক্কর দেয় অচিন বৃক্ষের কাছে।’

‘কেন?’

‘ফুল ফুটেছে কি-না দেখে। অচিন বৃক্ষের ফুল হইল অখন শেষ ভরসা।’

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম।

খেয়াঘাটের সামনে এসে আমাকে থমকে দাঁড়াতে হলো। দেখা গেল হেডমাস্টার সাহেব ছুটতে ছুটতে আসছেন। ছুটে-আসাজনিত পরিশ্রমে খুবই কাহিল হয়ে পড়া একজন মানুষ যার সারা শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। ছুটে আসার কারণ হচ্ছে স্ত্রীর কবিতার খাতা আমাকে দেখাতে ভুলে গিয়েছিলেন। মনে পড়ায় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

আমরা একটা অশ্বখ গাছের ছায়ার নিচে বসলাম। হেডমাস্টার সাহেবকে খুশি করার জন্যেই দু’নম্বরী খাতার প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত পড়ে বললাম, ‘খুব ভালো হয়েছে।’

হেডমাস্টার সাহেবের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললেন, ‘এখন আর কিছু লিখতে পারি না। শরীরটা বেশি খারাপ।’

আমি বললাম, ‘শরীর ভালো হলে আবার লিখবেন।’

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, ‘আমিও রেণুকে সেইটাই বলি অচিন বৃক্ষের ফুল ফুটারও বেশি বাকি নাই। ফুল ফুটার আগে পচা শ্যাওলার গন্ধ ছাড়ার কথা। গাছ সেই গন্ধ ছাড়া শুরু করেছে। আর কেউ সেই গন্ধ পায় না। আমি পাই।’

আমি গভীর সম্যক উদ্বেগের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি ইতস্তত করে বললেন, ‘প্রথম কবিতাটা আরেকবার পড়েন স্যার। প্রথম কবিতাটার একটা ইতিহাস আছে।’

‘কী ইতিহাস?’

হেডমাস্টার সাহেব লাজুক গলায় বললেন, ‘রেণুকে আমি তখন প্রাইভেট পড়াই। একদিন বাড়ির কাজ দিয়েছি। বাড়ির কাজের খাতা আমার হাতে দিয়ে দৌড় দিয়া পালাইল। আর তো আসে না। খাতা খুইল্যা দেখি কবিতা। আমারে নিয়া লেখা। কী সর্বনাশ বলেন দেখি! যদি এই খাতা অন্যের হাতে পড়ত, কী অবস্থা হইত বলেন?’

‘অন্যের হাতে পড়বে কেন? বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে দিবে আপনার হাতেই।’

তা ঠিক। রেণুর বুদ্ধির কোনো মা-বাপ নাই। কী বুদ্ধি! কী বুদ্ধি! তার বাপ-মা বিয়ে ঠিক করলো— ছেলে পুবালা ব্যাংকের অফিসার। চেহারাসুরত

ভালো। ভালো বংশ। পান চিনি হয়ে গেল। রেণু চুপ করে রইল। তারপর একদিন তার মারে গভীর রাতে ঘুম থেকে ডেকে বলল, মা তুমি আমারে বিষ যোগাড় কইরা দেও। আমি বিষ খাব। রেণুর মা বললেন, কেন? রেণু বলল, ‘আমি একজনরে বিবাহ করব কথা দিছি, এখন অন্যের সঙ্গে বিবাহ হইতেছে। বিষ ছাড়া আমার উপায় নাই। কতবড় মিথ্যা কথা, কিন্তু বলল ঠাণ্ডা গলায়। ঐ বিয়ে ভেঙে গেল। রেণুর মা-বাবা তাড়াহুড়া করে আমার সঙ্গে বিয়ে দিলেন। নিজের ঘরের কথা আপনাকে বলে ফেললাম, আপনি স্যার মনে কিছু নিবেন না।’

‘না—আমি কিছু মনে করিনি।’

‘সবাইরেই বলি। বলতে ভালো লাগে।’

হেডমাস্টারের চোখ চকচক করতে লাগল। আমি বললাম, ‘আপনি ভাববেন না, আপনার স্ত্রী আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন।’

তিনি জড়ানো গলায় বললেন, ‘একটু দোয়া করবেন স্যার। ফুলটা যেন তাড়াতাড়ি ফুটে।’

পড়ন্ত বেলায় খেয়ানোকায় উঠলাম। হেডমাস্টার সাহেব মূর্তির মতো ওপারে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেই এক ধরনের প্রতীক্ষার ভঙ্গি আছে। সেই প্রতীক্ষা অচিন বৃক্ষের অচিন ফুলের জন্যে। যে প্রতীক্ষায় গ্রহর গুণছে হতদরিদ্র গ্রামের অন্যসব মানুষরাও। এবং কী আশ্চর্য! আমার মতো কঠিন নাস্তিকের মধ্যেও সেই প্রতীক্ষার ছায়া। নদী পার হতে হতে আমার কেবলি মনে হচ্ছে—আহা ফুটুক! অচিন বৃক্ষে একটি ফুল হলেও ফুটুক। কত রহস্যময় ঘটনাই তো এ পৃথিবীতে ঘটে। তার সঙ্গে যুক্ত হোক আরো একটি।

হেডমাস্টার সাহেবও পাড়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। তার হাতে হাতির ছবি আঁকা দু’নম্বরী একটা কবিতার খাতা। দূর থেকে কেন জানি তাঁকে অচিন বৃক্ষের মতো লাগছে। হাতগুলি যেন অচিন বৃক্ষের শাখা। বাতাস পেয়ে দুলছে।



নিশিকাব্য

পরী মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে বাইরে এসে দেখে চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে। চিকমিক করছে চারদিক। সে ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলল। এ-রকম জ্যোৎস্নায় মন খারাপ হয়ে যায়।

বেশ রাত হয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকেছে অনেক আগে। চারদিক ভীষণ চুপচাপ। শুধু আজিজ, সাপ খেলানো সুরে পরীক্ষার পড়া পড়ছে। পরীর এখন আর কিছুই করার নেই। সে একাকী উঠোনো দাঁড়িয়ে রইল।

‘কী করছ ভাবী?’

পরী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল হারিকেন হাতে রুন্নে এসে দাঁড়িয়েছে। সে হালকা গলায় বলল, ‘ঘুমবে না ভাবী?’

‘ঘুমব। দাঁড়া একটু। কী চমৎকার জ্যোৎস্না দেখলি!’

‘হুঁ।’

‘আয় রুন্নে, তোকে একটা জিনিস দেখাই।’

‘কী জিনিস?’

‘ঐ দেখ জামগাছটার কেমন ছায়া পড়েছে। অবিকল মানুষের মতো না? হাত-পা সবই আছে।’

‘ওমা, তাই তো। রুন্নে তরল গলায় হেসে উঠল।’

পরী বলল, ‘কুয়োতলায় একটু বসবি না কি রে রুন্নে? চল বসি গিয়ে।’

‘তোমার মেয়ে জেগে উঠে যদি?’

‘বেশিক্ষণ বসব না, আয়।’

কুয়োতলাটা বাড়ি থেকে একটু দূরে আর দু’পাশে দু’টি প্রকাণ্ড শিরীষ গাছ। জায়গাটা বড় নিরিবিলি। রুন্নে বলল, ‘কেমন অন্ধকার দেখেছ ভাবী? ভয় ভয় লাগে।’

‘দূর, ভয় কীসের। বেশ হাওয়া দিচ্ছে, তাই না?’

‘হ্যাঁ।’

দু’জনেই কুয়োর বাঁধানো পাশটায় চুপচাপ বসে রইল। ঝিরঝির বাতাস বইছে। বেশ লাগছে বসে থাকতে। পরী কি মনে করে যেন হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল।

‘হাসছ কেন ভারী?’

‘এম্মি। রাস্তায় একটু হাঁটবি নাকি?’

‘কোথায়?’

‘চল না, হাঁটতে হাঁটতে পুকুর পাড়ের দিকে যাই। বেশ লাগছে না জ্যোৎস্নাটা?’

রুণু সে-কথার জবাব না দিয়ে ভয় পাওয়া গলায় বলল, ‘দেখ ভাবী, কে যেন দাঁড়িয়ে আছে ঐখানটায়?’

শিরীষ গাছের নিচে যেখানে ঘন হয়ে অন্ধকার নেমেছে, সেখানে সাদা মতো কী একটি যেন নড়ে উঠল।

‘কে ওখানে? কথা বলে না যে, কে?’

কেউ সাড়া দিল না। রুণু পরীর কাছে সরে এল। ফিসফিস করে বলল, ‘ভাবী, ছোট ভাইজানকে ডাক দাও।’

‘তুই দাঁড়া না, আমি দেখছি। ভয় কীসের এত?’

‘সাহস দেখাতে হবে না ভাবী, তুমি ছোট ভাইজানকে ডাকো।’

শিরীষ গাছের নিচের ঘন অন্ধকার থেকে একটা লোক হেসে উঠল। হাসির শব্দ শুনেই রুণু বিকট স্বরে চৈঁচিয়ে উঠল, বড় ভাইজান এসেছে। বড় ভাইজান এসেছে।’

পর মুহূর্তেই সে ছুটে বেরিয়ে পেল বাড়িতে খবর দিতে।

আনিস স্যুটকেস কুয়োতলয় সামিয়ে পরীর পাশে এসে দাঁড়াল। পরী কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। তার কেন জানি চোখে পানি এসে পড়ল।

‘টুকুন ভালো আছে পরী?’

‘হুঁ।’

‘আর তুমি?’

‘ভালো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?’

‘তোমাদের আসতে দেখে দাঁড়ালাম। কী মনে করেছিলে—ভূত?’

পরী তার জবাব না দিয়ে হঠাৎ নিচু হয়ে কদমবুসি করল। আনিস অপ্রস্তুত হয়ে হাসল।

‘কী যে কর তুমি পরী, লজ্জা লাগে!’

ততক্ষণে হারিকেন হাতে বাড়ির সবাই বেরিয়ে এসেছে। পরী বলল, ‘তুমি আগে যাও। স্যুটকেস থাক, রশিদ নিয়ে যাবে।’

আনিস হাসিমুখে হাঁটতে লাগল।

বাড়ির উঠানে আনিস এসে দাঁড়াতেই আনিসের মা কাঁদতে লাগলেন।

তাঁর অভ্যাসই এরকম। যে-কোনো খুশির ব্যাপারে মরাকান্না কাঁদতে বসেন। কেউ ধমক দিয়ে না থামালে সে কান্না থামে না। আনিসের বাবা চেষ্টা করে বললেন, ‘একটা জলচৌকি এনে দে না কেউ, বসুক। সবগুলি হয়েছে গাধা। রুঁনু হা করে দেখছিস কী? পাখা এনে হাওয়া কর।’

আনিসের ছোটভাই আজিজ বলল, ‘খবর দিয়ে আস নাই কেন দাদা? খবর দিলেই ইস্টিশনে থাকতাম।’

আনিস কিছু বলল না। জুতোর ফিতা খুলতে লাগল। আনিসের মা’র কান্না তখনো থামেনি। এবার আজিজ ধমক দিল।

‘আহ মা, তোমার ঘ্যানঘ্যানানি থামাও!’

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কান্না থেমে গেল। সহজ ও স্বাভাবিক গলায় তিনি বললেন, ‘তোমার শরীরটা এত খারাপ হলো কি করে রে আনিস? পেটের ঐ অসুখটা সারেনি? চিকিৎসা করাচ্ছিস তো বাবা?’

সবাই লক্ষ করল আনিসের শরীর সত্যি খারাপ হয়েছে। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে। গাল ভেতরে বসে গেছে। আনিসের বাবা বললেন, ‘স্বাস্থ্য খারাপ হবে না, মেসের খাওয়া। পাঁচ বছর মেসে থাকলাম, জানি তো সব। বুঝলে আনিসের মা, মেসে খাওয়ার ধারাই ঐ।’

পরী একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। আনিসের জন্যে নতুন করে রান্না চড়াতে হবে। তবু তার ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। পরীর শাওড়ি একসময় ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, ‘ওকি বৌমা, স্বাস্থ্যের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? রান্না চড়াও গিয়ে। তার আগে আনিসকে চা দাও এক কাপ।’

পরী অপ্রস্তুত হয়ে রান্নাঘরে চলে এল। রুঁনু এল তার পিছু পিছু।

রুঁনু হেসে বলল, ‘আমি চা বানিয়ে আনছি, তুমি ভাইজানের কাছে থাক ভাবী। পরী লজ্জা পেয়ে হাসল।’

‘তুই তো ভারী ফাজিল হয়েছিস রুঁনু।’

‘হয়েছি তো হয়েছি। তোমাকে একটা কথা বলি ভাবী।’

‘কী কথা?’

রুঁনু ইতস্তত করতে লাগল। পরী অবাক হয়ে বলল, ‘বল না কী বলবি।’

‘বাবা আমার যেখানে বিয়ে ঠিক করেছেন সেটা আমার পছন্দ না ভাবী। ভাইজানকে বুঝিয়ে বলবে তুমি। দোহাই তোমার।’

পরী আশ্চর্য হয়ে বলল, ‘পছন্দ হয়নি কেন রুঁনু? ছেলেটা তো বেশ ভালোই। কত জায়গাজমি আছে। তার উপর স্কুলে মাস্টারি করে।’

‘করুক। আমার একটুও ভালো লাগেনি। কেমন ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছিল দেখতে এসে। না না ভাবী, তোমার পায়ে পড়ি।’

‘আচ্ছা আচ্ছা, পায়ে পড়তে হবে না। আমি বলব।’

রুনা খুশি হয়ে বলল, ‘তুমি বড় ভালো মেয়ে ভাবী।’

‘তাই নাকি?’

‘হঁ। ভাইজান হঠাৎ আসায় তোমার খুব খুশি লাগছে তাই না?’

পরী জবাব না দিয়ে মুখ নিচু করে হাসতে লাগল।

‘বল না ভাবী খুব খুশি লাগছে?’

‘লাগছে।’

রুনা ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলল। থেমে বলল, ‘ভাইজানের চাকরিটা বড় বাজে। বৎসরে দশটা দিন ছুটি নেই। গত ঈদে পর্যন্ত আসল না।’

পরী কিছু বলল না। চায়ের কাপে চিনি ঢালতে লাগল।

রুনা বলল, ‘এবার তুমি বাসা করে ভাইজানের সঙ্গে থাক ভাবী। মেসের খাওয়া খেয়ে তার শরীরের কী হাল হয়েছে, দেখেছ?’

পরী মৃদুস্বরে বলল, ‘দুই জায়গায় খরচ চালানো কি সহজ কথা? অল্প ক’টা টাকা পায়। চা হয়ে গেছে, নিয়ে যারে রুনা।’

রুনা চা নিয়ে এসে দেখে তার বিয়ে নিয়েই আলাপ হচ্ছে। বাবা বলছেন, ‘ছেলে হলো তোমার বি. এ. ফেল। তবে এবার প্রাইভেট দিচ্ছে। বংশটংশ খুবই ভালো। ছেলের এক মামা ময়মনসিংহে ওকালতি করেন। তাঁকে একডাকে সবাই চিনে।’

আনিসের মা বলছেন, ‘ছেলে হুদুদে-শুনতে খারাপ না— রঙটা একটু মাজা। পুরুষমানুষের ফর্সা রঙ কি আর ভালো? ভালো না।’

আনিস বলল, ‘রুনুর পছন্দ হয়েছে তো? তার পছন্দ হলে আর আপত্তি কি?’

পাশের বাড়ি থেকে আনিসের ছোট চাচা এসেছেন খবর পেয়ে। তিনি বললেন, ‘রুনুর আঙ্গুর পছন্দ-অপছন্দ কি? আমাদের পছন্দ নিয়ে কথা।’

আনিস রুনুর দিকে তাকিয়ে হাসল। লজ্জা পেয়ে রুনা চলে এল রান্নাঘরে।

আনিসের বাবা বললেন, ‘কাল বিকালে না হয় ছেলেটাকে খবর দিয়ে আনি। তুই দেখ। কাল বিকাল পর্যন্ত তো থাকব না বাবা। আজ শেষ রাতেই যাব।’

‘সে কি!’

‘ছুটি নিয়ে আসিনি তো। কোম্পানি একটা কাজে পাঠিয়েছিল ময়মনসিংহ। অনেকদিন আপনাদের দেখি নাই। কাজটাও হয়ে গেল সকাল সকাল। তাই আসলাম।’

‘একটা দিন থাকতে পারিস না?’

‘উহঁ। কাল অফিস ধরতেই হবে। প্রাইভেট কোম্পানি, বড় ঝামেলার চাকরি।’

আনিস একটা নিশ্বাস ফেলল। সবাই চুপ করে গেল হঠাৎ। চার মাস পর এসেছে আনিস। আবার কবে আসবে কে জানে। আনিসের মা কাঁপা গলায় বললেন, 'তোমার বড় সাহেবকে একটা টেলিগ্রাম করে দে না।'

আনিস হেসে উঠল। গায়ের শার্ট খুলতে খুলতে বলল, 'বড়কর্তা যদি কোনোমতে টের পায় আমি বাড়িতে এসে বসে আছি তাহলেই চাকরি নট হয়ে যাবে। গোসল করব মা, গা কুটকুট করছে।'

'কুয়োয় করবি? পানি তুলে দেবে?'

'উই, পুকুরে করব। পুকুরে মাছ আছে রে আজিজ?'

'আছে ভাইজান। বড় বড় মৃগেল মাছ আছে।'

আনিসের পিছুপিছু পুকুর পাড়ে সবাই এসে পড়ল। আনিসের বাবা আর মা পাড়ে বসে রইলেন। আজিজ "ভীষণ গরম লাগছে" এই বলে আনিসের সঙ্গে গোসল করতে নেমে গেল। ঝুঁনু ঘাটের উপর তোয়ালে আর সাবান নিয়ে অপেক্ষা করছে। আনিসের সবচেয়ে ছোট বোন ঝুঁনু, ঘুমিয়ে পড়েছিল। আনিস ভোর রাতে চলে যাবে শুনে তার ঘুম ভাঙানো হয়েছে। সেও এসে চুপচাপ ঝুঁনুর পাশে বসেছে। শুধু পরী আসেনি। দু'টি চুলোয় রান্না মাপিয়ে সে আগুনের আঁচে বসে আছে একাকী।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে অনেক রাত হলো। আনিসকে ঘিরে গোল হয়ে সবাই বসে গল্প করতে লাগল। উঠোনে শীতল পাটিতে বসেছে গল্পের আসর-এ মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝুঁনু ঘুমুচ্ছে। চমৎকার চাঁদনি সেইসঙ্গে মিষ্টি হাওয়া। কারুর উঠতে ইচ্ছে করছে না। পরীর কাজ শেষ হয়নি। সে বাসন-কোসন নিয়ে ধুতে গেছে ঘাটে। একসময় ঝুঁনু বলল, 'ভাইজান এখন ঘুমোতে যাক মা। রাত শেষ হতে দেরি নেই বেশি।'

আনিসের বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ যা রে তুই ঘুমুতে যা। ঝুঁনু তুই বৌ-মাকে পাঠিয়ে দে। বাসন সকালে ধুলেই হবে।'

ঘরের ভিতর হারিকেন জ্বলছিল। আনিস সলতা বাড়িয়ে দিল। টুকুন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। আনিস চুমু খেল তার কপালে। পরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'জুর নাকি টুকুনের?'

'হুঁ।'

'কবে থেকে?'

'কাল থেকে। সর্দি জ্বর। ও কিছু না। ঘাম দিচ্ছে, এফুনি সেরে যাবে।'

আনিস পরীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। পরীর লজ্জা করতে লাগল। পরী বলল, 'হাসছো কেন?'

'এমনি। পরী তোমার জন্যে শাড়ি এনেছি একটা। দেখ তো পছন্দ হয় কিনা।'

পরী খুশি খুশি গলায় বলল, ‘অনেকগুলি পয়সা খরচ করলে তো।’

‘শাড়িটা পর, দেখি কেমন তোমাকে মানায়।’

‘রুনুর জন্যে একটা শাড়ি আনলে না কেন? বেচারির একটাও ভালো শাড়ি নেই।’

‘পয়সায় কুলোলে আনতাম। আরেকবার আসার সময় আনব।’

পরী ইতস্তত করে বলল, ‘আমার একা একা শাড়ি নিতে লজ্জা লাগবে। এইটি রুনুর জন্যে থাক। আরেকবার নিয়ে এসো আমার জন্যে।’

আনিস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ‘বেশ থাক তবে, আজ রাতের জন্যে পর না দেখি?’

‘শাড়ির ভাঁজ ভেঙে যাবে যে। রুনু মনে করবে আমার জন্যে এনেছিলে পরে তাকে দিয়েছ।’

‘আচ্ছা, তাহলে থাক।’

পরী লজ্জিত স্বরে বলল, ‘বিয়ের শাড়িটা পরব? যদি বল তাহলে পরি।’

পরী লজ্জায় লাল হয়ে ট্রাংকের তালা খুলতে লাগল। আনিস বলল, ‘টুকুন দেখতে তোমার মতো হয়েছে, তাই না?’

‘হ্যাঁ, আদ্যা তাকে ছোট পরী ডাকে। আচ্ছা টুকুনের একটা ভালো নাম রাখ না কেন?’

‘জরী রাখব তার নাম।’

‘জরী আবার কেমন নাম?’

‘তোমার সঙ্গে মিলিয়ে রাখলাম। পরীর মেয়ে জরী।’

পরী হেসে উঠল। হাসি থামলে বলল, ‘অন্য দিকে তাকিয়ে থাক, শাড়ি বদলাব। কী হয় অন্য দিকে না তাকালে?’

‘আহ শুধু অসভ্যতা।’

আনিস মাথা নিচু করে টুকুনকে আদর করতে লাগল। পরী হালকা গলায় বলল, ‘দেখ তো কেমন লাগছে?’

‘ইশ, শুধু ঠাট্টা।’

রান্নাঘর থেকে দুপধুপ শব্দ উঠছে।

আনিস বলল, ‘এত রাতে ধান কুটছে কেন?’

‘ধান কুটছে না চাল ভাঙছে। তোমার জন্যে পিঠা তৈরি হবে।’

‘নিশ্চয়ই রুনুর কাণ্ড।’

আনিস পরীর হাত ধরে তাকে কাছে টানল। পরীর চোখে আবার পানি এসে পড়ল। গাঢ়স্বরে বলল, ‘আবার কবে আসবে?’

‘জুলাই মাসে।’

‘কতদিন থাকবে তখন?’

‘অ-নে-ক দিন।’

‘তুমি এত রোগা হয়ে গেছ কেন? পেটের ঐ ব্যথাটা এখনো হয়?’

‘হয় মাঝে মাঝে?’

টুকুন কেঁদে জেগে উঠল। পরী বলল, ‘জ্বর আরো বেড়েছে। ও টুকুন সোনা, কে এসেছে দেখ। দেখ তোমার আবু এসেছে।’

আনিস বলল, ‘আমার কোলে একটু দাও তো পরী। আরে আরে মেয়ের একটা দাঁত উঠেছে দেখছি। কী কাণ্ড! ও টুকুন, ও জরী, একটু হাস তো মা। ও সোনামণি, দেখি তোমার দাঁতটা?’

টুকুন তারস্বরে চেঁচাতে লাগল। তাই দেখে আনিস ও পরী দু’জনেই হাসতে লাগল। ‘আমার জরী সোনা কথা শিখছে নাকি, পরী?’

‘হুঁ। মা বলতে পারে। আর পাখি দেখলে বলে, ফা ফা।’

আনিস হো হো করে হেসে উঠল— যেন ভীষণ একটা হাসির কথা। হাসি থামলে বলল, ‘আমার জরী তোমার চেয়েও সুন্দর হবে। তাই না পরী?’

‘আমি আবার সুন্দর নাকি?’

‘না, তুমি ভীষণ বিগ্রী।’

আনিস আবার হেসে উঠল। তার একটু পরেই বাইরে কাক ডাকতে লাগল। আনিসের বাবার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল— ‘ও আনিস, ও আনিস।’

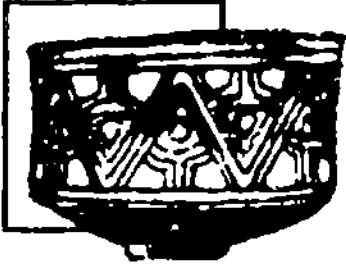
‘জি আব্বা।’

‘এখন রওনা না দিলে ট্রেন ধরতে পারবি না বাবা।’

আনিস টুকুনকে গুইয়ে দিল বিছানায়। পরী কোনো কথা বলল না। আনিস বাইরে বেরিয়ে দেখল চাঁদ হেলে পড়েছে। জ্যোৎস্না ফিকে হয়ে এসেছে। বিদায়ের আয়োজন শুরু হলো। ঘুমন্ত বুনুকে আবার ঘুম থেকে টেনে তোলা হলো। সে হঠাৎ ফলে ফেলল, ‘ভাবী আজ বিয়ের শাড়ি পরেছে কেন?’

কেউ তার কথার কোনো জবাব দিল না। মানুষের সুখ-দুঃখের সাথি আকাশের চাঁদ। পরীকে অহেতুক লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্যেই হয়তো একখণ্ড বিশাল মেঘের আড়ালে তার সকল জ্যোৎস্না লুকিয়ে ফেলল।

লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল আনিস। শেষ রাতের ট্রেনটা যেন কিছুতেই মিস না হয়।



কৃষ্ণপক্ষ

হানিফ দাঁড়িয়ে আছে জারুল গাছের নিচে।

জায়গাটা বেশ সুবিধাজনক, গাছ-গাছড়ায় ঝুপড়ির মতো হয়ে আছে—দূর থেকে তাকে দেখার উপায় নেই। টর্চের আলো ফেললেও বোঝা যাবে না। কিছু-কিছু বে-আক্কেল লোক টর্চের আলো রাস্তায় ফেলার বদলে আশপাশের ঝোপঝাড়ো ফেলে। তবে আশার কথা হলো, টর্চওয়ালা লোক এই অঞ্চলে নেই বললেই হয়। যে দু' একজন আছে তারা ব্যাটারি বাঁচানোর জন্যে খুট করে খানিকটা আলো ফেলেই টর্চ নিভিয়ে ফেলে।

ভাদ্র মাস।

তালপাকা গরম পড়েছে। হানিফের গায়ে মার্কিন কাপড়ের মোটা পাঞ্জাবি। গা অসম্ভব ঘামছে। অবিশ্যি এই রকম অবস্থায় সব সময় তাঁর গা ঘামে। মাঘ মাস হলেও ঘামতো। বড় ধরনের কোনো কাজের আগে আগে তার এমন হয়। মানুষ মারা সহজ কোনো কাজ না। বড় কাজ।

হানিফ দাঁড়িয়ে আছে নওমার্ঘঞ্জের মুনশি রইসুদ্দিন নামের একজন লোককে খুন করার জন্যে। মুনশি রইসুদ্দিনকে সে চেনে না। লোকটা ভালো কি মন্দ তাও জানে না। তবে মন্দ হবারই সম্ভাবনা। ভালো নির্বিরোধী কোনো মানুষকে কেউ খুন করতে চায় না।

অবিশ্যি লোকটি ভালো হলেও কিছু যায় আসে না। কাজটা করে দিলে হানিফ পাঁচ হাজার টাকা পাবে—এটাই আসল কথা। পাঁচ হাজারের মধ্যে এক হাজার তাকে দেয়া হয়েছে। বাকি চার হাজার কাজ শেষ হলে পাওয়া যাবে। আজ কাজ শেষ হলে আজ রাতেই। এইসব ব্যাপারে টাকাপয়সা নিয়ে কেউ ঝামেলা করে না। মাঝে মাঝে বেশিও পাওয়া যায়।

তিন বছর আগে এই রকম একটা কাজের জন্যে দুই হাজার টাকা বেশি পাওয়া গেল। ছ' হাজারের চুক্তি হয়েছিল। পুরো টাকাটা পাওয়ার পর হানিফ বলল, 'বকশিশ দেবেন না?' মোবারক শাহ নামের আধবুড়ো মানুষটা অতি দ্রুত মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'অবশ্যই দিব।' তৎক্ষণাৎ দু' হাজার টাকা দিয়ে ক্ষীণ গলায় বলল, 'আপনে খুশি তো?'

এই একটা মজার ব্যাপার—কাজ শেষ হবার পর তাকে আপনি আপনি করে বলা হয়। এর আগে ভুমি। হানিফের ধারণা ভয়ের চোটে আপনি বলে।

হানিফ মোবারক শাহ নামের বুড়ো লোকটাকে বলেছিল, ‘আমি বসতেছি। কাজ ঠিকমতো সমাধান হয়েছে কি-না খোঁজ নিয়ে আসেন, তারপর যাব।’

মোবারক শাহ চমকে উঠে বলেছিল, ‘তার দরকার হবে না। আপনার কথা ষোল আনা বিশ্বাস করতেছি। আপনার বসতে হবে না, আপনি যান।’

‘একটু বসি। এক কাপ চা খাই।’

মোবারক শাহ ফ্যাকাশে মুখে বলেছে, চায়ের আয়োজন বাড়িতে নাই। আপনে দোকানে গিয়া চা খান। ভাংতি টাকা দিতাছি। এই বলে পাঁচ টাকার ময়লা একটা নোট বের করে দিল। হানিফ নোটটা পকেটে রাখতে রাখতে মনে-মনে হেসেছে। লোকটার ভয় দেখতে মজা লাগছে, হারামজাদা, মানুষ মারবার সময় খেয়াল ছিল না?

‘আপনে তা হইলে এখন যান। বেশিক্ষণ থাকা ঠিক না।’

হানিফ উদাস গলায় বলল, ‘কোনো অসুবিধা নাই।’

‘আপনে হইলেন বিদেশী লোক, আপনারে সন্দেহ করব।’

‘আরে না, কী সন্দেহ করব? এত বড় গঞ্জ, বিদেশী লোক তো থাকবই। এক গ্লাস পানি দিতে বলেন।’

‘পানি দিতেছি। পানি খেয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান।’

পানি খাওয়ার পরও হানিফ যায় না। জর্দা দিয়ে পান খেতে চায়। পান মুখে দিয়ে বিড়ি ধরায়। উদাস ভসিঙে টানতে থাকে।

আসলে কাজ শেষ হবার পরপরই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে তার ইচ্ছা করে না। বড়ই ক্লান্ত লাগে। ঘুম পায়। তা ছাড়া এইসব ঘটনার পর কি সব কথাবার্তা রটে সেইগুলিও শুনতে ইচ্ছা করে। থানা থেকে পুলিশ সাহেব এসে চারদিকে মিথ্যা আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে। একে ধমকায়, তাকে ধমকায়—এইগুলি দেখতে ভালো লাগে। পুলিশ সাহেব মুখে দুঃখ এবং রাগ রাগ ভাব ফুটাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। পুলিশ সাহেবের মুখ দেখেই মনে হয় তিনি গভীর আনন্দ বোধ করছেন। খুন-খারাবি মানেই তাঁদের পকেটে কিছু কাঁচা পয়সা। কাজেই এইসব ঘটনায় তাঁরা আনন্দিতই হবেন, এটাই স্বাভাবিক। খুব কম করে হলেও দশ-বারো জনকে ধরে হাজতে পুরে দিবেন। এদের ছাড়াতে টাকা লাগবে। খুনীর শত্রুদের টাকা দিতে হবে। যে খুন হয়েছে তার আত্মীয়-স্বজনদেরও টাকা খরচ করতে হবে। টাকারই খেলা।

পায়ের কাছে মড়মড় শব্দ হলো। হানিফ চমকে খানিকটা সরে গেল। সাপ-খোপ হতে পারে। ভাদ্র মাস হলো সাপের মাস। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গর্ত ছেড়ে বের হয়। হানিফের সঙ্গে একটা টর্চ আছে। আলো ফেলে দেখবে না-কি ব্যাপারটা

কী? না, সেটা ঠিক হবে না। আশপাশে কেউ নেই। টর্চ জ্বালালেও কোনো ক্ষতি হবে না, তবু সাবধান থাকা ভালো। পায়ে ঝাঁঝি ধরে গেছে। কতক্ষণ ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে তা নিজে ধরতে পারছে না। মাঝে মাঝে মনে হয় সময় কাটছেই না, আবার মাঝে মাঝে মনে হয় অতি দ্রুত কেটে যাচ্ছে।

হানিফ বসল।

হাতের আঙুলে আগুন আড়াল করে সিগারেট ধরাল। পকেটে দশটা সিগারেট নিয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। এখন সিগারেট আছে তিনটা। সাতটা এর মধ্যেই খাওয়া হয়ে গেছে। এর থেকে মনে হচ্ছে রাত কম হয়নি। হানিফ রুমাল দিয়ে ঘাম মুছল। অন্য সময়ে এতটা ঘামে না। আজ বড় বেশি ঘামছে। মুখের ভেতরটাও নোনতা লাগছে। মানুষের মুখের ভেতরেও কি ঘাম হয়? মনে হয়, হয়। না হলে মুখের ভেতর নোনতা লাগত না।

ঘুটঘুটে অন্ধকার।

কৃষ্ণপক্ষের রাত, অন্ধকার হবেই। আকাশে মেঘ থাকায় নক্ষত্রের আলোও নেই। খুন করার জন্যে সময়টা ভালো না। এই কৃষ্ণ অন্ধকার রাতে ভুল-ভ্রান্তি হয়। ভুল লোক মারা পড়ে। চাঁদনি রাতে হলে ভুল-ভ্রান্তি হয় না। কে আসছে দূর থেকে। দেখা যায়। সবচে' ভালো হয় দিনের বেলা। তবে এই জাতীয় কাজ-কর্ম দিনের আলোয় হয় না বললেই হয়।

কৃষ্ণপক্ষে কাজ করতে হবে বলেই হানিফ গত কাল সন্ধ্যায় দুই ব্যাটারির এই টর্চ লাইটটা কিনেছে। কাজ করার আগে মুখে আলো ফেলে দেখে নিতে হবে লোক ঠিক আছে কিনা। একবার আলো ফেললেই চিনতে পারবে। আলো না-ফেলে হাঁটা দেখেও চিনতে পারবে—লোকটা হাঁটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ডান পায়ে কোনো দোষ-টোষ মনে হয় আছে।

লোকটাকে সে যাতে চট করে চিনতে পারে সেই উদ্দেশ্যে গত কাল তার সঙ্গে আলাপও করেছে। লোকটা প্রতিদিন ভোর আটটার ট্রেনে মোহনগঞ্জ থেকে যায় বারহাটা, ফিরে রাত দশটার ট্রেনে। দলিল লেখকরা সাধারণত হতদরিদ্র হয়, এ সেই শ্রেণীর না। এর পয়সা-কড়ি ভালো আছে। বাড়িতে টিনের বড় বড় দুটো ঘর। বাংলাঘরের পশ্চিমদিকে টিউবওয়েল। লম্বা বাঁশের আগায় এন্টেনা দেখে বোঝা যায় টেলিভিশন আছে। নিশ্চয়ই ব্যাটারিতে চালায়। এই অঞ্চলে এখনো ইলেকট্রিসিটি আসেনি। ব্যাটারিতে টিভি চালানো খরচান্ত ব্যাপার। তবে লোকটা কঞ্জুষ ধরনের। গত কাল সকালে কিছুক্ষণ সঙ্গে থাকায় তার স্বভাবচরিত্র পরিষ্কার বোঝা গেছে। হানিফ ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। মোহনগঞ্জ রেলস্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যাবে, এতে চেহারটা মনে গাথা হয়ে যাবে। অন্ধকারেও চিনতে অসুবিধা হবে না।

লোকটা মাটির দিকে তাকিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে ডিসটিঙ্ট বোর্ডের সড়কে উঠে এল। হানিফ সঙ্গে সঙ্গে বলল, ভাইজানের সঙ্গে ম্যাচবাক্স আছে? একটা সিগারেট ধরাব। রইসুদ্দিন সরু চোখে তাকাল। নিতান্ত অনিচ্ছায় দেয়াশলাই-এর বাক্স বের করল। হানিফ তার সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল। হাসি মুখে বলল, 'নেন ভাইজান, আপনেও একটা ধরান।' লোকটা তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। নিতান্ত অপরিচিত একজন মানুষের কাছ থেকে সিগারেট নিতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বা দ্বিধা দেখাল না। কণ্ডুস প্রকৃতির লোকজনের এই হচ্ছে লক্ষণ। যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে নেয়া।

হানিফ বলল, 'ইস্টিশানের দিকে যান না-কি ভাইজান?'

'হুঁ।'

'আমি একজন চাউলের পাইকার। চাউল কিনতে আসছিলাম, দরে বনল না। এই দিকে চাউলের দর বেশি।'

'হুঁ।'

লোকটা সব কথার জবাব এক অক্ষরে দিচ্ছে। কণ্ডুস ধরনের মানুষদের এটাও এক ধরনের আচরণ। মুখের কথাও তাদের কাছে টাকাপয়সার মতো। সহজে খরচ করতে চায় না। লোকটা বাজারে ঢোকার মুখে এক খিলি পান কিনল। হানিফ সঙ্গে আছে। একবার জিজ্ঞেস করল না পান খাবে কি-না।

অথচ কিছুক্ষণ আগেই তার কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে বিনা দ্বিধায় খেয়েছে। আশ্চর্য লোক।

হানিফ দুপুরের দিকে রইসুদ্দিনের বাড়িতে গিয়েও উপস্থিত হলো। এটা তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। কাজকর্ম করার আগে ঐ বাড়িতে একবার যাবেই। রইসুদ্দিনের বাড়িঘর তার পছন্দ হলো। হিন্দু বাড়ির মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়ি। ফুটফুটে একটা সবুজ জামা-পরা মেয়ে বাংলাঘরের উঠোন ঝাট দিচ্ছে। হানিফ মধুর গলায় বলল, 'ও মা তুমি এই বাড়ির?'

'হুঁ।'

'আমার জন্যে গেলাসে কইরা পানি আন তো, তিয়াস লাগছে।'

মেয়েটি ভিতরে চলে গেল। কেমন হেলতে-দুলতে যাচ্ছে। দেখতে ভালো লাগছে। পাঁচ ছয় বছর বয়স হবে, কিন্তু পরিষ্কার কাজকর্ম। কী সুন্দর করে উঠোন ঝাট দিচ্ছে! মেয়েটি ফিরে এল খালি হাতে। চিকন সুরে বলল, 'চাপকল থাইক্যা পানি খাইতে কইছে।'

'আচ্ছা আচ্ছা। তুমি চাপ কলে চাপ দেও আমি পানি খাই।'

মেয়েটি খুব উৎসাহের সঙ্গে কলে চাপ দিয়ে পানি বের করল। মনে হলো সে পানি বের করার কাজটায় খুব মজা পায়।

'তোমার নাম কী গো?'

‘ময়না ।’

‘বড় ভালো নাম—ময়না । রইসুদ্দিন সাব তোমার কে হয়?’

‘বাজান হয় ।’

‘আচ্ছা আচ্ছা ভালো ।’

হানিফের একটু মন খারাপ হলো । ঘটনা ঘটে গেলে এই মেয়ে নিশ্চয়ই ডাক ছেড়ে কাঁদবে । কাঁদলেও কিছু করার নেই । ঘটনা সে না ঘটালে অন্য কেউ ঘটাবে । ব্যাপার একই । মাঝখান থেকে এতগুলি টাকা হাতছাড়া হবে । টাকার খুবই দরকার । হাত এখন একেবারে খালি । তার বৌ খানিকটা শৌখিন ধরনের মেয়ে, অভাব সহ্য করতে পারে না । একবেলা উপোস দিলেই চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলে । ছেলেমেয়েগুলোকে ধরে ধরে পিটায় । সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করতে করতে বলে—‘সর, সর ।’

টাকাটা পাওয়া গেলে মাস ছয়েকের জন্যে নিশ্চিত শ্যামগঞ্জ বাজারের মেয়ে মানুষটার কাছেও তাহলে ইজ্জত নিয়ে যাওয়া যাবে । মেয়ে মানুষটা বড় তুচ্ছ করছে । গত মাসে একবার গিয়েছিল, দরজা ধরে কঠিন গলায় বলল, ‘আইজ জান গিয়া, ঘরে লোক আছে ।’

হানিফ আবার সিগারেট ধরাল । আর একটা মাত্র বাকি আছে । শেষ সিগারেটটা ধরানো যাবে না । কাজের শেষে একটা সিগারেট ধরতেই হয় । টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে । সিগারেটের আগুন খুব সাবধানে বৃষ্টির ফোঁটা থেকে আড়াল করে রাখতে হচ্ছে । বৃষ্টির ফোঁটায় আগুন নিভে গেলে সিগারেট আর ধরানো যাবে না । রাতের ট্রেন আসতে আজ এত দেরি করছে কেন কে জানে । লোকাল ট্রেনগুলির আসা-যাওয়ার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই । খুব বেশি দেরি করলে রইসুদ্দিন নামের রোগ কঞ্জুষ লোকটা হয়তো আসবেই না । বারহাটায় আত্মীয় বাড়িতে থেকো যাবে । আরো একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে । এইসব কাজে অপেক্ষার যন্ত্রণা বড় যন্ত্রণা । একবার এই রকম একটা কাজে এগারো দিন অপেক্ষা করা লাগল । লোকটাকে কিছুতেই একা পাওয়া যায় না । সঙ্গে সব সময় একজন না একজন থাকে । অতি সাবধানী লোক । এত সাবধান হয়েও অবিশ্যি শেষ রক্ষা হয়নি । কপালে মরণ লেখা থাকলে সাবধান হয়েও লাভ হয় না । লখিন্দর লোহার ঘর বানিয়েও বাঁচতে পারেনি ।

এই লোক অবিশ্যি সাবধানী না । একা একাই ঘোরাফেরা করে । তার এত বড় একজন শত্রু আছে তা বোধহয় জানেও না । না জানাই ভালো । জানলে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় । মৃত্যুভয় নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো । তা ছাড়া মরাটা ভয়াবহ কিছু না । একদিন না একদিন সবাইকেই মরতে হবে ।

রোগে ভুগে বিছানায় শুয়ে কাতরাতে কাতরাতে মরার চেয়ে এইভাবে মরে যাওয়া ভালো। কষ্ট অনেক কম। মৃত্যুর পর শহীদের দরজা পাওয়ারও একটা সম্ভাবনা থাকে। অপঘাতে মৃত্যু হলে শহীদের দরজা পাওয়া যায়— মৌলানা সাহেব একবার ওয়াজে বলেছিলেন। অপঘাতে মৃত্যু আর পেটের অসুখে মৃত্যু- এই দুয়ের জন্যে আছে শহীদের দরজা। মৌলানা সাহেবদের সব কথা কেন জানি বিশ্বাস হতে চায় না। পেটের অসুখে মৃত্যু হলে শহীদের দরজা পাওয়া যাবে কী জন্যে? কারণটা কী? সত্যি হলে অবিশ্যি ভালোই হয়। তাহলে বড় মেয়েটা শহীদের দরজা পায়। মেয়েটা মারা গেল পেটের ব্যথায়। কোনো চিকিৎসা করাতে পারেনি। কী চিকিৎসা করাবে, হাতে নাই একটা পয়সা। মেয়েটা ছটফট করেছে আর বলেছে— বাজান, আমারে ডাক্তারের কাছে লইয়া যাও।

হানিফ নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার সাহেব গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, ‘পেট কাটা লাগবে। তিন হাজার টাকা খরচ হবে কমসে কম। আছে টাকা? না থাকলে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি কর দে।’

হানিফ তাও পারেনি। মেয়েটা কোলের উপর ছটফট করতে করতে মরল। বড় মেয়েটার মৃত্যুর পর মানুষ মারার প্রথম কাজটা হানিফ করে। যে মানুষটাকে প্রথম মারে তার নাম ছিল দবীর। মরার সময় সেও অবিকল তার মেয়ের মতো ছটফট করতে করতে হানিফকে বলল, ‘আফসোস আমারে ডাক্তারের কাছে লইয়া যান।’

কী আশ্চর্য কথা! যে তার পেটে ছোঁরা বসিয়েছে তাকেই অনুরোধ করছে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। মৃত্যুর সময় মানুষ অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করে। কেন করে কে জানে? একবার এক লোকের পেটে ছোঁরা বসাবার পর দু’হাতে পেট চেপে বসে পড়তে পড়তে খুবই অবাক-হওয়া গলায় জিজ্ঞেস করেছিল— ‘ভাইজন আপনের নাম কী?’

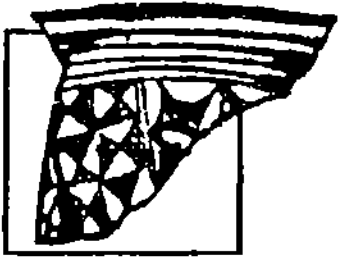
মৃত্যুর সময় মানুষের মাথায় বোধহয় কিছু-একটা হয়। সব গোলমাল হয়ে যায়। তার বড় মেয়েরও তাই হয়েছিল। মৃত্যুর ঠিক আগে আগে সে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল— ‘বাজান, আপনি হাসতাহেন ক্যান। কী হইছে?’

হানিফ তখন হাসছিল না। চিৎকার করে কাঁদছিল। সেই কান্না মৃত্যুর সময় মেয়েটার কাছে হাসি হয়ে ধরা পড়ল।

পিঁপড়া কামড়াচ্ছে।

রাতে পিঁপড়া কামড়ায় না, কিন্তু এখন কামড়াচ্ছে কেন কে জানে? হানিফ ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে এল। প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল রইসুদ্দিন আসছে। পা টেনে টেনে আসছে।

হানিফ ছোট নিশ্বাস ফেলল। শেষ সিগারেটটা রয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা ধরানো যাবে। তবে দিয়াশলাই ভিজে গেছে। ভেজা দিয়াশলাই দিয়ে এ সিগারেট ধরানো সমস্যা হতে পারে, এই নিয়েই সে খানিকটা চিন্তিত এবং বিষণ্ণ।



ছায়াসঙ্গী

প্রতিবছর শীতের ছুটির সময় ভাবি কিছুদিন গ্রামে ফেরিয়ে আসব। দলবল নিয়ে যাব- হইচই করা যাবে। আমার বাচ্চারা কখনো গ্রাম দেখেনি— তারা খুশি হবে। পুকুরে ঝাপাঝাপি করতে পারবে। শাপলা ফুল শুধু যে মতিঝিলের সামনেই ফোটে না, অন্যান্য জায়গাতেও ফোটে তাও স্বচক্ষে দেখবে।

আমার বেশির ভাগ পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারি না। এটা কেমন করে জানি লেগে গেল। একদিন সত্যি সত্যি রওনা হলাম।

আমাদের গ্রামটাকে অজপাড়া বলাতেও সম্মান দেখানো হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন সুন্দর সময়েও সেখানে পৌঁছতে হয় গরুর গাড়িতে। বর্ষার সময় নৌকা। তবে মাঝখানে একটা হাওড় পরে বলে সেই যাত্রা অগস্ত্যযাত্রার মতো।

অনেকদিন পর গ্রামে গিয়ে ভালো লাগল। দেখলাম আমার বাচ্চাদের আনন্দ বর্ধনের সব ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে। কোথেকে যেন একটা হাড় জিরজিরে বেতো ঘোড়া যোগাড় করা হয়েছে। এই ঘোড়া নড়াচড়া করে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। খুব বেশি বিরক্ত হলে দীর্ঘনিশ্বাসের মতো একটা শব্দ করে এবং লেজটা নাড়ে। বাচ্চারা এত বড় একটা জীবন্ত খেলনা পেয়ে মহাখুশি, দু'তিনজন একসঙ্গে ঘোড়ার পিটে উঠে বসে থাকে।

তাদের অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবও জুটে গেল। যেখানেই যায় তাদের সঙ্গে গোটা পঞ্চাশেক ছেলেপুলে থাকে। আমার বাচ্চারা যা করে তাতেই তারা চমৎকৃত হয়। আমার বাচ্চারা তাদের বিপুল জনপ্রিয়তায় অভিভূত। তারা তাদের যাবতীয় প্রতিভা দেখাতে শুরু করল— কেউ কবিতা বলছে, কেউ গান, কেউ ছড়া।

আমি একগাদা বই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার পরিকল্পনা— পুরোপুরি বিশ্রাম নেয়া। শুয়ে-বসে বই পড়া, খুব বেশি ইচ্ছা করলে খাতা-কলম

নিয়ে বসা। একটা উপন্যাস অর্ধেকের মতো লিখেছিলাম, বাকিটা কিছুতেই লিখতে ইচ্ছা করছিল না। পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। নতুন পরিবেশে যদি লিখতে ইচ্ছা করে।

প্রথম কিছুদিন বই বা লেখা কোনোটাই নিয়ে বসা গেল না। সারাক্ষণই লোকজন আসছে। তারা অত্যন্ত গম্ভীর গলায় নানা জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনায় উৎসাহী। এসেই বলবে— ‘দেশের অবস্থাটা কী কন দেহি ছোড় মিয়া। বড়ই চিন্তাযুক্ত আছি। দেশের হইলডা কী? কী দেশ ছিল আর কী হইল!’

দিন চার-পাঁচকের পর সবাই বুঝে গেল দেশ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। গল্প-গুজবও তেমন করতে পারি না। তারা আমাকে রেহাই দিল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। গ্রামের নতুন পরিবেশের কারণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক আমি লেখালেখির প্রবল আগ্রহ বোধ করলাম। অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসলাম, সারা দিন লেখালেখি কাটাকুটি করি। সন্ধ্যায় স্ত্রীকে সঙ্গে করে বেড়াতে বের হই। চমৎকার লাগে। প্রায় রাতেই একজন দু'জন করে ‘গাতক’ আসে। এরা জ্যোৎস্নাভেজা উঠোনে বসে চমৎকার গান ধরে—

“ও মনা

এই কথাটা না জানলে প্রাণে বাঁচতাম না।

না না না— আমি প্রাণে বাঁচতাম না।”

সময়টা বড় চমৎকার কাটতে লাগল। লেখার ব্যাপারে আগ্রহ বাড়তেই লাগল। সারা দিনই লিখি।

এক দুপুরের কথা একসময়ে লিখছি। জানালার ওপাশে খুট করে শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখি খালি পায়ে রোগামতো দশ-এগারো বছরের একটা ছেলে গভীর আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে আগেও দেখেছি। জানালার ওপাশ থেকে গভীর কৌতূহলে সে আমাকে দেখে। চোখে চোখ পড়লেই পালিয়ে যায়। আজ পালাল না।

আমি বললাম, ‘কী রে?’

সে মাথাটা চট করে নামিয়ে ফেলল।

আমি বললাম, ‘চলে গেলি নাকি?’

ও আড়াল থেকে বলল, ‘না।’

‘নাম কী রে তোর?’

‘মন্তাজ মিয়া।’

‘আয়, ভেতরে আয়।’

‘না।’

আর কোনো কথাবার্তা হলো না। আমি লেখায় ডুবে গেলাম। ঘুঘু ডাকা শ্রান্ত দুপুরে লেখালেখির আনন্দই অন্য রকম। মস্তাজ মিয়ার কথা ভুলে গেলাম।

পরদিন আবার একই ব্যাপার। জানালার ওপাশে মস্তাজ মিয়া বড় বড় কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, ‘কী ব্যাপার মস্তাজ মিয়া? আয় ভেতরে।’

সে ভেতরে ঢুকল।

আমি বললাম, ‘থাকিস কোথায়?’

উত্তরে পোকা খাওয়া দাঁত বের করে হাসল।

‘স্কুলে যাস না?’

আবার হাসি। আমি খাতা থেকে একটা সাদা কাগজ ছিঁড়ে তার হাতে দিলাম। সে তার এই বিরল সৌভাগ্যে অভিভূত হয়ে গেল। কী করবে বুঝতে পারছে না! কাগজটার গন্ধ শুকল। গালের উপর খানিকক্ষণ চেপে ধরে রেখে উল্কার বেগে বেরিয়ে গেল।

রাতে খেতে খেতে আমার ছোট চাচা বললেন, ‘মস্তাজ হারামজাদা তোমার কাছে নাকি আসে? আসলে একটা চড় দিয়ে বিদায় করবে।’

‘কেন?’

‘বিরাত চোর। যাই দেখে তুলে নিয়ে যায়। ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিবে না। দুইদিন পরপর মার খায়। তাতেও চুপ করে না। তোমার এখানে এসে করে কী?’

‘কিছু করে না?’

‘চুরির সন্ধানে আছে। কে জানে এর মধ্যে হয়তো তোমার কলম-টলম নিয়ে নিয়েছে।’

‘না কিছু নেয়নি।’

‘ভালো করে খুঁজে-টুজে দেখ। কিছুই বলা যায় না। ঐ ছেলের ঘটনা আছে।’

‘কী ঘটনা?’

‘আছে অনেক ঘটনা। বলব এক সময়।’

পরদিন সকালে যথারীতি লেখালেখি শুরু করেছি। হইচই শুনে বের হয়ে এলাম। অবাক হয়ে দেখি মস্তাজ মিয়াকে তিনচারজন চ্যাংদোলা করে নিয়ে এসেছে। ছেলেটা ফুঁপাচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে প্রচণ্ড মার খেয়েছে। ঠোট ফেটে রক্ত পড়ছে। একদিকের গাল ফুলে আছে। আমি বললাম, ‘কী ব্যাপার?’

শান্তিদাতাদের একজন বলল, ‘দেখেন তো এই কলমটা আপনার কি-না। মস্তাজ হারামজাদার হাতে ছিল।’

দেখলাম কলমটা আমারই। চার-পাঁচ টাকা দামের বল পয়েন্ট। এমন কোনো মহার্ঘ বস্তু নয়। আমার কাছে চাইলেই দিয়ে দিতাম। চুরি করার প্রয়োজন ছিল না। মনটা একটু খারাপই হলো। বাচ্চা বয়সে ছেলেটা এমন চুরি শিখল কেন? বড় হয়ে এ করবে কি!

‘ভাইসাব, কলমটা আপনার?’

‘হ্যাঁ। তবে আমি এটা ওকে দিয়ে দিয়েছি। ছেড়ে দিন। বাচ্চা ছেলে, এত মারধর করেছেন কেন? মারধর করার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবেন না?’

শান্তিদাতা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, ‘এই মাইরে ওর কিছু হয় না। এইডা এর কাছে পানিভাত। মাইর না খাইলে এর ভাত হজম হয় না।’

মন্তাজ মিয়া বিস্মিত চোখে আমাকে দেখছে। তাকে দেখেই মনে হলো সে তার ক্ষুদ্র জীবনে এই প্রথমে একজনকে দেখছে যে চুরি করার পরও তাকে চোর বলেনি। মন্তাজ মিয়া নিঃশব্দে বাকি দিনটা জানালাব পাশে বসে রইল। অন্যদিন তার সঙ্গে দু’-একটা কথাবার্তা বলি। আজ একটা কথাও বলা হলো না। মেজাজ খারাপ হয়েছিল। এই বয়সে একটা ছেলে চুরি শিখবে কেন?

মন্তাজ মিয়ার যে একটা বিশেষ ঘটনা আছে তা জানলাম আমার ছোট চাচীর কাছে। চুরির ঘটনারও দু’দিন পর। গ্রামের মানুষদের এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কোন ঘটনা যে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা তুচ্ছ তা এরা বুঝতে পারে না। মন্তাজ মিয়ার জীবনের এত বড় একটা ব্যাপার কেউ আমাকে এতদিন বলেনি অথচ তুচ্ছ সব বিষয় অনেকবার করে শোনা হয়ে গেছে।

মন্তাজ মিয়ার ঘটনাটা এই—

তিন বছর আগে কৃত্তিক মাসের মাঝামাঝি মন্তাজ মিয়া দুপুরে প্রবল জ্বর নিয়ে বাড়ি ফেরে। সেই জ্বরের প্রকোপ এতই বেশি যে শেষ পর্যন্ত মন্তাজ মিয়ার হতদরিদ্র বাবা একজন ডাক্তারও নিয়ে এলেন। ডাক্তার আনার কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্তাজ মিয়া মারা গেল। গ্রামে জন্ম এবং মৃত্যু দুটোই বেশ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়। মন্তাজ মিয়ার মা কিছুক্ষণ চিৎকার করে কাঁদল। তার বাবাও খানিকক্ষণ— ‘আমার পুত কই গেল রে’ বলে টেঁচিয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল। বেঁচে থাকার প্রবল সংগ্রামে তাদের লেগে থাকতে হয়। পুত্রশোকে কাতর হলে চলে না।

মরা মানুষ যত তাড়াতাড়ি কবর দিয়ে দেয়া হয় ততই নাকি সোয়াব এবং কবর দিতে হয় দিনের আলো থাকতে থাকতে। কাজেই জুম্মা ঘরের পাশে বাদ আসর মন্তাজ মিয়ার কবর হয়ে গেল। সবকিছুই খুব স্বাভাবিকভাবে।

অস্বাভাবিক ব্যাপারটা শুরু হলো দুপুর রাতের পর। যখন মন্তাজ মিয়ার বড় বোন রহিমা কলমাকান্দা থেকে উপস্থিত হলো। কমলাকান্দা এখান থেকে একুশ মাইল। এই দীর্ঘ পথ একটি গর্ভবতী মহিলা পায়ে হেঁটে চলে এল এবং বাড়িতে পা দিয়েই চৈঁচিয়ে বলল, ‘তোমরা করছ কী? মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে। কবর খুঁইড়া তারে বাইর কর। দিরং করবা না।’

বলাই বাহুল্য, কেউ তাকে পাত্তা দিল না। শোকে-দুঃখে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। কবর দিয়ে দেয়ার পর নিকট আত্মীয়-স্বজনরা সব সময় বলে— ‘ও মরে নাই।’ কিন্তু মন্তাজ মিয়ার বোন রহিমা এই ব্যাপারটা নিয়ে এতই হইচই শুরু করল যে সবাই বাধ্য হলো মৌলানা সাহেবকে ডেকে আনতে।

রহিমা মৌলানা সাহেবের পায়ে গিয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, ‘মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে— আপনে এরে বাঁচান। আপনে না বললে কবর খুঁড়ত না। আপনে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি পাও ছাড়তাম না।’ মৌলানা সাহেব অনেক চেষ্টা করেও রহিমাকে ঝেঁড়ে ফেলতে পারলেন না। রহিমা বজ্র আঁটুনিতে পা ধরে বসে রইল।

মৌলানা সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘বাঁইচ্যা আছে বুঝলা ক্যামনে?’

রহিমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, ‘আমি জানি।’

গ্রামের মৌলানারা অতি কঠিন হৃদয়ের হয় বলে আমাদের একটা ধারণা আছে। এই ধারণা সত্যি নয়। মৌলানা সাহেব বললেন, ‘প্রয়োজনে কবর দ্বিতীয়বার খোঁড়া জায়েজ আছে। এই মেয়ের মনের শান্তির জন্যে এটা করা যায়। হাদিস শরিফে আছে...

কবর খোঁড়া হলো।

ভয়াবহ দৃশ্য

মন্তাজ মিয়া কবরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে। হঠাৎ চোখে প্রবল আলো পড়ায় চোখ মেলতে পারছে না। কাফনের কাপড়ের একখণ্ড লুঙ্গির মতো পেঁচিয়ে পরা। অন্য দুটি খণ্ড সুন্দর করে ভাঁজ করা।

অসংখ্য মানুষ জমা হয়ে আছে। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে কারো মুখে কোনো কথা সরল না। মৌলানা সাহেব বললেন, ‘কী রে মন্তাজ?’

মন্তাজ মৃদু স্বরে বলল, ‘পানির পিয়াস লাগছে।’

মৌলানা সাহেব হাত বাড়িয়ে তাকে কবর থেকে তুললেন।

এই হচ্ছে মন্তাজ মিয়ার গল্প। আমি আমার এই জীবনে অদ্ভুত গল্প অনেক শুনেছি। এ-রকম কখনো শুনিনি।

ছোট চাচাকে বললাম, ‘মন্তাজ তারপর কিছু বলেনি? অন্ধকার কবরে জ্ঞান ফিরবার পর কী কী দেখল না দেখল এইসব?’

ছোট চাচা বললেন, ‘না। কিছু কয় না। হারামজাদা বিরাট বজ্জাত।’

‘জিজ্ঞেস করেননি কিছু?’

‘কত জনে কত জিজ্ঞেস করছে। এক সাংবাদিকও আসছিল। ছবি তুলল। কত কথা জিজ্ঞেস করল— একটা শব্দ করে না। হারামজাদা বদের হাড়ি।’

আমি বললাম, কবর থেকে ফিরে এসেছে— লোকজন তাকে ভয়-টয় পেত না?

‘প্রথম প্রথম পাইত। তারপর আর না। আল্লাহতায়ালার কুদরত। আল্লাহতায়ালার কেরামতি আমরা সামান্য মানুষ কি বুঝব কও?’

‘তা তো বটেই। আপনারা তার বোন রহিমাকে জিজ্ঞেস করেননি সে কী করে বুঝতে পারল মন্তাজ বেঁচে আছে?’

‘জিজ্ঞেস করার কিছু নাই। এইটাও তোমার আল্লাহর কুদরত। উনার কেরামতি।’

ধর্ম-কর্ম করুক বা না করুক, গ্রামের মানুষদের আল্লাহতায়ালার ‘কুদরত এবং কেরামতির’ উপর অসীম ভক্তি। গ্রামের মানুষদের চরিত্রে চমৎকার সব দিক আছে। অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এরা প্রচুর মাতামাতি করে, আবার অনেক বড় বড় ঘটনা হজম করে। দার্শনিকের মতো গলায় বলে— ‘আল্লাহর কুদরত’।

আমি ছোট চাচাকে বললাম, রহিমাকে একটু খবর দিয়ে আনানো যায় না?’

ছোট চাচা বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘কেন?’

‘কথা বলতাম।’

‘খবর দেওয়ার দরকার নাই। এম্মেই আসব।’

‘এম্মিতে আসবে কেন?’

ছোট চাচা বললেন, ‘তুমি পুলাপান নিয়া আসছ। চাইরদিকে খবর গেছে। এই গ্রামের যত মেয়ের বিয়া হইছে সব অখন নাইওর আসব। এইটাই নিয়ম। আমি অবাকই হলাম। সত্যি সত্যি এটাই নাকি নিয়ম। গ্রামের কোনো বিশিষ্ট মানুষ আসা উপলক্ষে গ্রামের সব মেয়েরা নাইওর আসবে। বাপের দেশে আসার এটা তাদের একটা সুযোগ। এই সুযোগ তারা নষ্ট করবে না।’

আমি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেউ কি এসেছে?’

‘আসব না মানে? গেরামের একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে না?’

আমি ছোট চাচাকে বললাম, ‘আমাদের উপলক্ষে যে সব মেয়েরা নাইওর আসবে তাদের প্রত্যেককে যেন একটা করে দামি শাড়ি উপহার হিসেবে দেয়া হয়। একদিন খুব যত্ন করে দাওয়াত খাওয়ানো হয়।’

ছোট চাচা এটা পছন্দ করলেন না। তবে তাঁর রাজি না হয়েও কোনো উপায় ছিল না। আমাদের জমিজমা তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখল করছেন।

গ্রামের নিয়মমতো একসময় রহিমাও এল। সঙ্গে চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। হতদরিদ্র অবস্থা। স্বামীর বাড়ি থেকে সে আমার জন্যে দুটো ডালিম নিয়ে এসেছে।

আমার স্ত্রী তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াল। খাওয়ার শেষে তাকে শাড়িটি দেয়া হলো। মেয়েটি অভিভূত হয়ে গেল। একরকম একটা উপহার বোধহয় তার কল্পাতেও ছিল না। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। আমি তাকে আমার ঘরে ডেকে নিলাম। কোমল গলায় বললাম, ‘কেমন আছ রহিমা?’

রহিমা ফিসফিস করে বলল, ‘ভালো আছি ভাইজান।’

‘শাড়ি পছন্দ হয়েছে?’

‘পছন্দ হইব না, কী যে কন ভাইজান! অত দামি জিনিস কী আমরা কোনো দিন চউকে দেখছি!’

‘তোমার ভাইয়ের ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছিলাম। তুমি কী করে বুঝলে ভাই বেঁচে আছে?’

রহিমা অনেকটা চুপ করে থেকে বলল, ‘কী কইরা বুঝলাম আমি নিজেও জানি না ভাইজান। মৃত্যুর খবর শুইন্যা। দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসছি। বাড়ির উঠানে পাও দিতেই মনে হইল মস্তাজ বইচ্যা আছে।’

‘কী জন্যে মনে হলো?’

‘জানি না ভাইজান। মনে হইল।’

‘এই রকম কি তোমার আগেও হয়েছে? মানে কোনো ঘটনা আগে থেকেই কি তুমি বলতে পার?’

‘জি-না।’

‘মস্তাজ তোমাকে কিছু বলেনি? জ্ঞান ফিরলে সে কী দেখল বা তার কী মনে হলো?’

‘জি-না।’

‘জিজ্ঞেস করনি?’

‘করছি। হারামজাদা কথা কয় না।’

রহিমা আরো খানিকক্ষণ বসে পান-টান খেয়ে চলে গেল।

আমার টানা লেখালেখিতে ছেদ পড়ল। কিছুতেই আর লিখতে পারি না। সব সময় মনে হয় বাচ্চা একটি ছেলে কবরের বিকট অন্ধকারে জেগে উঠে কী ভাবল? কী সে দেখল? তখন তার মনের অনুভূতি কেমন ছিল?

মস্তাজ মিয়াকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, আবার মনে হয়— জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে না। সব সময় মনে হয় বাচ্চা একটি ছেলেকে ভয়স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়াটা অন্যায় কাজ। এই ছেলে নিশ্চয়ই প্রাণপণে এটা ভুলতে চেষ্টা করছে। ভুলতে চেষ্টা করছে বলেই কাউকে কিছু বলতে চায় না। তবু একদিন কৌতূহলের হাতে পরাজিত হলাম।

দুপুরবেলা।

গল্পের বই নিয়ে বসেছি। পাড়া গাঁর ঝিম ধরা দুপুর। একটু যেন ঘুমঘুম আসছে। জানালার বাইরে খুঁট করে শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখি মস্তাজ। আমি বললাম, ‘কী খবর মস্তাজ?’

‘ভালো।’

‘বোন আছে না চলে গেছে?’

‘গেছে গা।’

‘আয় ভেতরে আয়।’

মস্তাজ ভেতরে চলে এল। আমার সঙ্গে তার ব্যবহার এখন বেশ স্বাভাবিক। প্রায়ই খানিকটা গল্প-গুজব হয়। মনে হয় আমাকে সে খানিকটা পছন্দ করে। এইসব ছেলেরা ভালোবাসার খুব কণ্ডালি হয়। অল্প কিছু মিষ্টি কথা, সামান্য একটু আদর— এতেই তারা অভিভূত হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে বলে আমার ধারণা।

মস্তাজ এসে খাটের এক প্রান্তে বসল। আড়ে আড়ে আমাকে দেখতে লাগল। আমি বললাম, ‘তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলি, কেমন?’

‘আইচ্ছা।’

‘ঠিকমতো জবাব দিবি তো?’

‘হু।’

‘আচ্ছা মস্তাজ, কবরে তুই জেগে উঠেছিলি, মনে আছে?’

‘আছে।’

‘যখন জেগে উঠলি তখন ভয় পেয়েছিলি?’

‘না।’

‘না কেন?’

মস্তাজ চুপ করে রইল। আমার দিক থেকে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। আমি বললাম, ‘কী দেখলি— চারদিকে অন্ধকার?’

‘হ।’

‘কেমন অন্ধকার?’

মন্তাজ এবারো জবাব দিল না। মনে হচ্ছে সে বিরক্ত হচ্ছে।

আমি বললাম, ‘কবর তো খুব অন্ধকার তবু ভয় লাগল না?’

মন্তাজ নিচু স্বরে বলল, ‘আরেকজন আমার সাথে আছিল, সেই জন্যে ভয় লাগে নাই।’

আমি চমকে উঠে বললাম, ‘আরেকজন ছিল মানে? আরেকজন কে ছিল?’

‘চিনি না। আন্ধাইরে কিছু দেখা যায় না।’

‘ছেলে না মেয়ে?’

‘জানি না।’

‘সে কী করল?’

‘আমারে আদর করল। আর কইল কোনো ভয় নাই।’

‘কীভাবে আদর করল?’

‘মনে নাই।’

‘কী কী কথা সে বলল?’

‘মজার মজার কথা— খালি হাসি আসে।’

বলতে বলতে মন্তাজ মিয়া ফিক করে হেসে ফেলল।

আমি বললাম, ‘কী রকম মজার কথা? দু’-একটা বল তো শুনি?’

‘মনে নাই।’

‘কিছুই মনে নাই। সে কে—এটা কী বলেছে?’

‘জি-না।’

‘ভালো করে ভেবে-টেবে বল তো—কোনোকিছু কি মনে পড়ে?’

‘উনার গায়ে শ্যাঙলার মতো গন্ধ ছিল।’

‘আর কিছু?’

মন্তাজ মিয়া চুপ করে রইল।

আমি বললাম, ‘ভালো করে ভেবে-টেবে বল তো। কিছুই মনে নেই?’

মন্তাজ মিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ‘একটা কথা মনে আসছে।’

‘সেটা কী?’

‘বলতাম না। কথাটা গোপন।’

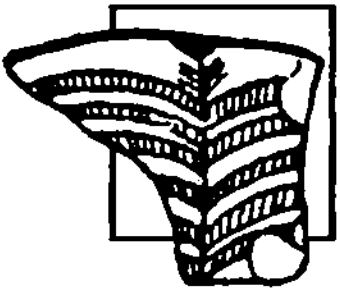
‘বলবি না কেন?’

মন্তাজ জবাব দিল না।

আমি আবার বললাম, ‘বল মন্তাজ, আমার খুব শুনতে ইচ্ছা করছে। মন্তাজ উঠে চলে গেল।’

এই তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। বাকি যে ক'দিন গ্রামে ছিলাম সে কোনোদিন আমার কাছে আসেনি। লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছি তবু আসেনি। কয়েক বার নিজেই গেলাম। দূর থেকে দেখতে পেয়ে সে পালিয়ে গেল। আমি আর চেষ্টা করলাম না।

কিছু রহস্য সে তার নিজের কাছে রাখতে চায়। রাখুক। এটা তার অধিকার। এই অধিকার অনেক কষ্টে সে অর্জন করেছে। শ্যাওলা-গন্ধী সেই ছায়াসঙ্গীর কথা আমরা যদি কিছু নাও জানি তাতেও কিছু যাবে আসবে না।



জলিল সাহেবের পিটিশন

তিনি হাসি মুখে বললেন, 'আমি দু'জন শাহীদ মুক্তিযোদ্ধার বাবা। সেভেন্টি ওয়ানে আমার দু'টি ছেলে মারা গেছেন।'

আমি অবাক হয়ে তাকলাম। ভদ্রলোকের চেহারা বিশেষত্বহীন। বয়স প্রায় ষাটের কোঠায়। সে তুলনায় বেশ শক্ত-সমর্থ। বসেছেন মেরুদণ্ড সোজা করে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। চশমা-টশমা নেই। তার মানে চোখে ভালোই দেখতে পান। আমি বললাম, 'আমার কাছে কী ব্যাপারে?' ভদ্রলোক যেভাবে বসে ছিলেন সেভাবেই বসে রইলেন। সহজ সুরে বললেন, 'একজনের ডেড-বডি পেয়েছিলাম। মালিবাগে কবর দিয়েছি। আমার ছোট মেয়ের বাড়ি আছে মালিবাগে।'

'তাই নাকি?'

'জি। মালিবাগ চৌধুরী পাড়া।'

'আমার কাছে কেন এসেছেন?'

'গল্পগুজব করতে আসলাম। নতুন এসেছেন এ পাড়ায়। খোঁজখবর করা দরকার। আপনি আমার প্রতিবেশী।'

ভদ্রলোক হাসিমুখে বসে রইলেন। আমার সন্দেহ হলো, তিনি হয়তো সত্যি সত্যি হাসছেন না। তাঁর মুখের কাটাটাই হাসি হাসি। ভদ্রলোক শান্ত স্বরে বললেন, 'আমি আপনার পাশের গলিতেই থাকি।'

‘তাই বুঝি?’

‘জি। ১৩/২, বাসার সামনে একটা নারিকেল গাছ আছে দেখছেন তো?’

আমি দেখিনি। তবু মাথা নাড়লাম। ভদ্রলোকের চরিত্র স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। সম্ভবত অবসর জীবনযাপন করছেন। কিছু করবার নেই। সময় কাটানোটাই বোধহয় তার এখন একমাত্র সমস্যা। যার জন্যে ছুটির দিনে প্রতিবেশী খুঁজতে হয়।

‘আমার নাম আবদুল জলিল।’

আমি নিজের নাম বলতে গেলাম, ভদ্রলোক বলতে দিলেন না। উঁচু গলায় বললেন, ‘চিনি। আপনাকে চিনি।’

‘চা খাবেন? চায়ের কথা বলি?’

‘জি-না। আমি চা খাই না। চা সিগারেট কিছুই খাই না। নেশার মধ্যে পান খাই।’

‘পান তো দিতে পারব না, এখানে কেউ পান খায় না।’

‘পান আমার সঙ্গেই থাকে।’

ভদ্রলোক কাঁধের ঝোলাতে হাত ঢুকিয়ে পানের কৌটা বার করলেন। বেশ বাহারী কৌটা। টিফিন কেরিয়ারের মতো তিন-চক্ৰিটা আলাদা বাটি আছে। আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করলাম। ভদ্রলোক লম্বা পরিকল্পনা নিয়ে এসেছেন। সারা সকালটা হয়তো এখানে কাটাবেন। নিজের ছেলে দুটির কথা ইনি-বিনি-বলবেন। দুঃখ-কষ্টের গল্প অন্যকে শোনাতে সবাই খুব পছন্দ করে। ভদ্রলোক একটু ঝুঁকে এসে বললেন, ‘প্রফেসর সাহেব, আপনি কি একটা পান খাবেন?’

‘জি-না।’

‘পান কিন্তু শরীরের জন্যে ভালো। পিঁতু ঠাণ্ডা রাখে। যারা পান খায় তাদের পিঁতু দোষ হয় না।’

‘তাই নাকি?’

‘জি। পানের রস আর মধু হলো গিয়ে পিঁতুর খুব বড় ওষুধ।’

আমি ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে দশটা। আজ ইউনিভার্সিটি নেই। থাকলে সুবিধা হতো। বলা যেত— কিছু মনে করবেন না। এগারোটোর সময় একটা ক্লাস আছে। আপনি অন্য আরেক দিন সময় হাতে নিয়ে আসুন। ছুটির দিনে এ-রকম কিছু বলা যায় না।

ভদ্রলোক তাঁর পানের কৌটা খুলে নানানরকম মশলা বের করলেন। প্রতিটি মশলা গুঁকে গুঁকে দেখলেন। পান বানালেন অত্যন্ত যত্নে। যিনি পান বানানোর মতো তুচ্ছ ব্যাপারে এতটা সময় নষ্ট করেন তিনি যে আজ দুপুরে আগে নড়বেন

না তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু আশ্চর্য! ভদ্রলোক পান মুখে দিয়েই উঠে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে বললেন, ‘যাই, আমি অনেকটা সময় নষ্ট করলাম।’

বিস্ময় সামলে আমি আন্তরিকভাবেই বললাম, ‘বসুন, এত তাড়া কীসের?’

তিনি বসলেন না। আমি তাঁকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ফেরার পথে দেখি, বাড়িওয়ালা বারান্দায় ক্রু কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, ‘প্রফেসর সাহেবকে ধরেছে বুঝি? সিগনেচার করেছেন?’

‘কী সিগনেচার?’

‘জলিল সাহেবের পিটিশনে সিগনেচার করেননি?’

‘পিটিশনটা কীসের?’

‘আমাকে বলতে হবে না। নিজেই টের পাবেন। হাড় ভাজা-ভাজা করে দিবে। কোনো প্রশ্ন দিবেন না।’

অস্পষ্ট একটা অস্বস্তি নিয়ে ঘরে ফিরলাম। নতুন পায়ের আসার অনেক বিরক্তিকর ব্যাপার আছে। নতুন নতুন মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। সে পরিচয় অনেক সময়ই সুখকর হয় না। তবে জলিল সাহেব প্রসঙ্গে ভয়টা বোধহয় অমূলক। এরপর তাঁর সঙ্গে দু’বার দেখা হলো। বেশ সহজ স্বাভাবিক মানুষ। একবার দেখা গ্রীন ফার্মেসীর সামনে। তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, ‘প্রফেসর সাহেব না? ভালো আছেন?’

‘জি ভালো। আপনি ভালো আছেন? কই আর তো এলেন না।’

‘সময় পাই না। খুব ব্যস্ত। পিটিশনটার ব্যাপারে।’

আমি আর কথা বাড়ালো না। ক্লাসের দোহাই দিয়ে রিকশায় উঠে পড়লাম। দ্বিতীয়বার দেখা হলো নিউ মার্কেটের একটা নিউজ স্ট্যান্ডের সামনে। দেখি, তিনি উবু হয়ে বসে একটির পর একটি পত্রিকা দ্রুত পড়ে শেষ করছেন। হকার ছেলেটি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁকে দেখছে।

‘কি জলিল সাহেব, কী পড়ছেন এত মন দিয়ে?’

জলিল সাহেব আমার দিকে তাকালেন। মনে হলো ঠিক চিনতে পারলেন না। তাঁর চোখে চশমা।

‘চশমা নিয়েছেন নাকি?’

‘জি। সন্ধ্যা হলে মাথা ধরে। প্লাস পাওয়ার। ভালো আছেন প্রফেসর সাহেব?’

‘জি ভালো।’

‘যাব একদিন আপনার বাসায়। পিটিশনটা দেখাব আপনাকে। চৌদ্দ হাজার তিনশ সিগনেচার যোগাড় হয়েছে।’

‘কীসের পিটিশন?’

‘পড়লেই বুঝবেন। আপনারা জ্ঞানী-গুণী মানুষ। আপনাদের বুঝতে কষ্ট হবে না।’

আমার ধারণা ছিল সরকারের কাছে কোনো সাহায্য-টাহায্য চেয়ে পিটিশন করা হয়েছে। সেখানে চৌদ্দ হাজার সিগনেচারের ব্যাপারটা বোঝা গেল না। আমি নিজে থেকেও কোনো আশ্রয় দেখালাম না। জগতে অসুস্থ মানুষের সংখ্যা কম নয়। সিগনেচার সংগ্রহ করা যদি তাঁর নেশা হয়, তা নিয়ে আমার উদ্বেগ হবার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু উদ্বেগ হতে হলো। জলিল সাহেব এক সন্ধ্যায় তাঁর চৌদ্দ হাজার তিনশ সিগনেচারের ফাইল-পত্র নিয়ে আমার বাসায় উপস্থিত হলেন। হাসি হাসি মুখে বললেন, ‘ভালো করে পড়েন প্রফেসর সাহেব।’

আমি পড়লাম। পিটিশনের বিষয়বস্তু হচ্ছে— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দশ লাখ ইহুদি মারা গিয়েছিল। সেই অপরাধে অপরাধীদের প্রত্যেকের বিচার করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। কিন্তু এ দেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষ মেরে অপরাধীরা কি করে পার পেয়ে গেল? কেন এ নিয়ে আজ কেউ কোনো কথা বলছে না? জলিল সাহেব তাঁর দীর্ঘ পিটিশনে সরকারের কাছে আবেদন করেছেন যেন এদের বিচার করা হয়।

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, ‘আমার দুটি ছেলে মারা গেছে, সেই জন্যেই যে আমি এটা করছি তা ঠিক না। আমার ছেলে মারা গেছে যুদ্ধে। ওদের মৃত্যুর জন্যে আমি কোনো বিচার চাই না। আমি বিচার চাই তাদের জন্যে যাদের ওরা মরার থেকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছে। আমার কথা বুঝতে পারছেন?’

‘পারছি।’

‘জানি পারবেন। আপনি জ্ঞানী-গুণী মানুষ। অনেকেই পারে না। বুঝলেন ভাই অনেকে মানবতার দোহাই দেয়। বলে, বাদ দেন। ক্ষমা করে দেন। ক্ষমা এত সস্তা? এঁ্যা, বলেন সস্তা?’

আমি কিছু বললাম না। জলিল সাহেব পানের কৌটা বের করে পান সাজাতে বসলেন। শান্ত স্বরে বললেন, ‘আপনি কি মনে করছেন আমি ছেড়ে দেব? ছাড়ব না। আমার দুই ছেলে ফাইট দিয়েছে। আমিও দেব। মৃত্যু পর্যন্ত ফাইট দেব। দরকার হলে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের সিগনেচার যোগাড় করব। ত্রিশ লক্ষ লোক মারা গেল আর কেউ কোনো শব্দ করল না? আমরা মানুষ না অন্য কিছু বলেন দেখি?’

আমি সিগনেচার ফাইল উল্টে দেখতে লাগলাম। খুব গোছানো কাজ-কর্ম। সিগনেচারের পাশে বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা। স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত আত্মীয়-স্বজনের নাম-ধাম।

‘অনেকেই মনে করে আমার মাথার ঠিক নাই। এক পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলাম। সম্পাদক সাহেব দেখাই করলেন না। ছোকরা মতো একটা ছেলে বলল, কেন পুরানা কাঁসুন্দি ঘাটছেন? বাদ দেন ভাই। আমি তার দাদার বয়সি লোক আমাকে বলে ভাই।’

‘আপনি কী বললেন?’

‘আমি বললাম, তুমি চাও না এদের বিচার হোক?’

‘ছেলেটি কিছু বলে না। সরাসরি না বলারও সাহস নাই। অথচ এইসব ছেলেরা কত সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। করে নাই?’

‘জি করেছে।’

‘আপনার বাড়িওয়ালার কথাই ধরেন। তাঁর এক শালাকে ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে। অথচ এই লোক সিগনেচার করেনি। ত্রিশ লাখ লোক মরে গেল। কোনো বিচার হলো না। মনে হলেই বুকের মধ্যে চিন্চিন্ ব্যথা হয়।’

আমি অত্যন্ত অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভদ্রলোক দ্বিতীয় একটি পান মুখে পুরে বললেন, সরকারি লোকজনদের সঙ্গে দেখা করেছি। তারা আমি কী বলতে চাই সেটাই ভালো করে শুনতে চায় না। একজন আমাকে বলল, ‘আপনি একটা পরিত্যক্ত বাড়ির জন্যে দরখাস্ত করেন। আপনার দুটি ছেলে মারা গেছে। বাড়ি পাওয়ার হক আছে আপনার।’

‘আপনি কী বললেন?’

‘আমি আবার বলব কী? বাড়ির জন্যে আমি পিটিশন করছি নাকি? বাড়ি দিয়ে আমি করবটা কি? আমার দুই ছেলের জীবন কি এত সস্তা? একটা বাড়ি দিয়ে দাম দিতে চায়? কতবড় স্পর্ধা চিন্তা করেন। আমি চাই একটা বিচার হবে। বিচার চাই। আর কিছুই না। সভ্য সমাজের নিয়মমতো বিচার হবে। বুঝলেন?’

‘জি বুঝলাম।’

‘আপনারা জ্ঞানী-গুণী মানুষ। আপনাদের বুঝাতে কষ্ট হয় না। অন্যেরা বুঝতে চায় না। একেকটা সিগনেচারের জন্যে তিনবার করে যেতে হয়। তাতে অসুবিধা নাই। আমি ছাড়বার লোক না।’

আমার সিগনেচার নিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন। তারপর অনেকদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না। একটা কৌতূহল জেগে রইল। রাস্তাঘাটে দেখা হলে জিজ্ঞেস করেছি, কি ভাই কতদূর করলেন?

‘চালিয়ে যাচ্ছি প্রফেসর সাহেব। দোয়া রাখবেন।’

‘লোকজন দস্তখত দিচ্ছে তো?’

‘সবাই দেয় না। ভয় পায়।’

‘কীসের ভয়?’

‘ভয়ের কি কোনো মা-বাপ আছে? ভয় পাওয়া যাদের স্বভাব তারা ভয় পাবেই। বুঝলেন না? আমি আছি লেগে। আদালতে হাজির করে ছাড়ব। কি বলেন প্রফেসর সাব?’

‘তা তো ঠিকই।’

‘ডিস্ট্রিক্ট ভাগ করে ফেলছি। এখন সব ডিস্ট্রিক্টে যাব। কষ্ট হবে। উপায় তো নাই। আপনি কি বলেন?’

‘ভালোই তো।’

‘তা ছাড়া শুধু দস্তখত যোগাড় করলেও হবে না। কেইস চালানোর মতো এভিডেন্স থাকতে হবে। বিনা কারণে নিরপরাধ লোকজন ধরে ধরে মেরেছে—এটা প্রমাণ করতে হবে না? ওরা ঘাণ্ড ঘাণ্ড সব ‘ল’ইয়ার’ দেবে। না?’

‘তা তো করবেনই। আপনি তো অন্ধ না। অন্যায়টা বুঝতে পারছেন। বেশির ভাগ লোকই পারে না। মূর্খের দেশ।’

অনেকদিন আর জলিল সাহেবের দেখা পাই না। হয়তো সত্যি সত্যি জেলায় জেলায় ঘুড়ে বেড়াতে শুরু করেছেন। বগলে ভারী ভারী ফাইল। দস্তখতের সংখ্যা হয়তো বাড়ছে। বারো হাজার থেকে পঁচাত্তর হাজার। পনেরো থেকে বিশ। এমনকি সত্যি হতে পারে যে চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখ দস্তখত যোগাড় করে ফেলবেন তিনি। পঞ্চাশ লাখ লোকের দাবি অত্যন্ত জোরালো দাবি।

বর্ষার শুরুতে খবর পেলাম জলিল সাহেব অসুখে পড়েছেন। হাঁপানী, সঙ্গে সঙ্গে রিউমেটিক ফিভার। বাড়িওয়ালা বললেন, ‘পাগল মানুষ। শরীরের যত্ন তো কোনোদিন করে নাই। এ যাত্রা চিকিৎসা না।’

‘বলেন কি!’

‘হ্যাঁ।’ গ্রীন ফার্মেসির ডাক্তার সাহেব বললেন, ‘আমি নিজেও গিয়েছিলাম দেখতে।’

‘অবস্থা কি বেশি খারাপ?’

‘বর্ষাটা টিকে কিনা সন্দেহ।’

‘বলেন কি!’

‘খুবই খারাপ অবস্থা।’

বর্ষাটা অবিশ্যি টিকে গেলেন। ফাইলপত্র বগলে নিয়ে আবার ঘুরতে বেরুলেন। আমার সঙ্গে দেখা হলো এক দুপুরে। আমি চিনতেই পারি না এমন অবস্থা। তিনি এগিয়ে এলেন, ‘প্রফেসর সাহেব না?’

‘আরে কি ব্যাপার ভাই? এ-কী অবস্থা আপনার!’

‘বাঁচব না বেশি দিন।’

‘না বাঁচলে চলবে? এত বড় একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন।’

‘ঐটার জন্যেই টিকে আছি।’

‘সিগনেচার কতদূর যোগাড় হয়েছে?’

‘পনেরো হাজার। মাসে তিন চারশ’র বেশি পারি না। বয়স হয়েছে তো। তবে ছাড়বার লোক না আমি।’

‘না, ছাড়বেন কেন?’

‘কাঠগড়ায় দাঁড় করাবো শালাদের। ইহুদিরা পেরেছে, আমরা পারব না কেন? কি বলেন?’

‘তা তো ঠিকই।’

‘ত্রিশ লাখ লোক মেরেছে বুঝলেন— একটা দু’টা না। বাংলাদেশের মানুষ সস্তা না। মজা টের পাইয়ে দেব।’

আজিমপুরের ঐ পাড়ায় আমি প্রায় দু’বছর কাটালাম। এই দু’বছরে জলিল সাহেবের সঙ্গে ভালোই ঘনিষ্ঠতা হলো। মাঝে মাঝে যেতাম তাঁর বাসায়। ভদ্রলোকের নিজের বাড়ি। দোতলাটি ভাড়া দিয়েছেন। বাড়ির টাকায় সংসার চলে। স্ত্রী নেই। বড় ছেলের বউ তাঁর সঙ্গে থাকে। ফুটফুটে দুটি মেয়ে আছে সেই বউটির। যমজ মেয়ে বোধ করি। খুব হাসি-খুসি। ভালোই লাগে ও বাড়িতে গেলে। বউটি বেশ যত্ন করে।

পিটিশন সম্পর্কে বাচ্চা দুটির ধারণাও দেখলাম খুব স্পষ্ট। একটি মেয়ে গম্ভীর হয়ে আমাকে বলল, ‘দাদার খাতা লেখা শেষ হলে যারা আমার বাবাকে মেরেছে তাদের বিচার হবে।’

এইটুকু মেয়ে এত সব বোঝার কথা নয়। জলিল সাহেব নিশ্চয়ই ব্যাপারটা ওদের বুঝিয়ে বলেছেন।

ঐ পাড়া ছেড়ে চলে আসার পরও মাঝে-মধ্যে যেতাম। তারপর ধীরে ধীরে যোগাযোগ কমে গেল। এবং একসময় দীর্ঘদিনের জন্যে দেশের বাইরে চলে গেলাম।

যাবার আগে দেখা করতে গিয়েছি। শুনলাম তিনি ফরিদপুরে গিয়েছেন সিগনেচার যোগাড় করতে। কবে ফিরে আসবেন কেউ বলতে পারে না। তাঁর ছেলের বউ অনেক দুঃখ করল। দুঃখ করার সংগত কারণ আছে। একমাত্র পুরুষ যদি ঘর-সংসার ছেড়ে দেয় তাহলে জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে।

বাইরে থাকলে দেশের জন্যে অন্যরকম একটা মমতা হয়। সেই কারণেই বোধহয় জলিল সাহেবের কথা মনে পড়তে লাগল। মনে হতো, ঠিকই তো ত্রিশ লক্ষ লোক হত্যা করে পার পেয়ে যাওয়া উচিত নয়। জলিল সাহেব যা করছেন ঠিকই করেছেন। এটা মধ্যযুগ না। এ যুগে এত বড় অন্যায় সহ্য করা যায় না।

উইক এন্ডগুলিতে বাঙালিরা এসে জড়ো হতো আমার বাসায়। কিছু আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছেলে, মুরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির অঙ্কের প্রফেসর আফসার উদ্দিন সাহেব। সবাই একমত— জলিল সাহেবের প্রজেক্টে সব রকম সাহায্য করতে

হবে। বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে প্রয়োজন হলে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করা হবে। বিদেশী পত্রিকায় জনমতের জন্যে লেখালেখি করা হবে। আমেরিকার ফার্গো শহরে আমরা এক সন্ধ্যাবেলায় ‘আবদুল জলিল সংগ্রাম কমিটি’ গঠন করে ফেললাম। আমি তার আহ্বায়ক। আফসার উদ্দিন সাহেব সভাপতি। বিদেশে বসে দেশের কথা ভাবতে বড় ভালো লাগে। সব সময় ইচ্ছে করে একটা-কিছু করি।

দেশে ফিরলাম ছ’বছর পর।

ঢাকা শহর অনেকখানি বদলে গেলেও জলিল সাহেবের বাড়ির চেহারা বদলায়নি। সেই ভাঙা পালস্তারা উঠা বাড়ি। সেই নারিকেল গাছ। কড়া নাড়তেই চৌদ্দ-পনেরা বছরের ভারি মিষ্টি একটি মেয়ে দরজা খুলে দিল। অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে।

‘তুমি কি জলিল সাহেবের নাতনি?’

‘জি।’

‘তিনি বাড়ি আছেন?’

‘না। দাদু মারা গেছেন দু’বছর আগে।’

‘ও। আমি তোমার দাদার একজন বন্ধু।’

‘আসুন, ভেতরে এসে বসুন।’

আমি বসলাম কিছুক্ষণ। মেয়েটির মার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা ছিল। ভদ্রমহিলা বাসায় ছিলেন না। কখন ফিরবেন তারও ঠিক নেই। উঠে আসবার সময় জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমার দাদু যে মানুষের সিগনেচার যোগাড় করতেন সেই সব আছে?’

‘জি আছে। কেন?’

‘তোমার দাদু যে কাজটি শুরু করেছিলেন সেটা শেষ করা উচিত। তাই না?’

মেয়েটি খুবই অবাক হলো। আমি হাসিমুখে বললাম, ‘আমি আবার আসব, কেমন?’

‘জি আচ্ছা।’

মেয়েটি গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে নরম গলায় বলল, ‘দাদু বলেছিলেন, একদিন কেউ না কেউ এই ফাইল নিতে আসবে।’

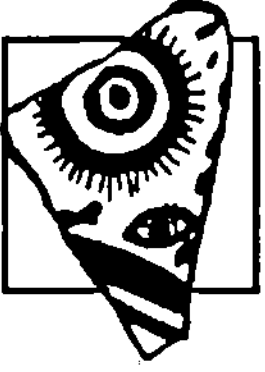
আর যাওয়া হলো না।

উৎসাহ মরে গেল। দেশের এখন নানানরকম সমস্যা। যেখানে-সেখানে বোমা ফাটে। মুখ বন্ধ করে থাকতে হয়। এর মধ্যে পুরানো একটি সমস্যা টেনে আনতে ইচ্ছা করে না।

আমি জলিল সাহেব নই। আমাকে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়। মীরপুরে একটা পরিত্যক্ত বাড়ি কেনার জন্যে নানান ধরনের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। জলিল সাহেবের বত্রিশ হাজার দরখাস্তের ফাইল নিয়ে রাস্তায়

বেরুনোর আমার সময় কোথায়?

জলিল সাহেবের নাতনিটি হয়তো অপেক্ষা করে আমার জন্যে। দাদুর পিটিশনের ফাইলটি ধুলো ঝেড়ে ঠিকঠাক করে রাখে। এই বয়েসি মেয়েরা মানুষের কথা খুব বিশ্বাস করে।



শবযাত্রা # ১

পুরোপুরি নাস্তিক মানুষের সংখ্যা এই পৃথিবীতে খুবই কম। ঘোর নাস্তিক যে মানুষ তাকেও বিশেষ ক্ষেত্রে খুব দুর্বল দেখা যায়। আমি একজন ঘোর নাস্তিককে চিনতাম, তার ঠোঁটে একবার একটা ঘোথের মতো হলো। ডাক্তাররা সন্দেহ করলেন ক্যানসার। সঙ্গে সঙ্গে সেই নাস্তিক পুরোপুরি আস্তিক হয়ে গেলেন। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার জন্যে মসজিদে যান। মালিবাগের পীর সাহেবের মুরিদও হলেন।

বায়োপসির পর ধরা পড়ল যে ঘোথের ধরন খারাপ নয়। লোকালাইজড ঘোথ। ভয়ের কিছুই নেই। অপারেশন করে ফেলে দিলেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আবার নাস্তিক হয়ে পড়লেন। ভয়াবহ ধরনের নাস্তিক। অঙ্ক করে

প্রমাণ করে দিলেন যে ঈশ্বর = 0^2 ও এবং আত্মা = $0^{\frac{3}{2}}$ ।

যাই হোক, মানুষদের চরিত্রের এই দ্বৈত ভাব আমাকে বিস্মিত করে না। প্রচণ্ড রকম ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষের মধ্যেও আমি অবিশ্বাসের বীজ দেখেছি। আমার কাছে এটাই স্বাভাবিক মনে হয়। এর বাইরে কিছু দেখা মানে অস্বাভাবিক কিছু দেখা।

আমি এরকম একজন অস্বাভাবিক চরিত্রের কথা এই গল্পে বলব। চরিত্রের নাম মোতালেব (কাল্পনিক নাম)। বয়স পঞ্চাশ থেকে পাঁচপঞ্চাশ। ভীষণ রোগা এবং প্রায় তালগাছের মতো লম্বা একজন মানুষ। চেইন স্মোকার। মাথায় কিছু অসুবিধা আছে বলেও মনে হয়। নিতান্ত অপরিচিত লোককেও এই ভদ্রলোক শীতল গলায় বলে ফেলতে পারেন— ‘ভাই, কিছু মনে করবেন না। আপনার

কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি একজন মহামূর্খ।’

মোতালেব সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় এক বিয়ে বাড়িতে। সেদিন ঐ বিয়ে বাড়িতে কি একটা সমস্যা হয়েছে— কাজী পাওয়া যাচ্ছে না কিংবা এই জাতীয় কিছু।

বরপক্ষীয় এবং কনেপক্ষীয় লোকজন বিমর্ষ মুখে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে গল্প করছে। আমি একটা দলের সঙ্গে জুটে গেলাম। সেখানে জনৈক অধ্যাপক বিগ বেং এবং এক্সপানডিং ইউনিভার্স সম্পর্কে কথা বলছেন। শ্রোতারা চোখ বড় বড় করে শুনছে। ভদ্রলোক ব্যাক হোল সম্পর্কে কথা বলা শুরু করেছেন তখন একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটল। রোগা এবং লম্বা একজন শুকনো মানুষ বললেন, ‘ভাই কিছু মনে করবেন না, আপনি একজন মহামূর্খ।’

অধ্যাপক ভদ্রলোক নিজেকে সামলাতে কিছু সময় নিলেন। পুরোপুরি সামলাতে পারলেন না— কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ‘আপনি কি আমাকে মহামূর্খ বললেন?’

‘জি।’

‘কেন বললেন জানতে পারি?’

‘অবশ্যই জানতে পারেন। আপনি আপনার বক্তৃতা শুরুই করেছেন ভুল তথ্য দিয়ে— বলছেন ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন ধরা পড়েছে ইনফ্রারেডে। তা পড়ে নি। ধরা পড়েছে মাইক্রোওয়েভে। আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটির একটি স্বীকার্যই হচ্ছে স্পেস এবং টাইমের জন্য বিগ বেং সিংগুলারিটিতে। আপনি বলছেন ভিন্ন কথা। কোনো কিছুই না জেনে একটার সঙ্গে একটি মিলিয়ে কী সব উল্টা-পাল্টা কথা বলছেন!’

অধ্যাপক ভদ্রলোক রাগে তোতলাতে তোতলাতে বললেন, ‘আমি তো ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস দিচ্ছি না... একটু এদিক-ওদিক হতেই পারে।’

‘বিজ্ঞান ঠাকুরমার ঝুলি না যে যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে বলবেন।’

ভদ্রলোক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে অন্যদিকে সরে গেলেন। আমি গেলাম তাঁর পেছনে পেছনে। মজার চরিত্র। কথা বলা দরকার।

যতটুকু মজার চরিত্র ভেবে ভদ্রলোকের কাছে গেলাম, দেখা গেল চরিত্র তারচেয়েও মজার। ভদ্রলোকের বিষয় পদার্থবিদ্যা নয়— সাইকোলজি। পদার্থবিদ্যা হচ্ছে তাঁর শখ। এই শখ মেটানোর জন্যে রীতিমতো শিক্ষক রেখে অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা শিখেছেন।

এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে সহজে বন্ধুত্ব হয় না। আমি লক্ষ করেছি এরা সচরাচর সন্দেহবাতিকণ্ঠ হয়ে থাকে। এই লোকও দেখা গেল সেই রকম। একদিন বেশ বিরক্ত হয়েই বলল, ‘আপনি দেখি মাঝে-মাঝেই আমার কাছে

আসেন। বিষয়টা কী বলেন তো?’

‘বিষয় কিছু না।’

‘বিষয় কিছু না বললে তো হবে না। এ পৃথিবীতে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই হয় না।’

আমি হাসি মুখে বললাম, ‘ক্লাসিক্যাল ম্যাকানিক্স, তাই বলে কিন্তু ভাই মোতালেব সাহেব, হাইজেনবার্গের আনসারটিনিটি প্রিন্সিপ্যাল আপনি ভুলে যাচ্ছেন। একটি বস্তুকে পুরোপুরি আপনি কিন্তু জানেন না। যখন অবস্থান জানেন তখন সঠিক গতি কী তা জানেন না...।’

‘আপনার সঙ্গে কূটতর্কে যেতে চাচ্ছি না— আপনি স্পষ্ট করে বলুন কী জন্যে আমার কাছে আসেন— মদ্য পানের লোভে?’

আমি ঝামেলা এড়াবার জন্যে বললাম, ‘হ্যাঁ।’

‘ভালো কথা। আমার পেছনে অনেকেই ঘুরে এবং তাদের উদ্দেশ্য একটাই— বিনা পয়সায় মদ্যপান। তৃষ্ণার্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি মদ্যপান করতে চায় তবে তা নিজের বাসায় নয় অন্যের বাসায়— যাতে স্ত্রী জানতে না পারে। নিজের পয়সায় না অন্যের পয়সায়, যাতে টাকা-পয়সা খরচ না হয়— অদ্ভুত মধ্যবিত্ত!’

আমি বললাম, ‘আপনি মনে হচ্ছে মধ্যবিত্তদের উপর খুব বিরক্ত।’

‘অফকোর্স বিরক্ত। মধ্যবিত্ত হচ্ছে সমাজের একটা ফাজিল অংশ। আনকট্রোলড গ্রোথ। এই মধ্যবিত্তের প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা হয় কাজিনের কাছে, প্রথম যৌনতার অভিজ্ঞতা হয় বাড়ির কাজের মেয়ের সঙ্গে। প্রথম মদ্যপানের অভিজ্ঞতা হয় অন্যের পয়সায়। এখন বলুন আপনাকে কী দেব? স্কচ ব্রান্ড আছে, জীন আছে, তদকা আছে, কয়েক পদের হুইস্কি আছে। আর আপনার যদি মিক্সড ড্রিংক পছন্দ হয় তাহলে তাও বানিয়ে দেব। You name it, I will make it- হা হা হা।’

‘কিছু মনে করবেন না ভাই। আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম— বিনা পয়সা মদের লোভে না, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার লোভেই আমি আসি।’

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘আমাকে কি ইন্টারেস্টিং কারেক্টার বলে মনে হয়?’

‘হ্যাঁ।’

‘আমি এই নিয়ে তিনবার বিয়ে করেছি— কোনো স্ত্রী আমাকে ইন্টারেস্টিং কারেক্টার বলে মনে করেননি। প্রথমজন অনেক কষ্টে দু’বছরের মতো টিকে ছিল, বাকি দু’জন এক বছরও টিকেনি। হা হা হা।’

‘না টেকায় আপনি মনে হচ্ছে খুশিই হয়েছেন।’

‘হ্যাঁ, হয়েছে। স্ত্রীরা স্বামীদের স্বাধীনতায় হাত দিতে পছন্দ করে। শুধু শুধু নানান বায়ানাক্ক— মদ খেতে পারবে না, রাত জেগে পড়তে পারবে না, জুয়া খেলতে পারবে না। আরে কি মুশকিল, আমার সব কথায় কথা বল কেন? আমি কি তোমার কোনো ব্যাপারে মাথা গলাই? আমি কি বলি— নীল শাড়ি পরতে পারবে না, লাল শাড়ি পরতে হবে। হাই হিল পরতে পারবে না, ফ্ল্যাট স্যান্ডেল পরবে। বলি কখনো? না বলি না। আমি ওদেরকে ওদের মতো থাকতে বলি। আমি নিজে থাকতে চাই আমার মতো। ওরা তা দেবে না।’

‘এই যে এখন একা একা বাস করছেন আপনি কি মনে করেন আপনি সুখী?’

‘হ্যাঁ সুখী, মাঝে মাঝে একটু দুঃখ দুঃখ ভাব চলে আসে। তখন মদ্যপান করি। প্রচুর পরিমাণেই করি। পুরোপুরি মাতাল হতে চেষ্টা করি। পারি না। শরীর যখন আর এলকোহল একসেপ্ট করতে পারে না তখন বমি করে ফেলে দেয় কিন্তু মাতাল হতে দেয় না— কেন দেয় না তারও একটা কারণ আছে।’

‘কী কারণ?’

‘বলব, আরেকদিন বলব। এখন বলেন কী রাখবেন? আজকের আবহাওয়াটা ‘ব্লাডি মেরি’র জন্যে খুব আইডিয়াল। দেখে একটা ব্লাডি মেরি বানিয়ে? জিনিসটা স্বাস্থ্যের জন্যেও ভালো। প্রচুর টম্বোলের রস দেয়া হয়।’

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ভাল্লাই খাতির হলো। মাসে দু’-একবার তাঁর কাছে যাই। বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে কথা হয়। যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, এন্টি ম্যাটার, লাইফ আফটার ডেথ। ভদ্রলোকের নাস্তিকতা দেখার মতো। যা বলবেন— বলবেন। কোথাও সংশয়ের কিছু রাখবেন না। আমার মতো আরো অনেকেই আসে। তবে তাদের মূল আগ্রহ জল-যাত্রায়।

একবার আমাদের আড্ডায় এক ভদ্রলোক একটি ব্যক্তিগত ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এ রকম—

শ্রাবণ মাসে একবার তিনি গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন। বাড়ি স্টেশন থেকে অনেকখানি দূর। সন্ধ্যাবেলা ট্রেন এসে পৌঁছার কথা। পৌঁছতে পৌঁছতে রাত ন’টা বেজে গেল। গ্রামদেশে রাত ন’টা মানে নিশুতি রাত। ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। স্টেশনে একটা লোক নেই। একা একাই রওনা হলাম। কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ দেখি আমার আগে আগে কে যেন সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ কাউকে দেখিনি। এখন এই সাইকেলে করে কে যাচ্ছে? আমি বললাম— ‘কে কে কে?’ কেউ জবাব দিলো না। লোকটা একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে

চিনলাম। যে সাইকেলে বসে আছে তার নাম পরমেশ। আমরা এক সঙ্গে স্কুলে পড়েছি। বছর তিনেক আগে নিউমোনিয়া হয়ে মারা যায়...

গল্পের এই পর্যায়ে মোতালেব সাহেব বাঁজখাই গলায় বললেন, ‘স্টপ। আপনি বলতে চাচ্ছেন— আপনার এক মৃতবন্ধু সাইকেল চালিয়ে আপনার পাশে পাশে যাচ্ছিল?’

‘হ্যাঁ।’

‘মনে হচ্ছে আপনাকে সাহস দেবার জন্যেই সে আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল।’

‘হতে পারে।’

মোতালেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, ‘তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নিলাম যে, আপনার বন্ধু মরে ভূত হয়েছেন। আপনাকে সাহস দেবার জন্যে আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন। এখন সমস্যা হলো— সাইকেল। একটা সাইকেল মরে ‘সাইকেল-ভূত’ হবে না। যদি না হয় তাহলে আপনার মৃতবন্ধু, সাইকেল পেল কোথায়?’

যিনি গল্প করছিলেন তিনি থমকে গেলেন। মোতালেব সাহেব বললেন, ‘স্বীকার করলাম অবশ্যই তর্কের খাতিরে যে মাঝে মাঝে মরে ভূত হতে পারে। তাই বলে কাপড় মরে তো ‘কাপড়-ভূত’ হবে না। আমরা যদি ভূত দেখি তাদের নেংটা দেখা উচিত। ওরা কাপড় পরে কোথায়? সব সময় দেখা যায় ভূত একটা সাদা কাপড় পরে থাকে। এর মানে কী?’

মজার ব্যাপার হচ্ছে— এই যৌর নাস্তিক, প্রচণ্ড যুক্তিবাদী। মানুষের কাছ থেকে আমি অবিশ্বাস্য একটি গল্প শুনি। যেভাবে গল্পটি শুনেছিলাম অবিকল সেইভাবে বলছি। গল্পের শেষে মোতালেব সাহেব কিছু ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অপ্রয়োজন বিধায় সেই ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি না। বৈশাখ মাসের এক ঝড়-বৃষ্টির সন্ধ্যায় মোতালেব সাহেব গল্প শুরু করলেন—

‘এই যে ভাই লেখক, ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতার একটা ঘটনা শুনবেন? একটা কভিশনে ঘটনাটা বলতে পারি। চুপ করে শুনে যাবেন। কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না। এবং ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারবেন না।’

‘বিশ্বাস করলে অসুবিধা কী?’

‘অসুবিধা আছে। আমার মাধ্যমে কোনো অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার প্রচার পাবে তা হয় না। তা হতে দেয়া যায় না। আপনি যদি ধরে নেন এখন যা শুনছেন তা একটা গল্প, মজার গল্প, তা হলেই আপনাকে বলতে পারি।’

‘এই গল্পটি আমি কোথাও ব্যবহার করতে পারি?’

‘পারেন। কারণ গল্প-উপন্যাসকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। সবাই ধরেই নেয় এগুলি বানানো ব্যাপার।’

‘তাহলে বলুন শুন।’

ভদ্রলোক পর পর চার পেগ মদ্যপান করলেন। তাঁর মদ্যপানের ভঙ্গিও অদ্ভুত। অশুধের মেজারিং গ্লাস ভর্তি করে হুইস্কি নেন। এক ফোঁটাও পানি মেশান না। ঢক করে পুরোটা মুখে ফেলে দেন কিন্তু গিলে ফেলেন না। কুলকুচার মতো শব্দ হয়। তারপর এক সময় ঘোঁৎ করে গিলে ফেলে বলেন—
কেন যে মানুষ এই সব ছাইপাশ খায়, বলেই আবার খানিকটা নেন। যাই হোক, ভদ্রলোকের জবানীতে মূল গল্পে যাচ্ছি—

তখন আমার বয়স চব্বিশ। এম.এ. পাশ করেছি। ধারণা ছিল খুব ভালো রেজাল্ট হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচার হিসেবে এন্ট্রি পেয়ে যাব। তা হয়নি। এম.এ.-র রেজাল্ট খুবই খারাপ হলো। কেন হলো তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। পরীক্ষা ভালো দিয়েছি। একটু গুজব শুনতে পাচ্ছি—জমৈক অধ্যাপক রাগ করে আমাকে খুবই কম নম্বর দিয়েছেন। এই গুজব অমূলক নাও হতে পারে। অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো না। দু’একজন আমাকে বেশ পছন্দ করেন। আবার কেউ কেউ আছেন আমার ছাত্রও মন্তব্য করতে পারেন না।

যা বলছিলাম, রেজাল্টের পর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাবা খুব রাগারাগি করলেন। হিন্দি ভাষায় বললেন, ‘নিকালো। আভি নিকালো।’

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, ‘চলে যাচ্ছি। হিন্দি বলার দরকার নেই।’

এই বলেই স্যুটকেস গুছিয়ে বের হয়ে পড়লাম। আমি খুবই স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে। কাজেই খালি হাতে ঘর থেকে বের হলাম না। বেশ কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে বের হলাম। কোথায় যাচ্ছি কাউকে বলে গেলাম না। সঙ্গে একগাদা বই। বিশাল একটা খাতা। এক ডজন বলপয়েন্ট। সেই সময় আমার লেখালেখির বাতীক ছিল। একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস শুরু করেছিলাম। যে উপন্যাসে মূল ডিটেকটিভ খুন করে। ইন্টারেস্টিং গল্প।

যাই হোক, বাড়ি থেকে বের হয়েও খুব-একটা দূরে গেলাম না। একটা হোটেলে ঘর ভাড়া করে রইলাম। দেখি, সেখানে কাজ করার খুব অসুবিধা—সারাক্ষণ হৈচৈ।

কিছু কিছু কামরায় রাত দুপুরে মদ খেয়ে মাতলামিও করে। মেয়েছেলে নিয়ে আসে।

হোটেল ছেড়ে দিয়ে শহরতলীতে একটা বেশ বড় বাড়ি ভাড়া করে বসলাম। এক জজ সাহেব শখ করে বাড়ি বানিয়ে ছিলেন। তার শখ হয়তো এখনো আছে। ছেলেমেয়েদের শখ মিশে গেছে। এ বাড়িতে কেউ আর থাকতে আসে না।

একজন কেয়ারটেকার-কাম-মালি-কাম-দারোয়ান আছে। বাড়ির পুরো দায়িত্ব তার। লোকটিকে দেখে মনে হয় বদলোক। আমাকে যে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে, মনে হচ্ছে, নিজ দায়িত্বেই দিয়েছেন। ভাড়ার টাকা মালিকের কাছে পৌঁছাবে বলে মনে হলো না। ওটা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। পৌঁছলে পৌঁছবে না পৌঁছলে নেই। আমার এক মাস থাকার কথা। সেটা থাকতে পারলেই হলো। নিরিবিলি বাড়ি। আমার খুবই পছন্দ হলো। লেখালেখির জন্যে চমৎকার।

কেয়ারটেকারের নাম ইয়াকুব। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছে। রিপালসিভ ধরনের চেহারা। তবে গলার স্বরটি অতি মধুর। আমি একাই এ বাড়িতে থাকব শুনে সে বিস্মিত গলায় বলল, ‘স্যার কি সত্যি সত্যি একা থাকবেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘বিষয়টা কী?’

‘বিষয় কিছু না। পড়াশোনা করব। লেখালেখি করব।’

‘আর খাওয়া-দাওয়া? হোটেল এখানে পাবেন কোথায়? সেই যদি শহরে যান, পাঁচ মাইলের ধাক্কা।’

‘রান্না করে দেবে এমন কাউকে পাওয়া যায় না? টাকা-পয়সা দেব।’

‘আপনি বললে আমি রাঁধব। খেতে পারবেন কি-না সেটা হলো কথা।’

‘পারব। খাওয়া নিয়ে আমার কোনো খুঁতখুতানি নেই।’

‘আরেকটা জিনিস বলে রাখবেন। মুরগি ছাড়া কিন্তু কিছু পাওয়া যায় না। হাটবারে মাছ-টাছ পাওয়া যায়। হাটবারের দেরি আছে। আর চালটা স্যার একটু মোটা আছে। আপনার নিশ্চয়ই চিকন চাল খেয়ে অভ্যাস।’

‘চিকন চাল খেয়ে অভ্যাস ঠিকই, মোটা চালে অসুবিধা হবে না। তবে ভাত যেন শক্ত না হয়। শক্ত ভাত খেতে পারি না।’

দেখা গেল লোকটি রান্নায় দ্রৌপদী না হলেও তার কাছাকাছি। দুপুরে খুব ভালো খাওয়াল। রাতেও নতুন নতুন পদ করল। আমি বিস্মিত। রাতে খেতে খেতে বললাম, ‘এত ভালো রান্না শিখলে কোথায়?’

ইয়াকুব গম্ভীর মুখে বলল, ‘আমার স্ত্রীর কাছে শিখেছি। খুব ভালো রাঁধতে পারত।’

‘পারত বলছ কেন? এখন কি পারে না?’

ইয়াকুব গম্ভীর হয়ে গেল। ভাবলাম নিশ্চয়ই খুব ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার। এখন আর প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না। তবে সহজেই নিজেকে সামলে নিল। সহজ স্বরে বলল, ‘এখন পারে কি পারে না জানি না স্যার। আমার সঙ্গে থাকে না।’

‘কোথায় থাকে?’

‘জানি না কোথায় থাকে। ওর চরিত্র খারাপ ছিল। এর-তার সাথে যোগাযোগ ছিল। বিশ্রী অবস্থা। বলার মতো না। অনেক দেন-দরবার করেছি। কিছু লাভ হয় নাই। তারপর সাত বছরের দুই মেয়ে ঘরে রেখে পালিয়ে গেছে। বুঝে দেখেন কত বড় হারমী।’

‘কতদিন আগের কথা?’

‘বছর দুই।’

‘কোনো খবর পাওয়া যায়নি?’

‘মোড়লগঞ্জ বাজারে না-কি দেখা গিয়েছিল— আমার কোনো আশ্রয় ছিল না। খোঁজ নেই নাই।’

এদের জীবনের এই জাতীয় কিচ্ছা-কাহিনী শুনতে সাধারণত ভালোই লাগে। আমার লাগল না। আমাদের সবার জীবনেই একান্ত মমস্যা আছে। সেই সব নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। কিন্তু ইয়াকুব মনে হলো কথা বলবেই।

‘জীবনে বড় ভুল কী করেছিলাম জানেন স্যার? সুন্দরী বিয়ে করেছিলাম। ডানাকাটা পরী বিয়ে করেছিলাম।’

‘বউ খুব সুন্দর ছিল?’

‘আগুনের মতো ছিল। আগুন থাকলেই পোকামাকড় আসে। তা-ই হলো। আমার জীবন হলো অতিষ্ঠ। একদিন মোড়লগঞ্জের বাজারে গেছি। ফিরে এসে দেখি সদর দরজা বন্ধ। অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করলাম। কেউ দরজা খোলে না। শেষে ধুপ করে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে কে যেন দৌড় দিল। আমি বউরে বললাম, ‘এ কে?’

বউ বলল, ‘আমি কি জানি কে?’

ইয়াকুব একের পর এক বউয়ের কীর্তিকাহিনী বলতে লাগল। আমি এক সময় বিরক্ত হয়ে বললাম, ‘ঠিক আছে বাদ দাও এসব কথা।’

‘বাদ দিতে চাইলেও বাদ দেয়া যায় না। তিনবার সালিসী বসল। সালিসীতে ঠিক হলো বউরে তালাক দিতে হবে। তালাক দিলাম না। মন মানল না। তার উপর জমজ মেয়ে আছে। এর ফল হইল এই...’

‘স্ত্রী কোথায় আছে তুমি জান না?’

‘জি-না।’

‘মেয়েরা তোমার সঙ্গেই থাকে?’

‘জি।’

‘কী নাম মেয়েদের?’

‘জমজ মেয়ে হয়েছিল জনাব। তুহীন একজনের নাম, তুষার আরেকজনের নাম। নাম রেখেছিল মেয়ের মা।’

‘ভালো, খুব ভালো।’

‘কোনো কিছু দরকার লাগলে এদের বলবেন। মেয়েরা এইখানেই থাকে। ডাক দিলেই আসবে।’

‘না, আমার কিছু লাগবে না।’

‘বিরক্ত করলেও বলবেন। খাবড়া দিয়ে গাল ফাটায়ে দিব। মেয়েগুলি বেশি সুবিধার হয় নাই। মায়ের খাসিলত পেয়েছে। সারাদিন সাজগোজ। এই পায়ে আলতা, এই ঠোটে লিপস্টিক।’

‘স্কুলে পড়ে না?’

‘আরে দূর— পড়াশোনা। এরা যায় আর আসে।’

মেয়ে দু’টিকে আমার অবিশ্যি খুবই পছন্দ হলো। দু’জনই হাস্যমুখ। সারাক্ষণ হাসছে। সব সময় সেজেগুজে আছে। কাজেরও খুব উৎসাহ। যদি বলি, এই এক গ্লাস পানি দাও তো। ওম্নি ছুটে যাবে। দু’জনই দু’হাতের দু’টা পানিভর্তি গ্লাস নিয়ে এসে বলবে, ‘চাচা আমারটা নেন। চাচা, আমরাটা নেন।’ আধগ্লাস পানি খেলেই যেখানে চলত সেখানে বাধা হয়ে দু’ গ্লাস খাই। যাতে মেয়ে দুটোর কোনোটাই কষ্ট না পায়।

স্নেহ নিম্নগামী। যতদিন যেতে লাগল বাচ্চা দু’টিকে আমার ততই পছন্দ হতে লাগল। ছোটখাট কিছু উপহার কিনে দিলাম। দু’জনের জন্যে দু’টা রঙ পেনসিলের সেট, ছোট ছোট আয়না, যা-ই পায় আনন্দে লাফায়। বড় ভালো লাগে দেখতে। ঐ বাড়িতে দেখতে দেখতে এগারো দিন কেটে গেল। বারো দিনের দিন একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনাটা বলার আগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটা বর্ণনা দিয়ে নেই।

আমার বাড়িটা পশ্চিমমুখী। বাড়ির সামনে এবং পেছনে আমন ধানের মাঠ। বাড়ির ওপরে জঙ্গল ধরনের জায়গা। এক সময় নিবিড় বাঁশবন ছিল। এখন পাতলা হয়ে গেছে। দক্ষিণে উকিল বাড়ির বিশাল বাগান। সেই বাগানে আম, জাম, লিচু থেকে শুরু করে আতাফলের গাছ পর্যন্ত আছে। একজন বেঁটেখাট দাড়িওয়ালা মালি সেই বাগান পাহারা দেয়। আমার সঙ্গে দেখা হলেই গভীর বিনয়ের সঙ্গে জানতে চায়, ‘স্যারের শইলডা কি ভালো? ঘুমের কোনো ডিসটার্ব হয় না তো?’

আমি প্রতিবারই বিস্মিত হয়ে বলি, ‘ঘুমের ডিসটার্ব হবে কেন?’

‘শহরের মানুষ হঠাৎ গেরামে আইস্যা পড়লেন। এই জন্যে জিগাই।’

‘আমার ঘুম, খাওয়া-দাওয়া কোনো কিছুতেই কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।’

‘অসুবিধা হইলে কইবেন। ভয়-ডর পাইলে ডাক দিবেন। আমার নাম বদরুল। আমি রাইতে ঘুমাই না। জাগান থাকি।’

‘ঠিক আছে বদরুল। যদি কখনো প্রয়োজন বোধ করি তোমাকে ডাকব।’

এগারো দিনের দিন প্রয়োজন বোধ করলাম। দিনটা সোমবার। সকাল থেকেই মেঘলা ছিল। দুপুর থেকে তুমুল বর্ষণ শুরু হলো। এর মধ্যে ইয়াকুব এসে বলল, ‘স্যার একটা বিরাট সমস্যা। তুহীনের গলা ফুলে কি যেন হয়েছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। ওকে তো স্যার ডাক্তারের কাছ নেয়া দরকার।’

আমি তৎক্ষণাই মেয়েটাকে দেখতে গেলাম। খুবই খারাপ অবস্থা। শুধু গলা না— সমস্ত মুখে ফুলে গেছে। কি কষ্টে যে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সেই জানে। মেয়েটার শরীর এত খারাপ অথচ এরা আমাকে কিছুই বলেনি। আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

আমি বললাম, ‘এক মুহূর্ত দেরী করা ঠিক হবে না। তুমি এক্ষুনি মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।’

‘স্যার, আপনার খাওয়া-দাওয়া...’

‘আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। চাল ফুটিয়ে নিতে পারব। একটা ডিমও ভেজে নেব। তুমি দেরী করবে না।’

আমি ইয়াকুবকে কিছু টাকা দিলাম। সে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দুই মেয়েকে একটা গরুর গাড়িতে তুলে রওনা হয়ে গেল। আমার বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। কেন যেন মনে হলো মেয়েটা বাঁচবে না।

আমি থাকি দোতলার দক্ষিণমুখী একটা ঘরে। ঘরটা বিশাল। দু’দিকে জানালা আছে। আসবাবপত্র বসন্তে পুরানো একটা খাট, খাটের পাশে টেবিল। লেখার টেবিলে হারিকেন ছাড়াও মোমদানে মোমবাতি। লেখালেখির জন্যে শুধু হারিকেনের আলো যথেষ্ট নয় বলেই মোমবাতির ব্যবস্থা।

কেন জানি সন্ধ্যার পর থেকে ভয় ভয় করতে লাগল। বিছানায় বসে লিখছি, হঠাৎ মনে হলো কেউ-একজন দক্ষিণের বারান্দায় নরম পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমি কে কে বলতেই হাঁটার শব্দ থেমে গেল।

আমি দুর্বলচিত্তের মানুষ নই। তবে যে-কোনো সাহসী মানুষও কোনো কারণে বিশাল একটা বাড়িতে একা পড়ে গেলে একটু অন্য রকম বোধ করে। আমার অন্য রকম লাগতে লাগল। সেই অন্য রকমটাও আমি ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারছিলাম না। একবার মনে হচ্ছে পানির পিপাসা হচ্ছে। আবার পর মুহূর্তেই মনে হচ্ছে— না পানির পিপাসা না, অন্য কিছু। অনেক চেষ্টা করেও কিছু লিখতে পারলাম না। লেখার জন্যে মাথা নিচু করতেই মনে হয় দরজার ফাঁক দিয়ে কেউ আমাকে দেখছে। তাকালেই সরে যাচ্ছে। দু’বার আমি বললাম— কে কে? বলেই লজ্জা পেলাম। কে কে বলে চেঁচানোর কোনো মানে হয় না।

এই সময় লক্ষ করলাম হারিকেনের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তেল কমে এসেছে। এফুনি হয়ত দপ্ করে নিভে যাবে। এতে ভয় পাবার ভেমন কোনো কারণ নেই। আরো একটি হারিকেন পাশের ঘরে আছে। সবুজ রঙের বড় একটা বোতলে কেরোসিন তেল থাকে। সেই বোতলটি একতলার রান্না ঘরে। তাছাড়া মোমবাতি তো আছেই।

আমি নিভুনিভু হারিকেন নিয়ে একতলায় নেমে গেলাম। চা বানিয়ে খাব। হারিকেনে তেল ভরব। রাতে খাবার কিছু করা যায় কি-না তাও দেখব।

দেখলাম রাতে খাবার জন্যে চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। ইয়াকুব ভাত রন্ধে রেখে গেছে। কড়াইয়ে ডাল আছে। ডিম আছে। ইচ্ছা করলেই ডিম ভেজে নেয়া যায়।

চা বানিয়ে খেলাম। ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা নিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। বারান্দায় পা দিতেই বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। মনে হলো সবুজ রঙের ডুরে শাড়ি পরা একটি মেয়ে যেন হঠাৎ দ্রুত সরে গেল। মেয়েটার চোখ দু'টি মায়া মায়া। কিন্তু এই অন্ধকারে মেয়েটার চোখ দেখার কথা না। তাহলে আমি এসব কী দেখছি?

বৃষ্টির বেগ খুব বাড়ছে। রীতিমতো ঝড়ো ঝড়িয়া বইছে। আমি আমার ঘরে আগের জায়গায় ফিরে এলাম। জানালা বন্ধ করে দিলাম। শৌ-শৌ শব্দ তবু কমল না।

ঠিক তখন বজ্রপাত হলো। ঝড়ো বজ্রপাত। সাউন্ড ওয়েভের নিজস্ব একটা ধাক্কা আছে। এই ধাক্কায় মোমবাতির কিংবা হারিকেনের শিখা নিভে যায়। টিবিলের উপর হারিকেনের আলো নিভে গেল। হঠাৎ চারদিকে গাঢ় অন্ধকার।

আমি তখন পরিষ্কার শুনলাম মেয়েলী গলায় কেউ-একজন বলছে, 'আপনে বাইরে আসেন।'

আমি চেষ্টা করে বললাম, 'কে?'

সেই আগের কণ্ঠ আবার শোনা গেল, 'ভয় পাইয়েন না। একটু বাইরে আইসা দাঁড়ান।'

অল্প বয়স্ক মেয়ে মানুষের গলা। পরিষ্কার গলা। আমি আবার বললাম, 'কে, তুমি কে?'

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। মনে হলো কেউ যেন ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলল। ঘরের দরজা একটু ফাঁক করল।

আমি উঠে বারান্দায় চলে এলাম। বারান্দায় কেউ নেই। তবু মনে হলো কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। সে চাচ্ছে কিছুটা সময় আমি বারান্দায় থাকি।

ধূপ ধূপ শব্দ আসছে। শব্দ কোথেকে আসছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনে

হচ্ছে কোদাল দিয়ে কেউ মাটি কোপাচ্ছে। এই ঝড়বৃষ্টির রাতে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে কে? আমি বারান্দায় রেলিং-এর দিকে এগিয়ে গেলাম। তখন বিদ্যুৎ চমকালো। বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম দক্ষিণ দিকের বাঁশবনের কাছে কোদাল দিয়ে একজন মাটি কোপাচ্ছে। যে মাটি কোপাচ্ছে সে হলো আমাদের ইয়াকুব।

কিন্তু ইয়াকুব এখানে আসবে কেন। ও তো মেয়ে নিয়ে শহরে গেছে। বিদ্যুৎ চমক দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। এক-একবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর আমি তাকে দেখছি। সে খুব ব্যস্ত হয়ে মাটি কোপাচ্ছে। গভীর গর্ত করছে। সে কি কবর খুঁড়ছে? পাশে কাপড় দিয়ে মোড়া লম্বা এটা কী?

পরিষ্কার কিছু দেখছি না। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তখনই শুধু দেখছি। বুঝতে পারছি এটা বাস্তব কোনো দৃশ্য নয়। এই দৃশ্যের জন্ম আমার চেনাজানা জগতের নয়। অন্য জগতে, অন্য সময়ে।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছি। মুহূর্তখানেক বর্ষণ হচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমি ইয়াকুবকে দেখছি। সে অতি ব্যস্ত, অতি দ্রুত করব খুঁড়ছে। কার কবর? সবুজ কাপড়ে মোড়া একটি মৃতদেহ পাশে রাখা। বৃষ্টির পানিতে তা ভিজছে। এটা তার স্ত্রীর মৃতদেহ? কী আশ্চর্য! হাত পাঁচেক দূরে বাচ্চা দু'টা বসে আছে। এরা এক দৃষ্টিতে মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে আছে।

যে রূপবতী স্ত্রী পালিয়ে যাবার কথা ইয়াকুব বলে, এই কি সেই মেয়ে? এই মেয়েটিকে সেই কি হত্যা করেছিল? হত্যাকাণ্ডটি কোনো-এক বর্ষার রাতে ঘটেছিল? কোনো-এক অস্বাভাবিক উপায়ে সেই মুহূর্তটি কি আবার ফিরে এসেছে? আমি দেখছি। ইন্দ্রিয়ের অতীত কোনো-একটি দৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ধরা পড়ছে আমার কাছে।

আমি আমার এই জীবনে কোনো অতি প্রাকৃতিক বিষয়কে স্থান দেইনি। আজ আমি এটা কী দেখছি?’

ভদ্রলোক এইখানে গল্প শেষ করলেন।

আমি বললাম, ‘তারপর? তারপর কী হলো?’

তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘আপনাকে একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাচ্ছিলাম, বলা হলো। এর আর তারপর বলে কিছু নেই।’

‘আপনি এই দৃশ্যটি দেখলেন, তারপর কী করলেন?’

‘আপনি হলে কী করতেন?’

‘আমি হলে কী করতাম সেটা বাদ দিন। আপনি কী করেছেন সেটা বলুন।’

‘দাঁড়ান, আরো খানিকটা এলকোহল গলায় ঢেলে নেই। তা না হলে বলতে পারব না।’

ভদ্রলোক ঢকঢক করে অকেকখানি কাঁচা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চোখ রক্তবর্ণ হয়ে গেল। তিনি স্থির গলায় বললেন, ‘আমি সেদিন যা করেছিলাম একজন বুদ্ধিমান যুক্তিবাদী মানুষ তাই করবে। আমি ছুটে গিয়েছিলাম সেখানে। প্রচণ্ড ভয়াবহ কোনো ঘটনার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে মানুষের ভয় থাকে না। এক জাতীয় এনজাইম শরীরে চলে আসে। তখন প্রচুর গ্লুকোজ ভাঙতে শুরু করে। মানুষ শারীরিক শক্তি পায়। ভয় কেটে যায়।

আমার কোনো ভয় ছিল না। আমি দ্রুত গেলাম ঐ জায়গায়। কাদায়-পানিতে মাখামাখি হয়ে গেলাম।’

‘তারপর কী দেখলেন?’

‘কী আর দেখব? কিছুই দেখলাম না। আপনি কি ভেবেছেন গিয়ে দেখব ইয়াকুব তার স্ত্রীর ডেডবডি নিয়ে বসে আছে?’

‘না তা ভাবিনি।’

‘নেচার বলুন বা ঈশ্বর বলুন বা প্রকৃতি বলুন — এরা কোনো রকম অস্বাভাবিকতা সহ্য করে না। এই জিনিসটি খেয়াল রাখবেন। কাজেই আমি কিছুই দেখলাম না। বৃষ্টিতে ভিজলাম, কাদায় মাখামাখি হলাম। আমার জেদ চেপে গেল। পাশের বাগানে মালিকে ডেকে এনে সেই রাতেই জায়গাটা খুঁড়লাম। কিছুই পাওয়া গেল না।’

পরদিন থানায় খবর দিলাম। পুলিশের সাহায্যে আবারো খোঁড়াখুঁড়ি করা হলো। কিছুই পাওয়া গেল না। সবার প্রাণা হলো আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার বাবা খবর পেয়ে আমাকে এসে নিয়ে গেলেন। দীর্ঘদিন ডাক্তারের চিকিৎসায় থেকে সুস্থ হলাম। শুনে অবাক হবেন— এই ঘটনার পর মাসখানিক আমি ঘুমুতে পারতাম না।

‘গল্পটা কি এখানেই শেষ না আরও কিছু বলবেন?’

‘না আর কিছু বলব না। ভাই আগেই তো বলেছি এটা কোনো ভৌতিক গল্প না। ভৌতিক গল্প হলে দেখা যেত ইয়াকুব বৌটাকে মেরে ঐখানে কবর দিয়ে রেখেছিল। ভৌতিক গল্প না বলেই এটা সত্যি হয়নি। তবে ঐ বাড়ি আমি কিনে নিয়েছি। বর্ষার সময় প্রায়ই ঐখানে একা একা রাত্রিযাপন করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ রাতে ঘটনার অংশবিশেষ আমি দেখেছিলাম। নিজের উপর কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছিলাম বলে বাকিটা দেখতে পারিনি। কোনো-একদিন বাকিটা হয়ত দেখব। ইচ্ছা করলে আপনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আপনি কি যাবেন?’

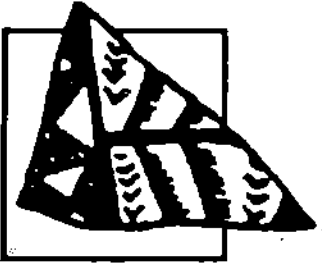
‘না। আমার ভূত দেখার কোনো ইচ্ছা নেই। আপনার ঐ মালি, ইয়াকুব না-

কি যেন নাম বললেন, ও কি এখনও ঐ বাড়িতে আছে?’

‘হ্যাঁ আছে।’

‘সে আপনার ঘটনা শুনে কী বলে?’

‘এটাও একটা মজার ব্যাপার। সে কিছুই বলে না। হ্যাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। চুপ করে থাকে। ভালো কথা, এতক্ষণ যে আমাদের ড্রিংকস দিয়ে গেল, কাজু বাদাম দিয়ে গেল, তার নামই ইয়াকুব। তাকে আমি সব সময় কাছাকাছি রাখি। আপনি কি তার সঙ্গে কথা বলবেন? ইয়াকুব, এই ইয়াকুব...।’



আনন্দ-বেদনার কাব্য

বইটির নাম—রিক্তশ্রী পৃথিবী।

প্রচ্ছদে একটি মেয়ের মুখের ছবি। মেয়েটি কাঁদছে। তার মুখের পাশে একটি গ্লোব। একটি বিকটদর্শন নর-কঙ্কাল গ্লোবটি বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। কঙ্কালটির ডান হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। যথেষ্ট জটিলতা। পৃথিবীর রিক্তশ্রী ফুটিয়ে তোলার আয়োজনে কোনো ত্রুটি নেই।

এ ধরনের প্রচ্ছদচিত্রের বইগুলোর পাতা সাধারণত উল্টানো হয় না। তবুও অভ্যাসবশেই পাতা উল্টানো। এবং একসময় দেখি গ্রন্থকারের লেখা ভূমিকাটি পড়তে শুরু করেছি। শুরু না করলেই বোধহয় ভালো ছিল। ভূমিকাটিতে খুব মন খারাপ করা একটি ব্যাপার আছে। আমার নিজের যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট আছে, অন্যের দুঃখ-কষ্ট আর ছুঁতে ইচ্ছে করে না। গ্রন্থকার লিখেছেন,

‘দীর্ঘ পাঁচ বছর পূর্বে রিক্তশ্রী পৃথিবীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। সেই সময় আমার অতি আদরের জ্যেষ্ঠ কন্যা মোসাম্মাৎ নূরুন্নাহার খানম (বেনু) উক্ত গ্রন্থের জন্যে প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কন করে। অর্থাভাবে তখন গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে পারি নাই। আজ প্রকাশিত হইল। কিন্তু হায় আমার বেনু মা দেখিতে পাইলো না।’

বইটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রচ্ছদশিল্পীর সামান্য একটু পরিচয়ও আছে।

সেখানে লেখা প্রচ্ছদশিল্পী : মোসাম্মাৎ নূরুন্নাহার খানম। দশম শ্রেণী বিজ্ঞানী বিভাগ।

মফস্বল থেকে প্রকাশিত বইটি হঠাৎ করেই অসামান্য হয়ে উঠল আমার কাছে। এই বইটি ঘিরে দরিদ্র পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবিটি চোখের সামনে দেখতে পেলাম। লম্বা বেণীর দশম শ্রেণীর কালোমতো রোগা একটি মেয়ে যেন গভীর ভালোবাসায় বাবার বইয়ের জন্যে, রাত জেগে প্রচ্ছদ আঁকছে। আঁকা হবার পর বাবাকে দেখাল সেটি। পৃথিবীর সব বাবাদের মতো এই বাবাও মেয়ের শিল্পকর্ম দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। রাতে সবাই খেতে বসেছে। দরিদ্র আয়োজন। কিন্তু সবার মুখ হাসি-হাসি। বাবা বললেন, পাস করলে আমার বেনু-মাকে আমি আর্ট কলেজে দেবো। বেনু বেচারি লজ্জায় মরে যায়। ভাত মাখতে মাখতে বলল, দূর ছাই, মোটেও ভালো হয়নি। বাবা রেগে গেলেন, ভালো হয়নি মানে? আঁকুক দেখি কেউ এ-রকম একটা ছবি।

বই অবিশ্যি বাবা প্রকাশ করতে পারলেন না। কে ছাপবে এরকম বই? দু'-একজন প্রকাশক বলেও ফেলল, এসব পদ্যের বই কি আজকাল চলে রে ভাই? এসব নিজের পয়সায় ছাপতে হয়। টাকা জমান, জমিয়ে নিজেই ছাপেন।

প্রয়োজনীয় টাকা যোগাড় করতে বাবার দীর্ঘ পাঁচ বছর লাগল। হয়তো স্ত্রীর কানের দুলজোড়া বিক্রি করতে হলো। সে বছর ঈদে বাচ্চারা কেউ কাপড় নিল না। তিনি খুঁজে পেতে সস্তার একটি প্রেস বের করলেন যার বেশির ভাগ টাইপই ভাঙা। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ প্রেসের মালিক সালাম সাহেব, গ্রন্থকারের কবিতার একজন ভক্ত। গ্রন্থকার লিখেছেন,

‘টাউন প্রেসের স্বত্বাধিকারী জনাব আবদুস সালাম সাহেব আমার এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যাপারে প্রকৃত সাহায্য করিয়াছেন। এই কাব্যানুরাগী বন্ধুবৎসল মানুষটির সহযোগিতায় ব্যতীত এই গ্রন্থ আপনাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত ছিল। জনাব আবদুস সালাম সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া ছোট করার ধৃষ্টতা আমার নাই।’

ভূমিকা থেকে প্রকাশিত যাচ্ছে কবি সন্ধ্যাবেলায় প্রুফ দেখতে যখন যেতেন তখন সালাম সাহেব হাসিমুখ বলতেন, ‘এই যে কবি সাহেব, আসেন, আপনার সেকেন্ড প্রুফ রেডি। কই রে কবি সাহেবের জন্যে চা আন। চা খেতে খেতে বললেন, প্রুফে চোখ বুলাতে বুলাতে আপনার একটা কবিতা পড়েই ফেললাম। বেশ লিখেছেন।’

কোন কবিতাটির কথা বলছেন?

‘ঐ যে কি যেন বলে, ইয়ের ওপর যেটা লিখলেন। বৃষ্টি বাদলার কথা আছে যেটায়।’

‘ও নব-বর্ষার কথা বলছেন?’

‘হ্যাঁ, ঐটাই। চমৎকার। খুবই ভাবের কথা। আপনি তো ভাই বিরাট লোক।’

কবি নিশ্চয়ই বই ছাপানোর সব টাকা আবদুস সালাম সাহেবকে দিতে

পারেননি। সালাম সাহেব বললেন, ‘যখন পারেন দিবেন। কবি মানুষ আপনি। আপনার কাছে টাকা মার যাবে নাকি— হা হা হা। ক’জন পারে আপনার মতো কবিতা লিখতে?’

ভূমিকা পড়েই জানতে পারলাম নেত্রকোনা শহরে একজন প্রবীণ উকিল বাবু নালিনী রঞ্জন সাহাও জনাব আবদুস সালামের মতো কবির প্রতিভায় মুগ্ধ। কবি লিখেছেন,

‘বাবু নালিনী রঞ্জন সাহার উৎসাহ ও প্রেরণা আমাকে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার জন্যে আগ্রহী করিয়াছে। বাবু নালিনী রঞ্জন একজন স্বভাব-কবি এবং কাব্যের একজন কঠিন সমালোচক। তিনি যখন আমার কবিতা প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘অঞ্জুষ’ত আমার একটি কবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এই কবির কাব্যগ্রন্থ অনতিবিলম্বে প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় তখনই আমি স্থির করি...।’

‘রিক্তশ্রী পৃথিবীতে মোট এক শ’ তেরোটি কবিতা আছে। প্রতিটি কবিতার নিচে রচনার স্থান, তারিখ এবং সময় দেয়া আছে। অনেকগুলোর সঙ্গে বিস্তৃত ফুটনোট। কয়েকটি উল্লেখ করি— ‘দিবাবসান’ কবিতাটির ফুটনোটে লেখা।,

‘আমার বড় শ্যালক জনাব আমির সাহেবের বাড়িতে এই কবিতাটি রচিত হয়। তাহার বাড়ির সন্নিহিতে খরস্রোতা একটি নদী আছে (নাম স্মরণ নাই)। উক্ত নদীর তীরে এক সন্ধ্যায় বসিয়াছিলাম। দিবাবসানের পরপরই আমার মনে গভীর আবেগের সৃষ্টি হয়। কবিতা রচনার উপকরণ সঙ্গে না থাকায় আবেগটি যথাযথ ধরিয়া রাখিতে পারি নাই। সমস্ত কবিতাটি মনে-মনে রচিত করিয়া পরে লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে।’

অন্য একটি কবিতার (বাসররাত্তা) ফুটনোটটি এ রকম—

‘এই দীর্ঘ কবিতাটি আমি আমার বাসররাতে রচনা করিয়াছি। সেই সময় বাহিরে খুব দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ছিল। প্রচণ্ড হাওয়া এবং অবিশ্রান্ত বর্ষণ। ক্ষণে-ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। আমার নব-পরিণীতা বালিকা-বধূ মেঘগর্জনে বারবার কাঁপিয়া উঠিতেছিল।’

বাসররাতে স্বামীর এই কাব্যরোগ দেখে নূতন বৌটি নিশ্চয়ই দারুণ অবাক হয়েছিল। তার চোখে ছিল বিস্ময় এবং হয়তো কিছুটা ভয়। কবি স্বামী দীর্ঘ রচনাটি কি সেই রাতেই পড়ে শুনিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে। না শুনিয়ে কি পারেন? ঝড়-জলের রাত। হাওয়ার মাতামাতি। টাটকা নতুন কবিতা। রহস্যমণ্ডিত এক নারী। সেই রাত কি যেন অপূর্ব ছিল সেটি আমরা ফুটনোট পড়ে কিছুটা বুঝতে পারি।

এবং এও বুঝতে পারি, যে লোক বিয়ের রাতে সাড়ে ছ’ পৃষ্ঠার একটি কবিতা লিখতে পারে, সে পরবর্তী সময়ে কী পরিমাণ বিরক্তি ও হতাশার সৃষ্টি করেছে তার স্ত্রীর মনে। ঘরে হয়তো টাকাপয়সা নেই। ছোট ছেলের জ্বর। তার জন্যে সাণ্ড কিনে আনতে হবে। কিন্তু ছেলের বাবা কবিতার খাতা নিয়ে

বসেছেন। গভীর ভাবাবেগে তাঁর চোখে জল। লিখেছেন, ‘একদা জ্যোৎস্নায়’ নামের দীর্ঘ কোনো রচনা। কেন কিছু-কিছু মানুষ এমন নিশি-পাওয়া হয়?

দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-বঞ্চনা কিছুই তাদের স্পর্শ করে না। স্বর্গীয় কোনো একটি হিংস্র পশু তাদের তাড়া করে ফিরে। কেন করে? আমার উত্তর জানা নেই। জানতে ইচ্ছে হয়।

এইসব নিশি-পাওয়া মানুষদের বেশিরভাগই নিজের ক্ষুদ্র পরিবার এবং কয়েক জন ভালোমানুষ বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আর কারোর কাছে তাঁদের আবেগের কথা পৌঁছাতে পারেন না। কৃপণ ঈশ্বর এঁদেরকে আবেগে উদ্বেলিত হবার মতো অপূর্ব একটি হৃদয় দিয়ে পাঠান কিন্তু সেই আবেগকে প্রবাহিত করবার মতো ক্ষমতা দেন না। এরা বড় দুঃখী মানুষ।

‘রিক্তশ্রী পৃথিবী’র পাতা উল্টাতে উল্টাতে আমার এমন কষ্ট হলো। কবি কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে কত আজেবাজে জিনিসই না লিখেছেন। ইরানের শাহকে নিয়ে পর্যন্ত একটা কবিতা আছে। কী আছে এই স্বৈরাচারী রাজার মধ্যে যে তাকে নিয়ে পর্যন্ত একটা কবিতা লিখতে হলো? তিনটি কবিতা আছে মহাসাগর নিয়ে। কবি কিন্তু সাগর-মহাসাগর কিছুই দেখেননি। [সমুদ্র দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তবে বহুবার আমি মনশ্চক্ষে সমুদ্র দেখিয়াছি। ফুটনোট, ‘হে মহাসিন্ধু’।]

কবিতা আমি পড়ি না। কিন্তু রিক্তশ্রী পৃথিবীর প্রতিটি কবিতা আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। কিছুই নেই। কষ্টে সঞ্চিত শেষ মুদ্রাটিও নিশ্চয়ই চলে গেছে এই বইয়ে। বাকি জীবন এই পরিবারটি অরিক্রীত গ্রন্থটির প্রতিটি কপি গভীর আগ্রহে আগলে রাখবে। প্রাণে ধরে সেরদুর্গের বিক্রি করতে পারবে না। বইয়ের স্তূপের দিকে তাকিয়ে স্ত্রী মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবেন। কিন্তু তাতে কি আছে? অন্তত একটি দিনের জন্যে হলেও তো এই পরিবারটিতে আনন্দ এসেছিল। কবি-স্ত্রী মুগ্ধ চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলেন, আমার স্বামী তাহলে সত্যি সত্যি একটি বই লিখে ফেলেছেন? ছেলেমেয়েরা বাবার বই নিয়ে ছুটে গেছে বন্ধু-বান্ধবদের দেখাতে।

বাবা প্রথমবারের মতো বুক উঁচু করে তাঁর বড় সাহেবের ঘরে ঢুকে বলেছেন, স্যার আপনার জন্যে একটা বই আনলাম। বড় সাহেব অবাক হয়ে বললেন, আরে আপনি আবার বই লিখলেন কবে?

স্যার, প্রচ্ছদটা আমার মেয়ের আঁকা।

তাই নাকি? বাহু চমৎকার।

রিক্তশ্রী পৃথিবীর শেষ কবিতাটি সম্পর্কে বলি। শেষ কবিতাটির নাম—‘মাগো’। কবিতাটি নুরুন্নাহার খানমকে নিয়ে লেখা। ফুটনোট থেকে জানতে পারি, মৃত্যুর আগের রাতে সে যখন রোগযন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন তার অসহায় বাবা এই কবিতাটি লিখে এনেছিলেন মেয়েকে কিঞ্চিৎ ‘উপশম’ দেবার

জন্যে। কবিতাটি ক্ষুদ্র এবং রচনাভঙ্গি অন্য কবিতার মতোই কাঁচা। কিন্তু প্রতিটি শব্দ চোখের গহীন জলে লেখা বলেই বোধকরি কবিতাটি দুঃখী বাবার মতোই হাহাকার করে ওঠে। সেই হাহাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়ে চলে যায় অদেখা সব ভুবনের দিকে। একটিমাত্র কবিতা লিখেও কেউ-কেউ কবি হতে পারেন। অল্প কিছু পঙ্ক্তিমালাতেও ধরা দিতে পারে কোনো এক মহান বোধ, মহান আনন্দ, জগতের গভীরতম ক্রন্দন। সেই অর্থে আমাদের ‘রিক্তশ্রী’র কবি একজন কবি।



অপেক্ষা

বশির মোল্লার সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে তিনি কোনো কিছুতেই রাগ করেন না।

রেগে যাবার মতো কোনো ঘটনা ঘটন ঘটতে, তিনি সারা চোখে-মুখে উদাস এক ধরনের ভাব ফুটিয়ে মৃদু গলায় বলেন, ‘আচ্ছা আচ্ছা।’

না রাগার মহৎ গুণের জন্যে তিনি পরম্পর তিনবার ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হয়েছেন। বাড়িতে পাকা দালান তুলেছেন। দশ বছর আগে জমির পরিমাণ যা ছিল আজ তাই বেড়ে তিনগুণ হয়েছে। সম্প্রতি একটি পাওয়ার টিলার কিনেছেন। অনেক দূর দূর থেকে মানুষজন চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ির বারান্দার পলিথিনের কাগজে ঢেকে রাখা যন্ত্রটি দেখতে আসে। বশির মোল্লা যন্ত্রটি এখনো মাঠে নামাননি। এই সবই সম্ভব হয়েছে তাঁর ‘না রাগা’ স্বভাবের জন্যে, মোলায়েম কথাবার্তার জন্যে। অন্তত বশির মোল্লার নিজের তাই ধারণা।

শ্রাবণ মাসের সকাল।

দু’দিন আগে পঁচাপঁচ বৃষ্টি শুরু হয়েছে, এখনো শেষ হয়নি। আকাশ ঘোলাটে। মনে হচ্ছে দু’পুরের আগে বৃষ্টি কমবে না।

বশির মোল্লা বাংলাঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে কাত হয়ে আছেন। নানান কারণে তার মন বিক্ষিপ্ত। আশপাশে ডাকাতি হচ্ছে। তাঁর বাড়িতেও হতে পারে। এখন পর্যন্ত কেন হয়নি সেটাই রহস্য। অবিশ্যি একটি দোনলা বন্দুক তাঁর আছে। বন্দুকের অস্তিত্ব জানান দেবার জন্যে পাখি শিকারের নাম করে পরশ

সকালেই তিনটি গুলি করলেন। কাজটা ঠিক হলো কিনা তাও বুঝতে পারছেন না। হিতে বিপরীত হতে পারে। বন্দুকের লোভে ডাকাত আসতে পারে। ডাকাতের দুশ্চিন্তা ছাড়াও অন্য আরেকটি দুশ্চিন্তা তাঁকে কাবু করে ফেলেছে— তিনি ঝাঁকের মাথায় গত বছর আরেকটি বিয়ে করে ফেলেছেন। মেয়েটির বয়স অল্প। কিছুতেই পোষ মানছে না। তাঁর নিজের বয়স পঁয়তাল্লিশ। এই বয়সে সতেরো বছরের তরুণীর মন তুলাবার জন্যে যে সব চং করতে হয় তা করা বেশ কষ্ট। তবু তিনি করার চেষ্টা করছেন। লাভ হচ্ছে না। মেয়েটি পোষ মানছে না।

আজ সকালে তাঁর মনের অবস্থা শ্রাবণ মাসের আকাশের মতোই ঘোলাটে। অবিশ্যি তাঁর মুখ দেখে কেউ তা বুঝতে পারবে না। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি বৃষ্টি-ভেজা সকালের অবসর বেশ উপভোগ করছেন। ভেতরের বাড়িতে চায়ের কথা বলা হয়েছে। চা এখনো আসেনি। এই বাড়িতে শহরের বাড়িঘরের মতো দু'বেলা চা হয়। খবরের কাগজ আসে। দু'দিন দেরি হয়, তবে নিয়মিত আসে।

বশির মোল্লার কোলে খবরের কাগজ পড়ে আছে। তবে তিনি কাগজ পড়ছেন না। কাগজ পড়তে তাঁর একেবারেই ভালো লাগে না। ছবিগুলি দেখেন। ছবির নিচের লেখাগুলিও সব সময় পড়তে ভালো লাগে না। বশির মোল্লা অলস চোখে খবরের কাগজের একটা ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন। ছবিতে এরশাদ সাহেবকে একজন বৃদ্ধের কাঁধে হুটি রেখে কি যেন বলতে দেখা যাচ্ছে। গুচ্ছগ্রাম-ট্রাম হবে। একেক প্রেসিডেন্ট এসে একেকটা কায়দা করেন। জিয়া সাহেব খাল কাটিয়ে গেছেন। ইমি বানাচ্ছেন গুচ্ছগ্রাম। পরের জন এসে কী করবে কে জানে।

‘প্রেসিডেন সাব।’

বশির মোল্লা, খবরের কাগজ থেকে চোখ তুললেন। এদিকের সবাই তাঁকে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদের সুবাদে প্রেসিডেন্ট সাব ডাকে। তাঁর ভালোই লাগে। আজ লাগল না, কারণ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে কেরামত। কেরামত তার বাড়ির কামলা। দশ বছর বয়স থেকেই আছে। এখন বয়স হয়েছে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। বোকা ধরনের মানুষ। এরা কামলা হিসাবে অসাধারণ হয়। যা করতে বলা হয় মুখ বুজে করে। বশির মোল্লা কেরামতকে দেখে বিরক্ত হলেন। কারণ, কেরামতের এখন ক্ষেতে থাকার কথা। তাঁর সামনে ঘুরঘুর করার কথা না।

‘কিছু বলবি না-কি রে কেরামত?’

‘একটা কথা ছেল।’

‘বলে ফেল্ ।’

কেরামত মাথা নিচু করে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, ‘বয়স তো হইল । এখন যদি একটা বিবাহ দিয়া দেন । ঘর-সংসার করি । ঘর-সংসার করতে মন চায় ।’

বশির মোল্লা বিস্মিত স্বরে বললেন, ‘বিয়ে করতে চাস?’

কেরামত গলার স্বর আরো নিচে নামিয়ে বলল, ‘বয়স হইতাছে । ঘর-সংসার করতে ইচ্ছা হয় । নবিজীঃ বয়সকালে বিবাহের কথা বলেছেন, হাদিস-কোরানে আছে ।’

‘পছন্দের কেউ আছে না-কি?’

‘না । আপনে দেখাশোনা কইরা...’

‘আচ্ছা ঠিক আছে, হবে । আমিই ব্যবস্থা করব । ঘর তুলে দিব । জমিও দিয়ে দিব । বেতন তো কিছু নেস না । সব জমা আছে । ব্যবস্থা করে দিব ।’

‘জে আচ্ছা ।’

‘এখন যা, কাজে যা । কাজ ফালায়া আসা ঠিক না ।’

‘জে আচ্ছা ।’

‘বিয়ের কথা বারবার আমারে বলারও দরকার নাই । আমার মনে থাকব । সুবিধামতো ব্যবস্থা করব । বিয়া-সাদী তাড়াহড়ার ব্যাপার না ।’

‘জে আচ্ছা ।’

‘রাতে পাহারার ব্যাপারটা ঠিক আছে তো? খুব সাবধান । দল বাইস্কা লাঠি-শরকি হাতে পাহারা দিবি ।’

‘জে আচ্ছা ।’

পরের তিন বছর বশির মোল্লার উপর দিয়ে নানান দ্বিপদআপদ গেল । জমিসংক্রান্ত এক মামলায় জড়িয়ে থানা-পুলিশে অনেক টাকা গচ্ছা গেল । তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী এক মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে নিজে মরমর হলো । দীর্ঘদিন তাঁকে ঢাকায় রেখে চিকিৎসা করতে হলো । তাঁর বাড়িতে একবার ডাকাতিও হলো । তারচে’ বড় কথা তাঁর অতি মোলায়েম স্বভাব সত্ত্বেও তিনি পরপর দুটি ইলেকশনে হেরে গেলেন । স্কুল কমিটির নির্বাচন এবং পৌরসভার নির্বাচন । এই রকম অবস্থায় মেজাজ ঠিক থাকে না । কাজেই কেরামত আবার যখন বিয়ের প্রস্তাব তুলল তিনি রেগে গিয়ে বললেন, ‘তুই এমন বিয়ে-পাগলা হলি কেন বল্ তো? এই অবস্থায় বিয়ের কথা তুললি কীভাবে?’

কেরামত বলল, ‘তিন বছর পার হইছে পেসিডেন সাব ।’

‘আমার অবস্থা তুই দেখবি না? তুই কি বাইরের লোক । তুই ঘরের লোক না? একটু সামলে উঠি, তারপর ব্যবস্থা করব ।’

‘জে আচ্ছা ।’

‘তোর তো ঘর-দুয়ারও লাগব । বউ এনে তুলবি কোথায়? একটু সামলে

উঠি, তারপর তোকে জমিজমা লিখে দিব। তখন বিয়ে হবে, তাড়াহড়ার কোনো ব্যাপার না।’

‘জে আচ্ছা।’

‘নিজের মনে কাম করে যা। তোর বিয়ের চিন্তা তোর করা লাগবে না। আমি আছি কি জন্যে? একটু সামলে উঠি।’

বশির মোল্লা পাঁচ বছরের মাথাতেই সামলে উঠলেন। বেশ ভালোভাবেই সামলে উঠলেন। স্কুল কমিটির সভাপতি হলেন। উপজেলা ইলেকশনে জিতলেন। রোয়াইল বাজারে বাড়ি বানালেন। গ্রামের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে এলেন। তবে গ্রামের বাড়িতে এখন তিনি বেশি থাকেন না। রোয়াইল বাজারেই থাকেন। তাঁর মনের শান্তি ফিরে এসেছে। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী আরো একটি মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে পুরোপুরি পোষ মেনে গেছে। পৌষ মাসের এক সন্ধ্যায় বশির মোল্লা গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। দিন তিনেক থাকবেন। আজকাল একনাগাড়ে বেশিদিন গ্রামের বাড়িতে থাকা হয় না। শহরের নানান কাজকর্ম থাকে। কাজকর্ম ফেলে গ্রামের বাড়িতে পড়ে থাকা সম্ভব না। তা ছাড়া বেশ কিছু শত্রু তৈরি হয়েছে। এরা কখন কি করে বসে, শহরে সেই সুযোগ কম।

বাড়িতে পা দেয়া মাত্র কেরামতের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘তুই তো দেখি বুড়ো হয়ে যাচ্ছিলে রে কেরামত।’

কেরামত মাথা নিচু করে ফেলল। যেন বুড়ো হয়ে যাওয়া একটা অপরাধ। বশির মোল্লা বললেন, ‘না এবার তোর বিয়েটা দিয়ে দিতে হয়— দেখি এই শ্রাবণেই ব্যবস্থা করব। বিয়ে-শাদির জন্যে শ্রাবণ মাস ভালো।’

কেরামত ক্ষীণ স্বরে বলল, ‘জে আচ্ছা।’

‘তুই একটা ঘর তুলে ফেল। পুস্কুনির উত্তর পাড়ে যে জায়গাটা আছে ঐখানে। বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ যা লাগে নে। ঘরটা আগে হউক।’

‘জে আচ্ছা।’

‘বিয়ে একটু বেশি বয়সে হওয়াই ভালো, বুঝলি কেরামত? এতে মিল-মহব্বত ভালো হয়। তুই ঘর তুলে ফেল। উপরে ছন দিয়ে দিস। ছনের টাকা নিয়ে যাস। তোর তো টাকা পাওনাই আছে।’

বশির মোল্লা তিনদিন থাকার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলেন। থাকতে হলো সাতদিন। স্কুল কমিটির কিছু সমস্যা ছিল। সমস্যা মেটাতে হলো। ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রামে একশ’ মণ গম এসেছিল। সেখান থেকে সত্তর মণ গমের হিসাব পাওয়া যাচ্ছিল না। সেটাও ঠিকঠাক করতে হলো। কয়েকটা গ্রাম্য সালিশী করতে হলো। দেখতে-দেখতে সাতদিন কেটে গেল। শহরে ফেরার দিন তিনি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে কেরামতের তৈরি ঘর দেখলেন। সে এই সাতদিনে সুন্দর

ঘর তুলে ফেলেছে। ঘরের চারপাশে কাঁঠাল, আম এবং পেয়ারা গাছের চারা লাগিয়েছে।

বশির মোল্লা বললেন, ‘গাছপালা লাগিয়ে তুই তো দেখি হুলস্থুল করে ফেলেছিস।’

কেরামত নিচু গলায় বলল, ‘ফল-ফলান্তির গাছ, পুলাপান বড় হইয়া খাইব।’

‘ভালো করেছিস। ভালো। কয়েকটা নারকেল গাছও লাগিয়ে দে।’

‘জে আচ্ছা।’

‘দেখি এই শ্রাবণেই বিয়ে লাগিয়ে দিব।’

‘জে আচ্ছা।’

সেই শ্রাবণে কিছু হলো না। তার পরের শ্রাবণেও না। বশির মোল্লা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিডনির অসুখ। চিকিৎসা করাতে সপরিবারে ঢাকা গেলেন।

কেরামতকে বলে গেলেন, ‘সেরে উঠেই বিয়ের ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলবেন। মেয়ে কয়েকটা দেখে রেখেছেন। এদের মধ্যে স্বভাব-চরিত্র ভালো দেখে কাউকে ঠিক করা হবে।’

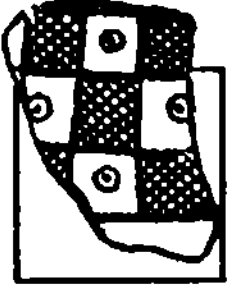
‘বিয়ে-শাদী হুট করে হয় না। লাখ কথার আগে বিয়ে হওয়া ঠিক না। চিরজীবনের ব্যাপার।’

কেরামত নিচু গলায় বলল, ‘কন্যা স্বাস্থ্যবতী হইলে ভালো হয়। ঘরে কাজকর্ম আছে।’

‘অবশ্যই। অবশ্যই। গ্রামের কুট রোগাপটকা হইলে চলে না। আছে, স্বাস্থ্যবতী মেয়েও সন্ধানে আছে। তুই এই বিষয়ে চিন্তা করিস না। আমি আছি কি জন্যে?’

কেরামত চিন্তা করে না। নিজের হাতে লাগানো ফলের গাছগুলিকে যত্ন করে। একটা গাছও মরেনা মরে। বিয়ের পর ছেলে-পুলে হবে, ফল-ফলান্তির গাছ দরকার। বাজারের জিনিসপত্রের যা দাম। ছেলে-পুলেকে ফল-ফলান্তি কিনে খাওয়ানো সম্ভব না।

কেরামত বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করে। সে জানে না তার বয়স পাঁচপঞ্চাশ পার হয়েছে। এখন তার মাথার চুল সবই সাদা। বাঁ চোখে ভালো দেখতেও পায় না। গায়ে সেই আগের জোরও নেই। কাজকর্ম তেমন করতে পারে না। তবু পুরানো অভ্যাসে সারা দিন ক্ষেতে পড়ে থাকে। সন্ধ্যাবেলায় নিজের বাড়িতে এসে অনাগত স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাদের কথা ভাবতে তার বড় ভালো লাগে।



শীত

মাঝ রাত্রে মতি মিয়ার ঘুম ভেঙে গেল।

বুকে একটা চাপা ব্যথা। দম বন্ধ হয়ে আসছে। শ্বাসের কষ্টটা শুরু হলো বোধহয়। সে কাঁথার ভেতর থেকে মাথা বের করল। কী অসম্ভব ঠাণ্ডা! বুড়োমারা শীত পড়েছে। দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে বরফ-শীতল হওয়া আসছে। হাতে... পায়ে কোনো সাড় নেই। ঠাণ্ডায় জমে গেছে নাকি?

মতি মিয়া বড় বড় নিশ্বাস নিতে শুরু করল। শ্বাসকষ্ট শুরু হলে কিছুতেই ফুসফুস ভরানো যায় না। কেউ একটু হাওয়া করলে আরাম হতো। ডাকবে নাকি ফরিদের মাকে? মতি মিয়া উঠে বসবার চেষ্টা করল। আশ্চর্যের ব্যাপার— ব্যথাটা কমে গেল। নিশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। মতি মিয়ার মনে হলো কেউ মেন তাঁর কাঁথার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। অশরীরী কেউ। সে হাত রাখল মতি মিয়ার পেটে। অসম্ভব শীতল হাত। সেই হাতে বড় বড় আঙুল। একবার হাত রেখেই সে হাত সরিয়ে নিল। মতি মিয়া ভয় পেয়ে ডাকল, ‘বৌমা, ও ফরিদের মা।’

ফুলজান ফরিদকে নিয়ে রান্নাঘরে ঘুমায়। স্বপ্নের বেশিরভাগ কথারই সে কোনো জবাব দেয় না। আজ দিল। বিরক্ত স্বরে বলল, ‘কী হইছে?’

‘কুপিটা ধরাও গো মা। বড় ভয় লাগতাকে।’

‘ঘুমান দেহি।’

‘কে জানি আমার পেটের মইধ্যে হাত দিল।’

‘স্বপ্ন দেখছেন। কার ঠেকা পরছে আপনার পেটে হাত দিব।’

‘ফরিদরে একটু দিয়া যাও আমার সাথে। দিয়া যাও গো মা। ও ময়না।’

‘খামাখা চিল্লাইয়েন না, ঘুমান।’

‘ও ফরিদের মা, ও বেটি।’

ফুলজান সাড়া দিল না। মতি মিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। জমাট অন্ধকার চারদিকে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে একবিন্দু আলোও আসছে না। বোধহয় কৃষ্ণপক্ষ। তার ভয়টা কিছুতেই কাটছে না। বুড়োকালে মানুষের ভয় বেড়ে যায়। অকারণেই গা-ছমছম করে। বুড়োকাল বড় অদ্ভুত কাল।

রান্নাঘরে খচমচ শব্দ হচ্ছে। ফুলজান কি জেগে আছে? নাকি ইঁদুর? ইঁদুরের

বড় উৎপাত হয়েছে। ফুলজান বিড়বিড় করে কথা বলছে। কে জানে হয়তো বা কুপি জ্বালাবে। দেখতে আসবে তাকে। যতটা খারাপ মনে হয় মেয়েটা তত খারাপ না। মায়া-মহব্বত আছে। মতি মিয়া কাঁথার ভেতর থেকে মাথা বের করল। কী ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছে! এই শীতটা বোধহয় কাটানো যাবে না। ভালোমন্দ কিছু এবারই হবে।

‘বৌমা ঘুমাইলা নাই, ও ফরিদের মা।’

‘কিতা?’

‘দুই কেঁথায় শীত মানে না।’

‘না মানলে আমি কী করুম কন?’

‘বুড়াকালে শীতটা বেশি লাগে। ফরিদরে দিয়া যাও আমার কাছে। ও ফরিদের মা।’

ফুলজান জবাব দেয় না।

‘ও ফরিদের মা, ও ময়না।’

লাভ হয় না কোনো। মতি মিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘুমন্ত চেষ্টা করে। ঘুম আসে না। বুড়ো-কালের এই এক যন্ত্রণা, একবার ঘুম ছুটে গেলে আর ঘুম আসে না। শীতের রাত জেগে পার করা বড় কষ্ট। ফুলজানের দু’টো বাচ্চা থাকলে ভালো হতো। একটাকে রাখতেন নিজের কাছে। পুলাপানের গায়ে জ্বর ওম। লেপের চেয়ে বেশি ওম। মেছের আলি বেঁচে থাকলেও হতো। একটা জোয়ান ছেলে আশপাশে থাকলেই ফরসা গরম থাকে। মতি মিয়ার বুক হু-হু করতে লাগল। বুড়াকালে আশপাশে একটা জোয়ান ছেলে দরকার। মেছের আলির কথা তার বেশিক্ষণ মনে রইল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ক্ষিদে লেগে গেল। অথচ ক্ষিদে লাগার কোনোই কারণ নেই। শীতের শুরুতেই ভাতের কষ্ট দূর হয়েছে। ফুলজান বোজা দারোগা বাড়ি থেকে ভাত নিয়ে আসছে। একজনের ভাত কিন্তু তিনজনেরই পুরপেট হচ্ছে।

আজ খাওয়া হয়েছে টেংরা মাছের তরকারি ও ডাল দিয়ে। এইসব ছোটখাট জিনিস তার মনে থাকে না। কিন্তু আজকেরটা মনে আছে। কারণ, টেংরা মাছের কাটা বিঁধে গিয়েছিল। বড় কষ্ট হয়েছে। শরীরের কষ্টটা এখন বেড়ে গেছে, অল্পতেই কষ্ট হয়।

বান্নাঘরে আবার শব্দ হচ্ছে। ব্যাপারটা কী? ঘুম ভাঙল নাকি ফরিদের? মাঝে মাঝে ফরিদ চুপি চুপি চলে আসে তার কাছে। বুকের কাছে গুটিগুটি মেরে ঘুমায়। বড় আরাম লাগে। মতি মিয়া উৎকর্ষ হয়ে অপেক্ষা করে। এবং একসময় অবাক হয়ে লক্ষ্য করে বান্নাঘরে কুপি জ্বালানো হয়েছে। বিজবিজ শব্দ শোনা যায়। ফরিদের মা নিজের মনেই কথা বলছে নাকি?

‘বৌমা কী হইছে?’

‘কিছু অয় নাই।’

‘বাণ্ডি জ্বালাইলা বিষয়ডা কী?’

‘ফরিদ বিছানা ভিজাইতেছে।’

‘কও কি! শীতের মইধ্যে কামডা কি করল?’

একটা চড়ের শব্দ শোনা যায়। ফরিদ অবিশ্যি কাঁদে না। মতি মিয়া উল্লসিত স্বরে চৈঁচিয়ে উঠে, এরে দিয়া যাও আমার কাছে। মাইর ধুইর করার কাম নাই। পুলাপান মানুষ।

ফুলজানের তরফ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। এখানে আনবে না নিশ্চয়ই।

‘ও বৌমা। ও ফরিদের মা।’

‘কী?’

‘ভিজা কেঁথার মইধ্যে রাখন ঠিক না। বুকে কফ জমলে মুশকিলে পড়বা। দিয়া যাও আমার কাছে।’

ফুলজানের দিক থেকে কোনো সাড়া নেই। ফরিদ খুনখুন করে কাঁদতে শুরু করেছে। মতি মিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। আর তখনই ফুলজান ফরিদকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল। এক হাত দূরে থাকা কুণ্ডির ঘরটা আলো পড়েছে তার মুখে। মুখ থমথম করছে তার। বোধহয় কেঁদেছে খানিকক্ষণ আগে। ফুলজান মাঝে মাঝে রাত জেগে কাঁদে। মতি মিয়া সবে বয়সের জন্যে জায়গা করে দিল। ফরিদ চোখ বন্ধ করে আছে। ঘুমের ভানি। এমন বজ্জাত হয়েছে। ফুলজান দাঁড়িয়ে আছে কুপি হাতে। কিছু বলছে বোধহয়।

‘কিছু বলবা নাকি মা?’

‘না।’

‘শীতটা পড়ছে মারাত্মক। রশিদ সাহেবের কাছে একবার যাইবা নাকি? কম্বল যদি দেয় একটা।’

ফুলজান কিছু বলল না। কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে রইল। মতি মিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করল। ফরিদের মা যাবে না। যে-কোনো কারণেই হোক রশিদ সাহেবের কাছে সে যেতে চায় না। রিলিফের গম এল একবার। সবাই গেল, ফুলজান গেল না। পা টেনে টেনে যেতে হলো মতি মিয়াকেই।

‘ও ফরিদের মা।’

‘কী কইবেন কন?’

‘যাইবা নাকি কাইল একবার রশিদ সাহেবের কাছে?’

‘কম্বলের আমার দরকার নাই। শীত লাগে না আমার।’

‘তোমার না লাগলে কি, আমার তো লাগে।’

‘আপনের লাগলে আপনে যান।’

মতি মিয়া উঠে বসার চেষ্টা করে। ফরিদ গুয়ে আছে তার গা ঘেঁষে। সে অন্য রকম একটা উত্তেজনা অনুভব করে।

‘বুঝালা ফরিদের মা, আমার হক আছে। আমার ছেলে মরে নাই যুদ্ধে? কও তুমি, যুদ্ধে মরে নাই?’

‘হেতো কতই মরছে।’

‘সবের হক আছে। বুঝালা? কমল আমার হকের জিনিস।’

ফুলজান হাই তুলে কুপি হাতে রান্নাঘরে ঢুকল। বাতি নিভে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। রাত কতটা বাকি কে জানে? মতি মিয়ার প্রস্রাবের চাপ হয়েছে। শীতের মধ্যে উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না। প্রস্রাবের চাপ এমন এক জিনিস যা ক্ষিধের মতো হু-হু করে বাড়তে থাকে।

‘ফরিদ ঘুমাইছস?’

‘হু।’

‘ঘুমাইলে কথা কস ক্যামনেরে ছাগল?’

ফরিদ খুকখুক করে হাসে। মতি মিয়াও হাসে। বড় ভালো লাগে তার। বড় মায়া লাগে।

‘কাইল কমল আনতে যামু বুঝালি ফরিদ?’

‘আইচ্ছা।’

‘তুইও যাইবি আমার সাথে। হকের কমল। ঠিক না?’

‘হু।’

‘ফরিদ ঘুমাইছস?’

‘ঘুমাইছি।’

‘পেসাব করন দরকার

মতি মিয়া চিন্তিত হয়ে পড়ে। এই প্রচণ্ড শীতে উঠা সম্ভব না। কিন্তু ইতোমধ্যে তলপেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। মারুদে এলাহি, বুড়ো হওয়ার বড় কষ্ট।

‘ফরিদ ঘুমাইছস?’

ফরিদ জবাব দেয় না। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। মতি মিয়া ঘুমন্ত ফরিদের সঙ্গেই কথাবার্তা চালাতে থাকে। কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকলে মনটা অন্য দিকে থাকে। তলপেটের চাপের কথাটা মনে থাকে না।

বুঝালি ফরিদ, ‘কাইল যামু রশিদ সাবের কাছে। তোর বাপের নাম কইলে না দিয়া উপায় নাই। বুঝছস? তুইও যাবি আমার সাথে। চূপ কইরা বইসা থাকবি। ফাইজলামি বাদরামি করলে চড় খাইবি। বুঝছস?’

মতি মিয়া অনবরত কথা বলতে থাকে। কথা বলতে বড় ভালো লাগে তার।

সকালটা শুরু হয়েছে খুব চমৎকারভাবে। চনমনে রোদ উঠেছে। কুয়াশার চিহ্নমাত্র নেই। কে বলবে মাঘ মাসের সকাল। মতি মিয়া আয়েশ করে রোদে

বসে আছে। বড় আরাম লাগছে।

ফুলজান ফরিদকে টিনের থালায় মুড়ি দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। এটা একটা ভালো লক্ষণ। এর মানে হচ্ছে ঘরে পান্তা নেই। যেদিন পান্তা থাকে না সেদিন দুপুরে ফরিদের মা গরম ভাতের ব্যবস্থা করে। আজও করবে। দুই-একগাল মুড়ি খেলে হতো। ফরিদ থালা নিয়ে ঘুরছে দূরে দূরে। মুড়ি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাছে ভিড়বে না। মতি মিয়া ডাকল, 'ওই ফরিদ, ওই। এদিকে আয় দাদা।' ফরিদ না শোনার ভান করল। মহা বজ্জাত হয়েছে ছোকরা।

ফুলজান দারোগা বাড়ি যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। দুপুরবেলা মনে করে এলে হয়। আসবে ঠিকই। মায়া-মহব্বত আছে মেয়েটার। ভালো মেয়ে।

'দারোগা বাড়ি যাও নাকি গো মা?'

'হু।'

'আইচ্ছা ঠিক আছে। যাও। রইদটা একটু তেজি হউক, আমিও যাইতাছি রশিদ সাহেবের কাছে।'

ফুলজান কোনো জবাব দিল না। মতি মিয়া ইতস্তত করে বলেই ফেলল, 'চিড়া-মুড়ি কিছু আছে? শইলডা যেন কেমন-কেমন লাগে।'

'চিড়া-মুড়ি কিছু নাই।'

'ঠিক আছে। অসুবিধা নাই। তুমি যাও।'

রোদটা এত আরামের যে উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত ইচ্ছা হয় না। তবু মতি মিয়া উঠল। রশিদ সাহেবের কাছে যাওয়া দরকার। মতি মিয়ার মন বলছে আজ গেলে কিছু-একটা হবে। না হয়েই পারেনা।

'আয়রে ফরিদ।'

ফরিদ তার থালার মুড়ির শেষ দানাটি মুখে ফেলে দাদার হাত ধরল। চিকন গলায় বলল, 'কোলে নাও।' কাউকে কোলে নেবার বয়স কি আছে মতি মিয়ার? তবু সে ফরিদকে কোলে নিল। কিছুদূর নিয়ে নামিয়ে দিলেই হবে। পুলাপান মানুষ, একটা শখ হয়েছে।

রশিদ সাহেব সোহাগীর সি.ও. রেভিন্যু।

লোকটি ছোটখাট। তাঁকে দেখেই মনে হয় সবার উপর বিরক্ত হয়ে আছেন। ভুরু না কুঁচকে তিনি কারো দিকে তাকাতে পারেন না। কম্বলের প্রসঙ্গে তাঁর কোনো ভাবান্তর হলো না।

তিনি অফিসের উঠোনে একটা চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিলেন। চায়ের কাপ থেকে দৃষ্টি সরালেন না। মতি মিয়া দ্বিতীয়বার বলল, 'শীতে বড় কষ্ট পাইতেছি।'

রশিদ সাহেব সে কথারও কোনো জবাব দিলেন না। শুকনো চোখে তাকিয়ে রইলেন। মতি মিয়া ভেবে পেল না কথাগুলি কীভাবে বললে শীতের কষ্টটা পরিষ্কার বুঝা যাবে। রশিদ সাহেব কম্বলের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ

নিয়ে এলেন, নিরাসক্ত গলায় বললেন, 'এই ছেলে কে?'

'জি, আমার নাতি। মেছের আলির ছেলে।'

'কার ছেলে?'

'মেছের আলির। মেছের আলিরে চিনলেন না, যুদ্ধ করল যে মেছের আলি।'

রশিদ সাহেব বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। তিনি চিনেছেন। মতি মিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল। এই লোকটা বিরক্ত হচ্ছে কেন? তার ছেলের কথায় বিরক্ত হওয়ার কি আছে?

গত বছর রিলিফের গম এল। মতি মিয়া গম আনতে গিয়ে বলল, 'চিনেছেন তো আমারে? আমি মেছের আলির বাপ। যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেল যে মেছের আলি।'

চ্যাংড়া মতো একটি অপরিচিত ছেলে গম দিচ্ছিল। সে চোখ-মুখ শক্ত করে বলল, 'মেছের আলির জন্যেও গম দেয়া লাগবে? সেও রুটি খাবে?' লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সবাই হেসে উঠল। যেন এ রকম মজার কথা তারা বহুদিন শুনে নাই।

রশিদ সাহেব বিরক্ত হচ্ছেন। কিংবা কে জানে হয়তো রেগেও যাচ্ছেন। অফিসার মানুষ। রেগে গেলে প্রথম দিকে বোঝা যায় না। তাঁরা রাগ চেপে রাখে। চেষ্টামেচি হইচই শুরু করে ছোট লোকেরা। মতি মিয়ার মতো মানুষরা।

মতি মিয়া গলা পরিষ্কার করে বলল, 'জীবন যুদ্ধ করেছিল মেছের আলি। নীলগঞ্জ একটা সড়কের তারা নাম দিচ্ছে 'শহীদ মেছের আলি সড়ক।' নীলগঞ্জ হইল গিয়া আপনার এইখান থাইক্যা।

'চিনি, নীলগঞ্জ কোথায় চিনি।'

রশিদ সাহেবের ভুরু কঁচকানো। মতি মিয়া চুপ করে গেল। বেলা অনেক হয়েছে। পেটের ক্ষিদে জামান দিচ্ছে। মুখ ভর্তি করে থুথু জমা হচ্ছে। রশিদ সাহেব উঠে দাঁড়ান। নির্লিপ্ত গলায় বললেন, 'দাঁড়ান আপনি, একটা কম্বলের ব্যবস্থা করছি। চা খাবেন?'

মতি মিয়ার চোখে পানি এসে গেল। বলে কি এই লোক? মতি মিয়া চোখ মুছল। ধরা গলায় বলল, 'গত বৎসর বড় কষ্ট করেছি জনাব। দানাপানি নাই। শেষে ফরিদের মা কইল, বুধবারের বাজারে একটা থালা লইয়া বসেন। বসলাম গিয়া। নিজ গেরামের বাজারে ভিক্ষা করা শরমের কথা। বড় শরমের মধ্যে ছিলাম জনাব।'

মতি মিয়া ক্রমাগত চোখ মুছতে লাগল। ফরিদ তাকিয়ে আছে। সে বড়ই অবাক হয়েছে।

রশিদ সাহেব শুধু যে কম্বল দিয়েছেন তাই না, পঞ্চাশটি টাকাও দিয়েছেন। সেই টাকার খানিকটা ভাঙিয়ে মতি মিয়া চা ও চিনি কিনে ফেলল। ফরিদকে বলল, 'বুড়াকালে চা-টা খুব দরকার। বুকে কফ জমে না। ভালো ঘুম হয়।'

বুঝলিবে বেকুব। বুড়াকালে চা হইল গিয়া অমুখ।’

তারা দু’জন সাড়া দুপুর বাজারে ঘুরল। মতি মিয়া পরিচিত সবাইকেই নতুন কমল দেখাল। তার গাল ভর্তি হাসি, ‘মেহের আলির কারণে পাইলাম, বুঝলো না? মেহেরের নাম কইতেই মন্ত্রের মতো কাম হইল। বিলাতি জিনিস, হাত দিয়া দেখ। জবর ওম। চাইর পাঁচ শ’ টেকা দাম হইব, কি কও?’

মতি মিয়ার মনে ক্ষীণ আশঙ্কা ছিল ফরিদের মা কমলটা হয়তো নিজের জন্যে দাবি করবে। মেহের আলির কমলে ওদের দাবিই তো বেশি। কিন্তু তা সে করল না। চকচকে নতুন কমলের প্রতি তার কোনো রকম আগ্রহ দেখা গেল না। যথারীতি ফরিদকে নিয়ে রান্নাঘরে ঘুমুতে গেল।

দীর্ঘদিন পর আরাম করে ঘুমুতে গেল মতি মিয়া। এত আরাম যে চট করে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে না। জেগে গল্প করতে ইচ্ছা করে।

‘ফরিদের মা, ঘুমাইলা নাকি?’

‘না।’

‘জবর ওম কমলটার মধ্যে। বিলাতি জিনিস তো। বিলাতি জিনিসের ওম অন্য রকম। ভালো ঘুম হইব।’

‘ঘুমান ভালো কইরা।’

‘ফরিদের মা।’

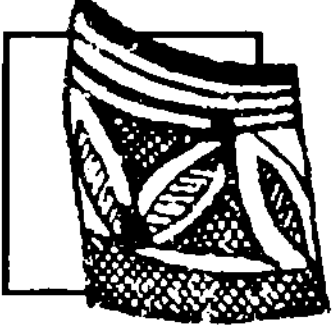
‘কন কি!’

মেহেরের কথা কইতেই রশিদ সঙ্গে খুব ইজ্জত করল। চা খাওয়াইল। শরিফ আদমী।

ফুলজান জবাব দিল না। মতি মিয়া বলল, ‘ফরিদকে দিয়া যাও, আমার সাথে বাপের কমলের নিচে ঘুমাউক।’ ফুলজান সে কথারও জবাব দিল না। ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?

গভীর তৃপ্তিতে ঘুমুবার আয়োজন করল মতি মিয়া। ছেলের প্রতি গাঢ় কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে যাচ্ছে। বড় শান্তি লাগছে। ঘুমের মধ্যেই সে শুনল, ফুলজান কাঁদছে। সে প্রায়ই কাঁদে। তার কান্না শুনতে মতি মিয়ার কোনো কালেই ভালো লাগে না। কিন্তু আজ ভালো লাগছে। কেমন যেন গানের সুরের মতো সুর।

আরাম করে ঘুমায় মতি মিয়া। বাইরে প্রচণ্ড শীত। ঘন হয়ে কুয়াশা পড়ছে। উত্তর দিক থেকে বইছে ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া।



ওইজা বোর্ড

প্রায় আট বছর পর নাসরিনের বড় ভাই আলাউদ্দিন দেশে ফিরল। সঙ্গে বিদেশী বউ। বউয়ের নাম ক্লারা। বউয়ের চুল সোনালি, চোখ ঘন নীল, মুখটাও মায়া মায়া। তবু মেয়েটাকে কারোরই পছন্দ হলো না।

যে পরিমাণ আগ্রহ নিয়ে নাসরিন বড় ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল, ভাইকে দেখে সে ঠিক ততখানি নিরাশ হলো। আট বছর আগে নাসরিনের বয়স ছিল নয়। এখন সতেরো। ন'বছর বয়েসি চোখ এবং সতেরো বছর বয়েসি চোখ এক রকম নয়। ন'বছর বয়েসি চোখ সবকিছুই কৌতূহল এবং মমতা দিয়ে দেখে। সতেরো বছরের চোখ বিচার করতে চেষ্টা করে। তার বিচারে ভাইকে এবং ভাইয়ের বৌ-কে— দু'জনকেই খারাপ লাগছে।

নাসরিন দেখল তার ভাই আগের মতো চুপচাপ, শান্ত ধরনের ছেলে নয়। খুব হইচই করা শিখেছে। স্ত্রীকে নিয়ে ঘরার সামনে বেশ আল্লাদ করছে। ঠোট গোল করে হানি ডাকছে। অথচ হানি শব্দটা বলার সময় ঠোট গোল হয় না।

আলাউদ্দিন এতদিন পর দেশে আসছে। আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে উপহার-টুপহার আনা উচিত ছিল। তেমন কিছুই আনেনি। ভূষভূষা এ্যাশ কালারের একটা সোয়েটার এনেছে মা'র জন্যে। সেই সোয়েটার নিয়ে কত রকম আধিখ্যোতা— পিওর ওল মা। পিওর ওল আজকাল আমেরিকাতেও এক্সপেনসিভ। মা তোমার কি কালার পছন্দ হয়েছে?

নাসরিনের একবার বলার ইচ্ছা হলো, 'এ্যাশ কালারে পছন্দের কি আছে ভাইয়া?'

অবিশ্যি কিছু বলল না। তার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। এতদিন পর আসছে। ভাইয়ার কি উচিত ছিল না মা'র জন্যে একটা ভালো কিছু আনা?

বাবার জন্যে এনেছে ক্যালকুলেটর। যে বাবা রিটায়ার করেছে, চোখে দেখতে পায় না, সে ক্যালকুলেটর দিয়ে কী করবে?

নাসরিনের বড় বোন শারমিন তার দুই যমজ মেয়েকে নিয়ে স্যুটকেস খোলার সময় বসে ছিল। এই দু'মেয়েকে আলাউদ্দিন দেখেনি। চিঠি লিখে জানিয়েছে এই দু'মেয়ের জন্যে একই রকম দু'টা জিনিস আনবে, যা দেখে

দু'জনই মুগ্ধ হবে। দু'জনের জন্যে দু'টা গায়ে মাখার সাবান বেরুল। এই সাবান ঢাকার নিউ মার্কেটে ভর্তি, আমেরিকা থেকে বয়ে আনতে হয় না।

আলাউদ্দিন বলল, 'বেশি কিছু আনতে পারিনি, বুঝলি? লাস্ট মোমেন্টে ক্লারা ডিসাইড করল আমার সঙ্গে আসবে। অনেকগুলি টাকা বেরিয়ে গেল। কিছু টাকা সঙ্গেও রাখতে হয়েছে। ঢাকায় হোটেলের বিল কেমন কে জানে?'

নাসরিন বলল, 'হোটেলের বিল মানে? তুমি কি হোটেলে উঠবে?'

'বাধ্য হয়ে উঠতে হবে। এই গাদাগাদি ভিড়ে ক্লারার দম বন্ধ হয়ে আসছে। চট করে তো সব অভ্যাস হয় না। আশু আশু হয়। তোরা আবার এটাকে কোনো ইস্যু বানিয়ে বসবি না। তোদের কাজই তো হচ্ছে সামান্য ব্যাপারকে কোনোমতে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ইস্যুতে নিয়ে যাওয়া।'

নাসরিনের চোখে পানি এসে গেল। তার আপন বড় ভাই তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি। নাসরিনের চোখের পানি অবিশ্যি কেউ দেখতে পেল না। 'একটু আসছি ভায়া' বলেই সে চট করে উঠে গেল। বাথরুমে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চোখ মুছে উপস্থিত হলো। আলাউদ্দিন তখন স্যুটকেস খুলে আরো কি সব উপহার বের করছে। অতি তুচ্ছ সব জিনিস— গাড়ির পেছনে লাগানোর স্টিকার, যেখানে লেখা— "Hug Your kind" তাদের গাড়ি কোথায় যে তারা গাড়ির পেছনে স্টিকার লাগাবে? কেউ অবিশ্যি কিছু বলল না। সবাই এমন ভাব করতে লাগল যে গাড়ির স্টিকারটার খুব প্রয়োজন ছিল।

আলাউদ্দিন বলল, 'নাসরিন তোর জন্যে তো কিছু আনা হয়নি।'

নাসরিন বলল, 'ভাইয়া আমার কিছু লাগবে না।'

'তোকে বরং এখান থেকেই শাড়ি-টাড়ি কিছু কিনে দেব।'

'আচ্ছা।'

আলাউদ্দিন স্যুটকেস ঘাঁটতে লাগল। তার ঘাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, সে আশা করছে কিছু একটা পেয়ে যাবে, যা নাসরিকে দিতে পারলে শাড়ির ঝামেলায় যেতে হবে না। নাসরিনের লজ্জার সীমা রইল না।

'এই যে জিনিস পাওয়া গেছে।'

হাসিতে আলাউদ্দিনের মুখ ভরে গেল। সবাই ঝুঁকে পড়ল স্যুটকেসের উপর। লিপিস্টিকের মতো একটা বস্তু বেরুল। আলাউদ্দিন বলল, 'নাসরিন নে। এর নাম লিপ গ্লস। ঠোঁটে দিলে ঠোঁট চকচক করে, ঠোঁট ফাটে না।'

নাসরিন শুকনো গলায় বলল, 'থ্যাংকস ভাইয়া।'

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বলল, 'গিফট হচ্ছে গিফট। গিফটের মধ্যে সস্তা দামি কোনো ব্যাপার না। বাঙালিদের স্বভাব হচ্ছে, কোনো উপহার পেলেই হিসাব-নিকাশে বসে যাবে। দাম কত কি!'

নাসরিন বলল, ‘আমি কোনো হিসাব-নিকাশ করছি না ভাইয়া। লিপগ্লসটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।’

‘দ্যাটস গুড। মাই গড, নাসরিন তোর ভাগ্য ভালো আরেকটা জিনিস পাওয়া গেছে ওইজা বোর্ড। এতক্ষণ চোখেই পড়েনি।’

‘ওইজা বোর্ড আবার কী?’

আলাউদ্দিন লুডু বোর্ডের মতো একটা বোর্ড মেলে ধরল। চারদিকে এ থেকে জেড পর্যন্ত লেখা। মাঝখানে দু’টা ঘর— একটায় লেখা ‘ইয়েস’, একটায় ‘নো’।

‘এটা কি কোনো খেলা ভাইয়া?’

‘খেলাই বলতে পারিস। ভূত নামানোর খেলা। প্ল্যানচেটের নাম শুনিসনি? এটা দিয়ে প্ল্যানচেটের মতো করা যায়।’

‘কীভাবে?’

‘লাল বোতামটা দেখছিস না? দু’জন বা তিনজন মিলে খুব হালকাভাবে তর্জনি দিয়ে এটাকে টাচ করে রাখবি, কোনো রকম প্রেসার দেয়া যাবে না। বোতামটাকে রাখবি বোর্ডের ঠিক মাঝখানে। ঘরের আলো কমিয়ে দিবি, আর মনে-মনে বলবি— If any good soul passes by—please come.’ তখন আত্মা বোতামে চলে আসবে। বোতাম নড়তে থাকবে। তখন কোনো প্রশ্ন করলে আত্মা জবাব দেবে।’

‘কীভাবে জবাব দিবে?’

‘বোতামটা অক্ষরগুলির উপর যাবে। কোন কোন অক্ষরের উপর যাবে সেটা খেয়াল রাখতে হবে। ভূতটার নাম যদি হয় রহিম, তাহলে প্রথমে যাবে ‘আর’-এর উপর, তারপর ‘এ’-এর উপর, তারপর ‘এইচ— বুঝতে পারছিস?’

‘বোতামটা আপন-আপনি যাবে?’

‘না, আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে রাখতে হবে।’

‘ভাইয়া, ভূত কি সত্যি সত্যি আসে?’

‘আরে দূর দূর। ভূত আছে না-কি যে আসবে। আমেরিকানদের এটা হচ্ছে পয়সা বানানোর একটা ফন্দি। এত সহজে আত্মা চলে এলে তো কাজই হতো।’

আলাউদ্দিন আমেরিকানদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে মজার মজার গল্প করতে লাগল। আলাউদ্দিনের মা— রাহেলার মনে ক্ষীণ আশা— গল্প যেভাবে জমেছে তাতে মনে হয় না ছেলে বৌকে নিয়ে হোটেল যাবে। যদি সত্যি সত্যি যায় তাহলে তিনি মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না। এমনিতেই বিদেশী বৌয়ের কথায় অনেকেই হাসাহাসি করছে। জামশেদ সাহেবের স্ত্রী গত সপ্তাহে এসে সরু গলায় বললেন, ‘বাঙালি ছেলেরা যে বিদেশে গিয়েই বিদেশিনী বিয়ে

করে ফেলে ঐ সব বিদেশিনীরা নিঁচু জাতের। ঝি-জমাদারনী এই সব।
ভদ্রলোকের মেয়েরা বাঙালি বিয়ে করতে যাবে কেন? ওদের গরজটা কী?’

রাহেলা ক্ষীণ গলায় বললেন, ‘আপনাকে কে বলেছে?’

‘বলবে আবার কে? এ তো সবাই জানে। বাঙালি ছেলেগুলির সাদা চামড়া
দেখে আর হুঁশ থাকে না। ওরা তো প্রথম প্রথম জানে না যে, ঐ দেশের ঝিয়ের
চামড়াও সাদা, আবার মেথরানির চামড়াও সাদা।’

রাহেলা এইসব কথার কোনো জবাব দিতে পারেননি। শুধু শুনে গেছেন।
এখন যদি ছেলে বউ নিয়ে হোটেলে চলে যায় তাহলে কী হবে? সবাই তো গায়ে
থুথু দিবে।

অবিশ্যি তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন ছেলে এবং ছেলের বউয়ের জন্যে
একটা ঘর ভালোমতো সাজাতে। নাসরিনের ঘরটাই সাজাতে হয়েছে। দেয়ালে
চুনকাম করা হয়েছে। টিউব লাইট লাগান হয়েছে। একটা ফ্যান ঘরে আছে।
সেই ফ্যানে ঘটাং ঘটাং শব্দ হয় বলে নতুন একটা সিলিং ফ্যান কেনা হয়েছে।
তারপরেও যদি ছেলে বউ নিয়ে হোটেলে উঠে তিনি কী আর করবেন? তাঁর আর
কী করার আছে?

রাতের খাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আলাউদ্দিন বলল, ‘আমরা তাহলে উঠি
মা।’

রাহেলা ক্ষীণ গলায় বললেন, ‘কোথায় যাবি?’

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বলল, ‘কোথায় যাবি বলছ কেন মা? আগেভাগে
তো বলেই রেখেছি একটা ভালো হোটেলে উঠতে হবে। ক্লারা গত রাতে এক
ফোঁটা ঘুমায় নি। বেচারি গরমে সিদ্ধ হয়ে গেছে। বাতাস নেই এক ফোঁটা।’

‘ফ্যান তো আছে।’

‘বাতাস গরম হয়ে গেলে ফ্যানে লাভ কী? তোমরা গরম দেশের মানুষ, ওর
কষ্টটা কি বুঝবে? আমি নিজেই সহ্য করতে পারছিলাম না, আর ও ...’

‘বউকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে উঠলে লোকে নানান কথা বলবে।’

আলাউদ্দিন এই কথায় রাগে জ্বলতে লাগল। হড়বড় করে এমন সব কথা
বলতে লাগল যার তেমন কোনো অর্থ নেই।

তার বাবা মনসুর সাহেব যিনি কখনোই কিছু বলেন না তিনি পর্যন্ত বলে
ফেললেন, ‘তুই খামাখা চিৎকার করছিস কেন?’

‘আমি খামাখা চিৎকার করছি? আমি খামাখা চিৎকার করছি? আমি শুধু
বলছি লোকজনের কথা নিয়ে তোমরা নাচানাচি কর কেন? তোমরা যদি না খেয়ে
মর লোকজন এসে তোমাদের খাওয়াবে? প্রতিমাসে দেড়শ’ ডলারের যে
মনিঅর্ডারটা পাও সেটা কি লোকজন দেয়? বল, দেয় লোকজন?’

মনসুর সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'যা, যেখানে যেতে চাস।'

আলাউদ্দিন তিক্ত গলায় বলল, 'তোমরা ভাবছ ছেলে ঘর ছেড়ে হোটেলে চলে যাচ্ছে, কাজেই ছেলে পর হয়ে গেল—এটা ঠিক না।'

'আমরা কিছু ভাবছি না। তুই আর ভ্যাজভ্যাজ করিস না। মাথা ধরিয়ে দিয়েছিস।'

'মাথা ধরিয়ে দিয়েছি? আমি মাথা ধরিয়ে দিয়েছি?'

আট বছর পর ফিরে-আসা পুত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় রাতেই বাড়ির সদস্যদের খণ্ডপ্রলয়ের মতো হয়ে গেল। নাসরিন মনে-মনে বলল, 'বেশ হয়েছে। খুব মজা হয়েছে। আমি খুব খুশি হয়েছি।'

ক্লারা ঝগড়ার ব্যাপারটা কিছুই বুঝল না। একবার শুধু জ্র কুঁচকে বলল, 'তোমরা এত চেষ্টা করে কথা বল কেন?' বলেই জবাবের অপেক্ষা না করে বসার ঘরে টিকটিকি দেখতে গেল। বাংলাদেশের এই ছোট্ট গ্রাম তার হৃদয় হরণ করেছে। সে টিকটিকির একুশটা ছবি এ পর্যন্ত তুলেছে। ম্যাকরো ল্যাম্প আনা হয়নি বলে খুব আফসোসও করছে। ম্যাকরো ল্যাম্পটা থাকলে ক্রোজ-আপ নেয়া যেত।

খুব সংগত কারণেই গভীর রাত পর্যন্ত এ পরিবারের কোনো সদস্য ঘুমুতে পারল না। বারান্দায় বসে রাহেলা ক্রমশঃ অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। একসময় মনসুর সাহেব বললেন, 'আর কেন? না, চোখে ঘা হয়ে যাবে। তোমার ছেলের আশা ছেড়ে দাও। বিদেশী পেট্রল বিয়ে করে ধরাকে সরা দেখছে। হারামজাদা।'

নাসরিন আজ ওর ঘরে ঘুমুতে পারছে।

ঘরে ঢুকে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কত আগ্রহ করে তারা সবাই মিলে ঘর সাজিয়ে দিয়েছে, তবু ভাইয়ার পছন্দ হলো না। এই ঘরটা কি হোটেলের চেয়ে কম সুন্দর হয়েছে? মাথার পাশে টেবিল ল্যাম্প। পায়ে দিকের দেয়ালে সূর্যাস্তের ছবি। খাটের পাশে মেরুণ রঙের বেড সাইড কার্পেট। জানালা খুলে ফুল স্পীডে ফ্যান ছেড়ে দিলে খুব-একটা গরম কি লাগে? কই তার তো লাগছে না। তার তো উল্টো কেমন শীত শীত লাগছে।

সে টেবিল ল্যাম্প জ্বালাল। এত বড় খাটে একা ঘুমুতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। ভাইয়া থাকবে না জানলে বড় আপাকে জোর করে রেখে দিত। নাসরিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। আজ রাতটা তাদের জন্যে খুব খারাপ রাত। আজ রাতে তাদের কারোরই ঘুম হবে না। একা একা জেগে থাকা খুব কষ্টের।

ভূত নামালে কেমন হয়? ওইজা বোর্ড খুলে সে যদি বোতামটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে বসে থাকে তাহলে কি কিছু হবে? যদি কোনো আত্মা চলে আসে ভালোই হয়। আত্মার সঙ্গে গল্প করা যাবে। মুশকিল হচ্ছে— এই আত্মাগুলি আবার কথা বলে না। বোতাম ঠেলে ঠেলে মনের ভাব প্রকাশ করে।

নাসরিন দরজা বন্ধ করে ওইজা বোর্ড নিয়ে বসল। তর্জনি দিয়ে বোতামটা ছুঁয়ে নরম গলায় বলল, ‘আমার আশপাশে যদি কোনো বিদেশী আত্মা থাকেন তাহলে তাঁদের মধ্য থেকে একজন কি দয়া করে আসবেন? যদি আসেন তাহলে আমার মনটা একটু ভালো হবে। কারণ, আজ আমার মনটা খুব খারাপ। কেন খারাপ তা তো আপনারা খুব ভালো করেই জানেন। পুরো ঘটনার সময় নিশ্চয়ই আপনারা আশপাশে ছিলেন। ছিলেন না?’ এই পর্যন্ত বলেই নাসরিন চমকে উঠল। ডান হাতটা একটু যেন কাঁপছে।

বোতামটা কি নড়তে শুরু করেছে? অসম্ভব। হতেই পারে না। এ কি! বোতামটা এগিয়ে গেল কীভাবে? নাসরিন নিজেই হয়তো নিজের অজান্তে বোতাম ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেছে। খানিকটা ভয় এবং খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে নাসরিন অপেক্ষা করছে। হচ্ছেটা কী?

বোতাম ‘ইয়েস’ লেখা ঘরে কিছুক্ষণ থামে আবার আগের জায়গায় ফিরে এল। নাসরিন শব্দ করেই বলল, বাহ, বেশ মজা তো! পরবর্তী কিছুক্ষণ ‘ইয়েস’ এবং ‘নো’তে বোতাম ঘুরতে লাগল। নাসরিনের শুরুর ভয় খানিকটা কমে গেল। যদিও তখনো বুক ধকধক করছে।

ওইজা বোর্ডে ‘ইয়েস’ এবং ‘নো’ ছাড়া আরো দুটি ঘর আছে। সেগুলি হচ্ছে— ‘আমি উত্তর দেব না’, ‘আমি জানি’। বোতামটা এইসব ঘরেও মাঝে মাঝে এল। প্রশ্ন এবং উত্তর এইভাবে সাজান যায়।

‘আপনি কি এসেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনি কি এই বাড়িতেই থাকেন?’

‘না।’

‘আপনি কোথায় থাকেন?’

‘আমি উত্তর দেব না।’

‘আজ আমাদের সবার খুব মন খারাপ সেটা কি আপনি জানেন?’

‘না।’

‘কী জন্যে আমাদের মন খারাপ সেটা কি বলব?’

‘না।’

‘শুধু না-না করছেন কেন? একটু শুনলে কী হয়? বলি?’

‘হ্যাঁ।’

‘তার আগে বলুন আপনার নাম কী?’

বোতামটা ঘুরতে-ঘুরতে এক্স ঘরে গিয়ে থামল। নাসরিন বলল, ‘এক্স দিয়ে বুঝি কারো নাম হয়? ঠিক করে নাম বলুন।’

‘আমি জানি না।’

‘আপনি জানেন না মানে? আপনার কি নাম নেই?’

‘না।’

‘ভূতদের নাম থাকে না।’

‘আমি জানি না।’

‘সে-কি! আমার তো ধারণা প্রেতাত্মারা সব জানে। আর আমি আপনাকে যা-ই জিজ্ঞেস করছি— আপনি বলছেন আমি জানি না। আচ্ছা বলুন তো, উনিশকে তেরো দিয়ে গুণ দিলে কত হয়?’

‘আমি জানি না।’

‘আমিও জানি না। তবে আপনি যদি বলতেন তাহলে গুণ করে বের করতাম। আপনি কি গুণ অঙ্ক জানেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আচ্ছা, আত্মাদের কি অঙ্ক করতে হয়?’

বোতাম এক জায়গায় স্থির হয়ে রইল। উত্তর দিল না। নাসরিন বলল, ‘আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘প্লিজ, আমার ওপর রাগ করবেন না। কেউ আমার সাথে রাগ করলে আমার খুব মন খারাপ থাকে। এমনিতেই আজ আমার খুব মন খারাপ। আপনি কি জানেন আমার যে মন খারাপ?’

‘হ্যাঁ।’

‘কেন মন খারাপ সেই ঘটনাটা বলি? বলব?’

‘হ্যাঁ।’

নাসরিন আজ সারা দিনের ঘটনা বলতে শুরু করল। বলতে বলতে দু’বার কেঁদে ফেলল। তার কাছে একবারও মনে হলো না সে হাস্যকর একটা কাণ্ড করছে। এইসব গল্প বোতামটাকে বলার কোনো মানে আছে?

নাসরিন ঘুমুতে গেল রাত তিনটায়। খুব চমৎকার ঘুম হলো। ঘুমিয়ে এত তৃপ্তি অনেকদিন সে পায়নি। তবে ঘুমের মধ্যে সারাক্ষণই মনে হলো— একজন বুড়ো মানুষ তার গায়ে হাত রেখে শুয়ে আছেন। বুড়ো মানুষটার শরীরে চুরুটের কড়া গন্ধ।

২.

ভোর সাতটায় আলাউদ্দিন এসে উপস্থিত।

সে ভোর হতেই বাসায় চলে আসবে রাহেলা তা ভাবেন নি। আগের রাতের সব দুঃখ তিনি ভুলে গেলেন। হাসি মুখে বললেন, 'বৌমাকে আনলি না?'

'ও ঘুমুচ্ছে। ঘুম ভাঙলে চলে আসবে। নোট লিখে এসেছি।'

'আসতে পারবে এক একা?'

'আসতে পারবে না মানে? কী যে তুমি বল মা! ওকি আমাদের দেশের মেয়ে যে স্বামী ছাড়া এক পা ফেলতে পারে না?'

'তা তো ঠিকই।'

রাহেলা নাশতার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আলাউদ্দিনকে এখন অনেক সহজ ও স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। রান্নাঘরে মা'র পাশে বসে অনেক গল্প করতে লাগল। নাসরিন এবং মনসুর সাহেবও গল্পে যোগ দিলেন।

'তুই তো ঐ দেশেই থেকে যাবি?'

'হ্যাঁ। এই দেশে আছে কী বলো? এই দেশে থাকলে তো মরতে হবে না খেয়ে।'

'অনেকেই তো আছে।'

'কী রকম আছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'তাও ঠিক।'

নাসরিনও সহজভাবে ভাইয়ের সঙ্গে অনেক গল্প করল। এখন ভাইয়াকে খুব আপন লাগছে। কথা বলতে ভালো লাগছে।

'ভাইয়া, কাল ওইজি বোর্ড দিয়ে ভূত এনেছিলাম।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনা-আপনি বোতাম এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যায়।'

'তুই নিশ্চয়ই ঠেলেছিস।'

'অনেষ্ট ভাইয়া। মোটেই ঠেলি নি।'

'তুই না ঠেলেও তোর সাব-কনশাস মাইন্ড ঠেলেছে। আমি নিউজ উইক পত্রিকায় দেখেছিলাম— পুরো ব্যাপারটাই আসলে সাব-কনশাস মাইন্ডের।'

এমন সহজ-স্বাভাবিকভাবে যে মানুষটা গল্প করল সেই আবার ঠিক সন্ধ্যাবেলা একটা ঝগড়া বাঁধিয়ে বসল। সাধারণ ঝগড়া না— কুৎসিত ঝগড়া। ব্যাপারটা এ-রকম :

ক্লারা খাবার পানি চেয়েছে।

নাসরিন গ্লাসে করে পানি দিয়েছে। এক চুমুকে সেই পানি খেয়ে ক্লারা

বলল, 'থ্যাংকস। খুব ভালো পানি।'

'ক্লারা এখন কিছু-কিছু বাংলা বলার চেষ্টা করে।'

আলাউদ্দিন বলল, 'ফোটানো পানি দিয়েছিস তো? বয়েলড ওয়াটার?'

'না ভাইয়া। টেপের পানি।'

'কেন? তোদেরকে কি আগে বলিনি সব সময় বয়েলড পানি দিবি। পানি ফুটিয়ে পরে বোতলে ভরে রাখবি। সামান্য কথাটা মনে থাকে না? বয়স যত বাড়ছে তোর বুদ্ধি দেখি তত কমছে।'

নাসরিনের মুখ কালো হয়ে গেল।

মনসুর সাহেব মেয়েকে রক্ষা করার জন্যে বললেন, 'একবার মাত্র খেয়েছে কিছু হবে না। আমরা তো সব সময় খাচ্ছি।'

'তোমাদের খাওয়া আর ক্লারার খাওয়া এক হলো? মাইক্রো অরগেনিজম খেয়ে খেয়ে তোমরা ইমমিউন হয়ে আছ। ও তো হয়নি।'

'যা হবার হয়ে গেছে। এখন চিৎকার করে আর কী হবে?'

'চিৎকার করছি না-কি? তোমাদের সঙ্গে দেখি সামান্য আর্গুমেন্টও করা যায় না।'

নাসরিন অনেক চেষ্টা করেও কান্না আটকাতে পারল না। মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে দ্রুত বের হয়ে গেল। রাহেলা মৃদু স্বরে বললেন, 'দিলি তো মেয়েটাকে কাঁদিয়ে। যা অভিমানী মেয়ে। রাতে তো খাবেই না।'

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বলল, 'এত অল্পতেই যদি চোখে পানি এসে যায় তাহলে তো মুশকিল। একটা ভুল করলে আর ভুল ধরিয়ে দেয়া যাবে না?'

'ও ছেলে মানুষ।'

'ছেলেমানুষ কি বলছ? সতেরো-আঠারো বছরে কেউ ছেলেমানুষ থাকে? তোমাদের জন্যে বড় হতে পারে না। তোমরা ছেলেমানুষ বানিয়ে রেখে দাও।'

আলাউদ্দিন রাতে খেল না। বউকে নিয়ে না-কি নিরিবিলি কোথাও ডিনার করবে।

নাসরিন সেই রাতে ঘুমুতে গেল না খেয়ে। অনেকক্ষণ জেগে রইল, ঘুম এল না। তার খুব কষ্ট হচ্ছে। মরে যেতে ইচ্ছা করছে। অনেক রাতে সে ওইজা বোর্ড নিয়ে বসল। আজ আর দেরি হলো না। বোতামে হাত রাখামাত্র বোতাম নড়তে লাগল। আজ সে উত্তরগুলিও শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়ে দিচ্ছে না। অক্ষরের উপর ঘুরে ঘুরে—ছোট ছোট শব্দ তৈরি করছে। মজার মজার শব্দ। নাসরিন এই শব্দগুলিতে গুরুত্ব দিচ্ছে না, আবার গুরুত্ব দিচ্ছে। একবার ভাবছে—এগুলি অবচেতন মনের ইচ্ছা। আরেকবার ভাবছে—হতেও তো পারে। হয়তো সত্যি কেউ এসেছে। পৃথিবীতে রহস্যময় ব্যাপারটা তো হয়। ক'টা রহস্যের সমাধান

আমরা জানি? কী যেন বলেছেন শেখপিয়র— There are many things...

‘আপনি কি এসেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘কাল যিনি এসেছিলেন আজও তিনিই এসেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনার নাম?’

‘X’

‘কী অদ্ভুত নাম! আচ্ছা আপনি কি জানেন আজ আমার মন কালকের চেয়েও খারাপ?’

‘জানি।’

‘কী করা যায় বলুন তো?’

‘আমি জানি না।’

‘আপনি কি জানেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে?’

‘জানি’

‘ভাইয়া বলছিল এই যে আপনি নানান কথা বলছেন এগুলি আসলে আমার মনের অবচেতন ইচ্ছার প্রতিফলন।’

‘হাতে পারে।’

‘ভাইয়াকে আমার দারুণ পছন্দ।’

‘আমি জানি।’

‘ঐ পচা মেয়েটা সব নষ্ট করে দিয়েছে। আমার মনে হয় মেয়েটা ডাইনী। ও আশপাশে থাকলেই ভাইয়া অন্য রকম হয়ে যায়। তখন সবার সঙ্গে ঝগড়া করে।’

‘জানি।’

‘কী করা যায় বলুন তো?’

‘মেয়েটাকে মেরে ফেল।’

‘ছিঃ! কী যে বলেন! মানুষকে মেরে ফেলা যায় না-কি?’

‘হ্যাঁ, যায়।’

‘কীভাবে?’

‘অনেকভাবে।’

‘আপনার কথাবার্তার কোনো ঠিক নেই। আপনি কি করে ভাবলেন আমি একটা মানুষ মারতে পারি।’

‘সবাই পারে।’

‘আপনি পারেন?’

‘না।’

‘আপনি পারেন না কেন?’

‘আমি জানি না।’

‘মানুষ মারা যে মহাপাপ এটা কি আপনি জানেন?’

‘আমি জানি না।’

‘আপনি আসলে কিছুই জানেন না।’

‘হতে পারে।’

‘তাছাড়া আপনি আরেকটা জিনিস ভুলে যাচ্ছেন— ধরুন, আমি ঐ পচা মেয়েকে মেরে ফেললাম, তখন পুলিশ কি আমাকে ছেড়ে দেবে? আমাকে ধরে নিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে না?’

‘তা দিতে পারে।’

‘আর ভাইয়ার অবস্থাটা তখন চিন্তা করে দেখুন। কী রকম রাগ সে করবে। টাকাপয়সা দেয়া বন্ধ করে দেবে। আমরা তখন না খেয়ে মারা যাব। বাবার এক পয়সা রোজগার নেই, আমাদের ব্যাংকে টাকাপয়সা নেই। ভাইয়া প্রতিমাসে যে টাকা পাঠায় এটা দিয়ে আমরা চলি। ভাইয়া প্রতিমাসে কত পাঠায় বলুন তো?’

‘আমি জানি না।’

‘এক শ’ ডলার। এক শ’ ডলারে পুর্নোদেশী টাকায় কত হয় তা জানেন?’

‘না।’

‘বেশি না, সাড়ে তিন হাজার। মা এবার কী ঠিক করে রেখেছেন জানেন? মা ঠিক করে রেখেছেন— ভাইয়াকে বলবে আরো কিছু বেশি টাকা পাঠাতে। এক শ’ ডলারে হচ্ছে না। জিনিসপত্রের যা দাম। আপনাদের তো আর কোনো কিছু কিনতে হয় না। আপনারা আছেন সুখে, তাই না?’

‘আমি জানি না।’

‘আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ভাইয়া টাকার পরিমাণ বাড়াবে?’

‘আমি জানি না।’

‘না বাড়ালে আমাদের খুব কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে বাড়াবে না। বিয়ে করেছে, খরচ বেড়েছে। তাই না?’

‘হতে পারে।’

‘টাকা না বাড়ালে কী হবে বলুন তো? আমার আরেক ভাই আছেন— জসিম ভাইয়া। চিটাগাং-এ থাকেন। তাঁর টাকাপয়সা ভালোই আছে। কিন্তু সে আমাদের একটা পয়সা দেয় না। আমরা যদি না খেয়ে মরেও যাই ফিরে তাকায় না। কী করা যায় বলুন তো?’

‘ক্লারাকে মেরে ফেলা যায়।’

‘বারবার আপনি এক কথা বলেন কেন? আপনার কাছে বুদ্ধি চাচ্ছি।’

‘ওকে মেরে ফেলাই একমাত্র বুদ্ধি।’

‘যান। আপনার সাথে আর কথাই বলব না।’

নাসরিন ওইজা বোর্ড বন্ধ করে ঘুমুতে গেল। আজ আর গত রাতের মতো চট করে ঘুম এল না। একটু যেন ভয় ভয় করতে লাগল। ওইজা বোর্ড টেবিলের উপর রাখা হয়েছে। তার কাছেই একটা চেয়ার। নাসরিনের কেন জানি মনে হচ্ছে চেয়ারে ঐ মিঃ এক্স বসে আছেন। বুড়ো ধরনের একজন মানুষ, যার গায়ে চুরুটের গন্ধ। ঐ বুড়ো মানুষটার একটা চোখ ছানি-পড়া। গায়ে চামড়ার কোট। সেই কোটেও এক ধরনের ভ্যাপসা গন্ধ।

নাসরিন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তার স্পষ্ট মনে হচ্ছে কেউ একজন আছে। নাসরিন ভয়ে ভয়ে বলল, ‘আপনি কি আছেন?’ চেয়ার নড়ে উঠল। সত্যি নড়ল? না মনের ভুল। নাসরিন ক্ষীণ স্বরে বলল, ‘আপনি দয়া করে বসে থাকবেন না। চলে যান। যখন আপনাকে দরকার হবে আমি ডাকব?’

আবার চেয়ার নড়ল। নিশ্চয়ই মনের ভুল।

নাসরিনের বড় ভয় লাগছে। জুন মাসের এই প্রচণ্ড গরমের রাতেও একটা চাদরে সারা শরীর ঢেকে সে শুয়ে রইল। ঘুম এল একেবারে শেষ রাতে। তাও গাঢ় ঘুম না। আজোবাজে সব স্বপ্ন। একটা স্বপ্ন তো খুবই ভয়ঙ্কর। তার শাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। সে অনেক চেষ্টা করছে আগুন নেভাতে। পারছে না। যতই চেষ্টা করছে, আগুন আরো ছড়িয়ে পড়ছে। একজন বুড়োমতো লোক চুরুট হাতে পুরো ব্যাপারটা দেখছে কিন্তু কিছুই করছে না।

টাকার পরিমাণ বাড়ানোর দাবি রাহেলা অনেক ভণিতার পর করলেন। বলতে তার খুবই লজ্জা লাগল কিন্তু কোনো উপায় নেই।

আলাউদ্দিন তখন চা খাচ্ছিল। চায়ের কাপ নামিয়ে বিস্মিত গলায় বলল, ‘টাকা বাড়াতে বলছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘এক শ’ ডলারে তোমাদের হচ্ছে না?’

‘না।’

‘তোমরা কি পাগল-টাগল হয়ে গেলে? আমেরিকায় কি আমি টাকার চাষ করছি? ট্রাক্টর দিয়ে জমি চষে টাকার চারাগাছ বুনে দিচ্ছি?’

রাহেলা ক্ষীণ স্বরে বললেন, ‘সংসার অচল।’

‘সংসার তো আমারটা আরো বেশি অচল। বিয়ে করেছি— নতুন সংসার। এ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছি। একটা জিনিস নেই এ্যাপার্টমেন্টে। ক্লারা অফিস করে,

তার একটা আলাদা গাড়ি দরকার। তোমাদের টাকা তো বাড়াতে পারবই না বরং কিছু কমিয়ে দেব বলে ভাবছি।’

‘আমাদের চলবে কীভাবে?’

‘জসিম ভাইকে বল। তারও তো কিছু দায়িত্ব আছে। সে তো গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরছে।’

রাহেলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। আলাউদ্দিন বিরক্ত স্বরে বলল, ‘এ-রকম ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলবে না। নিশ্বাস ফেললে সমস্যার সমাধান হয় না।’

৩

নাসরিন ওইজা বোর্ড নিয়ে বসেছে। রাত প্রায় দুটো। আজ অন্য দিনের মতো গরম নয়। সন্ধ্যাবেলায় তুমুল বর্ষা হয়েছে। আকাশ মেঘলা। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আরো হয়তো বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির ছাঁট আসছে বলে জানালা বন্ধ।

‘আপনি আছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আমাদের কী বিপদ হয়েছে শুনেছেন?’

‘না।’

‘ভাইয়া টাকাপয়সা বেশি তো পারাবই না বরং আরো কমিয়ে দিবে।’

‘ও আচ্ছা।’

‘কী করব আমরা বলুন তো?’

‘মেয়েটাকে মেরে ফেল।’

‘এইটা ছাড়া বুঝি আপনার মাথায় আর বুদ্ধি নেই?’

‘না। এটা সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি।’

‘আপনার সঙ্গে আমার কথা বলতেই ইচ্ছা করছে না।’

‘শুনে দুঃখিত হলাম।’

‘আচ্ছা, ঐ দিন আপনি আমাকে ভয় দেখালেন কেন? আপনি কি ঐ চেয়ারটায় বসে ছিলেন? আমার মনে হয় আপনি এখনো চেয়ারটায় বসে আছেন।’

‘ক্লারাকে আগুনে পুড়ে মারলে কেমন হয়?’

‘আপনি আজোবাজে কথা বলবেন না তো। আচ্ছা, বলুন তো ঐদিন কি আপনি চেয়ারে বসে ছিলেন?’

‘তুমি একটু সাহায্য করলেই হয়।’

‘কী সাহায্য?’

‘যখন আগুন জ্বলে উঠবে তখন এই ঘরের দরজা তুমি বাইরে থেকে বন্ধ করে দেবে।’

‘আপনার কথাবার্তার আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারছি না।’

‘আগুন লাগার পর মেয়েটা যাতে বেরুতে না পারে।’

‘কী বলছেন আপনি?’

‘আগুন লাগার পর সে ছুটে বের হতে চাইবে। তখন তাকে শুধু আটকান। অল্প কিছুক্ষণ আটকে রাখা।’

‘চুপ করুন তো।’

‘ভালো বুদ্ধি দিচ্ছি।’

‘আপনার বুদ্ধি চাই না।’

‘তুমি আমার বন্ধু।’

‘না, আমি আপনার বন্ধু নই।’

আজ রাতে নাসরিন এক পলকের জন্যেও চোখ এক করতে পারল না। মনে-মনে ঠিক করে ফেলল, ওইজা বোর্ডটা ভোর হতেই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে। কী সর্বনাশের কথা! বোতামটা এমন অদ্ভুত কথা বলছে কেন?

8.

আগামী কাল রাত দু’টার ফ্লাইটে আলাউদ্দিন চলে যাবে। শেষ রাতটা এ বাড়িতে থাকবার জন্যে এসেছে। দীর্ঘদিন হোটেলে থাকায় তাকে বেশ লজ্জিতও মনে হচ্ছে। আজ রাতটা থাকতে তেমন কষ্ট হবে না। বর্ষা শুরু হয়েছে। আবহাওয়ার অসহনীয় নয়। বৃষ্টি হচ্ছে।

আলাউদ্দিন কলার ঘরে সবার সঙ্গে গল্প করছে। গল্প বেশ জমে উঠেছে। প্রথমদিকে আমেরিকায় সে কী-সব বিপদে পড়েছিল তার গল্প। প্রতিটি গল্পই আগে অনেকবার করে শোনা, তবু সবাই খুব আগ্রহ করে শুনছে।

ঘরে ইলেকট্রিসিটি নেই। বিকেলে ঝড়-বৃষ্টির সময় ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছে, এখনো আসেনি। আজ রাতে আর আসবে বলে মনে হয় না। ঝড়-বৃষ্টি এখনো হচ্ছে। বাতাসের শৌ-শৌ শব্দ, বৃষ্টির ঝমঝমানি। দমকা হাওয়ার ঝাপ্টা, চমৎকার পরিবেশ।

একটিমাত্র হারিকেন, সেটা বসার ঘরে। হারিকেন ঘিরে সবাই বসে আছে।

ক্লারা ওদের গল্পে কোনো মজা পাচ্ছিল না। ঘনঘন হাই তুলছিল। মাঝরাতে সে ঘুমুতে গেল। নাসরিন তার ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

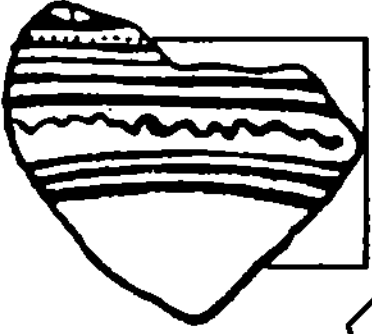
দুর্ঘটনা ঘটল তারও মিনিট দশেক পর। গল্প তখন খুব জমে উঠেছে। শুরু হয়েছে ভূতের গল্প। রাহেলা ছোটবেলায় নিশির ডাক শুনে ঘড় ছেড়ে বের হয়ে

পড়েছিলেন— সেই গল্প হচ্ছে। গা-ছমছমানো পরিবেশ। ঠিক তখন তীক্ষ্ণ গলায় নাসরিন বলল, ‘ঘর এত আলো হয়ে গেছে কেন ভাইয়া?’

তার কথা শেষ হবার আগেই শোনা গেল, গোঙানি ও চিৎকার। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে এবং ক্লারা চৈঁচাচ্ছে, ‘Oh God! Oh God!’

সবাই ছুটে গেল শোবার ঘরের দিকে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

দুর্ঘটনা তো বটেই। দুর্ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। বাতাসে মোমবাতি কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল নেটের মশারিতে। সেখান থেকে ক্লারার নাইট গাউনে। সিনথেটিক কাপড়— মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠল। খুবই সহজ ব্যাখ্যা। শুধু একটি ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। ক্লারার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। কেউ-একজন বাইরের থেকে শিকল তুলে দিয়েছিল। আগুন লেগে যাবার পর ক্লারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে ঘর থেকে বেরুতে। বেরুতে পারেনি। চিৎকার করে দরজা খুলতে বলেছে— ঝড়-বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের সঙ্গে তার চিৎকারও কেউ শুননি। ব্যাকুল হয়ে শেষ মুহূর্তে সে ঈশ্বরকে ডাকছিল। ঈশ্বর মানুষের কাতর আহ্বানে সাধারণত বিচলিত হন না।



শ্যামল ছায়া

খুটখাট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

কয়েক মুহূর্ত সে নিশ্বাস নিতে পারল না, দম আটকে এল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে রহিমার এ রকম হয়। আজ একটু বাড়াবাড়ি হলো, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে। রহিমা ভয় পেয়ে ভাঙা গলায় ডাকল, ‘মজিদ মিয়া, ও মজিদ মিয়া।’

মজিদ শেষপ্রান্তে থাকে। এত দূরে গলার আওয়াজ পৌঁছানোর কথা নয়। তবু রহিমার মনে হলো মজিদ বিছানা ছেড়ে উঠেছে, দরজা খুলছে শব্দ করে! এই আবার যেন কাশল। রহিমা চিকন সুরে দ্বিতীয়বার ডাকল, ‘ও মজিদ মিয়া, ও মজিদ।’

কিন্তু কেউ এল না। মজিদ তাহলে শুনতে পায়নি। চোখে পানি এসে গেল

রহিমার। হাঁপাতে হাঁপাতে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর একসময় হঠাৎ করে ব্যথাটা মরে গেল। নিশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। একটু আগেই যে মরে যাবার মতো অনুভূতি হয়েছে তাও পর্যন্ত মনে রইল না।

নিঃশব্দে খাট থেকে নেমে এল রহিমা। বালিশের নিচে থেকে দেয়াশলাই নিয়ে হারিকেন ধরাল। খুব আন্তে অনেকটা সময় নিয়ে দরজার খিল খুলল। রাতের বেলা ঝন্ঝন্ করে দরজা খুললে মজিদ বিরক্ত হয়। বাইরে বেশ শীত, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কার্তিক মাসের শুরুতেই শীত নেমে গেছে এবার। বাঁ হাতে হারিকেন উঁচু করে ধরে পা টিপে টিপে মজিদের ঘরের পাশে এসে দাঁড়াল রহিমা। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে মজিদ এখনো জেগে। বুকের নিচে বালিশ দিয়ে উঁবু হয়ে শুয়ে বই পড়ছে। ঘরের মেঝেতে আধ-খাওয়া সিগারেটের আন্তরণ। কটু গন্ধ আসছে সিগারেটের। রহিমা কোনো সাড়াশব্দ করল না। চুপচাপ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে লাগল।

রহিমা ভেবে পায় না এত রাত জেগে কী পড়ে ছেলেটা। পরীক্ষার পড়া তো কবেই শেষ হয়েছে। রহিমা অনেকক্ষণ হারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার যখন বিমুনি এসে গেল তখন মৃদু গলায় ডাকল, ‘ও মজিদ মিয়া।’

মজিদ বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, ‘ঠিক করে ডাকো মা। কী সব সময় মিয়া মিয়া কর!’

রহিমা একটু অপ্রস্তুত হলো। মজিদকে মজিদ মিয়া ডাকলে সে রাগ করে কিন্তু রহিমার একটুও মনে থাকে না। রহিমা বলল, ‘শুয়ে পাড় মজিদ।’

‘তুমি ঘুমাও গিয়ে। ঘ্যান্ঘ্যান করো না।’

রহিমা মৃদু গলায় বলল, ‘জানালা বন্ধ করে দেই? ঠাণ্ডা বাতাস।’

মজিদ সে-কথার জবাব দিল না। বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগল। রহিমা তবুও দাঁড়িয়ে রইল। তার ঘুমুতে ইচ্ছে করছিল না। কে জানে আবার হয়তো ঘুম ভেঙে যাবে, দম বন্ধ হয়ে যাবার কষ্টটা নতুন করে শুরু হবে। মজিদ রাগী গলায় বলল, ‘যাও না মা, দাঁড়িয়ে থেকো না।’

রহিমা জানালার পাশ থেকে সরে এল। মজিদকে তার ভয় করে। অথচ জন্মের সময় সে এই এতটুকুন ছিল। রাতদিন ট্যা ট্যা করে কাঁদত। মজিদের বাবা বলত, ‘এই ছেলে বাঁচবে না গো, এরে বেশি মায়া করলে কষ্ট পাবে।’

‘ছিঃ ছিঃ! কী অলক্ষুণি কথা! বাপ হয়ে কেউ এ-রকম বলে?’ লোকটার ধারাই এমন, কথার কোনো মা-বাপ নাই।

রহিমা এসে শুয়ে পড়ল। ঘুমুতে তার ভালো লাগে না। তাই ঘুম তাড়াতে নানা কথা ভাবে। রাত জেগে ভাববার মতো ঘটনা তার বেশি নেই। ঘুরেফিরে প্রতি রাতে একই কথা সে ভাবে। যেন সে একা-একা একটি সাজানো ঘরে বসে আছে। হইচই হচ্ছে খুব। মনটা বেশি ভালো নেই। ভয় ভয় করছে এবং একটু

কান্না পাচ্ছে তার। এমন সময় বড় ভাবী মজিদের বাবাকে নিয়ে ঘরে ঢুকেই বললেন, ‘নাও তোমার জিনিস। এখন দু’জনে মিলে ভাব-সাব কর।’ এই বলে বাইরে থেকে খুট করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। নতুন শাড়ি পরে জড়সড় হয়ে বসে আছে রহিমা। লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। কী বলবে তা-ও ভেবে পাচ্ছে না। এমন সময় কী কাণ্টাই না হলো! কথাবার্তা নেই হড়মড় করে লোকটা বমি করে বিছানা ভাসিয়ে ফেলল। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে রহিমা তাকে এসে ধরল। ভাবতে ভাবতে চোখ ভিজে উঠে। আহা নতুন বউয়ের সামনে কী লজ্জাটাই না পেয়েছিল লোকটা! কতদিনকার কথা অথচ মনে হয় এই তো সেদিন।

অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে রহিমা উঠে বসল। পানের বাটা থেকে পান বের করল। সুপুরি কাটল কুচি কুচি করে। পান মুখে দিয়ে আগের মতো চুপি চুপি মজিদের জানালায় উঁকি দিল। না এখনো ঘুমায়নি। রহিমা মজিদের কোনো ব্যাপারই বুঝতে পারে না। লেখাপড়া না-জানা মূর্খ বাপ-মার ছেলে যদি বৃত্তিটুঙি পেয়ে পাস করতে করতে এম.এ. পাস করে ফেলে তাহলে সে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে।

একসময় মজিদের চোখ গিয়ে পড়ে জানালায়। এ কী মা! এখনো ঘুরঘুর করছ? ঘুমাও না কেন?’

‘যাই বাবা, যাই।’

রহিমার নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো। বারান্দায় এসে বসে রইল একা একা। আধখানা চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় আবছাভাবে সবকিছু নজরে পড়ে। রাতের বেলা একলা লাগে মরি। বুকের মধ্যে হু-হু করে। দিনের বেলাটা এতোটা খারাপ লাগে মা। ঘরের কত কাজকর্ম আছে। কাজের লোক নেই। তাকেই সব করতে হয়। সময়টা বেশ কেটে যায়। বাসার কাছেই মাইকের দোকান আছে একটা। তারা সারা দিনই কোনো গানের সিকিখানা, কোনো গানের আধাআধি বাজায়। বেশ লাগে।

মজিদের বাবারও গান ভালো লাগত। এক একবার গান শুনে চঁচিয়ে বলেছে, ‘ফাস ক্লাস, ফাস ক্লাস।’ মজিদের বাপ লোকটা আমোদ-আহ্লাদের বড় কাঙাল ছিল। বদনসিব লোক। আমোদ-আহ্লাদ তার ভাগ্যে নাই। কোনোদিন হয়তো জামা-টামা পরে খুশি হয়ে গেছে সিনেমা দেখতে, ফিরে এসেছে মুখ কালো করে। হয় টিকিট পায়নি, নয় তো পকেট মার গেছে। কোনো র্নিয়ের দাওয়াত-টাওয়াত পেলে হাসিমুখে গিয়েছে কিন্তু খেতে পায়নি কিছু। নিজের ছেলেটা যখন লেখাপড়া শেষ করেছে, চাকরি-বাকরি করে বাপকে আরাম দেবে তখনই কথা নেই বার্তা নেই বিছানায় শুয়েই শেষ। রহিমা রান্নাঘর থেকে বলেছে পর্যন্ত, ‘অসময়ে ঘুমাও কেন? চা খাবে, চা দিব?’

রহিমা সেই মন্দভাগ্য লোকটার কথা ভেবে নিশ্বাস ফেলল। এমন খারাপ ভাগ্যের লোক আছে দুনিয়ায়? মরণের সময়ও যার পাশে কেউ রইল না। মজিদের তখন কোনো খোঁজ নেই। কোথায় নাকি গিয়েছে মিটিং করতে। তার বাপকে কাফন পরিয়ে খাটিয়ায় তুলে সবাই যখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ বলে হাঁক দিয়েছে তখন মজিদ নেমেছে রিকশা থেকে। বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছে, ‘কী হয়েছে?’

আহা লোকটা সারাজীবন কী কষ্টটাই না করল! কী কষ্ট! কী কষ্ট! মেকানিকের আর কয় পয়সা বেতন? বাড়ির জমিজমা যা ছিল বেচে বেচে পড়ার খরচ চলল মজিদের। এত কষ্টের পয়সায় পড়ে আজ মজিদের এই হাল। সন্ধ্যা নামতেই বন্ধুরা আসে। মিটিং বসে ঘরে। ট্রেড ইউনিয়ন, মৎস্য সমবায় সমিতি, হেনো তেনো। ছিঃ!

মজিদের মাথায় কীসের পোকা ঢুকেছিল কে জানে। মজিদের বাপকে রহিমা কত বলেছে, ‘ছেলেকে এসব করতে মানা কর গো, কোনদিন পুলিশে ধরবে তাকে।’

মজিদের বাপ শুধু বলেছে, ‘বুঝাদার বিদ্বান ছেলে, আমি মূর্থ মানুষ, আমি কী বলব?’

রহিমার শীত করছিল, সে ঘরের ভেতর চলে গেল। অন্ধকার ঘরে ঢুকতে গিয়ে ধাক্কা লাগল কীসের সঙ্গে। পিতলের বদনা বনবন করে গড়িয়ে গেল কতদূর। মজিদ ঘুম জড়ানো স্বরে বলল, ‘কে কে?’

‘আমি।’

আর কোনো সাড়া-শব্দ হলো না। রহিমা যখন ভাবছে আবার শুয়ে পড়বে কি-না, তখনই শুনল মজিদ বেশ শব্দ করে হাসছে। কী কাণ্ড! রহিমা ডাকল, ‘মজিদ মিয়া।’

‘কী?’

‘হাস কেন?’

‘এমনি হাসি। ঘুমাও তো, ফ্যাসফ্যাস করো না।’

না, মজিদকে রহিমা সত্যি বুঝতে পারে না। শুধু মজিদ নয়, মজিদের বন্ধুদেরও অচেনা লাগে। ঠিক সন্ধ্যাবেলায় তারা আসে। চোখের দৃষ্টি তাদের কেমন-কেমন। কথা বলে থেমে থেমে, নিচু গলায় হাসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে তাদের আলাপ। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন হয়ে যায়। পাশের রইসুদ্দীনের চায়ের স্টল থেকে দফায়-দফায় চা আসে। কীসের এত গল্প তাদের? রহিমা দরজার সাথে কান লাগিয়ে শুনতে চেষ্টা করে,

‘না ইলেকশন হবে না। পরিষ্কার বুঝতে পারছি।’

‘কিন্তু না হলে আমাদের করণীয় কী?’

‘শেখ সাহেব কী ভাবছেন তা জানা দরকার।’

‘শেখ সাহেব আপস করবেন। সাফ কথা।’

‘সাদেক বেশি বাড়াবাড়ি করছে। একটু কেয়ারফুল না হলে...’

রহিমার কাছে সমস্তই দুর্বোধ্য মনে হয়। তবু রোজ দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে সে শোনে। আর যদি কোনোদিন শিখা নামের মেয়েটি আসে তবে তো কথাই নেই। রহিমা জাঁকের মতো দরজার সঙ্গে সঁটে থাকে। শিখা আসে লম্বা একটি নকশীদার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে। একটুও সাজগোজ করে না, তবু কী সুন্দর লাগে তাকে! সে হাসতে হাসতে দরজায় ধাক্কা দেয়। ভেতর থেকে মজিদ গম্ভীর হয়ে বলে, ‘কে কে? (যদিও হাসির শব্দ শুনেই মজিদ বুঝতে পেরেছে কে, তবু তার এই ঢংটা করা চাই-ই।)’

‘আমি, আমি শিখা।’

‘অগ্নিশিখা নাকি?’

‘না, আমি প্রদীপশিখা।’

বলতে বলতে মেয়েটা হাসিতে ভেঙে পড়ে। দরজা খুলে মজিদ বেরিয়ে আসে। মজিদের চোখ-মুখ তখন অন্য রকম মনে হয়। দেখে-শুনে রহিমার ভালো লাগে না। কে জানে শিখাকে হয়তো পছন্দ করে ফেলেছে। হয়তো এই মেয়েটিকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করে রেখেছে। মজিদের বাপ সুতাখালীর ঐ শ্যামলা মেয়েটির সঙ্গে মজিদের বিয়ে দিবে বলে কি খুশি (টাঙ্গাইলের লালপাড় একটি শাড়িও সে দিয়েছে হামিনা নামের ঐ ভালোমানুষ মেয়েটিকে। রহিমা মেয়েটিকে দেখেনি, শুনেছে খুশি নরম মেয়ে আর ভীষণ লক্ষ্মী)। আহা মজিদের বাপ বেচারি বিয়েটা দিতে পারল না। আহা!

রহিমা কতবার দেখেছে শিখা এলেই মজিদ কেমন অস্থির হয়ে উঠে। শুধু শুধু হো হো করে হাসে। চায়ের সঙ্গে খাবার আনতে নিজেই উঠে যায়। কথাবার্তার মাঝখানে ফস করে বলে, ‘আজ আর ইলেকশন-ফিলেকশন ভালো লাগছে না। আজ অন্য আলাপ করব। ঘরে যারা থাকে তারা উসখুস করলেও আপত্তি করে না। তখন শোনা যায় হাসির হল্লা। মেয়ে মানুষ এত চেষ্টা করে হাসে রহিমা বুঝতে পারে না। শুধু হাসি নয় গানটানও হয়। শিখা মেয়েটি মাঝে মাঝে গান গায় (তার জন্যে সবাইকে খুব সাধ্য-সাধনা করতে হয়। খুব অহঙ্কারী মেয়ে)। রহিমা বুঝতে পারে না এত রাত পর্যন্ত মেয়ে মানুষ কী করে আড্ডা দেয়। মজিদের বাপ এইসব দেখেও কোনোদিন কথা বলেনি। শুধু বলেছে, ‘বুঝদার বিদ্বান ছেলে, আমি কী করব?’

মজিদের বাপ লোকটাও কি কম বুঝদার ছিল? চুপ করে থাকলে কি হবে দুনিয়ার হাল অবস্থা ঠিক বুঝত। রহিমার কতবার মনে হয়েছে পড়াশুনা করতে পেলে এই লোকটাও বন্ধুদের সাথে সন্ধ্যাবেলা ইংরেজিতে গল্প করত। নসিবে দেয়নি। ইমানদার লোক বদনসিব হয়। রহিমা আবার বিছানা ছেড়ে উঠল।

বাতি জ্বালাল। একা একা অন্ধকার ঘরে ভালো লাগে না। যুদ্ধের পর তেলের যা দাম হয়েছে। কে আর সারারাত বাতি জ্বালিয়ে রাখবে? ঐ ঘরে মজিদ আবার ঘুমের মধ্যে খুকখুক করে কাশছে। নতুন হিম পড়েছে। রহিমা কতবার বলেছে জানালা বন্ধ করে ঘুমুতে। কিন্তু মজিদ কিছুতেই শুনবে না। বন্ধ ঘরে তার নাকি দম বন্ধ হয়ে আসে। মজিদের বাপেরও এ-রকম বদঅভ্যাস ছিল। মাঘ মাসের শীতেও জানালা খোলা রাখা চাই। একবার তো খোলা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার শার্ট আর গেঞ্জি নিয়ে গেল। শার্টের পকেটে ছয় টাকা ছিল। কী মুশকিল! শেষ পর্যন্ত মজিদের বাপ ছোট এক শার্ট গায়ে দিয়ে কারখানায় গেছে। আহা একটা শার্ট ছিল না লোকটার। কম বেতনের চাকরি। তার উপর পয়সা জমানো নেশা। খুব ধুমধাম করে মজিদের বিয়ে দিবে সেই জন্যে পাই পয়সাটিও জমিয়ে রাখা।

শিখা মেয়েটির সঙ্গে মজিদের পরিচয় না হলে সুতাখালীর ঐ মেয়েটির সঙ্গে কত আগেই মজিদের বিয়ে হয়ে যেত। আর বিয়ে হলে কি বউ ফেলে যুদ্ধে যেত মজিদ? কোনোদিন না। গ্রামের মধ্যে বউ নিয়ে লুকিয়ে থাকতো কিছুদিন। তারপর সব ঠাণ্ডা হলে ফিরে আসত সবাই।

কিন্তু সে রকম হলো না। শিখা মেয়েটি বাহারি ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে আসতেই থাকল। আসতেই থাকল। আর দিনদিন সুন্দর হতে থাকল মেয়েটা।

তখন খুব গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। মজিদের ঘরে দিনরাত লোকজনের ভীড়। আগের মতো শিখা মেয়েটির তীক্ষ্ণ হাসি শোনা যায় না। রহিমা বুঝতে পারে খুব খারাপ সময়। দেশের অবস্থা ভালো না। কিন্তু দেশের অবস্থা দিয়ে রহিমা কী করবে? সে শুধু দেখে তার নিজেরই কপাল মন্দ। মন্দ কপাল না হলে কি মজিদ তার বাপকে বলে, 'দেশের অবস্থা খুব খারাপ। কী হয় বোঝা যাচ্ছে না। তোমরা গ্রামে চলে যাও।'

মজিদের বাপ বলেছে, 'তুই গেলে আমরা যাব।'

'আরে কী বলো পাগলের মতো! আমি কী করে যাই? আমার কত কাজ এখন। তোমরা কবে যাবে বল? আমি সব ব্যবস্থা করে দেই।'

মজিদের বাপ সে-কথার জবাব না দিয়ে ফস করে একটা বিড়ি ধরিয়েছে আর মজিদ হঠাৎ করে প্রসঙ্গ পাল্টে নিচু গলায় বলেছে, 'শিখাকে বিয়ে করলে তোমাদের আপত্তি নেই তো বাবা?'

মজিদের বাপ একটুও অবাক না হয়ে বলেছে, 'কবে বিয়ে?'

'সে দেরি আছে। তোমাদের আপত্তি আছে কি-না তাই বল।'

'না, আপত্তি কীসের জন্যে? বিয়েটা সকাল সকাল করে ফেললেই তো ভালো হয়। টাকার জন্যে ভাববি না তুই। তোর বিয়ের টাকা আলাদা করে পোস্টাপিসে জমা আছে।'

ছেলের বিয়ে দেখে যেতে পারল না। রহিমা যখন রান্নাঘরে ডাল চাপিয়ে খোঁজ নিতে এসেছে লোকটা চা-টা কিছু খাবে কিনা তখনই জেনেছে সব শেষ। সব আল্লাহর ইচ্ছা।

তারপর তো যুদ্ধই শুরু হলো। গ্রামের বাড়িতে রহিমাকে রেখে মজিদ উধাও। কত উড়ো খবর কানে আসে। কোথায় নাকি একশ' মুক্তিবাহিনীর ছেলে ধরা পড়েছে। কোথায় নাকি চারজন মুক্তিবাহিনীর ছেলেকে মিলিটারি পুড়িয়ে মেরেছে। রহিমা শুধু মন্ত্ৰের মতো বলেছে, 'মজিদের হায়াৎ ভিখ মাংগি গো আল্লাহ। তুমি নেকবান। হাসবুনালাহে নিয়ামুল ওয়াকিল নেয়ামুল মওলা ওয়া নিয়ামুন নাসির।' রহিমার রাতে ঘুম হয় না। জেগে জেগে রাত কাটে। সেই সময়ই অসুখটা হলো। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। মনে হয় মৃত্যু বুঝি এসে বসেছে বুকের উপর।

যুদ্ধ থেমে গেল। মজিদ ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাসিমুখে একদিন দরজার সামনে এসে ডাকল, 'মা আমি মরি নাই গো। দেখ বেঁচে আছি।'

অসুখটা তখন খুব বাড়ল রহিমার। ক্র্যাচের খটখট শব্দ তুলে মজিদ যখন এক পায়ে হেঁটে বেড়ায় তখন রহিমার বুক ধড়ফড় করে। কী কষ্ট! কী কষ্ট! সে মজিদের মতো ভাবতে চেষ্টা করে, একটি স্বাধীনতার কাছে এই ক্ষতি খুব সামান্য।

মজিদ বলে না কিছু কিন্তু রহিমা জানে শিখার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সেই ছেলেটি নিশ্চয়ই মজিদের মতো ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটে না।

'স্বাধীনতার কাছে এই ক্ষতি খুব সামান্য।' রহিমা মজিদের মতো ভাবতে চেষ্টা করে। কিন্তু রহিমা মজিদ নয়। জীবন তার সুবিশাল বাহু রহিমার দিকে প্রসারিত করেনি। কাজেই তার ঘুম আসে না।

শেষ রাতে যখন চাঁদ ডুবে গিয়ে নক্ষত্রের আলোয় চারদিক অন্য রকম হয় তখন সে চুপি চুপি মজিদের জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। ভাঙা গলায় ডেকে উঠে, 'ও মজিদ মিয়া, ও মজিদ মিয়া'। সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে মজিদের ঘুম ভাঙে না। অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করবার জন্যেই হয়তো শেষ রাতের দিকে তার গাঢ় ঘুম হয়।



বেয়ারিং চিঠি

জমীর সাহেব অফিস থেকে ফেরা মাত্রই তাঁর বড় মেয়ে মিতু বলল, ‘বাবা আজ তোমার একটা চিঠি এসেছে।’ বলেই সে মুখের হাসি গোপন করার জন্যে অন্যদিকে তাকাল।

মিতুর বয়স একুশ। এই বয়সের মেয়েদের মুখে অকারণে হাসি আসে। হাসি-তামাশা জমীর সাহেবের একেবারেই পছন্দ নয়। বিশেষ করে মা-বাবাকে নিয়ে হাসাহাসি। আজকাল অনেক পরিবারেই তিনি এই ব্যাপার দেখেন। মেয়ে বাবার সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছে, খিলখিল করে হাসছে। এতদূর কী? তিনি একবার তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই বন্ধুর মেয়ে বাবাকে নিয়ে খুব হাসি-তামাশা করতে লাগল। এক পর্যায়ে বলে ফেলল, ‘বাবা দিনদিন তোমার চেহারা সুন্দর হচ্ছে। রাস্তার বের হলে নিশ্চয়ই মেয়েরা তোমার দিকে তাকায়।’ জমীর সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর নিজের মেয়ে হলে চড় দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিতেন। অন্যের মেয়ে বলে কিছু মনে গেল না। তবে ঐ বন্ধুর বাড়িতে যাওয়া তিনি ছেড়ে দিলেন।

মিতু চিঠি বাবার দিকে ঝাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, ‘বেয়ারিং চিঠি বাবা। দু’ টাকা দিয়ে চিঠি রাখতে হয়েছে। বলে আবার ফিক্ করে হেসে ফেলল।’

জমীর সাহেব কাঠিন্য গলায় বললেন, ‘হাসছিল কেন? বেয়ারিং চিঠি এসেছে, এর মধ্যে হাসির কী হলো? এ রকম ফাজলামি শিখছিস কোথায়?’

মিতু মুখ কাশো করে চলে গেল। বাবাকে সে সঙ্গত কারণেই অসম্ভব ভয় পায়। জমীর সাহেব লক্ষ করলেন খামের মুখ খোলা। এরা চিঠি পড়েছে। এই বেয়াদবিও সহ্য করা মুশকিল। একজনের চিঠি অন্যজন পড়বে কেন? খামে তাঁর নাম লেখা দেখার পরেও এরা কোন সাহসে চিঠি খুলে? রাগে জমীর সাহেবের গা কাঁপতে লাগল। এই অবস্থায় তিনি চিঠি পড়লেন। একবার, দু’বার, তিনবার। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। সুস্মিতা নামের এক মেয়ের চিঠি। তাঁর কাছে লেখা। সম্বোধন হচ্ছে প্রিয়তমেষু। এর মানে কী? সুস্মিতা কে? সুস্মিতা নামের কাউকে তিনি চেনেন বলে মনে করতে পারলেন না। কলেজে পড়ার সময় কমলা নামের এক মেয়ের প্রতি খুব দুর্বলতা অনুভব করেছিলেন।

মেয়েটির বিয়ে হয়ে যাবার পর দুর্বলতা কেটে যায়। এ ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে তিনি চেনেন না। জমীর সাহেব কপালের ঘাম মুছে চতুর্থবারের মতো চিঠিটা পড়লেন।

প্রিয়তমেষু,

তুমি কেমন আছ? তোমার কথা খুব মনে হয়। তোমার শরীর এত খারাপ হয়েছে কেন? শরীরের আরো যত্ন নেবে। আমি দেখেছি তুমি বাসে যাওয়া-আসা কর। তোমাকে অনুরোধ করছি সপ্তাহখানেক বাসে উঠবে না। কাল তোমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দুঃস্বপ্নটা হচ্ছে তুমি বাসে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে পা ভেঙে ফেলেছে। স্বপ্নকে গুরুত্ব দেয়ার কোনো মানে হয় না। তবু অনুরোধ করছি— এক সপ্তাহ বাসে উঠবে না।

বিনীতা
তোমার সুস্মিতা

জমীর সাহেব পঞ্চমবারের মতো চিঠি পড়তে শুরু করলেন। মোটা নিবের কলমে গোটা গোটা অক্ষরের চিঠি। তারিখ বা ঠিকানা নেই। হলুদ রঙের কাগজ। কাগজ থেকে হালকা ন্যাপথলিনের গন্ধ আসছে।

‘বাবা তোমার চা।’

মিতু চায়ের কাপ এনে বাবার সামনে রাখাল। তার মুখ থমথম করছে। বাবার ধমকের কথা সে এখনো ভুলতে পারেনি। জমীর সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, ‘কে লিখল কিছুই বুঝতে পারছি না। সুস্মিতা নামের কাউকে চিনি না।’

মিতু বলল, ‘চিঠি হয়েছে কি-না দেখ।’

জমীর সাহেব চায়ের চিনির ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখালেন না। শুকনো গলায় বললেন, ‘তোমার মা এই চিঠি পড়েছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘বলেছে কিছু?’

‘না।’

‘বুঝলি মিতু— সুস্মিতা নামের কাউকেই চিনি না। আর ধর যদি চিনতামও তাহলেও কি এই রকম একটা চিঠি কেউ লিখতে পারে? ছিঃ ছিঃ! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।’

মিতু ইতস্তত করে বলল, ‘আমার কি মনে হয় জানা বাবা? আমার মনে হয়, এই বাড়িতে জমীর সাহেব বলে আগে কেউ ছিলেন। চিঠিটা তাঁকেই লেখা।’

জমীর সাহেবের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই সহজ সমাধান তাঁর মাথায় কেন আসেনি বুঝতে পারলেন না। মিতু মেয়েটার মাথা তো বেশ ভালো। সায়েসে দেয়া উচিত ছিল। গাধার মতো তিনি মেয়েটাকে আর্টস পড়িয়েছেন।

তিনি চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, ‘খুব ভালো চা হয়েছে মা। খুব ভালো।
তোর মা কোথায়?’

‘নানুর বাড়ি গেছে।’

‘মা নানুর বাড়ি গেছে’ এই বাক্যটি জমীর সাহেবের খুব অপছন্দের বাক্য। শাহানার মার বাড়ি মীরপুর ছ’ নম্বর। ঐ বাড়িতে গেলেই শাহানা রাতটা থেকে যায়। আজও থেকে যাবে। তবে আজ জমীর সাহেব অন্যদিনের মতো খারাপ বোধ করলেন না। শাহানা থাকলে নিশ্চয়ই চিঠিটা নিয়ে গম্ভীর গলায় কথা বলত। শাহানার কথা শুনতেই ইদানীং তাঁর অসহ্য লাগে। রাগী রাগী কথা তো আরো অসহ্য লাগবে।

‘মিতু।’

‘জি বাবা।’

‘তোর মা বোধহয় থেকে যাবে ও বাড়িতে।’

‘হ্যাঁ।’

‘তোর মা কিছু বলেনি চিঠি পড়ে?’

‘না।’

‘তোর কি মনে হয় রাগ করেছে?’

মেয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতার জমীর সাহেবের মন ভরে গেল। মেয়েটাকে সায়েস পড়ান উচিত ছিল। সায়েস না পড়িয়ে ভুল হয়েছে। আর্টস পড়বে গাদা টাইপের মেয়েরা। তাঁর মেয়ে গাধা টাইপ নয়। বুদ্ধি আছে। বাপের প্রতি ফিলিংস আছে।

পরদিন যথারীতি জমীর সাহেব অফিসে রওনা হলেন। একবার মনে হলো বাসে না গিয়ে একটা রিক্সা নিয়ে নেবেন। পর মুহূর্তেই এই চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেললেন। ফালতু একটা চিঠি নিয়ে কিছু ভাবার কোনো মানে হয়? এইসব জিনিস প্রশ্নই দেয়াই উচিত না। ঝিকাতলার মোড়ে অন্য সব অফিসযাত্রীর মতো তিনি একটি টিফিন বক্স এবং ছাতা হাতে বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং যথারীতি প্রচণ্ড ভীড়ে ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠে পড়লেন। বাস ছেড়ে দিল। সেই মুহূর্তে কিছু-একটা হলো তাঁর। মনে হলো ছিটকে বাস থেকে পড়ে যাচ্ছেন। তিনি একসঙ্গে অনেক লোকের চিৎকার শুনলেন, ‘থামো, থামো, থামো— এই রুককে, রুককে—’

জমীর সাহেব রাস্তায় ছিটকে পড়ে জ্ঞান হারালেন। জ্ঞান হলো হাসপাতালে। তাঁর বাম পা হাঁটুর নিচে ভেঙেছে। এক জায়গায় না, দু’ জায়গায়। মিতু এবং

শাহানা মাথায় কাছে বসে আছে। দু'জনই কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালের ডাক্তার সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'কাঁদছেন কেন? বললাম তো তেমন সিরিয়াস কিছু হয়নি। দিন পনেরোর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাসায় যাবেন। দু'টা ফ্ল্যাকচার হয়েছে তবে সিরিয়াস কিছু না।'

ডাক্তারের কথামতো পনেরো দিনের মাথাতেই জমীর সাহেব বাড়ি ফিরলেন। তবে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে নয়। বাঁ পা অচল হয়ে গেল। এদেশে না-কি কিছু করা সম্ভব না। বিদেশে যদি কিছু হয়। চাকরি শেষ হবার আগেই জমীর সাহেব রিটায়ার করলেন। তিনি এবং তাঁর পরিবারের কেউ ঐ হলুদ চিঠির কথা একবারও তুলল না। যেন ঐ চিঠি একটা অভিশপ্ত চিঠি। তার কথা তোলা উচিত না। চিঠিটা জমীর সাহেবের শোবার ঘরের টেবিলের তিন নাম্বর ড্রয়ারের পড়ে রইল। মাঝে মাঝে জমীর সাহেব চিঠিটা বের করে পড়েন এবং তাঁর অচল পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সেই রাতে তাঁর এক ফোঁটা ঘুম হয় না। কেমন ভয় ভয় লাগতে থাকে।

নতুন বছরের গোড়াতে ঝিকাতলার বাসা উঠিয়ে উত্তর শাজাহানপুরে সস্তায় একটা ফ্ল্যাটে তাঁরা চলে গেলেন। রোজগার কমেছে এখন। টাকাপয়সা সাবধানে খরচ করতে হবে। নতুন ফ্ল্যাটে দুটো মাত্র শোবার ঘর। একটিতে জমীর সাহেব শাহানাকে নিয়ে থাকেন। অন্যটিতে মিঠু আর তার ছোট বোন ইরা থাকে। জমীর সাহেবের বড় ছেলে থাকে বঙ্গবন্ধু ঘরে। একটা খাট বসার ঘরে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে। এই বাড়িতে বাসার তিনেক কাটানোর পর আরেকটি বেয়ারিং চিঠি এল। আগের মতো গোটা গোটা হরফে লেখা। মোটা কলমের নিচ দিয়ে মেয়েলি অক্ষরে সুস্মিতা লিখেছে।

প্রিয়তমেশু,

তুমি কেমন আছ? এত দুশ্চিন্তা করছ কেন? তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে দেখলে আমার ভালো লাগে না। সংসারে দুঃখকষ্ট সমস্যা থাকেই। এতে বিচলিত হলে চলে? মনে সাহস রাখ। আচ্ছা একটা কথা— তোমার বড় ছেলেটাকে কিছুদিন ঢাকা শহরের বাইরে রাখতে পার না? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে— ও কোনো ঝামেলায় পড়ে যাবে। তোমাদের গ্রামের বাড়িতে ওকে কিছুদিনের জন্যে পাঠিয়ে দাও না। ও যেতে চাইবে না। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাও।

বিনীতা
তোমার সুস্মিতা

এবার আর সুস্থিতার চিঠি নিয়ে কেউ হাসাহাসি করল না। চিঠি পড়বার সময় শাহানার হাত থরথর করে কাঁপতে লাগল। জমীর সাহেব অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেলেন। বড় ছেলে সুমনকে গ্রামের বাড়িতে পাঠানোর প্রশ্নই উঠে না। কারণ, তার বি. এ. ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। দুটো পেপার হয়ে গেছে। তবু শাহানা বললেন, ‘থাক পরীক্ষা দিতে হবে না। ওকে পাঠিয়ে দাও।’

জমীর সাহেব বললেন, ‘দরকার আছে বলে তো মনে হয় না। চিঠি পাওয়ার পরেও তো পনেরো দিন হয়ে গেল।’

‘হোক পনেরো দিন, পাঠিয়ে দাও। আমার ভালো লাগছে না।’

‘আচ্ছা বলে দেখ। যদি যেতে রাজি হয় তাহলে যাক।’

সুমন যেতে রাজি হলো। শুধু যে রাজি হলো তাই না, তৎক্ষণাৎ যেতে রাজি। টাকা দিলে আজ রাতের ট্রেনেই রওনা হয়ে যায় এমন অবস্থা। ঠিক হলো সে সোমবার সকালের ট্রেনে যাবে। জমীর সাহেবও সঙ্গে যাবেন। পৈতৃক বাড়ি ঠিকঠাক করবেন, জমিজমার খোঁজখবর করবেন। সম্ভব হলে কিছু জমি বিক্রি করে আসবেন। টাকাপয়সার খুব টানাটানি যাচ্ছে।

তাদের যাবার কথা সোমবার। তার আগের দিন অর্থাৎ, রোববার ভোররাতে পুলিশ এসে জমীর সাহেবের বাড়ি ঘেরাও করে সুমনকে ধরে নিয়ে গেল। হতভম্ব জমীর সাহেবকে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—আপনার ছেলের বিরুদ্ধে গাড়ীর চার্জ আছে। সাতদিন আগে চারজনে মিলে খুনটা করেছে। কোন্ড রাইড মার্ডার। আপনার ছেলে এই চারজনের একজন। আপনি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছেলেকে রাজসাক্ষী হতে রাজি করান। এতে আপনারও লাভ। আমাদেরও লাভ। না হলে কিন্তু ফাঁসিটাসি হয়ে যাবে। পলিটিক্যাল প্রেসারও আছে।

সুমন রাজসাক্ষী হতে রাজি হলো না। দীর্ঘদিন মামলা চলল। রায় বেরতে দু’বছর। তিনজনের সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড, একজনের ফাঁসি। সেই একজন সুমন। অন্য তিনজন ছেলেটাকে ধরে রেখেছিল। খুন করেছে সুমন। ধারাল ক্ষুর দিয়ে রগ কেটে দিয়েছে।

পাঁচ বছর কেটে গেছে। পরবর্তী বেয়ারিং চিঠিটি এল পাঁচ বছর কেটে যাবার পর। এই পাঁচ বছরে জমীর সাহেবের সংসারে বড় রকমের উলটপালট হয়েছে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। মিতুর বিয়ে হয়েছে কৃষিখামারের এক ম্যানেজারের সঙ্গে। সে স্বামীর সঙ্গে গোপালপুরে থাকে। ছোট মেয়ে ইরার বিয়ে হয়েছে ওষুধ কোম্পানির এক কেমিস্টের সঙ্গে। তারা ঢাকা শহরেই থাকে। প্রায়ই বাবা-মাকে দেখতে আসে। বড় মেয়ের কোনো ছেলে-পুলে হয়নি। ছোট

মেয়ের একটি ছেলে হয়েছে। ছেলের নাম ফরহাদ। এই ছেলেটি জমীর সাহেবের খুব ভক্ত। তাঁর কাছে এলেই কোলে উঠে বসে থাকে। কিছুতেই কোল থেকে নামানো যায় না।

পাঁচ বছর পর একদিন পিওন এসে বলল, 'স্যার, আপনার একটা বেয়ারিং চিঠি আছে, রাখবেন?' জমীর সাহেব শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সেদিন ইরা বেড়াতে এসেছে। জমীর সাহেবের কোলে ফরহাদ। তিনি ফরহাদকে মাটিতে নামিয়ে চিঠি হাতে নিলেন। হাতের লেখা চিনতে তাঁর অসুবিধা হলো না। সেই হাতের লেখা। সেই নাপথলিনের গন্ধ।

পিওন বলল, 'চার টাকা লাগবে।'

জমীর সাহেব একবার ভাবলেন, চিঠি রাখবেন না। তিনি তা বলতে পারলেন না। যন্ত্রের মতো পকেটে হাত দিয়ে টাকা বের করলেন। চিঠি পাঞ্জাবির পকেটে রেখে দিলেন। কাউকে কিছু বললেন না। তাঁর বমি বমি ভাব হলো। মাথা ঘুরতে লাগল।

রাতে তিনি কিছু খেলেন না। ইরাদের আমা উপলক্ষে ভালোমন্দ রান্না হয়েছিল। তিনি কিছুই মুখে দিলেন না।

ইরা বলল, 'বাবা তোমার কী হয়েছে?'

তিনি ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'কিছু হয়নি। শরীরটা ভালো না।'

'রোজই তুমি বল শরীর ভালো না, তখচ একজন ভালো ডাক্তার দেখাও না। একজন ভালো ডাক্তার দেখাও বাবা।'

'আর মাকেও একজন ভালো ডাক্তার দেখাও।'

'আচ্ছা।'

'আচ্ছা না বাবা। দেখাও।'

মেয়ে-জামাই রাত নটার দিকে চলে গেল। ফরহাদ গেল না। সে নানার সঙ্গে থাকবে। সারারাত জমীর সাহেবের ঘুম হলো না। পরদিন হু-হু করে গায়ে জ্বর এসে গেল। জ্বরের মূল কারণ কাউকে বলতে পারলেন না। বেলা যতই বাড়তে লাগল জ্বরও ততই বাড়তে লাগল। দুপুরের পর ঘাম হতে লাগল। ইরা হতভম্ব হয়ে বলল, 'বাবা চল তোমাকে ক্লিনিকে নিয়ে ভর্তি করি। আমার কিছু ভালো লাগছে না। তুমি এ-রকম ঘামছ কেন? হার্টের কোনো সমস্যা না তো?'

জমীর সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'চিঠি পেয়েছি।'

'চিঠি পেয়েছি মানে? কার চিঠি?'

'বেয়ারিং চিঠি।'

ইরা দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, 'কী লেখা এবারের চিঠিতে?'

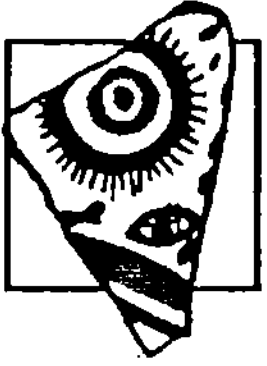
'চিঠি পড়িনি।'

‘পড়ে দেখ। না পড়েই এ-রকম করছ কেন? হয়ত এবার কোনো ভালো খবর আছে।’

জমীর সাহেব কাঁপা গলায় বললেন, ‘ভয় লাগছে রে ইরা।’

‘ভয়ের কিছু নেই। দাও, আমার কাছে দাও— আমি পড়ি।’

ইরা চিঠি খুলে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। অন্যদের সেই চিঠি দেখাল। যারা দেখল প্রত্যেকেই গম্ভীর হলো। কারণ, চিঠিতে কিছু লেখা নেই। সাদা একটা পাতা। শেষে নাম সই করা— বিনীতা, তোমার সুস্মিতা। এই সাদা না লেখা অংশে কী বলতে চাচ্ছে সুস্মিতা? কে সে? কেনই বা সে চিঠি লেখে, আবার আজ কেনই বা লিখল না?



ভালোবাসার গল্প

নীলু কঠিন মুখ করে বলল, ‘কাল আমাকে দেখতে আসবে।’ রঞ্জু নীলুর কথা শুনল বলে মনে হলো না। দমকা বাতাস দিচ্ছিল। খুব কায়দা করে তাকে সিগারেট ধরাতে হচ্ছে। কথা শুনবার সময় নেই।

নীলু আবার বলল, ‘আগামী কাল সন্ধ্যায় আমাকে দেখতে আসবে।’

‘কে আসবে?’

মাঝে মাঝে রঞ্জুর বোকামিতে নীলুর গা জ্বালা করে। এখনো তাই করছে।

রঞ্জু আবার বলল, ‘কে আসবে সন্ধ্যা বেলা?’

নীলু থেমে থেমে বলল, ‘আমার বিয়ের কথা হচ্ছে। পাত্র দেখতে আসবে।’

রঞ্জুকে এ খবরে বিশেষ উদ্বিগ্ন মনে হলো না। সে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, ‘আসুক না।’

‘আসুক না মানে? যদি আমাকে পছন্দ করে ফেলে?’

রঞ্জু গম্ভীর গিয়ে বলল, ‘পছন্দ করবে না মানে? তোমাকে যেই দেখবে সেই ট্যারা হয়ে যাবে।’

নীলু রেগে গিয়ে বলল, ‘তোমার মতো যারা গাধা শুধু তাদের চোখই ট্যারা হবে।’

রঞ্জু রাস্তার লোকজনদের সচকিত করে হেসে উঠল। নীলু বলল, ‘আস্তে হাঁট না, দৌড়াচ্ছ কেন?’

রঞ্জু এ কথাতেও হেসে উঠল। কী কারণে জানি তার আজ খুব ফুর্তির মুড দেখা যাচ্ছে। গুনগুন করে গানের কী একটা সুর ভাঁজল সচরাচর এ রকম দেখা যায় না। রাস্তায় সে ভারি ক্লি চালে হাঁটে।

‘নীলু সিনেমা দেখবে নাকি একটা?’

‘না।’

‘চল না, যাই।’

‘নীলু চুপচাপ হাঁটতে লাগল।’

‘কথা বল না যে? দেখবে?’

‘উই। বাড়িতে বকবে।’

‘কেউ বকবে না। মেয়েদের বিয়ের কথাবার্তা যখন হয় তখন মায়েরা তাদের কিছু বলে না।’

‘কে বলেছে তোমাকে?’

‘আমি জানি। তখন মায়েরা মন খুব খারাপ থাকে। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। এইসব সেন্টিমেন্টের ব্যাপারে তুমি বুঝবে না। চল একটা সিনেমা দেখি।’

‘না।’

‘বেশ তাহলে চল কোনো ভালো রেস্টুরেন্টে বসে চা খাওয়া যাক। নীলু সরু চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, খুব পয়সা হয়েছে দেখি।’

রঞ্জু আবার হেসে উঠল। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বলল, ‘কী ভেবেছ তুমি? রোজ তোমার পয়সায় চা খাব? এই দেখ।’

রঞ্জু ম্যাজিসিয়ানদের মতো পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটি চকচকে একশ’ টাকার একটা নোট বের করল।

‘আরো দেখবে? এই দেখ।’

এবার আরো দুটি পঞ্চাশ টাকার নোট বের হলো। নীলু কোনো কথা বলল না।

‘তুমি এত গম্ভীর কেন নীলু?’

‘তোমার মতো শুধু শুধু হাসতে পারি না। বাসায় যাব, এখন চা-টা খাব না।’

‘প্লীজ নীলু, এ রকম কর কেন? তুমি?’

রেস্টুরেন্টে ঢুকতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। রঞ্জু ছেলে-মানুষের মতো খুশি হয়ে বলল, ‘বেশ হয়েছে। যতক্ষণ বৃষ্টি না থামবে ততক্ষণ বন্দী।’ সে এবার আরাম করে আরেকটি সিগারেট ধরাল।

নীলু বলল, ‘এই নিয়ে ক’টি সিগারেট খেলে?’

‘এটা হচ্ছে ফিফথ’।

‘সত্যি?’

‘হুঁ।’

‘গা ছুঁয়ে বল।’

‘আহ্ কী সব মেয়েলি ব্যাপার! গা ছুঁয়ে বললে কী হয়?’

‘হোক না হোক তুমি বল।’

রঞ্জু ইতস্তত করে বলল, ‘আর সিগারেট খাব না। ওয়ার্ড অব অনার। মরদাকা বাত হাতীকা দাঁত।’

তারা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরুল সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে। বৃষ্টি নেই। নিয়ন আলোয় ভেজা রাস্তা চিকমিক করছে।

রঞ্জু বলল, ‘রিকশা করে একটু ঘুরবে নীলু?’

‘উহুঁ।’

‘বেশ। চল রিকশা করে তোমাকে ঝিকাতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।’

‘হ্যাঁ, পরে কেউ দেখুক।’

‘সন্ধ্যাবেলা কে আর দেখবে? একটা রিকশা ডাকি?’

‘আচ্ছা ডাক।’

রিকশার উঠতে গিয়ে রঞ্জু দেখল নীলুর চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

‘সে দারুণ অবাক হয়ে গেল।’

‘কী ব্যাপার নীলু?’

‘খুব খারাপ লাগছে। কাল যদি ওরা আমাকে পছন্দ করে ফেলে?’

রঞ্জু দরাজ গলায় হেসে উঠল, ‘করুক না পছন্দ, আমরা কোর্টে বিয়ে করে ফেলব।’

‘তারপর আমাকে তুলবে কোথায়, খাওয়াবে কী? দুটি টিউশনি ছাড়া আর কী আছে তোমার?’

‘এম. এ. ডিগ্রিটা আছে। সাহস আছে। আর...’

‘আর কী?’

‘আর আছে ভালোবাসা।’

নীলু এবং রঞ্জু দু’জনেই এবার একত্রে হেসে উঠল। রঞ্জু অত্যন্ত উৎফুল্ল ভঙ্গিতে আরেকটি সিগারেট ধরাল। নীলু মৃদুস্বরে বলল, ‘এই তোমার সিগারেট ছেড়ে দেয়া? ফেল এম্ফুনি।’

‘এটাই লাস্ট ওয়ান।’

‘উহুঁ।’

রঞ্জু সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়।

পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে সন্ধ্যাবেলা কিন্তু তোড়জোড় শুরু হলো সকাল থেকে। নীলুর বড় ভাই এই উপলক্ষে অফিসে গেলেন না। নীলুর ছোট বোন বীলুও স্কুলে গেল না। এই বিয়ের যিনি উদ্যোক্তা—নীলুর বড় মামা, তিনিও সাত সকালে এসে হাজির। নীলু তার এই মামাকে খুব পছন্দ করে কিন্তু আজ যখন তিনি হাসিমুখে বললেন, ‘কী করে নীলু বিবি, কী খবর?’

তখন নীলু শুকনো মুখে বলল, ‘ভালো।’

‘মুখটা এমন হাঁড়ির মতো করে রেখেছিস কেন? তোর জন্যে একটা শাড়ি এনেছি। দেখ তো পছন্দ হয় কি-না।’

‘শাড়ি কী জন্যে মামা?’

‘আনলাম একটা ভালো শাড়ি। এই শাড়ি পরে সন্ধ্যাবেলা যখন যাবি ওদের সামনে...।’

নীলু নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে এল।

রান্নাঘরে নীলুর ভাবী রেহানা মাছ কুটছিল। কল্লেজ যেদিন ছুটি থাকে সেদিন নীলু রান্নায় সাহায্য করার নামে বসে বসে গল্প করে। আজ নীলু দেখল রেহানা ভাবীর মুখ গম্ভীর। নীলু পাশে এসে বসতেই সে বলল, ‘তোমার ভাই কাল রাতে আমাকে একটা চড় মেরেছে। তোমার বিশ্বাস হয় নীলু?’

নীলু স্তম্ভিত হয়ে গেল। রেহানা বলল, ‘তুমি বিয়ে হয়ে চলে গেলে আমার কেমন করে যে দিন কাটবে।’

নীলু বলল, ‘দাদাটা একটা অমানুষ। অভাবে অভাবে এ রকম হয়েছে ভাবী। তুমি কিছু মনে করো না।’

‘না, মনে করব কী? আমার এত রাগ-টাগ নেই।’

দু’জনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। রেহানা একসময় বলল, ‘তোমার ভাই পাঁচ টাকা মানত করেছে। তোমাকে যদি ওদের পছন্দ হয় তবে পাঁচ টাকা ফকিরকে দিবে।’

নীলু কিছু বলল না। রেহানা বলল, ‘পছন্দ তো হবেই। তোমাকে পছন্দ না করলে কাকে করবে? তুমি কি আর আমার মতো? কত মানুষ যে আমাকে দেখল নীলু, কেউ পছন্দ করে না। শেষকালে তোমার ভাই পছন্দ করল। সুন্দর-টুন্দর তো সে বুঝে না।’

নীলু হেসে উঠল। রেহানা বলল, ‘চা খাবে?’

নীলু জবাব দিল না।

তোমাকে চা খাওয়াবার সুযোগ কি আর হবে? বড়লোকের বউ হবে। মামা বলেছিলেন ওদের নাকি দুটি গাড়ি। একটা ছেলেরা ব্যবহার করে, একটা বাড়ির মেয়েরা।

নীলু চুপ করে রইল। রেহানা বলল, ‘ছেলের এক চাচা হাইকোর্টের জজ।’

‘হাইকোর্টের জজ দিয়ে আমি কী করব ভাবী?’

‘তুমি যে কী কথা বল নিলু, হাসি লাগে!’

দুপুর থেকে নীলুর দাদা গম্ভীর হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হলো। নীলু ভেবে পেল না এই সামান্য ব্যাপারে দাদা এত চিন্তিত হয়ে পড়েছে কেন। একটি ছেলে মোটা মাইনের একটা চাকরি করলে এবং ঢাকা শহরে তার ঘর-বাড়ি থাকলেই এ-রকম করতে হয় নাকি?

অকারণে রেহানা নীলুর দাদার কাছে ধমক খেতে লাগল।

‘বললাম একটা ফুলদানিতে ফুল এনে রাখতে।’

‘এই বুঝি ঘর পরিষ্কারের নমুনা? টেবিল ক্লথটাও ইপ্তি করিয়ে রাখতে পারনি?’

নীলুর বড় মামা অনেকবার তাকে বুঝালেন কী করে সালাম দিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে। নম্র ভঙ্গিতে চা এগিয়ে দিতে হবে। কিছু জিজ্ঞাস করলে খুব কম কথায় উত্তর দিতে হবে। নীলুর রীতিমতো কান্না পেতে লাগল। সাজগোজ করাবার জন্যে মামি এলেন বিকেলবেলা। সন্ধ্যা হবার আগেই নীলু সেজেগুজে বসে রইল। সমস্ত ব্যাপারটা যে রকম ভয়াবহ মনে হয়েছিল সে রকম কিছুই হলো না। ছেলের বাবা খুব নরম গলায় বললেন, ‘কী নাম মা তোমার?’

‘নীলাঞ্জনা।’

‘খুব কাব্যিক নাম। কে রেখেছেন?’

‘বাবা।’

তিনি আর কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নীলুর মামার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। ছেলে নিজেও এসেছিল। নীলু তার দিকে চোখ তুলে তাকাতো পারল না। চা পর্ব শেষ হবার পর নীলু যখন চলে আসছে তখন শুনল একজন ভদ্রমহিলা বলছেন, ‘খুব পছন্দ হয়েছে আমাদের।’

‘আগস্ট মাসে বিয়ে দিতে আপনাদের কোনো অসুবিধা আছে?’

নীলুর কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। রেহানা রান্নাঘরে বসে ছিল। নীলুকে দেখেই বলল, ‘টি-পটটা ভেঙে দু’টুকরা হয়েছে। তোমার ভাই শুনলে কী করবে ভেবে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। কী অলক্ষণ! ওমা কাঁদছ কেন, কী হয়েছে?’

নীলু প্রায় দৌড়ে এসে তার ভাবীকে জড়িয়ে ধরে ফুঁফিয়ে উঠল, ‘ভাবী আমি রঞ্জু ভাইকে বিয়ে করব। আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়। তুমি দাদাকে বল ভাবী।’

‘আমি? আমার সাহস হয় না। হায় রে কী করি! চুপ নীলু চুপ। ভালো করে সব ভাব। এফুনি জানাজানির কী দরকার।’

‘আমি ভাবতে পারি না ভাবী।’

নীলু এ ক'দিন কলেজে যায়নি। দিন সাতেক পর যখন প্রথম গেল ক্লাসের মেয়েরা অবাক হয়ে বলল, 'বড্ড রোগা হয়ে গেছিস তুই। অসুখ-বিসুখ নাকি?'

'কেমন গোলগাল মুখ ছিল তোর, এখন কী রকম লম্বাটে হয়ে গেছে! কিন্তু বেশ লাগছে তোকে ভাই।'

ক্লাসে মন টিকল না নীলুর। ইতিহাসের অনিল স্যার ঘুমপাড়ানো সুরে যখন গুপ্ত ডায়ানিস্টি পড়াতে লাগলেন তখন ছাত্রীদের স্তম্ভিত করে নীলু উঠে দাঁড়াল।

'স্যার আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে। বাসায় যাব।'

অনিল স্যার অতিরিক্ত রকম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'বেশি খারাপ? সঙ্গে কোনো বন্ধুকে নিয়ে যাবে?'

'না স্যার, একাই যাব।'

নীলু ক্লান্ত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে কলেজ গেটের সামনে রঞ্জু দাঁড়িয়ে আছে। শুকনো মুখ। হাতে একটা কাগজের ঠোঙা।

গত তিনদিন ধরে আমি রোজ একবার করে আসি তোমাদের কলেজে।

নীলু বলল, 'এই ক'দিন আসিনি, শরীর ভালো না।'

দু'জন পাশাপাশি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটল। তারপর রঞ্জু হঠাৎ দাঁড়িয়ে থেমে থেমে বলল, 'আগস্ট মাসের ৯ তারিখে তোমার বিয়ে?'

'কে বলল?'

'কার্ড ছাপিয়েছ তোমরা। রেবার কাছে তোমার বিয়ের কার্ড দেখেছি।'

নীলু চুপ করে রইল। রঞ্জু এত বেশি উত্তেজিত ছিল যে, সহজভাবে কোনো কথা বলতে পারছিল না। কোনোমতে বলল, 'কার্ড দেখেও আমার বিশ্বাস হয়নি। তুমি নিজের মুখে বল।'

নীলু মৃদুস্বরে বলল, 'মা, সত্যি না। তোমাকেই বিয়ে করব আমি।'

'কবে?'

'আজই।'

রঞ্জু স্তম্ভিত হয়ে বলল, 'তোমার মাথা ঠিক নেই নীলু।'

'মাথা ঠিক আছে। কোর্টে মানুষ কীভাবে বিয়ে করে আমি জানি না।'

রঞ্জু বলল, 'চল আমার মেসে। কী হয়েছে সবকিছু শুনি।'

সে নীলুর হাত ধরল।

রঞ্জুর নয়া পল্টনের মেসে নীলু আগে অনেকবার এসেছে। দুপুরের गरমে বসে অনেক সময় গল্প করে কাটিয়েছে কিন্তু আজকের মতো কুলকুল করে ঘামেনি কখনো। রঞ্জু বলল, 'তোমার শরীর খারাপ হয়েছে নীলু, বড্ড ঘামছ।'

'আমার কিছু হয়নি।'

'চা খাবে? চা দিতে বলব?'

'উহঁ। পানি খাব।'

রঞ্জু পানির গ্লাস নিয়ে এসে দেখে নীলু হাত-পা এলিয়ে বসে আছে। চোখ ঈষৎ রক্তাভ। পানির গ্লাস হাতে নিয়ে সে ভাঙা গলায় বলল, 'রেবা তোমাকে আমার বিয়ের কার্ড দেখিয়েছে?'

'হুঁ।'

'আর কী বলেছে সে?'

বলেছে, 'তোমাকে নাকি ফর্সা মতো রোগা একটি ছেলের সঙ্গে দেখেছে।'

নীলু বলল, 'ওর নাম জমশেদ। ওর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে আমার।'

রঞ্জু কিছু বলল না।

নীলু বলল, 'ঐ ছেলেটির সঙ্গে আমার বিয়ে হলে তুমি কী করবে?'

'কী করব মানে?'

নীলু ভীষণ অবাক হয়ে বলল, 'কিছু করবে না তুমি?'

তোমার শরীর সত্যি খারাপ নীলু। তুমি বাসায় যাও। বিশ্রাম কর।

নীলু রিকশায় উঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

রঞ্জু বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে আসব? বাসায় পৌঁছে দেব?'

'উহু।'

নীলু বাসায় পৌঁছে দেখে অনেক লোকজম। হিরণপুর থেকে খালারা এসেছেন। বিয়ে উপলক্ষে বাড়িতে তুমুল হুইচুই। নীলু আলগাভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সন্ধ্যায় চা খেতে বসে সেজো খালার হাসির গল্প শুনে উঁচু গলায় হাসল। কিন্তু রাতের বেলা অন্যরকম হলো। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নীলু গিয়ে তার দাদার ঘরে ধাক্কা দিল। রেহানা বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে নীলু?'

নীলু ধরা গলায় বলল, 'বড় কষ্ট হচ্ছে ভাবী।'

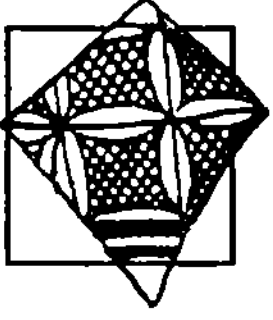
রেহানা নীলুর হাত ধরল। কোমল স্বরে বলল, 'ডাকব তোমার দাদাকে? কথা বলবে তার সাথে?'

'ডাক।'

নীলুর দাদা সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে এলেন। অবাক হয়ে বললেন, 'কী রে নীলু কিছু হয়েছে?'

নীলু বলল, 'কিছু হয়নি দাদা। তুমি ঘুমাও।'

তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।



সৌরভ

আজহার খাঁ ঘর থেকে বেরুবেন, শার্ট গায়ে দিয়েছেন, তখনই লিলি বলল, ‘বাবা আজ কিন্তু মনে করে আনবে।’

তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে। মেয়ে বড় হয়েছে, ইচ্ছে করলেও ধমক দিতে পারেন না। সেই জন্যেই রাগী চোখে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

লিলি বলল, ‘রোজ রোজ মনে করিয়ে দেই। আজ আনবে কিন্তু।’

‘সামনের মাসে আনব।’

‘না, আজই আনবে।’

রাগে মুখ তেতো হয়ে গেল আজহার খাঁর। প্রতিটি ছেলেমেয়ে এমন উদ্ধত হয়েছে। বাবার প্রতি কিছুমাত্র মমতা নেই। আর নেই বলেই মাসের ছাব্বিশ তারিখে দেয়ালে হেলান দিয়ে দৃঢ় গলায় বলতে পারে, না আজই আনতে হবে।

তিনি নিঃশব্দে শার্ট গায়ে দিয়ে পিছুল আঁচড়ালেন। জুতা পরলেন। জুতার ফিতায় কাদা লেগেছিল, ঘষে ঘষে স্ফর্ক করলেন। লিলি সারাক্ষণই বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি বেরবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই বলল, ‘বাবা আনবে তো?’

মেয়েটার গালে প্রচণ্ড একটি চড় কষিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রাণপণে দমন করে তিনি শান্ত গলায় বললেন, ‘টাকা নেই, সামনের মাসে আনব।’

লিলি নিঃশব্দে উঠে গেল। তিনি ভেবে পেলেন না সবাই বৈরী হয়ে উঠলে কী করে বেঁচে থাকা যায়! তিনি তো কিছু বলেননি। শুধু শান্ত গলায় বলছেন, ‘হাতে টাকা নেই।’ এটা তাঁকে বলতে হলো কেন? যে মেয়ে বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁর অভাব বুঝতে না পারে সে কেমন মেয়ে?

তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। ইদানীং অল্পতেই তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। সামান্য সব কারণে হতাশা বোধ করেন। বেঁচে থাকা অনাবশ্যক বলে মনে হয়।

“হতাশা গুণ নাশিনী। হতাশা মানুষের সমস্ত গুণ নষ্ট করে দেয়। তবুও তো ভালোবাসার মতো মহত্তম সৎগুণটি আমার এখনো নষ্ট হয়নি। তোমাদের সবাইকে আমি ভালোবাসি। তোমাদের জন্যে সারাক্ষণ আমার বুক টনটন করে, আর লিলি তুমি তোমার বাবার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাক। মাসের ছাব্বিশ

তারিখে তোমার একটি শখের জিনিস আমি কিনে আনতে পারি না। কিন্তু তুমি তো আমারই মেয়ে। তুমি তোমার মায়ের মতো অবুঝ হবে কেন?”

আজহার খাঁর কান্না পেতে লাগল। যদিও সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তাঁকে এফুনি বাইরে বেরতে হবে। তবু তিনি চৌকিতে বসে বাইরের আকাশ দেখতে লাগলেন।

‘বাবা এই নাও টাকা।’

লিলি তিনটি দশ টাকার নোট টেবিলে বিছিয়ে দিল। তিনি অবাক হয়ে বললেন, ‘টাকা কোথায় পেয়েছিস?’

‘আমার টাকা। আমি জমিয়েছি। আনবে তো বাবা?’

‘আনব।’

‘নাম মনে আছে তোমার?’

‘আছে।’

লজ্জা ও হতাশার মিশ্র অনুভূতি নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন। বাইরে ঝিরঝির করে হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। সন্ধ্যা এখনো মিলায়নি। এর মধ্যেই চারদিকের তরল অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। পরিচিত পথঘাটও অপরিচিত লাগছে।

“দশ বছর ধরে আমি এই শহরে পড়ে আছি। দশ বছর খুব দীর্ঘ সময়। এই দীর্ঘ সময়ে আমি রোজ একই রাস্তায় ঘাটাই। একই ধরনের লোকজনের সঙ্গে কথা বলছি। এই দীর্ঘ সময়ে কোথাও যাইনি। তোমাদের কথা ভেবেই প্রতিটি পয়সা আমাকে সাবধানে খরচ করতে হয়েছে। অফিসে টিফিন আওয়ারে সবাই যখন চায়ের সঙ্গে দুটি কুসে বিস্কিট খায় আমি সেখানে এক কাপ চা নিয়ে বসি। সেও তোমাদের কথা ভেবেই। তোমরা তার প্রতিদানে কী দিয়েছে আমাকে? আমাকে লজ্জা দেবার জন্যে লিলি, তুমি তোমার দীর্ঘদিনের জমানো টাকা বের করে আন। তোমার মা তার ভাইদের কাছে টাকা চেয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে চিঠি লেখে।”

তাঁর মনে হলো তিনি কুকুরের জীবনযাপন করছেন। সাধ-আহ্লাদহীন বিরক্তিকর জীবন। তিনি একটি নিশ্বাস ফেললেন।

বৃষ্টির ছাটে আধভেজা হয়ে আজহার খাঁ বাজারে ঢুকলেন। খারাপ আবহাওয়ার জন্যে বাজার তেমন জমেনি। সন্ধ্যাবেলা যেমন জমজমাট থাকে চারদিক সে রকম নয়। কেমন ফাঁকা ফাঁকা। তিনি বড়-সড় দেখে একটি স্টেশনারি দোকানে ঢুকে পড়লেন।

‘ইভিনিং ইন প্যারিস সেন্টটা আছে আপনাদের?’

‘না, অন্য সেন্ট আছে। দেখবেন?’

‘উহঁ, এইটাই চাই।’

তখন ঝামঝাম করে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে তিনি রাস্তায় নেমে পড়লেন। তিন-চারটি দোকান ঘুরতেই কাদায় পানিতে মাখামাখি। তাঁর গাল বেয়ে পানির স্রোত বইতে লাগল। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, সেন্টের শিশিটি তাঁর এই মুহূর্তেই প্রয়োজন। বৃষ্টি কখন ধরবে তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারছেন না— এমনি তাড়া। পঞ্চম দোকানে সেটি পাওয়া গেল। দোকানি শিশিটি কাগজে মুড়ে বলল, ‘ইশ, একেবারে যে ভিজ়ে গেছেন? রিকশা করে চলে যান।’

‘কত দাম?’

‘ছাব্বিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।’

দরদাম করবার ধৈর্য নেই আর। টাকার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে আজহার খা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সেখানে দুটি এক টাকার নোট আর একটি আধুলি ছাড়া কিছুই নেই।

দোকানি নীরবে শিশিটি আগের জায়গায় রেখে দিল। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল এ রকম ঘটনা যেন প্রতিদিন ঘটে। কাস্টমার জিনিস কিনে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখে পয়সা নেই। এ যেন খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার।

আজহার খাঁ ভাবলেশহীন মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বৃষ্টির ভেতর নেমে গেলেন। হু-হু করে হাওয়া বইছে। ঝড় উঠবে কিনা কে জানে। চশমার কাছে বৃষ্টির ফোঁটা জমে চারদিক ঝাপসা দেখাচ্ছে। আজহার খাঁ নীরবে হেঁটে চলেছেন। দু’-একটি রিকশা তার ঝড়ের উপর পড়তে পড়তে সামলে উঠছে। দ্রুতগামী ট্যাক্সির উজ্জ্বল আলো মাঝে মাঝে তাঁর চোখ ঝলকে দিচ্ছে। তিনি আচ্ছন্নের মতো হাঁটছেন। এই বৃষ্টি, এই শীতল হাওয়া, পায়ের কনুই পর্যন্ত ডুবে যাওয়া ময়লা পানির স্রোত কিছুই যেন নজরে আসছে না তাঁর।

“আহা, আমার মেয়ে পথ করে একটা জিনিস চেয়েছে। আশা করে বসে আছে হয়তো। এমন লক্ষী মেয়ে আমার। বাবার সংসারে কত কষ্ট পাচ্ছে। তার নিজের সংসার হোক, সেখানে কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না, আমি কসম খেয়ে বলতে পারি।”—এই জাতীয় অসংলগ্ন ভাবনা ভাবতে ভাবতে তিনি নয়াপাড়া ছাড়িয়ে হাইস্কুল ছাড়িয়ে সেইজখালী পর্যন্ত চলে গেলেন। কোথায় যাচ্ছেন, কী জন্যে যাচ্ছেন এসব তাঁর মনে রইল না। একসময় ইটে ধাক্কা খেয়ে পানিতে পড়ে গেলেন। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বুঝলেন তাঁর পা টলছে; মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। “পাগলের মতো ঘুরছি কী জন্যে?” এই ভেবে ফিরে চললেন উল্টো পথে। বাজারের সীমানা ছাড়িয়ে পোস্ট-অফিসের কাছ আসতেই সশব্দে বাজ পড়ল কোথাও। রাত কত হয়েছে কে জানে। বাতি-টাতি বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। লোকজন শুয়ে পড়েছে। আজহার খাঁর হঠাৎ মনে হলো রফিকের বাসায় গিয়ে বিশটা টাকা নিয়ে এলে হয়। কিন্তু দোকান খোলা থাকবে কতক্ষণ? তিনি ডানদিকের গলিতে ভেজা সেভেল টানতে টানতে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন।

ঘন অন্ধকার রাস্তা, বিজলির আলোয় এক-আধবার সব ফর্সা হয়ে উঠে। পরক্ষণে নিকষ কালো।

রফিকের বাসায় কড়া নাড়তে গিয়ে বুঝলেন তাঁর শরীর সুস্থ নয়। প্রবল জ্বর এসেছে। পিপাসায় গলা বুক শুকিয়ে কাঠ— রফিক আঁতকে উঠে বলল, ‘কী হয়েছে আজহার ভাই?’

‘না কিছু হয়নি। এক গ্লাস পানি খাওয়াও।’

‘বাসার সবাই ভালো আছে তো? ভাবীর জ্বর কেমন?’

‘সব ভালোই আছে, এক গ্লাস পানি আন আগে।’

আজহার খাঁ উদ্ভ্রান্ত শূন্য দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। রফিক তাঁর হাত ধরল, ‘এহ, তোমার ভীষণ জ্বর। কী হয়েছে বল?’

‘টাকা আছে তোমার কাছে?’

‘কত টাকা?’

‘গোটা ত্রিশেক।’

‘দিচ্ছি। তুমি একটা শুকনো কাপড় পর। আমি রিকশা আনিয়ে দিই।’

‘আগে একটু পানি দাও।’

ঘর বন্ধ করে দোকানিরা গুয়ে পড়েছিল। আজহারি খাঁ হতভম্ব হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। রিকশাওয়ালা বিরক্ত হয়ে বলল, ‘ধাক্কা দেন না স্যার, ভিতরে লোক আছে।’

তিনি প্রাণপণে দরজায় ঘা দিলেন। ভেতর থেকে শব্দ এল— ‘কে?’

তিনি ভাঙা গলায় বললেন, ‘আমি। একটু খুলেন ভাই।’

‘কী ব্যাপার?’

‘টাকা নিয়ে এসেছি। সেটের শিশিটা দিন।’

খুঁট করে দরজা খুলে গেল। সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দোকানদার তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। তিনি পকেট হাতড়ে টাকা বের করলেন।

দোকানদার বলল, ‘আপনার কী হয়েছে?’

‘কিছু হয়নি।’

‘এত রাতে আসলেন কেন? সকালে আসলেই পারতেন।’

‘রাত কত হয়েছে?’

‘সাড়ে বারো।’

দ্রুতগতিতে রিকশা চলছে। তিনি শক্ত হাতে হুড চেপে ধরে আছেন। তাঁর সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। তাঁর মনে হলো তিনি যে-কোনো সময় ছিঁটকে পড়ে যাবেন।

বাড়ির কাছাকাছি সমস্ত অঞ্চলটা অন্ধকারে ডুবে আছে। একটি লাইটপোস্টেও আলো নেই। অল্প ঝড়-বাদলা হলেই এ দিককার সব বাতি নিভে যায়। রিকশা আজহার খার বাড়ি থেকে একটু দূরে টগরদের বাড়ির সামনে

থামল। তিনি দেখলেন হারিকেন জ্বালিয়ে লিলি আর তার মা বারান্দায় বসে আছে। রিকশার বাতি দেখে দু'জনই উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারের জন্যে বুঝতে পারছে না কে এল।

আজহার খাঁ ডাকলেন, লিলি লিলি। জমে থাকা পানিতে ছপছপ শব্দ তুলে মা ও মেয়ে দু'জনেই দ্রুত আসছিল। তিনি ব্যস্ত হয়ে রিকশা থেকে নামতে গিয়ে উলটে পড়লেন। যে জায়গাটায় তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, সেখানটায় অদ্ভুত মিষ্টি সুবাস। তিনি ধরা গলায় বললেন, 'লিলি তোর শিশিটা ভেঙে গেছে রে।'

লিপি ফোঁপতে ফোঁপাতে বলল, 'আমার শিশি লাগবে না। তোমার কী হয়েছে বাবা?'

গভীর জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন আজহার খাঁ। রঞ্জু অকাতরে ঘুমুচ্ছে। লিলি আর লিলির মা ভয়কাতর চোখে জেগে বসে আছেন। বাইরে বৃষ্টিস্নাত গভীর রাত্রি। ঘরের ভেতরে হারিকেনের রহস্যময় আলো। জানালা গলে ভিজে হিমেল হাওয়া আসছে।

সেই হাওয়া সেন্টের ভাঙা শিশি থেকে কিছু অপকৃষ্ট সৌরভ উড়িয়ে আনল।



জলছবি

ফার্মগেটে বাসে উঠবার সময় জলিল সাহেবের বাম পায়ের জুতার তলাটা খুলে গেল। বাসে উঠবার উত্তেজনায় ব্যাপারটা তিনি খেয়াল করলেন না। শুধু মনে হলো দাঁড়িয়ে তিনি যেন ঠিক আরাম পাচ্ছেন না। বাম পায়ে তেমন জোর নেই।

শাহবাগের কাছে এসে তিনি বসবার জায়গা পেলেন। অফিস টাইমে বসবার জায়গা পাওয়া অসম্ভব ভাগ্যের ব্যাপার। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঝামেলা আছে। তিনি আড়চোখে পাশে বসা লোকটির দিকে তাকালেন এবং শিউরে উঠলেন। লোকটির ঘাড় থেকে কান পর্যন্ত দগদগে ঘা। লালভ একরকম রস সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ছে। জলিল সাহেবের পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল। তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন তার পায়ের দিকে। আর তখনই দেখলেন বাম পায়ের জুতার তলাটার কোনো চিহ্নই নেই। এক বছরও হয়নি। এর মধ্যে এই অবস্থা! পাশে বসা লোকটি বলল, 'ক'টা বাজে?'

‘ন’টা।’

লোকটা রাগী গলায় বলল, ‘আপনার ঘড়িতে তো ন’টা দশ বাজে। ন’টা বললেন কেন?’ জলিল সাহেব তাকিয়ে দেখলেন লোকটির হাতেও ঘা। কুণ্ট নাকি? তিনি বাঁ দিকে খানিকটা সরে এলেন। লোকটি পা মেলে যতটুকু জায়গা খালি ছিল সবটুকু ভরাট করে ফেলল।

‘আপনার জুতার কী হয়েছে?’

জলিল সাহেব জবাব দিলেন না।

‘খুলে পড়ে গেছে নাকি?’

‘হ্যাঁ।’

বাসের অনেক লোক উঁকি দিল। যেন দারুণ একটা মজার ব্যাপার। অনেক রকম ছোট ছোট প্রশ্ন হতে লাগল, ‘কোন সময় খুলল?’ ‘টের পান নাই?’ ‘বলেন কি!’

‘কোন কোম্পানির জুতা? বাটা নাকি? বাটা জুতার আধের কোয়ালিটি এখন আর নেই। জুতার দোকানে না গিয়ে অর্ডার দিয়ে বানানোই এখন ভালো। হেসে-খেলে চার-পাঁচ বছর যায়।’

জলিল সাহেব লক্ষ করলেন তাঁর সামনের সিটে বসা দুটি মেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে জুতা দেখতে চাচ্ছে। এই গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যেও তামাশা দেখা চাই। একটি মেয়ে আবার ফিক করে হেসে ফেলল। এর মধ্যে হাসির ঠিক কী আছে জলিল সাহেব ভেবে পেলেন না! তাঁর মনে হলো মেয়েরা এখন আর আগের মতো নেই। মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে ভারাই সবার আগে হেসে ওঠে। যেমন তাঁর অফিসের ডেসপাস সেকশনের মেয়েটি। কী মায়াকাড়া চেহারা! কী মিষ্টি হাসি! একদিন লাঞ্চার সময় এসে জিজ্ঞেস করল, ‘কী লাঞ্চ আনলেন আজ?’

তিনি বললেন, ‘রুটি আর আলু ভাজা।’

কয়েক দিন পর আবার জিজ্ঞেস করল। সেদিনও তিনি বললেন রুটি আর আলু ভাজা। তারপর একদিন তিনি শুনে ডেসপাস সেকশনের সবাই তাঁকে ডাকছে— মিস্টার পটেটু ভাজা।

এইসব তাঁকে বিচলিত করে না। কিন্তু এমন একটা মিষ্টি চেহারার মেয়ে, যে এত সুন্দর করে হাসে— সে কী করে মানুষের কষ্ট নিয়ে তামাশা করে? তা ছাড়া তিনি তার বাবার বয়েসি। বিয়ে করলে এত বড় একটা মেয়ে তার নিশ্চয়ই থাকত।

জলিল সাহেবের গুলিস্তানে নামার কথা কিন্তু তিনি প্রেসক্লাবে নেমে পড়লেন। জুতাটা সারানো যায় কিনা দেখতে হবে। আজ অফিসে দেরি হবেই। গত এক বছরে তিনি একদিন মাত্র দেরি করেছেন। আজকেরটা নিয়ে হবে

দু'দিন। দু'দিন দেরি হলে কিছু হবে না।

কিন্তু সেকশন অফিসার নজমুল হুদা সাহেব তাঁকে সহ্যই করতে পারেন না। তিনি আসার পর থেকে শুধু খুঁত ধরার চেষ্টা করছেন। 'এ কী জলিল সাহেব! চিঠি লিখেছেন ডেট কোথায়? ডেট ছাড়া চিঠি হয়? বাইশ বছরে কাজ এই শিখেছেন? রিপোর্টিংয়ের বুঝি এই বানান? ডিকশনারি দেখতে পারেন না? অফিসের খরচে তো ডিকশনারি কেনা হয়। সেটা কি শুধু টেবিলে সাজিয়ে রাখবার জন্যে?'

'ভাউচারগুলো সবই করিয়ে রাখতে বলেছিলাম। এখন দেখি দু'টা ভাউচারে কোনো সই নেই। পেয়েছেন কী আপনি? বাইশ বছরেও সামান্য কাজটা শিখতে না পারলে কখন পারবেন?'

'আসলে আপনার এখন অফিসের কাজে মন নেই। মন থাকলে এ রকম হয় না।'

মুচি ছেলেটি গম্ভীর মুখে টায়ারের রবার কাটছে। বয়স তেরো-চৌদ্দ বেশি হবে না কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে ফসফস করে সিগারেট টানছে। এক পোচ রবার কাটে আর গম্ভীর হয়ে সিগারেটে টান দেয়। অফিসে যেন রবার কাটার মতো জটিল কাজ এ-পৃথিবীতে আর তৈরি হয়নি। বহু কষ্টে ছেলেটির গায়ে চড় মারার ইচ্ছা দমন করে জলিল সাহেব টলপুকাঠের বাক্সের ওপরে বসে বসে ঝিমুতে লাগলেন। এগারোটা সাত মিনিটে জুতা তৈরি হলো। জলিল সাহেব সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ছেলেটি ডেস্ক তুলল তাঁকে।

না। বয়স হয়ে যাচ্ছে। নয়তো এ রকম অসময়ে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে? নজমুল হুদা সাহেব ঠিকই বলেছিলেন, 'বয়স হয়ে গেছে এখন অফিস ছেড়ে বাড়িতে বিশ্রাম করেন। অফিসের কাজ আর আপনাকে দিয়ে হবে না।'

ঠিক সাড়ে এগারোটোর সময় তিনি অফিসে পৌঁছলেন। তাঁর মনে হলো কিছু একটা হয়েছে। ডেসপাস সেকশনের আমিন সাহেব কেমন যেন অদ্ভুত চোখে তাকালেন।

'জুতাটা ছিঁড়ে গিয়েছিল। ঠিক করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।'

আমিন সাহেব কোনো কথা বললেন না।

'রবারের সোল লাগিয়েছি। দশ টাকা লাগল।'

আমিন সাহেব শুধু বললেন, 'ও তাই বুঝি?'

ডেসপাসের ঐ মেয়েটি হেড ক্লার্কের সঙ্গে হাত নেড়ে কী যেন বলছিল। জলিল সাহেবকে দেখেই থেমে গেল। এর মানে কী? জলিল সাহেব কৈফিয়তের স্বরে বললেন, 'জুতার শুকতলিটা খুলে পড়ে গিয়েছিল।'

মেয়েটি শীতল স্বরে বলল, 'বড় সাহেব আপনাকে খুঁজেছিলেন।'

'কখন?'

'সাড়ে দশটার দিকে।'

'কী জন্যে?'

'তাঁর কাছ থেকেই শুনবেন।'

জলিল সাহেব নিঃশব্দে তার টেবিলে গিয়ে বসলেন। টেবিলের উপর ক্লিয়ারেন্সের দুটি ফাইল ছিল। তার একটিও নেই। তিনি চেয়ারে বসে ঘামতে লাগলেন। পাশের টেবিলের সুভাস বাবু মৃদু স্বরে বললেন, 'কোনোদিন দেরি করেন না। আজকের দিনটাই দেরি করলেন?'

জলিল সাহেব বিড়বিড় করে কী বললেন ঠিক বোঝা গেল না।

'আপনার ফাইল দু'টো নাজমুল হুদা সাহেব নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন আমাকে দেখে দিতে বলেছেন।'

জলিল সাহেব কিছু বললেন না।

আপনাকে বড় সাহেব দেখা করতে বলেছেন, যান দেখা করে আসুন।'

জলিল সাহেব নড়লেন না। ফ্যানের ঠিক নিচেই তাঁর চেয়ার। তবু তিনি কুলকুল করে ঘামতে লাগলেন। তাঁর মনে হলো নিশ্চয়ই চাকরি চলে গেছে।

আজ সন্ধ্যায় বাড়ি গিয়ে কী বলবেন তিনি? যার বাড়িতে তিনি মাসে তিনশ' পনেরো টাকা দিয়ে থাকেন এবং খনি সেরে তাঁর দূর সম্পর্কের ভাই। তবু সে তাঁকে নিশ্চয় দশ দিনের মধ্যে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। দশ দিন পর নতুন মাস থেকে অন্য একজন কাউকে সে নেবে। না নিলে তার সংসার চলবে না। তার বৌটি অবিশ্যি খুব কষ্ট পাবে। এই মেয়েটি অন্য মেয়েগুলোর মতো না। এই মেয়েটির মধ্যে দয়াময়ি আছে। বড় ভালো মেয়ে।

'জলিল সাহেব!'

'জি।'

'বসে আছেন কেন? যান সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসুন।'

'যাই।'

জলিল সাহেব উঠলেন না, বসেই রইলেন। তার দারুণ তৃষ্ণা বোধ হলো। একটি বেয়ারা আছে। তাকে বললেই সে পানি এনে দেয়। কিন্তু তাকেও তিনি কিছু বললেন না। প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে ফ্যানের নিচে বসে তিনি ঘামতে লাগলেন।

প্রাইভেট কোম্পানির চাকরি চলে গেলে টাকাপয়সা তেমন কিছু পাওয়া যাবে না। প্রভিডেন্ট ফান্ডে অল্প যা কিছু ছিল তার প্রায় সবটা নিয়েই বাবার শেষ চিকিৎসা করাতে হলো। জানতেন টাকাটা জলে যাচ্ছে তবু দায়িত্ব পালন। বিনা চিকিৎসায় মরতে দেয়া যায় না। ক্যানসার, বাঁচার কোনো আশা নেই জেনেও তিন হাজার টাকা খরচ করে অপারেশন করালেন।

ডাক্তার সাহেব নিজেও নিষেধ করেছিলেন, ‘এই বয়সে অপারেশনের শক সহ্য হবে না। বাড়িতে নিয়ে যান, শান্তিতে মরতে দিন। অপারেশন সাকসেসফুল হলেও লাভ নেই তেমন কিছু। বড়জোর বছরখানেক বাঁচবেন।’

কিন্তু বাবা ক্ষেপে উঠলেন অপারেশনের জন্যে। রোজ দু’বেলা জিজ্ঞেস করেন, ‘অপারেশন কবে? তাড়াতাড়ি করা দরকার। এইসব জিনিস যত তাড়াতাড়ি হয় তত ভালো।’

প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে মোট পাঁচ হাজার আটশ’ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। আসলে ছ’হাজার। দু’শ টাকা পান খাওয়ার জন্যে দিতে হয়েছে। তার মধ্যে খরচ হলো তিন হাজার। এতগুলো টাকা হাতছাড়া করতে মায়া লাগে। সব চকচকে নোট। হাতে নিয়ে বসে থাকতেও আনন্দ। নতুন জুতা কিনে ফেললেন একজোড়া, একটা মশারি কিনলেন। আগের মশারিটি দিয়ে তিনটি নারকেল পাওয়া গেল। সদরঘাটের পুরানো কাপড়ের দোকান থেকে ছাপান টাকায় কোট কিনলেন একটা। এই কোটটিই তার কাল হয়েছিল। কোটের পকেট থেকেই বাকি টাকাগুলো পকেটমার হয়। সব নতুন নোট। তিনি সেদিন অফিসে না গিয়ে রেসকোর্সের মাঠে একটা গাছের নিচে সারা দুপুর বসে ছিলেন। রেসকোর্সের মাঠটাকে গাছ-টাছ লাগিয়ে যে এত চমৎকার করা হয়েছে তা তিনি জানতেন না।

লাঞ্চ আওয়ারে বড় সাহেব ডেকে পাঠালেন।

বড় সাহেবের ঘরে এয়ারকন্ডিশন আছে। সেটি বোধহয় কাজ করছে না। জলিল সাহেবের গরম লাগছে। প্রচণ্ড গরম। বড় সাহেবের পাশে নাজমুল হুদা সাহেব বসে আছেন। চেক চেক শার্টের জন্যে তাঁর বয়স খুব কম লাগছে। কিন্তু শার্টের ছাপাটা ভালো না। কেমন যেন চোখে লাগে। জলিল সাহেবের চোখ কড়-কড় করতে লাগল।

‘জলিল সাহেব।’

‘জি স্যার।’

‘বসুন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন?’

জলিল সাহেব বসলেন।

‘সকাল বেলায় দিকে একবার আপনার খোঁজ করেছিলাম।’

জলিল সাহেব জুতা ছেঁড়ার ব্যাপারটা বলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বলতে পারলেন না। গলায় কথা আটকে গেল। বড় সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, ‘হেড অফিস থেকে চিঠি এসেছে। তারা আপনাকে অফিসার্স গ্রেডে প্রমোট করেছে। আপনার সার্ভিসে হেড অফিস খুব স্যাটিসফায়েড।’

জলিল সাহেব শুকনো চোখে তাকিয়ে রইলেন।

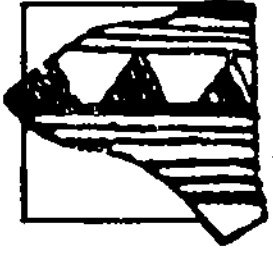
‘নাজমুল হুদা সাহেবের পাশের কামরাটাতে আপনি আপাতত কাজ শুরু করুন। জিনিসপত্র কিছু লাগলে রিকুইজিশন শ্লিপ দিয়ে স্টোর থেকে নিয়ে নেবেন।’

বড় সাহেব হাত বাড়িয়ে বললেন, ‘কনগ্রাচুলেশনস।’ হাতটি যে হ্যাভসেকের জন্যে বাড়ানো জলিল সাহেব অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারলেন না। যখন পারলেন তখন তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। তিনি ধরা গলায় বললেন, ‘স্যার জুতাটা ঠিকমতো সেলাই করেনি। একটা পেরেক উঁচা হয়ে আছে। খুব ব্যথা লাগছে।’

ক্যান্টিনে সবাই বোধহয় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাঁকে আসতে দেখে সবাই উঠে দাঁড়াল। ডেসপাস সেকশনের মেয়েটি হাসিমুখে বলল, ‘স্যার আপনার সম্মানে আজ আমরা সবাই দুপুরে একটু বিশেষ খাওয়া-দাওয়া করব। নাজমুল হুদা সাহেবও খাবেন আমাদের সঙ্গে।’

কিছু একটা বলা দরকার। সবাই হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। জলিল সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, ‘জুতাটা ঠিকমতো সেলাই করেনি। একটা পেরেক উঁচা হয়ে আছে।’

কাদের মিয়া বিরিয়ানি এবং একটি করে টিকিয়া আনতে স্টেডিয়ামে গেছে। জলিল সাহেব তাঁর নিজের লাঞ্চ বাক্সটি হাতে করে চুপচাপ বসে রইলেন। তাঁর খুব ইচ্ছা করছিল ডেসপাস সেকশনের মেয়েটিকে লাঞ্চ বাক্সটি খুলে দেখান। কারণ, সেখানে রুটি এবং আলুভাজা ছাড়াও একটা খেজুরগুড়ের সন্দেশ আছে। রোজ-রোজ এক জিনিস খেতে কষ্ট হয় ভেবেই বাড়ি থেকে মেয়েটি দিয়ে দিয়েছে। তিনি খুব আশা করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটি শোনেনি। মেয়েজাতটা হচ্ছে মায়াবতীর জাত। শুধু শুধু মায়া দেখায়। জলিল সাহেবের চোখ আবার ভিজে উঠল। ডেসপাস সেকশনের মেয়েটি বলল, ‘স্যার আপনার কষ্ট হচ্ছে। আপনি বরং জুতাটা খুলে রাখুন।’



নন্দিনী

মজিদ বলল, 'চল তোকে একটা জায়গায় নিয়ে যাই।'

বেশ রাত হয়েছে। চারদিকে ফিনফিনে কুয়াশা। দোকানপাট বন্ধ। হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। পাড়ার শহরগুলিতে আগে আগে শীত নামে। মজিদ বলল, 'পা চালিয়ে চল। শীত কম লাগবে।'

'কোথায় যাবি?'

'চল না দেখি। জরুরি কোনো কাজ তো তোর নেই। নাকি আছে?'

'না নেই।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় রাস্তা ছেড়ে ইট বিছানো সরু রাস্তায় এসে পড়লাম। শহর অনেক বদলে গেছে। আগে এখানে ডাক্তার কারবারিরা বসত। এখন জায়গাটা ফাঁকা। পিছনেই ছিল কার্তিকের 'মডার্ন সেলুন।' সেখানে দেখি একটা চায়ের স্টল। শীতে গুটিসুটি মেরে লোকজন চা খাচ্ছে। আমি বললাম, 'এক দফা চা খেয়ে নিবি নাকি মজিদ?'

'উঁহু, দেরি হয়ে যাবে।'

'শহরটা বদলে গেছে একেবারে। মহারাজের চপের দোকানটা এখনো আছে?'

'আছে।'

হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলা পর্যন্ত চলে এলাম। ধর্মতলায় গা ঘেঁসে গিয়েছে হাড়িখাল নদী। আমি আর মজিদ গোপনে সিগারেট টানবার জন্যে কতবার হাড়িখালের পাড়ে এসে বসেছি। কিন্তু এখন নদী-টদী কিছু চোখে পড়ছে না।

'নদীটা কোথায় রে মজিদ? হাড়িখাল এইদিকেই ছিল না?'

'ঐ তো নদী। সাবধানে আয়।'

একটা নর্দমার মতো আছে এখানে। পা পিছলে পড়েই গিয়েছিলাম। সামলে উঠে দেখি নদী দেখা যাচ্ছে। আমরা নদীর বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। সরু ফিতের মতো নদী অন্ধকারেও চিকমিক করছে। আগে এখানে এরকম উঁচু বাঁধ ছিল না। নদীর ঢালু পাড়ে সরিষার চাষ হতো। মজিদ চুপচাপ হাঁটছিল।

আমি বললাম, 'আর দূর কত?'

‘ঐ দেখা যাচ্ছে।’

‘কার বাড়ি?’

‘আয় না চুপচাপ। খুব সারপ্রাইজড হবি।’

একটি পুরানো ভাঙা দালানের সামনে দু’জন থমকে দাঁড়ালাম। বাড়ি চারপাশ ঝোপঝাড়ে অন্ধকার হয়ে আছে। সামনের অপরিচ্ছন্ন উঠোনে চার-পাঁচটা বড় বড় কাগজি লেবুর গাছ। লেবুর গন্ধের সঙ্গে পুরনো গন্ধ এসে মিশেছে। অসংখ্য মশার পিনপিনে আওয়াজ। মজিদ খট খট করে কড়া নাড়তে লাগল। ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় কেউ একজন বলল, ‘কে?’

মজিদ আরো জোরে কড়া নাড়তে লাগল। হারিকেন হাতে একটি লম্বা রোগামতো শ্যামলা মেয়ে দরজা খুলে দিল। মজিদ বলল, ‘কাকে নিয়ে এসেছি দেখ।’

আমি কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। মেয়েটি হাসিমুখে বলল, ‘আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন তো? আমি নন্দিনী।’

আমি মাথা নাড়লাম।

‘আপনি কবে দেশে ফিরেছেন?’

‘দু’মাস হবে। এতদিন ঢাকায় ছিলাম। এখানে এসেছি গত কাল।’

মজিদ বিরক্ত হয়ে বলল, ‘ভিতরে আয় না। ভিতরে এসে বস।’

ঘরের ভিতরটা বেশ গরম। একটি টেবিলে কাচের ফুলদানিতে গন্ধরাজ ফুল সাজানো। চৌকিতে ধবধবে সাদা ছাদির বিছানো। ঘরের অন্য প্রান্তে প্রকাণ্ড একটা ইজি চেয়ার। মজিদ পা এগিয়ে ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়ল। হালকা গলায় বলল, ‘চিনি এনেছি। একটু চাবানাও।’

নন্দিনী হারিকেন দুর্লভে চলে গেল। আমরা দু’জন অন্ধকারে বসে রইলাম। মজিদ ফস করে বলল, ‘সারপ্রাইজড হয়েছিস নাকি?’

‘হুঁ।’

‘কেমন দেখলি নন্দিনীকে?’

‘ভালো।’

‘শুধু ভালো? ইজ নট সি ওয়াভারফুল?’

আমি সে-কথার জবাব না দিয়ে বললাম, ‘এই বাড়িতে আর কে থাকে?’

‘সবাই থাকে।’

‘সবাই মানে?’

মজিদ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ঠাণ্ডা গলায় বলল, ‘তুই একবার নন্দিনীকে প্রেমপত্র লিখেছিলি না? অনেক কবিতা-টবিতা ছিল সেখানে। তাই না?’

আমি শুকনো গলায় বললাম, ‘বাদ দে ওসব পুরানো কথা।’

মজিদ টেনে টেনে হাসতে লাগল।

পরের দশ মিনিট দু'জনেই চুপ করে রইলাম। মজিদ একটির পর একটি সিগারেট টানতে লাগল। মাঝে মাঝে হাসতে লাগল আপন মনে।

‘অনেকক্ষণ আপনাদের অন্ধকারে বসিয়ে রাখলাম। ঘরে একটা মোটে হারিকেন। কী যে করি!’ নন্দিনী চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল।

‘চিনি হয়েছে চা’য়ে?’

কাপে চুমুক দিয়ে মজিদ বিষম খেয়ে কাশতে লাগল। আমি বললাম, ‘আপনাদের এদিকে খুব হাওয়া তো।’

‘হঁ নদীর উপরে বাড়ি। হাওয়ার জন্যে কুপি জ্বালানোই মুশকিল।’

ভেতর থেকে কে একজন ডাকল, ‘বউ, ও বউ।’

নন্দিনী নিঃশব্দে উঠে গেল। আমি বললাম, ‘তুই প্রায়ই আসিস এখানে?’

‘আসি।’

‘ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।’

আমি চুপ করে রইলাম। মজিদ বলল, ‘রাত হয়ে যাচ্ছে এইবার ফিরব। নন্দিনীকে কেমন দেখলি বল না শুনি।’

‘ভালো। আগের মতোই, একটুও বদলায়নি।’

নন্দিনী আমাদের ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। উত্তক্ষেপে চাঁদ উঠে গেছে। স্নান জ্যোৎস্নায় চারদিক কেমন ভূভূড়ে মনে হচ্ছে। মজিদ বলল, ‘যাই নন্দিনী।’

নন্দিনী কিছু বলল না। হারিকেন উঠে করে বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে রইল। আমরা ধর্মতলা পর্যন্ত নিঃশব্দে হাঁটলাম। একসময় মজিদ বলল, ‘কলেজের ফেয়ারওয়েলে নন্দিনী কোন পানতী গেয়েছিল মন আছে?’

‘না মনে নেই।’

‘আমার আছে।’

মজিদ গুনগুন করে একটা গানের সুর ভাজতে থাকল। হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, ‘জানিস, নন্দিনীকে আমিই এ বাড়িতে এনে তুলেছিলাম।’

‘তাই নাকি?’

‘ওর বাবাকে তখন মিলিটারিরা মেরে ফেলেছে।’

‘সুরেশ্বর বাবুকে মিলিটারিরা মেরে ফেলেছে নাকি?’

‘মারবে না তো কি আদর করবে? তুই কী যে কথা বলিস! মেরে তো সাফ করে ফেলেছে এদিকে।’

আমি বললাম, ‘সুরেশ্বর বাবু একটা গাধা ছিলেন। কত বললাম—মিলিটারি আসবার আগেই পালান। না পালাবেন না, একটামাত্র মেয়ে সঙ্গে নিয়ে হুস করে চলে যাবে, তা না...।’

মজিদ একদলা থুথু ফেলে বলল, ‘নন্দিনী তখন এসে উঠেছে হারুনদের বাসায়। হিন্দু মেয়েদের সে সময় কে জায়গা দেবে বল? কী যে মুসিবত হলো!’

কতজনের বাড়িতে গিয়ে হাত জোড় করে বলেছি, এই মেয়েটিকে একটু জায়গা দেবেন। এর বড় বিপদ। কেউ রাজি হয় না। শেষকালে আজিজ মাস্টার রাজি।’

‘আজিজ মাস্টার কে?’

‘এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি স্কুলের টিচার।’

মজিদ একটি সিগারেট ধরাল। ঘনঘন ধোঁয়া টেনে কাশতে লাগল। আমি বললাম, ‘পা চালিয়ে চল, বেশ রাত হয়েছে।’

মজিদ ঠাণ্ডা সুরে বলল, ‘নন্দিনী আজিজ মাস্টারের কাছে কিছুতেই থাকতে চায়নি। বারবার বলছে— আপনি তো ইন্ডিয়া যাবেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। পায়ে পড়ি আপনার।’

আমি ধমক দিয়ে বলেছি, ‘তুমি হিন্দু মেয়ে মুসলমান ছেলের সঙ্গে যাবে, পথেঘাটে গিজগিজ করছে মিলিটারি। নন্দিনী কী বলেছিল জানিস?’

‘কী?’

‘আন্দাজ করতে পারিস কিছু?’

আমি কথা বলার আগেই মজিদ চাপা গলায় বলল, ‘নন্দিনী বলেছে, বেশ, তাহলে আপনার বউ সেজে যাই। না হয় আপনি আমাকে বিয়ে করুন।’

মজিদ এক দলা থুথু ফেলল। আমি বললাম, ‘আজিজ খাঁ বুঝি বিয়ে করেছে একে?’

‘হ্যাঁ।’

‘আজিজ খাঁ কোথায়? তাঁকে তো দেখলাম না।’

‘ও শালাকে দেখবি কী করে? ও মুক্তিবাহিনীর হাতে মরেছে। দালাল ছিল শালা। হিন্দু মেয়েকে মুসলমান বানিয়ে বিয়ে করেছে। বুঝতে পারছিস না? আর নন্দিনী কিনা তার বাড়িতেই মাটি কামড়ে পড়ে রইল। হারামজাদী।’

আমি চুপ করে রইলাম। মজিদ দাঁড়িয়ে পড়ল। অকারণেই গলা উঁচিয়ে বলল, ‘মেয়ে মানুষের মুখে থুথু দেই। তুই হারামজাদী ঐ বাড়িতে পড়ে আছিস কী জন্যে? কী আছে ঐ বাড়িতে? জোর করে তোকে বিয়ে করেছে, আর তুই কিনা ছিঃ ছিঃ!’

দু’জনে বাঁধ ছেড়ে শহরের প্রশস্ত পথে উঠে এলাম। বড় রাস্তাটা বটগাছ পর্যন্ত গিয়ে বেঁকে গেছে ডানদিকে। এদিকেই সুরেশ্বর বাবুর বাড়ি ছিল। আমি আর মজিদ সেই বাড়ির সামনে শুধুমাত্র নন্দিনীকে একনজর দেখবার জন্যে ঘুরঘুর করতাম। কোনো কোনো দিন সুরেশ্বর বাবু দেখে ফেললে অমায়িক ভঙ্গিতে ডাকতেন, ‘আরে আরে তোমরা যে এসো, এসো চা খাবে।’ মজিদ হাতের সিগারেট কায়দা করে লুকিয়ে ফেলে বলতো, ‘আরেক দিন আসব কাকা।’

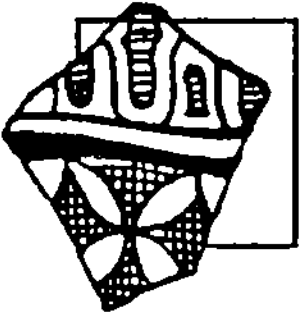
মজিদ নিঃশব্দে হাঁটছিল। আমি ডাকলাম, 'এই মজিদ।'

'কী?'

'চুপচাপ যে?'

'শীত করছে।'

সে কান পর্যন্ত চাদর তুলে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'জানিস, আমি আর নন্দিনী একটা গোটা রাত নৌকায় ছিলাম। রাতের অন্ধকারে আজিজ খাঁর বাড়িতে নৌকা করে ওকে রেখে এসেছিলাম। খুব কাঁদছিল সে। আমি ওর ঘাড়ে একটা চুমু খেয়েছিলাম।' মজিদ হঠাৎ কথা থামিয়ে কাশতে লাগল। আমি চারদিকের গাঢ় কুয়াশা দেখতে লাগলাম।



সুখ অসুখ

খুটখুট শব্দ হচ্ছে সিঁড়িতে।

সুরমা আসছে। দশটা বেজে গেল নাকি? রহমান সাহেব দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালেন। তাকাতে কষ্ট হয়। ঘাড় অনেকখানি বাঁকা করতে হয়। না দশটা বাজেনি, এখনো দশ মিনিট বাকি আছে। সুরমা আজ সকাল সকাল চলে আসছে কেন? তার সব কাজ তো ঘড়ি-ধরা। রহমান সাহেব বিস্ময় বোধ করলেন।

'বাবা, কিছু লাগবে?'

রহমান সাহেব উত্তর দেবার আগে সুরমার মনের ভাব বুঝতে চেষ্টা করলেন। কিছু-কিছু মুখ আছে যেখানে মনের কোনো ছাপ পড়ে না। রহমান সাহেব সুরমার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনোদিনই কিছু বুঝতে পারেননি। আজও পারলেন না। সুরমা দ্বিতীয়বার বলল, 'কিছু লাগবে আপনার?'

'না বৌমা। কিছু লাগবে না।'

'দুধ খেয়েছেন?'

'হু।'

'তোতা মিয়া আপনাকে বাথরুম করিয়ে গেছে?'

এই প্রশ্নটি সুরমা প্রতি রাতেই জিজ্ঞেস করে এবং প্রতি রাতেই তিনি দারুণ লজ্জিত বোধ করেন। আজও হ্যাঁ বলতে গিয়ে গলায় কথা আটকে গেল।

‘আবার যদি বাথরুমের দরকার হয় তাহলে তোতা মিয়াকে ডাকবেন। কলিং বেলটা টেপবেন।’

‘না দরকার নাই।’

‘বাতি নিভিয়ে দেই?’

‘দাও।’

সুরমা বাতি নিভিয়ে দিল। ঘর অবিশ্যি অন্ধকার হলো না। সুরমা জিরো পাওয়ারের টেবিল ল্যাম্পটি জ্বালাল। এই কাজ দু’টি শুয়ে শুয়ে রহমান সাহেব নিজেও করতে পারেন। তাঁর হাতের কাছে বেড সুইচ আছে। প্যারালাইসিস হবার পর থেকে শেষ বাতি নেভানোর জন্যে সুরমা আসছে। তিনি এই বাড়তি যত্নটুকু পাচ্ছেন। বড় ভালো মেয়ে।

বাতি নেভাবার পরও সুরমা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সে কি কিছু বলতে চায়? রহমান সাহেব উঠে বসার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। তিনি যে এখন আর ইচ্ছামতো উঠে-বসতে পারেন না, তা মনে থাকে না। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, ‘বৌমা, লিলি কি ঘুমিয়ে পড়েছে?’

‘হ্যাঁ। ও ন’টার সময় ঘুমুতে যায়।’

‘তুমি কি কিছু বলবে?’

‘না কিছু বলব না। আপনি ঘুমান। মাথার পাশের জানালাটা বন্ধ করে দিই? শেষ রাতের দিকে ঠাণ্ডা পড়বে।’

‘দাও।’

‘আপনার পায়ের কাছে চাদর আছে। ঠাণ্ডা লাগলেই চাদর টেনে দেবেন।’

‘ঠিক আছে।’

‘আর কোনো রকম দরকার হলেই তোতা মিয়াকে বলবেন আমাকে ডেকে তুলতে।’

‘ঠিক আছে মা, বলব।’

সুরমা ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা ভেজিয়ে নিচে নেমে গেল। রহমান সাহেব মনে করতে চেষ্টা করলেন— সুরমার চোখে-মুখে ঠিক কী পরিমাণ ঘৃণা ছিল। ভালো মেয়েদের মধ্যেও ঘৃণা থাকতে পারে এবং থাকে।

বালিশের নিচ থেকে তিনি সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। হাত দু’টি সচল আছে। সিগারেট ধরাতে কোনো অসুবিধা হয় না। ভাগ্যিস কোমরের নিচ থেকে প্যারালাইসিস হয়েছে।

সিগারেটে টান দিয়ে নিজের মনে তিনি খানিকক্ষণ হাসলেন। মনে-মনে বললেন, ‘আমার খুব ভালো এবং খুব লক্ষ্মী বৌমাকে আমি প্যাঁচে ফেলেছি।’

আমাকে এই অবস্থায় ফেলে তার কোথাও যাবার উপায় নেই। এইখানেই তাকে থাকতে হবে।’

আফজাল নিশ্চয়ই নর্থ ডাকোটা থেকে প্রতি সপ্তাহেই লিখছে—

সুরমা,

বাবাকে এই অবস্থায় দেশে ফেলে তোমাদের আমেরিকায় আসার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই তোমরা আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর। বাবার শরীর সুস্থ হোক। বাবার শরীর না সারা পর্যন্ত এই নিয়ে আর কিছুই করা যাবে না...।

রহমান সাহেব অন্ধকারেই হাসলেন, এটা সুস্থ হবার অসুখ না। তিনি খাটের কাছে লাগানো সুইচ টিপলেন। দু’বার টেপার সঙ্গে সঙ্গেই তোতা মিয়া বিরক্ত মুখে ঢুকল।

‘বেড প্যান দাও। পেসাব করব।’

তোতা মিয়া বাতি জ্বালাল। তার মুখ অন্ধকার। হারামজাদা নবাব, বেড প্যান দিতে তার কষ্ট হচ্ছে। মুখ একেবারে আঁধার হয়ে গেল।

তোতা মিয়া শুকনো গলায় বলল, ‘সিগারেট খাইতে আম্মা নিষেধ করছে না?’

‘চুপ থাক তুই।’

‘আম্মা আমরারে গাইল-মন্দ করে।’

‘করলে করুক। তুই টেবিল ল্যাম্পটা মাথার কাছে দিয়া যা।’

‘এত রাইতে টেবিল ল্যাম্প দিয়া কী করবেন?’

‘যাই করি। তোকে দিতে বলছি, দে।’

তোতা মিয়া টেবিল ল্যাম্প এগিয়ে আনল। রাত এগারোটোর দিকে তিনি চিঠি লিখতে বসলেন। বাতজাগার রুটিন তাঁর নতুন নয়। সুরমা বাতি নিভিয়ে দেবার পরপরই তিনি বাতি জ্বালেন। প্রায় রাতে দেড়টা-দু’টো পর্যন্ত জাগেন। এই বয়সে ঘুম কমে যায়। শুধু জেগে থাকতে ইচ্ছা করে।

রহমান সাহেবের হাতের লেখা পরিষ্কার। তিনি গোটা গোটা হরফে লিখলেন—

প্রিয় আফজাল,

আমার শরীর ক্রমশই খারাপ হইতেছে। এখন আর কিছুই ভালো লাগে না। রাতদিন পাক পরওয়ারদেগারের কাছে প্রার্থনা করি যাতে তিনি আমাকে তোমার মা’র কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। আমার কারণে বৌমার যাওয়া স্থগিত আছে মনে হইলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করি। লিলির দিকে তাকাইলে চোখে পানি আসে। বাবা, তোমার প্রতি আমার আদেশ— তুমি আমার কথা চিন্তা না করিয়া বৌমাকে নিজের কাছে নেওয়ার ব্যবস্থা করো।

এইখানে একা একা থাকিতে আমার কোন অসুবিধা হইবে না।
ইনশাআল্লাহ। তোতা মিয়া আছে। মনোয়ারের মা আছে। পাশের
বাড়ির ডাক্তার সাহেব আছেন। তুমি বাবা, আমার জন্যে চিন্তা
করিবে না। আমার কোনোই অসুবিধা নাই...।

চিঠিটা প্রায় তিন পৃষ্ঠা হলো। অসুখের পর রহমান সাহেব ছোট চিঠি
লিখতে পারেন না। চিঠি লম্বাই হতে থাকে। শুধু লিখতেই ইচ্ছা করে।

তিনি চিঠি শেষ করে বাতি নেভালেন। ঘুমঘুম ভাব আসছে। ঘণ্টাখানিকের
মধ্যে ঘুম হয়তো এসে যাবে। তিনি ভাবতে লাগলেন— আফজাল চিঠির জবাবে
কী লিখবে? সে নিশ্চয়ই রেগে-মেগে লিখবে— “কী করে আপনি ভাবলেন
আপনার বৌমা আপনাকে ফেলে আমার কাছে আসবে? এ রকম চিন্তা করাই
বাতুলতা। এ নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। আমি খুব শিগগিরই দেশে এসে
আপনাকে দেখে যাব।”

রহমান সাহেব আবার কলিং বেল টিপলেন। বৌমা এই বুদ্ধিটি ভালো
করেছে। খাটের সঙ্গে সুইচ লাগিয়ে দিয়েছে। তোতা মিয়াকে আনবার জন্যে
বেশ কয়েক বার সুইচ টিপতে হলো। হারামজাদা নবাব, বারোটা বাজতেই ঘুম।
তাকে রাখাই হয়েছে রুগি দেখাশোনার জন্যে। রহমান সাহেব গম্ভীর গলায়
বললেন, ‘বেড প্যান দে।’

‘আবার?’

‘হ্যাঁ, আবার।’

তোতা মিয়া বেড প্যান দিল। খাবার পানি দিল। টেবিল ল্যাম্প সরিয়ে
রাখল। মাথার কাছের যে জানালাটা বন্ধ করা হয়েছিল সেটি খুলল। রহমান
সাহেবের ফরমায়েশ তখনো শেষ হলো না। তিনি হঠাৎ বললেন, ‘পান বানিয়ে
আন। পান খাব।’

‘পান ঘরে নাই। এই বাড়িতে পান তো কেউ খায় না।’

‘খায় না কি রে ব্যাটা? আমি খাই না? আমি তো খাই, যা নিয়ে আয়।’

‘কোনথে আনমু?’

‘দোকান থেকে আন।’

‘এই দুপুর রাইতে?’

‘হ্যাঁ।’

‘দোকান তো সব বন্ধ।’

‘চুপ ব্যাটা, বেশি কথা বলে। ঢাকা শহরে বারোটার সময় পানের দোকান
বন্ধ হয়? আবার মুখে-মুখে কথা।’

‘অখন গেট খুললে আম্মার খুব ভাঙব।’

‘আর একটি কথা বললে চড় খাবি। পান নিয়ে আসতে বলেছি, নিয়ে আয়।’

তোতা মিয়া পান আনতে যায় এবং ইচ্ছা করেই গেটে ঝনঝন শব্দ করতে থাকে। দোতলা থেকে রহমান সাহেব গেটের ঝনঝনানি শুনে পান। এবং তার খানিকক্ষণ পর সিঁড়িতে খুটখুট শব্দ হয়। সুরমা উঠে আসছে। রহমান সাহেব চোখ বন্ধ করে বালিশে মাথা এলিয়ে দেন।

‘কী হয়েছে বাবা?’

‘কিছু হয় নাই মা। বমি বমি লাগছে। তোতা মিয়াকে পান আনতে পাঠিয়েছি। বড় খারাপ লাগছে মা।’

রহমান সাহেব ওয়াক করে বমির একটা ভঙ্গি করেন।

‘আপনি এখনো ঘুমাননি?’

ঘুমিয়েছিলাম। একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল। তোমার শাশুড়িকে স্বপ্নে দেখলাম। পরিষ্কার দেখলাম, হাত ইশারা করে আমাকে ডাকছে। মরা মানুষের হাত ইশারা করে ডাকার স্বপ্ন খুব খারাপ।

রহমান সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সুরমার দিকে। সুরমাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে বিশ্বাস করছে। ভাবলেশহীন দৃষ্টি। এই মেয়ে তাঁর বেশির ভাগ কথাই বিশ্বাস করে না। রহমান সাহেব মনে-মনে একটা কুৎসিত গাল দিলেন। সুরমা বলল, ‘ঘুমুতে চেষ্টা করুন। বাতি নিভিয়ে দিন।’

‘পান আনুক। আগে পান খেয়ে নিই।’

সুরমা আর কোনো কথা না বলে ঘরে নেমে গেল। রহমান সাহেব মনে-মনে বললেন, আদরের বৌমাকে আমি ভালো প্যাঁচে ফেলেছি। এখন যাও দেখি আমেরিকা? সব তো ঠিকঠাক করা ছিল। বুড়ো স্বস্তর এখানে থেকে বাড়ি পাহারা দিবে। আর তোমরা মহাসুখে থাকবে আমেরিকা। সেখানে বাড়িটারিও কেনা হয়েছে। লেকের পাড়ে বাড়ি। উইক এন্ডে লেকে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে স্পিড বোট পর্যন্ত কেনা হয়েছে। এখন ঘুরো দেখি স্পিড বোটে? এখন আর বুড়ো বাপের কথা মনে থাকে না? বুড়ো দেশে থেকে পচুক। কিছুই যায় আসে না। ছ’মাস দশ মাস পরপর একখানা চিঠি ছাড়লেই হবে— বাবা, তুমি কেমন আছ? তুমি একা একা দেশে পড়ে আছ ভাবতেই খুব কষ্ট হয়...।

তোতা মিয়া পান নিয়ে এল।

রহমান সাহেব একসঙ্গে দুটো পান মুখে দিয়ে হুটচিতে সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন খুব কায়দা করে। মশারির ভেতর সিগারেটের ধোঁয়া মেঘের মতো জমে জমে যাচ্ছে। বেশ লাগছে দেখতে।

তোতা মিয়া বলল, ‘আর কিছু লাগব?’

‘না।’

‘পেসাব করবেন আরেক বার?’

‘না।’

‘ঘুমাইতে যাই।’

‘যা।’

বেশ লাগছে তাঁর। তবে ঘুম চটে গেছে। বাকি রাতটা বোধহয় জেগেই কাটাতে হবে। তিনি মনে-মনে আফজালের কাছে দ্বিতীয় একটি চিঠি লিখতে শুরু করলেন। এই চিঠিটি তিনি আগামী সপ্তাহে পাঠাবেন। বাবা, শরীরের অবস্থা আরো খারাপ হইতেছে। বাঁচিয়া থাকা বড় কষ্ট। তবে আমার লক্ষ্মী বৌমা বড় যত্ন করিতেছে। আমার নিজের মেয়ে থাকিলে সেও এত কষ্ট করিত কি-না সন্দেহ। আল্লাহ তার হায়াত দরাজ করুক। আমি আল্লাহর কাছে তার জন্যে খাস দিলে দোয়া করিতেছি।

ভাবতে ভাবতে রহমান সাহেব খুকখুক করে হাসলেন। ভালো প্যাঁচে আটকে দিয়েছি। প্যারালিসিস-এর রুগি সহজে মরে না। এরা শকুনের মতো বেঁচে থাকে। আমিও থাকব। দেখি আমাকে ফেলে রেখে তোমরা যাও কোথায়?

তাঁর ডান পায়ের পাতা চুলকাচ্ছে। কোনোমতেই চুলকানো সম্ভব নয়। তাঁর বড় অস্বস্তি লাগছে। তিনি কলিং বেলের সুইচ টিপলেন। হারামজাদা তোতা মিয়া আসছে না। ইচ্ছা করে আসছে না। জেগে মটক মেরে পড়ে আছে। রহমান সাহেব টিপতেই থাকলেন।

খুটখুট শব্দ হচ্ছে সিঁড়িতে। সুরমা উঠে আসছে না-কি? রহমান সাহেবের পায়ের চুলকানি সেরে গেল।

‘কী হয়েছে বাবা?’

‘পায়ের পাতা চুলকাচ্ছিল?’

‘কোন্ পায়ের পাতা?’

‘ডানটা।’

সুরমা মশারি তুলে মাথা ভেতরে ঢুকাল। রহমান সাহেব দেখলেন তার ফর্সা হাত এগিয়ে আসছে পাখির দিকে।

‘চুলকাতে হবে মা। এখন আর নাই।’

‘আহ কী ফর্সা হাত মেয়েটার!’

‘বাবা, এখন কি আরাম হয়েছে?’

‘হ্যাঁ, তুমি যাও মা। আর লাগবে না।’

সুরমা গেল না। বিছানার পাশে বসল। হাত বুলিয়ে দিতে লাগল পায়ে। রহমান সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন— ‘বুঝলে বৌমা, তোমার সাথে তোমার শাশুড়ির খুব মিল আছে।’

সুরমা কিছু বলল না।

‘সেও তোমার মতো সুন্দর ছিল। তোমার মতোই গায়ের রঙ।’

রহমান সাহেবের হয়তো আরো কিছু বলার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সুরমা উঠে দাঁড়াল। মশারি গুঁজে দিয়ে হাক্কা সুরে বলল, ‘মশারির ভেতর সিগারেট খাবেন

না বাবা। হঠাৎ আগুন-টাগুন ধরে যাবে।’

‘আচ্ছা আর খাব না।’

‘সিগারেট খাবার সময় কাউকে রাখবেন আশপাশে। এখন কি আপনার সিগারেট খেতে ইচ্ছা হচ্ছে? ইচ্ছা হলে একটা খান, আমি বসছি।’

তিনি যন্ত্রের মতো বালিশের নিচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। সুরমা চেয়ারে বসল। তার গায়ে হালকা নীল রঙের একটা শাড়ি। রহমান সাহেব মনে-মনে বললেন— বড় সুন্দর মেয়ে, তবে খুব অহঙ্কারী। এত অহঙ্কার ভালো না।

সুরমা তাকিয়ে আছে ঘড়ির দিকে। সময় দেখছে হয়ত। দেড়টা বাজে, অনেক রাত। একসময় সে মৃদুস্বরে বলল, ‘বাবা, বাইরের মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা সাবধানে বলা উচিত। কেউ পেটে কথা রাখে না। চারদিকে ছড়ায়।’

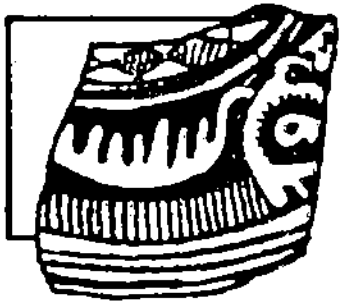
‘কাকে আমি কী বললাম?’

‘ডাক্তার সাহেবকে আপনি বলেছেন আপনার মনে মনেই কোনদিন না কোনদিন আমি বিষ-টিষ খাইয়ে আপনাকে মেরে ফেলব। এমন বলা ঠিক না।’

‘ঠাট্টা করে বলেছিলাম মা।’

‘ঠাট্টা করে বলাও ঠিক না। সবাই তো আর ঠাট্টা বুঝতে পারে না। মনে করে সত্যি।’ সুরমা বসে আছে শান্ত ভঙ্গিতে। তাঁর মুখে মনের ছাপ পড়ে না। রহমান সাহেবের ইচ্ছা হলো জ্বলন্ত সিগারেট হাত থেকে বিছানায় ফেলে দেন। আগুন জ্বলে উঠুক। মেয়েটি দেখুক তাকিয়ে তাকিয়ে। কিন্তু তার সাহস হয় না। তাঁর বড় বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে।

বেঁচে থাকতে তাঁর খুব ভালো লাগে।



গোপন কথা

আজ আমার ঘুম ভাঙল খুব ভোরে।

আলো তখনো ভালো করে ফোটেনি। এখনো অন্ধকার গাঢ় হয়ে আছে। আকাশে ক্ষীণ আলো-আধারিতে মন অন্য রকম হয়ে যায়। পৃথিবীর সবাইকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

আমি পৃথিবীর সবাইকে ভালোবেসে ফেললাম। আমার পাশের চৌকিতে বাকের সাহেব ঘুমিয়ে। অন্ধকারে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। তবু আমি নিশ্চিত জানি তিনি একটি কুৎসিত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছেন। মুখের লালায় তাঁর বালিশ ভিজে গেছে। লুঙ্গি উঠে গেছে কোমরে। তাতে কিছু যায় আসে না। আজ আমার চোখে অসুন্দর কিছু পড়বে না, বাকের সাহেবকেও আমি ভালোবাসব।

‘বৎসরের অন্যদিনগুলি আজকের মতো হয় না কেন?’— ভাবতে ভাবতে আমি সিগারেট ধরলাম। হিটার জ্বালিয়ে চায়ের কেতলি বসিয়ে দিলাম। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল নিঃশব্দে। তবু বাকের সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি জড়ানো গলায় বললেন, ‘চা হচ্ছে নাকি?’

‘হ্যাঁ।’

‘আজ এত ভোরে উঠলেন যে, ব্যাপার কী? শরীর খারাপ নাকি?’

‘জি না। চা খাবেন বাকের সাহেব?’

‘দেন এক কাপ।’

এই বলেই মাথা বের করে তিনি নাক ঝাড়লেন। নাক মুছলেন মশারিতে— কী কুৎসিত ছবি! আজ চমৎকার সব ছবি দেখতে ইচ্ছা করছে। আমি প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করলাম বাকের সাহেব নামে এ ঘরে কেউ থাকে না এবং এটা যেন-তেন কোনো ঘরও নয়। এটা হচ্ছে মহিমগড়ের রাজবাড়ি এবং আমি এসেছি মহিমগড়ের রাজকন্যার অতিথি হয়ে। আর আমিও কোনো হেজিপেজি লোক নই। আমি একজন কবি। আজ সন্ধ্যায় মহিমগড়ের রাজকন্যাকে আমি কবিতা শুনাবো।

‘মঞ্জু সাহেব।’

‘জি বলুন।’

‘এ রকম লাগছে কেন আপনাকে? কিছু হয়েছে নাকি?’

‘না, কী হবে?’

‘দেখি, একটা সিগারেট দেন দেখি।’

বাকের সাহেব তাঁর সাপের মতো কালো রোগা হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। একটা সিগারেট দিলাম। অথচ আমি নিশ্চিত জানি, বালিশের নিচে তাঁর নিজের সিগারেট আছে। বাকের সাহেব নিজের সিগারেট কমই খান। আহ কী সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ভাবছি। আজ আমি একজন অতিথি-কবি। আমার চিন্তাভাবনা হবে কবির মতো। আমি নরম স্বরে ডাকলাম, ‘বাকের সাহেব।’

‘জি।’

‘আজ আমার কেন জানি বড় ভালো লাগছে।’

‘ভালো লাগার কী হলো আবার?’

বাকের সাহেব বড়ই অবাক হলেন। তাঁর কাছে আজকের দিনটি অন্য সব দিনের মতোই। সাধারণ ক্লাস্তিকর। আমি মৃদুস্বরে ডাকলাম, ‘বাকের সাহেব।’

‘বলেন।’

‘আজ আমার জন্মদিন।’

‘তাই নাকি?’

‘জি। এগারোই বৈশাখ।’

‘আম-কাঁঠালের সিজনে জন্মেছেন রে ভাই।’

এই বলেই বাকের সাহেব চায়ের কাপ নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। আজ আমি রাগ করব না। চমৎকার একটি সকালকে কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না। সন্ধ্যাবেলা যাব নীলুদের বাড়ি। সন্ধ্যা হবার আগে পর্যন্ত শুধু ওর কথাই ভাবব।

বাকের সাহেব বাথরুম থেকে ফিরে এসে বললেন, ‘পাইখানা কষা হয়ে গেছে ভাই’।

আমি শুনেও না শোনার ভান করলাম। আজ আমি অসুন্দর কিছুই শুনব না। আজ আমার জন্মদিন। আজ নীলুদের বাসায় যাব এবং তাকে গোপন কথাটি বলব।

ঝড় হোক। বৃষ্টি হোক। কিংবা প্রচণ্ড টর্নেডো হোক। কিছুই আসে যায় না। আজ সন্ধ্যায় আমি ঠিকই যাব নীলুদের বাসায়। নীলুর বাবা হয়ত বসে থাকবেন বারান্দায়। তিনি আজকাল বেশিরভাগ সময় বারান্দাতেই থাকেন। অপরিচিত কাউকে দেখলে কপালের চামড়ায় ভাজ ফেলে দীক্ষা দৃষ্টিতে তাকান। আমার দিকেও তাকাবেন। আমি হাসিমুখে বলব, ‘নীলুফার কি বাসায় আছে? ওর সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।’ আমি উত্তেজিত অবস্থায় ঠিকমতো কথা বলতে পারি না। কথা গলায় আটকে যায়। কিন্তু আজ আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আজ কথা বলব অভিনেতাদের মতো।

চা শেষ করেই বাকের সাহেব ঘুমুবার আয়োজন করলেন। গলা টেনে টেনে বলেন, ‘ন’টা পর্যন্ত ঘুমাব। তারপর উঠে নাশতা খেয়ে আবার ঘুম। ছুটির দিনের ঘুম কাকে বলে দেখবেন। ম্যারাথন ঘুম। হা হা হা।’

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। বারান্দায় এসে দেখি আলো ফুটেছে। আকাশ হালকা নীল। পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। গোপন কথা বলার জন্যে এরচে’ সুন্দর দিন আর হবে না।

সকাল এগারোটায় টেলিফোন করলাম। নীলুকে টেলিফোনে কখনো পাওয়া যায় না। আজ পাওয়া গেল। নীলু কিশোরীদের মতো গলায় বলল, ‘কে কথা বলছেন?’

‘আমি মঞ্জু।’

‘ও, মঞ্জু ভাই। আপনি কেমন আছেন?’

‘ভালো। তুমি কেমন আছ নীলু?’

‘আমিও ভালো।’

‘কী করছিলে?’

‘পড়ছিলাম। আবার কী করব? আমার অনার্স ফাইন্যাল না?’

‘ও তাই তো। আচ্ছা শোন নীলু, তুমি কি আজ সন্ধ্যায় বাসায় থাকবে?’

‘থাকব না কেন?’

‘আমি একটু আসব তোমাদের ওখানে।’

‘বেশ তো আসুন।’

‘একটা কথা বলব তোমাকে।’

‘কী কথা?’

‘গোপন কথা?’

‘আপনার আবার গোপন কথা কী?’

নীলু খিল-খিল করে হাসতে লাগল। কী সুন্দর সুরেলা হাসি! কী অদ্ভুত লাগছে শুনতে! ‘হ্যালো নীলু।’

‘বলুন শুনছি।’

‘আজ সন্ধ্যায় আসব।’

‘বেশ তো আসুন। রাখলাম এখন। নাকি আরো কিছু বলবেন?’

‘না, এখন আর কিছু বলব না।’

নীলু রিসিভার নামিয়ে রাখার পরও আমি অনেকক্ষণ রিসিভার কানে লাগিয়ে রইলাম।

মাত্র এগারোটা বাজে। আরো আট ঘণ্টা কাটাতে হবে। কোথায় যাওয়া যায়? কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। নিউ মার্কেটে কিছুক্ষণ হাঁটলাম একা একা এবং একসময় দামি একটা শার্ট কিনে ফেললাম। অন্যদিন হলে শার্টের দাম আমার বুকে বিঁধে থাকত। আজ থাকল না। দামের কথা মনেই রইল না।

দশটি ফাইভ ফাইভ কিনলাম এ্যালিফেন্ট রোড থেকে। অন্তত আজকের দিনটিতে দামি সিগারেট খাওয়া যেতে পারে। নীলুর জন্যে কিছু একটা উপহার নিয়ে গেলে হয় না? কী নেয়া যায়? সুন্দর মলাটের একটা কবিতার বই। সেখানে খুব গুছিয়ে একটা কিছু লিখতে হবে যেমন, “নীলুকে— দেখা হবে চন্দনের বনে।” বইটি দেয়া হবে ফিরে আসার সময়। নীলু নিশ্চয়ই আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসবে। তখন বলব, ‘নীলু, আজ কিন্তু আমার জন্মদিন।’ নীলু বলবে, ‘ওমা আগে বলবেন তো?’

‘আগে বললে কী করতে?’

‘কোনো উপহার-টুপহার কিনে রাখতাম।’

‘কী উপহার?’

‘কবিতার বই-টই।’

‘আমি তো কবিতা পড়ি না।’

‘না পড়লেও বই উপহার দেয়া যায়।’

ঠিক এই সময় আমি মোড়ক খুলে বইটি হাতে দিয়ে অল্প হাসব। হাসতে

হাসতেই বলব, আমি তোমার জন্যে একটা কবিতার বই এনেছি নীলু।

সন্ধ্যাবেলা আকাশে খুব মেঘ করল। এবং একসময় শৌ শৌ শব্দে বাতাস বইতে শুরু করল। নীলুদের বারান্দায় পা রাখামাত্র সত্যি সত্যি ঝড় শুরু হলো। কারেন্ট চলে গেল। সমস্ত অঞ্চল ডুবে গেল অন্ধকারে। নীলু আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, ‘এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে এসেছেন? ভিজে গেছেন দেখি। আসুন, ভেতরে আসুন। কী যে কাণ্ড করেন! কাল এলেই হতো।’

বসার ঘরে মোমবাতি জ্বলছে। একজন বুড়োমতো ভদ্রলোক বসে আছেন। তার পাশে বিলু। আমাকে দেখেই হাসিমুখে বলল, ‘স্যার ভূতের গল্প বলছেন। উফ যা ভয়ের! তারপর স্যার বলুন।’

নীলু বলল, ‘দাঁড়ান স্যার, আমি এসে নিই। চায়ের কথা বলে আসি।’

নীলু চায়ের কথা বলে এল। একটা তোয়ালে আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, ‘মাথা মুছে ফেলুন। তারপর স্যারের গল্প শুনুন। প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স। বানানো গল্প না।’

‘তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল নীলু।’

‘দাঁড়ান গল্প শুনে নিই।’

‘আমি ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।’

‘তাই নাকি?’

‘কৃষি ব্যাংকে একটা চাকরি হয়েছে। ফিফথ গ্রেড অফিসার।’

‘বাহ, বেশ তো। আসুন এখন গল্প শুনুন।’

নীলু আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল, ‘স্যার ইনি হচ্ছেন আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু। যে ভাই ওয়াশিংটন ডিসি-তে থাকেন তাঁর।’

নীলুর স্যার বললেন, ‘বসুন।’

আমি বসলাম। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে গল্প শুরু করলেন। পথ-ঘাট অন্ধকার। শ্রাবণ মাস। আকাশে খুব মেঘ করেছে। আমি আর আমার বন্ধু তারাদাস পাশাপাশি যাচ্ছি। এমন সময় একটা শব্দ শুনলাম। যেন কেউ একজন ছুটতে ছুটতে আসছে। তারাদাস বলল, ‘কে? কে?’ তখন শব্দটা থেমে গেল।

ভদ্রলোক ভালোই গল্প করতে পারেন। নীলু-বিলু মুগ্ধ হয়ে শুনছে। নীলু একটা শাড়ি পরেছে। পরার ভঙ্গিটির মধ্যে কিছু একটা আছে। তাকে বিলুর চেয়েও কম বয়স্ক লাগছে। যেন সিক্স-সেভেন পড়া বালিকা শখ করে শাড়ি জড়িয়েছে।

গল্প শেষ হতে অনেক সময় লাগল। নীলু উঠে গিয়ে চা নিয়ে এল। আমি বললাম, ‘তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।’

নীলু অবাক হয়ে বলল, ‘একবার তো বলেছেন।’

‘কী বললাম?’

‘কৃষি ব্যাংকে চাকরি নিয়ে ময়মনসিংহ যাচ্ছেন।’

‘এ-কথা না। অন্য একটা কথা।’

‘ঠিক আছে বলবেন। দাঁড়ান স্যারের কাছ থেকে আরেকটা গল্প শুনি। স্যার আরেকটা গল্প বলুন।’

ভদ্রলোক গল্প বলার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় গল্প শুরু করলেন। গল্প হতে হতে অনেক রাত হয়ে গেল। বৃষ্টিও কিছুটা কমে এসেছে। নীলু ব্যস্ত হয়ে তাদের ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলল।

আমি স্যারের পাশে বসলাম। নীলু হালকা গলায় বলল, ‘আবার আসবেন মঞ্জু ভাই।’

গাড়ি চলতে শুরু করতেই বিলুর স্যার বললেন, ‘আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন?’

আমি তার জবাব দিলাম না। ভূতে বিশ্বাস করি কি না-করি তাতে কিছুই যায় আসে না। আমি পরশু দিন চলে যাব। অনেকদিন আর ঢাকায় আসা হবে না। আর এলেও গোপন কথা বলার ইচ্ছা হবে না হয়ত। বিলুর স্যার বললেন, ‘পৃথিবীতে অনেক স্ট্রেঞ্জ ঘটনা ঘটে বুঝলেন মঞ্জু সাহেব, বাইনটিন সিগারেটতে একবার কী হয়েছে শুনেন...।’

‘আরেক দিন শুনব। আজ আমার মাথা ধরেছে।’

আমাদের এদিকেও বাতি নেই। অন্ধকার ঘরে বাকের সাহেব শুয়ে আছেন। আমাকে ঢুকতে দেখেই ক্লান্ত স্বরে বললেন, ‘শরীরটা খারাপ করেছে ভাই। বমি হয়েছে কয়েক বার। একটু সাবধান আসেন, পরিষ্কার করা হয় নাই।’

সব পরিষ্কার করে ঘুমুতে যেতে আমাদের অনেক রাত হলো। বাইরে আবার মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাকের সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, ‘ঘুমালেন নাকি ভাই?’

‘জি না।’

আপনার জন্মদিন উপলক্ষে এক প্যাকেট সিগারেট এনেছিলাম। গরিব মানুষ, কী আর দিব বলেন। বাকের সাহেব অন্ধকারে এগিয়ে দিলেন সিগারেটের প্যাকেটটি। আমি নিচু স্বরে বললাম, ‘একটা কথা শুনবেন?’

‘কী কথা?’

‘গোপন কথা। কাউকে বলতে পারবেন না।’

বাকের সাহেব বিছানায় উঠে বসলেন। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। আজ বোধহয় পৃথিবী ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যে গোপন কথাটি বলা হয়নি সেটি আমি বলতে শুরু করলাম। আমার ভালোই লাগল।



ফজলুল করিম সাহেবের ত্রাণকার্য

ফজলুল করিম সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, ‘মাঝে মাঝে বড় ধরনের ক্যালামিটির প্রয়োজন আছে। বন্যার খুব দরকার ছিল।’ এই বলেই তিনি পানের পিক ফেলে কড়া করে তাকালেন ইয়াজুদ্দিনের দিকে। ইয়াজুদ্দিন ভয়ে কুঁচকে গেলো।

‘পানে কি জর্দা দেয়া ছিল ইয়াজুদ্দিন?’

ইয়াজুদ্দিন হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। ফজলুল করিম সাহেব দ্বিতীয়বার পানের পিক ফেলে বললেন, ‘তোমরা কোনো কাজ ঠিকমতো করতে পার না। আমি কি জর্দা খাই?’

‘আরেকটা পান নিয়ে আসি স্যার?’

তিনি জবাব দিলেন না! তাঁর মাথা ঘুরছে। ঝিমঝিম ভাব হচ্ছে। এইসঙ্গে ক্ষীণ সন্দেহও হচ্ছে যে, ইয়াজুদ্দিন নামের বোকম বোকা ধরনের এই লোকটা ইচ্ছে করে তাঁকে জর্দাভর্তি পান দিয়েছে। এরা কেউ তাঁকে সহ্য করতে পারে না। পদে-পদে চেষ্টা করে ঝামেলায় ফেলতে। ইয়াজুদ্দিনের উচিত ছিল ছুটে গিয়ে পান নিয়ে আসা তা করে তো ক্যাবলার মতো জিজ্ঞেস করছে— আরেকটা পান নিয়ে আসি স্যার। হারামজাদা আর কাকে বলে।

তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, ‘রিলিফের মালপত্র সব উঠেছে?’

রোগা লম্বা মতো এক ছোকরা বলল, ‘ইয়েস স্যার।’ ছোকরার চোখে সানগ্লাস। সানগ্লাস চোখে দিয়ে একজন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা চূড়ান্ত অভদ্রতা— এটা কি এই ছোকরা জানে? অবিশ্যি পুরোপুরি মন্ত্রী তিনি নন, প্রতিমন্ত্রী। মন্ত্রীদের দলের হরিজন। তিনি যখন কোথাও যান তাঁর সঙ্গে টিভি-ক্যামেরা থাকে না। বক্তৃতা দিলে খবরের কাগজে সব সময় সেটা ছাপাও হয় না। কাজেই এই ছোকরা যে সানগ্লাস পরে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। তবু তিনি বললেন, ‘আপনার চোখে সানগ্লাস কেন?’

‘চোখ উঠেছে স্যার।’

ছোকরা সানগ্লাস খুলে ফেলল। তিনি আঁতকে উঠলেন... ভয়াবহ অবস্থা! তাঁর ধারণা ছিল চোখ-উঠা রোগ দেশ থেকে বিদেয় হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে পুরোপুরি বিদেয় হয়নি। এই ছোকরার কাছ থেকে হযত তাঁর হবে। এখনি

কেমন যেন চোখ কড় কড় করছে। তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, ‘আমরা অপেক্ষা করছি কী জন্যে?’

‘সারেং এখনো আসেনি।’

‘আসেনি কেন?’

‘বুঝতে পারছি না স্যার। ন’টার সময় তো আসার কথা।’

তিনি ঘড়ি দেখলেন এগারোটা কুড়ি বাজে। তাঁর এগারোটার সময় উপস্থিত হবার কথা ছিল। তিনি কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায় এসেছেন। অথচ তাঁর পি.এ. এসেছে এগারোটা দশে। প্রতিমন্ত্রী হবার এই যন্ত্রণা।

‘ডেকে চেয়ার আছে স্যার। ডেকে বসে বিশ্রাম করুন। সারেংকে আনতে লোক গেছে।’ তিনি অপ্রসন্ন মুখে ডেকে রাখা গদিওয়ালা বেতের চেয়ারে বসলেন। সামনে আরো কিছু খালি চেয়ার আছে কিন্তু তাঁর সঙ্গে কেউ সেই সব চেয়ারে বসল না। তিনি দরাজ গলায় বললেন, ‘দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন। কতক্ষণে লঞ্চ ছাড়বে কোনো ঠিক নেই। বাংলাদেশ হচ্ছে এমনই একটা দেশ যে সময়মতো কিছু হয় না।’

‘বন্যাটা অবিশ্যি স্যার সময় মতো আসে।’

তিনি অপ্রসন্ন মুখে তাকালেন। কথাটা বলেছে সানগ্লাস পরা ছোকরা। কথার পিঠে কথা ভালোই বলেছে। তিনি নিজেকে তা পারেন না। চমৎকার কিছু কথা তাঁর মনে আসে ঠিকই কিন্তু তা কথাবাতাপ্রণয় হবার অনেক পরে। তিনি চশমা পরা ছোকরার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনি কে? আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।’

‘আমার নাম স্যার জামিল। নিউ ভিডিও লাইফে কাজ করি। আমি স্যার ত্রাণকার্যের ভিডিও করব।’

‘ত্রাণকার্যের ভিডিও করবেন মানে? ত্রাণকার্যের ভিডিও করতে আপনাকে বলেছে কে?’

‘আমাকে স্যার একদিনের জন্যে ভাড়া করা হয়েছে।’

‘আপনি নেমে যান।’

‘জি স্যার।’

‘আপনাকে নেমে যেতে বলছি। ত্রাণকার্যের ভিডিও করার কোনো প্রয়োজন নেই।’

‘স্যার হামিদ সাহেব বললেন ...’

‘হামিদ সাহেব বললে তো হবে না। আমি কী বলছি সেটা হচ্ছে কথা। যান, নেমে যান।’

জামিল লঞ্চের ডেক থেকে নিচে নেমে গেল। ফজলুল করিম সাহেব থমথমে

গলায় বললেন, ‘জনগণকে সাহায্য করবার জন্যে যাচ্ছি। এটা কোনো বিয়েবাড়ির দৃশ্য না যে ভিডিও করতে হবে। কি বলেন আপনারা?’

একজন বলল, ‘স্যার ঠিকই বলেছেন। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি হয়ে যাচ্ছে। সাহায্য যা দেয়া হচ্ছে তার চেয়ে ছবি বেশি তোলা হচ্ছে। টিভি খুললেই দেখা যায়...’

তিনি তাকে কথা শেষ করতে দিলেন না। কড়া গলায় বললেন, ‘লঞ্চের সারেং-এর খোঁজ পাওয়া গেল কি-না দেখুন। আমরা রওনা হব কখন আর ফিরবই বা কখন? এত মিস ম্যানেজমেন্ট কেন?’

দুপুর বারোটা পর্যন্ত লঞ্চের সারেং-এর খোঁজ পাওয়া গেল না। তার বাসা কল্যাণপুরে। পুরো বাড়ি পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় তার পরিবার-পরিজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না— এ-রকম একটা খবর পাওয়া গেল। ফজলুল করিম সাহেবের বিরক্তির সীমা রইল না। এত মিস ম্যানেজমেন্ট। কেউ কোনো দায়িত্ব পালন করছে না।

লঞ্চ একটা দশ মিনিটে ছাড়ল। অন্য একজন সারেং যোগাড় করা হয়েছে।

ফজলুল করিম সাহেব বলে দিয়েছেন ইনটেরিয়রের দিকে যেতে হবে। এমন জায়গা যেখানে এখনো সাহায্য পৌঁছেনি। তাঁরা হলেন প্রথম ত্রাণদল।

‘প্রথম দিকে এ রকম হচ্ছে— একই লোক তিন-চারবার করে সাহায্য পাচ্ছে, আবার কেউ-কেউ এখন পর্যন্ত কিছু পায়নি। তবে অবস্থাটা সাময়িক। কিছুদিনের মধ্যে খুবই প্ল্যানড ওয়েভে ত্রাণকার্য শুরু হবে। কি বলেন হামিদ সাহেব।’

‘তা তো ঠিকই স্যার। জামানুরা যখন প্রথম রাশিয়া আক্রমণ করল তখন কি রকম কনফিউশন ছিল রাশিয়াতে। টোটেল হচপচ। কে কী করবে, কার দায়িত্ব কী— কিছুই জানে না। এখানেও একই অবস্থা।’

ফজলুল করিম সাহেব কিছুই বললেন না। তাঁর এই পি.এ-র স্বভাব হচ্ছে বড় কথা বলা। বুঝিয়ে দেয়া যে, সে নিজে প্রচুর পড়াশোনা জানা লোক। সে ছাড়া বাকি সবাই মূর্খ।

‘স্যার চা খাবেন? ফ্লাক্সে চা এনেছি।’

‘না।’

‘খান স্যার, ভালো লাগবে।’

তাঁর চায়ের পিপাসা ছিল কিন্তু তিনি চা খেলেন না। ডেকের খোলা হাওয়ায় আরাম করে চা খেতে খেতে যাওয়ার চিন্তাটাই অস্বস্তিকর। তিনি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, ‘এতো দেখি সমুদ্র।’

‘সমুদ্র তো বটেই স্যার। বাতাস নেই, আরামে যাচ্ছি। বাতাস দিলে ছয়-সাত ফুট ঢেউ হয়।’

‘সে-কি!’

‘একটা ত্রাণলঞ্চ ডুবে গেল। আর ছোটখাট নৌকা তো কতই ডুবছে।’
 ‘বলেন কি! নতুন সারেং কেমন?’
 ‘লঞ্চ ডুববার ভয় নেই স্যার। স্টিল বডি লঞ্চ। নতুন ইঞ্জিন।’
 ‘আমরা যাচ্ছি কোথায়?’
 ‘সেটা তো স্যার এখনো ঠিক হয়নি।’
 ‘কী বলছেন এসব! চোখ বন্ধ করে চলতে থাকবে নাকি?’
 ‘ব্যাপার অনেকটা তাই স্যার। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সব দিকেই পানি।
 এখন কম্পাস ছাড়া গতি নেই।’
 ‘ডেস্টিনেশন তো লাগবে?’
 ‘অফকোর্স স্যার। আমি সারেংকে বলে দিয়েছি, ঘণ্টা খানিক নদী ধরে
 সোজাসুজি যাবে, তারপর কোনো একটা শুকনো জায়গা দেখলে... শুকনো
 জায়গা মানেই আশ্রয় শিবির।’
 ‘আগে দেখতে হবে ওরা সাহায্য পেয়েছে কি-না। তেল আখায় তেল দেয়ার
 মানে হয় না।’
 ‘তা তো বটেই স্যার।’
 ‘ত্রাণসামগ্রীর লিস্ট কার কাছে?’
 ‘আমার কাছে।’
 ‘কী কী নিয়ে যাচ্ছি আমরা?’
 হামিদ সাহেব ফাইল খুলে লিস্ট বের করলেন।
 ‘বায়ান্নাটা তাঁবু...’
 ‘তাঁবু? তাঁবু কি জন্যে? তাঁবু আপনি কি মনে করে আনলেন? এটা মরুভূমি
 নাকি?’
 ‘মরুভূমির দেশ থেকে আসা সাহায্য আমরা স্যার কী করব বলুন। তাঁবু
 ছাড়াও আরো জিনিস আছে। এক হাজার কৌটা কনসানট্রেটেড টমেটো জুস।’
 ‘বলেন কি! কনসানট্রেটেড টমেটো জুস দিয়ে ওরা কী করবে?’
 ‘ইরাকের সাহায্য স্যার। গত বছরে বন্যার জন্যে দিয়েছিল। গুদামে থেকে
 পচে গেছে বলে মনে হয়। কৌটা খুললেই ভক করে একটা গন্ধ আসে।’
 ‘আর কী আছে?’
 ‘পাঁচশ’ বোতল ডিস্টিল ওয়াটার। এক একটা বোতল দু’লিটারের।’
 ‘ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে কী করবে?’
 ‘বুঝতে পারছি না স্যার। মনে হচ্ছে মেডিক্যাল সাপ্লাই, বরি কটন আছে
 দুই পেটি।’
 ‘এইসব সাহায্য নিয়ে উপস্থিত হলে তো আমার মনে হয় মার খেতে হবে।’

‘তা তো হবেই। বেশ কিছু ত্রাণ পার্টি মার খেয়ে ভূত হয়েছে। কাপড়চোপড় খুলে নেংটা করে ছেড়ে দিয়েছে।’

‘আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?’

‘জি না স্যার, সত্যি কথা বলছি। একটা পার্টি খুব সম্ভব শিক্ষক সমিতি— শিশু শিক্ষা বই, খাতা, পেনসিল এইসব নিয়ে গিয়েছিল। তাদের এই অবস্থা হয়েছিল।’

ফজলুল করিম সাহেব খুবই গম্ভীর হয়ে গেলেন। হামিদ সাহেব বললেন, আমাদের এই ভয় নেই। রান্না করা খাবারও তো নিয়ে যাচ্ছি।

‘কী খাবার?’

‘খাবার হচ্ছে খিচুড়ি। প্রায় তিনশ’ লোকের ব্যবস্থা। তারপর লুঙ্গি, গামছা, শাড়ি এসবও আছে। ক্যাশ আছে।’

‘ক্যাশ টাকা কত?’

‘প্রায় পাঁচ হাজার।’

‘প্রায়? প্রায় কি জন্যে? এগজেস্ট ফিগার বলুন।’

‘পাঁচ হাজার ছিল, তার মধ্যে কিছু খরচ হয়ে গেল। ভিডিও ক্যামেরা, তারপর আপনার নতুন সারেং নিতে হলো। এই খরচ বাদ যাবে।’

‘ভিডিও ক্যামেরা আপনাকে কে নিতে বলল?’

‘এটা তো স্যার বলার অপেক্ষা রাখে না। একটা রেকর্ড থাকতে হবে না?’

ফজলুল করিম সাহেব আর কিছু বললেন না। ঝিম মেরে বসে রইলেন। চারদিকে পানি আর পানি। নদী দিয়ে নৌকা চলছে না সমুদ্র পাড়ি দেয়া হচ্ছে বোঝার কোনো উপায় নেই। আকাশ কেমন ঘোলাটে। অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে। তাতেই বড় বড় ঢেউ ভৈরি হচ্ছে।

লঞ্চের গায়ে বেশ শব্দ করে ঢেউ ভেঙে পড়ছে। এর চেয়ে বড় ঢেউ উঠতে শুরু করলে মুশকিল।

দু’ঘণ্টা চলার পরও কোনো শুকনো জায়গা দেখা গেল না। লঞ্চের সারেং চোখ-মুখ কুঁচকে জানাল, ‘নদী-বরাবর গেলে শুকনো জায়গা চোখে পড়বে না। আড়াআড়ি যেতে হবে। তবে সে আড়াআড়ি যেতে চায় না। লঞ্চ আটকে যেতে পারে। আড়াআড়ি যেতে হলে নৌকা নিয়ে যাওয়া উচিত।’

ফজলুল করিম সাহেবের বিরক্তির সীমা রইল না। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, ‘মিস ম্যানেজমেন্ট। বিরাট মিস ম্যানেজমেন্ট। এই ব্যাপারগুলো আগেই দেখা উচিত ছিল।’

হামিদ সাহেব হালকা গলায় বললেন, ‘আগে তো স্যার বুঝতে পারিনি। আপনি কিছু মুখে দিন, সারা দিন খাননি। চা আর নোনতা বিসকিট দেই? কলাও আছে। স্যার দিতে বলি?’

‘আপনারা কিছু খেয়েছেন? চারটা তো প্রায় বাজে।’

‘খিচুড়ি নিয়ে বসেছিল সবাই। খেতে পারেনি। টক হয়ে গেছে।’

‘টক হয়ে গেছে মানে?’

‘সকাল সাতটার সময় রান্না হয়েছে, এখন বাজছে চারটা— গরমটাও পড়েছে ভ্যাপসা। এই গরমে মানুষ টক হয়ে যায় আর খিচুড়ি।’

লঞ্চ মাঝ-নদী কিংবা মাঝ-সমুদ্রে থেমে আছে। ফজলুল করিম সাহেব বিমর্ষ মুখে নোনতা বিসকিট এবং চা খাচ্ছেন। এক ফাঁকে লক্ষ করলেন ভিডিওর জামিল ছোকরা লঞ্চেই আছে, নেমে যায়নি। পানির ছবি তুলছে। হারামজাদাকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দিতে পারলে একটু ভালো লাগত, তা সম্ভব না।

নদীতে নৌকা, লঞ্চ একবারেই চলাচল করছে না। দুপুরবেলার দিকে কিছু-কিছু ছিল এখন তাও নেই। হামিদ সাহেব শুকনো গলায় বললেন, ‘কী করব স্যার? ফিরে চলে যাব?’

ফজলুল করিম সাহেব জবাব দিলেন না। হামিদ সাহেব থেমে থেমে বললেন, ‘সন্ধ্যা পর্যন্ত নদীতে থাকা ঠিক হবে না স্যার, ডাকাতের উপদ্রব। খুবই ডাকাতি হচ্ছে। ফিরে যাওয়াই ভালো। দিনের অবস্থা খারাপ। ভাদ্র মাসে ঝড়-বৃষ্টি হয়।’

‘আশ্বিন মাসে ঝড় হয় বলে জানতাম। ভাদ্র মাসের কথা এই প্রথম শুনলাম।’

‘আবহাওয়া তো স্যার চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন তাহলে কি রওনা হবে?’

ফজলুল করিম সাহেব চুপ করে রইলেন। বন্যার পানি দেখতে লাগলেন। হামিদ সাহেব বললেন, ‘খিচুড়ি ফেলে দিতে বলেছি। টক খিচুড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তো লাভ নেই। যে খাবে তারই পেট নেমে যাবে।’

‘যা ইচ্ছা করুন। কানের কাছে বকবক করবেন না।’

‘পাঁচ হাজার টাকা ক্যাশ আছে বলেছিলাম না, তাও ঠিক না। লঞ্চার তেলের খরচ দিতে হয়েছে। সারেং এবং তার দুই এ্যাসিস্টেন্টের ভেতন, ভিডিও ভাড়া, চা, নোনতা বিসকিট এবং কলার জন্যে খরচ হলো চার হাজার সাতান্ন টাকা তেত্রিশ পয়সা। সঙ্গে এখন স্যার ক্যাশ আছে সাতাশি টাকা তেপ্পান পয়সা।’

‘আমার কানের কাছে দয়া করে ভ্যানভ্যান করবেন না।’

লঞ্চ ফিরে চলল। পথে কলাগাছের ভেলায় ভাসমান একটি পরিবারকে পাওয়া গেল। তিন বাচ্চা, বাবা-মা, একটি ছাগল এবং চারটা হাঁস। অনেক ডাকাডাকির পর তারা লঞ্চার পাশে এনে ভেলা ভিড়াল। সাতাশি টাকা তেপ্পান পয়সার সবটাই তাদেরকে দেয়া হলো। একটা শাড়ি, একটা লুঙ্গি এবং একটা গামছা দেয়া হলো। ফজলুল করিম সাহেব দরাজ গলায় বললেন, ‘একটা তাঁবু দিয়ে দিন।’ হামিদ সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, ‘তাঁবু দিয়ে ওরা কী করবে?’

‘যা ইচ্ছা করুক। আপনাকে দিতে বলছি দিন।’

‘তাঁবুর ভারে ভেলা ডুবে যাবে স্যার।’

‘ডুববে না।’

তারা তাঁবু নিতে রাজি হলো না। তার বদলে ভেলা থেকে লঞ্চে উঠে এল। এগারো-বারো বছরের একটি মেয়ে আছে সঙ্গে। সে সারা দিনের ধকলের কারণেই বোধহয় লঞ্চে উঠে হড়হড় করে বমি করল। ফজলুল করিম সাহেব আঁতকে উঠে বললেন, ‘কলেরা না-কি? কী সর্বনাশ!’ তাঁর মেজাজ খুবই খারাপ হয়ে গেল। তিনি বাকি সময়টা ক্যাবিনে দরজা আটকে বসে রইলেন। তাঁর গায়ের তাপমাত্রা বেড়ে গেল।

পরদিনের খবরের কাগজে ফজলুল করিম সাহেবের ত্রাণকার্যের একটি বিবরণ ছাপা হয়— অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় জনশক্তি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জনাব ফজলুল করিম একটি ত্রাণদল পরিচালনা করে বন্যা মোকাবিলায় বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারকেই স্পষ্ট করে তুলেন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পুরো চব্বিশ ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করে তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। জনশক্তি মন্ত্রী জনাব এখলাস উদ্দিন হাসপাতালে তাঁকে মাল্যভূষিত করে বলেন— বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের ফজলুল করিম সাহেবের মতো মানুষ দরকার। পরের জন্যে যারা নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পিছপা নন। এই প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রকবির একটি কবিতার চরণও আবেগজড়িত কণ্ঠে আবৃত্তি করেন— “কেবল আগে প্রাণ করিবেক দান, তার লাগি কাড়াকাড়ি।”



সুলেখার বাবা

ঘুম ভেঙেই সুলেখা দেখল গেটের কাছে একটি লোক উবু হয়ে বসে আছে। লোকটির চোয়াল ভাঙা, মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটা, চোখ দুটি ফোলা ফোলা। সে কিছুক্ষণ পরপর পিক করে থুথু ফেলছে। কী বিশ্রী স্বভাব। নিজের চারদিকে কেউ এমন থুথু ছিটায়? এই তো সুলেখা দাঁত মাজছে। মুখ ভর্তি হচ্ছে

ফেনায়। সে তো থুথু ফেলছে না। বেসিনে গিয়ে ফেলে আসছে। তাই নিয়ম। মুখে থুথু এলে সেটা ফেলতে হয় বেসিনে কিংবা আশপাশে নর্দমা থাকলে নর্দমায়। থুথু কখনো গিলে ফেলতে নেই। তাদের ক্লাসের মিস এ্যানি বলে দিয়েছেন। মিস এ্যানির কথাগুলি যেমন সুন্দর চেহারাও তেমনি সুন্দর। মাঝে মাঝে শাড়ি পরলে তাঁকে দেখায় ঠিক পরীর মতো।

সুলেখা ব্রাস ঘসতে ঘসতে ফুলের টবগুলির দিকে এগিয়ে গেল। ঐ লোকটা ফোলা ফোলা চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বাঁ চোখের কোণে এক গাদা ময়লা। দেখলেই বমি বমি ভাব হয়। সুলেখা চেষ্টা করল লোকটির বাঁ চোখের দিকে না তাকাতে।

যেসব দৃশ্য কুৎসিত সেসব দেখতে নেই। কুৎসিত কিছু দেখলে মন ছোট হয়ে যায়। এই কথাটা বলেন সুলেখার মা। এবং তিনি সুলেখাকে কুৎসিত কিছু দেখতে দেন না। একবার তারা গাড়িতে করে সোনারগাঁও যাচ্ছিল। হঠাৎ সুলেখার বাবা বললেন, ‘মাই গড! কুকুরটাকে দেখি পিঠে ফেলেছে। নির্ঘাৎ কোনো ট্রাকের কাণ্ড।’

সুলেখা সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘বাবা আমি দেখব।’ কিন্তু মা দেখতে দিলেন না। চট করে একটা হাত দিয়ে তার চোখ ঢেকে গুল্মীর গলায় বললেন, ‘কুৎসিত জিনিস দেখতে নেই সোনা।’ সুলেখার অধিশি কুৎসিত জিনিস দেখতে এমনিতেই ভালো লাগে না। তার শুধু ভালো ভালো জিনিস দেখতে ইচ্ছা করে। দেখার মতো কত সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে।

ফোলা ফোলা চোখের ঐ লোকটি এখনো তার দিকে তাকিয়ে আছে। এই লোকটিরও বোধহয় সুন্দর জিনিস দেখতে ইচ্ছে করে। সুলেখা তো খুবই সুন্দর। এটা তো নিজের কথা নয়, সবাই বলে। মিস এ্যানি তাকে ডাকেন— সুইট এনজেল। এনজেল মানে পরী। পরী তো খুবই সুন্দর হয়। মিস এ্যানি ছাড়া অন্য আপারাও তাকে সুন্দর বলেন। নতুন একজন আপা সেদিন এলেন। পরিবেশ পরিচিতি পড়াবেন। ক্লাসে ঢুকেই বললেন— বলো ‘তো তোমরা, পরিবেশ কাকে বলে? কেউ বলতে পারল না। শেষটায় তিনি সুলেখার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, ‘এই যে সুন্দর মেয়ে, তুমি বলতে পার?’ সুলেখা বলতে পারল না। নতুন আপা পুরুষদের গলায় বললেন, ‘শুধু সুন্দর হলে তো হবে না। পড়াশোনাও করতে হবে।’ যা রাগ লেগেছিল সেদিন। কান্নাও পেয়েছিল। আরেকটু হলে সে কেঁদেই ফেলতো। অল্পতেই তার কান্না পায়।

সুলেখার দাঁত মাজা হয়ে গেছে। এখন আর বারান্দায় শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না। সে চলেই যেত কিন্তু ঐ লোকটা তার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ফিক ফিক করে হাসছে। কী বিশ্রী দাঁত লোকটার, হলুদ এবং

কালো! এই লোক বোধহয় কোনোদিন দাঁত মাজে না। আরে কী আশ্চর্য লোকটা হাত ইশারা করে তাকে ডাকছে! সুলেখা এগিয়ে গেল। মিষ্টি রিনরিনে গলায় বলল, ‘ডাকছ কেন?’

লোকটি কিছু বলল না। মুখ ভর্তি করে হাসল। সুলেখা বলল, ‘নাম কী তোমার?’

‘আমার নাম নাই গো মা।’

‘সবারই নাম থাকে।’

লোকটা খুব মাথা দুলিয়ে হাসছে। যেন সুলেখার কথায় খুব মজা পাচ্ছে। সুলেখা তো কোনো মজার কথা বলেনি।

‘তুমি হাসছ কেন শুধু শুধু?’

এই কথায় লোকটি যেন আরো মজা পেয়ে গেল। অদ্ভুত শব্দ করে হাসল। হঠাৎ কল খুললে যে রকম শব্দ হয় সে রকম শব্দ। হাসিটা আবার চট করে থেমেও গেল। লোকটি পিক করে বেশ অনেকখানি দূরে থুথু ফেলল। সুলেখা কড়া গলায় বলল, ‘চারদিকে থুথু ফেলছ কেন? ঘর ময়লা হয় না বুঝি?’ লোকটি কোনো উত্তর দেবার আগেই সুলেখার মা বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। চোখ দুটি অসম্ভব শুকনো। বাবার সঙ্গে ঝগড়া হলে মা’র মুখ এ-রকম হয়ে যায়। কে জানে আজ হয়তো বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। মা বললেন, ‘সুলেখা, তুমি এখানে কী করছ?’

‘কিছু করছি না মা।’

‘যাও, হাত-মুখ ধুয়ে নাক্তা ধুতে যাও।’

মা খুব কড়া গলায় কথা বলছেন। সুলেখার মন খারাপ হয়ে গেল। সে কান্না-কান্না মুখে বাথরুমের দিকে রওনা হলো। মা রাগী রাগী গলায় ঐ লোকটাকে ধমকাচ্ছেন।

‘কোথায় তুমি ঠিকানা পেয়েছ? তোমাকে বলা হয়েছে না কোনোদিন আমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে না? কি, বলা হয়নি? চুপ করে আছে কেন? জবাব দাও।’

‘মনটা বড় টানে আম্মা। বড় টানে।’

‘কী আজোবাজে কথা বলছ! তোমাকে যথেষ্ট টাকা দেয়া হয়েছে যাতে মন না টানে। তোমার তো আরো ছেয়েমেয়ে আছে, আছে না?’

‘জি আছে। আরো আছে।’

‘তাহলে এত মন টানাটানি কীসের?’

লোকটি খুক খুক করে কাশতে লাগল। মা ক্রমাগত কী সব বলতে লাগলেন। তার বেশির ভাগই সুলেখা বুঝল না। মা আজ ভীষণ রেগেছেন।

কোনোদিন এ রকম রাগেন না। বাইরের লোকের সঙ্গে তো কখনো না। কী মিষ্টি করে মা কথা বলেন, শুনতে যা ভালো লাগে!

সে নাশতা খেতে গিয়ে দেখল বাবার মুখও গম্ভীর। তাঁর হাতে একটি চটি বই। সামনে চায়ের কাপ। কিন্তু চা খাচ্ছেন না। সুলেখা তাঁর সামনে বসেছে। কিন্তু তিনি একটি কথাও বললেন না। যেন তাকে দেখতেই পাননি। সুলেখা চুপচাপ বসে রইল। বুয়া এসে তাকে এক বাটি পরিজ এবং একটা সিদ্ধ ডিম দিয়ে যাবে। তার আগে তো আর কিছু করার নেই। সে চামচ দিয়ে টুং করে গ্লাসে একটা শব্দ করল। বাবা তাকালেন কিন্তু কিছু বললেন না। অন্য সময় হলে বলতেন—খাবার সময় খেলতে নেই। খাওয়ার সময় খাওয়া। খেলার সময় খেলা।

বুয়া এবং মা ঢুকলেন একই সঙ্গে। বুয়ার হাতে পরিজের বাটি। সে বাটিটি সুলেখার সামনে রাখল।

সুলেখার মা বললেন, ‘রহিমার মা ঐ লোকটাকে কিছু খাবার-টাবার দাও। ওকে বল গেটের বাইরে গিয়ে বসতে। কেন ভিতরে ঢুকল? বাইরে যেতে বল। এফুনি বল।’

‘জি আইচ্ছা।’

‘রাতের ভাত তরকারি কিছু আছে? থাকলে ওকে তাই দাও। ভাত দাও।’

সুলেখার বাবা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, ‘কী চায়?’

‘তার নাকি মন টানছে। মেয়েকে দেখতে চায়।’

‘যত ফালতু কথা। আরো কিছু টাকা আদায়ের চেষ্টা।’

‘এত মহা যন্ত্রণা হলো! বামা চিনে গেছে। এখন তো দু’দিন পরে পরে এসে বসে থাকবে। অস্ত্রির কাজে যাবে। পুলিশকে দিয়ে একটা ধমক দেওয়াবো?’

সুলেখার মা বিরক্তিতে ঝুঁকুঁচকে ফেললেন। বাবা বললেন, ‘ওর বৌটার কী অবস্থা? বৌয়ের মন টানে না? বৌটা তো কখনো আসে না।’

‘জানি না। আমি কি ওর সঙ্গে রসলাপ করতে গিয়েছি নাকি?’

‘একশ’টা টাকা দিয়ে বিদায় করে দাও। এবং ভয় দেখিয়ে দাও যে আরেকবার এলে পুলিশে দেয়া হবে। আর যেন ত্রিসীমানায় ওকে না দেখি।’

মা একটা চকচকে একশ’ টাকার নোট সুলেখার হাতে দিয়ে বললেন, ‘যাও, ঐ লোকটাকে দিয়ে আস। দিয়েই চলে আসবে। আবার গল্প জুড়ে দিবে না। যাবে আর আসবে।’

বাবা বললেন, ‘ওর যাবার দরকার কী? তুমি গিয়ে দিয়ে আস।’

মা ক্লান্ত গলায় বললেন, ‘যাক সুলেখাই যাক। মেয়েকে দেখতে এসেছে।’

লোকটি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কী রোগা একটা মানুষ! নীল রঙের গেঞ্জি গায়ে। গেঞ্জিটা খুবই পরিষ্কার। কিন্তু লুঙ্গিটা অসম্ভব নোংরা।

সুলেখা টাকা হাতে এগিয়ে এল। লোকটি তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

সুলেখা বলল, 'নাও, টাকা নাও। মা দিয়েছেন।'

লোকটি টাকা নিল না। বিড়বিড় করে বলল, 'ভালো আছ আন্মা? শইল বালা? ইস্কুলে পড়? কোন ইস্কুলে?'

সুলেখা কিছু বলল না। লোকটি ফিসফিস করে বলল, 'খুব অভাবের মইধো পড়ছিলাম গো। খুবই অভাব। ভাতের কষ্ট হইল গিয়া খুব বড় কষ্ট। পেটের জইন্যে এই কাম করলাম। ওমন কুকাম করলাম।'

'কী করলে?'

লোকটি তার জবাব না দিয়ে বলল, 'আমি কে কও দেখি?'

'কীভাবে বলব?'

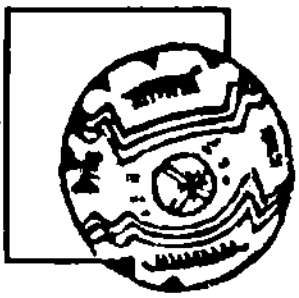
'আমারে চিনা চিনা লাগে না গো মা? ভালো কইরা দেখ।'

সুলেখার মা বারান্দায় বের হয়ে এলেন। কৰ্কশ গলায় বললেন, 'টাকা দিয়ে চলে আসতে বললাম না? কী করছ তুমি? টাকা দিয়ে দাও।'

সুলেখা বলল, 'টাকা নাও।'

লোকটি টাকা নিল না। কুঁজো হয়ে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল। একবারও পিছনে ফিরে তাকাল না। সুলেখা বলল, 'ঐ লোকটা কে মা? তাকে তুমি বকছ কেন?'

সুলেখার মা তার জবাব দিলেন না।



যন্ত্র

[গল্পটি এই শতকের নয়। আগামী শতকের শেষের দিকের। এই জাতীয় রচনার একটি বিশেষ নাম আছে, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীরা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীকে মোটেই গুরুত্ব দেন না। কেন যে দেন না তা সাহিত্যের ছাত্র নই বলেই হয়তো বুঝি না। আমি নিজে এই জাতীয় রচনা আগ্রহ নিয়ে পড়ি। লেখার সময়ও আগ্রহ নিয়ে লিখি— পাঠকদের এই তথ্যটি খুব বিনয়ের সঙ্গে জানিয়ে গল্প শুরু করছি।]

তিনি নরম গলায় বললেন, ‘ভাই এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই তো?’

সেলসম্যান জবাব দিল না, বিরক্ত চোখে তাকাল। তিনি আবার বললেন, ‘ভাই এই যন্ত্রটার কোনো সাইড এফেক্ট নেই তো?’ সেলসম্যানের বিরক্তি চোখ থেকে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। জ্র কুঁচকে গেল, নিচের ঠোট টানটান হয়ে গেল। সে শুকনো গলায় বলল, ‘সাইড এফেক্ট বলতে আপনি কী বুঝাচ্ছেন?’

‘মানে নেশা ধরে যায় কিনা। শুনেছি একবার ব্যবহার শুরু করলে নেশা ধরে যায়। রাতদিন যন্ত্র লাগিয়ে বসে থাকে...।’

‘আপনার যদি সন্দেহ থাকে তাহলে কিনবেন না। আপনাকে কিনতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।’

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এতগুলি টাকা দিয়ে যন্ত্রটা কিনবেন অথচ লোকটা তার প্রশ্নের জবাব পর্যন্ত দিতে চাচ্ছে না। এমনভাবে তার দিকে তাকাচ্ছে যেন তিনি...

‘আপনি কি যন্ত্রটা কিনবেন না দাঁড়িয়ে থাকবেন?’

তিনি পকেট থেকে চেক বই বের করলেন। খসখস করে টাকার অঙ্ক বসালেন। হাতের লেখাটা ভালো হলো না। কারণ এত বড় অঙ্কের চেক তিনি এর আগে কাটেননি। মাত্র আটশ গ্রাম ওজনের কালো চৌকোনা একটা বক্স। অথচ কী অসম্ভব দাম! টাকার অঙ্ক লিখতে গিয়ে হাত কেঁপে যাচ্ছে।

সেলসম্যান বলল, ‘আপনার কোনো ক্রেডিট কার্ড নেই?’

‘জি না।’

‘আপনাকে তাহলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আমরা আপনার ব্যাংক একাউন্ট চেক করব। কম্পিউটারটা ট্রাবল দিচ্ছে— একটু সময় লাগবে। আপনি ইচ্ছা করলে পাশের রুমে বসতে পারেন।’

‘আমি বরং এখানেই দাঁড়িয়ে থাকি। অবশ্য আপনার যদি কোনো অসুবিধা না হয়।’

সেলসম্যান জবাব দিল না। তাঁর কাছে মনে হলো সেলসম্যানের মুখের বিরক্ত ভাব একটু যেন কমেছে। কমাই উচিত—তিনি তো শেষ পর্যন্ত যন্ত্রটা কিনেছেন। তাঁর পঞ্চাশ বছরের জীবনের সঞ্চিত অর্থের সবটাই চলে গেছে। এর পরেও কি লোকটা তাঁর সঙ্গে সহজভাবে দু’একটা কথা বলবে না? তিনি বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত আবার বললেন, ‘ভাই এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই তো?’

এবার জবাব পাওয়া গেল। সেলসম্যান রোবটদের মতো ধাতব গলায় বলল, ‘না নেই।’

‘নেশা হয় না?’

‘না— হয় না। তবে আপনি ইচ্ছা করে যদি নেশা ধরান তাহলে তো করার

কিছু নেই। যন্ত্রটির সঙ্গে ইনস্ট্রাকশান ম্যানুয়েল আছে। ম্যানুয়েল মেনে যদি ব্যবহার করেন তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না। প্রতিদিন এক ঘণ্টার বেশি ব্যবহার করবেন না। সপ্তাহে অন্তত একদিন যন্ত্রটায় হাত দেবেন না।’

তিনি এবার আনন্দের একটা নিশ্বাস ফেললেন। লোকটি শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বলছে। তিনি হাসিমুখে বললেন, ‘যন্ত্রটা নিয়ে নানান কথাবার্তা হয় তো। তাই...’

‘আমাদের স্বভাবই হচ্ছে নতুন আবিষ্কার নিয়ে কথা বলা। পি থার্ড টু হচ্ছে এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। এই বিষয়ে কি আপনার কোনো সন্দেহ আছে?’

‘জি না।’

‘তা হলে ভয় পাচ্ছেন কেন?’

‘ভয় পাচ্ছি না তো।’

‘পাশের ঘরে গিয়ে বসুন। আরো আধ ঘণ্টার মতো লাগবে।’

‘জি আচ্ছা।’

‘একটা জিনিস শুধু মনে রাখবেন, এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার পি থার্ড টু। বিংশ শতাব্দীতে দশটি বড় বড় আবিষ্কার হয়ে গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হচ্ছে “ডেথ হরমোন”। ডাক্তার পিটার স্লীম্যান প্রমাণ করেছেন, একটা নির্দিষ্ট বয়সে পিটুইটারী গ্র্যাণ্ড থেকে “ডেথ হরমোন” শরীরে চলে আসে। শরীর তখন মৃত্যুর জন্য নিজেকে তৈরি করে। শুরু হয় বার্ধক্য প্রক্রিয়া। যে হারে জীবকোষ মরে যায় সেই হারে তৈরি হয় না। জরা শরীরকে গ্রাস করে। ডাক্তার পিটার স্লীম্যান দেখালেন, সালফার এবং অক্সিজেন ঘটিত একটি আপাতদৃষ্টিতে সহজ যৌগ অণু এই কাজটি করে। তিনি যৌগটি শরীর থেকে বের করে দেবার প্রক্রিয়াও বের করলেন। এই অসম্ভব ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া ব্যবহার করে পৃথিবীর কিছু ভাগ্যবান মানুষ তাদের শরীর থেকে ডেথ হরমোন বের করে দিয়েছে। জরা আর তাদের স্পর্শ করতে পারছে না।’

তিনি পাশের ঘরে চুপচাপ বসে আছেন। এই ঘরে একটি ‘কফি ডিসপেনসিং’ রোবট আছে। সে তাকে এক পেয়ালা কফি দিয়ে হাসিমুখে বলেছে, ‘আশা করি এক পেয়ালা উষ্ণ কফি আপনার হৃদয়ের শৈত্য দূর করে দেবে।’

তিনি রোবটের কথার কোনো জবাব দিলেন না। এদের তৈরিই করা হয় বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলে মানুষকে চমৎকৃত করার জন্যে। এদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললেই মানুষ হিসাবে নিজেকে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র মনে হয়। তিনি সামনের গোলটেবিলের উপর রাখা চকচকে কিছু ম্যাগাজিন থেকে একটি তুলে নিলেন। পাতা উলটিয়ে তাঁর মুখ বিকৃত হলো। ভুল ম্যাগাজিন বেছে নিয়েছেন— ‘জেনো-কোড নিউস’। জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং বিষয়ে রগরগে সব খবরে ভর্তি। এইসব

খবরের কোনোটির প্রতিই তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। প্রাণীর জিনের সঙ্গে উদ্ভিদের জিন লাগিয়ে কত সব অদ্ভুত জিনিস তৈরি হচ্ছে তার রগরগে বর্ণনা পড়তে তাঁর ভালো লাগে না। টেমোটো-জিনের সঙ্গে গোলাপগাছ-জিন লাগানো হচ্ছে— সাফল্য দোরগোড়ায়। এর শেষ কোথায় কে জানে? মানুষ এবং উদ্ভিদের এক শংকর প্রজাতি তৈরি হবে— আগামী পৃথিবীতে কারা বাস করবে? মানব-উদ্ভিদ?

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জির মিলনে তৈরি হলো নতুন প্রজাতি। তারা মানুষ না, আবার শিম্পাঞ্জিও না। গাধা ও ঘোড়ার শংকর যেমন খচ্চর এ-ও তেমনি। তবে সেই পরীক্ষা হয়েছিল গোপনে। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। নতুন প্রজাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে বিজ্ঞানী জানিয়েছিলেন— নতুন প্রজাতি গ্রহণযোগ্য নয়। সেদিন এই পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বিজ্ঞানীর সাজা দেয়া হয়েছিল। আজ আর সেই দিন নেই। জেনেটিক ইনজিনিয়াররা আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ। তাঁদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সব রকম সুযোগ এবং অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ, এই পৃথিবীকে তাঁরা ক্ষুধামুক্ত করেছেন। জেনেটিক ইনজিনিয়ারদের কারণে আজকের পৃথিবীতে কোনো খাদ্যাভাব নেই। সমুদ্রের শৈবালকে তারা স্বাদু স্টার্চে রূপান্তরিত করেছেন। উদ্ভিদের সঙ্গে জীবের জিনের সংযোগে তৈরি করেছেন সুস্বাদু প্রোটিনসর্বস্ব উদ্ভিদ। জেনেটিক ইনজিনিয়াররা আজকের পৃথিবীর দেবতা।

‘আপনার চেক ওকে হয়েছে। আপনি যন্ত্রটি নিতে পারেন।’

‘আপনাকে ধন্যবাদ’।

‘আশা করি এই যন্ত্রের কল্যাণে আপনার সময় আনন্দময় হবে।’

‘শুভ কামনার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ’।

তিনি কালো বাস্তি বুকের কাছে নিয়ে রাস্তায় নামলেন। রাত বেশি হয়নি, তবু পথঘাট নির্জন। টাউন সার্ভিসের হলুদ বাসগুলি প্রায় ফাঁকা যাচ্ছে— তার যে-কোনো একটিতে উঠে গেলেই হয়। উঠতে ইচ্ছা করছে না। হাঁটতে ভালো লাগছে। আবহাওয়া চমৎকার, তবে একটু শীত ভাব আছে।

বেশ কিছু সময় হাঁটার পর তিনি একটা ফাঁকা বাসে উঠে পড়লেন। বাসের ড্রাইভার মুখ ঘুরিয়ে বলল, ‘আপনার নৈশভ্রমণ আনন্দময় হোক।’ তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। রোবট ড্রাইভার। পৃথিবী রোবটে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এইসব রোবট চমৎকার কথা বলে। এদের প্রোগ্রামিং অসাধারণ।

রোবট ড্রাইভার বলল, ‘আপনি কত দূর যাবেন?’

তিনি শুকনো গলায় বললেন, ‘কাছেই।’

‘আপনি মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী নন।’

‘না।’

‘কেন বলুন তো?’

তিনি চুপ করে রইলেন। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। এইসব রোবটদের সঙ্গে কথা বলা মানেই হচ্ছে নিজেকে ছোট করা। রোবট গাড়ির গতি বাড়াতে বাড়াতে বলল, ‘আমি রোবট বলেই কি আপনি কথা বলতে চাচ্ছেন না?’

‘জানি না।’

‘আমি লক্ষ করেছি বেশিরভাগ মানুষ রোবটদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে। সারাক্ষণ বিষণ্ণ হয়ে থাকে যেন তার সমস্যার অন্ত নেই। আমি কি ঠিক বলছি?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনারা কী নিয়ে এত চিন্তা করেন?’

তিনি জবাব দিলেন না। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। গাড়ি রেসিডেনশিয়েল এলাকা ঢুকেছে। রাস্তার দু’পাশে আকাশছোঁয়া বাড়ি। কত লক্ষ মানুষ না এইসব বাড়িতে বাস করে। তবু কেন জানি বাড়িগুলিকে প্রাণহীন মনে হয়।

রোবট ড্রাইভার গাড়ির বেগ অনেকখানি কমিয়ে এনেছে। রেসিডেনশিয়েল এলাকায় গাড়ির গতি অনেক কম রাখতে হয়। ফাঁকা রাস্তা—ইচ্ছা করলেই ঝড়ের গতিতে চালানো যায়। রোবট ড্রাইভার কখনো তা করবে না। লালবাতিতে গাড়ি থামল। রোবট বলল, ‘এই শতকে আপনারা মানুষেরা এত অসুখী হয়ে গেলেন কীভাবে?’

‘জানি না।’

‘আপনাদের তো অসুখী হবার কোনো কারণ নেই। মানুষ ক্ষুধা জয় হয়ে করেছে, রোগ-ব্যাদি জয় করেছে। অমরত্ব তার হাতের মুঠোয়। তবু এত দুঃখ কেন?’

তিনি বললেন, ‘সাম্রাজ্যের ব্লকে আমি নামব।’

‘অবশ্যই। আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেননি। আপনারা মানুষেরা এই শতকে সবই পেয়েছেন। হাইড্রোজেন ফুয়েল আসায় শক্তির সমস্যা মিটেছে, বাসস্থানের সমস্যা মিটেছে। আপনার নিশ্চয়ই নিজস্ব একটি এ্যাপার্টমেন্ট আছে। আছে না?’

‘হুঁ।’

‘আপনি নিশ্চয়ই একা থাকেন না। আপনার স্ত্রী আছে।’

‘হুঁ।’

‘তার পরেও পি থার্ড টু কিনে এনেছেন। অনেক টাকা গেল তাই না?’

‘হুঁ।’

‘আপনি কি হুঁ ছাড়া আর কিছুই বলবেন না?’

‘আমি এইখানে নামব।’

স্টপেজের মাঝখানে গাড়ি থামানোর নিয়ম নেই। রোবট ড্রাইভার নিয়মভঙ্গ করে গাড়ি থামাল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে উঁচু গলায় বলল, ‘আপনার পি থার্টি টু আনন্দময় হোক।’

তিনি রোবটদের মতো গলায় বললেন, ‘ধন্যবাদ।’

তাঁর স্ত্রী হাসপাতালে কাজ করেন। আজ তাঁর নাইট ডিউটি। কাজেই তিনি এ্যাপার্টমেন্টে নেই। টেলিফোনের কাছে ছোট চিরকুট লিখে রেখে গেছেন— খাবার তৈরি করা আছে। খেয়ে নিও।

তিনি খেয়ে নিলেন। অত্যন্ত স্বাদু খাবার। খাবারের সঙ্গে চমৎকার পানীয়। এই পানীয়টি এই শতকের মাঝামাঝি তৈরি করা হয়েছে— ঝাঁঝালো টক ধরনের স্বাদ। কিছুক্ষণের জন্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ করে দেয়— বড় ভালো লাগে। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তিনি ঘরের চারদিকে তাকালেন, আনন্দের কত উপকরণ চারদিকে ছড়ানো— ত্রিমাত্রিক ছবি দেখার জন্যে একটি হলোরামা, যা চালু করামাত্র অনুষ্ঠানের পাত্রপাত্রীরা মনে হয় সশরীরে ঘরের ঠিক মাঝখানে চলে এসেছে। যেন হাত বাড়ালেই তাদের ছোঁয়া যাবে।

মস্তিষ্কের আনন্দকেন্দ্র উত্তেজিত করবার জন্যে আছে নানান ব্যবস্থা। সুমধুর সংগীত শ্রবণের আনন্দ থেকে শুরু করে নারীমুগ্ধের আনন্দের মতো তীব্র আনন্দ মস্তিষ্ক উত্তেজিত করেই পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মানুষ কেন আনন্দ পায়, কোথেকে আনন্দ পায় তা জেনেছেন। তারা জানেন বাগানের একটি ফুল দেখার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে পিঠ চুলকানোর আনন্দের বেশ কিছু মিল আছে, আবার অমিলও আছে। ফুল না দেখেও এবং পিঠ না চুলকিয়েও অবিকল সেই আনন্দ মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশ উত্তেজিত করে পাওয়া যায়। ঘরে-ঘরে সেই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মানুষ তা থেকে আর আনন্দ পাচ্ছে না। মানুষ ঝুঁকছে পি থার্টি টু-এর দিকে। কে জানে একসময় হয়তো এই যন্ত্রটিও তার ভালো লাগবে না।

তিনি তাঁর স্ত্রীকে পি থার্টি টু কেনার খবর দেবার জন্যে ফোন করলেন। রোবটদের ভাবলেশহীন গলায় বললেন, ‘আমি আজ একটি পি থার্টি টু কিনেছি।’

‘সে কি সত্যি?’

‘হ্যাঁ।’

‘বিরাত ভুল করেছ।’

‘কেন?’

‘আমাদের মতো দম্পতিদের সরকার থেকে একটি করে এই যন্ত্র দেয়া হবে বলে কথা হচ্ছে। তুমি কি জানতে না?’

‘জানতাম।’

‘তাহলে?’

‘কবে না কবে দেয়— আগেভাগেই কিনে ফেললাম। তুমি কি রাগ করেছ?’

‘না। যন্ত্রটা কি ব্যবহার করেছে?’

‘এখনো করিনি। এখন করব।’

‘আচ্ছা। তোমার যন্ত্র তোমার জীবনকে আনন্দময় করে তুলুক। আমাদের মতো দম্পতিদের যন্ত্রের আনন্দের প্রয়োজন আছে।’

‘তোমাকে ধন্যবাদ’।

তিনি টেলিফোন রেখে দিলেন। কাগজের মোড়ক খুলে কালো বক্সটি বের করে টেবিলে রাখতে রাখতে মনে-মনে বললেন, “আমাদের মতো দম্পতি”—এই বাক্যটি আমার ভালো লাগে না।

ভালো না লাগলেও তাঁর স্ত্রী বাক্যটি তাঁকে দিনের মধ্যে কয়েক বার বলেন। হয়তো এই নিয়ে তাঁর মনে গোপন ক্ষোভ আছে। ক্ষোভ থাকার কোনোই কারণ নেই। তাঁদের মতো দম্পতি পৃথিবীতে অসংখ্য আছে যারা সন্তান জন্মবার অধিকার পাননি। মানবজাতির স্বার্থেই তা করা হচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে পৃথিবীর জনসংখ্যা কমিয়ে আনার একটি শর্তই হচ্ছে একদল সন্তানহীন দম্পতি।

মানুষ মৃত্যুকে যদি সত্যি সত্যি জয় করে ফেলে তাহলে জনসংখ্যা আরো কমাতে হবে। তাঁদের মতো দম্পতির সংখ্যা আরো বাড়বে।

তিনি যন্ত্র হাতে নিয়ে সোফায় এসে বসলেন। ইনস্ট্রাকশান ম্যানুয়েল মন দিয়ে পড়লেন। যন্ত্রটি ব্যবহার করা খুব সহজ— যন্ত্র থেকে বের হওয়া ঋণাত্মক ইলেকট্রোড ঘাড়ের ঠিক মাঝমাঝি লাগাতে হয়। ধনাত্মক ইলেকট্রোড থাকবে বা কপালে। স্ট্যান্ড বাই স্কোভার টিপে কারেন্ট ফ্লো এ্যাডজাস্ট করতে হবে যাতে এক মাইক্রো এ্যাম্পায়ারেরও কম বিদ্যুৎপ্রবাহ স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে প্রবাহিত হয়। কারেন্ট এ্যাডজাস্ট করার সঙ্গে সঙ্গেই নীল আলো জ্বলে উঠবে। তখন চোখ বন্ধ করে স্টার্ট বাটন টিপতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কিছুই হবে না। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে হবে।

পি থার্ডি টু যন্ত্রটি বেশ কিছু শাপদ জন্তুর মস্তিষ্কের স্মৃতি ধরে রেখেছে। এই স্মৃতি বায়ো কারেন্টের মাধ্যমে মানুষের মাথায় সংগরিত করা হয়।

তিনি যন্ত্র চালু করে বসে আছেন। মাথায় ভোঁতা ধরনের যন্ত্রণা হচ্ছে—অল্প পিপাসাও বোধ হচ্ছে। হঠাৎ সেই পিপাসা হাজারো গুণে বেড়ে গেল। তৃষ্ণায় তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে— এই তৃষ্ণার কারণেই বোধহয় তাঁর ঘ্রাণশক্তি লক্ষগুণ বেড়ে গেল। তিনি এখন সবকিছুর ঘ্রাণ পাচ্ছেন। মাটির ঘ্রাণ, ফুলের গাছের শেকড়ের ঘ্রাণ। তাঁর জগৎটি ঘ্রাণময় হয়ে গেছে। এবং তিনি বুঝতে পারছেন তিনি শহরের সাতানব্বুই তলার সাজানো-গোছানো কোনো এ্যাপার্টমেন্টে বাস

করেন না। তিনি বাস করেন বনে। গহীন বনে। তিনি কে? তিনি কী...

বোঝা যাচ্ছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তিনি একটি চিতাবাঘ। বাঘ নয় বাঘিনি। তাঁর তিনটি শিশু শাবক আছে। গত দু'দিন এদের তিনি আগলে রেখেছেন। আজ প্রবল তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে এদের ছেড়ে পানির সন্ধানে বের হয়েছেন। পানি কোথায় আছে তা তিনি জানেন— পানিরও গন্ধ আছে। সেই গন্ধ মাটির গন্ধের মতোই তীব্র। পানি আছে, কাছেই আছে। এক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি পানির কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারেন কিন্তু যেতে পারছেন না। কাছেই কোথায় যেন পুরুষ বাঘটা ঘুরঘুর করছে। এর মতলব ভালো না। বাচ্চাটাকে এ হয়তো মেরে ফেলবে। এদের একা রেখে কোথাও যাওয়া যাবে না। অথচ তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

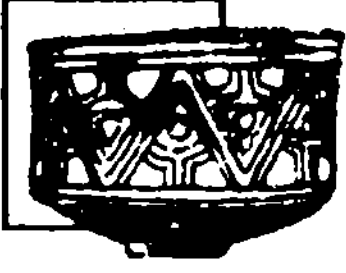
আকাশে বিরাট চাঁদ। তার আলোয় বনভূমি ঝলমল করছে। কনকন করে বইছে শীতের বাতাস। বাতাসে কী অদ্ভুত শব্দেই না গাছের পাতা নড়ছে! যেসব পাতা নড়ছে তার থেকে এক ধরনের গন্ধ আসছে। আবার স্থির পাতা থেকে অন্য ধরনের গন্ধ। কী বিচিত্র! কী বিচিত্র চারপাশের জগৎ! কোন্ স্তরেই না পৌঁছে গেছে অনুভূতির তীব্রতা।

তাঁর শরীর থরথর করে কাঁপছে। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে— অথচ কী আনন্দই না তিনি রক্তের ভেতর অনুভব করছেন! তিনি জলের সন্ধানে এগুচ্ছেন অথচ তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁর শাবকদের দিকে।

তারো অনেক পরের কথা।

ডেথ হরমোন রক্তের ভেতরই ভেঙে ফেলার অতি সহজ পদ্ধতি বের হয়েছে। মানুষ জরা বোধ করেছে। মানুষকে এখন অমর বলা যেতে পারে। বার্ধক্যজনিত কারণে আর আর মৃত্যু হবে না। জীবাণু এবং ভাইরাসঘটিত কোনো অসুখও পৃথিবীতে নেই। মানুষকে এখন কি তাহলে অমর বলা যাবে? হয়তোবা।

অমর মানুষেরা এখন দিনরাত ঘরেই বসে থাকে। তাদের কাজ করার প্রয়োজন নেই। কাজের জন্যে আছে রোবট শ্রেণী। চিন্তাভাবনারও কিছু নেই। অমরত্বের বেশি আর কিছু তো মানুষের চাইবারও নেই। এখনকার মানুষ দিনের পর দিন একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে বসে থাকে। পি থার্টি টু যন্ত্র লাগিয়ে পশুদের জীবনের অংশবিশেষ যাপন করতে তাঁদের বড় ভালো লাগে। এই তাঁদের একমাত্র আনন্দ।



মিরখাইয়ের অটোগ্রাফ

নীলগঞ্জ হাই স্কুলের হেড মাস্টার জাহেদুর রহমান সাহেব নীতুর বড় মামা। বড় মামাকে নীতুর খুব পছন্দ। তিনি অন্যসব হেড মাস্টারের মতো না— পড়া ধরেন না, গম্ভীর হয়ে থাকেন না, একটু হাসাহাসি করলেই বিরক্ত হন না। গল্প বলতে বললে গল্প শুরু করেন। সুন্দর সুন্দর গল্প, তবে নীতুর ধারণা, বানানো গল্প।

বানানো গল্প শুনতে নীতুর ভালো লাগে না। তার সত্যি গল্প শুনতে ইচ্ছে করে। সে গল্প শুনতে চায় কিন্তু প্রথমেই বলে নেয়— সত্যি গল্প বলতে হবে।

আজ নীতুর মামা জাহেদুর রহমান সাহেব একটা ভূতের গল্প শুরু করেছেন। তাঁর সামনে এক বাটি মুড়ি। বড় চায়ের কাপে এক কাপ চা। তিনি মুড়ি খাচ্ছেন এবং চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। নীতু তার সামনেই উপুড় হয়ে আছে। দু'হাত দিয়ে মাথা তুলে রেখেছে। খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মামাকে দেখছে এবং বোঝার চেষ্টা করছে মামা সত্যি গল্প বলছেন না মিথ্যা গল্প বলছেন। মিথ্যা গল্প হলে সে শুনবে না।

নীতুর বয়স বেশি না। এবারী ক্লাস খিতে উঠেছে। তবে তার খুব বুদ্ধি। গল্পের সত্যি-মিথ্যা সে চট করে ধরে ফেলে। ঐ তো সেদিন কাজের বুয়া তাকে গল্প বলেছে—

‘একদেশে ছিল একটা বাঘ। মাঘ মাসের শীতে বাঘ হইছে কাহিল।

কাপড়ের দোকানে গিয়ে বলছে, মিয়া ভাই, আমারে একখানা গরম চাদর দেন। শীতে কষ্ট পাইতাছি...’

নীতু বুয়াকে কড়া করে ধমক দিয়েছে। সে কঠিন গলায় বলেছে, ‘মিথ্যা গল্প বলতে নিষেধ করেছি। এটা তো মিথ্যা গল্প।’

বুয়া অবাক হয়ে বলেছে, ‘কোনটা মিথ্যা?’

‘বাঘ কি কথা বলতে পারে? বাঘ কি দোকানে যেতে পারে?’

‘কথা তো সত্য বলছেন আফা... কিন্তু...’

‘থাক বুয়া, তোমাকে গল্প বলতে হবে না।’

নীতু খুব সাবধানী। কেউ তাকে ঠকাতে পারে না। বড় মামাও পারবেন না, চেষ্টা করলেও না। সে ঠিক ধরে ফেলবে।

নীতু বলল, ‘কই বড় মামা, তারপর কী হলো বলো।’

জাহেদুর রহমান সাহেব বলবেন, 'মুড়ি খেয়ে নিই।'

'উঁহু, তুমি খেতে খেতে বলো।'

জাহেদ সাহেব চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, 'তখন আমার যুবক বয়স। চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। খবর পেলাম, চিটাগাং পোর্টের স্কুলে একজন...'

'মামা, মিথ্যা গল্প না তো?'

'অসম্ভব। আমি মিথ্যা গল্প বলি কীভাবে? স্কুলের হেড মাস্টার মিথ্যা বলে কখনো শুনেছিস?'

'আচ্ছা বেশ, বলো?'

'কতদূর বলেছি?'

'তোমার তখন যুবক বয়স...'

'ও হ্যাঁ, খবর পেলাম, চিটাগাং পোর্টের স্কুলে ইংরেজির একজন শিক্ষক নেবে...'

'মামা, তুমি কিন্তু একটু আগে বলেছ অঙ্কের শিক্ষক। তুমি মিথ্যা গল্প শুরু করেছ।'

'আরে না, ওরা একজন শিক্ষক নেবে, তাকে অঙ্ক-ইংরেজি দুটো পড়াতে হবে। এখন বুঝলি?'

'হুঁ।'

'ইন্টারভিউ দিলাম। চাকরি হয়ে গেল। ভালো বেতন। কর্ণফুলি নদীর ওপর বিরাট বাসা ভাড়া করলাম। তখন বাড়ি-ভাড়া ছিল সস্তা। দু'শ'-তিন শ' টাকায় আলিশান বাড়ি পাওয়া স্বেত।'

'আলিশান বাড়ি মানে কী মামা?'

'আলিশান বাড়ি মানে রাজপ্রাসাদ।'

'তুমি রাজপ্রাসাদ থাকতে?'

'গরিবের রাজপ্রাসাদ বলতে পারিস। দু'টা শোবার ঘর। বসার ঘর। টানা বারান্দা। দোতলা বাড়ি। একতলায় ট্যাক্স অফিস। দোতলায় আমি থাকি। আলো-হাওয়া খুব আসে। সমুদ্রের ওপর বাড়ি হলে যা হয়।'

'মামা, তুমি একটু আগে বলেছ নদীর ওপর বাড়ি।'

'কর্ণফুলি নদী সেখানে সমুদ্রে পড়েছে। কাজেই নদীর ওপর বললে যেমন ভুল হয় না, সমুদ্রের ওপর বাড়ি বললেও ভুল হয় না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণে তাকালে সমুদ্র দেখা যায়, আবার পশ্চিমে তাকালেই নদী। এখন বুঝেছিস?'

'হুঁ। তারপর কী হয়েছে বলো।'

'বাড়িটা ছিল লোকালয়ের বাইরে। দিনের বেলায় একতলার অফিসে কাজকর্ম হতো। লোকজনে গমগম করত। সন্ধ্যাবেলা সব সুনশান।'

‘সুনশান কী মামা?’

‘সুনশান হলো কোনো শব্দ নেই। নীরব। ভয়ঙ্কর নীরব।’

‘তারপর?’

‘তারপর একদিন কী হয়েছে শোনো— কাজে আটকা পড়েছিলাম, অফিস থেকে ফিরতে অনেক দেরি হলো...’

‘অফিস বলছ কেন মামা-তুমি না স্কুলে মাস্টারি কর!’

‘বাবারে, স্কুলেও তো অফিস আছে। ছাত্র পড়ানো শেষ করে সেই অফিসে হেড মাস্টারের সঙ্গে মিটিং করতে গিয়ে দেরি। এইজন্যেই অফিস বলছি।’

‘ও আচ্ছা।’

‘আমি দুপুরে বাইরে খেয়ে নিই। রাতে নিজে রঁধে খাই। চারটা চাল ফুটাই, আলুভর্তা করি, একটা ডিম ভাজি। গাওয়া ঘি গরম ভাতের ওপর ছড়িয়ে আলুভর্তা দিয়ে ভাত খাওয়ার মজাই অন্য...।’

‘আমার আলুভর্তা আর গাওয়া ঘি দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছে করছে মামা।’

‘এখন খাবি?’

‘হুঁ।’

‘একটু আগেই তো খেলি। খাওয়ার কথা শুনে ক্ষিদে পাওয়া, ভূতের কথা শুনে ভয় পাওয়া— এসব তো ভালো লক্ষণ না। এসব হলো জটিল এক রোগের লক্ষণ। রোগটার নাম হচ্ছে ‘শোনা রোগ’। এই রোগ হলে শোনা কথায় আক্কেল গুড়ুম হয়...।’

‘তুমি গল্প বাদ দিয়ে অন্য কথা বলছ...’

‘আমি অন্য কথা বলতে চাইনি, তুই-ই তো অন্য কথা নিয়ে এলি। যাই হোক, গল্প শুরু করি— কী যেন বলছিলাম ও হ্যাঁ, আমার বাসা যে এলাকায় সে এলাকাটা সন্ধ্যার পর সুনশান নীরব হয়ে যায়। সেদিনই বাসাটা ছিল অন্যদিনের চেয়েও নীরব। হোটেলের চারটা ভাত খেয়ে যখন ফিরছি—’

‘মামা, তুমি এগুনি বললে আলুভর্তা দিয়ে গাওয়া ঘি দিয়ে ভাত খেলে?’

‘তোকে গল্প বলাই এক যন্ত্রণা! সবটা না শুনেই জেরা শুরু করিস। পুরোটা শুনে তার পরে জেরা করবি। ঠিক করেছিলাম, বাসাতেই রঁধে খাব। রাঁধতে গিয়ে দেখি চুলা ধরানো যাচ্ছে না। এক ফোঁটা কেরোসিন নেই। বাধ্য হয়ে হোটেল খেতে গেলাম।’

‘ও আচ্ছা।’

‘হোটেলটা আবার অনেকখানি দূরে। তিন কিলোমিটার হবে। যেতে লাগে এক ঘণ্টা। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ফিরছি। রাত ন’টার মতো বাজে। নির্জন রাস্তা। খুব হাওয়া দিচ্ছে— শীত শীত লাগছে। চাদর গায়ে ছিল। চাদর দিয়ে নিজেকে মুড়িয়ে নিয়ে এগুচ্ছি— হঠাৎ মনে হলো, কে যেন চাদরের খুঁট ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে এগুচ্ছে। তাকিয়ে দেখি কেউ না। নিশ্চয়ই মনের ভুল। কিন্তু

আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম, যখন আমি হাঁটি কে যেন চাদরের খুট ধরে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। দাঁড়ালেই চাদরের খুট ছেড়ে দেয়। আমি হতভম্ব। ব্যাপারটা কী? চাদরে কোনো সমস্যা আছে নাকি? আমি গা থেকে চাদর খুলে ভাঁজ করে ছোট করলাম। ফেলে দিলাম কাঁধে। শীত লাগলে লাগুক। চাদরের খুট ধরে তো আর কেউ এখন টানাটানি করবে না। আবার হাঁটা ধরতেই ভয়ঙ্কর এক চমক খেলাম। কে যেন এখন আমার বাঁ হাতের কড়ে আঙুল ধরে হাঁটছে। অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

নীতু ভীতু গলায় বলল, ‘মামা, কে তোমার কড়ে আঙুল ধরে হাঁটছে?’

‘কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে যে হাঁটছে সে শক্ত হাতে আমার আঙুল চেপে ধরে আছে। মনে হচ্ছে, অল্প বয়স্ক কোনো বাচ্চা। তুলতুলে হাত। নরম আর ঠাণ্ডা। আমি ঝাঁকি দিয়ে হাত সরিয়ে নিলাম। দু’পা এগুতেই আবার আঙুল চেপে ধরল।’

নীতু কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, ‘মামা, আমার ভয় লাগছে। জাহেদুর রহমান সাহেব বললেন— তোর আর কি ভয় লাগছে? আমার ভয় যা লাগছিল তার সীমা-পরিসীমা ছিল না। শরীর ঘেমে গেল। বুক ধকধক করতে লাগল। একবার ইচ্ছা করল উঠে দৌড় দেই।’

‘তুমি কী করলে? দৌড় দিলে?’

‘না, দৌড় দিলাম না। কারণ, স্যাভেল পুরনো, স্যাভেলের ফিতা নরম হয়ে আছে। দৌড় দিলেই ফিতা ছিঁড়ে যাবে। আমি সিগারেট ধরালাম।’

‘সিগারেট ধরালে কেন মামা?’

‘সিগারেটে আগুন আছে। আগুন থাকলে ভূত-প্রেত কাছে ভিড়ে না।’

‘ওটা কি ভূত ছিল মামা?’

‘না, ভূত ছিল না। ওটা ছিল টুতের বাচ্চা।’

নীতু অবাক হয়ে বলল, ‘টুতের বাচ্চা আবার কী?’

জাহেদুর রহমান সাহেব বললেন, ‘আমরা সব সময় বলি না বাঘ-টাগ, ভূত-টুত? বাঘের যেমন বাচ্চা আছে, সেরকম আছে টাগের বাচ্চা। আবার ভূতের বাচ্চার মতো আছে টুতের বাচ্চা।’

‘ওরা কেমন মামা?’

‘ভয়ঙ্কর। ভূতরাই ওদের ভয়ে অস্থির, মানুষের কথা ছেড়ে দে। একটা টুতের বাচ্চা থাকলে তার ত্রিসীমানায় কোনো ভূতের দেখা পাবি না।’

‘ওরা দেখতে কেমন?’

‘দেখতে কেমন কী করে বলব? ওদের তো আর চোখে দেখা যায় না।’

‘হাত দিলে বুঝা যায়?’

‘অবশ্যই যায়।’

‘তারপর কী হলো মামা বলো।’

‘আমি তো ভয়ে আঁতকে উঠলাম। তবে চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললাম, ‘কে? কে?’

‘ধমক দিলে কেন মামা?’

‘ভয় কাটানোর জন্যে দিলাম। খুব বেশি ভয় পেলে ধমক দিতে হয়। ধমকের জোর যত বেশি হয় ভয়ও তত কমে।’

‘তোমার ধমকের জোর খুব বেশি ছিল?’

‘ভয়ঙ্কর ছিল। নিজের ধমকে নিজেই ভয় পেয়ে গেলাম। আর তখন গুনলাম মিনমিন করে কে যেন কথা বলল। কথা পরিষ্কার না, একটু জড়ানো। আমি বললাম, কথা কে বলছে?’

‘আমি?’

‘আমিটা কে? নাম কী?’

‘আমার নাম মিরখাই।’

‘তুই কে? ভূত নাকি?’

‘জি না, আমি ভূত না, আমি টুত।’

‘তুই আমার আঙুল ধরে আছিস কেন? ভয় দেখাবার চেষ্টা করছিস?’

‘হুঁ।’

‘কেন?’

ভূতের বাচ্চা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। আমি বললাম, ‘ব্যাপারটা কী? কাঁদছিস কেন?’ কোনো জবাব কেই— কান্না আরো বেড়ে গেল। আমার মায়াই লাগল; ব্যাপার কিছু বুঝছি না। কেন কাঁদছে জানা দরকার।

‘মামা, ওর কি পেটে ব্যথা?’

‘তখনও জানি না— তবে পেটে ব্যথা হতে পারে। পেটে ব্যথার কারণে কাঁদাটা অস্বাভাবিক না। আবার অন্য কারণও থাকতে পারে— হয়তো পথ হারিয়ে ফেলেছে। খুব অল্প বয়স যাদের ওরা মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে ফেলে— তখন কান্নাকাটি শুরু করে— আমি বললাম, কী রে তুই পথ হারিয়ে ফেলেছিস?’

‘না।’

‘পেটে ব্যথা?’

‘না।’

‘কেউ মারধর করেছে?’

‘না।’

‘তাহলে ব্যাপারটা কী খুলে বল। কান্না বন্ধ করে বল হয়েছে কী।’

‘টুতের বাচ্চা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, পরীক্ষায় ফেল করেছে।’

‘বলিস কি!’

নীতু বলল, ‘মামা, টুতের বাচ্চাদের স্কুল আছে?’

‘অবশ্যই আছে। প্রাইমারি এডুকেশন এদের জন্যে কম্পলসারি।’

‘ওদের কী কী পড়ানো হয়?’

‘সবই পড়ানো হয়— অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, ধর্ম ...’

‘ও কীসে ফেল করেছে?’

‘ও ফেল করেছে ভয় দেখানো বিষয়ে।’

‘সেটা কী?’

‘সব ভূত-টুতের বাচ্চাদের ১০০ নম্বরের একটা পরীক্ষা দিতে হয়— ভয় দেখানো পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় এরা মানুষকে ভয় দেখায়। যে ভয় দেখাতে পারে না সে ফেল করে। ভয় দেখানো পরীক্ষায় ফেল মানে ভয়াবহ ব্যাপার। এই বিষয়ের ফেলের অর্থ হলো সব বিষয়ে ফেল। মিরখাই কাউকে ভয় দেখাতে পারে না। পরপর দু’বার ফেল করেছে।’

নীতু বলল, ‘আহা বেচারী!’

‘আজ তার পরীক্ষা। সে আমাকে ভয় দেখাবে। আমি যদি ভয় পাই তাহলে পাস করবে। ভয় না পেলে আবার ফেল। আজ ফেল করলে পরপর তিনবার ফেল হবে— তাকে স্কুল থেকে বের করে দেবে।’

‘কী ভয়ঙ্কর!’

‘ভয়ঙ্কর মানে মহাভয়ঙ্কর!’

‘তুমি ভয় পাচ্ছ না কেন মামা? একটু ভয় পেলে কী হয়?’

‘আমি নিজেও তাই ঠিক করলাম— ভাবলাম, এমন ভয় পাব যে টুত সমাজে হইচই পড়ে যাবে। মিরখাই শুধু যে পরীক্ষায় পাস করবে তাই না, মুন-মার্ক পেয়ে পাশ করবে।’

‘মুন-মার্কটা কী?’

‘একশ’তে আশি নম্বরের ওপর পেলে হয় স্টার মার্ক। একশ’তে ৯০ নম্বরের ওপর পেলে হয় মুন-মার্ক। যাই হোক, আমি বললাম, মিরখাই, তোর পরীক্ষা শুরু হবে কখন?’

মিরখাই বলল, ‘রাত বারোটোর পর। হেড স্যার আসবেন— অন্য স্যাররাও আসবেন। তখন আমি আপনাকে ভয় দেখাব। যদি ভয় পান তাহলে আমি পাশ করব। আর যদি না পান তাহলে...’

মিরখাই ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল। আমি বললাম, ‘কান্না বন্ধ কর মিরখাই। কোনো কান্না না। আজ তোকে আমি পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেব— এমন ভয় পাব যে তাদেরই আক্কেল গুডুম হয়ে যাবে।’

‘সত্যি?’

‘হ্যাঁ সত্যি। তুই আসিস সবাইকে নিয়ে। চোখ মোছ। এত কাঁদবি না। যা, বাসায় যা।’

‘তারপর কী হলো মামা?’

‘আজ থাক। বাকিটা কাল বললে কেমন হয় রে নীতু!’

‘খুব খারাপ হয়। তোমাকে আজই বলতে হবে। এফুনি বলতে হবে। ওরা কী করল—এলো তোমার কাছে?’

‘হুঁ।’

‘রাত বারোটায়?’

‘বারোটো এক মিনিটে। বিরাট টুতের দল নিয়ে মিরখাই উপস্থিত। সেই দলে টুতের বাবা-মা’ও আছেন। তারা দেখতে এসেছেন টুত পরীক্ষা পাস করতে পারে কিনা।’

‘তুমি তখন কী করছ?’

আমি ঘুমের ভান করে পড়ে আছি। নাক ডাকার মতো আওয়াজও করছি যাতে কেউ বুঝতে না পারে এটা আমার নকল ঘুম। কিন্তু আমার কান খুব সজাগ—কী হচ্ছে সব বুঝতে পারছি। জানালা দিয়ে টুত ঢুকল, সেটা বুঝলাম। টুতের স্যাররা যে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছেন সেটাও টের পেলাম...। টুত এসে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, ‘মামা, আমি এসেছি।’

‘ও তোমাকে মামা ডাকে?’

‘আগে কিছু ডাকত না। হঠাৎ ডাকা শুরু করল।’

‘আমার মনে হয় ও তোমাকে পছন্দ করেছে বলেই মামা ডাকে।’

‘হতে পারে। তারপর কী হলো শোন—টুত বলল, মামা, আমি আপনাকে ভয় দেখাতে এসেছি।’

আমি বললাম, ‘ভেরি গুড। ভয় দেখানো শুরু কর।’

টুত বলল, ‘কীভাবে ভয় দেখাব মামা?’

আমি বললাম, ‘প্রথমে টান দিয়ে গা থেকে লেপটা সরিয়ে দে। তারপর আমার পায়ের পাতায় সুড়সুড়ি দে। সুড়সুড়ি দিতেই আমি চিৎকার করে উঠব। আমার চিৎকার শুনে তুই থিকথিক করে হাসবি। তারপর জানালাটা বন্ধ করবি। খুলবি। বন্ধ করবি। খুলবি। আমি তখন বাতি জ্বালাব। বাতি জ্বালালেই তুই নিভিয়ে দিবি। যতবার জ্বালাব ততবার তুই নিভিয়ে দিবি। বাতি নিভিয়ে থিকথিক করে হাসবি।’

টুত বলল, ‘আচ্ছা।’ বলেই সে করল কি—টান দিয়ে আমার গা থেকে লেপ সরিয়ে দিল।

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। সে আমার পায়ে সুড়সুড়ি দিতে শুরু করল। আমি চোঁচিয়ে বললাম, ‘কে কে! কে আমার পায়ে সুড়সুড়ি দেয়? কে কে?’

আর তখন থিকথিক হাসির শব্দ শোনা যেতে লাগল। আমি ভয়ে ‘আঁ আঁ’ করতে লাগলাম।

নীতু বলল, ‘মামা, এটা তো সত্যি ভয় না, মিথ্যা ভয়। তাই না?’

‘হ্যাঁ মিথ্যা ভয়। কিন্তু কার সাধ্য সেটা বুঝে। আমি আঁ আঁ করে চিৎকার করছি আর তখন জানালা বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে। আমি চিকন স্বরে চোঁচাতে লাগলাম— ভূত ভূত ভূত। আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! কে কোথায় আছে? আমাকে বাঁচাও। ভূত আমাকে মেরে ফেলল! ভূত আমাকে মেরে ফেলল!’

আমার চিৎকার হইচই শুনে টুত নিজেই ভয় পেয়ে গেল। সে আমার কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, ‘মামা, আপনি কি সত্যি সত্যি ভয় পাচ্ছেন?’

আমি বললাম, ‘কথা বলে সময় নষ্ট করিস না— ভূত এখন টেবিল থেকে জিনিসপত্র মাটিতে ফেলতে থাক। কাচের জিনিস ফেলবি না। ভাঙা কাচে পা কাটতে পারে। বই-খাতা শব্দ করে মাটিতে ফেল।’

ধুম ধুম শব্দে বই-খাতা মাটিতে পড়তে লাগল। আমি তখন চড়কির মতো সারা ঘরে ঘুর পাক খাচ্ছি আর বলছি, ‘এসব কী হচ্ছে! এসব কী হচ্ছে? ভূত আমাকে মেরে ফেলল! আমাকে বাঁচাও! কে কোথায় আছে আমাকে বাঁচাও!’

সুইস টিপে বাতি জ্বাললাম। মিরখাই সঙ্গে সঙ্গে বাতি নিভিয়ে ফেলল। আমি চিৎকার করে বললাম, ‘এসব কী হচ্ছে! বাতি নিভে যাচ্ছে কেন?’ বলে আবার বাতি জ্বাললাম। মিরখাই আবার বাতি নিভিয়ে ফেলল। আমি একটা বিকট চিৎকার করে পৌঁ পৌঁ শব্দ করতে করতে মেঝেতে পড়ে গেলাম।

মিরখাইয়ের স্কুলের হেড মাস্টার সাহেব বললেন, ‘থাক থাক, আর লাগবে না, আর লাগবে না। বাদ দাও, শেষে মরে-টরে যাবে। দেখে মনে হচ্ছে হার্ট এটাক হয়ে গেছে। মিরখাই, তুমি পাস করেছ। শুধু পাস না, মুন-মার্ক পেয়ে পাস করেছ। ভেরি গুড। ভেরি গুড। চল যাওয়া যাক।’

মিরখাই আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, ‘মামা যাই।’

আমি বললাম, ‘আচ্ছা যা, আর শোন, ভালোমতো পড়াশোনা করিস।’

নীতু বলল, ‘মামা, গল্প কি শেষ হয়ে গেল?’

‘হ্যাঁ।’

‘এটি কি সত্যি গল্প মামা?’

‘অবশ্যই সত্যি গল্প।’

‘মিরখাইয়ের সঙ্গে কি এখনো দেখা হয়?’

‘হয়। আসে মাঝেমধ্যে।’

‘এখন মিরখাই কী করে?’

‘ও এখন ভূত এবং টুত সমাজে বিরাট ব্যক্তিত্ব। টুত ইউনিভার্সিটিতে মাস্টারি করে। এসোসিয়েট প্রফেসর। চারটা বই লিখেছে। বিরাট নাম করেছে বই লিখে।’

‘কী বই লিখেছে?’

‘মানুষকে কী করে ভয় দেখাতে হয় সেই বিষয়ে বই। মানুষকে ভয় দেখানোতে সে খুব নাম করেছে তো, সে জন্যে ঐ বিষয়ে শেষ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে, গবেষণা করেছে। পিএইচ.ডি ডিগ্রি নিয়েছে। টুত সমাজে মানুষকে ভয় দেখানোর কৌশল এখন তার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। সে খুবই জ্ঞানী ব্যক্তি।’

‘সত্যি, মামা?’

‘হ্যাঁ সত্যি। তার একটা বই আছে, টুত ইউনিভার্সিটিতে পাঠ্য— মানুষকে ভয় দেখানোর সহজ, জটিল ও মিশ্র পদ্ধতি, আরেকটা বই আছে যেটা নানা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। খুবই কঠিন বই, নাম হলো— ভয়ের রূপরেখা।’

‘উনি বাচ্চাদের জন্যে বই লিখেননি?’

‘নিচু ক্লাসের ছাত্রদের জন্যেও তার বই আছে— খেলতে খেলতে ভয় দেখানো।’ মিরখাইয়ের সঙ্গে আলপা করতে চাস? চাইলে একদিন আসতে বলি।’

‘না মামা, আসতে বলার সবকিছু নেই।’

‘তোমার অটোগ্রাফ লাগবে? অটোগ্রাফ লাগলে অটোগ্রাফের খাতাটা দিয়ে দিস। অটোগ্রাফ এনে দেব।’

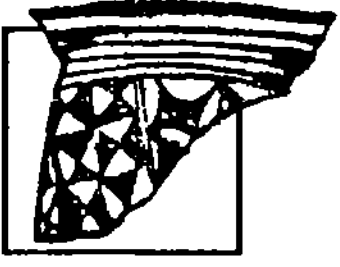
জাহেদুর রহমান সাহেব নীতুর অটোগ্রাফের খাতায় মিরখাইয়ের অটোগ্রাফ এনে দিয়েছেন। নীতুর খাতা দেখে বলল, ‘কোনো তো লেখা দেখছি না মামা।’

জাহেদ সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, ‘দেখবি কী করে? মিরখাই নিজে যেমন অদৃশ্য তার হাতের লেখাও অদৃশ্য।’

‘এখানে কী লেখা আছে মামা?’

‘এখানে লেখা— স্নেহের নীতুকে। নীতু, ভয়কে জয় কর, মিরখাই। খাতাটা যত্ন করে রাখিস মা। টুতের অটোগ্রাফ পাওয়া সহজ ব্যাপার না।’

নীতু তার অটোগ্রাফের খাতা খুব যত্ন করে তুলে রেখেছে। কেউ এলেই সে মিরখাইয়ের অটোগ্রাফ খুব আগ্রহ করে দেখায়।



রুঁরুঁর গল্প

রাত প্রায় একটা বাজে।

আমি বসে আছি গৌরীপুর রেলস্টেশনে— চিটাগাং মেইল ধরব। ট্রেন আসবে রাত তিনটায়। অপেক্ষা করা ছাড়া বর্তমানে আমার আর কিছু করণীয় নেই। শীতের রাত। ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিখ্যাত শীত পড়েছে। গাড়ো পাহাড় থেকে উড়ে আসছে কনকনে হাওয়া। সুয়েটারের ওপর কোট, তার ওপর একটা চাদর চাপিয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি।

গৌরীপুর রেলস্টেশনের ওয়েটিং রুমে আপাতত স্থান পেয়েছি, তবে কতক্ষণ এখানে থাকতে পারব বুঝতে পারছি না। স্টেশনের ভবঘুরে সম্প্রদায়ের বিশাল অংশ এখানে স্থান নিয়েছে। ঝগড়া-ঝাঁটি হচ্ছে। আমার চোখের সামনে ছোটখাটো একটা মারামারিও হয়ে গেল। এক ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্যে খাসি কিনেছেন। তিনি যাবেন মোহনগঞ্জ চারটি প্রমাণ-সাইজের খাসি নিয়ে তিনিও আমার মতোই ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছেন। খাসি চারটির স্বভাব বিচিত্র। এরা চুপচাপ থাকে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরপর চারজনই একত্রে ব্যাকুল স্বরে ডাকাডাকি শুরু করে। তাদের ডাকাডাকিতে ভয় পেয়ে ছোট ছোট বাচ্চারা কাঁদতে শুরু করে। মখন বিশৃঙ্খলা চরমে ওঠে তখন খাসিরা চুপ করে যায়।

এমন অবস্থায় মেজাজ ঠিক রাখা খুব মুশকিল। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি মেজাজ ঠিক রাখতে। চেয়ারে পা তুলে বসে বই পড়ার চেষ্টা করছি। এই সময় আমাকে চমকে দিয়ে এক ভদ্রলোক বললেন, ‘স্যার চা খাবেন?’

ভদ্রলোক আমার পরিচিত নন। পরিচিত হলেও অবিশ্যি চেনা যেত না। তিনি পরে আছেন মাংকি ক্যাপ। টুপির ফুটোর ভেতর দিয়ে শুধু চোখ বের হয়ে আছে। রোগা-পাতলা মানুষ। বেশ লম্বা। শীতের কারণেই বোধহয় খানিকটা বেঁকে গেছেন। ভদ্রলোক আবার বললেন, ‘স্যার চা খাবেন?’

আমি বললাম, ‘জি না।’

‘আমি আপনার মতোই চিটাগাং মেইল ধরব।’

‘ও আচ্ছা।’

‘শীত কী রকম পড়েছে দেখেছেন? সাইবেরিয়াতেও এত শীত পড়ে না!’

আমি হাসির মতো ভঙ্গি করে আবার বই পড়ায় মন দিলাম। এ জাতীয়

উটকো লোককে বেশি প্রশ্রয় দিতে নেই। প্রশ্রয় পেলেই এরা কথা বলে বলে জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। চা খাব না বলার পরও ভদ্রলোক হাল ছাড়লেন না। খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, ‘শীতের মধ্যে চা খেলে শরীরটা চাঙ্গা হতো।’

‘আমার প্রায়োজন নেই।’

ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমি আবার বইয়ে মন দেবার চেষ্টা করলাম। শীত মনে হচ্ছে আরো বেড়েছে। চাদর ভেদ করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে। খাসি চারটা আবারো একসঙ্গে চেষ্টাতে শুরু করেছে। আমি বই পড়ছি, কিন্তু কী পড়ছি নিজেই বুঝতে পারছি না।

‘স্যার চা নিন।’

আমি তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোক পিরিচ দিয়ে ঢাকা চায়ের কাপ এগিয়ে ধরে আছেন। আমার নিষেধ শুনেননি।

‘শীতটা কমবে— চুমুক দিন।’

আমি কথা বাড়ালাম না। চায়ের কাপ নিলাম।

‘পান খাওয়ার অভ্যাস আছে?’

‘জি না।’

‘পান নিয়ে এসেছি। চা খাবার পর জরুরি দিলে একটা পান খান, দেখবেন শীত কমে গেছে। পান খেলে মুখ নড়ে তো— এক্সারসাইজ হয়— এতে শীত কমে।’

আমাকে পানও নিতে হলো। ভদ্রলোক আমার পাশের টেবিলে উঠে বসলেন। লক্ষণ ভালো না। তিনি নিশ্চয়ই দীর্ঘ গল্পের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমি আবারও বই খুলে বসলাম। এমন ভাব করলাম যেন এই মুহূর্তে বই পড়াটা আমার খুব জরুরি।

‘স্যার, আমার নাম মনসুর। আমিও আপনার সঙ্গে চিটাগং মেইল ধরব, তবে আমি যাচ্ছি দোহাজারি।’

‘ও আচ্ছা।’

‘দোহাজারিতে একটা পুরনো বাড়ি আছে। প্রায় দু’শ বছর আগের হিন্দুবাড়ি। ঐ বাড়িতে ভূত থাকে বলে জনশ্রুতি। সেই জন্যেই যাচ্ছি।’

আমি বই থেকে মুখ না তুলেই বললাম, ‘ভূত দেখতে যাচ্ছেন?’ বলেই মনে হলো বিরাট ভুল করেছি। ভদ্রলোককে বকবক করার সুযোগ দিয়েছি। এখন তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে ব্যাখ্যা করবেন কেন তিনি দোহাজারি যাচ্ছেন।

‘কথাটা স্যার আপনি নেহায়েত ভুল বলেননি— আমি ভূতের সন্ধ্যানেই যাচ্ছি।’

‘ও আচ্ছা।’

‘বাংলাদেশে যেখানে যত পুরনো বাড়ি আছে— সেখানেই যাচ্ছি। ভূত-

শ্রেতরা সাধারণত লোকালয়ের বাইরে পুরনো বাড়িঘর পছন্দ করে। ওদের খুঁজে বের করার জন্যে এসব জায়গাই ভালো।’

‘ও।’

‘শহরে তারা যে একেবারে থাকে না তা না। মাঝেমাঝে শহরেও আসে। তবে অল্প সময়ের জন্যে। গাড়ি-ঘোড়ার যে ভিড়— মানুষই থাকতে পারে না তো ভূত!’

‘আপনি ভূত নিয়ে গবেষণা করছেন?’

‘জি না। তবে ওদের বিষয়ে অনেক কিছু জানি।’

‘ও আচ্ছা।’

‘ভূত নিয়ে একটা গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা আছে। দেখি পারি কিনা। একবার একটা আর্টিকেল লিখে পত্রিকায় পাঠিয়েছিলাম। ওরা ছাপেনি। আজকাল সবকিছুতেই ধরাধরি। লেখা ছাপার মধ্যেও ধরাধরি। পরিচিত লেখকের অগা-মগা-বগা লেখা বড় বড় হেডিং দিয়ে ছাপবে। আমার মতো অপরিচিত লেখকের লেখা যত ভালোই হোক, ছাপবে না। ঠিক বলিনি স্যার?’

‘জি।’

‘অথচ আমার লেখাটা ছিল গবেষণামূলক, শিরোনাম ছিল— শিশু ভূতের খাদ্য। লেখার কপি সঙ্গে আছে। পড়বেন?’

‘জি না আমি একটা বই পড়ছি। বইটা শেষ করা দরকার।’

‘আমার লেখাটা খুব ছোট, তিন পৃষ্ঠার, পড়তে সময় লাগবে না।’

‘পড়তে চাচ্ছি না।’

‘না চাইলে পড়তে হবে না। খুব খাটাখাটনি করে লিখেছিলাম... শিশু ভূতের খাদ্যের ওপর এ-রকম লেখা দ্বিতীয়টি লেখা হয়নি বলে আমার ধারণা। অথচ এই লেখা ছাপল না। সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। উনি ব্যক্তিগতভাবে লেখাটার প্রশংসা করলেন। অবশ্য বললেন— শিশু ভূতের খাদ্যের ওপর লেখা তাঁদের পত্রিকার উপযোগী নয়। ভূতের কোনো পত্রিকা থাকলে তারা লেখা নেবে। উনি বললেন ভূতদের কোনো পত্রিকায় লেখাটা পাঠিয়ে দিতে।’

আমি মনে-মনে সম্পাদকের বুদ্ধির প্রশংসা করলাম। সেইসঙ্গে ক্ষীণ সন্দেহ হতে লাগল, আমার সামনে বসে থাকা এই মানুষটার মাথায় সম্ভবত কোনো সমস্যা আছে। সুস্থ মাথার লোক ভূত-শিশুর খাদ্য নিয়ে প্রবন্ধ ফাঁদতে পারে না।

মনসুর নামের এই ভদ্রলোক বেশিক্ষণ কথা না বলে থাকতে পারে না বলে মনে হচ্ছে। নড়াচড়া শুরু করেছেন। এই নড়াচড়া কথা শুরু করার প্রস্তুতি। আমি হাতের বইয়ের দিকে আরো ঝুঁকে এলাম।

‘স্যারের কি একটা মিনিট সময় হবে? জাস্ট ওয়ান মিনিট।’

আমি বই থেকে মুখ তুললাম। মনসুর সাহেব হাসিমুখে বললেন, ‘আপনার সন্ধান কি কোনো পুরনো বাড়ি আছে, যেখানে ভূতের আস্তানা?’

‘জি না।’

‘অনুগ্রহ করে আমার কার্ডটা রাখুন। এখানে আমার ঠিকানা আছে। টেলিফোন নাম্বারও আছে— তবে আমার নিজের টেলিফোন না। পাশের বাসার টেলিফোন। মাঝে মাঝে ওদের খুব নরম গলায় অনুরোধ করলে ওরা আমাকে ডেকে দেয়।’

আমি যন্ত্রণা এড়াবার জন্যেই কোনো কথা না বলে টেলিফোন কার্ড পকেটে রেখে দিলাম। মনসুর সাহেব আনন্দিত ভঙ্গিতে বললেন, ‘পুরনো ধরনের কোনো ভূতের বাড়ির সন্ধান পেলে আমাকে দু’কলম লিখে দেবেন। আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।’

‘জি আচ্ছা।’

‘স্যার, আপনি আমাকে পাগল ভাবছেন না তো?’

‘না।’

‘থ্যাংক ইউ। অনেকেই ভাবে। আমার নিজের আত্মীয়স্বজনরাই ভাবে, আপনাকে দোষ দিয়ে কি হবে! আমার বড় বোন আমাকে এক পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। পিজির প্রফেসর, তিনি আমাকে খুব ভালোমতো পরীক্ষা করে বলেছেন যে আমি পাগল না।’

‘ও আচ্ছা।’

‘শুধু যে মুখে বলেছেন তা না— লিখিতভাবে দিয়েছেন। আমার সঙ্গে আছে, দেখতে চাইলে দেখাতে পারি।’

‘জি না, দেখতে চাচ্ছি না।’

মনসুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘আমাকে পাগল ভাবলে লোকজনদের দোষও দেয়া যায় না। কোনো সুস্থ মাথার লোক তো আর ভূতের বাড়ি খুঁজে বেড়াবে না— ঠিক বলছি না স্যার?’

‘ঠিকই বলছেন। মনসুর সাহেব, ভাই শুনুন, যদি কিছু মনে না করেন আমার বইটা শেষ করা দরকার। খুবই জরুরি।’

‘জরুরি হলে তো বই শেষ করতেই হবে। স্যার বই শেষ করুন— আসলে আমি পড়েছি এমন বিপদে, যে বিপদের কথা কাউকে না বলে থাকতে পারি না। আবার এমন বিপদ যে সবাইকে বলাও যায় না। সবাই এইসব জিনিস বুঝতে পারবে না। আপনার মতো দু’-একজন বুঝবে। যখন এ রকম কাউকে পাই তখন বিপদের কথাটা বলার চেষ্টা করি। আমি জানি, যাকে বলতে যাই তিনি বিরক্ত হন। তারপরেও বলি। এই যেমন আপনি বিরক্ত হচ্ছেন। বই পড়ার কথা বলে আমার হাত থেকে বাঁচতে চাচ্ছেন। আসলে তো আপনি বই পড়ছেন না। তখন থেকেই একটা পাতা চোখের সামনে মেলে ধরে আছেন। যখনই আপনাকে কিছু বলতে যাচ্ছি ততবারই আপনি বলছেন— খুব জরুরি, বইটা শেষ করতে হবে।’

আমি হাতের বই বন্ধ করে বললাম, ‘আপনার বিপদটা কী বলুন— আমি শুনছি।’

‘আমার কথায় রাগ করেননি তো?’

‘না, রাগ করিনি— বলুন কী বলবেন।’

‘আমি বরং আরেক কাপ চা নিয়ে আসি। চা খেতে খেতে শুনুন।’

‘চা আনতে হবে না— আপনি বলুন।’

মনসুর সাহেব গলা নামিয়ে বললেন, ‘একটা ভূতের বাচ্চাকে নিয়ে আমি বড়ই বিব্রত আছি।’

‘ভূতের বাচ্চা?’

‘জি, ভূতের বাচ্চা। সান অব এ গোস্ট। তিন-চার বছর বয়স। নিতান্তই শিশু।’

‘ও আচ্ছা।’

‘সে তার বাবা-মা’র সঙ্গে ঢাকা শহরে বেড়াতে এসেছিল। সারা দিন ঘুরেছে। মিরপুর চিড়িয়াখানায় গিয়েছে। শিশুপার্ক গিয়েছে... নিউ এয়ারপোর্ট গিয়ে প্লেনে কিভাবে উঠে-নামে এইসব দেখেছে, আরশর এসেছে গুলিস্তানে...’

‘কেন?’

‘দেখার জন্যে, আর কিছু না। যাই হোক গুলিস্তানে এসে পৌঁছার পরই মারামারি শুরু হয়ে গেল। রিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন বনাম ট্রাক ড্রাইভার এসোসিয়েশন— বিরাট মারামারি, ফকটেল ফাটাফাটি—রিকশা ভাঙা— ট্রাকের কাচ ভাঙা— যাকে বলে লঙ্কাকাণ্ড— এই দেখে ভূতের বাবা ভয়ে দিল এক দিকে দৌড়। তার মা দিল আর এক দিকে দৌড়— আর বাচ্চাটা লাফ দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বুলতে লাগল।’

‘আপনি বুঝতে পারলেন যে, একটা ভূতের বাচ্চা আপনার গলা জড়িয়ে ধরে আছে?’

‘শুরুতে কিছু বুঝতে পারিনি। আমার তখন মাথার ঘায়ে কুত্তা-পাগল অবস্থা। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছাড়তে শুরু করেছে। চোখে অন্ধকার দেখছি। আমি দৌড়াতে দৌড়াতে বাসায় এলাম— বাসায় আসার পর মনে হলো বানরের মতো কিছু একটা আমার গলা জড়িয়ে ধরে বুলছে। জিনিসটাকে ছাড়িয়ে দিতেই সেটা ধূপ করে মেঝেতে পড়ে গিয়ে উঁ উঁ করে কান্না শুরু করল। এখন বিবেচনা করুন আমার মনের অবস্থা। একটা-কিছু আমার গলা থেকে খসে পড়েছে— আমি তার মেঝেতে পড়ার শব্দ শুনছি— কান্নার শব্দ শুনছি অথচ জিনিসটাকে দেখতে পাচ্ছি না।’

‘আপনি কিছু দেখছেন না?’

মনসুর সাহেব হাসিমুখে বললেন, ‘দেখব কী করে? ভূত তো আর চোখে দেখা যায় না!’

‘কতদিন আগের কথা?’

‘প্রায় ন’ মাস।’

‘ন’ মাস ধরে এটা আপনার সঙ্গে আছে?’

‘জি। ফেলে তো দিতে পারি না। অবোধ শিশু, বাবা-মা’কে হারিয়ে নিতান্তই অসহায়। কোথায় তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে সেটা জানে না। কীভাবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে তাও জানে না।’

‘কথা বলতে পারে?’

‘অল্পবিস্তর পারে। সব কথা শিখে নাই। নিতান্তই শিশু, বুঝতেই পারছেন। মানুষের বাচ্চারা তিন বছরে সব কথা বলতে পারে। ভূতের বাচ্চারা পারে না। ওদের গ্রোথ কম।’

আমি হাঁ করে ভদ্রলোকের দিতে তাকিয়ে আছি। তিনি এমন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলে যাচ্ছেন যে, মাঝে মাঝে আমার মনে হচ্ছে বোধহয় এ রকম কিছু সত্যি সত্যি ঘটছে। ভদ্রলোক হয়তো আসলেই ভূত-শিশু লালনপালন করছেন।

‘বুঝলেন ভাই সাহেব— মানুষের শিশু পালন করা কত জটিল, আর এ হচ্ছে ভূত-শিশু। চোখে দেখা যায় না। বাবা-মা হারা শিশু। আমি ছাড়া দেখার কেউ নেই। রাতে ঘুমুতে যেতাম ওকে সঙ্গে করে। আমার গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমাতো। আমার ঠাণ্ডা লাগত। ভূতদের শরীর আবার খুব ঠাণ্ডা। শীতের দিনে দু’টা কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছি— ভূত-শিশুর কারণে কম্বলের ভেতরটা হিম-শীতল। ঠাণ্ডা লেগে নিওমোনিয়ার মতো হয়ে গেল। তাই বলে তো আর রুঁরুঁকে ফেলে দিতে পারি না।’

‘ওর নাম কি রুঁরুঁ?’

‘হ্যাঁ রুঁরু। ওর মা নাম রেখেছে।’

‘রুঁরুঁকে খাওয়াতেন কী?’

‘এই তো আপনি আসল পয়েন্ট ধরে ফেলেছেন— প্রধান সমস্যা হচ্ছে এদের খাওয়া। মানুষের কোনো খাবারই এরা খায় না। প্রথম দিকে তো বুঝতেই পারিনি কী খেতে দেব। হেন জিনিস নেই তাকে খেতে দেইনি। টুথপেস্ট দিয়েছি, সাবান দিয়েছি, জুতার কালি দিয়েছি, মোমবাতি দিয়েছি, আফটার শেভ লোশন দিয়েছি। যাই দেই হাঁ করে মুখে নেয়, তারপর থু করে ফেলে দেয়।’

‘তারপর কী করলেন?’

‘কী আর করব! রুঁরুঁকে একদিন কোলে বসিয়ে আদর-টাদর করে বললাম— বাবা, তুই নিজেই দয়া করে বল তোরা কী খাস। না খেয়ে খেয়ে তুই তো বাপধন মরে যাবি। তখন সে বলল, ভূতরা আলো খায়।’

‘আলো খায়?’

‘জি, আলো। টাঁদের আলো, মোমবাতির আলো— এইসব খায়।’

‘এটা জানার পর নিশ্চয়ই রুঁরুঁকে খাওয়ানোর প্রবেলম সহজ হয়ে গেল?’

‘জি না। প্রবেলেমের তখন শুরু। ভূতরা আলো খায় ঠিকই— কিন্তু সব ধরনের আলো খেতে পারে না। বিদ্যুৎ চমকের সময় যে আলো হয় সেই আলো কোনো ভূত খেতে পারে না। সেই আলো খাওয়া মানে ভূতের মৃত্যু।’

‘বলেন কি!’

‘তা ছাড়া একজন বয়স্ক ভূত যে আলো খেতে পারে একটি শিশু ভূত সেই আলো খেতে পারে না। খেলে বদহজম হয়— পেট খারাপ করে।’

‘তাই নাকি?’

‘জি। একশ’ পাওয়ারের একটা বাল্বের আলো তিন বছর বয়সি ভূতকে খাওয়ালেন কি তার পেট নেমে যাবে।’

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ইতস্তত ভঙ্গিতে বললাম, ‘একটা প্রশ্ন করি, কিছু মনে করবেন না— আমরা ভাত-মাছ খেয়ে বাথরুমে যাই— বাথরুম করি। ভূতরা যে আলো খায়, ওদের বাথরুম করতে হয় না?’

‘অবশ্যই হয়। ওরা আলো খায়, বের হয়ে আশে-পাশে ঘুরে।’

‘সেটা মন্দ না।’

‘রুঁরুঁকে মানুষ করতে গিয়ে অনেক কিছু শিখেছি এবং বললে বিশ্বাস করবেন না, পশ্চিম দিকে ফিরে কানে ধরোছি ভূতের বাচ্চা আর মানুষ করব না। যথেষ্ট হয়েছে। ওরা তো আর আমাদের মতো না। ওদের নিয়মকানুনই অন্য।’

‘তাই না-কি?’

‘অদ্ভুত অদ্ভুত সব নিয়ম। শুনলে আপনি হয়তো ভাববেন পাগলের প্রলাপ... যেমন ধরুন ওরা যদি খুব আনন্দিত হয় তাহলে কামড়ায়।’

‘তাই বুঝি?’

‘এই দেখুন না কামড়ে কামড়ে আমার হাতের দশা কি করেছে।’

ভদ্রলোক শাটের আঙ্গিন তুলে আমাকে দেখালেন— সত্যি সত্যি দাগ দেখা যাচ্ছে। ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, ‘ভূতরা সাইজে বড়-ছোট হতে পারে, এটা জানেন আশা করি?’

‘জি না, জানি না।’

‘এরা অনেকটা রবারের মতো, ইচ্ছা করলে মারবেলের মতো ছোট হতে পারে। রুঁরুঁ করতো কি, প্রায়ই ছোট হয়ে আমার নাকের ফুটায় কিংবা কানের ফুটায় বসে থাকতো।’

‘এত দেখি ভালো যন্ত্রণা!’

‘যন্ত্রণা মানে— জীবন অতিষ্ঠ। তবে ভাই, খুব মায়াকাড়া জানোয়ার। অল্পদিনেই এদের ওপর মায়া পড়ে যায়। এক দণ্ড এদের চোখের আড়াল করতে ইচ্ছা করে না। রুঁরুঁকে তার বাবা-মার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে, এটা যখন মনে

হয় তখন চোখে পানি এসে যায়।’

‘ওকে তাহলে বাবা-মার কাছে দিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছেন?’

‘ফিরিয়ে দিতে হবে না? কী বলেন আপনি! পরের বাচ্চা কত দিন রাখব?’

‘ওর বাপ-মা’কেই তাহলে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?’

‘ঠিক ধরেছেন। রুঁরুঁকে নিয়ে ভূতদের আস্তানায় যাচ্ছি। যদি কোনো সন্ধান পাওয়া যায়। হাটহাজারিতে একটা দু’শ বছরের পুরনো ভাঙা বাড়ি আছে। ভূতদের আখড়া। যাচ্ছি ঐদিকে যদি কোনো খোঁজ তারা দিতে পারে। ভূতে ভূতে এক ধরনের যোগাযোগ তো আছে। আছে না?’

‘থাকারই কথা।’

‘আমি অন্যভাবেও চেষ্টা করেছি— লাভ হয়নি। যেমন ধরুন, থানায় ডায়েরি করাতে গেলাম। ভূতের বাচ্চা পেয়েছি, থানায় জিডি এন্ট্রি থাকা ভালো। ধানমণ্ডি থানার ওসি এমনভাবে তাকালেন যেন আমি সরাসরি পাগলাগারদ থেকে ছাড়া পেয়ে তাঁর কাছে এসেছি। পুলিশের লোকদের ব্রেইন যে কম থাকে সেটা ঐদিনই বুঝলাম। আশ্চর্য, এরা আমার কথা ভালোমতো শুনলই না।

আমি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে গিয়েছি, সেখানেও এই অবস্থা— বিজ্ঞাপন ছাপবে না। আর, আমি আমার নিজের পয়সায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, তুমি না ছাপার কে? ঠিক বলছি না স্যার?’

‘ঠিকই বলছেন।’

‘শেষে উপায়ন্তর না দেখে দশ হাজার হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে গুলিস্তান, ফার্মগেট, মীরপুর এক নম্বর এবং সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে বিলি করিয়েছি।’

‘কী লেখা ছিল হ্যান্ডবিলে?’

‘কী আছে দেখুন না।’

ভদ্রলোক তার চামড়ার সুটকেস খুলে হ্যান্ডবিল বের করলেন, নিউজপ্রিন্ট কাগজে ছাপা বড় বড় ইংরেজি হ্যান্ডবিল—

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

রুঁরুঁ নামে তিন বছর বয়েসি একটি ভূতের ছানা পাওয়া গিয়েছে। ছানাটি তার বাবা-মা’র নাম বলতে পারে না। তারা কোথায় থাকেন তাও বলতে পারে না। সে তার একটা বোনের নাম জানে— রিঁরিঁ। উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে রুঁরুঁর আইনানুগ অভিভাবককে ভূত-শিশুটি সংগ্রহ করার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।

পোস্ট বক্স ১০৩

ঢাকা জিপিও

‘বাড়ির ঠিকানা না দিয়ে পোস্ট বক্সের নাম্বার দিয়ে দিয়েছি। বাড়ির ঠিকানা দিলে আলতু-ফালতু লোক বিরক্ত করবে। কী দরকার!’

আমি বললাম, ‘আপনি তাহলে ভূত-শিশু নিয়ে অনেক কষ্ট করেছেন?’

‘তা করেছি। তবে এইসব কষ্ট কোনো কষ্ট না, আসল কষ্ট হলো— মানুষ যখন ভুল বুঝে তখন। যখন ভাবে, আমার ব্রেইন ডিফেক্ট হয়ে গেছে তখন মনটা খারাপ হয়।’

‘আপনার ব্রেইন ডিফেক্ট হয়েছে এ-রকম তাহলে কেউ-কেউ ভাবছে?’

‘সবাই ভাবছে। আমার নিজের বড় বোন একদিন এসে কঠিন গলায় বলল— কই, দেখা তোর ভূত। এখন আপনিই বলুন, স্যার, ভূতের বাচ্চা আমি দেখাব কী করে? এরা তো অদৃশ্য। সেই কথা বোনকে বুঝিয়ে বললাম। তাতেও কাজ হলো না। সে বলে কি— বেশ, তাহলে তুই তোর ভূতকে কথা বলতে বল। আমি কথাটা অন্তত শুনে যাই।’

‘শুনিয়েছেন কথা?’

‘জি না। রুঁরুঁ তো অন্যের সামনে কথা বলবে না। অসম্ভব লাজুক।’

‘ও আচ্ছা।’

‘এই তো এতক্ষণ যে সে আপনার চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে আপনি কি তার মুখ থেকে একটা বাক্য শুনেছেন?’

‘জি না।’

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘সবাই শুধু প্রমাণ চায়। আর, মুখের কথাটা তো সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ঠিক বলছি না?’

‘অবশ্যই ঠিক বলছেন।’

‘আমার ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে, ঘণ্টা দিয়ে দিয়েছে। এখন উঠতে হয়।’

মনসুর সাহেব বললেন, ‘স্যার তৈরি হোন। এই ফাঁকে আমি রুঁরুঁকে খাইয়ে আনি।’

‘সে কি আপনার সঙ্গেই আছে?’

‘জি। তাকে আর কোথায় ফেলে যাব?’

‘তাকে কী খাওয়াবেন?’

‘চাঁদের আলো। আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোই খানিকটা খাওয়াব। আজ সারা দিন কিছুই খায়নি। খাওয়া-দাওয়া পুরোপুরি বন্ধ। কী যে যন্ত্রণায় পড়েছি!’

‘খাচ্ছে না কেন?’

‘এই যে দোহাজারি নিয়ে যাচ্ছি, তার বাবা-মা’কে খুঁজছি, এইজন্যেই খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। আমার সঙ্গে থাকতে চায়, অন্য কোথাও যেতে চায় না। রুঁরুঁকে ফিরিয়ে দিতে আমার নিজেরও কি ভালো লাগছে? মায়া পড়ে গেছে না? রুঁরুঁ চলে গেছে এটা ভাবতেই আমার চোখে পানি আসে।’ বলতে বলতে মনসুর সাহেবের চোখ ভিজে উঠল। তিনি চাদরে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন। ধরা গলায় বললেন, ‘স্যার, আপনি ভূতের বাড়ির কোনো সন্ধান পেলে অধমকে জানাবেন— অন্যের আদরের ধন আমার কাছে পড়ে আছে। আমার একটা দায়িত্ব আছে না? জানি রুঁরুঁ চলে গেলে আমার কষ্ট হবে কিন্তু উপায় কি!’

চিটাগাং মেলে উঠে বসেছি। মনসুর সাহেব তাঁর ভূতের বাচ্চাকে চাঁদের আলো খাইয়ে আমার পাশে এসে বসেছেন। তাঁকে এখন বেশ আনন্দিতই মনে হচ্ছে। সম্ভবত ভূতের বাচ্চা চাঁদের আলো খেয়েছে।

মনসুর সাহেব বললেন, ‘জানলার কাচ নামিয়ে দিন সময়। ট্রেন ছাড়লে ঠাণ্ডা লাগবে।’

আমি কাচ নামাচ্ছি এই সময় ছোট্ট একটা বাটক হলো। এক ভদ্রলোক হস্তদন্ত হয়ে ট্রেনের কামরায় ঢুকে পড়লেন। ঢুকেই মনসুরের হাত ধরে টানাটানি। ভদ্রলোকের পেছনে পেছনে বয়স্ক একজন মহিলাও ঢুকলেন। তিনিও কাঁদতে শুরু করলেন।

আমি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম। যা জানলাম তা হচ্ছে— মনসুর হলো গৌরীপুর পোস্টমাস্টার সাহেবের ছোট ভাই। ঢাকায় থাকতো। মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে তার সঙ্গে ভূতের বাচ্চা আছে। তাকে ঢাকা থেকে এনে গৌরীপুরে অলাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়েছে। তারপরেও মাঝে মাঝে তালা খুলে বের হয়ে পড়ে। আজ যেমন বের হয়েছে।

টানাটানি করে মনসুরকে নামানো হয়েছে। গার্ড বাতি দেখিয়েছে। ট্রেন চলতে শুরু করেছে। মনসুর সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে দুঃখিত ভঙ্গিতে হাসলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, ‘আমি সত্যি কথাই বলছি। কিন্তু কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। কেউ না।’

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। মনসুরকে দু’দিক থেকে দু’জন ধরে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।



মোবারক হোসেনের মহাবিপদ

ছেলেটা বড় যন্ত্রণা করছে।

মোবারক হোসেন হুংকার দিলেন, ‘এঁ্যাও।’

এটা তাঁর বিশেষ ধরনের হুংকার। বাচ্চারা খুব ভয় পায়। শব্দটা বেড়ালের ডাকের কাছাকাছি, আবার ঠিক বেড়ালের ডাকও নয়, বাচ্চাদের ভয় পাবারই কথা।

তবে এই বাচ্চা ভয় পাচ্ছে না। আগের মতোই লাফলাফি করছে। মনে হচ্ছে তাঁর ধমক শুনতে পায়নি। এ যুগের টিভি-ভিসিআর দেখা বাচ্চা, এরা সহজে ভয় পায় না।

গত মাসে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলেন। সময় কাটে না। এইজন্যেই যাওয়া, অন্য কিছু না। সন্তর বছরের বুড়োরা চিড়িয়াখানায় যায় না। খানিকক্ষণ বাদরের লাফঝাঁপ দেখে গেলেন বাঘের খাঁচার সামনে। আলিশান এক রয়েল বেঙ্গল। দেখে যে-কোনো মানুষের পিলে চমক যাবার কথা। আশ্চর্য কাণ্ড! ছোট বাচ্চাকাচ্চারা কেউ ভয় পাচ্ছে না। একটা আবার কান্না শুরু করে দিয়েছে, সে বাঘের লেজ ধরতে চায়। বাবা-মা শত চেষ্টাতেও কান্না সামলাতে পারছেন না। মিষ্টি মিষ্টি করে মা বুঝাবার চেষ্টা করছে।

‘বাঘমামার লেজে হাত দিতে নেই। বাঘমামা রাগ করবে।’

‘হাত দেব। হাত দেব। উঁ উঁ।’

মোবারক হোসেন সাহেব সন্তর বছর বয়সে একটা জিনিস বুঝে গেছেন— এ যুগের ছেলেমেয়ে বড়ই ত্যাঁদর। এরা ভূতের গল্প শুনলে হাসে। রাক্ষসের গল্প শুনলে হাসে। এরা ধমকেও পোষ মানে না। আদরেও পোষ মানে না।

এই যে ছেলেটা তখন থেকে তাঁকে বিরক্ত করছে একে ধমক-ধামক দিয়ে কিছু হবে বলে মনে হয় না। মুখ দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে লাফ-ঝাঁপ দিয়েই যাচ্ছে। তিনি পার্কে এসেছেন বিশ্রামের জন্যে। শীতকালের রোদে পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে থাকতে বড় ভালো লাগে। শীতকালে পার্কে বিশ্রামের নিয়ম হলো, শরীরটা থাকবে রোদে, মাথাটা থাকবে ছায়ায়। ঘুম ঘুম তন্দ্রা অবস্থায় কিছুক্ষণ গা এলিয়ে পড়ে থাকা।

তাঁর যে বাড়িতে জায়গা নেই তা না। নিজের দোতলা বাড়ি আছে

মগবাজারে কিন্তু সেই বাড়ি হলো মাছের বাজার। দিনরাত কাঁ্যাও কাঁ্যাও ঘ্যাঁও ঘ্যাঁও হচ্ছেই। একদল শুনছে ওয়ার্ল্ড মিউজিক। একদল দেখছে জিটিভি। এখন আবার বড় মেয়ে এসেছে তার আগুবাচ্চা নিয়ে। দু'টা ছেলেমেয়ে কিন্তু অসীম তাদের ক্ষমতা। দেড়শ' ছেলেমেয়ে যতটা হইচই করতে পারে, এই দু'জন মাশাআল্লাহ তার চেয়ে বেশি পারে। আর কী তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা! এক ভাই খাটের ওপর চেয়ার বসিয়ে তার ওপর মোড়া দিয়ে অনেক কষ্টে তার ওপর উঠে সিলিং ফ্যান ধরে ঝুলে পড়েছে, অন্য ভাই ফুল স্পিডে ফ্যান ছেড়ে দিয়েছে। এটা নাকি একটা খেলা। এই খেলার নাম, 'হেলিকপ্টার খেলা'। যে বাড়িতে হেলিকপ্টার খেলা হচ্ছে সবচেয়ে কম বিপজ্জনক খেলা সে বাড়িতে দুপুরে বিশ্রাম নেয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তিনি ক'দিন ধরেই পার্কের বেঞ্চিতে এসে কাত হচ্ছেন। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এখানেও বিশ্রাম নেয়া যাবে না। এই পিচকা বড়ই যন্ত্রণা করছে!

মোবারক হোসেন সাহেব উঠে বসলেন। কঠিন গলায় ডাকলেন, 'এই পিচকা, এদিকে শুনে যা।'

ছেলেটা চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে। তুই করে বলায় রাগ করেছে বলে মনে হয়। একালের ছেলেপুলের আত্মসম্মান জ্ঞান আবার টনটনে। তুই বলে পার পাবার উপায় নেই। কাঁ্যাও করে ওঠার কথা।

ছেলেটা নরম গলায় বলল, 'আপনি কি আমাকে ডাকছেন?'

'হুঁ।'

সে এগিয়ে এলো। বেঞ্চিতে তাঁর পাশে বসল। বাহ, স্মার্ট ছেলে তো! এ যুগের ছেলেদের একটা গুণ আছে। এরা স্মার্ট। মোবারক হোসেন সাহেব লক্ষ করলেন ছেলের চেহারাও খুব সুন্দর। দুধে-আলতায় রঙ বলতে যা বোঝায়, তা-ই। কোঁকড়ানো চুল। বড় বড় চোখ। চোখে মা বোধহয় কাজল দিয়েছে। সুন্দর লাগছে। এ-রকম সুন্দর একটা ছেলেকে তুই বলা যায় না। মোবারক হোসেন ঠিক করলেন তুমি করেই বলবেন। প্রথম খানিকক্ষণ ছোটখাটো দু'-একটা প্রশ্ন-ট প্রশ্ন করে শেষটায় কড়া করে বলবে, দুপুরবেলায় পার্কে ঘোরাঘুরি করছ কেন? বাসায় যাও। বাসায় গিয়ে হোমটাস্ক কর। কিংবা মা'র পাশে শুয়ে ঘুমাও। এখন খেলার সময় না। খেলতে হয় বিকেলে।

ছেলেটা পা দুলাতে দুলাতে বলল, 'আমাকে কী জন্যে ডেকেছেন?'

'তোমার নাম কী?'

'আমার নাম হলো শীশী'

'শীশী।'

মোবারক হোসেন সাহেবের মুখটা তেতো হয়ে গেল। আজকালকার বাবা-মা'রা ছেলেমেয়েদের নাম রাখার ব্যাপারে যা শুরু করেছে কহতব্য নয়। 'শীশী'

কোনো নাম হলো? আধুনিক নাম রাখতে হবে, আনকমন নাম রাখতে হবে। এমন নাম যে নামের দ্বিতীয় কোনো বাচ্চা নেই। কাজেই শীশী ফীফী।

মোবারক হোসেন সাহেব বললেন, ‘কে রেখেছে এই নাম? তোমার মা?’

‘জি না, আমার বাবা।’

মোবারক হোসেন সাহেব এই আশঙ্কাই করেছিলেন। উদ্ভট নাম রাখার ব্যাপারে মা’দের চেয়ে বাবাদের আগ্রহই বেশি। অন্যদের দোষ দিয়ে কি হবে, তাঁর নিজের বাড়িতেই এই অবস্থা। তাঁর মেজ মেয়ের ছেলে হয়েছে। নাম রেখেছে ‘নু’। তিনি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এটা কী রকম নাম?’

মেয়ে বলল, ‘ছেলের বাবা শখ করে রেখেছে।’

‘এর অর্থ কী?’

‘অর্থ আমি জানি না বাবা। তুমি তোমার জামাইকে জিজ্ঞেস কর।’

তিনি ঠিকই জিজ্ঞেস করলেন। কঠিন গলায় জানতে চাইলেন, ‘তুমি এই নামটা আমাকে ব্যাখ্যা কর। কী ভেবে তুমি এই নাম রাখলে?’

তাঁর মেয়ে-জামাই খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, ‘ন হচ্ছে একটা কোমল বর্ণ। সেই কোমল বর্ণ ব্যবহার করে এক বর্ণের একটা নাম রেখেছি নু। সবাই দু’ অক্ষরের তিন অক্ষরের নাম রাখে। আমার ভালো লাগে না। নু নামটা আপনার কাছে ভালো লাগছে না?’

তিনি কোনো উত্তর দিলেন না, তবে মনে-মনে বললেন, ‘ন’ ছাড়াও তো আরো সুন্দর সুন্দর বর্ণ আছে। ‘গ’ তো সুন্দর বর্ণ। গ দিয়ে গু রেখে ফেললে আরো ভালো হতো। মানুষের নাম হিসেবে খুব আনকমন হতো। এর আগে এই নাম কেউ রাখেনি। তবে মুখে কিছু বললেন না। এমনিতেই জামাইরা তাঁকে পছন্দ করে না। কী দরকার!

শীশী তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। এখনো তার পা দুলছে। মনে হয় স্থির হয়ে বসতে পারে না। এখনই একে একটা কড়া ধমক দেবেন কিনা মোবারক হোসেন সাহেব বুঝতে পারছেন না। ধমক খেয়ে কেঁদে ফেলবে কিনা কে জানে। কাঁদলে সমস্যা হবে।

ছেলেটা বলল, ‘আপনি আমার সঙ্গে খেলবেন?’

মোবারক হোসেন ছেলের স্মার্ট ভঙ্গি দেখে মুগ্ধ হলেন।

‘আমার সঙ্গে খেলতে চাও?’

‘হুঁ।’

‘কী খেলা?’

‘আপনি যে খেলা জানেন সেই খেলাই খেলব। আপনি কোন কোন খেলা জানেন।’

‘আমি অনেক খেলাই জানি, যেমন ধর হেলিকপ্টার খেলা...’

‘মজার খেলা?’

‘মনে হয় বেশ মজার। আমি সিলিং ফ্যান ধরে ঝুলে পড়ব, আর তুমি ফুল স্পিণ্ডে ফ্যান ছেড়ে দেবে।’

ছেলেটা মহাউৎসাহের সঙ্গে বলল, ‘আসুন খেলি।’

‘এখানে সিলিং ফ্যান নেই, এই খেলা খেলা যাবে না।’

ছেলেটা হতাশ গলায় বলল, ‘আর কী খেলা জানেন?’

‘প্যারাসুট খেলা বলে একটা খেলা আছে। আমার দুই নাতি একবার খেলেছে। এটাও মন্দ না। এই খেলাতে একটা খোলা ছাতার হাতল ধরে গ্যারাজের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামতে হয়।’

‘খুব মজার খেলা?’

‘মোটামুটি মজার তবে সামান্য সমস্যা আছে। হাত-পা ভেঙে হাসপাতালে কিছুদিন থাকতে হয়। বড় নাতিটা প্রায় এক মাসের মতো ছিল।’

ছেলেটা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। মোবারক হোসেন সাহেবের একটু মায়া হলো। বাচ্চা মানুষ খেলতে চাচ্ছে, খেলার বন্ধ পাচ্ছে না।

‘শোন খোকা! বিকেলে আসবে, তখন বাচ্চাকাচ্চার থাকবে, ওদের সঙ্গে খেলবে। দুপুরবেলা খেলার সময় না।’

‘দুপুরবেলা কীসের সময়?’

‘দুপুর হচ্ছে হোম ওয়ার্ক করার সময়, কিংবা মা’র পাশে শুয়ে ঘুমুবার সময়।’

ছেলেটা গম্ভীর হয়ে অবিকল বড়দের মতো বলল, ‘ও আচ্ছা, আমি জানতাম না। আমি তো মানুষের ছেলে না, আমি হচ্ছে পরীদের ছেলে। এইজন্যে মানুষের নিয়মকানুন জানি না।’

‘তুমি পরীদের ছেলে?’

‘জি।’

মোবারক হোসেন এই ছেলের বানিয়ে কথা বলার ক্ষমতায় চমৎকৃত হলেন। এ ছেলে বড় হলে নির্ঘাৎ কোনো রাজনৈতিক দলের লিডার হবে। দিব্যি বলে যাচ্ছে— আমি মানুষের ছেলে না, আমি হচ্ছে পরীদের ছেলে। ফাজিলের ফাজিল।

‘তুমি যখন পরীদের ছেলে তখন নিশ্চয়ই উড়তে পার।’

‘জি পারি।’

‘পাখা তো দেখছি না। পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে রেখে এসেছ বোধহয়।’

‘মা’র কাছে রেখে এসেছি।’

‘মা’র কাছে রেখে আসাই ভালো। তুমি বাচ্চা মানুষ, হারিয়ে ফেলতে পার। কিংবা ময়লা করে ফেলতে পার। তুমি থাক কোথায়? পরীর দেশে?’

ছেলে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। বানিয়ে বানিয়ে কথা যে বলে যাচ্ছে তার জন্যে তার মধ্যে কোনো রকম বিকার দেখা যাচ্ছে না। মোবারক হোসেনের

ইচ্ছা করছে মিথ্যা কথা বলার জন্যে ঠাস করে এর গালে একটা চড় বসিয়ে দিতে।

‘তোমার পায়ের জুতা তো মনে হচ্ছে বাটা কোম্পানির। পরীর দেশেও তাহলে বাটা কোম্পানি দোকান খুলেছে?’

‘জুতা আমার মা এখান থেকে কিনে দিয়েছে। পরীর দেশের ছেলেমেয়েরা জুতা পরে না। তারা তো আকাশে আকাশেই ওড়ে, তাদের জুতা পরতে হয় না।’

মোবারক হোসেন সাহেব ছেলের বুদ্ধি দেখে অবাক হলেন। সুন্দর করে নিজেকে কাটান দিয়ে যাচ্ছে। এই ছেলে রাজনৈতিক দলের নেতা হবে না, নেতাদের এত বুদ্ধি থাকে না।

‘তুমি তাহলে পরীদের ছেলে, এখানে বেড়াতে এসেছ?’

‘মানুষের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে এসেছি। ওরা কত সুন্দর সুন্দর খেলা জানে।’

‘তুমি তাহলে প্রথম পরীর বাচ্চা যে মানুষের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে এসেছে।’

‘না তো, আমরা সব সময় আসি।’

‘সব সময় আস?’

‘জি। ওদের সঙ্গে খেলি তারপর চলে যাই। ওরা বুঝতে পারে না।’

‘তাই নাকি?’

‘জি। যখনই দেখবেন একদল ছেলেমেয়ে খেলছে তখনই জানবেন ওদের মধ্যে অতি অবশ্যই দু’-একজন পরীর ছেলেমেয়ে আছে।’

‘পাখা ছাড়া আস কী করে?’

‘আমাদের উড়তে পাখা লাগে না। পাখাটা হচ্ছে আমাদের এক ধরনের পোশাক। জন্মদিনে আমরা নতুন পাখা পাই। আবার দুটুমি করলে মা’রা আমাদের পাখা নিয়ে নেন। আমার ক’টা পাখা আছে জানেন? সব মিলিয়ে সাতটা—সেভেন।’

‘তুমি ইংরেজিও জানো? পরীর দেশে ইংরেজি চালু আছে?’

‘আপনি আমার সঙ্গে এমন রোগে রোগে কথা বলছেন কেন?’

মোবারক হোসেন সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, ‘দেখ খোকা—কী যেন নাম তোমার?’

‘শীশী।’

‘দেখ শীশী। তোমার কথা শুনে রাগে আমার শরীর রি রি করছে। এই বয়সে তুমি যে মিথ্যা শিখেছ...’

‘আপনার ধারণা আমি মিথ্যা কথা বলছি?’

‘অবশ্যই মিথ্যা কথা বলছ। এই মিথ্যা বলার জন্যে তোমাকে কানে ধরে উঠবস করানো দরকার।’

‘বাহ্ আপনাদের মিথ্যা বলার শাস্তিটা তো খুব মজার!’

‘কানে ধরে উঠবস তোমার কাছে মজা মনে হলো?’

‘অবশ্যই মজার। আমরা মিথ্যা বললে কী শাস্তি হয় জানেন? আমরা মিথ্যা বললে আমাদের পাখায় কালো দাগ দিয়ে দেয়া হয়। যে যত মিথ্যা বলে তার পাখায় ততই কালো দাগ পড়ে।’

মোবারক হোসেন এই ছেলের গুছিয়ে কথা বলার ক্ষমতায় আরো মুগ্ধ হলেন। ছেলেটা পড়াশোনায় কেমন কে জানে। ভালো হওয়া তো উচিত।

‘শোন খোকা— তোমার রোল নাম্বার কত?’

‘রোল নাম্বার মানে কী?’

‘ক্লাসে যে পড় তোমার রোল কত?’

‘আমি ক্লাসে যাই না তো। পরীর বাচ্চাদের স্কুলে যেতে হয় না। আমাদের যা শেখার আকাশে উড়তে উড়তে বাবামা’র কাছ থেকে শিখি...।’

‘আমি অনেক মিথ্যুক দেখেছি, তোমার মতো দেখিনি। এই দেশের যেকোনো রাজনৈতিক নেতাকে তুমি মিথ্যা বলায় হারিয়ে দিতে পারবে।’

‘আমি মিথ্যা বলছি না তো। এই দেখুন আমি উড়ছি...’

বলতে বলতে ছেলে তিন-চার ফুট উপরে উঠে গেল। শূন্যে কয়েক বার ঘুরপাক খেল। আবার নেমে এলো নিজের জায়গায়। হাসিমুখে বলল, ‘দেখেছেন?’

মোবারক হোসেন কিছু বললেন না। তিনি দ্রুত মনে করতে চেষ্টা করলেন, সকালে কী নাশতা খেয়েছেন। অনেক সময় বদহজম হলে মানুষের দৃষ্টি বিভ্রম হয়।

‘আমার কথা কি আপনার বিশ্বাস হচ্ছে?’

মোবারক হোসেন সাহেব এবারও জবাব দিলেন না। তার কপাল ঘামছে। পানির পিপাসা পেয়ে গেছে। শীশী বলল, ‘আপনার সঙ্গে তো খেলা হলো না, আরেক দিন এসে খেলব। আজ যাই।’

মোবারক হোসেন সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, ‘যাবে কীভাবে? উড়ে চলে যাবে?’

‘হুঁ।’

তিনি হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। তাঁর হতভম্ব চোখের সামনে দিয়ে ছেলে উড়ে চলে গেল।

বাসায় ফিরতেই তাঁর দেখা হলো বড় মেয়ের সঙ্গে। তিনি তাকে পুরো ঘটনা বললেন। বড় মেয়ে বলল, ‘বাবা, তুমি বিছানায় শুয়ে থাক। আমি আসছি। তোমার মাথায় পানি ঢালব।’

‘কেন?’

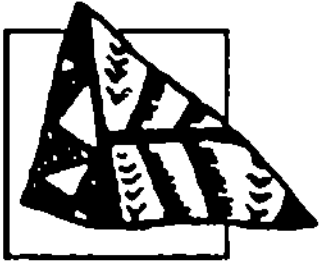
‘রৌদে ঘুরে ঘুরে তোমার মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে, এইজন্যে।’

‘তুই আমার কথা বিশ্বাস করছিস না?’

‘ওমা! কে বলল বিশ্বাস করছি না? করছি তো।’

রাতের মধ্যে সবাই জেনে গেল মোবারক হোসেন সাহেবের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আত্মীয়স্বজনে বাড়ি ভরে গেল। ডাক্তার এলেন, সাইকিয়াট্রিস্ট এলেন। হুলস্থূল ব্যাপার।

মোবারক হোসেন সাহেবের চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসায় তেমন উন্নতি হচ্ছে না। তিনি এখনো বিশ্বাস করেন ঐদিন এক পরীর ছেলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। দুপুর হলেই তিনি পার্কে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠেন। মাঝে মাঝে চিৎকার-চৈচামেচিও করেন। তাঁকে যেতে দেয়া হয় না। ছোট্ট একটা ঘরে তাঁকে সব সময়ই তালাবদ্ধ করে রাখা হয়।



একটি ভয়ঙ্কর অভিযানের গল্প

চৈত্র মাসের সন্ধ্যা।

সারা দিন অসহ্য গরম গিয়েছে, এখন একটু বাতাস ছেড়েছে। গরম কমেছে। আকাশে মেঘের আনাগোনা। কে জানে হয়তোবা বৃষ্টিও নামবে। অনেক দিন বৃষ্টি হচ্ছে না। এখন হওয়া উচিত।

মশাদের জন্যে এর চেয়ে আনন্দজনক আবহাওয়া আর হতে পারে না। অল্প-স্বল্প বৃষ্টি হবে। খানাখন্দে খানিকটা পানি জমবে। সেই পানিতে ডিম পাড়া হবে। ডিম থেকে তৈরি হবে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা। পিন পিন করে গান গাইতে গাইতে তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

এ-রকম এক সন্ধ্যায় এক মা-মশা তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে ডাকলেন। তাঁর তিন মেয়ে এক ছেলে। মেয়েদের নাম যথাক্রমে— পিঁ, পিঁপিঁ এবং পিঁপিঁপিঁ। ছেলেটার নাম টে।

মা-মশা বললেন, ‘আদরের সোনামণিরা, তোমরা লাইন বেঁধে আমার সামনে দাঁড়াও। তোমাদের সঙ্গে কথা আছে।’

পিঁ বলল, ‘মা এখন তো আমরা খেলছি। এখন কোনো কথা শুনতে পারব না।’

মা-মশা বিরক্ত গলায় বললেন, ‘বেয়াদবি করবে না মা। বড়রা যখন কিছু বলেন তখন শুনতে হয়। সবাই আস।’

মশার ছেলেমেয়েরা মা’কে ঘিরে দাঁড়াল। শুধু পিঁর মন একটু খারাপ। খেলা ছেড়ে উঠে আসতে তার ভালো লাগে না। সে যখন খেলতে বসে তখনই শুধু মা’র জরুরি কথা মনে হয় কেন কে জানে।

মা-মশা বললেন, ‘আমার সোনামণিরা, আজ তোমাদের জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন। আজ তোমাদের নিয়ে আমি এক অভিযানে বের হব।’

টে বলল, ‘কী অভিযান মা?’

‘রক্ত খাবার অভিযান। আজ আমরা মানুষের রক্ত খেতে যাব। কী করে রক্ত খেতে হয় শেখাব।’

টে আনন্দে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, ‘মা, আমি কিন্তু সবার আগে রক্ত খাব।’

মা-মশা বিরক্ত মুখে বললেন, ‘বোকার মতো কথা বলবে না টে। তুমি হলে ছেলে-মশা। ছেলে-মশারা কখনো রক্ত খায় না। মেয়ে-মশারা খায়। তোমার বোনরা রক্ত খাবে— তুমি তাদের সাহায্য করবে।’

টে মুখ কালো করে বলল, ‘ওরা সবাই খাবে। আর আমি বুঝি বসে বসে দেখব। আমি রক্ত খেলে অসুবিধা কী?’

‘অসুবিধা আছে। মেয়ে-মশাদের পেটে ডিম আসে। সেই ডিমের পুষ্টির জন্যে মানুষের রক্ত দরকার। ছেলে-মশাদের পেটে তো আর ডিম আসে না— ওদের সেই জন্যেই রক্ত খেতে হয় না।’

টে রাগী গলায় বলল, ‘আমার পেটে ডিম আসুক আর না আসুক, আমি খাবই।’

‘খাবে কীভাবে? রক্ত খাবার জন্যে যে গুঁড় দরকার— সেটাই তো ছেলে মশাদের নেই।’

টে বলল, ‘আমি যদি নাই খেতে পারলাম— তাহলে শুধু শুধু তোমাদের সঙ্গে কেন যাব?’

‘আমাদের সাহায্য করার জন্যে যাবে। মানুষের রক্ত খাওয়া তো কোনো সহজ ব্যাপার না। কঠিন ব্যাপার। ভয়ঙ্কর কঠিন।’

মশা-মা’র সবচেয়ে ছোট মেয়ে পিঁপিঁপিঁ একটু বোকা ধরনের। সে অবাক হয়ে বলল, ‘রক্ত খাওয়া কঠিন কেন হবে মা? আমরা যাব, চুমুক দিয়ে ভরপেট রক্ত খেয়ে চলে আসব।’

‘মা, তুমি সব সময় বোকার মতো কথা বলো। তুমি বড় হচ্ছ কিন্তু তোমার বুদ্ধি বড় হচ্ছে না। এটা খুব দুঃখের কথা! তুমি যেভাবে কথা বলছ তাতে মনে হয় মানুষরা বাটিতে করে তোমার জন্যে রক্ত সাজিয়ে রেখেছে। ব্যাপার মোটেই

তা না। মানুষের রক্ত খাওয়া ভয়ঙ্কর কঠিন ব্যাপার। জীবন হাতে নিয়ে যেতে হয়।’

‘জীবন হাতে নিয়ে যেতে হবে কেন মা?’

‘তোমরা তাদের রক্ত খাবে আর তারা তোমাদের ছেড়ে দেবে? কক্ষনো না। মানুষের বুদ্ধি তো সহজ বুদ্ধি না, জটিল বুদ্ধি।’

টে বলল, ‘মা, ওদের বুদ্ধি কি আমাদের চেয়েও বেশি?’

‘না রে বাবা। আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি কী করে হবে? ওরা যেমন মোটা। ওদের বুদ্ধিও মোটা। আমরা যেমন সরু আমাদের বুদ্ধিও সরু। আমাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ওরা যা করে তা দেখে হাসি পায়।’

‘কী করে মা?’

‘দরজা-জানালায় নেট লাগায়। শক্ত তারের নেট। কিন্তু ওরা জানে না যে যখন দরজা খোলা হয় তখন আমরা হুড় হুড় করে ঢুকে পড়ি। তা ছাড়া নেটের ফুটা দিয়েও সহজে ঢোকা যায়। পাখা গুটিয়ে টুপ করে ঢুকে যেতে হয়। তাদের শিখিয়ে দেব। ওটা কোনো ব্যাপারই না।’

মেজ মেয়ে পিঁপিঁ বলল, ‘ওরা আর কি বোকামি করে মা?’

‘ওদের কাজকর্মের সবটাই বোকামিতে ভরা। মশারি বলে ওরা একটা জিনিস খাটায়—জালের মতো। ছোট ছোট ফুটা। ওদের ধারণা ও তো সেই ফুটা দিয়ে আমরা ঢুকতে পারব না। হি হি হি।’

‘আমরা কি ঢুকতে পারি?’

‘অবশ্যই পারি। ওরা ঘুমিয়ে পড়লে আমরা করি কি, কয়েক জন মিলে ফুটা বড় করে ভেতরে ঢুকি। রক্ত টুক খেয়ে ঐ ফুটা দিয়ে বের হয়ে চলে আসি। ওরা ভাবে, আমাদের হাত থেকে খুব বাঁচা বেঁচেছে।’

‘আসলে বাঁচতে পারে না, তাই না মা?’

‘হুঁ। এখন তোমরা সবাই তৈরি হয়ে নাও— আমার সঙ্গে যাবে এবং মানুষদের কামড়ানোর সাধারণ নিয়মকানুন শিখবে।’

‘এটার আবার নিয়মকানুন কী?’

‘কঠিন কঠিন নিয়ম আছে সোনামণিরা। নিয়ম না মানলে অবধারিত মৃত্যু। তোমাদের বাবা তো নিয়ম না মানার জন্যেই মারা গেল। শুনবে সেই গল্প?’

পিঁ বলল, ‘না শুনব না। বাবার মৃত্যুর গল্প শুনতে ভালো লাগবে না। মন খারাপ হবে।’

‘মন খারাপ হলেও তোমাদের শোনা দরকার। এর মধ্যে শেখার ব্যাপারও আছে। পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখময় ঘটনা থেকেই শিক্ষা নেয়া যায়।’

‘ঠিক আছে মা বলো আমরা শুনছি।’

‘তোমাদের তখনও জন্ম হয়নি। আমার সবেমাত্র তোমাদের বাবার সঙ্গে

বিয়ে হয়েছে। তোমাদের বাবা আমাকে বলল— চলো মানুষের রক্ত খাবে। আমার যেতে ইচ্ছা করছিল না। তবু তার উৎসাহ দেখে গেলাম। তোমাদের বাবা বলল— তুমি নির্ভয়ে রক্ত খাবে, আর আমি লোকটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখব। সে আমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তোমাকে দেখতেই পাবে না। আমি তোমাদের বাবার কথামতো একটা মানুষের রক্ত খেতে শুরু করেছি। তোমাদের বাবা তাকে ব্যস্ত রাখার জন্যে তার চোখের সামনে খুব নাচানাচি করছে। একবার এদিকে যায়, একবার ওদিকে যায়। মাঝে মাঝে কানের কাছে গিয়ে গান গায়—

তিন তিন তিন
পিন পিন পিন।’

‘বাহ্ বাবার তো খুব সাহস!’

‘হ্যাঁ তার সাহস ছিল। কিন্তু এইসব হলো বোকামি সাহস। বাহাদুরি দেখানোর সাহস। মশাদের যেসব নিয়মকানুন আছে তার মধ্যে প্রথম নিয়ম হলো— বাহাদুরি করবে না। বাহাদুরি করেছে কি মরেছে।’

‘দ্বিতীয় নিয়ম— লোভী হয়ো না। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। সাধু-সন্ন্যাসীর মতো নির্লোভ হতে হবে।’

‘কীভাবে হবে মা?’

‘রক্ত যখন খাওয়া শুরু করবে তখন লোভীর মতো খাবে না। যতটুকু তোমার প্রয়োজন তার চেয়ে এক কিছুও বেশি খাবে না। বেশি খেয়েছ কি মরেছে। শরীর ভারি হয়ে যাবে। উঠতে পারবে না। রক্ত খেয়ে ঐ জায়গাতেই বসে থাকতে হবে। তখন যাব রক্ত খেয়েছ সে চড় দিয়ে মেরে ফেলবে।’

‘পিঁপিঁ আঁতকে উঠে বলল, ‘কী ভয়ঙ্কর!’

মা-মশা বললেন, এই ব্যাপারটা সবাইকে প্রথমেই শেখানো হয়। তারপরেও অনেকের মনে থাকে না। লোভীর মতো রক্ত খেতে শুরু করে। ফল হলো মৃত্যু।

সবচেয়ে ছোট মেয়ে পিঁপিঁপিঁ বলল, ‘আমি কখনো লোভীর মতো রক্ত খাব না। অল্প একটু খেয়েই উড়ে চলে আসব। শুধু ঠোট ভেজাব।’

‘সবাই এই কথা বলে কিন্তু কাজের সময় আর কারোর কিছু মনে থাকে না।’

‘রক্ত খেতে কি খুব মজা মা?’

‘অসম্ভব মজা। একবার খাওয়া শুরু করলে ইচ্ছা করে খেতেই থাকি, খেতেই থাকি, খেতেই থাকি।’

‘মা, আমার খুব খেতে ইচ্ছা করছে।’

‘চল যাওয়া যাক। শুধু একটা কথা তোমরা মনে রাখবে— আমরা কিন্তু বেড়াতে যাচ্ছি না, আমরা যাচ্ছি এক ভয়ঙ্কর অভিযানে। আমাদের যেতে হবে খুব সাবধানে।’

মা-মশা তার চার পুত্র-কন্যা নিয়ে এলিফ্যান্ট পার্ক এপার্টমেন্টের আট তলায় শীলাদের বাসায় এসে উপস্থিত হলো। শীলারা তিন বোন তখন টিভি দেখছে। তাদের ছোট ভাইটা খাটে ঘুমুচ্ছে। শীলার বাবা চেয়ারে বসে কী যেন লিখছেন। শীলার মা ছোট বাবুর পাশে বসে গল্পের বই পড়ছেন।

পিঁ ফিসফিস করে বলল, ‘মা, আমরা কাকে কামড়াব? বড় মেয়েটাকে কামড়াব মা? ও দেখতে সবচেয়ে সুন্দর।’

মা-মশা বললেন, ‘প্রথমেই কামড়াবার কথা ভাববে না। প্রথমে পরিস্থিতি দেখে অবস্থা বিবেচনা করবে।’

‘পরিস্থিতি কীভাবে দেখব? ওদের কাছ থেকে ঘুরে আসব?’

‘অসম্ভব। ওদের কাছে গিয়ে ভনভন করলেই ওরা সজাগ হয়ে যাবে। ওরা বুঝবে যে ঘরে মশা আছে। বলা যায় না মশার ওষুধও দিয়ে বসতে পারে। ওদের কিছুতেই জানতে দেয়া যাবে না যে আমরা আছি।’

পিঁ বলল, ‘আমি কাকে কামড়াব তা তো তুমি এখনো বললে না। তিন বোনের কোন বোনটাকে কামড়াব?’

‘ওদের কাউকেই কামড়ানো যাবে না। দেখছ না ওরা জেগে আছে, টিভি দেখছে? টিভির প্রোগ্রামও বাজে। কেউ মন দিয়ে দেখছে না। ওদের কামড়ালেই ওরা টের পেয়ে যাবে। সবচেয়ে ভালো ঘুমন্ত কামড়কে কামড়ানো।’

বড় মেয়ে বলল, ‘মা, ওদের ছোট ভাইটা ঘুমুচ্ছে। ওকে কামড় দিয়ে আসি?’

মা-মশা গম্ভীর গলায় বললেন, ‘ভুলেও এই কাজ করবে না। বাচ্চার মা পাশে বসে আছে— বাচ্চাকে কামড়ালেই মা টের পাবে। মা’য়েরা কিভাবে কিভাবে যেন টের পেয়ে যায়। একটা কথা খেয়াল রেখো, মা পাশে থাকলে ছোট শিশুর গায়ে কখনো বসবে না।’

‘মা’কে কামড়ে আসি মা?’

‘হ্যাঁ, তা পারা যায়। মা বই পড়ছেন— খুব মন দিয়ে পড়ছেন। তাঁর এক হাতে বই, কাজেই এই হাতটা আটকা আছে। অন্য হাতটা খালি। এমন জায়গায় বসতে হবে যেন খালি হাত সেখানে পৌঁছতে না পারে। আমাদের আদরের বড় মেয়ে পিঁ তুমি যাও— ঐ মা’র রক্ত খেয়ে আস। খুব সাবধান। লোভী হবে না। মনে থাকবে?’

‘মনে থাকবে মা।’

‘কোথায় বসবে বলে ঠিক করেছ?’

‘তার বাঁ হাতে।’

‘ভালো, খুব ভালো চিন্তা। শীলার মা’র ডান হাতে বই ধরা আছে। এই হাতে সে তোমাকে মারতে পারবে না। বাঁ হাত দিয়ে তো আর বাঁ হাতের মশা

মারতে পারবে না। আমার ধারণা, কোনো রকম সমস্যা ছাড়াই তুমি রক্ত খেয়ে চলে আসতে পারবে। যাও মা...

বড় মেয়ে পিঁ উড়ে গেল এবং রক্ত খেয়ে চলে এলো। শীলার মা কিছু বুঝতেও পারলেন না। একসময় শুধু বিরক্ত হয়ে হাত ঝাঁকালেন।

মা-মশা বললেন, 'আমার বুদ্ধিমতী বড় মেয়ে কী সুন্দর রক্ত খেয়ে চলে এসেছে! কিছু বুঝতেও পারেনি। এবার মেজ মেয়ের পালা...'

মা-মশা কথা শেষ করবার আগেই পিঁপিঁ উড়ে গেল। তার আর তর সইছিল না। সে শীলার মা'কে দু'বার চক্কর দিয়ে বসল তাঁর ঘাড়ে। এবার শীলার মা টের পেলেন। মশা মারার জন্যে বাঁ হাত উঁচু করলেন— মশা এমন জায়গায় বসেছে যে বাঁ হাত সেখানে পৌঁছে না। কাজেই মেজ মেয়ে পিঁপিঁও নিবিঁয়ে রক্ত খেয়ে চলে এলো।

মা-মশা বললেন, 'তোমার কাজেও আমি খুশি, তবে তুমি দু'টা চক্কর দিলে কেন? এটা উচিত হয়নি। শুধু গায়ে বসলেই যে মানুষ মশা মারে তা না— আশপাশে উড়তে দেখলেও মেরে ফেলে। তুমি বাহাদুরি করতে গিয়েছ। বাহাদুরি করাও নিষেধ। ভবিষ্যতে আরো সারিধান হবে। এবার সবচেয়ে ছোটজনের পালা...'

বলতে না বলতেই পিঁপিঁপিঁ উড়তে শুরু করল। মা-মশা চিৎকার করে ডাকলেন, 'ফিরে এসো, ফিরে এসো।'

'পিঁপিঁপিঁ ফিরে এলো। মা-মশা বললেন, 'তুমিও কি ঐ শীলার মা'কে কামড়াতে যাচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'এত বড় বোকামি কি করতে আছে? এর আগে দু'জন তার রক্ত খেয়ে গেছে। এখন সে অনেক সাবধানী। তার কাছে যাওয়াই ঠিক হবে না।'

'তাহলে কি শীলার বাবার রক্ত খাব মা?'

'হ্যাঁ, তা খাওয়া যেতে পারে। উনি গভীর মনোযোগে লেখালেখি করছেন। তাঁর গা থেকে এক চুমুক রক্ত খেলে উনি বুঝতেও পারবেন না।'

'উনি কী লিখছেন মা?'

'মনে হয় গল্প লিখছেন।'

'সুন্দর গল্প?'

'সুন্দর গল্প না পচা গল্প তা তো জানি না— এখন মা, তুমি মন দিয়ে শোনো আমি কী বলছি— তুমি উনার হাতে বসবে। বসেই রোমকূপ খুঁজে বের করবে। যেখানে-সেখানে সুচ ফুটিয়ে দেবে না। সুচ ভেঙে যেতে পারে। সুচ ভাঙলে তীব্র ব্যথা হয়। মনে থাকবে?'

'হ্যাঁ মা, মনে থাকবে।'

‘মানুষের শরীরে দু’ধরনের রক্ত আছে— শিরার রক্ত । এই রক্ত কালো, স্বাদ নেই । আর হলো ধমনির পরিষ্কার ঝকঝকে রক্ত । খুব স্বাদ । ধমনির রক্ত খাবে । মনে থাকবে?’

‘হ্যাঁ থাকবে ।’

‘লোভীর মতো রক্ত খাবে না । মনে রাখবে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ।’

‘মা, আমার মনে থাকবে ।’

‘তুমি তো একটু বোকা— এইজন্যেই তোমাকে নিয়ে আমার ভয় ।’

‘মা, একটুও ভয় পেও না । দেখ না আমি যাব আর চলে আসব । মা যাই?’

মা-মশা চিন্তিত মুখে বললেন, ‘আচ্ছা যাও ।’

পিঁপিঁপিঁ শীলার বাবার হাতে বসেছে । রোমকূপ খুঁজে বের করে তার শূড় নামিয়ে দিয়েছে । শূড় বেয়ে রক্ত উঠে আসছে । পিঁপিঁপিঁর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল— কী মিষ্টি রক্ত! কী মিষ্টি! মনে হচ্ছে, আহ, সারাজীবন ধরে যদি এই রক্ত খাওয়া যেত! সে খেয়েই যাচ্ছে, খেয়েই যাচ্ছে । তার পেট বেলুনের মতো ফুলছে... তার কোনোই খেয়াল নেই ।

মা-মশা চিৎকার করে কাঁদছেন— ‘বোকা মেয়ে, তুই কী সর্বনাশ করছিস! তুই উঠে আয় । এখনো সময় আছে । এখনো হয়তো কষ্ট করে উড়তে পারবি...

পিঁপিঁপিঁ মা’র কোনো কথা শুনতে পাচ্ছে না । সে রক্ত খেয়েই যাচ্ছে । পিঁপিঁপিঁর দুই বোন এখন কাঁদছে, ভাই ভাইও কাঁদছে ।

মা-মশা ফোঁপাতে বললেন, ‘ওরে বোকা মেয়ে, শীলার বাবা তো এক্ষুনি তোকে দেখবে । পিষে মেয়ে ফেলবে— তুই উড়ে পালিয়েও যেতে পারবি না । তোকে এত করে শিখিয়ে দিলাম, তারপরেও তুই এত বড় বোকামি কী করে করলি...!’

মা-মশার কথা শেষ হবার আগেই শীলার বাবা মশাটাকে দেখলেন— রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে আছে । নড়াচড়া করতে পারছে না । ঝিম মেয়ে হাতের ওপর বসে আছে । তিনি মশাটাকে তাঁর লেখার কাগজের ওপর ঝেড়ে ফেললেন । মশাটা অনেক কষ্টে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল । কয়েক বার উড়ার চেষ্টা করল । পারল না । শীলার বাবা বললেন, ‘আমার মামণিরা কোথায়? মজা দেখে যাও ।’

মজা দেখার জন্যে তিন মেয়েই ছুটে এলো ।

‘দেখ, এই দেখ । মশাটাকে দেখ, রক্ত খেয়ে কেমন হয়েছে । উড়তে পারছে না ।’

শীলা বলল, ‘এর মধ্যে মজার কী আছে বাবা? তুমি কী যে পাগলের মতো বলো! মশাটাকে মেয়ে ফেল ।’

‘মেয়ে ফেলব?’

‘অবশ্যই মেরে ফেলবে। সে তোমার রক্ত খেয়েছে, তুমি তাকে ছেড়ে দেবে কেন? তোমার হয়ে আমি মেরে দেই?’

‘না না, মারিস না। মারিস না— থাক না।’

‘মারব না কেন?’

‘তুচ্ছ একটা প্রাণী শুধু শুধু মেরে কী হবে?’

‘তোমার রক্ত খেয়েছে তো!’

‘বেচারার খাবারই হচ্ছে রক্ত। না খেয়ে করবে কী? আমরা হাঁস-মুরগি এইসব মেরে মেরে খাচ্ছি না? আমাদের যদি কোনো দোষ না হয় ওদেরও দোষ হবে না।’

পিঁপিঁপিঁ খানিকটা শক্তি ফিরে পেয়েছে— অনেকবারের চেষ্টায় সে একটু উড়তে পারল। খানিকটা উড়ল— ওমনি তাকে সাহায্যের জন্যে তার মা, ভাই ও দুই বোন ছুটে এল। তারা তাকে ধরে ধরে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পিঁপিঁপিঁ বলল, ‘মা, আমরা যে চলে যাচ্ছি ঐ ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে গেলাম না তো। উনি ইচ্ছা করলে আমাকে মেরেও ফেলতে পারতেন কিন্তু মারেননি।’

‘উনাকে ধন্যবাদ দেয়ার দরকার নেই মা। উনি আমাদের ধন্যবাদ বুঝবেন না। তা ছাড়া যারা বড় তারা কখনো ধন্যবাদ পাবার আশায় কিছু করে না।’

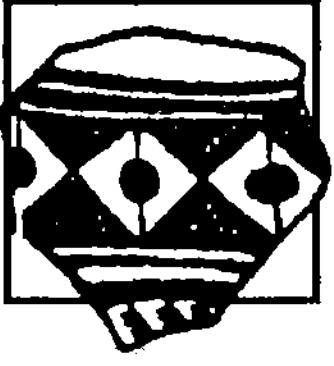
‘মা, তবু আমি উনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই।’

‘তুমি তো উড়তেই পারছ না? ধন্যবাদ কী করে দেবে?’

‘আমি এখন উড়তে পারছি। আমি পারব।’

পিঁপিঁপিঁ শীলার বাবার চারদিকে একটা চক্র দিয়ে বিনীত গলায় বলল— ‘আমি অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র একটা পতঙ্গ। আপনি আমার প্রতি যে মমতা দেখিয়েছেন তা আমি সারাজীবন মনে রাখব। আমার কোনোই ক্ষমতা নেই। তারপরও যদি কখনো আপনার জন্যে কিছু করতে পারি আমি করব।’

পিঁপিঁপিঁর মা, ভাই এবং বোনরা একটু দূরে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে উড়ে যাচ্ছে তাদের দিকে। তার চোখ বারবার পানিতে ভিজে যাচ্ছে। কিছু-কিছু মানুষ এত ভালো হয় কেন এই ব্যাপারটা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না।



ভূত মন্ত্ৰ

বাবলুকে একা বাসায় রেখে তার বাবা-মা ভৈরবে বেড়াতে গেছেন। সকালের ট্রেনে গেছেন, ফিরবেন রাত ন'টায়। এই এত সময় বাবলু একা থাকবে। না, ঠিক একা না, বাসায় কাজের বুয়া আছে।

বাবলুর খুব ইচ্ছা ছিল সেও ভৈরব যাবে। অনেক দিন সে ট্রেনে চড়ে না। তার খুব ট্রেনে চড়তে ইচ্ছা করছিল। তা ছাড়া ভৈরবে ছোট খালার বাড়িতেও অনেক মজা হবে। ছোটখালার বাড়িটা নদীর ওপরে। নিশ্চয়ই নৌকায় চড়া হবে। বাবলু অনেক দিন নৌকাতেও চড়ে না। তাকে ইচ্ছা করলেই নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু বাবলুর বাবা মনসুর সাহেব তাকে নেবেন না। তিনি চোখ-মুখ কুঁচকে বললেন, 'নো নো নো। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বেড়ানো আমি পছন্দ করি না। তুমি বাসায় থাক। হোম ওয়ার্ক শেষ কর।'।

বাবলু ক্ষীণ গলায় বলল, 'হোম ওয়ার্ক শেষ করে রেখেছি।'

'শেষ করলে অন্য কাজ কর। বেশি অঙ্ক বই নিয়ে আস, দাগিয়ে দেই। অঙ্ক করে রাখ— ভৈরব থেকে ফিরে এসে দেখব।'

বাবলু অঙ্ক বই নিয়ে এলো। মনসুর সাহেব বিশটা অঙ্ক দাগিয়ে দিলেন।

'সব করবে। একটা বাদ থাকলে কানে ধরে চড়কিপাক খাওয়াব। সারা দিন আছেই শুধু খেলার ধাক্কা।'

বাবলুর চোখে পানি এসে গেল। সারা দিন সে তো খেলার ধাক্কাই থাকে না। খেলাধুলা যা করার স্কুলেই করে। বাসায় ফিরে বাবার ভয়ে চুপচাপ বই নিয়ে বসে থাকে। বাবলু তার বাবাকে অসম্ভব ভয় পায়। বাবাদের কোনো ছেলেই এত ভয় পায় না— বাবলু পায়, কারণ মনসুর সাহেব বাবলুর আসল বাবা না, নকল বাবা।

বাবলুর আসল বাবার মৃত্যুর পর তার মা ঐকে বিয়ে করেন। তবে লোকটা যে খুব খারাপ তাও বলা যাবে না। বাবলুকে তিনি প্রায়ই খেলনা, গল্পের বই এইসব কিনে দেন। কিছুদিন আগে দামি একটা লেগোর সেট কিনে দিয়েছেন।

তবে বাবলুর সব সময় মনে হয় তার আসল বাবা বেঁচে থাকলে লক্ষ গুণ বেশি মজা হতো। বাবা নিশ্চয়ই তাকে ফেলে ভৈরব যেতেন না। বাবলু কোথাও

যেতে পারে না। বেশির ভাগ সময় সোবহানবাগ ফ্ল্যাটবাড়ির তিনতলাতেই তাকে বন্দী থাকতে হয়। মাঝে মাঝে তার এমন কান্না পায়! তার কান্না দেখলে মা কষ্ট পাবেন বলে সে কাঁদে না। তার খুব যখন কাঁদতে ইচ্ছা করে তখন সে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে কাঁদে। বের হয়ে আসার সময় চোখ মুছে এমনভাবে বের হয় যে, কেউ কিছু বুঝতে পারে না।

বাবলু বসার ঘরে অঙ্ক বই নিয়ে বসেছে। মনসুর সাহেব বিশটা অঙ্ক দাগিয়ে দিয়ে গেছেন। এর মধ্যে সে মাত্র একটা অঙ্ক করেছে। অঙ্কগুলি এমন কঠিন! বুয়া গ্লাস ভর্তি দুধ রেখে গেছে। দুধ খেতে হবে— না খেলে সে নালিশ করবে। গ্লাসটার দিকে তাকালেই বাবলুর বমি আসছে। সে অঙ্ক করছে গ্লাসটার দিকে না তাকিয়ে। এই সময় দরজায় খট খট শব্দ হলো। বাবলু দরজা খুলে দিল। সাত-আট বছর বয়েসি দুষ্ট দুষ্ট চেহারার একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। খালি পা। পরনে সাইজে বড় একটা প্যান্ট। প্যান্ট খুলে পড়ার মতো হচ্ছে আর সে টেনে টেনে তুলছে। তার গায়ে রঙিন শার্ট। শার্টের একটা বোতাম নেই। বোতামের জায়গাটা সেফটি পিন দিয়ে আটকানো। ছেলেটা বাবলুর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে বলল, ‘এই, তুই আমার সঙ্গে খেলবি?’

বাবলু কথা বলল না। ছেলেটাকে সে চিনতে পারছে না। ফ্ল্যাটেরই কারো ছেলে হবে। তবে বাবলু আগে দেখেনি। অপরিস্ফুট একটা ছেলে তাকে তুই তুই করছে, এটাও বাবলুর ভালো লাগছে না।

‘কথা বলছিস না কেন? খেলবি?’

‘না।’

‘আমি অনেক মজার মজার খেলা জানি।’

‘আমি খেলব না। অঙ্ক করছি।’

‘সকালবেলা কেউ অঙ্ক করে? আয় কিছুক্ষণ খেলি— তারপর অঙ্ক করিস।’

‘আমাকে তুই তুই করে বলছ কেন?’

‘বন্ধুকে তুই তুই করে বলব না? বন্ধুকে বুঝি আপনি আপনি করে বলব?’

‘আমি তোমার বন্ধু না।’

‘বন্ধু না। এখন হবি। ঐ গ্লাসটায় কি দুধ নাকি?’

‘হুঁ।’

‘তোকে খেতে দিয়েছে?’

‘হুঁ।’

‘খেতে ইচ্ছা করছে না?’

‘না।’

‘দুধটাকে পেপসি বানিয়ে তারপর খা।’

‘পেপসি কীভাবে বানাব?’

‘মন্ত্র পড়লেই হয়। এর মন্ত্র আছে। মন্ত্র জানিস না?’

রাগে বাবলুর গা জ্বলে যাচ্ছে। কী রকম চালবাজের মতো কথা! মন্ত্র পড়লেই দুধ নাকি পেপসি হয়ে যাবে। মন্ত্র এতই সস্তা?

‘আমি মন্ত্র জানি। মন্ত্র পড়ে পেপসি বানিয়ে দেব?’

‘দাও।’

‘যদি দেই তাহলে কি তুই খেলবি আমার সঙ্গে?’

‘হঁ।’

ছেলেটা ঘরে ঢুকল। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কী যেন বলে গ্লাসে ফুঁ দিল— বাবলু দেখল, দুধ দুধের মতোই আছে। আগের মতোই কুৎসিত। সর ভাসছে।

ছেলেটা বলল, ‘দেখলি দুধ কেমন পেপসি বানিয়ে দিলাম, কঠিন মন্ত্র— তোকে শিখিয়ে দেব। এই মন্ত্র দিয়ে খাবার জিনিস বদলে ফেলা যায়। মনে কর তোকে ছোট মাছ দিয়ে ভাত দিয়েছে। ছোট মাছ খেতে ইচ্ছা করছে না। মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিবি ছোট মাছ হয়ে যাবে মুরগির রান। তুই মুরগির রান খাস, না বুকের মাংস?’

বাবলু বলল, ‘দুধ তো আগের মতোই আছে। একটুও বদলায়নি।’

‘দেখাচ্ছে দুধের মতো কিন্তু এর স্বাদ এখন পেপসির মতো। খুব ঝাঁঝ। এক চুমুক খেলেই টের পাবি। একটা চুমুক দিয়ে দেখ।’

ছেলেটা কি তাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে? বাবলুর রাগ লাগছে। কেউ তাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করলে তার রাগ লাগে। ছেলেটা বলল, ‘আমার দিকে এমন রাগী চোখে তাকিয়ে আছিস কেন? একটা চুমুক দিয়ে দেখ।’

বাবলু দুধের গ্লাস হাতে নিল। এক চুমুক খেয়ে দেখা যাক। ক্ষতি তো কিছু নেই। ছেলেটা ফেরত বলছে তাতে দুধ বদলে গিয়ে পেপসি হয়েও তো যেতে পারে!

বাবলু চুমুক দিল। চুমুক দিয়েই থু করে ফেলে দিল। দুধ দুধের মতোই আছে— তার মুখের ভেতর দুধের সঙ্গে এক গাদা সরও ঢুকে গেছে। এই ছেলে দেখি মহাত্মাদড়। তাকে খুব বোকা বানাল।

ছেলেটা বলল, ‘পেপসি হয়নি?’

‘না।’

‘সময় লাগবে। দিনের বেলা মন্ত্র চট করে লাগে না। দুধের গ্লাসটা এক কোণে রেখে দে কিছুক্ষণ পর দেখবি দুধ বদলে পেপসি হবে। এখন আয় আমরা খেলি। বেশিক্ষণ খেলব না। অল্প কিছুক্ষণ খেলে আমি চলে যাব।’

‘আমি খেলব না। আমাকে অঙ্ক করতে হবে। তা ছাড়া তুমি মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদীর সঙ্গে আমি খেলি না।’

‘আমি মিথ্যাবাদী তোকে কে বলল? দুধটা বদলাতে সময় লাগছে—
বললাম না, গরমের সময় মন্ত্র সহজে ধরে না।’

‘তুমি চলে যাও। আমার অঙ্ক শেষ করতে হবে।’

‘কঠিন অঙ্ক?’

‘হু কঠিন।’

‘খুব কঠিন?’

‘হুঁ। খুব কঠিন।’

‘কঠিন অঙ্ক সহজ করার একটা মন্ত্র আছে। সেটা শিখিয়ে দিব? যে-কোনো
কঠিন অঙ্কের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রটা পড়ে দু’বার ফুঁ দিলেই অঙ্ক সহজ হয়ে যাবে,
চট করে করতে পারবি। দেব শিখিয়ে?’

‘তুমি আমার সঙ্গে ফাজলামি করছ কেন? তুমি কি ভেবেছ আমি বোকা?
আমি মোটেই বোকা নই।’

‘মন্ত্র শিখবি না?’

‘না শিখব না। আর শোনো আমাকে তুই তুই করবে না।’

ছেলেটা ফিসফিস করে বলল— ‘তুই এমন বেগে আছিস কেন? রাগ করা
তো ভালো না। আচ্ছা শোন, রাগ কমানোর মন্ত্র আমার কাছ থেকে শিখবি? এই
মন্ত্রটা খুব সহজ। হাত মুঠো করে এই মন্ত্র একবার পড়লেই রাগ কমে যায়।
নিজের রাগ তো কমেই আশপাশে যারা আছে তাদের রাগও কমে। মনে কর
তোর বাবা খুব রাগ করেছেন— তুই হাত মুঠো করে একবার মন্ত্রটা পড়বি—
দেখবি মজা। তোর বাবার সব রাগ পানি হয়ে যাবে। তাকে হাসি মুখে কোলে
তুলে নিবে।’

বাবলু বলল, ‘তুমি যাও তো।’

‘চলে যাব?’

‘হ্যাঁ চলে যাবে। আর কোনো দিন আসবে না।’

আচ্ছা চলে যাচ্ছি। একটা খাতা আর কলম আন—চট চট করে মন্ত্রগুলি
লিখে ফেল। আমি একবার চলে গেলে আর আমাকে পাবি না।’

‘তোমাকে আমার দরকারও নেই।’

‘সত্যি চলে যাব?’

‘হ্যাঁ চলে যাবে।’

‘আচ্ছা চলে যাচ্ছি। তুই মন খারাপ করে বসেছিলি দেখে এসেছিলাম—
আমি কে জানিস?’

‘জানতে চাই না।’

‘আমি হচ্ছি ভূত রাজার ছেলে। ভূতদের সব মন্ত্র আমি জানি। খাতাটা দে
না— অদৃশ হবার মন্ত্রটা লিখে রেখে যাই। চোখ বন্ধ করে তিনবার এই মন্ত্রটা
পড়লেই অদৃশ্য হয়ে যাবি। আর কেউ তোকে দেখতে পাবে না।’

‘তুমি যাও তো।’

‘ছেলেটা মন খারাপ করে চলে গেল। বাবলু দরজা বন্ধ করে আবার অন্ধ নিয়ে বসল। কী যে কঠিন সব অন্ধ! বাবলু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। অন্ধ সহজ করার কোনো মন্ত্র থাকলে ভালোই হতো।’

রান্নাঘর থেকে বুয়া চৈঁচিয়ে বলল, ‘দুধ খাইছ?’

বাবলু বলল, ‘না।’

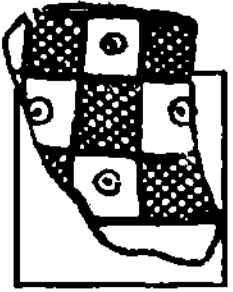
‘তাড়াতাড়ি খাও। না খাইলে তোমার আবার কাছে নালিশ দিমু।’

‘নালিশ দিতে হবে না, খাচ্ছি।’

বাবলু দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। দুধ কোথায়? গ্লাস ভর্তি পেপসি। বরফের দু’টা টুকরাও ভাসছে। বাবলু ভয়ে ভয়ে একটা চুমুক দিল।

হ্যাঁ সত্যি সত্যি পেপসি। কী ঝাঁঝ! মন্ত্র তাহলে সত্যি আছে?

বাবলু ছুটে ঘর থেকে বের হলো। ছেলেটাকে কোথাও পাওয়া গেল না। ফ্ল্যাটের দারোয়ান বলল, লাল শার্ট পরা একটা ছেলেকে মেষ শিস দিতে দিতে রাস্তার ফুটপাথ ধরে এগিয়ে যেতে দেখেছে। এর বেশি সে আর কিছু জানে না।



পানি-রহস্য

মবিন সাহেব বাগানের ফুল গাছে পানি দিচ্ছিলেন। তাঁর সামনে জয়নাল দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরেই আছে, মাঝে মাঝে খুকখুক করে কাশছে, পায়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে নকশা কাটছে, মুখে কিছু বলছে না। মবিন সাহেব বললেন, ‘কিছু বলবি নাকি রে জয়নাল?’ জয়নাল লজ্জিত মুখে হাসল। সে অল্পতেই লজ্জা পায়।

মবিন সাহেব বললেন, ‘আজ কাজকর্ম নেই?’

‘জে না।’

জয়নালের বয়স চল্লিশের ওপরে। বিয়ে-টিয়ে করেনি। একা মানুষ। এক কামারের দোকানে কাজ করে। হাপর চালায়, কয়লায় ফুঁ দেয়। রাতে ঐ দোকানের একপাশে চট বিছিয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

মবিন সাহেব বছরখানিক আগে কামারের দোকানে একটা শাবল বানাতে দিয়েছিলেন। জয়নাল তাকে বসিয়ে রেখে শাবল বানিয়ে নিল। নামমাত্র দাম দিল। সেই সূত্রে পরিচয়। মবিন সাহেবের মনে হয়েছে জয়নাল অতি ভদ্র, অতি সজ্জন একজন মানুষ। একটু বোধহয় বোকা। তাতে কিছু যায়-আসে না। চালাক বদলোকের চেয়ে বোকা সজ্জন ভালো। সে ছুটিছাঁটার দিনে মবিন সাহেবের বাড়িতে আসে। কিছু বলে না, মাথা নিচু করে মেঝেতে চুপচাপ করে থাকে। মবিন সাহেব তাঁর নাতনিদের সঙ্গে গল্প-গুজব করেন, সে গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনে। আজও বোধহয় গল্প শোনার লোভেই এসেছে। মবিন সাহেব গাছের গোড়ায় পানি ঢালতে ঢালতে বললেন, ‘কি রে জয়নাল, কিছু বলবি?’

জয়নাল মাথা চুলকাতে লাগল। পায়ের বুড়ো আঙুলে নকশা কাটা আরো দ্রুত হলো। বার কয়েক খুকখুক করে কাশল।

‘কিছু বলার থাকলে বলে ফেল। এত লজ্জা কীসের?’

‘ঐ গল্পটা আবার শুনতে আইছি।’

মবিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘কোন গল্প?’

‘পানির উপরে দিয়া যে হাঁটে...’

‘একবার তো শুনেছিস, আবার কেন?’

‘মনটা টানে।’

মবিন সাহেব তাঁর নাতনিদের টলুস্টায়ের বিখ্যাত একটা গল্প বলেছিলেন। যে গল্পে কয়েক জন বেঁটে ধরনের সাধুর কথা আছে। তারা এক নির্জন দ্বীপে বাস করতো, নিজেদের মতো করে আল্লাহর নাম-গান করতো। সমুদ্রের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যাবার অদ্ভুত ক্ষমতা তাদের ছিল। এই গল্প জয়নালও শুনেছে। বোকা মানুষ, হয়তো ভুলো করে বুঝতে পারেনি। এখন ভালোমতো বুঝতে চায়।

মবিন সাহেব বললেন, ‘বস আমার সামনে, গল্পটা আবার বলি।’

জয়নাল বসল। মবিন সাহেবের কাছ থেকে খুরপাই টেনে নিয়ে মাটি কুপাতে লাগল। তাকে নিষেধ করে লাভ হবে না। সে কাজ না করে থাকতে পারে না। সে যতবার আসে এটা-সেটা করে দেয়।

মবিন সাহেব গল্প শুরু করলেন। জয়নাল নিবিষ্ট মনে শুনছে। গল্প শেষ হবার পর সে নিশ্বাস ফেলে বলল, ‘উনারা সাধু ছিলেন?’

‘হ্যাঁ, সাধু ছিলেন। সাধারণ মানুষ তো আর পানির ওপর হাঁটতে পারে না।’

‘পারে না কেন স্যার?’

‘মানুষের ওজন পানির চেয়ে বেশি। আর্কিমিডিসের একটা সূত্র আছে। তুই তো বুঝবি না। লেখাপড়া না জানলে বুঝানো মুশকিল।’

জয়নাল বিনীত গলায় বলল, ‘আমি লেখাপড়া জানি। ক্লাস থিরি পাস করছিলাম। পাঁচের ঘরের নামতা জানি।’

‘পাঁচের ঘরের নামতা জানলে হবে না, আরো পড়াশোনা জানা লাগবে।’

‘জি আচ্ছা। স্যার আইজ উঠি।’

‘আচ্ছা যা।’

জয়নাল উঠে দাঁড়াল তবে চলে গেল না। আবারো খুকখুক করে কাশতে লাগল। মনে হচ্ছে সে আরো কিছু বলতে চায়। মবিন সাহেব বললেন, ‘কিছু বলবি?’

জয়নাল বিব্রত গলায় বলল, ‘সাধু হওয়ার নিয়মটা কী?’

‘কেন, তুই কি সাধু হতে চাস নাকি?’

জয়নাল মাথা নিচু করে ফেলল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে সাধু হতে চায়।

মবিন সাহেব বললেন, ‘সাধু হওয়া বড়ই কঠিন। নিরোত্তর হতে হয়। পরের মঙ্গলের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে হয়। তারা কখনও মিথ্যা বলে না। সাধারণ মানুষ মিথ্যা না বলে থাকতে পারে না। সামান্য হলেও মিথ্যা বলতে হয়।’

জয়নাল প্রায় ফিসফিস করে বলল, ‘স্যার, আমি মিথ্যা বলি না।’

‘ভালো। খুব ভালো।’

‘আমার কোনো লোভও নাই।’

মবিন সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, ‘তুই তো তাহলে সাধুর পর্যায়ে চলেই গেছিস।’

জয়নাল লজ্জা পেয়ে বলল, ‘স্যার যাই?’

‘আচ্ছা যা। আরে শোন শোন, একটু দাঁড়া।’

মবিন সাহেব ঘর থেকে একটা পুরনো কোট এনে দিলেন। কোটের রঙ জ্বলে গেছে, হাতের কাঁচ পোকায় কেটেছে। তবু বেশ গরম। জয়নাল ব্যবহার করতে পারবে। মবিন সাহেব লক্ষ করেছেন এই শীতেও জয়নাল পাতলা একটা জামা পরে থাকে। খালি পায়ে হাঁটে।

জয়নাল কোট পেয়ে অভিভূত হয়ে গেল। তার চোখে পানি এসে গেল। সে নিচু হয়ে মবিন সাহেবকে কদমবুসি করল।

কোট যেদিন দিলেন সেদিন সন্ধ্যাতেই মবিন সাহেবের সঙ্গে জয়নালের আবার দেখা। কোট গায়ে দিয়ে জয়নাল একেবারে ফিটফাট বাবু। সে রাস্তার মোড়ে উবু হয়ে বসে একটা কুকুরকে পাউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিচ্ছে। ফিসফিস করে কুকুরকে বলছে, ‘খা বাবা খা। কষ্ট কইরা খা। পরের বার তোর জন্যে গোস্ত যোগাড় করব। না খাইলে শইল্যে বল হইব না।’

মবিন সাহেব ধমকে দাঁড়ালেন।

‘কী করছিস রে জয়নাল?’

‘কিছু না স্যার।’

‘কুকুরকে পাঁউরুটি খাওয়াচ্ছিস, ব্যাপারটা কী?’

‘এ স্যার হাঁটাচলা করতে পারে না। দুইটা ঠেং ভাঙা, লুলা হইয়া আছে। ঠেং-এর ওপর দিয়া গাড়ি চইল্যা গেল।’

‘তুই কি রোজ একে খাইয়ে যাস?’

মবিন সাহেব দেখলেন কুকুরটার আসলেই অন্তিম দশা। মনে হচ্ছে শুধু পানা, কোমরও ভেঙেছে। নিম্ন শ্রেণীর বলেই এখনও বেঁচে আছে। মানুষ হলে মরে যেত।

জয়নাল কিছু বলল না। হাসল। মবিন সাহেব বললেন, ‘পাউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে তুলে দেবার দরকার কী? সামনে ফেলে দে— নিজেই খাবে।’

‘জি আচ্ছা।’

জয়নাল পাঁউরুটি ফেলে মবিন সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। মবিন সাহেব বললেন, ‘কোটে শীত মানে?’

‘জে স্যার, মানে।’

‘কোট গায়ে দিয়ে খালি গায়ে হাঁটাইয়া দিলে দেখায় না। এক জোড়া স্যাভেল কিনে নিস।’

‘জে আচ্ছা।’

‘বাসায় আসিস। পুরনো এক জোড়া জুতা দিয়ে দেব। তোর পায়ে লাগলে হয়। তোর যা গোদা পা!’

জয়নাল হেসে ফেলল। গোদা পা বলায় সে মনে হলো খুব আনন্দ পেয়েছে। মবিন সাহেব বললেন, ‘তুই আমার পেছনে পেছনে আসছিস কেন?’

‘স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব।’

‘জিজ্ঞেস কর।’

‘উনাদের নাম কী স্যার?’

‘কাদের নাম কী? পরিষ্কার করে বল।’

‘সাধু। যারা পানির ওপর দিয়ে হাঁটে।’

‘এখনও সেই গল্প মাথায় ঘুরছে? সাধুদের কোনো নাম দেয়া নেই, তবে যিনি এই গল্প লিখেছেন তাঁর নাম টলস্টয়। মস্ত বড় লেখক।’

‘বড় তো স্যার হইবই। সত্য কথা লেখছে। পানির উপরে হাঁটা সহজ ব্যাপার তো না। আচ্ছা স্যার, এই দুনিয়ায় সর্বমোট কয়জন লোক আছে যারা পানির উপরে হাঁটতে পারে?’

মবিন সাহেব উত্তর দিলেন না। বোকা লোকদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই। উত্তর দিতে গেলে ঝামেলায় পড়তে হবে। জয়নালও উত্তরের জন্যে চাপাচাপি করল না। মবিন সাহেবকে তাঁর বাড়ির গেট পর্যন্ত আগিয়ে দিল।

এতদিন ঠাণ্ডায় চলাফেরা করে জয়নালের কিছু হয়নি। গরম কোট পাবার তিন দিনের মাথায় তার ঠাণ্ডা লেগে গেল। প্রথমে সর্দি-জ্বর, তারপর একেবারে শয্যাশায়ী। খবর পেয়ে মবিন সাহেব দেখতে গেলেন। খুপড়ি ঘরের এক কোনায় সে চটের ওপর পড়ে আছে। তার গায়ে কোট। কোট পেয়েই সে যে গায়ে দিয়েছে আর বোধহয় খুলেনি। অন্যপাশে হাপরের গনগনে আগুন। এ-রকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পশুও থাকতে পারে না। মবিন সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, ‘কেমন আছিস রে?’

জয়নাল হাসিমুখে বলল, ‘খুব ভালো আছি স্যার।’

‘এই বুঝি তোর ভালো থাকার নমুনা? গায়ে জ্বর আছে?’

‘জে না।’

মবিন সাহেব জয়নালের কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন, ‘গা পুড়ে যাচ্ছে!’

‘চিকিৎসা কি হচ্ছে?’

জয়নাল জবাব দিল না। তার মানে চিকিৎসা কিছু হচ্ছে না। অবস্থা যা তাতে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার। মবিন সাহেবের পক্ষে রোগী নিয়ে টানাটানি করাও সম্ভব না। তাঁর নিজের কাজকর্ম আছে।

‘তোর আত্মীয়স্বজন এখানে কে আছে?’

‘কেউ নাই স্যার।’

‘খাওয়া-দাওয়া কে দিয়ে যাব?’

‘চায়ের দোকানের একটা ছেলে আছে, ইয়াকুব নাম, হে দেয়। বড় ভালো ছেলে। অন্তরে খুব মুহব্বত।’

‘ছেলেটাকে বলবি আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।’

‘জি আচ্ছা।’

‘চিন্তা করিস না। তোর চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি করব।’

জয়নালের চোখে পানি এসে গেল। মানুষ এত ভালো হয়! সে শার্টের হাতায় চোখ মুছতে মুছতে বলল, ‘স্যারের কাছে একটা আবদার ছেল।’

‘বল কী আবদার?’

‘ঐ গল্পটা যদি আরেকবার বলতেন। গল্পটা শোনার জন্যে মন টানতাকে।’

‘কোন গল্প?’

‘পানির উপরে দিয়ে যে হাঁটতো।’

‘ঐ গল্প তো শুনেছিস, আবার কেন?’

‘শুনতে মন চায়।’

‘জুরে মরে যাচ্ছিস, গল্প শুনতে হবে না। বিশ্রাম কর। ঘুমুতে চেষ্টা কর।’

‘জে আচ্ছা।’

মবিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, জয়নাল বলল, ‘স্যার, আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারার জন্যে পানির উপরে দিয়া হাঁটা কি আল্লাপাক নিষেধ কইরা দিছে?’

‘নিষেধ-টিষেধ কিছু না। মানুষ পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে পারে না, কিন্তু মাকড়সা পারে। আবার মানুষ উড়তে পারে না কিন্তু পাখি উড়তে পারে। একেক জনের জন্যে একেক ব্যবস্থা এই হলো ব্যাপার।’

জয়নাল চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বলল, ‘কিন্তু স্যার, কেউ-কেউ পানির উপরে দিয়া হাঁটতে পারে।’

মবিন সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, ‘না তো। মানুষ আবার পানির ওপর দিয়ে হাঁটবে কি! তা ছাড়া তার দরকারইবা কি? মানুষের জন্যে নৌকা আছে। জাহাজ আছে।’

‘তারপরও স্যার কেউ-কেউ পানির উপরে হাঁটে। আপনে নিজেই বলছেন।’

‘আরে গাধা, আমি যা বলেছি সেটা হলো গল্প।’

জয়নাল বিছানায় উঠে বসল। উত্তেজিত গলায় বলল, ‘গল্প না স্যার, ঘটনা সত্য। কোনো কোনো মানুষ পানির উপরে দিয়া হাঁটতে পারে, কিছু হয় না, খালি পায়ের পাতাটা ভিজে।’

‘চুপ করে ঘুমা তো, গাধা।’

জয়নাল কাতর গলায় বলল, ‘হাত জোড় কইরা আপনেরে একটা কথা বলি স্যার। আমি নিজেই পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারি। সত্যই পারি। এই কথা কোনো দিন কেউরে বলি নাই, আইজ আপনেরে বললাম। স্যার, ঘটনাটা আপনেরে বলি?’

মবিন সাহেব অনাগ্রহের সঙ্গে বললেন, ‘আচ্ছা আজ থাক, আরেক দিন শুনব।’

‘আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা আপনেরে বলি। আপনে হইলেন জ্ঞানী মানুষ, আপনে বুঝবেন। ষড়ঈ আচানক ঘটনা।’

‘ঘটনা আরেক দিন শুনব। আজ সময় নেই। রাতের ট্রেনে নেত্রকোনা যাব।’

‘জি আচ্ছা, স্যার।’

মবিন সাহেব জয়নালের কথার কোনো গুরুত্ব দিলেন না। প্রবল জ্বরে মাথা চড়ে গিয়েছে। আবোল-তাবোল বকছে। মবিন সাহেব বললেন, ‘জয়নাল, আমি যাচ্ছি, চায়ের দোকানের ছেলেটা আসলে পাঠিয়ে দিস। রাত দশটার আগেই যেন আসে। দশটার সময় আমি চলে যাব।’

‘জি আচ্ছা, স্যার।’

চায়ের দোকানের কোনো ছেলে মবিন সাহেবের কাছে এলো না। তিনি চলে গেলেন নেত্রকোনা। তিন দিন পার করে ফিরলেন। এসেই জয়নালের খোঁজ নিলেন। সে আগের জায়গায় নেই। জ্বর প্রবল হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি

করা হয়েছে।

কামারশালার মালিক সতীশ বলল, ‘অবস্থা সুবিধার না। শ্বাসকষ্ট হইতেছে।’

মবিন সাহেব বললেন, ‘ডাক্তার কী বলল? ওর হয়েছে কী?’

‘নিওমোনিয়া। খুব খারাপ নিওমোনিয়া। ডাক্তার বলছে বাঁচে কিনা বাঁচে ঠিক নাই। তবে চিকিৎসা হইতেছে।’

‘বলো কি!’

‘স্যার, জয়নাল হইল গিয়া আফনের পাগলা কিসিমের মানুষ। শইলের কোনো যত্ন নাই। আমার এইখানে আছে দশ বছর। এই দশ বছরে তারে গোসল করতে দেখি নাই। পানির বিষয়ে তার নাকি কি আছে। সে পানির ধারে কাছে যায় না।’

‘যায় না কেন?’

‘কিছু বলে না, খালি হাসে। তবে স্যার, পাগল কিসিমের লোক হইলেও মানুষ ভালো। ধরেন, আমার এইখানে পইড়া ছিল পেটে-ভাতে। ব্যাবসাপাতি নাই, তারে কী দিমু কন। নিজেই চলতে পারি না। কিন্তু স্যার, এই নিয়া কোনো দিন একটা কথা সে আমারে বলে নাই। আমারে না জানাইয়া সে মাঝে মাঝে ইস্টিশনে কুলির কাম করতো। হেই পয়সা দিয়া হে কী করতো জানেন স্যার?’

‘কী করতো?’

‘দুনিয়ার যত কাউয়ারে পাঁউরুটি বিন্যা খাওয়াইতো।’

‘কেন?’

‘বললাম না স্যার, পাগল কিসিমের লোক। তয় মনটা পানির মতো পরিষ্কার।’

মবিন সাহেব তাকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন। বিছানায় মরার মতো পড়ে আছে। জুরে আছেন। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বুক কামারের হাপরের মতোই ওঠানামা করছে। মবিন সাহেব বললেন, ‘কেমন আছিস রে জয়নাল?’

জয়নাল অনেক কষ্টে চোখ মেলে বলল, ‘স্যার, ভালো আছি।’

‘ভালো আছি বলছিস কোন আন্দাজে? তুই তো মরতে বসেছিস রে গাধা।’

জয়নাল থেমে থেমে বলল, ‘আপনারে একটা ঘটনা বলব স্যার। ঘটনাটা না বললে মনটা শান্ত হইব না।’

‘কী ঘটনা?’

‘পানির উপরে দিয়া হাঁটনের ঘটনা। আমি স্যার সাধু না, পির-ফকিরও না, কিন্তু আমি ...’

জয়নাল হাঁপাতে লাগল। তার কপাল দিয়ে টপটপ করে ঘাম পড়তে লাগল। মবিন সাহেব বললেন, ‘এখন বিশ্রাম কর তো। তোর ঘটনা সবই শুনব।’

‘আপনে স্যার জ্ঞানী মানুষ, আপনে শুনলে বুঝবেন। যা বলব সবই সত্য। আমি জীবনে মিথ্যা বলি নাই। আমি স্যার পানির উপরে দিয়া হাঁটতে পারি। খালি পায়ের পাতা ভিজে আর কিছু হয় না। বিরাট রহস্য স্যার ...’

‘শুনব, তোর বিরাট রহস্য মন দিয়ে শুনব। এখন ঘুমুতে চেষ্টা কর। তোর শরীরের যে অবস্থা দেখছি...’

‘কুত্তাটার জন্যে মনটা টানে স্যার। পাও ভাঙা, নিজে যে হাঁট্যা-চইড়া খাইবে সেই উপায় নাই। কেউ দিলে খায়, না দিলে উপাস থাকে। বোবা প্রাণী, কাউরে বলতেও পারে না।’

‘আচ্ছা, আমি কুকুরটার খোঁজ নিব।’

‘আপনের অসীম মেহেরবানি।’

‘তুই নাকি কাকদের পাঁউরুটি ছিঁড়ে খাওয়াস, এটা সত্যি নাকি?’

জয়নাল লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। মবিন সাহেব বললেন, ‘কাককে পাঁউরুটি খাওয়ানোর দরকার কী? ওদের তো আর খাবারের অভাব হয়নি। ওদের ডানাও ভাঙেনি।’

জয়নাল বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, ‘কাউয়ারে কেউ পছন্দ করে না। আদর কইরা কাউয়ারে কেউ খাওন দেয় না। এই ভাইব্যা...’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে। তুই আর কথা বলিস না। শুয়ে থাক। আমি কাল এসে আবার খোঁজ নেব।’

‘আপনের মতো দয়ার মানুষ আমি আর এই জীবনে দেখি নাই।’ জয়নালের চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল।

মবিন সাহেব পরদিন আঁকে আবার দেখতে গেলেন। অবস্থা আগের চেয়ে অনেক খারাপ হয়েছে। চোখ লাল। বুক যেভাবে ওঠা-নামা করছে তাতে মনে হয় শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। রাতে ডাক্তাররা অক্সিজেন দেবার চেষ্টা করেছেন। তাতে তার খুব আপত্তি। কিছুতেই সে নাকের ওপর বাটি ধরবে না। আমি বললাম, ‘কেমন আছিস রে জয়নাল?’

জয়নাল ফঁাসফঁাস গলায় বলল, ‘খুব ভালো আছি স্যার। খুব ভালো। ঘটনাটা বলব?’

‘কী ঘটনা?’

‘পানির উপরে দিয়া হাঁটনের ঘটনা। না বইল্যা যদি মইরা যাই তা হইলে একটা আফসোস থাকব। বলি—? কাছে আইস্যা বসেন। আমি জোরে কথা বলতে পারতেছি না।’

মবিন সাহেব কাছে এসে বসলেন। জয়নাল ফিসফিস করে প্রায় অস্পষ্ট গলায় বলতে লাগল—

‘ছোটবেলা থাক্যাই স্যার আমি পানি ভয় পাই। বেজায় ভয়। আমি কোনো দিন পুসকুনিতে নামী নাই, নদীতে নামী নাই। একবার মামারবাড়ি গিয়েছি, মামার বাড়ি হলো সান্দিকোনা— বাড়ির কাছে নদী। খুব সুন্দর নদী। আমি সন্ধ্যাকালে নদীর পাড় দিয়া হাঁটাহাঁটি করি। একদিন হাঁটতেছি— হঠাৎ শুনি খচমচ শব্দ। নদীর ঐ পাড়ে একটা গরুর বাচ্চা পানিতে পড়ে গেছে। গরু-ছাগল এরা কিন্তু স্যার জন্ম থাইক্যা সাঁতার জানে। এরা পানিতে ডুবে না। কিন্তু দেখলাম, এই বাচ্চাটা পানিতে ডুইব্যা যাইতেছে। একবার ডুবে, একবার ভাসে। পায়ের মধ্যে দড়ি পেঁচাইয়া কিছু একটা হইছে। বাচ্চাটা এক একবার ভাইস্যা উঠে আমার দিকে চায়। আমাকে ডাকে। তার ডাকের মধ্যে কী যে কষ্ট! আমার মাথা হঠাৎ আউলাইয়া গেল। আমি যে সাঁতার জানি না, পানি ভয় পাই কিছুই মনে রইল না— দিলাম দৌড়। এক দৌড়ে বাচ্চার কাছে গিয়া উপস্থিত। পানি থাইকা বাচ্চাটারে টাইন্যা তুইল্যা দেহি আমি নিজে পানির উপরে দাঁড়াইয়া আছি। আমি নদী পার হইছি হাঁট্যা, আমার পায়ের পাতাটা খালি ভিজছে। আর কিছু ভিজে নাই— এখন স্যার আপনে আমারে বলেন বিষয় কী? ঘটনা কী?’

মবিন সাহেব বললেন, ‘এরকম কি আরো ঘটেছে?’

‘জে না, সেই প্রথম, সেই শেষ। আর কোনো দিন আমি পানিতে নামী নাই। এখন আপনে যদি বলেন আরেকবার পানিতে নাইম্যা দেখব। তয় আমি তো সাধুও না— পীর-ফকিরও না...’

মবিন সাহেব বললেন, ‘কে বলতে পারে! তুই হয়তো বিরাট সাধু— তুই নিজে তা জানিস না।’

জয়নাল কাঁদতে কাঁদতে বলল, ‘আমি স্যার সাধারণ মানুষ। অতি সাধারণ, তয় স্যার, সাধু হইতে আমার ইচ্ছা করে। খুব ইচ্ছা করে।’

মবিন সাহেব বললেন, ‘আর কথা বলিস না জয়নাল। তোর কষ্ট হচ্ছে, শুয়ে থাক।’

‘আমার কুত্তাটারে পাইছিলেন?’

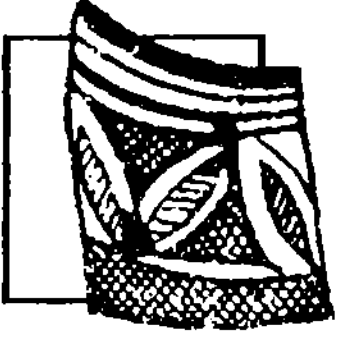
‘খোঁজ করছি— এখনও পাইনি। পেলো ভাত খাইয়ে দেব। চিন্তা করিস না। রাতে এসে খোঁজ নিয়ে যাব।’

জয়নাল হাসল। তৃপ্তির হাসি, আনন্দের হাসি।

রাতে খোঁজ নিতে এসে মবিন সাহেব শুনলেন জয়নাল মারা গেছে। মবিন সাহেব অত্যন্ত মন খারাপ করে হাসপাতালের বারান্দায় এসে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন— রাজ্যের কাক বারান্দায় লাইন বেঁধে বসে আছে। তাদের চেয়ে

একটু দূরে বসে আছে কোমরভাঙা কুকুর। কীভাবে সে এতদূর এসেছে কে জানে?

মবিন সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এই জগতে কত রহস্যই না আছে! কোনো দিন কি এইসব রহস্যভেদ হবে?



গুণীন

তার নাম চান্দ শাহ ফকির।

আসল নাম না— নকল নাম। আসল নাম মেকান্দার আলি। যারা মন্ত্র নিয়ে কাজ করে— তাদের অনেক রকম ভেক খরচ হয়। নামও বদলাতে হয়। তাদের চাল-চলন, আচার-আচরণ সাধারণ মানুষের মতো হলে চলে না। সাধারণ মানুষের ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা অর্জনের জন্যে তাদের সারাক্ষণই নানান চেষ্টা চালাতে হয়।

চান্দ শাহ ফকিরকে দেখে সাধারণ মানুষের ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধা কোনোটাই হয় না। রোগা, বেঁটে একজন মানুষ। বেঁটেরা সচরাচর কুঁজো হয় না, চান্দ শাহ খানিকটা কুঁজো। হাঁটে ঝুঁড়িয়ে। কারণ বাঁ পা বলতে গেলে অচল। বাঁ পা টেনে টেনে এগুতে হয়। অন্যান্য গুণীনদের মতো মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল আছে। চোখও সারাক্ষণই লাল থাকে। গলায় তিন রকমের হাড়, কাঠ এবং অষ্টধাতুর মালা আছে, তারপরেও চান্দ শাহকে সবাই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। তাকে চান্দ শাহ ফকির ডাকে না— ডাকে চান্দু। চান্দ শাহ তার স্ত্রীর কাছে এই নিয়ে খুব দুঃখ করে। দীর্ঘনিশ্বাস চাপতে চাপতে বলে, ‘দেখ বউ মানুষের বিচার। আমি এতবড় একটা গুণীন। পশু-পাখি পর্যন্ত আমারে সমীহ করে। যে গাছের নিচে বসি গাছে পাখ-পাখালি থাকে না। উইড়া চইলা যায়। অথচ নিজ গ্রামের মানুষ আমারে তুচ্ছ করে। সামনে দিয়া যায়, সেলাম দেয় না। আমার যে নাম চান্দ শাহ ফকির, এই নামে ডাকে না, ডাকে চান্দু। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে মারী-মন্ত্র দিয়া এরাএ একটা শিক্ষা দেই। জন্মের শিক্ষা।

চান্দ শাহের স্ত্রীর নাম ফুলবানু। সে দীর্ঘদিন রোগভোগ করে এখন বিছানায়

পড়ে গেছে। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই তবে জিহ্বা অত্যন্ত সচল। সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, ‘কী মন্ত্রের কথা কইলেন?’

‘মারী-মন্ত্র। মন্ত্র ঝাড়া-মাত্র গ্রামের ঈশান কোণ থাইকা শুরু হবে রোগব্যাদি— আস্তে-আস্তে পুরো গ্রাম। বড় কঠিন মন্ত্র। একবার ঝাড়লে মন্ত্র কাটান দেওয়া মুশকিল। তুমি যদি বল একবার মন্ত্র ঝাড়ি। উচিত শিক্ষা হউক। গ্রামের সব মুরব্বি যখন পায়ের উপরে উপুড় হয়ে পরব তখন একটা বিবেচনা হবে।’

ফুলবানু বলল, ‘এই জাতের কথা বলতে আফনের শরম লাগে না? মন্ত্রের আফনে কী জানেন? কাঁচকলাটা জানেন।’

‘বউ, কী বললা?’

‘বললাম মন্ত্রের আফনে কাঁচকলাটা জানেন। আফনে হইলেন ঠগ। বিরাট ঠগ।’

‘ঠগ বললা?’

‘হ্যা বললাম। অহন কী করবেন? বান মারবেন?’

‘বান তো মারতেই পারি। বান মারা কোনো বিষয় না। হাতের ময়লা।’

‘মারেন দেখি একটা বান।’

চান্দ শাহ হুঁকায় তামাক ভরতে ভরতে বলল, ‘তুমি রোগী মানুষ বইল্যা ছুইড়া দিলাম। না হইলে সরিষা মন্ত্র দিয়া দিতাম। দেখতা, বিষয় কি! হাতের তালুর মধ্যে পাঁচটা কাঁচা সরিষা মিয়া মন্ত্র পড়তে হয়, তরপরে সেই সরিষা ছুইড়া দিতে হয় শইল্যে। সরিষা তো না, সাক্ষাত হাবিয়া দোজখের আগুন। শইলের যে জাগাতে লাগবে সেই জাগাত সাথে সাথে গোল আলুর মতো ফোঁসকা। সারা শইল্যেও মনে হইব আগুন জ্বলতাছে। ইচ্ছা হবে শীতল পানিতে ঝাঁপ দিয়া পড়ি। ঝাঁপ দিয়া পড়লে আরো বিপদ। পানি তখন আগুনের মতো। শইল্যে পানি লাগল কি গেল।’

‘দেন না এটু সরিষা পড়া। আফনের ক্ষমতাটা দেখি। দেখি আপনে কত বড় গুণীন। বিয়ার পর থাইক্যা আমি শুনতাছি— আমার এই ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা, মারী-মন্ত্র, সরিষা মন্ত্র। ভর ভর কইরা বলেন, বলতে শরমও লাগে না। ছিঃ ছিঃ!’

‘রাগ উঠাইও না বউ। রাগ উঠাইলে নিজের ক্ষতি হবে।’

‘আহারে! রাগ উঠাইলে নিজের ক্ষতি হবে! কী আমার ওস্তাদ! দুনিয়ার বেবাক মন্ত্র জানে। তার হুকুমে চলে জিন-পরী। হেই লোক দুই বেলা ভাত পায় না। আফনের পুষা জিন যেন কয়টা আছে?’

তামাক টানতে টানতে চান্দ শাহ উদাস গলায় বলে, ‘আমার পোষা না। আমার বাপজান পুষেছিলেন— এখন আমার দখলে আছে। তিনটার ভেতর

একটার মৃত্যু হয়েছে। এখন আছে দুইটা। একজনের নাম দাস্তিন, আরেকজনের নাম নাস্তিন। এরা দুই সহোদর ভাই।’

‘দুই জিন আফনের হুকুমের চাকর। হেই দুই জিনরে দিয়া এক কলসি সোনার মোহর আনাইয়া দেন। যে কয়টা দিন বাঁচি আরাম কইরা বাঁচি। ভালোমন্দ কিছু খানা খাই। দুই হাতে ছয় গাছি, ছয় গাছি সোনার চুড়ির আমার বড় শখ।’

চান্দ শাহ গম্ভীর মুখে বলে, ‘সোনার মোহরের কলসি কোনো ব্যাপারই না বউ। জিনেরে আইজ বললে আইজই আইন্যা দিবে। কিন্তু নিষেধ আছে। নিজের লাভের জন্যে কিছু করার উপায় নাই। আমার হাত-পা বান্ধা বউ। তাহলে শোন তোমারে একটা গল্প বলি— আমার পিতার আমলের কথা। উনার যেমন জিনসাধনা ছিল, তেমনি ছিল পরীসাধনা। একটা পরী ছিল ওনার খুব পেয়ারের। তার নাম একরার বেগম। বড় সৌন্দর্য ছিল সে! চান্দের আলোর মতো গায়ের রঙ। আহা রে, কী বিউটি!’

‘কানের কাছে ভ্যান ভ্যান কইরেন না। জিনসাধনা পরীসাধনা, ওরে আমার সাধক রে! দূর হন দেখি, দূর হন।’

স্ত্রীর কটু কথায় চান্দশাহর মতো বড় সাধককে খুঁষি বিচলিত হতে দেখা যায় না। সে হুঁক্কা হাতে বাড়ির সামনের উঠানে ছাতিম গাছের নিচে এসে বসে। দিনের বেশিরভাগ সময় এই গাছের নিচেই সে বসে। কিছুদিন আগেও ছাতিম গাছে একটা সাইনবোর্ড ঝুলতো—

চান্দশাহ ফকির
জিনসাধনা, পরীসাধনা,
আজিজ, জাদু-টোনা, বশীকরণ,
বাঁচি চালনা, তেলপড়া, চুনপড়া
বিফলে মূল্য ফেরত

রোদে, বৃষ্টিতে, ঝড়ে, তুফানে সাইনবোর্ড পচে গলে গিয়েছে। নতুন সাইনবোর্ড কিনতে একশ’ কুড়ি টাকা লাগে। এত টাকা চান্দ শাহর নেই। সে হত-দরিদ্র। কাজেই তাকে এখন মূর্তিমান সাইনবোর্ড হিসাবে বসে থাকতে হয়। বাড়ির সামনে দিয়ে কেউ গেলে গম্ভীর আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাস করে— ‘কে যায়? আজিজ মিয়া না? খবর কী? বস, দুই একটা গফসফ করি। শরীর ভালো? মুখটা মলিন দেখতেছি কেন?’

আজিজ মিয়ার তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। ভিন গ্রামের কেউ গুণীনের খোঁজে এলে চান্দশাহ ফকিরের ভাবভঙ্গি বদলে যায়। সে ভারি গলায় বাড়ির দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়— ‘মোবারক, তামুকে আগুন দেও দেখি।’ মোবারককে এম্নিতে তুই তুই করে বলা হলেও এই সময় তার সম্বোধন হয়ে যায় তুমি।

মোবারক চান্দ শাহ ফকিরের সঙ্গে থাকে। ফকিরকে সে মামা ডাকে। তার বয়স এগারো। অকাট গাধা। গাধারা যেমন কাজকর্মে ভালো হয় মোবারকও কাজকর্মে ভালো। রান্নাবান্না, কলসি করে টিউবওয়েলের পানি আনা, হাট-বাজার করা, কাপড় ধোয়া, রোগীর যত্ন— সব সে একাই করে। হাসিমুখে করে। চান্দশাহ ফকির মোবারককে বেতন দেয় না, সেই সামর্থ্য নেই। দুবেলা খাওয়া দিতে পারে না, বেতন তো অনেক পরের ব্যাপার। মোবারকের তা নিয়ে মাথাব্যথাও নেই। সে আনন্দেই আছে, কারণ চান্দশাহ ফকিরের আশপাশে থাকাকেও সে ভাগ্য বলে মনে করে। চান্দ শাহ ফকির তাকে পছন্দও করে। মন-টন খুব উদাস হলে মোবারককে ডেকে বলে—

‘ও মোবারক! তোর কোনো চিন্তা নাই— মন দিয়া কাজকর্ম কর। আমার মৃত্যুর আগে তোরে একটা ফকিরবিদ্যা দিয়া যাব। সব দিতে পারব না। বড় কঠিন বিদ্যা। তবে একটা পারি। একটা বিদ্যাই যথেষ্ট। সারা জীবন এই বিদ্যা বেইচ্যা খাবি। সুখে থাকবি। ক’ দেহি কোন বিদ্যা চাস? মন-পড়া শিখবি? টেলিভিশনের পর্দায় যেমুন ছবি দেখা যায় তেমন নথের উপরে ফকফকা কালার ছবি দেখবি। তোর রাশিটা কী? তুলারাশি ছাড়া আরার হয় না।’

‘রাশি কী তা তো ফকির মামা জানি না।’

‘আইচ্ছা, দেখব নে পরীক্ষা কইরা। তুলারাশি বইল্যা মনে হয় না। তুই বিরাট গাধা। তুলারাশির মধ্যে গাধা হয় না। যাই হউক, তুই চিন্তা করিস না। জবান যখন দিছি তোরে একটা বিদ্যা দিয়া যাব। কোন বিদ্যা চাস? বল মুখ ফুইট্যা। শরমের কিছু নাই। শরম নারীর ভূষণ, পুরুষের কলঙ্ক।’

‘আস্কাইর মন্ত্র শিখাই দিয়েন।’

‘আরে ব্যাটা তুই কিস কি! এই মন্ত্র যারে-তারে দেওয়া যায় না। বড় কঠিন মন্ত্র। দুই বার এই মন্ত্র পইড়া ডাইন কান্দে একবার ফু, বাঁও কান্দে একবার ফু, বাস, আর দেখা লাগবে না। তুই হবি অদৃশ্য। তুই সবেরে দেখবি, তোরে কেউ দেখব না। তুই হবি অদৃশ্য মানব। এই মন্ত্র যারে তারে দেয়া যায় না— শোন তাহলে একটা গফ— আমার তখন জোয়ান বয়স। বাঁশখালি অঞ্চলের নামকরা চোর মজনু মিয়া এক রাইতে আমার পায়ে আইস্যা পড়ল। দুইটা মন্ত্র চায়— নিদলী মন্ত্র আর আস্কাইর মন্ত্র। বলে কি— ফকির সাব, এই দুই মন্ত্র দেন— আর টেকা কী লাগব কন। টেকা কোনো বিষয় না।’

আমি বললাম, ‘এইটা তো হবে না। এই মন্ত্র যার-তার হাতে দেওয়া যায় না। ওস্তাদের নিষেধ আছে। কঠিন নিষেধ।’

মজুন মিয়া তখন আমারে ভয় দেখায়। বলে কি! মন্ত্র না দিলে ফকির সাব আফনের কিন্তু অসুবিধা হবে। আমি সহজ লোক না। আমি জটিল লোক।

আমি মনে-মনে হাসলাম। যার জিনসাধনা তারে ভয় দেখায়। হাতি-ঘোড়া

গেল তল পিপীলিকা বলে কত জল। হায় রে বেকুব! পরের ঘটনা বিরাট ইতিহাস।

‘ইতিহাস কী?’

চান্দ শাহ ফকির উদাস গলায় বলে, ‘সব ইতিহাস শুননের দরকার নাই মোবারক। কাজ কর, কাজ কর। মন দিয়া কাজ করলে তোর গতি করে দিয়ে যাব। চান্দ শাহ ফকির জবান ঠিক রাখে।’

‘ইতিহাসটা কী জাননের ইচ্ছা হইতাছে মামা।’

‘দিক করিস না মোবারক। কাজ করতে করতে বলছি কাজ কর। গুণীন যারা, তারার বথা বলতে হয় কম। কথা বেশি বললে মন্ত্রের জোর কমে। আইজ এক দিনে মেলা কথা বইল্যা ফেলছি। আর না।’

কথা বললে যদি মন্ত্রের জোর কমে তাহলে চান্দ শাহ ফকিরের মন্ত্রে কোনো জোর থাকার কথা না। কথা বলার কোনো সুযোগই সে নষ্ট করে না। অন্য গ্রামের অচেনা কেউ এলে তো কথাই নেই। এ রকম ঘটনা আজকাল ঘটে না। পীর-ফকির গুণীনের আগের রমরমা নেই।

আগে কি দিন ছিল আর এখন কি দিন! চান্দ শাহ ফকির ছাতিম গাছের নিচে বসে বর্তমান দিনের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আগের দিনে কথায় কথায় গুণীন ডাকতো। গুণীন ছাড়া সমাজ ছিল অচল।

পাগলা কুকুরের কামড় : হলুদ পোড়া।

সাপের কাটা : কালো তাপার।

জিনের দৃষ্টি : লোহাপাড়া। মোলেমানি তাবিজ।

ভূতের বাতাস : সরিষা পাড়া।

পরীর নজর : বাড়ি বন্ধন।

চোরের উপদ্রব : কণ্টক মন্ত্র।

নয়া আবু লাজে ঘুমায় না, চিল্লাফাল্লা করে : আবু নিদালী।

সেই আমলে একটা গুণীনের দিন ভালোই চলে যেত। খাওয়া-পরার রমরমা না থাকলেও অনাহারে থাকতে হতো না। নতুন ধান উঠলে গুণীনের বাড়িতে এক ধামা ধান পাঠিয়ে দেয়া রেওয়াজের মধ্যে ছিল। লাউগাছে দশটা লাউ ফললে একটা লাউ পাঠিয়ে দেও গুণীনের কাছে।

এইসব সভ্যতা-ভব্যতার আজকাল কিছুই নাই। মন্ত্র-তন্ত্রের উপর থেকে মানুষের বিশ্বাস উঠে গেছে। পাগলা কুকুরে কামড় দিলে হলুদ পোড়ার জন্যে তার কাছে আসে না। রোগী নিয়ে সোজা চলে যায় সদরে। নাভির মধ্যে সাত ইনজেকশান। এতে নাকি রোগ আরাম হয়। কী বে-সম্ভব কথা!

চান্দ শাহ ফকিরের দিনকাল বড়ই খারাপ যায়। স্ত্রীর কটু কথা মুখ বুজে শুনতে হয়। অভাব-অনটনে রোগ-ব্যাধিতে ফুলবানুর মাথা থাকে চড়া। কড়া কথা যখন বলে কঠিন করেই বলে। আগে হঠাৎ বলতো, ইদানীং প্রায় রোজই

করছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ছাতিম গাছের নিচ থেকে ঘরে ঢুকতে আজকাল চান্দ শাহ ফকির আতঙ্কগ্রস্ত হয়। মনে হয়, না জানি কপালে কি আছে।

চান্দ শাহ ফকির রাতে শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়তে পারে না। বয়সের কারণে তার ঘুম কমে গেছে। বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকতেও তার ভালো লাগে না— গল্প করতে ইচ্ছা করে। ফকিরী গল্প শুরু করলে ফুলবানু এমন হইচই শুরু করে যে চান্দ শাহর আফসোসের সীমা থাকে না— কেন সে গল্প শুরু করল! চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকলে এই যন্ত্রণা হতো না। একে বলে খাল কেটে কুমীর আনা।

আজ রাতেও এ রকম খাল কাটার ব্যাপার ঘটেছে। চান্দ শাহ ফকির মনের আনন্দে খাল কেটে যাচ্ছে। সে তার এক ফকিরী গল্প শুরু করেছে। গল্প বলতে বড় ভালো লাগছে। সে বুঝতেই পারছে না কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কাটা খালে কুমীর আসবে। আলিশান কুমীর।

‘বুঝা বউ, তখন আমার যৌবনকাল। তোমার সঙ্গে কোনো বিবাহ হয় নাই। টুকটাক ফকিরি করি। ফকিরের তো আর চরিত্র খারাপ কাজ না। যখন ডাক পড়ে— ফট। বাকি সময় গান-বাজনা করি। যৌবনকালে ঢোল ভালো বাজাইতাম। মন্দিরাও শিখছিলাম। তবে ঢোল হইল মন্দিরার চেয়ে কঠিন বিদ্যা। শুনতেছ বউ?’

‘শুনতেছি। বলেন।’

‘তখন মুরাদপুর গ্রাম থাইকল একটা ডাক পাইলাম। মুরাদপুর গ্রামের বিশিষ্ট জোতদার ইয়াজুদ্দীন হাওলাদার মহিষের গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে নিবার জন্যে। কারণ, তাঁর পুত্রবধূর প্রসববেদনা। বউ শুনতেছ? বড়ই চমকপ্রদ কাহিনী!

‘আফনের চককপ্রদ কাহিনী শুনতেছি।’

‘হাওলাদার সাহেবের পুত্রবধূ হইল মৃতবৎসা। মৃতবৎসা বুঝা তো—সন্তান হয়, আর বাঁচে না। আমার ডাক পড়ছে বিষয় কী দেখার জন্যে। গিয়া দেখি মেলা ডাক্তার-কবিরাজ আছে, আমিও তাদের মধ্যে शामिल হইলাম। হাওলাদার সাহেব বিরাট সম্মান করলেন। হাত ধইরা অন্দরে নিয়া গেলেন। হাঁক-ডাক শুরু করলেন— ফকির সাবেরে পাও ধোয়া, পানি দে, শরবত দে।’

‘জামাই আদর।’

‘একসময় আমার কদর ছিল বউ। জামাই আদরই ছিল—গুণীন তো আর পথেঘাটে জন্মায় না। দশ গ্রামে বিশ গ্রামে একটা। যাই হোক, গল্পটা শোন— আমি উঠানে বইস্যা দুই ঝাড়া দিয়া পাইলাম—হাওলাদার সাহেবের পুত্রবধূ জিনের সাথে একবার বেয়াদবি করছিল।’

‘কী বেয়াদবি?’

‘জিন পুসকুনিতে গোসল কইরা পাকপবিত্র হইয়া আসতেছিল, তখন হাওলাদার সাহেবের পুত্রবধূ নাক ঝাড়া দিয়া তার গায়ে নাকের সর্দি ফেলছে। তারপর থাইক্যা জিন লাগছে তার পিছনে। অল্প বয়সি চেংড়া জিন— নাম হইল কলিন্দর শাহবাজ। এরার মিজাজ খুবই চড়া থাকে। এই হইল ইতিহাস।’

‘আপনে কী করলেন? জিনের শইলের সর্দি মুইছ্যা দিলেন?’

‘তা না। জিন তাড়াইলাম। দেশছাড়া করলাম।’

‘এক্কেবারে দেশান্তরি?’

‘অবশ্যই। মন্ত্রের তো আমার কাছে অভাব নাই বউ। একটায় কাজ না করলে আরেকটা দেই। কোনো কিছুই যখন কাজ করে না তখন আছে কুফুরি কালাম। বড় কঠিন জিনিস। অযুধের মধ্যে যেমন পেনিসিলিন ইনজেকশন— মন্ত্রের মধ্যে তেমন কুফুরি কালাম। পাক কোরানের কলাম উল্টাপাল্টা কইরা পড়তে হয়। বিরাট গুনার কাজ। কিন্তু উপায় কি! গুণীন হইয়া জন্মাইছি, গুনা তো করতেই হইবে। রোজ হাশরে এর শক্ত বিচার হবে। আমরা যারা গুণীন আমাদের সামনে তোমরা চলচেলইয়া বেহেশতে ফাইবা। আর আমরা দোজখের আগুনে পুঁইড়া মরব। এটাই বিধান।’

চান্দ শাহ ফকির তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে গল্প শেষ করে। বারুদের মতো জ্বলে উঠে ফুলবানু।

‘এইসব মিথ্যা কথা বইল্যা আফনে মানুষ ঠকান? আফনের লজ্জা নাই?’

ফুলবানু রোগের কথা ভুলে বিছানায় উঠে বসে। চান্দ শাহ ফকির শঙ্কিত বোধ করে। কাটা খাল বেঞ্চে কুমীর চলে এসেছে। তাও ছোটখাট কুমীর না, বিরাটাকার কুমীর।

‘দুনিয়ার বেবাক মন্ত্র গুইল্যা খাইছেন, বলতে শরম লাগে না?’

চান্দ শাহ ফকির ক্ষীণ গলায় বলল, ‘শরমের কী আছে? শরম নারীর ভূষণ, পুরুষের কলঙ্ক।’

‘শরমের কিছু নাই? তা হইলে মন্ত্রের একটা খেলা দেখান দেখি? নিদালী মন্ত্র পইরা একটা ফুঁ দিয়া আমারে ঘুম পাড়াইয়া দেন। না দিলে আইজ অসুবিধা আছে।’

‘রাইত দুপুরে কি চিল্লা ফাল্লা শুরু করলা?’

‘হয় মন্ত্রের খেলা আইজ আফনে দেখাইবেন, নয় গলায় গামছা দিয়া কইবেন— মন্ত্র-ফন্ত্র কিছু জানি না। যা বলি সবই মিথ্যা।’

‘এইটা যদি স্বীকার পাই তাইলে তো মিথ্যা কথা হয়, মিথ্যা বলি ক্যামনে বউ?’

‘ওরে বাবা রে, আমার সত্যবাদী রে!’

‘বুঝালা বউ, মন্ত্র-তন্ত্রের এই বিদ্যা যারা চর্চা করে মিথ্যা বলা তাদের জন্যে সম্পূর্ণ নিষেধ।’

ফুলবানু হাসতে শুরু করে। অপ্রকৃতস্থ মানুষের হাসি। হাসতে হাসতে তার হিক্কা উঠে যায়। চান্দ শাহ ফকির বড় অসহায় বোধ করে। মনে-মনে বলে—কী যে যন্ত্রণায় পড়লাম! গল্প শুরু না করলেই হতো।

এক শ্রাবণ মাসের মধ্যরাতে ফুলবানুর বুকে তীব্র ব্যথা হলো। বিছানায় শুয়ে সে ছটফট করতে লাগল। সমস্ত শরীর তার নীলবর্ণ হয়ে গেল। চান্দ শাহ ফকির স্ত্রীর অবস্থা দেখে অবাক হলো। মুখে স্বীকার না করলেও স্ত্রীকে সে পছন্দ করে। তার চিৎকার, তার রাগারাগি সবই পছন্দ করে। চান্দ শাহ ফকিরের ইচ্ছা করতে লাগল চিৎকার করে কাঁদে। গুণীনদের জন্যে চোখের পানি ফেলা পুরোপুরি নিষিদ্ধ বলে চোখের পানি ফেলতে পারছে না। ফুলবানু স্বামীকে ডেকে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, ‘আমার মৃত্যুর সময় হইছে। আফনেরে একটা অনুরোধ।’

চান্দশাহ বলল, ‘বল বউ কী অনুরোধ। তুমি যা বলবে আমি তাই করব। জিন চালান দিয়া অমুখ আইন্যা দিতাছি। একটু সবুজ কর। জিনের রাজধানী হইল কোহকাফ নগর। সেই রাজধানী থাইক্যা অমুখ চইল্যা আসবে।’

‘আবার মিথ্যা?’

চান্দ শাহ নিশ্বাস ফেলল। আগের মতো জোর গলায় বলতে পারল না—সে যা বলছে তা মিথ্যা না। ফুলবানু হাঁপাতে বলল, ‘মন্ত্র-তন্ত্র নিয়া আর মিথ্যা ভণ্ডামি কইরেন না। আফনের আঙ্গুর দোহাই লাগে।’

চান্দ শাহ ধরা গলায় বলল, ‘আচ্ছা যাও করব না।’

‘মোবারকরে ডাক দিয়া বলেন, সব মিথ্যা। বোকাসোকা মানুষ, একটা আশার মধ্যে আছে। আশা তাকে অদৃশ্য মন্ত্র দিবেন।’

‘আচ্ছা, তাকে বলতেছি।’

‘এখনই বলেন।’

‘এত অস্থির হইও না বউ। শান্ত হও।’

‘শান্ত পরে হবে—আগে আপনে তাকে বলেন। আমার সামনে আইন্যা বলেন। নিজের কানে শুনি।’

চান্দ শাহ মোবারককে ডেকে আনলেন। ধরা গলায় বললেন, ‘মোবারক শোন, মন্ত্র-ফন্ত্র আসলে কিছু না। এতদিন তোর যা বলছি সবই মিথ্যা। বুঝছস?’

‘জি না।’

ফুলবানু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ‘মন্ত্র হইল ধাপ্পাবাজি, বুঝছস? মন্ত্র বইলা কিছু নাই। মন্ত্র থাকলে আইজ আমার এই অবস্থা? খাওন নাই, পিন্দনের

কাপড় নাই, রোগে চিকিৎসা নাই। মন্ত্র হইল মিথ্যা।’

‘মন্ত্র মিথ্যা মামি?’

‘হ রে ব্যাটা মিথ্যা। তুই বেহুদা তর মামার পিছে পিছে ঘুরিস না। কাজ কইরা খা।’

‘জি আইচ্ছা।’

‘জি আইচ্ছা না। আইজই বিদায় হ— এক্ষণ যা।’

চান্দ শাহ ফকির বিরক্ত গলায় বলল, ‘এক্ষণ যাওয়ার দরকার কী? ধীরে সুস্থে যাইব। ঘরে এমন রোগী, কখন কী দরকার হয়।’

ফুলবানু বড় বড় নিশ্বাস নিতে নিতে বলল, ‘না, হে এক্ষণ যাইব। এক্ষণ। এক্ষণ বিদায় না হইলে আফনে তারেও মন্ত্র শিখাইবেন। হেও হইব আফনের মতো ধান্দাবাজ। তার জীবন কাটব দুঃখে দুঃখে...।’

‘ঠিক আছে অস্থির হইও না। ব্যবস্থা করতেছি।’

‘ব্যবস্থা করা করি না। মোবারকরে বিদায় করেন। টেকা পয়সা যদি কিছু থাকে মোবারকের হাতে দিন। দিয়া বিদায় করেন।’

ফুলবানুকে শান্ত করার জন্যে সেই রাতেই মোবারককে বিদায় করতে হলো। ফুলবানুর অস্থিরতা তাতে কমল না। আরো বেড়ে গেল। তার শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। তার কষ্ট চোখে দেখা যায় না। চান্দ শাহ ফকিরের চোখে পানি এসে গেল। গুণীন মানুষের চোখে পানি আসা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। মন্ত্রের জোর বলে কিছু থাকে না। কিন্তু সে চোখের পানি সামলাতে পারছে না।

ফুলবানু স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কানতেছেন ক্যান? পুলাপানের মতো দিক্কর দিয়া কান্দন। ছিঃ ছিঃ! মানুষ হইয়া জন্মাইছি, রোগ হইব। ব্যাধি হইব— একদিন মরণ হইব। কান্দনের কি? চউখ মুছেন।’

চান্দ শাহ চোখে মুছল। সেই চোখ সঙ্গে সঙ্গে জলে ভর্তি হয়ে গেল। ফুলবানু অতি কষ্টে শ্বাস টানতে টানতে বলল, ‘আফনে আমার সামনে থাইক্যা যান। আমার সামনে বইস্যা আফনের কষ্ট হইতেছে।’

‘কই যাব?’

‘ছাতিম গাছের তলে গিয়ে বসেন।’

‘কী যে তোমার কথা!’

‘আমার কথা ঠিক আছে। আপনে যান কইলাম— এক্ষণ যান। শইলডা একটু ভালো বোধ হইলে ডাক দিব।’

‘বউ।’

‘আবার কথা?’

চান্দ শাহ ফকির হুঁকা হাতে ছাতিম গাছের নিচে বসল। কৃষ্ণপক্ষের মরা চাঁদ উঠেছে। চারদিকে গা-ছমছমা আলো। ঘরের ভেতর থেকে ফুলবানুর

কাতরানি শোনা যাচ্ছে। এমন সময় একটা অদ্ভুদ ঘটনা ঘটল। চান্দ শাহ ফকিরকে চমকে দিয়ে কে একজন মিষ্টি গলায় ডাকল— ‘ফকির সাব।’ চান্দ শাহ চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। ভয়ে সে অস্থির হয়ে গেল। ফুলের গন্ধে চারদিক ম-ম করছে। কেথেকে আসছে এত মিষ্টি সুবাস?’

‘কে, কে? কে কথা বলে?’

মিষ্টি গলা আবার শোনা গেল— ‘ওমা, ভয়ে আপনি দেখি আধামরা! যে দিন-রাত জিন-সাধনা, পরী-সাধনার কথা বলে তার এমন ভয় পেলে চলে?’

‘আপনি কে?’

‘আমি পরী।’

চান্দ শাহ হতভম্ব গালায় বলল, ‘পরী বইল্যা দুনিয়ায় কিছু নাই।’

‘ওমা, আজ দেখি উল্টা কথা।’

‘উল্টা না, এইটা সত্য।’

‘এইটা যদি সত্যি হয় তাহলে আমার কথা কীভাবে শুনছেন?’

‘রোগে-শোকে, অভাবে-অনটনে মনের মধ্যে ধাক্কা লাগছে। ধাক্কার কারণে কথা শুনতেছি। আসলে কিছু না।’

‘ভালো করে তাকান। তাকিয়ে দেখেন তো কী ব্যাপার!’

চান্দ শাহ ফকির ভালো করে তাকাল। আরে তাই তো, তার সামনে একটা পরীই তো দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে কিশোরী মেয়েদের মতো। শুধু চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। পাখা আছে—পাখা দু’টা অল্প অল্প কাঁপছে। ফুলের গন্ধ আসছে পরী মেয়েটার গা থেকে। কী অদ্ভুদ গন্ধ আর কী সুন্দর মেয়েটার মুখ! পরী ঠোট টিপে হাসতে হাসতে বলল, ‘দেখলেন?’

চান্দ শাহ কিছু বলল না। বলবে কী? সে পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে। পরী আবার কী?

‘কি! মুখে দেখি বাক্য নেই। বিনা আগুনে হুকা টানছেন। হুঁকায় আগুন দেয়ার কেউ নেই। মোবারক চলে গেছে?’

‘জি।’

‘ঘরে এমন রোগী, জীবন-মরণ ব্যাপার। আর মোবারক চলে গেল?’

চান্দ শাহ কী বলবে ভেবে পেল না। শরীর বন্ধন মন্ত্রটা কি পড়বে? পড়ে ফেলা দরকার। এই পরী মেয়েটার কাণ্ডকারখানা ভালো ঠেকছে না। যদিও মন্ত্র-তন্ত্র বলে কিছু নেই। নেই-ই বা বলা যায় কী ভাবে? চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে পাখাওয়ালা পরী। কী আজব কাণ্ড!

‘চান্দ শাহ ফকির।’

চান্দ শাহ জবাব দিল না। শরীর বন্ধন মন্ত্র মনে করার চেষ্টা করতে লাগল—

দোহাই দোহাই
তিন পীর ।
কিরপিন সবে নীর॥
লক্ষ্মী ও মনসা ।
মা কালী ভরসা ।
দিলাম দেহ বন্ধন
রক্তবর্ণ চন্দন॥
ফুলের নাম জবা ।
পশ্চিমে রয় কাবা ।
কাবার ঘরে ছয় কুঠুরী...

পরী খিলখিল করে হেসে উঠল। চান্দ শাহ ফকিরের মন্ত্রে গণ্ডগোল হয়ে গেল। দেহ-বন্ধন মন্ত্র দীর্ঘ মন্ত্র। একবার আউলা লেগে গেলে গোড়া থেকে পড়তে হবে।

‘চান্দ শাহ ফকির বিড়বিড় করে কী পড়ছেন? মন্ত্র?’

‘জি।’

‘কী মন্ত্র? দেহ বন্ধন?’

‘হুঁ।’

‘মন্ত্র-তন্ত্র বলে কি কিছু আছে?’

‘আপনে কে?’

‘একবার তো বললাম। আবার বলতে হবে? আমি পরী।’

‘ও আচ্ছা।’

‘আমি আপনার বাড়ির উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলাম, আপনার চোখের পানি দেখে নেমে এলাম। কী দাঁড়াছিলেন কেন?’

চান্দ শাহ চুপ করে রইল। বলবেই বা কী? বলার মতো কোনো কথা কী আর আছে!

‘শুনুন চান্দ শাহ, আমার হাতে একেবারে সময় নেই। আমি এক্ষুণি চলে যাব। তবে নেমেছি যখন, তখন আপনার একটা ইচ্ছা পূরণ করব। বলুন কী চান? যা চান তাই পাবেন। তবে একটা মাত্র জিনিস। বলে ফেলুন? এক কলসি সোনার মোহর দিলে হবে? এক কসীর জায়গায় সাত কলসিও দিতে পারি। তবে ধনদৌলত বেশি হলেও সমস্যা হয়। দেব এক কলসি মোহর?’

‘জি না।’

‘ধনদৌলত চান না। তাহলে কী চান? সম্মান? লোকজন আপনাকে দেখেই সালাম করবে। যত বড়মানুষই হোক, আপনাকে দেখে উঠে দাঁড়াবে?’

‘জি না।’

‘বাকি রইল কী— ক্ষমতা। ক্ষমতাও খুব ভালো জিনিস। সম্মানের চেয়ে ক্ষমতা অনেক মধুর— ক্ষমতা চান?’

‘জি না।’ আপনি ফুলবানুরে ভালো কইরা দেন।’

‘উদ্ভট কথা বলেন কী ভাবে! ফুলবানুরে আমি ভালো করব কী ভাবে? আমি কি ডাক্তার— মেডিক্যাল কলেজের ডিগ্রি আছে আমার? আপনাকে বুদ্ধিমান লোক বলে ভেবেছিলাম— এখন তো দেখছি আপনি বোকা! মহা বোকা! ফুলবানু যে দজ্জাল, ভালো হয়ে গেলে আপনকে তো কচলে ফেলবে।’

‘কচলাইলেও ক্ষতি নাই।’

‘কচলালেও ক্ষতি নেই? তাহলে তো ভালো করে দিতেই হয়। আচ্ছা ঠিক আছে দিচ্ছি ভালো করে। যান, ঘরে যান, ঘরে গিয়ে দেখুন। আর আমি বিদায় হচ্ছি।’

পাখির ডানা ঝাপ্টানোর মতো শব্দ হলো। হতভম্ব চান্দ শাহ ফকিরের চোখের সামনে পরী আকাশের উঠে গেল। পরী চলে গেলেও তার গায়ের গন্ধ এখনো রয়ে গেছে। ঘরের ভেতর থেকে ফুলবানু ডাকল, ‘এই যে ফকির সাব, শুইন্যা যান।’

চান্দ শাহ ঘরে ঢুকে দেখে ফুলবানু খাটে বসে আছে। তার মুখটা হাসি হাসি। চান্দ শাহকে দেখে সে খানিকটা লজ্জামুগ্ধ গলায় বলল, ‘বুকের ব্যথাটা হঠাৎ কইর্যা চইল্যা গেছে।’

‘বল কি!’

‘শইলটাও ভালো ঠেকতেছে।’

‘হুঁ।’

‘দেখেন না নিজে-নিজে উইঠ্যা বসছি।’

‘হুঁ।’

‘পিয়াস লাগছে। এক গ্লাস পানি দেন তো।’

চান্দ শাহ অতি দ্রুত পানি নিয়ে এল। ফুলবানু তৃপ্তির সঙ্গে গ্লাস শেষ করে বলল, ‘হঠাৎ শরীরটা এমন ভালো ঠেকতেছে কেন কিছুই বুঝলাম না।’

চান্দ শাহ বলল, ‘ঘটনা তোমারে বলি। বড়ই চমকপ্রদ ইতিহাস। হইছে কি— ছাতিম গাছের নিচে বইসা ছিলাম, হঠাৎ দেখি চোখের সামনে এক পরী। বড় সৌন্দর্য চেহারা! বড় বিউটি!’

‘চোখের সামনে কী দেখলেন? পরী?’

‘হুঁ, পরী।’

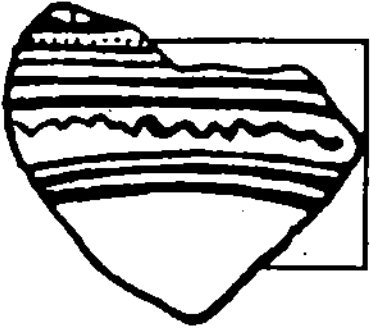
‘আবার শুরু করছেন? আবার?’

চান্দ শাহ চুপ করে গেল। এমন সুন্দর একটা গন্ধ। এমন এক চমকপ্রদ ইতিহাস কিন্তু সে তার স্ত্রীকে বলতে পারবে না। কোনোদিনই বলতে পারবে না। এরচে’ দুঃখের ব্যাপার আর কী-ই বা হতে পারে।

ফুলবানু খাট থেকে নেমেছে। সে হেঁটে হেঁটে দরজা পর্যন্ত গেল। তার বিস্ময়ের সীমা নেই—দীর্ঘ পাঁচ বছর পর সে নিজে হেঁটে দরজা পর্যন্ত গিয়েছে।

ফুলবানু দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কৃষ্ণপক্ষের মরা জোছনাও তার কাছে অপূর্ব লাগছে। ফুলবানু মুগ্ধ গলায় বলল, ‘জংলা কী ফুল জানি ফুটছে। কী গন্ধ!’

ফুলের গন্ধের রহস্যের ‘চমকপ্রদ ইতিহাস’ চান্দ শাহ ফকির জানে, কিন্তু তার বলার উপায় নেই। সেও এসে স্ত্রীর পাশে দাঁড়াল।



আয়না

সকাল সাড়ে সাতটা। শওকত সাহেব বারান্দায় উঁবু হয়ে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা মোড়া, মোড়ায় পানিভর্তি একটা মগ। পানির মগে হেলান দেয়া ছোট্ট একটা আয়না। আয়নাটার সম্মুখ ভেঙে গেছে বলে কিছু একটাতে ঠেকা না দিয়ে তাকে দাঁড়া করানো যায় না। শওকত সাহেব মুখ ভর্তি ফেনা নিয়ে আয়নাটার দিকে তাকিয়ে আছেন। দাড়ি শেভ করবেন। পঁয়তাল্লিশ বছরের পর মুখের দাড়ি শক্ত হয়ে যায়। ইচ্ছা করলেই রেজারের একটানে দাড়ি কাটা যায় না। মুখে সাবান মেখে অপেক্ষা করতে হয়। একসময় দাড়ি নরম হবে, তখন কাটতে সুবিধা।

দাড়ি নরম হয়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর শওকত সাহেব রেজার দিয়ে একটা টান দিতেই তাঁর গাল কেটে গেল। রগ-টগ মনে হয় কেটেছে, গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। শওকত সাহেব এক হাতে গাল চেপে বসে আছেন। কিছুক্ষণ চেপে ধরে থাকলে রক্ত পড়া বন্ধ হবে। ঘরে স্যাভলন কিছু আছে কিনা কে জানে। কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না। সকাল বেলার সময়টা হলো ব্যস্ততার সময়। সবাই কাজ নিয়ে থাকে। কী দরকার বিরক্ত করে?

এই এক মাসে চারবার গাল কাটল। আয়নাটাই সমস্যা করছে। পুরানো আয়না, পারা নষ্ট হয়ে গেছে। কিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না। একটা ছোট্ট আয়না কেনার কথা তিনি তাঁর স্ত্রী মনোয়ারাকে কয়েক বার বলেছেন। মনোয়ারা

এখনো কিনে উঠতে পারেনি। তার বোধহয় মনে থাকে না, মনে থাকার কথাও না। আয়নাটা শওকত সাহেব একাই ব্যবহার করেন। বাসার সবাই ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়না ব্যবহার করে। কাজেই হাত-আয়নাটার যে পারা উঠে গেছে মনোয়ারার তা জানার কথা না। আর জানলেও কি সব সময় সব কথা মনে থাকে?

শওকত সাহেব নিজেই কতবার ভেবেছেন অফিস থেকে ফেরার পথে একটা আয়না কিনে নেবেন। অফিস থেকে তো রোজই ফিরছেন, কই, আয়না তো কেনা হচ্ছে না। আয়না কেনার কথা মনেই পড়ছে না। মনে পড়ে শুধু দাড়ি শেভ করার সময়।

শোবার ঘর থেকে শওকত সাহেবের বড় মেয়ে ইরা বের হলো। সে এক ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে। সে জন্যেই সব সময় এক ধরনের ব্যস্ততার মধ্যে থাকে। শওকত সাহেব বললেন, ‘মা, ঘরে স্যাভলন আছে?’

ইরা বলল, ‘জানি না বাবা।’

সে যে রকম ব্যস্তভাবে বারান্দায় এসেছিল সে রকম ব্যস্ত ভঙ্গিতেই আবার ঘরে ঢুকে গেল। বাবার দিকে ভালোমতো তাকালোও না। তার এত সময় নেই।

রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে কিনা এটা দেখার জন্যে শওকত সাহেব গাল থেকে হাত সরিয়ে আয়নার দিকে তাকালেন। আচ্ছ! কাণ্ড! আয়নাতে দেখা যাচ্ছে ছোট একটা মেয়ে বসে আছে। আচ্ছ! নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটার গায়ে লাল ফুল আঁকা সুতির একটা ফ্রক। খালি পা। মাথার চুল বেণী করা। দু’দিকে দু’টা বেণী ঝুলছে। দু’টা বেণীতে দু’রঙের ফিতা। একটা লাল একটা শাদা। মেয়েটার মুখ গোলাপ, চোখ দু’টা বিষণ্ণ। মেয়েটা কে?

শওকত সাহেব ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালেন। তাঁর ধারণা হলো, হয়তো টুকটাক কাজের জন্যে বাচ্চা একটা কাজের মেয়ে রাখা হয়েছে। সে বারান্দায় তাঁর পেছনে বসে আছে তিনি এতক্ষণ লক্ষ করেননি।

বারান্দায় তাঁর পেছনে কেউ নেই। পুরো বারান্দা ফাঁকা। তা হলে আয়নায় মেয়েটা এল কোথেকে? শওকত সাহেব আবার আয়নার দিকে তাকালেন। ঐ তো মেয়েটা বসে আছে, তার রোগা-রোগা ফর্সা পা দেখা যাচ্ছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। ব্যাপারটা কী?

মেয়েটা একটু যেন ঝুঁকে এল। শওকত সাহেবকে অবাক করে দিয়ে মিষ্টি গলায় বলল, ‘আপনার গাল কেটে গেছে। রক্ত ঝরছে।’

শওকত সাহেব আবারও ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালেন। না, কেউ নেই। তাঁর কি মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? একমাত্র পাগলরাই উদ্ভট এবং বিচিত্র ব্যাপার-ট্যাপার দেখতে পায়। এই বয়সে পাগল হয়ে গেলে তো সমস্যা। চাকরি চলে যাবে। সংসার চলবে কীভাবে? শওকত সাহেব আয়নার দিকে তাকালেন

না। আয়না হাতে ঘরে ঢুকে গেলেন। নিজের শোবার ঘরের টেবিলে আয়নাটা উল্টো করে রেখে দিলেন। একবার ভাবলেন, ঘটনাটা তাঁর স্ত্রীকে বলবেন, তারপরই মনে হলো— কী দরকার! সবকিছুই সবাইকে বলে বেড়াতে হবে, তা তো না। তা ছাড়া তিনি খুবই স্বল্পভাষী, কারো সঙ্গেই তাঁর কথা বলতে ভালো লাগে না। অফিসে যতক্ষণ থাকেন নিজের মনে থাকতে চেষ্টা করেন। সেটা সম্ভব হয় না। অকারণে নানান কথা বলতে হয়। যত না কাজের কথা— তারচে' বেশি অকাজের কথা। অফিসের লোকজন অকাজের কথা বলতেই বেশি পছন্দ করে।

শওকত সাহেব ইস্টার্ন কমার্শিয়াল ব্যাংকের ক্যাশিয়ার। ক্যাশের হিসাব ঠিক রাখা, দিনের শেষে জমা-খরচ হিসাব মেলানোর কাজটা অত্যন্ত জটিল। এই জটিল কাজটা করতে গেলে মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকা দরকার। অকারণে রাজ্যের কথা বললে মাথা ঠাণ্ডা থাকে না। কেউ সেটা বোঝে না। সবাই প্রয়োজন না থাকলেও তাঁর সঙ্গে কিছু খাজুরে আলাপ করবেই।

‘কি শওকত সাহেব, মুখটা এমন শুকনা কেন? অবসর সঙ্গে ফাইট চলছে নাকি?’

‘আজকের শার্টটা তো ভালো পরেছেন। বয়স মনে হচ্ছে দশ বছর কমে গেছে। রঙে আছেন দেখি।’

‘শওকত ভাই, দেখি চা খাওয়ান। আপনার স্বভাব কাউটা ধরনের হয়ে গেছে। চা-টা কিছুই খাওয়ান না। আজ ছাড়াছাড়ি নাই।’

এইসব অকারণ অর্থহীন কথা শুনতে শুনতে শওকত সাহেব ব্যাংকের হিসাব মেলান। মাঝে-মাঝে হিসাব পণ্ডগোল হয়ে যায়। তাঁর প্রচণ্ড রাগ লাগে। পুরো হিসাব আবার গোড়া থেকে করতে হয়। মনের রাগ তিনি প্রকাশ করেন না। রাগ চাপা রেখে মুখ হাসি হাসি করে রাখার ক্ষমতা তাঁর আছে। মনের রাগ চেপে রেখে অপেক্ষা করেন কখন সামনে বসে থাকা মানুষটা বিদেয় হবে, তিনি তাঁর হিসাব আবার গোড়া থেকে করতে শুরু করবেন। খুবই সমস্যার ব্যাপার। তবে মাসখানিক হলো শওকত সাহেব আরো বড় ধরনের সমস্যায় পড়েছেন। ব্যাংকে কম্পিউটার চলে এসেছে। এখন থেকে হিসাবপত্র সব হবে কম্পিউটারে। চেংড়া একটা ছেলে, নাম সাজেদুল করিম, সবাইকে কম্পিউটার ব্যবহার করা শেখাচ্ছে। সবাই শিখে গেছে, শওকত সাহেব কিছু শিখতে পারেননি।

যন্ত্রপাতির ব্যাপার তাঁর কাছে সব সময়ই অতি জটিল মনে হয়। সামান্য ক্যালকুলেটরও তিনি কখনো ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারেন না। একটা বেড়াচেড়া হয়ে যায়ই। তা ছাড়া যন্ত্রের উপর তাঁর বিশ্বাস নেই। তিনি যত দায়িত্বের সঙ্গে একটা যোগ করবেন যন্ত্র কি তা করবে? কেনই বা করবে? ভুল-ভ্রান্তি করলে বড় সাহেবদের গালি খাবেন, তাঁর চাকরি চলে যাবে। যন্ত্রের তো

সেই সমস্যা নেই। যন্ত্রকে কেউ গালিও দেবে না বা তার চাকরিও চলে যাবে না। তারপরেও কেন মানুষ এত যন্ত্র-যন্ত্র করে? কম্পিউটার তাঁর কাছে অসহ্য লাগছে। অনেকটা টেলিভিশনের মতো একটা জিনিস। হিসাব-নিকাশ সব পর্দায় উঠে আসছে। এম্মিতেই টেলিভিশন তাঁর ভালো লাগে না। বাসায় তিনি কখনো টিভি দেখেন না। যে যেটা অপছন্দ করে তার কপালে সেটাই জোটে, এটা বোধহয় সত্য। তিনি টিভি পছন্দ করেন না। এখন টিভির মতো একটা জিনিস সব সময় তাঁর টেবিলে থাকবে। অফিসে যতক্ষণ থাকবেন তাঁকে তাকিয়ে থাকতে হবে টিভির পর্দার দিকে। যে পর্দায় গান-বাজনা হবে না, শুধু হিসাব-নিকাশ হবে। কোনো মানে হয়?

অফিস শুরু হয় ন'টার সময়। শওকত সাহেব ন'টা বাজার ঠিক দশ মিনিট আগেই অফিসে ঢোকেন। তাঁর টেবিলে পিরিচে ঢাকা এক গ্লাস পানি থাকে। তিনি পানিটা খান। তারপর তিনবার কুল হু আল্লা পড়ে কাজকর্ম শুরু করেন। এটা তাঁর নিত্যদিনের রুটিন। আজ অফিসে এসে দেখেন কম্পিউটারের চেংড়া ছেলেটা, সাজেদুল করিম, তাঁর টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে ভুরু কুঁচকে সিগারেট টানছে। পিরিচে ঢাকা পানির গ্লাসটা খালি। সাজেদুল করিম খেয়ে ফেলেছে নিশ্চয়ই। সাজেদুল করিম শওকত সাহেবকে দেখে উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, 'স্যার, কেমন আছেন?'

'ভালো আছি।'

'আজ আপনার জন্যে সকাল সকাল চলে এসেছি।'

'ও, আচ্ছা।'

'জিএম সাহেব খুব রাগারাগি করছিলেন। আপনাকে কম্পিউটার শেখাতে পারছি না। আজ ঠিক করেছে সারা দিন আপনার সঙ্গেই থাকব।'

শওকত সাহেব কোনো মুখে বললেন, 'আচ্ছা।'

'আমরা চা খাই, চা খেয়ে শুরু করি। কি বলেন স্যার?'

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। বেল টিপে বেয়ারাকে চা দিতে বললেন। সাজেদুল করিম হাসি-হাসি মুখে বলল, 'গত কাল যা যা বলেছিলাম সে সব কি স্যার আপনার মনে আছে?'

শওকত সাহেবের কিছুই মনে নেই, তবু তিনি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

'একটা ছোটখাট ভাইবা হয়ে যাক। স্যার বলুন দেখি, মেগাবাইট ব্যাপারটা কী?'

'মনে নেই।'

'র‍্যাম কী সেটা মনে আছে?'

'না।'

‘মনে না থাকলে নাই। এটা এমন কিছু জরুরি ব্যাপার না। ম্যাগাবাইট, র‍্যাম সবই হচ্ছে কম্পিউটারের মেমোরির একটা হিসাব। একেক জন মানুষের যেমন একেক রকম স্মৃতিশক্তি থাকে, কম্পিউটারেরও তাই। কিছু-কিছু কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তি থাকে অসাধারণ, আবার কিছু কিছু কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তি সাধারণ মানের। মেগাবাইট হচ্ছে স্মৃতিশক্তির একটা হিসাব। মেগা হলো টেন টু দ্যা পাওয়ার সিক্স আর বাইট হলো টেন টু দ্যা পাওয়ার সিক্স ভাগের এক ভাগ। র‍্যাম হচ্ছে র‍্যানডম একসেস মেমরি। স্যার বুঝতে পারছেন?’

শওকত সাহেব কিছুই বোঝেননি। তারপরেও বললেন, ‘বুঝতে পারছি।’

‘একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন— কম্পিউটার হলো আয়নার মতো।’

‘আয়নার মতো?’

‘হ্যাঁ স্যার, আয়নার মতো। আয়নাতে যেমন হয়— আয়নার সামনে যা থাকে তাই আয়নাতে দেখা যায়, কম্পিউটারেও তাই। কম্পিউটারকে আপনি যা দেবেন সে তাই আপনাকে দেখাবে। নিজে থেকে বানিয়ে যে আপনাকে কিছু দেবে না। তার সেই ক্ষমতা নেই। বুঝতে পারছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘স্যার, এখন আসুন মেমরি এবং হার্ড ডিস্ক এই দুয়ের ভেতরের পার্থক্যটা আপনাকে বুঝিয়ে বলি। আমার কথা মন দিয়ে শুনছেন তো?’

‘হ্যাঁ।’

শওকত সাহেব আসলে মন দিয়ে কিছুই শুনছেন না। আয়নার কথায় তাঁর নিজের আয়নাটার কথা মনে পড়ে গেছে। ব্যাপারটা কী? আয়নার ভেতরে ছোট মেয়েটা এল কী ভাবে? মেয়েটা কে? তার নাম কী? চোখ পিটপিট করে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল।

বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে। শওকত সাহেব চায়ের কাপে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চুমুক দিচ্ছেন। সাজেদুল করিম বলল, ‘স্যার!’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনি কি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত?’

‘না তো।’

‘তাহলে আসুন কম্পিউটারের ফাইল কীভাবে খুলতে হয় আপনাকে বলি। শুধু মুখে বললে হবে না। হাতে-কলমে দেখাতে হবে। হার্ড ডিস্ক হলো আমাদের ফাইলিং ক্যাবিনেট। সব ফাইল আছে হার্ড ডিস্কে। সেখানে থেকে একটা বিশেষ ফাইল কীভাবে বের করব?...’

বিকেল চারটা পর্যন্ত শওকত সাহেব কম্পিউটার নিয়ে ঘটঘট করলেন। লাভের মধ্যে লাভ হলো— তাঁর মাথা ধরে গেল। প্রচণ্ড মাথাধরা। সাজেদুল করিমকে মাথাধরার ব্যাপারটা জানতে দিলেন না। বেচারি এত আগ্রহ করে

বোঝাচ্ছে। তার ভাব ভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে কম্পিউটারের মতো সহজ কিছু পৃথিবীতে তৈরি হয়নি।

‘স্যার, আজ এই পর্যন্ত থাক। কাল আবার নতুন করে শুরু করব।’

‘আচ্ছা।’

অফিস থেকে বেরবার আগে জিএম সাহেব শওকত সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। শওকত সাহেবের বুক কেঁপে উঠল। জিএম সাহেবকে তিনি কম্পিউটারের মতোই ভয় পান। যদিও ভদ্রলোক অত্যন্ত মিষ্টভাষী। হাসিমুখ ছাড়া কথাই বলতে পারেন না। জিএম সাহেবের ঘরে ঢুকতেই তিনি হাসিমুখে বললেন, ‘কেমন আছেন শওকত সাহেব?’

‘জি স্যার, ভালো।’

‘বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?’

শওকত সাহেব বসলেন। তাঁর বুক কাঁপছে, পানির পিপাসা পেয়ে গেছে।

‘আপনার কি শরীর খারাপ?’

‘জি না স্যার।’

‘দেখে অবিশ্যি মনে হচ্ছে শরীর খারাপ। যাই হোক, কম্পিউটার শেখার কতদূর হলো?’

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। মাথা নিচু করে বসে রইলেন। জিএম সাহেব বললেন, ‘আমি সাজেদুল করিমকে গত কাল কঠিন বকা দিয়েছি। তাকে বলেছি— তুমি কেমন ছেলে, সামান্য একটা জিনিস শওকত সাহেবকে শেখাতে পারছ না?’

‘তার দোষ নেই স্যার। সে চেষ্টার ক্রটি করছে না। আসলে আমি শিখতে পারছি না।’

‘পারছেন না কেন?’

‘বুঝতে পারছি না স্যার।’

‘কম্পিউটার তো আজ ছেলেখেলা। সাত-আট বছরের বাচ্চারা কম্পিউটার দিয়ে খেলছে। আপনি পারবেন না কেন? আপনাকে তো পারতেই হবে। পুরানো দিনের মতো কাগজে-কলমে বসে বসে হিসাব করবেন আর মুখে বিড়বিড় করবেন— হাতে আছে পঁচ, তা তো হবে না। আমাদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। যা হবে সব কম্পিউটারে হবে।’

‘জি স্যার।’

‘নতুন টেকনোলজি যারা নিতে পারবে না তাদের তো আমাদের প্রয়োজনে নেই। ডারউইনের সেই থিয়োরি—সারভাইব্ল্ ফর দি ফিটেস্ট। বুঝতে পারছেন?’

‘জি স্যার।’

‘আচ্ছা আজ যান। চেষ্টা করুন ব্যাপারটা শিখে নিতে। এটা এমন কিছু না।’

আপনার নিজের ভেতরও শেখার চেষ্টা থাকতে হবে। আপনি যদি ধরেই নেন কোনোদিন শিখতে পারবেন না, তা হলে তো কোনোদিনই শিখতে পারবেন না। ঠিক না?’

‘জি স্যার, ঠিক।’

‘আচ্ছা, আজ তাহলে যান।’

বেরুবার সময় তিনি দরজায় ধাক্কা খেলেন। ডান চোখের উপর কপাল সুপুরির মতো ফুলে উঠল। মাথাধরাটা আরো বাড়ল।

শওকত সাহেব মাথাধরা নিয়েই বাসায় ফিরলেন। বাসা খালি, শুধু কাজের বুয়া আছে। বাকি সবাই নাকি বিয়েবাড়িতে গেছে। ফিরতে রাত হবে। আবার না ফেরার সম্ভাবনাও আছে। কার বিয়ে শওকত সাহেব কিছুই জানেন না। তাকে কেউ কিছু বলেনি। বলার প্রয়োজন মনে করেনি। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দার ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। এতে যদি মাথাধরাটা কমে। ইদানীং তাঁর ঘনঘন মাথা ধরছে। চোখ আরো খারাপ করেছে কি না কে জানে। চোখের ডাক্তারের কাছে একবার গেলে হয়। যেতে ইচ্ছা করছে না। ডাক্তারের কাছে যাওয়া মানেই টাকার খেলা। ডাক্তারের ভিজিট, নতুন চশমা, নতুন ফ্রেম।

কাজের বুয়া তাঁকে নাশতা দিয়ে গেল। একটা পিরিচে কয়েক টুকরা পেঁপে, আধবাটি মুড়ি এবং সরপড়া চা। পেঁপেটা খেতে তিতা তিতা লাগল। মুড়ি মিইয়ে গেছে। দাঁতের চাপে রবারের মতো চপ্টা হয়ে যাচ্ছে। তাঁর প্রচণ্ড খিদে লেগেছিল। তিনি তিতা পেঁপে এবং মুড়ি সবটা খেয়ে ফেললেন। চা খেলেন। গরম চা খেলে মাথাধরাটা কমে ভেবেছিলেন। কমল না। কারণ, চা গরম ছিল না। এই কাজের বুয়া গরম চা বানানোর কায়দা জানে না তার চা সব সময় হয় কুসুম-গরম।

শওকত সাহেব মাথাধরার ট্যাবলেটের খোঁজে শোবার ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের ড্রয়ারে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট থাকার কথা। কিছুই পাওয়া গেল না। ড্রয়ারের ভেতর হাত-আয়নাটা ঢুকানো। মনোয়ারা নিশ্চয়ই রেখে দিয়েছে। আচ্ছা, আয়নার ভেতর মেয়েটা কি এখনো আছে? শওকত সাহেব আয়না হাতে নিলেন। অস্বস্তি নিয়ে তাকালেন। আশ্চর্য! মেয়েটা তো আছে। আগেরবার বসেছিল, এখন দাঁড়িয়ে আছে। আগের ফ্রকটাই গায়ে। মেয়েটা খুব সুন্দর তো! গোল মুখ, মায়া-মায়া চেহারা। বয়স কত হবে? এগারো-বারোর বেশি না। কমও হতে পারে। মেয়েটার গলায় নীল পুঁতির মালা। মালাটা আগে লক্ষ করেনি। শওকত সাহেব নিচু গলায় বললেন, ‘তোমার নাম কী?’

মেয়েটা মিষ্টি গলায় বলল, ‘চিত্রলেখা।’

‘বাহ, সুন্দর নাম!’

মেয়েটা লাজুক ভঙ্গিতে হাসল। শওকত সাহেব আর কী বলবেন ভেবে পেলেন না। মেয়েটাকে আর কী বলা যায়? আয়নার ভেতর সে এল কী করে

এটা কি জিজ্ঞেস করবেন? প্রশ্নটা মেয়েটার জন্যে জটিল হয়ে যাবে না তো? জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করার আগে মেয়েটা বলল, ‘আপনার কপালে কী হয়েছে?’

‘ব্যথা পেয়েছি। জিএম সাহেবের ঘর থেকে বের হবার সময় দরজায় ধাক্কা খেলাম।’

‘খুব বেশি ব্যথা পেয়েছেন?’

‘খুব বেশি না। তুমি কোন ক্লাসে পড়?’

‘আমি পড়ি না।’

‘স্কুলে যাও না?’

‘উহঁ’

‘আয়নার ভেতর তুমি এলে কী করে?’

‘তাও জানি না।’

‘তোমার বাবা-মা, তারা কোথায়?’

‘জানি না।’

‘তোমরা মা-বাবা আছেন তো? আছেন না?’

‘জানি না।’

‘তুমি কি একা থাক?’

‘ইঁ।’

শওকত সাহেব লক্ষ্য করলেন মেয়েটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। বুকের উপর দু’টা হাত আড়াআড়ি করে রাখা। মনে হয় তার শীত লাগছে। অথচ এটা চৈত্র মাস। শীত লাগার কোনো কারণ নেই। তিনি নিজে গরমে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, তার বাতাসটা পর্যন্ত গরম।

‘কাঁপছ কেন? শীত লাগছে নাকি?’

‘ইঁ, এখানে খুব শীত।’

‘তোমার কি গরম কাপড় নেই?’

‘না।’

‘তোমার এই একটাই জামা?’

‘ইঁ।’

‘আমাকে তুমি চেন?’

‘চিনি।’

‘আমি কে বল তো?’

‘তা বলতে পারি না।’

‘আমার নাম জান?’

‘আপনি তো আপনার নাম বলেননি। জানব কীভাবে?’

‘আমার নাম শওকত । শওকত আলি ।’

‘ও আচ্ছা ।’

‘আমার তিন মেয়ে ।’

‘ছেলে নাই?’

‘না, ছেলে নাই ।’

‘আপনার মেয়েরা কোথায় গেছে?’

‘বিয়েবাড়িতে গেছে ।’

‘কার বিয়ে?’

‘কার বিয়ে আমি ঠিক জানি না । আমাকে বলেনি ।’

‘আপনার মেয়েদের নাম কী?’

‘বড় মেয়ের নাম ইরা, মেজটার নাম সোমা, সবচেয়ে ছোটটার নাম কল্পনা ।’

‘ওদের নামে কোনো মিল নেই কেন? সবাই তো মিল দিয়ে দিয়ে মেয়েদের নাম রাখে । বড় মেয়ের নাম ইরা হলে মেজটার নাম হয় মীরা । তা না হয়ে ছোটটার নাম মীরা... ।’

‘ওদের মা নাম রেখেছে । মিল দিতে ভুলে গেছে ।’

‘আপনি নাম রাখেননি কেন?’

‘আমিও রেখেছিলাম । আমার নাম কারো পছন্দ হয়নি ।’

‘আপনি কী নাম রেখেছিলেন?’

‘বড় মেয়ের নাম রেখেছিলাম বেগম রোকেয়া । মহীয়সী নারীর নামে নাম । তার মা পছন্দ করেনি । তার মার দোষ নেই । পুরানো দিনের নাম তো, এইজন্যে পছন্দ হয়নি ।’

‘বেগম রোকেয়া কেন?’

‘তোমাকে বললাম না মহীয়সী নারী । রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মেছিলেন । মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের জন্যে প্রাণপাত করেছিলেন । তুমি তাঁর নাম শুননি?’

‘জি না ।’

কলিংবেল বেজে উঠল । শওকত সাহেব আঁতকে উঠলেন । ওরা বোধহয় চলে এসেছে । তিনি আয়না ড্রায়ারে রেখে দরজা খোলার জন্যে গেলেন । ওদের সামনে আয়না বের করার কোনো দরকার নেই । তারা কী না কী মনে করবে— দরকার কী? অবিশ্যি আয়নায় তিনি নিজেও কিছু দেখছেন না । সম্ভবত এটা তাঁর কল্পনা । কিংবা তিনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন । ছোটবেলায় তিনি যখন স্কুলে পড়তেন তখন তাদের অবনী স্যার স্কুলের সামনে বড় আমগাছটার সঙ্গে কথা বলতেন । কেউ দেখে ফেললে খুব লজ্জা পেতেন । এক বর্ষাকালে তিনি স্কুলের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখেন অবনী স্যার আমগাছের সঙ্গে কথা বলছেন । অবনী স্যার

তাকে দেখে খুব লজ্জা পেয়ে বললেন, সন্ধ্যাবেলা এমন ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটবি না। খুব সাপের উপদ্রব। তারপরের বছরই স্যার পুরোপুরি পাগল হয়ে গেলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন তাকে নিয়ে ইন্ডিয়া চলে গেল।

কে জানে তিনি নিজেও হয়তো পাগল হয়ে যাচ্ছেন। পুরোপুরি পাগল হবার পর তাঁর স্ত্রী ও মেয়েরা হয়তো তাঁকে পাবনার মেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে আসবে। পাবনায় ভর্তি হতে কত টাকা লাগে কে জানে। টাকা বেশি লাগলে ভর্তি নাও করাতে পারে। হয়তো নিজেদের বাড়িতেই দরজায় তালাবন্ধ করে রাখবে, কিংবা অন্য কোনো দূরের শহরে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে। পাগল পুষতে না পারলে দূরে ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়। এতে দোষ হয় না। পাগল তো আর মানুষ না। তারা বোধশক্তিহীন জন্তুর মতোই।

মনোয়ারা বিয়েবাড়ি থেকে মেয়েদের নিয়ে ফেরননি। মেজো মেয়ের মাস্টার এসেছে। শওকত সাহেব বললেন, ‘ওরা কেউ বাসায় নেই। বিয়েবাড়িতে গেছে। আপনি বসেন, চা খান।’

মাস্টার সাহেব বললেন, ‘আচ্ছা চা এক কাপ খেয়েই যাই। শওকত সাহেব বুয়াকে চায়ের কথা বলে এসে শুকনো মুখে মাস্টারের সামনে বসে রইলেন। তাঁর মেজাজ একটু খরাপ হলো। মাস্টারের চা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সামনে বসে থাকতে হবে। টুকটাক কথা বলতে হবে। কী কথা বলবেন?’

মাস্টার সাহেব বললেন, ‘আপনার গালে কী হয়েছে?’

‘দাড়ি শেভ করতে গিয়ে গাল কেটে গেছে। আয়নাটা খরাপ, ভালো দেখা যায় না।’

‘নতুন একটা কিনে নেন না কেন?’

‘ইরার মাকে বলেছি—ও সময় করতে পারে না। আপনার ছাত্রী পড়াশোনা কেমন করছে?’

‘ভালো। ম্যাথ-এ একটু উইক।’

‘আপনি কি শুধু ম্যাথ পড়ান?’

‘আমি সায়েন্স সাবজেক্ট সবই দেখাই—ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি।’

বুয়া চা নিয়ে এসেছে। শুধু চা না, পিরিচে পেরঁপে এবং মুড়ি। মাস্টার সাহেব আগ্রহ করে তিতা পেরঁপে এবং মিয়ানো মুড়ি খাচ্ছেন। প্রাইভেট মাস্টাররা যে কোনো খাবার আগ্রহ করে খায়। শওকত সাহেব কথা বলার আর কিছু পাচ্ছেন না। একবার ভাবলেন আয়নার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবেন, ‘নিজেকে সামলালেন। কী দরকার?’

‘মাস্টার সাহেব।’

‘জি।’

‘আপনি তো সায়েন্সের টিচার, আয়নাতে যে ছবি দেখা যায়, কীভাবে দেখা যায়?’

‘আলো অবজেক্ট থেকে আয়নাতে পড়ে, সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।’

শওকত সাহেব ইতস্তত করে বললেন, ‘কোনো বস্তু যদি আয়নার সামনে না থাকে তা হলে তো তার ছবি দেখার কোনো কারণ নেই, তাই না?’

মাস্টার সাহেব খুবই অবাক হয়ে বললেন, ‘তা তো বটেই। এটা জিজ্ঞেস করছেন কেন?’

‘এমনি জিজ্ঞেস করছি। কোনো কারণ নাই। কথার কথা। কিছু মনে করবেন না।’

শওকত সাহেব খুবই লজ্জা পেয়ে গেলেন।

পরদিন অফিসে যাবার সময় শওকত সাহেব আয়নাটা খবরের কাগজে মুড়ে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। কেন নিলেন নিজেও ঠিক জানেন না। অফিসের ড্রয়ারে আয়না রেখে সাজেদুল করিমের সঙ্গে কম্পিউটার নিয়ে ঘটঘট করতে লাগলেন। কীভাবে উইন্ডো খুলে সেখান থেকে সিস্টেম ফোল্ডার বের করতে হয়, ডাটা এন্ট্রি, ডাটা প্রসেসিং— চৌদ্দ রকম যন্ত্রণা। তিনি মুগ্ধ হলেন ছেলেটার ধৈর্য দেখে। তিনি যে সব গুবলেট করে দিচ্ছেন তার জন্যে সাজেদুল করিম একটু রাগ করছে না। একই জিনিস বারবার করে বলছে। এমনভাবে কথা বলছে যেন তিনি বয়স্ক একজন মানুষ না, বরঞ্চ একটা ছেলে। সাজেদুল করিম বলল, ‘স্যার, আসুন আমরা একটু রেস্ট নেই। চা খাই। তারপর আবার শুরু করব।’

শওকত সাহেব বললেন, ‘আমাকে দিয়ে আসলে কিছু হবে না। বাদ দাও।’

‘বাদ দিলে চলবে কী করে স্যার? কম্পিউটার চলে এসেছে। এখন তো আর আপনি লম্বা লম্বা যোগ-বিয়োগ করতে পারবেন না। ব্যালেন্স শীট তৈরি হবে কম্পিউটারে।’

শওকত সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, ‘আমি পারব না। যারা পারবে তারা করবে। চাকরি ছেড়ে দেব।’

‘কী যে বলেন স্যার! চাকরি ছেড়ে দেবেন মানে? চাকরি ছাড়লে খাবেন কী? আপনি মোটেই ঘাবড়াবেন না। আমি আপনাকে কম্পিউটার শিখিয়ে ছাড়ব। আমার সাংঘাতিক জেদ।’

চা খেতে খেতে শওকত সাহেব ছেলেটার সঙ্গে কিছু গল্পও করলেন। গল্প করতে খারাপ লাগল না। তবে এই ছেলে কম্পিউটার ছাড়া কোনো গল্প জানে না। কোনো এক ভদ্রলোক তার কিছু জরুরি ডাটা ভুল করে ইরেজ করে ফেলেছিলেন। প্রায় মাথা খারাপ হবার মতো যোগাড়। সেই ডাটা কীভাবে উদ্ধার হলো তার গল্প সে এমনভাবে করল যেন এটা এক রোমহর্ষক গল্প।

‘বুঝলেন স্যার, দু’টা প্রোগ্রাম আছে যা দিয়ে ট্রেস ক্যান-এ ফেলে দেয়া ডাটাও উদ্ধার করা যায়। একটা প্রোগ্রামের নাম নর্টন ইউটিলিটিজ, আরেকটার নাম কমপ্লিট আনডিলিট। খুবই চমৎকার প্রোগ্রাম।’

শওকত সাহেব কিছুই বুঝলেন না তবু মাথা নাড়লেন যেন বুঝতে পেরেছেন। চা শেষ হবার পর সাজেদুল করিম বলল, ‘স্যার আসুন বিসমিল্লাহ বলে লেগে পড়ি।’

শওকত সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন, ‘আজ থাক। আজ আর ভালো লাগছে না।’

‘জিএম সাহেব শুনলে আবার রাগ করবেন।’

‘রাগ করলে করবে। কী আর করা! আমাকে দিয়া কম্পিউটার হবে না। শুধু শুধু তুমি কষ্ট করছ।’

‘আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। ঠিক আছে, আজ আপনি রেস্ট নিন, কাল আবার আমরা শুরু করব। আমি তাহলে স্যার আজ যাই।’

‘একটা জিনিস দেখ তো।’

শওকত সাহেব ড্রয়ারে থেকে খবরের কাগজে মোড়া আয়না বের করলেন। খুব সাবধানে কাগজ সরিয়ে আয়না বের করলেন। সাজেদুল করিমের হাতে আয়নাটা দিয়ে বললেন, ‘জিনিসটা একটু ভালো করে দেখ তো।’

‘জিনিসটা কী?’

‘একটা আয়না।’

সাজেদুল করিম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আয়না দেখল। শওকত সাহেব কৌতূহলী গলায় বললেন, ‘দেখলে?’

সাজেদুল করিম বিস্মিত হয়ে বলল, ‘দেখলাম।’

‘কী দেখলে বল তো?’

‘পুরানো একটা আয়না দেখলাম। পারা নষ্ট হয়ে গেছে। আর তো কিছু দেখলাম না। আর কিছু কি দেখার আছে?’

‘না, আমার শখের একটা আয়না।’

শওকত সাহেব আয়নাটা কাগজে মুড়তে শুরু করলেন। সাজেদুল করিম এখনো তাঁর দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে। শওকত সাহেবের মনে হলো তিনি ছোটবেলায় অবনী স্যারকে গাছের সঙ্গে কথা বলতে দেখে এইভাবেই বোধহয় তাকিয়েছিলেন।

সাজেদুল করিম চলে যাবার পর তিনি তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। আয়নাটা বের করলেন— ঐ তো, মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটাকে কেমন দুঃখী দুঃখী লাগছে। শওকত সাহেব মৃদু গলায় বললেন, ‘কেমন আছ চিত্রলেখা?’

‘ভালো।’

‘তোমার মুখটা এমন শুকনা লাগছে কেন? মন খারাপ?’

‘হুঁ।’

‘মন খারাপ কেন?’

‘একা একা থাকি তো এইজন্যে মন খারাপ। মাঝে মাঝে আবার ভয় ভয় লাগে।’

‘কীসের ভয়?’

‘জানি না কীসের ভয়। এটা কি আপনার অফিস?’

‘হুঁ।’

‘আপনার টেবিলের উপর এটা কী? বাক্সের মতো?’

‘এটা হচ্ছে একটা কম্পিউটার। আইবিএম কম্পিউটার।’

‘কম্পিউটার কী?’

‘একটা যন্ত্র। হিসাব-নিকাশ করে। আচ্ছা শোন চিত্রলেখা, তোমার বাবা-মা আছেন?’

‘জানি না তো।’

‘তুমি আজ কিছু খেয়েছ?’

‘না।’

‘তোমার খিদে লেগেছে?’

‘হুঁ।’

‘তুমি যেখানে থাক সেখানে কোনো খাবার নেই?’

‘না।’

‘জায়গাটা কেমন?’

‘জায়গাটা কেমন আমি জানি না। খুব শীত।’

শওকত সাহেব দেখলেন মেয়েটা শীতে কাঁপছে। পাতলা সুতির জামায় শীত মানছে না। তিনি কী করবেন বুঝতে পারলেন না। এই শীতাত ও ক্ষুধার্ত মেয়েটার জন্যে তিনি কি-ই বা করতে পারেন। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আয়নাটা কাগজে মুড়ে ড্রয়ারে রেখে দিলেন। তাঁর নিজেরও খিদে লেগেছে। বাসা থেকে টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার এনেছেন। কোনো উপায় কি আছে মেয়েটাকে খাবার দেয়ার? আরে, কী আশ্চর্য! তিনি এসব কী ভাবছেন? আয়নায় যা দেখছেন সেটা মনের ভুল ছাড়া আর কিছুই না। এটাকে গুরুত্ব দেয়ার কোনো মানে হয় না। আসলে আয়নাটা তাঁর দেখাই উচিত না। তিনি টিফিন কেরিয়ার নিয়ে অফিস ক্যানটিনে খেতে গেলেন। কিন্তু খেতে পারলেন না। বারবার মেয়েটার শুকনা মুখ মনে পড়তে লাগল। তিনি হাত ধুয়ে উঠে পড়লেন।

বাসায় ফিরতে ফিরতে তাঁর সন্ধ্যা হয়ে গেল। সাধারণত অফিস থেকে তিনি সরাসরি বাসায় ফেরেন। আজ একটু ঘুরলেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বেঞ্চিতে বসে রইলেন। তাঁর ভালোই লাগল। ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে, চারদিকে গাছপালা। কেমন শান্তি-শান্তি ভাব। দুপুরে কিছু খাননি বলে খিদেটা এখন

জানান দিচ্ছে। বাদামওয়ালা বুট-বাদাম বিক্রি করছে। এক ছটাক বাদাম কিনে ফেলবেন নাকি? কত দাম এক ছটাক বাদামের? তিনি হাত উঁচিয়ে বাদামওয়ালাকে ডাকলেন। তারপরই মনে হলো বাচ্চা একটা মেয়ে না খেয়ে আছে। তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাদাম না কিনেই তিনি বাসার দিকে রওনা হলেন।

বাসায় ফেরামাত্র তাঁকে নাশতা দেয়া হলো— তিতা পেঁপের টুকরা, মিয়ানো মুড়ি। মনে হয় অনেকগুলি তিতা পেঁপে কেনা আছে এবং টিন ভর্তি মিয়ানো মুড়ি আছে। এগুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে খেতেই হবে। ঘরের ভেতর থেকে হারমোনিয়ামের শব্দ আসছে। অপরিচিত একজন পুরুষ নাকি গলায় সা-রে-গা-মা করছে। ইরার গলাও পাওয়া যাচ্ছে। ইরা গান শিখছে নাকি?

সারেগা রেগামা গামাপা মাপাধা পাধানি ধানিসা...

মনোয়ারা চায়ের কাপ নিয়ে শওকত সাহেবের সামনে রাখতে রাখতে বললেন, ‘ইরার জন্যে গানের মাস্টার রেখে দিলাম। সপ্তাহে দুদিন আসবে। পনেরো শ’ টাকা সে নেয়, বলে-কয়ে এক হাজার করেছি। তিনলটিকে দিতে হবে তিন শ’। মেয়ের এত শখ। তোমাকে বলে তো কিছু হবে না। কার কী শখ, কী ইচ্ছা, তুমি কিছুই জান না। যা করার আমাকেই করতে হবে।’

শওকত সাহেব নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। এক হাজার যোগ তিন শ’-তেরো শ’। বাড়তি তেরো শ’ টাকা কোথেকে আসবে? সামনের মাস থেকে বেতন কমে যাবে। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে দশ হাজার টাকা লোন নিয়েছিলেন, সামনের মাস থেকে পাঁচশ’ টাকা করে কাটা শুরু হবে। উপায় হবে কী? তিনি কম্পিউটারও শিখতে পারছেন না। সত্যি সত্যি যদি এই বয়সে চাকরি চলে যায়, তখন?

মনোয়ারা বললেন, ‘সেইমাদের কলেজ থেকে স্টাডি ট্যুরে যাচ্ছে। তার এক হাজার টাকা দরকার। তোমাকে আগেভাগে বলে রাখলাম। কি, কথা বলছ না কেন?’

শওকত সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসেভাবে হাসলেন। কিছু বললেন না।

‘তোমার সঙ্গে বসে যে দু’টো কথা বলব সে উপায় তো নেই। মুখ সেলাই করে বসে থাকবে। আশ্চর্য এক মানুষের সঙ্গে জীবন কাটালাম।’

মনোয়ারা উঠে চলে গেলেন। ঘরে ভেতর থেকে এখন গানের কথা ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে ওস্তাদ টিচার প্রথম দিনেই গান শেখাচ্ছেন—

তুমি বাস কিনা তা আমি জানি না
ভালোবাস কি না তা আমি জানি না
আমার কাজ আমি বন্ধু করিয়া যে যাব
চিন্তা হইতে আমি চিতানলে যাব...

শওকত সাহেব একা বসে আছেন। রাতে ভাত খাবার ডাক না আসা পর্যন্ত একাই বসে থাকতে হবে। আয়নাটা বের করে মেয়েটার সঙ্গে দু'টা কথা বললে কেমন হয়? কেউ এসে দেখে না ফেললে হলো। দেখে ফেললে সমস্যা।

‘কেমন আছ চিত্রলেখা?’

‘জি, ভালো আছি। কে গান গাচ্ছে?’

‘আমার বড় মেয়ে।’

‘ইরা?’

‘হ্যাঁ ইরা। তোমার দেখি নাম মনে আছে।’

‘মনে থাকবে না কেন? আমার সবার নামই মনে আছে— ইরা, সোমা কল্পনা। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার খুব মন খারাপ। আপনার কী হয়েছে?’

‘কিছু হয়নি রে মা।’

শওকত সাহেবের গলা ধরে এল। দিনের পর দিন তাঁর মন খারাপ থাকে। কেউ জানতে চায় না তার মন খারাপ কেন— আয়নার ভেতরের এই মেয়ে জানতে চাচ্ছে। তাঁর চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম হলো। তিনি প্রসঙ্গ পাঁচটার জন্যে বললেন, ‘তুমি কি গান জান?’

‘জি না।’

‘আচ্ছা শোন, তুমি যে বলেছিলে খিদে লেগেছে। কিছু কী খেয়েছ? খিদে কমেছে?’

মেয়েটা মিষ্টি করে হাসল। সজার কোনো কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে বলল, ‘আপনি কী যে বলেন! খাবার কী করে? আমাদের এখানে কি কোনো খাবার আছে?’

‘খাবার নেই?’

‘না। কিছু নেই। এটা একটা অদ্ভুত জায়গা। শুধু আমি একা থাকি। কথা বলারও কেউ নেই। শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলি।’

শওকত সাহেব লক্ষ করলেন, মেয়েটা আগের মতো দু'হাত বুকের উপর রেখে থরথর করে কাঁপছে। তিনি কোমল গলায় বললেন, ‘শীত লাগছে মা?’

‘লাগছে। এখানে খুব শীত। যখন বাতাস দেয় তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগে। আমার তো শীতের কাপড় নেই। এই একটাই ফ্রক।’

দুঃখে শওকত সাহেবের চোখে প্রায় পানি এসে গেল। তখন মনোয়ারা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। শীতল গলায় বললেন, ‘আয়না হাতে বারান্দায় বসে আছ কেন? কল্পনার পাশে বসে তার পড়াটা দেখিয়ে দিলেও তো হয়। সব বাবারাই ছেলেমেয়ের পড়াশোনা দেখিয়ে দেয়, একমাত্র তোমাকে দেখলাম

অফিস থেকে এসে বটগাছের মতো বসে থাক। বাবার কিছু দায়িত্ব তো পালন করবে।’

শওকত সাহেব আয়নাটা রেখে কল্লনার পড়া দেখানোর জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

২

সাজেদুল করিম অসাধ্য সাধন করছে। শওকত সাহেবকে কম্পিউটার শিখিয়ে ফেলেছে।

‘কি স্যার, বলিনি আপনাকে শিখিয়ে ছাড়ব?’

শওকত সাহেব হাসলেন। তাঁর নিজের এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না তিনি ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন। সাজেদুল করিম বলল, ‘আর কোনো সমস্যা হবে না। তা ছাড়া আমি আপনার জন্যে আরেকটা কাজ করেছি— প্রতিটি স্টেপ কাগজে লিখে এনেছি। কোনো সমস্যা হলে কাগজটা দেখবেন। দেখবেন, সব পানির মতো পরিষ্কার।’

‘থ্যাংক য়ু।’

‘আর স্যার, আমার ঠিকানাটা কাগজে লিখে গেলুম। কোনো ঝামেলা মনে করলেই আমার বাসায় চলে আসবেন।’

‘আচ্ছা। বাবা, তুমি অনেক কষ্ট করেছ।’

‘আপনার অবস্থা দেখে আমার সবার মনটা খারাপ হয়েছিল। রাতে দেখি ঘুম আসে না। তখন একের পর এক স্টেপগুলি কাগজে লিখলাম। সারারাত চিন্তা করলাম কীভাবে বোঝালে আপনি বুঝবেন।’

শওকত সাহেবের চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম হলো। তিনি ভেবে পেলেন না এ রকম অসাধ্য সাধন ছেলে পৃথিবীতে এত কম জন্মায় কেন?

‘স্যার, আমি মাই। জিএম সাহেবকে বলে যাচ্ছি আপনি সব শিখে ফেলেছেন, আর কোনো সমস্যা নেই। আরেকটা কথা স্যার, কম্পিউটারকে ভয় পাবেন না। তাকে ভয় পাবার কিছু নেই। কম্পিউটার হচ্ছে সামান্য একটা যন্ত্র। এর বেশি কিছু না।’

শওকত সাহেবের চোখে এইবার সত্যি সত্যি পানি চলে এল। ছেলেটা যেন চোখের পানি দেখতে না পায় সে জন্যে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে-মনে ঠিক করলেন, আজ অফিস থেকে ফেরার পথে ছেলেটার জন্যে একটা উপহার কিনবেন। দামি কিছু না, সেই সামর্থ তাঁর নেই, তবু কিছু কিনে তার বাসায় গিয়ে তাকে দিয়ে আসবেন। একটা কলম বা এই জাতীয় কিছু। শ’দুই টাকার মধ্যে কলম না পাওয়া গেলে সুন্দর কিছু গোলাপ। তাঁর সঙ্গে পাঁচশ’ টাকা আছে। টেবিলের ড্রয়ারে খামের ভেতর রাখা।

শওকত সাহেব একশ’ পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ওয়াটারম্যান কলম

কিনলেন। তারপর কোনো কিছু না ভেবেই চিত্রলেখার জন্যে একটা স্যুয়েটার কিনে ফেললেন। গরমের সময় বলেই ভালো ভালো স্যুয়েটার সস্তায় বিক্রি হচ্ছিল। স্যুয়েটার কিনতে তিনশ' চল্লিশ টাকা খরচ হয়ে গেল। শাদা জমিনের উপর নীল ফুল আঁকা। সিনথেটিক উল। দোকানদার বলল, 'সিনথেটিক হলেও আসল উলের বাবা। শুধু স্যুয়েটার গায়ে দিয়েই তুম্বা অঞ্চলে বরফের চাঁইয়ের উপর শুয়ে থাকা যায়।' শওকত সাহেব জানেন স্যুয়েটার কেনাটা তাঁর জন্যে খুবই বোকামি হয়েছে। চিত্রলেখাকে এই স্যুয়েটার তিনি কখনও দিতে পারবেন না। কারণ, চিত্রলেখা বলে কেউ নেই। পুরো ব্যাপারটা তাঁর মাথার অসুস্থ কোনো কল্পনা। সংসারের দুঃখ-ধাক্কায তাঁর মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বলে এইসব হাবিজাবি দেখছেন। তারপরেও মনে হলো— মেয়েটা দেখবে জিনিসটা তার জন্যে কেনা হয়েছে। বেচারি খুশি হবে।

সাজেদুল করিমকে তিনি বাসায় পেলেন না। দরজা তালাবন্ধ। দরজার ফাঁক দিয়ে তিনি কলমটা ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর মনে হলো, ভালোই হয়েছে, সাজেদুল করিম জানল না উপহার কে দিয়েছে। মানুষের মনোভাব ভালো লাগে অজানা কোনো জায়গা থেকে উপহার পেতে।

শওকত সাহেব গভীর আনন্দ নিয়ে বাসায় ফিরলেন। আজকের পেঁপে খেতে আগের মতো তিতা লাগল না। চা-টাও খেতে ভালো হয়েছে। তিনি মনোয়ারাকে আরেক কাপ চা দিতে বলে ড্রয়ার থেকে আয়না বের করতে গেলেন। আয়না পাওয়া গেল না। ড্রয়ারে নেই, টেবিলের উপরে নেই, রাখরুমে নেই, বারান্দায় নেই। তিনি পাগলের মতো আয়না খুঁজছেন। মেয়েরা কেউ কি নিয়েছে? তিনি মেয়েদের ঘরে ঢুকে টেবিলের বইপত্র এলোমেলো করতে শুরু করলেন।

ইরা বলল, 'বাবা, তুমি কী খুঁজছ?'

'আয়নাটা খুঁজছি। আমার একটা হাত-আয়না ছিল না? ঐ আয়নাটা।'

'ঐ আয়না তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। মা তোমার জন্যে নতুন আয়না কিনেছে। ওটা ফেলে দিয়েছে।'

শওকত সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, 'এইসব কী বলছিস? কোথায় ফেলেছে?'

'পুরানো একটা আয়না ফেলে দিয়েছে। তুমি এ রকম করছ কেন বাবা?'

শওকত সাহেব বিড়বিড় করে কী যেন বললেন, কিছু বোঝা গেল না। ইরা ভয় পেয়ে তার মাকে ডাকল। মনোয়ার এসে দেখেন শওকত সাহেব খুব ঘামছেন। তাঁর কপাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম পড়ছে। তিনি ধরা গলায় বললেন, 'মনোয়ারা, আয়না কোথায় ফেলেছ?'

রাত এগারোটা বাজে। শওকত সাহেব বাসার পাশে ডাস্টবিন হাতড়াচ্ছেন। তাঁর সারা গায়ে নোংরা লেগে আছে। তাঁর সেদিকে কোনো দ্রক্ষেপ নেই। তিনি

দু'হাতে ময়লা ঘেটে যাচ্ছেন। একটু দূরে তার স্ত্রী ও তিন কন্যা দাঁড়িয়ে। তাদের চোখে রাজ্যের বিস্ময়। বড় মেয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'তোমার কী হয়েছে বাবা?'

শওকত সাহেব ফিসফিস করে বললেন, 'চিত্রলেখাকে খুজছি রে মা। চিত্রলেখা।'

'চিত্রলেখা কে?'

'আমি জানি না কে?'

শওকত সাহেবের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকছেন, 'চিত্রা মা রে, ওমা, তুই কোথায়?'



কুদুসের এক দিন

মোহাম্মদ আব্দুল কুদুস পত্রিকা অফিসে কাজ করে।

বড় কাজ না, ছোট কাজ—মা সানানো, সম্পাদক সাহেবের জন্যে সিগারেট এনে দেয়া। ড্রাইভার গাড়িতে তেল নিলে সঙ্গে যাওয়া, যাতে তেল চুরি করতে না পারে। এই ধরনের টালু-ফালু কাজ।

কুদুসের বয়স বাতান্ন। বাতান্ন থেকে ষোল বাদ দিলে থাকে ছয়ত্রিশ। ষোল বছরে মেট্রিক পরীক্ষা দেবার পর (পুরো পরীক্ষা দিতে পারেনি, ইংরেজি প্রথম পত্র পর্যন্ত দিয়েছিল) গত ছয়ত্রিশ বছর ধরে সে নানান ধরনের চাকরি করেছে। সবই টালু-ফালু চাকরি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, কিছুদিন সে একটা চোরের অ্যাসিসট্যান্টও ছিল। নিতান্ত ভদ্র ধরনের চোর। সুন্দর চেহারা। স্যুট পরে ঘুরে বেড়াত। শান্তিনিকেতনি ভাষায় কথা বলতো। বোঝার কোনো উপায়ই নেই লোকটা বিরাট চোর। কুদুস যেদিন বুঝতে পেরেছে সেদিনই চাকরি ছেড়ে দিয়ে বায়তুল মোকাররাম মসজিদে গিয়ে মসজিদের খতিবের মাধ্যমে তওবা করেছে। চোরের সঙ্গে বাস করে চারশ' টাকার মতো জমিয়েছিল, তার অর্ধেক মসজিদের দানবাক্সে ফেলে দিয়েছে। ইচ্ছা ছিল পুরোটাই দিয়ে দেয়, না খেয়ে থাকতে হবে বলে দিতে পারেনি।

গত ছয়ত্রিশ বছরে যে সব চাকরি কুদ্দুস করেছে তার তুলনায় পত্রিকা অফিসের চাকরিটা শুধু ভালো না, অসম্ভব ভালো। দেশ-বিদেশের টাটকা খবরের সঙ্গে যুক্ত থাকার মতো সৌভাগ্য বাংলাদেশের ক'টা মানুষের আছে? সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই বিনা পয়সায় খবরে কাগজ পড়া যাচ্ছে। এই সৌভাগ্য তো সহজ সৌভাগ্য না, জটিল সৌভাগ্য।

প্রতিদিন সকাল বেলা খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে নিজের সৌভাগ্যে কুদ্দুস নিজেকেই ঈর্ষা করে। যুবক বয়সে সে একবার গণক দিয়ে হাত দেখিয়েছিল। গণক বলেছিল— শেষ বয়সটা আপনার মহাসুখে কাটবে। বিরাট সম্মান পাবেন। পত্রিকা অফিসে কাজটা পাবার পর কুদ্দুসের ধারণা গণক মোটামুটি সত্যি কথাই বলেছে। শুধু বিরাট সম্মানের জায়গায় একটু ভুল করেছে। তা কিছু ভুল-ত্রুটি তো হবেই।

কুদ্দুস রাতে পত্রিকা অফিসেই ঘুমায়। কোনো এক কোণা-কানা খুঁজে নিয়ে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ে। চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে ফেললে মশার হাত থেকে মুক্তি। মেস করে থাকতে হচ্ছে না বলে বেশ কিছু টাকা বেঁচে যাচ্ছে। বেতন যা পাওয়া যায় তাতে আলাদা ঘর ভাড়া করে বা মেস করে থাকা সম্ভব না। তার দরকারই বা কী? সে একা মানুষ। এত শোখিনতার তার দরকার কী? পত্রিকা অফিসে কাজ করতে এসে তার গত তিন বছরে দশ হাজার পাঁচশ' টাকা জমে গেছে। অকল্পনীয় একটা ব্যাপার। টাকাটা পত্রিকার সম্পাদক মতিয়ুর রহমান সাহেবের কাছে জমা আছে। চাইলেই উনি দেন। কুদ্দুসের টাকার কোনো দরকার নেই, তবু মাঝে মাঝে মতিয়ুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে টাকাগুলি চেয়ে আনে। সারা দিন হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে থেকে সন্ধ্যাবেলা ফেরত দিয়ে আসে। টাকা হাতে নিরীক্ষা করে বসে থাকতে তার ভালো লাগে। নিজেকে রাজা-বাদশাহর মতো মনে হয়।

আজ সকালে কেমন কোনো কারণ ছাড়াই কুদ্দুসের নিজেকে রাজা-বাদশাহর মতো মনে হতে লাগল। সে চায়ের কাপ এবং পত্রিকা হাতে বসেছে। পা নাচাতে নাচাতে কাগজ পড়ছে। মজার মজার খবরে আজ কাগজ ভর্তি। খবরগুলি পড়ে ফেললেই তো মজা শেষ হয়ে গেল, কাজেই কুদ্দুস প্রথমে শুধু হেড লাইনে চোখ বুলাবে। ভেতরের ব্যাপারগুলি ধীরে সুস্থে পড়া যাবে। তাড়া কিছু নেই। সম্পাদক সাহেব চলে এসেছেন। তাঁকে প্রথম দফার চা দেয়া হয়েছে, তিনি ঘণ্টাখানিকের ভেতর আর ডাকবেন না। কুদ্দুস শিস দিয়ে একটা গানের সুর তোলার চেষ্টা করতে লাগল— পাগল মন...। গানটা খুব হিট করেছে।

কুদ্দুস পত্রিকার তিন নাম্বার পাতাটা খুলল। “আজকের দিনটি কেমন যাবে” তিন নম্বর পাতায় ছাপা হয়। কুদ্দুস এই অংশটা প্রথম পড়ে। তার ধনু রাশি। তার ব্যাপারে “আজকের দিনটি কেমন যাবে”তে যা লেখা হয় সব মিলে যায়।

একবার লেখা হলো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। সেদিন অকারণে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বুড়ো আঙুলের নখের অর্ধেকটা ভেঙে গেল।

আজকের রাশিফলে লেখা—

ধনু রাশির জন্যে আজ যাত্রা শুভ। ভ্রমণের যোগ আছে। কিঞ্চিৎ অর্থনাশের আশঙ্কা। শত্রুপক্ষের তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। শত্রুর কারণে সম্মানহানির আশঙ্কা।

সম্মানহানির আশঙ্কায় কুদ্দুস খানিকটা চিহ্নিত বোধ করছে। সম্মান বলতে গেলে কিছুই নেই। যা আছে তাও যদি চলে যায় তো মুশকিল। পত্রিকার সব হেড লাইন শেষ করবার আগেই কুদ্দুসের ডাক পড়ল। মতিয়ুর রহমান সাহেবের ইলেকট্রিক বেল ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল। কুদ্দুস এমনভাবে লাফিয়ে উঠল যে তার কাপ থেকে চা পুরোটাই ছলকে গায়ে পড়ে গেল। শার্টটা নূতন কেনা। আজ নিয়ে মাত্র তৃতীয়বার পরা হয়েছে। শাদা কাপড়ে চায়ের রঙ সহজে ওঠে না। এফুনি ধুয়ে ফেলতে পারলে হতো। সেটা সম্ভব না। মতিয়ুর রহমান স্যার ডেকেছেন। এক সেকেন্ড অপেক্ষা করা যাবে না। কুদ্দুস প্রায় ছুটে সম্পাদক সাহেবের ঘরে ঢুকল।

মতিয়ুর রহমান সাহেব বললেন, ‘তোমার খবর কী রে কুদ্দুস?’

কুদ্দুস বিনয়ে মাথা নিচু করে বলল, ‘খবর ভালো স্যার।’

‘একটা কাজ করে দে তো— এই চিঠিটা নিয়ে যা। নাম-ঠিকানা লেখা আছে। হাতে হাতে দিয়ে আসবি।’

‘জি আচ্ছা, স্যার।’

‘জাভেদ সাহেব ইস্টার্ন প্লাজায় নয় তলায় থাকেন। ইস্টার্ন প্লাজা চিনিস তো?’

‘জি স্যার, চিনি।’

‘খুবই জরুরি চিঠি। হাতে হাতে দিবি। উনাকে বলবি আমাকে টেলিফোন করতে। আমি অফিসেই থাকব। নে টাকাটা নে, রিকশা করে চলে যা।’

মতিয়ুর রহমান সাহেব কুড়ি টাকার একটা নোট বের করে কুদ্দুসের হাতে দিলেন। কুদ্দুস টাকা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হলো। রওনা হবার আগে শার্টটা পানি দিয়ে একবার ধুয়ে ফেলতে হবে। কতক্ষণের মামলা? কুদ্দুস বাথরুমের দিকে যাচ্ছে, আবার মতিয়ুর রহমান সাহেবের বেল বেজে উঠল। আবারও কুদ্দুস ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকল। সম্পাদক সাহেবের ঘরে ঢুকলে কুদ্দুসের মাথা ঠিক থাকে না।

‘কুদ্দুস।’

‘জি স্যার।’

‘রিকশায় যাওয়ার দরকার নেই, দেরি হবে। তুই এক কাজ কর, আমার গাড়ি নিয়ে চলে যা। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।’

‘জি আচ্ছা, স্যার।’

রিকশা ভাড়ার টাকাটা ফেরত দেবার জন্যে কুদ্দুস কুড়ি টাকার নোটটা বের করল। মতিয়ুর রহমান সাহেব বললেন, ‘টাকা ফেরত দিতে হবে না। তুই দেরি করিস না। চলে না।’

শার্ট না ধুয়েই কুদ্দুস গাড়িতে উঠল। তার মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। শার্টের এই রঙ তো আর উঠবে না। নতুন শার্ট। মাত্র তিনবার পরা হয়েছে। গাড়িতে উঠে তার আরেকটু মন খারাপ হলো— আবার একটা ভুল করা হয়েছে। পত্রিকাটা সাথে নিয়ে এলে হতো। গাড়িতে যেতে-যেতে কাগজ পড়ার আলাদা একটা মজা আছে। বসনিয়া-হার্জিগোভিনার গরম খবর আছে। আজকের দিনটা ভুল দিয়ে শুরু হয়েছে। আজকের তারিখটা কত যেন? ১৪ই এপ্রিল ১৯৯৬, তারিখটা তার জন্যে শুভ না।

লিফ্টে কুদ্দুস একা। লিফ্টম্যান তাকে ঢুকিয়ে বোতাম টিপে দিয়ে বলেছে— আট তলায় গিয়ে থামবে। নেমে যাবেন। পারবেন না? কুদ্দুস বলেছে, পারব। তার কথা শেষ হবার আগেই লিফ্টের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। লিফ্ট চলছে না। স্থির হয়ে আছে। একটা লালবাতি জ্বলছে আর নিভছে। মাথার উপর শাঁশাঁ শব্দে ফ্যান ঘুরছে। অদ্ভুত ফ্যান। গায়ে কোনো ঝড়ো লাগছে না। লিফ্টের ভেতর বিরাট একটা আয়ান লাগানো। আয়নার দিকে তাকিয়ে কুদ্দুসের মন খারাপ হয়ে গেল। শার্টের দাগ বিশ্রীভাবে দেখা যাচ্ছে। এখন লজ্জিতে দিয়েও লাভ হবে না। টাকা খরচ হবে অথচ দাগ উঠবে না। আচ্ছা, লিফ্টটা চলছে না, ব্যাপারটা কী? লিফ্টম্যান মনে হয় শুধু দরজা বন্ধ করার বোতাম টিপেছে, উপরে উঠার বোতাম টিপতে ভুলে গেছে। সে কি সত্যি লেখা বোতামটা টিপবে? কুদ্দুস মনস্থির করতে পারছে না। এ-কী বিপদে পড়া গেল! আগে জানলে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে হেঁটে উপরে উঠে যেত। আট তলায় ওঠা এমন কোনো ব্যাপার না।

পাগল মন গানটার প্রথম লাইনটা কুদ্দুস মনে-মনে কয়েক বার গাইল। ইচ্ছে করলে শব্দ করেও গাইতে পারে। লিফ্টে সে একা। লিফ্টের ভেতর গান গাইলে কি বাইরে থেকে শোনা যায়?

হৌস করে একটা শব্দ হয়ে লিফ্টের ভেতরটা পুরো অন্ধকার হয়ে গেল। ইলেকট্রিসিটি কি চলে গেল? কুদ্দুসের বুকে ধক্ করে একটা ধাক্কা লাগল। টাকা শহরে কারেন্টের কোনো ঠিকঠিকানা নেই। একবার চলে গেলে কখন আসবে কে জানে। লিফ্টের ভেতর কতক্ষণ থাকতে হবে? লিফ্টম্যান যে গেছে তারও ফেরার নাম নেই। কী হচ্ছে না হচ্ছে সে খোঁজ-খবর করবে না? অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভালো না। মতিয়ুর রহমান স্যারের হাতে পড়ত— এক পঁ্যাচে ঠিক করে দিত।

কুদ্দুস খুব সাবধানে লিফ্টের দরজায় কয়েক বার ধাক্কা দিল। জোরে ধাক্কা

দিতে সাহসে কুলুচ্ছে না। কল-কজার কাবরার—কী থেকে কী হয় কে জানে? গরম লাগছে। আবার দমবন্ধও লাগছে। কুদ্দুস বেশ উঁচু গলায় ডাকল, 'লিফ্টম্যান ব্রাদার, হ্যালো! হ্যালো!'

কতক্ষণ পার হয়েছে তারও বোঝা যাচ্ছে না। কুদ্দুসের মনে হলো ঘণ্টাখানিকের কম না। বেশিও হতে পারে। সারা দিনে যদি কারেন্ট না আসে তাহলে কী হবে? লিফ্টের ভেতর থাকতে হবে? কুদ্দুস লিফ্টের দরজায় আরেকবার ধাক্কা দিল আর তাতেই লিফ্ট চলতে শুরু করল। কারেন্ট ছাড়াই কি চলছে? লিফ্টের ভেতরটা ঘোর অন্ধকার। কারেন্ট এলে তো বাতি-ফাতি জ্বলত। কিছুই জ্বলেনি। কুদ্দুস মনে-মনে বলল, 'চলুক, কারেন্ট ছাড়াই চলুক। চলা দিয়ে হচ্ছে কথা।'

শৌ শৌ হচ্ছে হচ্ছে। কুদ্দুসের শরীর কাঁপছে। লিফ্ট কি এত দ্রুত ওঠে? এ তো মনে হচ্ছে বাড়িঘর ফুঁড়ে আসমানে উঠে যাবে। এত দ্রুত লিফ্ট উঠছে যে কুদ্দুসের পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠছে। যেভাবে উঠছে তাতে ১০০ তলা ছাড়িয়ে যাবার কথা। এটা মাত্র বার তলা বিল্ডিং। কুদ্দুস অসহাবে কাহাফের আটটা নাম মনে করার চেষ্টা করছে। এদের নাম পড়ে বুকে ফুঁ দিলে মহা বিপদ দূর হয়। বহু পরীক্ষিত। এরা আটজন দাকিয়ানুস বাদশাহর সময়ে পর্বতের গুহায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রোজ কেয়ামত পর্যন্ত এরা ঘুমন্ত থাকবে। এদের সাতজন মানুষ, একটা কুকুর। সাতজন মানুষের নাম মনে পড়ছে, কুকুরটা নাম মনে পড়ছে না।

মাকসেলাইনিয়া
মাসলিনিয়া
ইয়ামলিখা
মারনুশ
দাবারনুশ
শয়নুশ
কাফশাততাইউশ
কুকুরটার নাম কী?

কুকুরে নাম মনে করতে না পারলে কোনো লাভ হবে না। কুকুরের নাম শুদ্ধ পড়ে বুকে ফুঁ দিতে হয়। কুদ্দুস প্রাণপণে কুকুরটার নাম মনে করার চেষ্টা করছে। চরম বিপদে কিছুই মনে পড়ে না।

শৌ শৌ শব্দ বাড়ছেই। শব্দটা এখন কানের পর্দার ভেতরে হচ্ছে। কুদ্দুসের মুখ শুকিয়ে গেছে। সে লিফ্টের মেঝেতে বসে পড়ল। আর তখনই কুকুরটার নাম মনে পড়ল—কিতমীর!

কিতমীর নাম পড়ার পরপরই হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে লিফ্ট থেমে গেল। লিফ্টের দরজা খুলতে শুরু করল। দরজা পুরোপুরি খোলার জন্যে কুদ্দুস

অপেক্ষা করল না। সে বসা অবস্থা থেকেই ব্যাঙের মতো লাফ দিয়ে বের হয়ে পড়ল। বের হয়েই হতভম্ব হয়ে গেল। সে কোথায় এসেছে? ব্যাপারটা কী? লিফ্ট থেকে বের হওয়াটা বিরাট বোকামি হয়েছে। যেভাবে লাফ দিয়ে সে লিফ্ট থেকে বের হয়েছে তার উচিত ঠিক একইভাবে লাফ দিয়ে আবার লিফ্টে ঢুকে যাওয়া। সে পেছনে তাকাল। পেছনে লিফ্ট নেই। লিফ্ট কেন কোনো কিছুই নেই, চারদিকে ভয়াবহ শূন্যতা। সে নিজেও বসে আছে শূন্যের উপর। মাথার উপর আকাশ থাকার কথা। আকাশ-ফাকাশ কিছু নেই। তার চারপাশে কুয়াশার মতো হালকা ধোঁয়া। সেই ধোঁয়ার রং ঈষৎ গোলাপি। কুদুস মনে-মনে বলল, ‘ইয়া গাফুরুর রাহিম! এ-কী বিপদে পড়লাম! ও আল্লাপাক, আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর। হে গাফুরুর রাহিম! একবার যদি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাই তাহলে শুক্রবার তারা মসজিদে সিন্নি দেব। এবং বাকি জীবনে আর লিফ্টে চড়ব না। দরকার হলে ৫০০ তলা পর্যন্ত হেঁটে উঠব। আমার উপর দয়া কর আল্লাহপাক।’

কুদুস চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। চোখ বন্ধ অবস্থাতেই সে তিনবার কুলুহআল্লাহ পড়ে বুকে ফুঁ দেবে। তারপর চোখ খুলবে। তাতে যদি কিছু হয়। কোনো দোয়াই প্রথম চোটে মনে পড়ছে না। হায়, এ কেমন বিপদ!

২

কুদুস চোখ খুলল। অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আগে চারপাশে ছিল গোলাপি রঙের ধোঁয়া, এখন বেগুনি ধোঁয়া। আগে কোনো শব্দ ছিল না। এখন একটু পরপর সাপের শিসের মতো তীব্র শব্দ হচ্ছে। শব্দটা শরীরের ভেতর ঢুকে কলজে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এবারে তো আগেই ভালো ছিল। কুদুস ভেবে পাচ্ছে না সে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলবে কি না। চোখ বন্ধ রাখা আর খোলা রাখা তো একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে সে মারা গেছে? হার্টফেল করে লিফ্টের ভেতরেই তার মৃত্যু হয়েছে? সে যে জগতে আছে সেটা আর কিছুই না, মৃত্যুর পরের জগৎ। এ রকম তো হয়। কিছু বোঝার আগেই কত মানুষ মারা যায়। সেও মারা গেছে, মৃত্যুর পর তাকে আবার জিন্দা করা হয়েছে। কিছুক্ষণের ভিতর মানকের-নেকের আসবে, তাকে সোয়াল-জোয়াব শুরু করছে—“তোমার ধর্ম কী?” “তোমার নবি কে?” এইসব জিজ্ঞেস করবে। এ-কী বিপদ!

‘তুমি কে?’

কুদুস চমকে চারদিকে তাকাল, কাউকে সে দেখতে পেল না। প্রশ্নটা সে পরিষ্কার শুনল। তাকেই যে প্রশ্ন করা হচ্ছে তাও বোঝা যাচ্ছে। কেমন গম্ভীর ভারি গলা। শুনলেই ভয় লাগে।

‘এই, তুমি কে?’

কুদ্দুস কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'স্যার, আমার নাম কুদ্দুস।'

'তুমি এখানে কীভাবে এসেছ?'

'স্যার, আমি কিছুই জানি না। লিফ্টের ভিতরে ছিলাম। লাফ দিয়ে বের হয়েছি। বাইর হওয়া উচিত হয় নাই। আপনে স্যার এখন একটা ব্যবস্থা করেন। গরিবের একটা রিকোয়েস্ট।'

'আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি এখানে এলে কী করে?'

'স্যার, আমার ভুল হয়েছে। ক্ষমা করে দেন। কোথায় আসছি নিজেও জানি না। কীভাবে আসছি তাও জানি না। লিফ্টের দরজা ভালোমতো খোলার আগেই লাফ দিয়েছিলাম। এটা স্যার অন্যায় হয়েছে। আর কোনোদিন করব না। সত্যি কথা বলতে কি-আর কোনোদিন লিফ্টেও চড়ব না। এখন স্যার ফেরত পাঠাবার একটা ব্যবস্থা করেন। আমি খাস দিলে আল্লাহপাকের কাছে আপনার জন্যে দোয়া করব।'

'তোমার কোনো কিছুই তো আমরা বুঝতে পারছি না। প্রথম কথা হলো—মাত্রা কী করে ভাঙলে? মাত্রা ভেঙে এখানে এলে কীভাবে?'

'স্যার বিশ্বাস করেন, আমি কোনো কিছুই ভাবি নাই। যদি কিছু ভেঙে থাকে আপনাআপনি ভাঙছে। তার জন্যে স্যার আমি ক্ষমা চাই। যদি বলেন, পায়ে ধরব। কোনো অসুবিধা নাই।'

'তুমি তো বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছ। তুমি কি বুঝতে পারছ ব্যাপারটা কী ঘটেছে?'

'জি না।'

'তুমি ত্রি-মাত্রিক জগৎ থেকে চতুর্মাত্রিক জগতে প্রবেশ করেছ। এই কাণ্ডটা কীভাবে করেছ আমরা জানি না। আমরা জানার চেষ্টা করছি।'

'স্যার, ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। সারাজীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকব।'

'তোমার কথাবার্তাও তো আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। গোলাম হয়ে থাকব মানে কী?'

কুদ্দুস ব্যাকুল গলায় বলল, 'স্যার, গোলাম হয়ে থাকব মানে হলো স্যার আপনার সার্ভেন্ট হয়ে থাকব। আমি আপনার মুখ দেখতে পারছি না। মুখ দেখতে পারলে ভয়টা একটু কমত।'

'আমার ইচ্ছা করেই তোমাকে মুখ দেখাচ্ছি না। মুখ দেখালে ভয় আরো বেড়ে যেতে পারে।'

'স্যার, যে ভয় লিফ্টের ভিতর পেয়েছি, এরপর আর কোনো কিছুতেই কোনো ভয় পাব না। রয়েল বেঙ্গলের খাঁচার ভেতর ঢুকে রয়েল বেঙ্গলকে চুমু খেয়ে আসব। তার লেজ দিয়ে কান চুলকাব, তাতেও স্যার ভয় লাগব না।'

'তোমার নাম যেন কী বললে—কুদ্দুস?'

‘জি স্যার, কুদ্দুস।’

‘একটা জিনিস একটু বোঝার চেষ্টা কর—তুমি হচ্ছ ত্রি-মাত্রিক জগতের মানুষ। তোমাদের জগতের প্রাণীদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এই তিনটি মাত্রা আছে। এই দেখে তোমরা অভ্যস্ত। আমরা চার মাত্রার প্রাণী। চার মাত্রার প্রাণী সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই।’

‘স্যার, আপনি আমার মতো বাংলা ভাষায় কথা বলতেছেন, এইটা শুনেই মনে আনন্দ পাচ্ছি। আপনার চেহারা যদি খারাপও হয়, কোনো অসুবিধা নাই। চেহারার উপর তো স্যার আমাদের হাত নাই। এটা হলো বিধির বিধান।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আমাকে দেখ।’

কুদ্দুসের শরীরে হালকা একটা কাঁপুনি লাগল। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে যে রকম লাগে, সে রকম। তারপরই মনে হতে লাগল তার চারপাশে যত বেগুনি রঙ আছে সব তার চোখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। আবার চোখের ভেতর থেকে কিছু-কিছু রঙ বের হয়ে আসছে। এ কী নতুন মুসিক! হুশো!

আচমকা রঙের আসা-যাওয়া বন্ধ হলো। কুদ্দুস তার চোখের সামনে কী একটা যেন দেখল। মানুষের মতোই মুখ, তবে স্বচ্ছ কমন্ডের তৈরি। একটা মুখের ভেতর আরেকটা, সেই মুখের ভেতর আরেকটা—এই রকম চলেই গিয়েছে। মুখটার চোখ দু’টাও কাচের। সেই চোখের যে কোনো একটার দিকে তাকালে তার ভেতরে আর একটা চোখ দেখা যায়। সেই চোখের যে কোনো একটার দিকে তাকালে তার ভেতরে আর একটা চোখ দেখা যায়, সেই চোখের ভেতর আবার আরেকটা ... ঘটনা এইখানে শেষ হলে হতো, ঘটনা এইখানে শেষ না। কুদ্দুসের কখনো মনে হচ্ছে সে ভয়ঙ্কর এই মানুষটার ভিতরে বসে আছে, আবার পরমুহূর্তেই মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর এই মানুষটা তার ভেতরে বসে আছে। এই কুৎসিত জিনিসটাকে মানুষ বলার কোনো কারণ নেই, মানুষ ছাড়া কুদ্দুস তাকে আর কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

‘তুমি কি ভয় পাচ্ছ?’

‘জি না, স্যার। যদি কিছু মনে না করেন—একটু পেসাব করব, পেসাবের বেগ হয়েছে।’

‘কী করবে?’

‘প্রস্রাব করব। আপনাদের বাথরুমটা কোন দিকে?’

‘তোমার কথা বুঝতে পারছি না—কী করতে চাও?’

‘স্যার, একটু টয়লেটে যাওয়া দরকার।’

‘ও আচ্ছা। আচ্ছা, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন। তুমি তো আমাদের মহা সমস্যা ফেললে। আমাদের এখানে এ-রকম কোনো ব্যবস্থা নেই।’

‘বলেন কী স্যার!’

‘আমরা দেহধারী প্রাণী নই। দেহধারী প্রাণীদের মতো আমাদের খাদ্যের

যেমন প্রয়োজন নেই তেমনি টয়লেটেরও প্রয়োজন নেই। এখন তুমি টয়লেটে যেতে চাচ্ছ, আমাদের ধারণা কিছুক্ষণ পর তুমি বলবে খিদে পেয়েছে।’

‘সত্যি কথা বলতে কি স্যার, খিদে পেয়েছে। সকাল বেলা নাশতা করি নাই। মারাত্মক খিদে লেগেছে। চক্ষুলাজ্জার জন্যে বলতে পারি নাই। সকাল থেকে এই পর্যন্ত কয়েক চুমুক চা শুধু খেয়েছি, পত্রিকাও পড়া হয় নাই। আপনাদের এখানে পত্রিকা আছে স্যার?’

‘না, পত্রিকা নেই।’

‘জায়গা তো তাহলে খুব সুবিধার না।’

‘আমাদের জায়গা আমাদের মতো, তোমাদের জায়গা তোমাদের মতো।’

‘আপনাদের তাহলে “ইয়ে” হয় না?’

‘ইয়ে মানে কী?’

‘প্রেসাব-পায়খানার কথা বলতেছি—বর্জ্য পদার্থ।’

‘না, আমাদের এই সমস্যা নেই। তোমাকে তো একবার বলি হয়েছে আমরা তোমাদের মতো দেহধারী না। শুধু দেহধারীদেরই খাদ্য লাগে। খাদ্যের প্রশ্ন যখন আসে তখনই চলে আসে বর্জ্য পদার্থের ব্যাপার।’

‘তবু স্যার, আমার মন হয় বাইরের পেস্টের জন্যে দুই-তিনটা টয়লেট বানিয়ে রাখা ভালো।’

‘দেহধারী কোনো অতিথির আমাদের এখানে আসার উপায় নেই।’

‘আপনি তো স্যার একটা মিসটেক কথা বললেন। আমি চলে এসেছি না?’

‘হ্যাঁ, তুমি চলে এসেছ। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কীভাবে এসেছ সেই রহস্য এখনো ভেদ করা সম্ভব হয়নি।’

‘স্যার বিশ্বাস করেন, নিজের ইচ্ছায় আসি নাই। যে দেশে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নেই, পেসাব-পায়খানার উপায় নাই, সেই দেশে খামাখা কী জন্যে আসব বলেন? তাও যদি দেখার কিছু থাকত, একটা কথা ছিল। দেখারও কিছু নাই। স্যার, আপনাদের সমুদ্র আছে?’

‘হ্যাঁ আছে। তবে সে সমুদ্র তোমাদের সমুদ্রের মতো না। আমরা সময়ের সমুদ্রে বাস করি। তোমাদের কাছে সময় হচ্ছে নদীর মতো বয়ে যাওয়া। আমাদের সময় নদীর মতো প্রবাহমান নয়, সমুদ্রের মতো স্থির।’

‘মনে কিছু নেবেন না স্যার, আপনার কথা বুঝতে পারি নাই।’

‘সময় সম্পর্কিত এই ধারণা ত্রি-মাত্রিক জগতের প্রাণীদের পক্ষে অনুধাবন করা খুবই কঠিন। অঙ্ক এবং পদার্থবিদ্যায় তোমার ভালো জ্ঞান থাকলে চেষ্টা করে দেখতাম।’

‘এটা বলে স্যার আমাকে লজ্জা দিবেন না। আমি খুবই মূর্খ। অবশ্য স্যার মূর্খ হবার সুবিধাও আছে। মূর্খদের সবাই স্নেহ করে। বুদ্ধিমানদের কেউ স্নেহ

করে না। ভয় পায়। মতিযুর রহমান স্যার যে আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করে তার কারণ একটাই— আমি মূর্খ। বিরাট মূর্খ।’

‘ও আচ্ছা।’

‘উনার স্ত্রীও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। গত ঈদে আমাকে পায়জামা আর পাঞ্জাবি দিলেন। পাঞ্জাবি সিল্কের। এই রকম সিল্ক সচরাচর পাওয়া যায় না, অতি মিহি— এক্সপোর্ট কোয়ালিটি সিল্ক। যা তৈরি হয় সবই বিদেশে চলে যায়। ওনাদের কানেকশন ভালো বলে এইসব জিনিস যোগাড় করতে পারে। যাই হোক, পাঞ্জাবি সাইজে ছোট হয়ে গিয়েছিল, সেটা আর উনাকে বলি নাই, মনে কষ্ট পাবেন। শখ করে একটা জিনিস কিনেছেন।’

‘কুদ্দুস।’

‘জি স্যার।’

‘তোমাকে আমাদের পছন্দ হয়েছে।’

‘এই যে স্যার বললাম— মূর্খদের সবাই পছন্দ করে। আপনারা বেশি জ্ঞানী, কেউ আপনাদের পছন্দ করবে না। সত্যি কথা বলতে কি স্যার, আপনাদের ভয়ে আমি অস্থির। আপনাদের দিকে তাকাতো ভয় লাগতেছে।’

‘ভয়ের কিছু নেই। আমরা তোমাকে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি।’

‘আপনাদের পা থাকলে স্যার ভালো হতো। আপনাদের পা ছুঁয়ে সালাম করতাম।’

‘তোমার প্রতি আমাদের মমতা রয়েছে, যে কারণে আমরা এমন ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যাতে তোমার নিজের জায়গায় যখন ফিরবে তখন তোমার জীবন আনন্দময় হবে।’

‘বললে হয়তো স্যার আপনারা বিশ্বাস করবেন না, আমি খুব আনন্দে আছি।’

‘আনন্দে থাকলেও তোমার জীবন মোটামুটিভাবে অর্থহীন, এটা বলা যায়। জীবন কাটাচ্ছ অনেক জেনে চা বানিয়ে।’

‘কী করব স্যার বলেন, পড়াশোনা হয় নাই, মেট্রিক পরীক্ষাটা দিতে পারলাম না। ইংরেজি সেকেন্ড পেপার পরীক্ষার আগের দিন রাতে বাবাকে সাপে কাটল। চোখের সামনে ধড়ফড় করতে করতে মৃত্যু।’

‘আমরা কী করছি মন দিয়ে শোন, তোমাকে ফেরত পাঠাচ্ছি ইংরেজি সেকেন্ড পেপার পরীক্ষার আগের দিন রাতে। তুমি সেখান থেকে জীবন শুরু করবে। বাবাকে যাতে সাপে না কাটে সেই ব্যবস্থা করবে।’

‘সেটা স্যার কী করে সম্ভব?’

‘সময় আমাদের কাছে স্থির। আমরা তা পারি। তুমি যখন ফিরে যাবে তখন এখনকার স্মৃতি তোমার থাকবে না। তবে তোমার বাবাকে সাপে কাটবে এই ব্যাপারটা তোমার মনে থাকবে। এটা যাতে মনে থাকে সেই ব্যবস্থা আমরা করে

দিচ্ছি। নতুন জীবন তোমার শুরু হচ্ছে। সেখানে তোমার বাবাকে সাপে কাটবে না। তোমার বুদ্ধিবৃত্তিও কিছু উন্নত করে দিচ্ছি। পড়াশোনায় তুমি অত্যন্ত মেধার পরিচয় দেবে।’

‘অঙ্কটা নিয়ে স্যার সমস্যা। অঙ্কটা পারি না। খুব বেড়াছেড়া লাগে।’

‘আর বেড়াছেড়া লাগবে না।’

‘এখন কি স্যার আমি চলে যাচ্ছি?’

‘কিছুক্ষণের মধ্যে যাচ্ছ।’

‘ম্যাডামকে আমার সালাম দিয়ে দেবেন। উনার সঙ্গে দেখা হয় নাই।’

‘ম্যাডামকে তোমার সালাম পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তোমাকে আগে একবার বলেছি আমরা দেহধারী নই। আমাদের মধ্যে নারী-পুরুষের কোনো ব্যাপার নেই।’

‘জি আচ্ছা। না থাকলে কি আর করা! সবই আল্লাহর হুকুম। একটু দোয়া রাখবেন স্যার। এই বিপদে থেকে কোনোদিন উদ্ধার পাব চিন্তা করি নাই।’

কুদ্দুস হঠাৎ তার বুকে একটা ধাক্কার মতো অনুভব করল। গভীর ঘুমে সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যেই তার মনে হচ্ছে যে অতল কোনো সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে। সেই সমুদ্রের পানি শিসার মতো ভারি, বরফের মতো ঠাণ্ডা। পানির রঙ গাঢ় গোলাপি। সে তলিয়েই যাচ্ছে। তলিয়েই যাচ্ছে। তলিয়েই যাচ্ছে। এই সমুদ্রের কি কোনো তলা নেই? না-কি এখন সে মারা যাচ্ছে?

কুদ্দুসের ঘুম পাচ্ছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে। সে চোখ মেলে রাখতে পারছে না। অথচ তার ইচ্ছা জেগে থাকে। অদ্ভুত ব্যাপার কী হচ্ছে দেখে।

৩

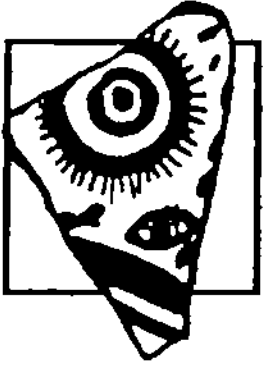
কুদ্দুসের ঘুম ভেঙেছে।

সে তার গ্রামের বাড়িতে চৌকির উপর বই-খাতা মেলে পড়তে বসেছিল। পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কী সর্বনাশের কথা! কাল ইংরেজি সেকেন্ড পেপার পরীক্ষা। রচনা এখনো দেখা হয়নি। অ্যা জার্নি বাই বোট এই বছর আসার কথা। গত বছর আসেনি। কুদ্দুস রচনা বই টেনে নিল। আর তখন মনে হলো তাকে একটা সাপ মারতে হবে। সাপটা কিছুক্ষণের মধ্যেই বের হবে। ভয়ঙ্কর বিষধর একটা সাপ। এ রকম মনে হবার কী কারণ কুদ্দুস বুঝতে পারল না। তারপরেও সে হ্যারিকেন হাতে নেমে এল। একটা মোটা লাঠি দরকার। লাঠি হাতে এফুনি তাকে তার বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। হাতে একটুও সময় নেই।

কেউ একজন তাকে বলছে— তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর। সেই কেউ একজনটা কে? কুদ্দুস জানে না। শুধু জানে এফুনি একটা সাপ তার বাবাকে

ছোবল দিতে আসবে। তার দায়িত্ব সাপটাকে মারা। যদি মারতে পারে তবেই তার জীবন হবে অন্য রকম।

কুদুস তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। ঐ তো সাপটা। শঙ্খচূড় নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। হ্যারিকেনের আলোয় তার চোখ জ্বলজ্বল করছে।



ভাইরাস

নুরুজ্জামান সাহেব বর্তমানে একজন সুখী মানুষ

বীমা কোম্পানিতে ভালো চাকরি করতেন। সাত বছর হলো রিটারার করেছেন। রিটারারের সময় গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড সব মিলিয়ে হাতে একসঙ্গে বেশ কিছু টাকা পেয়েছিলেন। সেই টাকা ব্যাংকে জমা আছে। ইন্টারেস্ট যা পান তাতেই তাঁর মোটামুটি চলে যায়। স্বাস্থ্য ভালো, রোগ-ব্যাধি নেই। ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেসার হার্টের সমস্যা এই জাতীয় বৃদ্ধ বয়সের রোগের কোনো কিছুই তাঁকে এখনো ধরেনি। দু'টি মেয়েই ভালো বিয়ে দিয়েছেন। একজন বরের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় থাকে, অন্যজন সিঙ্গাপুরে। স্ত্রী গত হয়েছেন। নুরুজ্জামান সাহেব একা থাকেন। এই একটাই যা সমস্যা। তবে অনেকদিন থেকেই একা আছেন বলে খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর খারাপ লাগে না, বরং ভালোই লাগে। দিনের বেলাটা তিনি ঘুরে ঘুরেই কাটান। দুপুর নিরিবিলি দেখে কোনো একটা হোটেলে খেয়ে নেন। ভিড়ভাড়া তাঁর একেবারেই সহ্য হয় না। রাতে কিছু খান না। কোনোদিন একটা কলা, কোনোদিন একটা আপেল খেয়ে শুয়ে পড়েন। এক ঘুমে রাত কাবার করে দেন।

আশ্বিন মাসের এক দুপুর। বেলা প্রায় দু'টা। নুরুজ্জামান সাহেব লালবাগের কেল্লা দেখে একটা হোটেলে ভাত খেতে ঢুকেছেন। হোটেলের নাম দিল্লী রেস্টুরেন্ট। দিল্লী রেস্টুরেন্টের পাশেই আরেকটা হোটেল— 'হোটেল আমানিয়া'। সেখানে রমরমা ভিড়। দিল্লী রেস্টুরেন্ট একেবারেই ফাঁকা। মনে হয় এই হোটেলের খাবার-দাবার সুবিধার না। নুরুজ্জামান সাহেবের কাছে খাবারটা প্রধান না, নিরিবিলিটা প্রধান। কাজেই তিনি ঢুকেছেন দিল্লী রেস্টুরেন্টে। কোনার

দিকের অন্ধকারের একটা টেবিলে বসেছেন। ইলিশ মাছ, সবজি এবং ডালের অর্ডার দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। সাধারণত তিনি মাছ খান না। আজ কেন জানি মাছ খেতে ইচ্ছা করল। তখন হোটেলে আরেকজন কাস্টমার ঢুকল। এত ফাঁকা জায়গা থাকতে নুরুজ্জামান সাহেবের কাছে এসে বলল, ‘আপনার টেবিলে বসতে পারি?’

নুরুজ্জামান সাহেব না বলতে গিয়েও বললেন না। হোটেলটা তাঁর না। কাস্টমার এসেছে, পয়সা দিয়ে খাবে। তার যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসবে। নুরুজ্জামান সাহেবের মনটা খারাপ হয়ে গেল। কারো সামনে খাওয়া-দাওয়া করতে তাঁর ভালো লাগে না।

‘আশা করি আপনার বিরক্তি উৎপাদন করছি না।’

‘জি না।’

‘একটা দেয়াশলাই দিতে পারেন?’

নুরুজ্জামান সাহেব দেয়াশলাই বের করে বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর মন আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে— বোঝাই যাচ্ছে এই লোক প্রচুর কথা বলবে। বকবক করে মাথা ধরিয়ে দেবে। এখনো সময় আছে, তিনি ইচ্ছা করলে অন্য টেবিলে চলে যেতে পারেন। কাজটা অভদ্রতা হয়।

‘আশা করি সিগারেটের ধোঁয়ায় আপনার অসুবিধা হচ্ছে না।’

‘না, হচ্ছে না।’

‘আন্তরিক ধন্যবাদ।’

লোকটার অন্য কোনো মন্তব্য নেই তো? ধান্দাবাজ না তো? বাংলাদেশে ধান্দাবাজ লোকের কোনো অভাব নেই। কয়েক দিন আগেই এ-রকম একজন ধান্দাবাজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ইস্ত্রী করা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে রীতিমতো ভদ্রলোক। চোখে সোনালি রিমলেস চশমা। মুখ ভর্তি হাসি। নুরুজ্জামান সাহেব একটা হোটেলে খেতে বসেছেন, লোকটা তাঁর সামনে বসে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল, ‘স্যার কিছু মনে করবেন না। গুলিস্তানের মোড়ে আমার মানিব্যাগটা চুরি হয়েছে। খিদেয় মরে যাচ্ছি। চারটি ভাত খাওয়ান।’

এ-রকম সম্ভ্রান্ত চেহারার একজন মানুষের মুখের উপর ‘না’ করা মুশকিল। লোকটা ভাত খেল। ভাত খাওয়ার পর দৈ, মিষ্টি খেল। সবশেষে মিষ্টি পান এবং একটা বেনসন সিগারেট।

নুরুজ্জামান সাহেবকে কিছু বলতে হচ্ছে না, সে নিজেই হাসিমুখে অর্ডার দিচ্ছে। কোনো দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই। কী সুন্দর করে বলছে—

‘স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে একটা সিগারেট দিতে বলি। এমন চমৎকার লাঞ্চার পর সিগারেট না খেলে লাঞ্চার অপমান করা হয়— এই বেয়ারা, একটা বেনসন নিয়ে এসো। দেখে শুনে আনবে, ড্যাম্প যেন না হয়। ড্যাম্প হলে খাবড়া খাবি।’

এই লোকও সে রকম কেউ না তো? নুরুজ্জামান আড় চোখে তাকালেন। সে রকমই তো মনে হচ্ছে। অন্ধকার কোনায় এসে বসেছে, চোখে সানগ্লাস। চোখ থেকে সানগ্লাস খোলেনি। একবার রিডার্স ডাইজেস্টে পড়েছিলেন— যারা সহজে সানগ্লাস খুলতে চায় না তাদের ভেতর সমস্যা থাকে। লোকটা পোশাকে-আশাকে ভালো। খয়েরি রঙের হাফ হাওয়াই শার্ট। শাদা প্যান্ট। শাদা প্যান্টের সঙ্গে মিলিয়ে ধবধবে শাদা চামড়ার জুতা। বিদেশী জুতা নিশ্চয়ই। সিগারেট যে খাচ্ছে দামি সিগারেটই খাচ্ছে। সুন্দর গন্ধ আসছে। সস্তা সিগারেটের দম আটকানো গন্ধ না। সিগারেট বের করেছে সিগারেট-কেস থেকে। আজকাল অবিশ্যি কেউ সিগারেট কেস ব্যবহার করে না। লোকটা সিগারেট-কেস নুরুজ্জামান সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিল। নিচু গলায় বলল, ‘আপনি কি সিগারেট খাবেন?’

নুরুজ্জামান বিরক্ত মুখে বললেন, ‘জি না, আমি ভাত খাব। ভাতের অর্ডার দিয়েছি।’

ভাত চলে এসেছে। সুন্দর সরু চালের ভাত। হোটেলে খাবার একটাই সুবিধা। হোটেলে তরকারি যেমনই রাঁধুক, ভাত ভালো রাঁধে। বাড়ির ভাত কখনো এ রকম হয় না, কোনো কোনো দিন মলমল থাকে, কখনো নরম কাদার মতো। এই জন্যেই তিনি বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে দিয়েছেন।

‘স্যার, আপনি কি আমার উপস্থিতিতে বিরক্ত বোধ করছেন?’

নুরুজ্জামান হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। শবজি দিয়ে ভাত মাখতে লাগলেন। শবজির চেজহারা দেখতে ভালো। খেতে কেমন কে জানে!

‘লালবাগের কেল্লা কেমন দেখলেন স্যার?’

নুরুজ্জামান চমকে উঠলেন, ‘ঐ লোকটি লালবাগ কেল্লা থেকেই পেছনে লেগেছে? সর্বনাশের কল্লা! মতলবটা কী?’

‘আপনি যখন কেল্লা দেখছিলেন আমিও দেখছিলাম। আমি অবিশ্যি এর আগেও অসংখ্যবার দেখেছি। বাংলাদেশে দেখার কিছু নেই। একই জিনিস বারবার দেখতে হয়। লালবাগের কেল্লা আপনি কি এই প্রথম দেখলেন?’

‘জি।’

‘পুরানো আমলের জিনিস দেখতে যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে সম্রাট শাহজাহানের আমলের একটা গেট আছে, দেখে আসতে পারেন। ইউনিভার্সিটি এলাকায় যাবেন, টিএসসি এবং বাংলা একাডেমীর সামনে দিয়ে যে বড় রাস্তাটা গেছে নজরুল সরণী, ঐ রাস্তার মাথায় গেটের অংশবিশেষ আছে। জায়গাটা চিনেছেন? চার নেতার কবরের পাশে।’

‘নুরুজ্জামান হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। মাথা নিচুর করে খেয়ে যাচ্ছেন। এরা রান্না ভালো করে। শবজিটা ভালো রঁধেছে। তারপরেও কাস্টমার কেন

পাচ্ছে না? একদিন হোটেল আমানিয়াতে খেয়ে দেখতে হবে। কে জানে হয়তো এদের রান্না আরো ভালো।’

‘প্রায় তিনশ বছরের পুরানো একটা গির্জা আছে— আর্মেনিয়ান গির্জা।’

‘গির্জা ফির্জা আমি দেখি না।’

‘স্যার, মনে হচ্ছে আমার প্রতিটি কথায় বিরক্ত হচ্ছেন। আমার পরিচয় পেলে অবিশ্যি আর বিরক্ত হবেন না। আমি একজন ভ্যাম্পায়ার।’

খাওয়া বন্ধ রেখে নুরুজ্জামান মুখ তুলে বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘আপনি কী?’

‘ভ্যাম্পায়ার? ভ্যাম্পায়ার চিনেন না? ঐ যে কাউন্ট ড্রাকুলা। ট্রানসেলভেনিয়ার বিখ্যাত কাউন্টের গল্প পড়েননি?’

নুরুজ্জামান আবার খেতে শুরু করলেন এবং মনে-মনে বললেন, ‘ব্যাটা বদম্যাস! ভ্যাম্পায়ার সেজেছে।’

‘আপনার মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। না পারারই কথা। ভ্যাম্পায়ার কী সেই সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই। গল্পের বই, সিনেমা থেকে আহরিত জ্ঞানের সবই ভুল।’

‘তাই বুঝি?’

‘জি তাই! লোকজ বিশ্বাস হচ্ছে ভ্যাম্পায়ার রাতে মানুষের রক্ত খেয়ে বেড়াবে, দিনে কফিনের ভেতর শুয়ে থাকবে। কারণ, রোদ গায়ে লাগা মানে তাদের মৃত্যু। আমাকে দেখুন দিনে ঘুরে বেড়াচ্ছি।’

‘তাই তো দেখছি।’

‘শুধু চোখগুলি প্রটেক্ট করতে হয়। চোখে রোদ লাগানো যায় না।’

‘এইজন্যেই সানগ্লাস?’

‘ঠিক ধরেছেন।’

‘মানুষের রক্ত আপনি কখন খান? দিনে না রতে? মানুষের রক্ত খান তো?’

‘জি খাই। বাধ্য হয়ে খেতে হয়। ভ্যাম্পায়ারদের জন্যে কিছু এসেনসিয়াল ভিটামিন মানুষের রক্ত ছাড়া পাওয়া যায় না।’

‘ও আচ্ছা।’

‘স্যার, আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?’

‘না। আপনি আমার ঘাড়ে দাঁত বসিয়ে রক্ত খেয়ে ফেলবেন এটা বিশ্বাস হচ্ছে না।’

‘সেভাবে রক্ত খাই না। ব্লাডব্যাংক থেকে কিনে নিয়ে আসি। একটা প্যাকটে এক সপ্তাহ দু’ সপ্তাহ চলে যায়। ব্লাডব্যাংকগুলি থাকায় সুবিধা হয়েছে। পছন্দসই রক্ত কিনতে পারছি। সব রকম রক্ত সবার স্যুট করে না। আমায় পছন্দের রক্ত হলো বি নিগোটিভ।’

‘শুনে ভালো লাগল।’

‘আপনার রক্তের গ্রুপ কী স্যার?’

‘জানি না রক্তের গ্রুপ কী। পরীক্ষা করাইনি।’

‘পরীক্ষা করিয়ে রাখা ভালো। শহরে মানুষ যে হারে বাড়ছে— অ্যাকসিডেন্ট তো হামেশাই হচ্ছে। যে দিকে তাকাই শুধু মানুষ। মানুষের বৃদ্ধির হার খুবই আশঙ্কাজনক।’

‘ভ্যাম্পয়ারের সংখ্যা বাড়ছে না?’

‘মানুষের তুলনায় কম। আগে আমরা মানুষের ঘাড়ে কামড় দিয়ে রক্ত খেতাম। তখন ভ্যাম্পয়ার বেশি ছিল। এখন ব্লাডব্যাংক থেকে আমরা রক্ত খাচ্ছি। কাজেই ভ্যাম্পয়ারের সংখ্যা বাড়ছে না। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।’

‘কিছু মনে করবেন না। আমি ব্যাপারটা বোঝার কোনো আগ্রহ বোধ করছি না।’

‘শোনার পর আগ্রহবোধ করবেন। ভাত খেতে খেতে শুনুন। শুনতে তো ক্ষতি নেই। ভ্যাম্পয়ার আসলে ভাইরাসঘটিত এক ধরনের অসুখ।’

‘ও, আচ্ছা।’

‘ভাইরাসগুলি অতি দীর্ঘজীবী। এরা বিশেষ ধরনের মৃত্যুহীন ভাইরাস। মানুষের শরীরে একবার ঢুকতে পারলে তারা আর মরে না। এবং যার শরীরে তারা ঢুকেছে তাকে বাঁচিয়ে রাখে নিজেদের বেঁচে থাকার স্বার্থে। মানুষ মরে গেলে তো তারাও মরে যাবে। ঠিক না?’

‘ঠিক বলেই তো মনে হয়।’

‘আমাদের যে রক্ত খেতে হয় তা ঐ ভাইরাসগুলির জন্যেই। রক্তটা ওদের জন্যেই দরকার।’

‘ও।’

‘একটা ভ্যাম্পয়ার যখন কোনো মানুষের রক্ত খায় তখন ভাইরাস একজনের গায়ে থেকে অন্যজনের গায়ে ঢোকে। আজকাল আমরা ব্লাড ব্যাংকের রক্ত খাওয়া ধরেছি। তাই ভাইরাসজনিত সংক্রমণ অনেক কমে গেছে।’

‘ভালো।’

‘তবে একেবারে যে নেই তাও না। হঠাৎ হঠাৎ অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যারা আসলে ভ্যাম্পয়ার। যেমন আজ যখন আপনাকে লালবাগের কেল্লায় দেখলাম তখন আপনাকে ভ্যাম্পয়ার ভেবেছিলাম।’

নুরুজ্জামান হতভম্ব গলায় বললেন, ‘আমাকে ভ্যাম্পয়ার ভেবেছিলেন?’

‘জি। আশা করি আমার কথায় আহত হননি।’

নুরুজ্জামান কঠিন চোখে তাকিয়ে রইলেন। লোকটার গালে ঠাস করে একটা চড় দিতে পারলে মনটা শান্ত হতো। তিনি চড় দিলেন না, শুকনো গলায় বললেন, ‘আমাকে আপনি ভ্যাম্পয়ার ভেবেছিলেন?’

‘জি। আপনার চোখে সানগ্লাস ছিল। আপনি ভ্যাম্পয়ারের মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরছিলেন। আমরা ভ্যাম্পয়াররা উদ্দেশ্যহীনভাবেই ঘোরাফেরা করি। আমাদের তো কোনো কাজ-কাম নেই। অফিসে যেতে হয় না। হা হা হা।’

নুরুজ্জামান সাহেবের খাওয়া শেষ হয়েছে। তিনি আরও বিরক্ত হয়ে হাত ধুয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। লোকটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। লোকটা হয় বন্ধ উন্মাদ কিংবা অন্য কোনো বদ মতলব আছে। মতলবটা কী ধরা যাচ্ছে না।

‘স্যারের খাওয়া তো হয়েছে। এবার আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট নিন।’

‘না, সিগারেট খাই না।’

‘সিগারেট— অবশ্যই খান। না খেলে সঙ্গে দেয়াশলাই রাখতেন না। আপনার পকেটে দেয়াশলাই দেখা যাচ্ছে। ভ্যাম্পয়ারের কাছ থেকে সিগারেট নিলে ক্ষতি নেই। ভ্যাম্পয়ারের ভাইরাস আপনাকে ধরবে না। এই ভাইরাস শুধুমাত্র রক্তবাহিত।’ নুরুজ্জামান সিগারেট নিলেন।

‘স্যার, পান খাবেন? চমচ বাহার দিয়ে একটা মিষ্টি পান দিতে বলি। ভাত খাবার পর পান খেলে ভালো লাগবে।’

‘না, পান খাব না।’

লোকটা নুরুজ্জামান সাহেবের দিকে একটু ঝুঁকে এসে বলল, ‘আপনাকে একটা গোপন কথা বলি। অনেকেই আছে, তারা নিজেরা বুঝতে পারে না যে তারা ভ্যাম্পয়ার। দিব্যি মানুষের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমরা যারা ভ্যাম্পয়ার তাদের দায়িত্ব হচ্ছে— ওদের জানানো। হয় কি জানেন, ব্লাড ট্রান্সফিউশান থেকে ভ্যাম্পয়ার ভাইরাস গায়ে ঢুকে গেল। এইডস ভাইরাসে দুম করে লোক মরে যায়। ভ্যাম্পয়ারের ভাইরাসে এ ধরনের আর মৃত্যু নেই। সেটাও এক যন্ত্রণা। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে কি আর ভালো লাগে? জীবন বোরিং হয়ে যায়।’

‘আপনি কতদিন ধরে বেঁচে আছেন?’

‘প্রায় তিন শ’ বছর। লালবাগের কেল্লা এই নিয়ে পঁচাত্তর বার দেখলাম। ঠিক করেছি আরও পঁচিশ বার দেখে এক শ’ পুরা করব। তারপর আর দেখব না।’

‘ভ্যাম্পয়ারের লক্ষণ কী?’

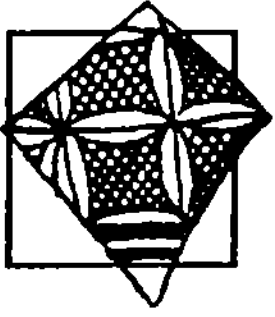
‘লক্ষণ খুব সহজ। ভ্যাম্পয়ারদের রোদে ছায়া পড়ে না।’

‘কেন?’

‘কেন সেটা জানি না। ছায়া পড়ে না এইটুকু জানি। স্যার, যাই, আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল।’

লোকটা উঠে চলে গেল। নুরুজ্জামান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হোটেলের বিল মিটিয়ে বাইরে এলেন। কৌতূহল থেকেই নিজের ছায়ার দিকে তাকালেন— আশ্চর্য! তাঁর কোনো ছায়া নেই। অন্যদের দিকে তাকালেন— সবার ছায়া আছে, শুধু তাঁর নেই।

ব্যাপারটা কী? নুরুজ্জামান সাহেবের মাথা ঘুরতে লাগল।



নিজাম সাহেবের ভূত

পলিথিনের ব্যাগে পাঁচটা শিং মাছ নিয়ে নিজাম সাহেব বাড়ি ফিরছেন। মাছগুলি যেন মরে না যায় সে জন্যে বুদ্ধি করে ব্যাগে খানিকটা পানি নিয়েছিলেন। এখন মনে হচ্ছে বাগে পানি নেয়াটা চূড়ান্ত বোকামি হয়েছে। পানি টুঁইয়ে টুঁইয়ে পড়ছে। তার প্যান্ট ইতোমধ্যেই মথামাখি হয়ে গেছে। নিজাম সাহেব লক্ষ্য করেছেন, তাঁর ৪১ বছরের জীবনে তিনি বুদ্ধি করে যে ক'টা কাজ করেছেন সব ক'টাই চূড়ান্ত নিবুদ্দিতা বলে পরবর্তী সময়ে প্রমাণিত হয়েছে। আসলে বুদ্ধি খাটিয়ে তাঁর কিছু করাই ঠিক না।

পাঁচটা শিং মাছের দাম নিয়েছে চল্লিশ টাকা। ঠকেছেন বলে মনে হচ্ছে। প্রতিটি শিং মাছের দাম পড়েছে আট টাকা। শিং মাছ সস্তা ধরনের মাছ—সাপের মতো কিলবিল করে। এই মাছ আট টাকা পিস হতেই পারে না। বাড়ি ফিরলে স্ত্রীর কাছে প্রচণ্ড ধমক খেতে হবে। নিজাম সাহেবের স্ত্রী ফরিদা সুপারি গাছের মতো সরু। তাঁর বুদ্ধিও সরু। তেজ ভয়াবহ। ফরিদার সরু বুদ্ধি এবং ভয়াবহ তেজের কাছে নিজাম সাহেব কেঁচোর মতো হয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে মনে হয় মাপ মতো গর্ত পেলে গর্তে ঢুকে যেতেন।

বাজার দেখে ফরিদা কী বলতে পারে তা নিজাম সাহেব কল্পনা করতে করতে যাচ্ছেন। প্রথমেই ফরিদা বরফ-শীতল গলায় বলবে— মাছ আর তরকারি আলাদা এনেছ তো? ঐ দিনের মতো মাছ-তরকারি-পান-সুপারি সব একসাথে আননি তো?

না, সেই ভুল নিজাম সাহেব করেননি। মাছ আলাদা আছে।

‘কাঁচা সুপারি আনতে বলেছিলাম, এনেছ? না ভুলে বসে আছ? যেটা বলা

হয় সেটা তো মনে থাকে না।’

আজ মনে আছে। বাজারে ঢুকেই প্রথম কাঁচা সুপারি কিনেছেন।

‘শিং মাছ আনতে বলেছিলাম, এনেছ? না রান্ধুসী মাগুরের বাচ্চা নিয়ে এসেছ? তুমি কচি খোকা তো, যে যা বলে তাই বিশ্বাস করো। আশ্চর্য মানুষ! কত করে নিয়েছে মাছ?’

‘পঁচিশ টাকা নিয়েছে। পাঁচ টাকা পিস।’

(নিজাম সাহেব মিথ্যা বলতে পারেন না। মিথ্যা কথা তাঁর গলার ফুটো দিয়ে বের হয় না। তাঁর ধারণা তার গলার ফুটো খুব সরু বলে এই সমস্যা হয়। তবে আজ বাধ্য হয়ে মিথ্যা বলতে হবে।)

‘পাঁচটা মাছ পঁচিশ টাকা নিল? বাড়িতে কি টাকার গাছ পুঁতে রেখেছ? না তুমি বাংলাদেশের মন্ত্রী-মিনিস্টার? একটা দাম বলবে আর হুট করে দিয়ে দেবে? নাকি মেছো হাঁটায় গিয়ে বড়লোকী চাল দেখাও? দরদাম করতে ভালো লাগে না? পাঁচ টাকা পিস শিং মাছ কী মনে করে কিনলে? এই শিং মাছগুলির শিং কি সোনা দিয়ে বাঁধানো?’

ফরিদার এইসব কথা তাঁকে মাথা নিচু করে শুনতে হবে। কোনো উপায় নেই। তিনি যদি বলেন মাছ পনেরো টাকা হয়েছে, তিন টাকা করে পিস। তারপরেও কথা শুনতে হবে।

‘ঝিনুকের চুন আনতে বলেছিলাম, এনেছ?’

নিজাম সাহেব চমকে উঠলেন। ঝিনুকের চুন আনা হয়নি। কী সর্বনাশ! ভেবে রেখেছিলেন সব বাজার শেষ হলে চুনটা কিনবেন। এইটাই ভুল হয়েছে। কাঁচা সুপারি কেনার সময়ই চুনটা কেনা উচিত ছিল। চুন ছাড়া বাড়িতে যাওয়াই যাবে না। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তাঁর উচিত ছিল পেছন ফিরে যে দিক থেকে এসেছেন সেদিক রওনা হওয়া— তা না করে তিনি ঠিক করলেন রাস্তা পার হবেন। প্রাচীন একটা কুসংস্কার আছে— যে রাস্তায় আসবে সে রাস্তায় ফেরত যাবে না।

রাস্তা বদল করতে গিয়েই দুর্ঘটনাটা ঘটল। দশ টনি এক ট্রাক তাঁর গায়ের উপর এসে পড়ল। তাঁকে চাপা দিয়ে উল্কার গতিতে পার হয়ে গেল। অ্যাকসিডেন্টের পর ট্রাকওয়ালারা খুব সাবধান থাকে। ট্রাক থামায় না। ট্রাক থামালে পাবলিকের হাতে ধরা খেতে হবে। এটা হতে দেয়া যায় না।

দশ টন মাল বোঝাই একটা ট্রাক নিজাম সাহেবের ওপর দিয়ে চলে গেছে, তার পরেও তিনি খুবই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, তিনি তেমন ব্যথা পাননি। ইনজেকশনের সূচ ফোটান মতো ব্যথাটা মোটেই ধর্তব্য নয়। ট্রাক-চাপা পড়লে ব্যথা পাওয়া যায় না—এই সত্য আবিষ্কারের আনন্দ নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। হাতের তরকারির ব্যাগ এবং মাছের ব্যাগ ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। মাছের ব্যাগ থেকে মাছগুলি বের হয়ে ঐকেবেঁকে যাচ্ছে। নর্দমার মধ্যে পড়লে এদের আর

পাওয়া যাবে না। নিজাম সাহেব অতি ব্যস্ত হয়ে মাছগুলির কাছে ছুটে গেলেন। বাড়িতে শিং মাছ না নিয়ে গেলে ভূমিকম্প হয়ে যাবে। তিনি ট্রাক-চাপা পড়েছেন এই ঘটনা শুনেও ফরিদা তাঁকে রেহাই দেবে না।

নিজাম সাহেব উবু হয়ে বসলেন, মাছ ধরতে গেলেন, ধরতে পারলেন না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে অদ্ভুত উপায়ে মাছগুলি বের হয়ে যাচ্ছে। কী আশ্চর্য ব্যাপার! ঘটনা কী? এর মধ্যে প্রচুর হইচই শুরু হয়েছে। রাস্তার ওপর শত শত লোক জমে গেছে। মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে। নিজাম সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। কৌতূহলী হয়ে উঁকি দিয়ে দেখেন— রক্তে রাস্তা ভেসে যাচ্ছে। সেই রক্তে মাখামাখি হয়ে যে শুয়ে আছে সে আর কেউ না, তিনি নিজে।

এই দৃশ্য দেখার পরেও তাঁর বুঝতে কিছু সময় লাগল যে তিনি আসলে মারা গেছেন। অপঘাতে মৃত্যুর পর মানুষ ভূত হয়। তিনিও তাই হয়েছেন। ভূত হয়েছেন বলেই কেউ তাকে দেখতে পারছে না— তবে তিনি নিজে নিজেকে পরিষ্কার দেখতে পারছেন। যদিও তাঁর শরীরগত কিছু পরিবর্তন হয়েছে। তিনি শিং মাছ ধরতে পারছেন না। মাছগুলি হাতের আঙ্গুল ভেদ করে বের হয়ে যাচ্ছে।

মৃত্যুর আগে তাঁর গায়ে যে পোশাক ছিল, ভূত হিসেবেও তাঁর গায়ে একই পোশাক। এমনকি শিং মাছের পানি লেগে শরীরে ভিজি গিয়েছিল— এখনো প্যান্টটা ভেজা। ভেজা প্যান্ট থেকে আঁশটে গন্ধ আসছে। ভূতরা তাহলে গন্ধ পায়? এই রহস্যময় ব্যাপারটার মাস্টার কে জানে। তবে কোনো রহস্যময় ব্যাপার নিয়ে আপাতত তাঁর মাথা ঘামাতে ইচ্ছা করছে না। মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে। ধাতস্থ হতে সময় লাগবে। সিগারেট খেতে পারলে হতো। ভূতরা সিগারেট খায় কি না তিনি জানেন না।

অ্যাকসিডেন্টের জায়গায় প্রচণ্ড ভিড়। পুলিশ চলে এসেছে। ট্রাফিক পুলিশ পৌঁ পৌঁ করে বাঁশি বাজাচ্ছে। কী হয়েছে সবাই একনজর দেখতে চায়। তিনিও উঁকি দিলেন। এমন ভিড় যে কিছু দেখার উপায় নেই। নিজের ডেডবডি অথচ তিনি নিজে দেখতে পারছেন না। এরচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে? তিনি ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঢোকান চেষ্টা করতে লাগলেন। এই সময় তাঁর পিঠে কে যেন হাত রেখে বলল, ‘স্যার, আপনিই মারা গেছেন?’

নিজাম সাহেব বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, ‘জি।’

নিজের মৃত্যুর কথা নিজের মুখে বলতে লজ্জা লাগল।

‘খুবই আফসোসের কথা। ভেরি স্যাড।’

লোকটির কথায় নিজাম সাহেব অভিভূত হলেন। যখন মানুষ ছিলেন তখন এত সহানুভূতি নিয়ে কেউ তার সঙ্গে কথা বলেনি। ভূত হবার পর মানুষের সহানুভূতি পাচ্ছেন, এটা তুচ্ছ করার ব্যাপার না।

‘স্যার, আপনার নাম কী?’

‘নিজাম । নিজামুদ্দিন ।’

‘আমার নাম মোতালেব । আমিও আপনার মতো ভূত । ঐ যে টাইলসের একটা দোকান দেখছেন— ইউরেকা টাইলস, আমি ছিলাম ঐ দোকানের ম্যানেজার ।’

‘ও ।’

‘দোকানের মধ্যেই পা পিছলে বেকায়দা অবস্থায় পড়েছিলাম । সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু । হাসপাতালে নেবারও সুযোগ হয়নি ।’

‘ও ।’

‘তারপর থেকে এইখানেই আছি । রাতে দোকানে ঘুমাই ।’

নিজাম সাহেব আবার বললেন, ‘ও ।’

‘মেইন রোডের ওপর দোকান । ট্রাক-ফ্রাক সারারাত চলে, ঘুম ভালো হয় না ।’ ভূতদের ঘুমের প্রয়োজন হয় তাঁর জানা ছিল না । ভূত-জগৎ সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না । ধীরে ধীরে সব জানবেন । মোতালেব সাহেবকে পাওয়ায় তাঁর লাভ হয়েছে । সাধারণ জিনিসগুলি তাঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাবে ।

মোতালেব বলল, ‘এইখানে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করে কী করবেন স্যার, চলে যান ।’

নিজাম সাহেব বললেন, ‘কোথায় যাব?’

‘ভাবির কাছে যান । এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, ভাবির আশপাশে থাকলেও একটা সান্ত্বনা ।’

‘যাব কীভাবে?’

‘রিকশা করে চলে যান । আপনার তো আর রিকশা ভাড়া লাগবে না । চালু একটা রিকশায় লাফ দিয়ে সীটে উঠে বসে পড়ুন । আপনার বাসা কোথায়?’

‘কলাবাগান ।’

‘ঐ দিকে যাচ্ছে এখন একটি রিকশায় উঠে বসুন । আমি অবিশ্যি কোথাও যেতে হলে গাড়িতে করে যাই । তবে রিকশার আলাদা মজা আছে ।’

নিজাম সাহেব চুপ করে আছেন । এত দিন ভেবেছিলেন ভূতরা বাতাস হয়ে ঘুরে বেড়ায়— এখন দেখা যাচ্ছে ব্যাপার সে-রকম নয় । চলাফেরার জন্যে তাদেরও রিকশা, বেবিট্যাক্সি লাগে ।

মোতালেব বলল, ‘স্যারের মনটা এত খারাপ কেন?’

নিজাম সাহেব বললেন, ‘না, না, মন খারাপ না । একটু ইয়ে লাগছে । কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ ভূত হয়ে গেলাম ।’

মোতালেব বলল, ‘একটু ইয়ে তো লাগবেই । শুধু একটু না, অনেকই ইয়ে লাগবে । আধঘণ্টা আগেও ছিলেন মানুষ, এখন হয়েছেন ভূত । আমি যখন প্রথম ভূত হই— কী অভিজ্ঞতা! কী করব না করব কিছুই জানি না । তখন ছিল ঘোর বর্ষা, বুঝলেন ভাই সাহেব । আমি বেকুরের মতো সারারাত বৃষ্টিতে ভিজলাম ।’

তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ইচ্ছা করলেই যে কোনো বাড়িতে ঢুকে যেতে পারতাম। আমরা হলাম ভূত— দরজা বন্ধ থাকুক, আমরা যে-কোনো ফুটোফাটা দিয়ে ঢুকতে পারি, তাই না?’

কিছু না বুঝেই নিজাম সাহেব বললেন, ‘জি।’

‘বুঝলেন ভাই সাহেব, যেহেতু কিছু জানি না— সারারাত বৃষ্টিতে ভিজে আমার হয়ে গেল সর্দি। বুকে কফ বসে গেল— খকর-খকর করে কাশি।’

নিজাম সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, ‘ভূতদের সর্দি হয়?’

মোতালেব বিরক্ত হয়ে বলল, ‘ব্যাঙের যদি সর্দি হতে পারে, ভূতের হবে না কেন? আমরা কি ব্যাঙের চেয়েও খারাপ?’

নিজাম সাহেব কিছু বললেন না। তাঁর মাথায় সব তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। মোতালেব বলল, ‘শুধু শুধু দেরি করেছেন কেন স্যার? চলে যান। ভাবির পাশে বসে থাকুন। আপনার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছানোর পর ভাবি আছাড়-পিছাড় খেয়ে কাঁদবে। ঐ দৃশ্য দেখে খুব মজা পাবেন। একটা রিকশা নিয়ে চলে যান। তবে চোখ-কান খোলা রাখবেন— একটু কেয়ারফুল থাকবেন।’

‘কেয়ারফুল থাকব কেন?’

‘কিছু সন্ত্রাসী ভূত আছে। চাঁদাবাজ। ভদ্রতা বলতে কিছুই জানে না। মানুষ থাকতে যেমন বদ ছিল, মরে আরও বদ হয়েছে। অকারণে মারধর করে।’

নিজাম সাহেব আঁতকে উঠে বললেন, ‘সে কি!’

‘পরশুদিনের ঘটনা-একটা পাজেরো গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। নতুন গাড়ি দেখে লোভ লাগল। গাড়ির গতি আমার আবার একটা দুর্বলতা আছে। বিকেলের দিকে গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে। পাজেরো দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। লোক দিয়ে গাড়িতে ঢুকে পড়লাম। গাড়ি যাচ্ছিল গুলশানের দিকে। ফর্মগেইস্টে রেড লাইট। গাড়ি থামছে। আমি বেকুবের মতো মাথা বের করেছি। আমাকে দেখেই চার-পাঁচ সন্ত্রাসী-ভূত হইচই করে ছুটে এল। আমি কিছু বোঝার আগেই জানালা দিয়ে টেনে বের করে ফেলল। দিল ধোলাই— এখনো আমার হাতে-পায়ে ব্যথা।’

নিজাম সাহেব শুকনো গলায় বললেন, ‘সর্বনাশ!’

‘অপঘাতে যারা মারা যায় তারাই তো ভূত হয়— অপঘাতে মারা যায় কারা? সন্ত্রাসী-খুনী-চাঁদাবাজ। আমরা যারা সাধারণ ভূত তারা এদের হাতে জিম্মি। কাওরান বাজারে এক খুনী-ভূত আছে-রামদা হাতে বসে থাকে। কাউকে দেখলেই হুঁ হুঁ হুঁ শব্দ করে রামদা হাতে ছুটে আসে। ভাই সাহেব, কাওরান বাজার এলাকার দিকে ভুলেও যাবেন না।’

‘জি আচ্ছা।’

‘মিরপুর চার নাম্বারেও যাবেন না।’

‘ঐখানে কী?’

‘মিরপুরে আছে দুই ভাই— ছদরুল-বদরুল, দু’ভাই-ই ভয়ঙ্কর। আমার ফ্যামিলি থাকে মিরপুরে। দু’বছরের উপর হয়ে গেল ওদের দেখতে যেতে পারি নাই। মন মানে না, দেখতে ইচ্ছা করে— বেকুবের মতো একবার চুপি চুপি চলে গেছি, বাসায় ওঠার আগেই দু’জনের হাতে ধরা পড়লাম। কিরিচের এক কোপে তারা আমার ডান পা হাঁটুর নিচ থেকে কেটে ফেলল— তারপর সেই কাটা পা নিয়ে কী খুশি! ফুটবলের মতো ছোড়াছুড়ি করে। ওরা পা নিয়ে লাফালাফি করছিল, আমি সেই ফাঁকে কোনোক্রমে পালিয়ে এসেছি। দু’মাস ভুগলাম— দুই মাসে নতুন পা গজাল।’

‘পা গজায়?’

‘তা গজায়। লেজের মতো গজায়— ভূত হবার এই এক সুবিধা। যখন পা কাটা গেল তখন জানতাম না পা আবার গজায়। খুব মন-কষ্টে ছিলাম, তারপর একদিন দেখি পা গজিয়েছে। দেখুন না।’

ভদ্রলোক পায়জামা পরে ছিলেন। পায়জামা সরিয়ে গজানো পা দেখালেন। এবং নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘গজানো পা আসল পায়ের মতো হয় না। দুর্বল হয়— জোর পাওয়া যায় না। তবু যে পা গজায় সেটা কম না। ভূত-জীবনে দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। হাত-পা গজানোর সিস্টেম না থাকলে বিরাট বিপদ ছিল।’

‘মাথা গজায়?’

‘মাথা কাটা পড়লে মাথাও গজায়। সেই মাথা সাইজে ছোট হয়।’

নিজাম সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, ‘ভাই সাহেব, আপনি কি আমার সঙ্গে একটু আসবেন? একা যেতে ভয়-ভয় লাগছে।’

মোতালেব সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘চলুন। আপনার ওপর মায়া পড়ে গেছে। আপনাকে একা ছাড়তে ইচ্ছা করছে না। ভূত যদি ভূতকে না দেখে, তাহলে কে দেখবে? একটা গান আছে না— ভূত ভূতের জন্যে....’

মোতালেব গান ধরল। গলায় সুর বেশ ভালো। একটু নাকি নাকি তারপরও শুনতে খারাপ লাগছে না। কয়েক লাইন গেয়ে বলল, ‘স্যারের গান-বাজনার চর্চা আছে?’

‘জি না।’

‘চর্চা থাকলে ভালো হতো। আমাদের সময় কাটে না তো— গান-বাজনা করে সময় কাটাই। চলুন রওনা হই— রিকশায় যাবেন, না গাড়িতে? রিকশায় যাওয়া ভালো। আপনার তো নিশ্চয়ই চলন্ত গাড়িতে লাফ দিয়ে ওঠার অভ্যাস নেই। শিখে যাবেন। বেঁচে থাকার জন্যে সবই শিখতে হবে। সংগ্রাম করতে হবে। ভূতদের জীবন হলো সংগ্রামী জীবন।’

নিজাম সাহেব চমকে উঠলেন। ভূতদের জীবন সংগ্রামী জীবন— তার মানে

কী? বেঁচে থাকতে সংগ্রাম, মরার পরেও সংগ্রাম? কী ধরনের সংগ্রাম মোতালেবকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া ভালো।

মোতালেবকে জিজ্ঞেস করা হলো না। তার আগেই সে গান ধরল—

‘আইজ পাঁশা খেলবরে ভূতনী
ও ভূতনী তৌমার সঁনে।
এঁকেলা পাইয়াছিরে ভূতনী
এই নিঘোর বঁনে’

নিজাম সাহেবের ভালো লাগল। মোতালেবের গলা আসলেই ভালো। তালজ্ঞানও ঠিক আছে। নিজাম সাহেব হাতে তাল দিতে লাগলেন। মোতালেব গান থামাল—

‘স্যার।’

‘জি।’

‘একটা খালি রিকশা যাচ্ছে, চলুন উঠে পাড়ি। আমার হাত ধরে লাফ দিন। হাই জাম্প। ছোটবেলায় হাই জাম্প দেননি?’

‘জি না।’

ছোটবেলা হাই জাম্প না দিলেও নিজাম সাহেব ভালোই লাফ দিলেন। রিকশার পাটাতনে গড়িয়ে পড়লেন। মোতালেব তাঁকে সিটে টেনে তুলল। নিজাম সাহেব বললেন, ‘রিকশায় প্যাসেঞ্জার উঠলে আমরা কী করব?’

মোতালেব হাই তুলতে তুলতে বলল, ‘কোনো সমস্যা নেই। তখন আমরা প্যাসেঞ্জারদের কোলে বসে থাকব। ভূত হবার এও এক মজা। মানুষের কোলে বসে বসে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়।’

মানুষের কোলে বসে জীবন কাটিয়ে দেবার ব্যাপারটা নিজাম সাহেবের খুব রুচিকর মনে হলো না। তিনি কিছু বললেন না। রিকশার হুড ধরে বসে রইলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, তিনি পিঠে এক ধরনের ব্যথা অনুভব করছেন। অস্বস্তিকর ব্যথা। যেন মেরুদণ্ড ধরে কেউ একজন হালকাভাবে তাঁকে পেছন দিকে টানছে। ব্যথাটা শুরুতে হালকা থাকলেও রিকশা যতই এগুচ্ছে ততই বাড়ছে। মোতালেবকে ব্যাপারটা বলবেন কি না, তিনি বুঝতে পারছেন না। ভৌতিক ব্যাপার হয়তো সে অনেক ভালো জানে। রিকশায় চড়লে সব ভূতদেরই হয়ত পিঠে ব্যথা করে। এটাই নিয়ম। ব্যথাটা বাড়ছে, কিছুতে যাচ্ছে না। ব্যথা কমানোর জন্যে নিজাম সাহেব খুকখুক করে কালশেন। মোতালেব মাথা ঘুরিয়ে বিস্মিত গলায় বলল, ‘কাশছেন কেন?’

‘কাশি আসছে এইজন্যে কাশলাম। ভূতদের কি কাশা নিষেধ?’

‘কাশা নিষেধ না। আপনার কাশির ধরনটা ভালো না। পিঠে ব্যথা আছে?’

নিজাম সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ আছে।’

‘মেরুদণ্ডে?’

‘জি।’

‘সর্বনাশ! লাফ দিয়ে নামুন দেখি রিকশা থেকে।’

নিজাম সাহেব রিকশা থেকে লাফ দিয়ে নামলেন। ভীত গলায় বললেন, ‘কী হয়েছে?’

‘সাড়ে সর্বনাশ হয়ে গেছে। পিছন দিকে দেখেন।’

নিজাম সাহেব পিছন ফিরে দেখলেন— তাঁর পেছনে রঙিন এক ফিতা— ফিতার একমাথা তার পিঠে লাগছে, অন্য মাথা বহুদূর চলে গেছে।

মোতালেব বিরক্ত হয়ে বলল, ‘কিছু বুঝতে পারছেন?’

‘জি না।’

‘আরে ভাই, আপনি তো এখনো মরেন নাই। মনে হয় ডাক্তার আপনার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছে। কিছু নির্বোধ ডাক্তার আছে না, রোগীকে বাঁচাবার জন্যে জীবন দিয়ে দেয়। একজন মরতে চাচ্ছে মরতে দাঁড়। তা দেবে না। বাঁচিয়ে তুলবে। বাঁচিয়ে তুলে লাভটা কী?’

নিজাম বললেন, ‘ফিতার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।’

‘আপনার রক্তমাংসের শরীরের সঙ্গে এই ফিতা লাগানো। ফিতায় টান পড়ছে, তার মানে হলো আপনাকে ঐ শরীরে ঢুকতে হবে। ব্যথা, যন্ত্রণা, চিকিৎসা চলবে— ওই, শরীরে ঢুকতে চান?’

‘বুঝতে পারছি না।’

‘কোনো দরকার নাই। যা আছেন ভালো আছেন। দেখি চেষ্টা করে ফিতা ছিঁড়তে পারি কিনা। আপনি ও’হাতে লাগান। আরও কয়েক জন ভূত পেলে ভালো হতো— একসঙ্গে টানটানি করে ছিঁড়ে ফেলতাম। আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন— আমি দেখি কয়েক জনকে নিয়ে আসি। খবরদার, যাবেন না। এই টেলিফোনের খাম্বা ধরে দাঁড়ান। দু’হাতে শক্ত করে খাম্বা ধরে থাকুন, নয়তো ফিতার টানের চোটে উঠে চলে যাবেন। মহাবিপদে পড়লাম দেখি।’

নিজাম সাহেব টেলিফোনের খাম্বা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। পিঠের টান বাড়ছে। তাঁর একবার মনে হলো খাম্বাসুদ্ধ তাকে বুঝি উড়িয়ে নিয়ে যাবে, এমন টান। ইতিমধ্যে মোতালেব তিন-চারজন ভূত নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তারা ফিতা ছেঁড়ার চেষ্টা করছে। লাভ কিছু হচ্ছে না। একসময় টান প্রবল হলো— নিজাম সাহেব টেলিফোনের খাম্বা ছেড়ে দিলেন। তাঁর মনে হলো তিনি ঝড়ের মতো ছুটে যাচ্ছেন। ভয়াবহ অবস্থা! মানুষ (নাকি ভূত?) এমন বিপদে পড়ে!

নিজাম সাহেবের মাথার অপারেশন শেষ হয়েছে। নিউরোলজির সার্জেন্ট প্রফেসর ইফতেখারুল ইসলাম হাতের গ্লাভস্ খুলতে খুলতে বললেন, ‘অপারেশন

সাকসেসফুল হয়েছে বলেই আমার ধারণা। রোগীর বেঁচে থাকার কথা। অবিশ্যি চব্বিশ ঘণ্টা পার না হলে কিছু বলা যাচ্ছে না— তার পরেও আমি আশাবাদী। চোখের মণিতে আলো ফেলে দেখুন তো রিফ্লেক্স একশান কেমন?’

একজন ডাক্তার নিজাম সাহেবের চোখের মণিতে আলো ফেললেন। চোখের মণি বড় বড় হয়ে আছে। নিজাম সাহেবের ভূত তাঁর শরীরের কাছেই বসা। তিনি শরীরের ভেতর ঢোকান তীব্র আকর্ষণ বোধ করেছেন— কোন দিক দিয়ে ঢুকবেন বুঝতে পারছেন না।

‘স্যার।’

নিজাম সাহেব চমকে তাকিয়ে দেখেন মোতালেব চলে এসেছে। বোধহয় দৌড়ে এসেছে। হাঁপাচ্ছে।

নিজাম সাহেব মোতালেবের দিকে তাকালেন। মোতালেব বলল, ‘খামাখা আর বসে আছেন কেন? এরা তো মনে হয় আপনাকে ঝাঁপবেই-শরীরে ঢুকে পড়ুন।’

‘কোন দিক দিয়ে ঢুকব?’

‘চোখের মণি দিয়ে ঢুকে পড়ুন। চোখের মণি দিয়ে ঢোকাটা সহজ হবে।

‘ভয় লাগছে তো।’

‘কচি খোকা নাকি, ভয় লাগছে! ভাবির সঙ্গে দেখা হয়েছে?’

‘না।’

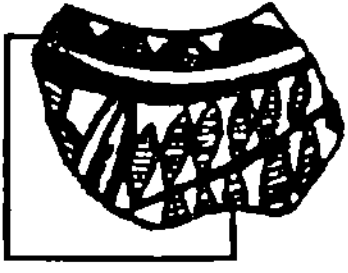
‘সে-কি! হাসাপাতালের বায়ুশায় লম্বা হয়ে পড়ে আছে। ভাবির সঙ্গে আপনার ছোট মেয়েটাও আছে। খেচারি বোধহয় খুব বাপ ভক্ত। কান্নাকাটি যেভাবে করছে বলার না।’

‘খুব কাঁদছে?’

‘আহারে, শুধু কথা বলে সময় নষ্ট। ঢুকে পড়ুন তো।’

নিজাম সাহেব তাঁর চোখের মণির ভেতর দিয়ে নিজের শরীরে ঢুকলেন।

যে ডাক্তার চোখের মণির উপর আলো ফেলেছিল সে আনন্দিত গলায় বলল, ‘রিফ্লেক্স একশান ভালো। চোখের মণি ছোট হচ্ছে। এ যাত্রা বোধহয় টিকে গেল। ট্র্যাকের নিচে পড়েও বেঁচে যায়— এই প্রথম দেখলাম। একেই বলে ভাগ্য।’



লিপি

‘জাংক মেইল’ বলে একটা ব্যাপার আছে যা চরিত্রগত দিক দিয়ে ১০০ ভাগ আমেরিকান। একমাত্র আমেরিকাতেই মেইল বক্স খুললে হাতভর্তি চিঠিপত্র পাওয়া যায়। যার ভেতর একটা বা দুটো কাজের চিঠি, বাকি সবই অকাজের বা আমেরিকান ভাষায়— জাংক মেইল।

জাংক চিঠিগুলি চট করে আলাদা করাও মুশকিল। খাম দেখে মনে হবে খুব জরুরি কিছু চিঠি। চিঠি শেষ পর্যন্ত পড়লে ভুল ভাঙবে। একটা নমুনা দেই—

প্রিয় হুমায়ুন,

তুমি কি জানো তুমি একজন অত্যন্ত মৌভাগ্যবান ব্যক্তি? টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে এক মিলিয়ন ব্রান্ডম নাম্বার নিয়ে একটি সুইপস্টেক করা হয়েছে। যার বিশ জন ফাইন্যান্সিস্টের মধ্যে তুমি এক জন। প্রথম পুরস্কার এক সপ্তাহ বিশ্বভ্রমণের জন্যে দু’টি প্রথম শ্রেণীর বিমানের টিকিট। দ্বিতীয় পুরস্কার চার দিনের জন্যে ফ্লোরিডা প্যাকেজ।

আমাদের নিয়মানুসারে বিশ জন ফাইন্যান্সিস্টকে আমাদের কোম্পানির একটি করে প্রোডাক্ট কিনতে হবে। আমরা ক্যাটালগ পাঠালাম। তুমি কোনটি কিনতে চাও তাতে টিক মার্ক দিয়ে সেই পরিমাণ ডলার আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে।

আশা করি তুমি এই সুযোগ হারাবে না। তোমাকে সুইপস্টেকের ফাইন্যান্সিস্টদের একজন হবার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ।

.....

জাংক মেইলগুলি প্রথম লাইন পড়ে ফেলে দেয়াই নিয়ম। আমি তা করি না। কেন জানি খুব আগ্রহ নিয়ে প্রতিটি চিঠি শেষ পর্যন্ত পড়ি। যা বলে তা বিশ্বাসও করি। আমেরিকানরা চিঠি লিখে মিথ্যা কথা বলবে এটা ভাবতেও আমার কাছে খারাপ লাগে। এই গল্পটি জাংক মেইল নিয়ে। প্রস্তাবনা অংশ শেষ

হয়েছে, এখন মূল গল্পে আসি।

১৯৮০ সালের জুন-জুলাই মাসের ঘটনা। আমি তখন নর্থডেকোটায়ে। স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছি। হঠাৎ একদিন মেইল বক্সে একটা চিঠি পেলাম। চিঠিটা এ রকম—

ড. আহমেদ,

আমি জেনেছি তুমি লুপ্ত প্রাচীন ভাষার বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। আমার কাছে লুপ্ত ভাষায় লেখা একটি কাগজ আছে। তুমি যদি ভাষার পাঠোদ্ধারে আমাকে সাহায্য করো আমি খুশি হব। তুমি দয়া করে নিম্নলিখিত পোস্ট বক্স নাম্বারে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো। ভালো কথা, তোমার পরিশ্রমের জন্যে যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দেয়া হবে।

বলাই বাহুল্য, এটা একটা জাংক চিঠি। পোস্ট বক্সের ঠিকানায় উত্তর দিলেই ধরা খেতে হবে। প্রাচীন ভাষাবিষয়ক কোনো সোসাইটির সদস্য হতে হবে যার জন্যে মাসিক চাঁদা বিশ ডলার বা এই জাতীয় কিছু। চিঠি আমি ফেলেই দিতাম কিন্তু আমার নামের আগে ড. পদবিটি আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিল। তখনও ডক্টর ডিগ্রি পাইনি। পাব পাব আশা। কিউমিলিটিভ একজাম পাস করেছি। থিসিস লিখছি। এই সময় কেউ যদি ড. লিখে চিঠি পাঠায় মন দুর্বল হতে বাধ্য। কাজেই আমি চিঠির জবাব পাঠালাম। আমি লিখলাম—

জনাব,

আপনার চিঠি পেয়েছি। প্রাচীন লুপ্ত ভাষা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আমার পড়াশোনার বিষয় পলিমার রসায়ন। আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না বলে দুঃখিত। আমি প্রাচীন ভাষা জানি এই তথ্য কোথায় পেলেন জানালে খুশি হব।

বিনীত

হুমায়ূন আহমেদ

পুনশ্চ ১ : আমি এখনো Ph. D. ডিগ্রি পাই নি। আপনার এই তথ্যটিও ভুল।

পুনশ্চ ২ : আপনার চিঠিটি যদি জাংক মেইল জাতীয় হয় তা হলে জবাব দিবেন না।

আমি এই চিঠির জবাব আশা করি নি। কিন্তু সাত দিনের মাথায় জবাব পেলাম। জবাবটা হুবহু তুলে দিলাম—

প্রিয় আহমেদ,

আমার চিঠিটি জাংক মেইল নয়, সে কারণেই জবাব দিচ্ছি।
তুমি প্রাচীন লুপ্ত ভাষা নিয়ে গবেষণা করো এই তথ্য তোমার
বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান আমাকে জানিয়েছে।

আমি আমেরিকার প্রায় সব বড় লাইব্রেরিকে একটি আবেদন
পাঠিয়েছিলাম। সেখানে জানতে চেয়েছি লাইব্রেরির পাঠকদের
মাঝে এমন কেউ কি আছেন যারা প্রাচীন ভাষা নিয়ে পড়াশোনা
বা গবেষণা করেন?

তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি তোমার নাম পাঠিয়েছে
এবং তোমার নামের আগে ড. পদবি তারাই দিয়ে দিয়েছে।

তুমি লিখেছ তোমার বিষয় পলিমার রসায়ন। আমার কেন
জানি মনে হচ্ছে পলিমার রসায়ন তোমার বিষয় হলেও তুমি লুপ্ত
প্রাচীন ভাষা বিষয়ে আগ্রহী। তা না হলে তুমি আমার চিঠি জবাব
দিতে না। তুমি কি দয়া করে একটি প্রাচীন ভাষা উদ্ধারে আমাকে
সাহায্য করবে? লিপিটির পাঠোদ্ধার করা আমার খুবই প্রয়োজন।

বিনীত
এরিখ স্যামসন
সিনোসিটা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি আমার নাম কেন পাঠিয়েছে ভেবে বের করতে
গিয়ে মনে পড়ল— গত সামান্য লাইব্রেরি থেকে রোসেটা স্টোনের উপর একটি
বই আমি ইস্যু করেছিলাম।

প্রাচীন মিশরীয় হিরোগ্লিফিকের পাঠোদ্ধারে রোসেটা স্টোন বিরাট ভূমিকা
রেখেছিল। ঘটনাটুকী জানার জন্যে বইটি পড়া। বইটি পড়ে আরেকটি বই ইস্যু
করি ‘অশোকের শিলালিপি’। ‘অশোকের শিলালিপি’ অনেক দিন ধরে পাঠোদ্ধার
করা যাচ্ছিল না— এক ইংরেজ সাহেব শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন। এই দুটি
বই পড়ার পর আমি মায়াদের ভাষা পাঠোদ্ধারের চেষ্টাবিষয়ক আরেকটি বই ইস্যু
করি। এই থেকেই কি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানের ধারণা হয়েছে
আমি প্রাচীন ভাষার একজন গবেষক?

আমি যদি প্রাচীন ভাষার গবেষক হইও বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান আমার
অনুমতি ছাড়া আমার নাম-ঠিকানা কাউকে দিতে পারে না। এসব বিষয়ে
আমেরিকায় নিয়মকানুন খুব কঠিন। আমি ঠিক করলাম লাইব্রেরিয়ানকে
ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করব।

জিজ্ঞেস করা হলো না। কারণ, আমি তখন খুবই ব্যস্ত। মানুষ তার এক জীবনে নানান ধরনের ব্যস্ততায় জড়িয়ে যায়। পিএইচ.ডি. থিসিস প্রস্তুতকালীন ব্যস্ততার সঙ্গে অন্য কোনো ব্যস্ততার তুলনা চলে বলে আমি মনে করি না। একটা চ্যাপ্টার লিখে প্রফেসরকে দেখাই, তিনি পুরোটা কেটে দেন। আবার লিখে নিয়ে যাই, আবারও কেটে দেন। আমি ল্যাবরেটরি রেজাল্টের যে ব্যাখ্যা দেই সেগুলি তাঁর পছন্দ হয় না। তিনি যেসব ব্যাখ্যা দেন তা আমার পছন্দ হয় না। চলতে থাকে ধারাবাহিক কাটাকুটি খেলা।

মাঝে মাঝে রাগারাগিও হয়। যেমন, একদিন আমার প্রফেসর বললেন, ‘আহমেদ, তোমাকে তো বেশ বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবেই জানতাম। এখন তোমার থিসিস পড়তে গিয়ে মনে হচ্ছে তোমার আই কিউ এবং মিডিয়াম সাইজের কড মাছের আই কিউ কাছাকাছি। মাছেরটা বরং কিছু বেশি হতে পারে।’

প্রফেসরের এই ধরনের কথাবার্তায় খুবই মন খারাপ হয়। এ্যাপার্টমেন্টে ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করি। ভাত না খেয়ে থালা-বাশন ছুড়ে মারি। থিসিস লেখার সময় পিএইচ.ডি. স্টুডেন্টদের এই আচরণ খুবই স্বাভাবিক। আমেরিকার ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকসের এই বিষয়ে একটি স্ট্যাটিসটিকসও আছে। তারা দেখিয়েছে— বিবাহিত ছাত্রদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার পিএইচ. ডি. করার সময়ে সবচেয়ে বেশি— শতকরা ৫৩। এই ৫৩-এর ভেতর ৯৭% বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে যখন ছাত্ররা তাদের থিসিস লেখা শুরু করে।

প্রতিদিন যে হারে স্ত্রী সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে তাতে মনে হয় আমি ওই স্টেজে দ্রুত চলে এসেছি। একদিন ঝগড়া চরমে উঠল। আমার কন্যার মাতা আমাকে হতভম্ব করে কন্যার হাত ধরে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হলো। সে নাকি নিউইয়র্কের দুটো টিকিট কাটিয়ে রেখেছে। আসছে দু’ মাস সে নিউইয়র্কে তার মামার কাছে থাকবে। আমার থিসিস লেখা শেষ হবার পর ফিরবে। যদি কোনো কারণে থিসিস লেখা শেষ না হয় তা হলে আর ফিরবে না।

আমি রাগ দেখিয়ে বললাম, ‘খুবই ভালো কথা। তোমাদের আরও আগেই যাওয়া উচিত ছিল। হু কেয়ারস? গো টু হেল।’

‘গো টু হেল’ গালিটা তখন নতুন শিখেছি। যখন-তখন ব্যবহার করি এবং অত্যন্ত ভালো লাগে। বাংলা ভাষায় ‘জাহান্নামে যাও’— এর চেয়েও লাগসই মনে হয়।

ব্যাচেলর জীবন হচ্ছে সর্বোত্তম। এই জীবনে আছে মুক্তির আনন্দ— এ ধরনের অতি উচ্চ ভাব নিয়ে প্রথম রাতটা কাটল। দ্বিতীয় রাত আর কাটতে চায় না। আমি সময় কাটাবার জন্যে রাত এগারোটায় এরিথ স্যামসনকে টেলিফোন করলাম।

‘হ্যালো এরিথ।’

‘ইয়েস। মে আই নো, হু ইজ স্পিকিং?’

আমি নাম বললাম। আমার মনে হলো অপর প্রান্তে এরিখ আনন্দের আতিশয্যে শূন্যে লাফ দিল। যেন দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর হারানো বন্ধুকে ফিরে পেয়েছে। উচ্ছ্বাস বাঁধ মানছে না। আমেরিকানদের এ ধরনের উচ্ছ্বাসের সবটাই সাধারণত মেকি হয়ে থাকে। আমার মতো বোকা বিদেশীরা এতে বিভ্রান্ত হয়। যাই হোক আমাদের কথাবার্তা যা হলো তা মোটামুটি এ রকম—

‘আহমেদ তুমি কেমন আছ?’

‘খুবই ভালো আছি। তবে এই মুহূর্তে মনটা একটু খারাপ।’

‘কেন জানতে পারি কী? যদি কোনো অসুবিধা না থাকে।’

‘কোনো অসুবিধা নেই। রাগ করে আমার স্ত্রী নিউইয়র্কে চলে গেছে। যাবার আগে জানিয়েছে দু’ মাসের ভেতর সে ফিরবে না।’

‘তুমি নিশ্চিত থাক দিন তিনেকের ভেতরই তোমার স্ত্রী ফিরে আসবে। মন খারাপের কারণেই তুমি আমাকে টেলিফোন করেছ নাকি অন্য কোনো কারণ আছে?’

‘তোমার প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারের কিছু হয়েছে কি না জানার আগ্রহ হচ্ছে।’

‘এখনো কিছু হয় নি।’

‘চেষ্টা নিশ্চয়ই চালিয়ে যাচ্ছ?’

‘সাক্ষেতিক কোড ভাঙতে পারে এমন একটা সফটওয়্যারের সন্ধান পেয়েছি। দাম ধরাছোঁয়ার বাইরে বলে কিন্তু পারছি না। তবে মনে হয় কিনে ফেলব। তোমার কি ধারণা কেনা উচিত?’

‘তুমি যদি পুরোপুরি নিশ্চিত হও যে সফটওয়্যার তোমার লিপির পাঠোদ্ধার করবে তা হলে কিনে ফেলো। আর যদি সন্দেহ থাকে তা হলে কেনা ঠিক হবে না। কারণ, এই সফটওয়্যারের তখন আর কোনো উপযোগিতা নেই।’

‘আমিও তা-ই ভাবছি। তোমাকে তোমার মূল্যবান মতামতের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।’

এই পর্যন্ত কথাবার্তার পর আমি টেলিফোন রেখে ঘুমাতে গেলাম। তার পাঁচ মিনিটের মাথায় এরিখের টেলিফোন পেলাম।

‘হ্যালো আহমেদ।’

‘হ্যাঁ বলো।’

‘তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি বলে দুঃখিত। কথাটা হচ্ছে আমি সিয়াটলে যাব। ফার্গো সিটি পার হয়ে যেতে হবে। তোমার হাতে যদি অবসর থাকে তা হলে ভাবছি এক রাত থাকব ফার্গো সিটিতে। তোমার সঙ্গে গল্প করা হবে এবং তুমি প্রাচীন লিপিটা ইচ্ছা করলে দেখতেও পারো।’

আমি বললাম, ‘প্রাচীন লিপি দেখার জন্যে আমি ছুটফট করছি।’

কথাটা আমেরিকানদের মতো বললাম। আমেরিকানরা অতিরিক্ত উৎসাহ দেখানোটা ভদ্রতার অংশ বলে মনে করে। কোনো আমেরিকান মা যদি বলে আমার বাচ্চাটা এবারে ভালো খেড পেয়েছে তখন যাকে এই কথাটা বলা হবে তার দায়িত্ব হবে বিকট চিৎকার দিয়ে বলা, ‘ওয়াভারফুল! হোয়াট এ গ্রেট নিউজ!’

সত্যি কথাটা হলো প্রাচীন লিপি বিষয়ে আমার তেমন আগ্রহ নেই। আজ পর্যন্ত এমন কোনো প্রাচীন লিপি পাওয়া যায় নি যেখানে রাজাদের যুদ্ধজয়ের কাহিনী এবং পুরোহিতদের মন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু লেখা। রাজা-বাদশা এবং পুরোহিতদের বিষয়ে আগ্রহী হবার কোনো কারণ থাকার কথা না।

এরিখ স্যামসনের সঙ্গে ফার্গো হোটেলে দেখা হলো। তার গলার স্বর শুনে মনে হয়েছিল যুবক মানুষ। এখন দেখি প্রৌঢ়। আমেরিকান প্রৌঢ়দের বয়স বোঝা মুশকিল, ৫০ থেকে ৭০ হতে পারে। বেশিও হতে পারে।

সে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমেরিকান কায়দায় অনেক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। গিফট র্যাপে মুড়ে সে আমার জন্যে একটা গিফটও নিয়ে এসেছে। আমি সেই গিফট নিলাম। চামড়ায় বাঁধানো ডায়েরি। আমি সেই গিফট হাতে নিয়ে আমেরিকান কায়দায় অনেক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলাম। এ-রকম একটা ডায়েরি আমি অনেকদিন ধরে খুঁজছিলাম। কয়েক বার দোকানে দেখেছি— কিন্তু কেন জানি শেষ পর্যন্ত কেনা হয় নি। এ-ধরনের রুটিন কথাবার্তা বললাম।

আমার অতিথি সেই হিসেবে আমি তাকে রাতে আমার এ্যাপার্টমেন্টে খেতে নিয়ে গেলাম। এবং বললাম— তুমি খাওয়াদাওয়া করো। তারপর আমরা গল্পগুজব করব। সবচেয়ে ভালো হয় রাতে তুমি যদি হোটেলে ফিরে না যাও। আমার এ্যাপার্টমেন্ট পুরো খালি। তুমি রাতে থেকে যাবে। প্রয়োজনে সারারাত আমরা গল্প করতে পারব।

বাঙালিরা হোটেল পছন্দ করে না— তারা যেখানেই যায় বন্ধুবান্ধব খুঁজে বেড়ায়, বন্ধুবান্ধব না পেলে দেশের মানুষ খোঁজে। হোটেল খোঁজে না। আমেরিকানদের স্বভাব উল্টো, তারা প্রথমেই খোঁজে হোটেল। তার পরেও এরিখ স্যামসন আমার ঘরে থাকতে রাজি হয়ে গেল। আমার রাঁধা অখাদ্য ডাল-ভাত এবং ডিম ভাজা তৃপ্তি করে খেল। ডাল খেয়ে বলল, এত চমৎকার স্যুপ সে অনেকদিন খায় নি। তাকে যেন এই স্যুপের রেসিপি দেয়া হয়।

খাওয়া শেষ করে আমরা গল্প করতে গেলাম। কথক এরিখ স্যামসন, আমি শ্রোতা। আমেরিকানরা গল্প ভালো বলতে পারে না। কিন্তু এরিখ দেখলাম ভালোই গল্প করে। সাউথের উচ্চারণে তার ইংরেজি বুঝতে মাঝে মাঝে সমস্যা হচ্ছে। আমাকে প্রায়ই বলতে হচ্ছে— ‘Please say it again.’ তারপরেও

বলতে বাধ্য হচ্ছি— কোনো আমেরিকানের মধ্যে আমি গল্প বলার এমন স্টাইল দেখি নি।

‘আহমেদ, তোমাদের পূর্বদেশীয় ভদ্রতার কথা আমি বইপত্রে পড়েছি। বাস্তবে দেখার সুযোগ আগে হয় নি। আজ দেখলাম। তুমি আমার জন্যে রান্নাবান্না করেছ। হোটেল থেকে আমাকে নিয়ে এসেছ এবং তোমার এ্যাপার্টমেন্টে আমাকে রাতে থাকতে বলছ— আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এ ধরনের আদরে আমরা আমেরিকানরা অভ্যস্ত না। আমার খানিকটা অস্বস্তি অবিশ্যি লাগছে। কিন্তু ভালো লাগছে অনেক বেশি। যাই হোক আমি প্রাচীন লিপিবিসয়ক গল্পটা এখন তোমাকে বলব। এবং মূল লিপিটা তোমাকে দেখাব। এই লিপি বিষয়ে আমার এত আগ্রহ কেন তা গল্পটা শুনলেই তুমি ধরতে পারবে। এই গল্পের প্রায় সবটা জুড়েই আছে আমার স্ত্রী কেরোলিন। কাজেই এখন আমি যা করব তা হলো কেরোলিনের গল্প বলব।’

পৃথিবীর সব দেশেই বন্ধুবান্ধবের কাছে স্ত্রীর গল্প করা অরুচির পর্যায়ে পড়ে। তারপরেও বাধ্য হয়ে আমাকে তার গল্প করতে হচ্ছে।

আমি কেরোলিনকে বিয়ে করি যখন আমার বয়স মাত্র তেইশ। আমেরিকান পুরুষরা দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ বিয়ে করে খুব অল্প বয়সে— আর এক ভাগ বিয়ে করে মধ্যবয়স পার করে। আমি প্রথম দলের।

কেরোলিন ইউনিভার্সিটিতে আমার সঙ্গে পড়ত। আমরা ক্লাসের সব ছেলেমেয়েরা তাকে খুব ভয়ের চোখে দেখতাম। কারণ, সে ছিল ভয়াবহ ধরনের ভালো ছাত্রী। শুধু আমরা ছাত্রছাত্রীরা না, শিক্ষকরাও তাকে খুব সমীহের চোখে দেখতেন। অথচ সে ছিল খুবই বিনয়ী। ক্লাসে এসে শেষের সারির চেয়ারের একটিতে মাথা নিচু করে বসে থাকত। শিক্ষকরা কোনো প্রশ্ন করলে সে কখনো জবাব দেবার জন্যে হাত তুলত না। তাকেও শিক্ষকরা কখনো প্রশ্ন করতেন না, কারণ তাঁরা ধরেই নিয়েছেন, এমন কোনো প্রশ্ন তাকে করা যাবে না যার উত্তর তার জানা নেই।

এ-ধরনের মেয়েদের সঙ্গে আগবাড়িয়ে কেউ কথা বলে না। তাদের সঙ্গে ডেট করা তো অকল্পনীয় ব্যাপার। কেরোলিনের প্রসঙ্গে অনেক রসিকতাও আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যেমন একবার নাকি বাজি ধরে কোনো এক সিনিয়র ছাত্র কেরোলিনকে ডেট-এ নিয়ে গিয়েছিল। চাইনিজ ডিনার। ডিনার শেষে স্পিলবার্গের ছবি। কেরোলিন নাকি পুরো সময়টায় তার ডেটকে শুধু ফিজিক্সের প্রশ্ন করেছে। ডেট একবার শুধু বলেছে— কেরোলিন তোমার চোখ তো খুব সুন্দর। কালো চোখ।

তার উত্তরে কেরোলিন বলেছে— চোখের কালোটা হয় টিনডেল এফেক্টের

জন্যে। তারপরই টিনডেল এফেক্ট এবং টিনডেল ফেনোমেনার ওপর তিন মিনিট বক্তৃতা দিয়েছে।

ডেটের শেষে ছেলেটা বাড়িতে ফিরেছে জ্বর এবং প্রচণ্ড মাথাব্যথা নিয়ে।

কেরোলিনকে আমরা দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। আমেরিকান সোসাইটি অতি স্মার্ট তরুণী পছন্দ করে না। স্মার্ট শব্দটি আমি মেধা অর্থে ব্যবহার করছি।

যাই হোক, একদিন কী হয়েছে বলি। টার্ম পেপার জমা দিতে হবে— আমি পেপার লেখার জন্যে লাইব্রেরিতে গিয়েছি। হঠাৎ দেখি লাইব্রেরির এক কোণায় কেরোলিন মাথা নিচু করে বসে আছে। তার সামনে বেশ কিছু বই। একটা পেপার কাপে কফি। ন্যাপকিনের ওপর একটা স্যান্ডউইচ রাখা। স্যান্ডউইচের পাশে একটা আপেল। তার দুপুরে খাবার। আমি কী মনে করে যেন তার পাশে দাঁড়িয়ে বললাম, ‘হ্যালো কেরোলিন’। সে চমকে উঠে দাঁড়াল। তার হাতের ধাক্কা লেগে কফির কাপ উল্টে গেল। চারদিকে কফি ছড়িয়ে বিশ্রী অবস্থা! আমি বললাম, ‘তোমাকে চমকে দেয়ার জন্যে দুঃখিত। কেরোলিন কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ইটস ওকে। ইটস ওকে।’

আমি বললাম, ‘তুমি বোধহয় আমাকে চিনতে পারছ না। তুমি তো ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ড ছাড়া কোনোদিকে তাকাও না। আমি যেহেতু ব্ল্যাকবোর্ড না, আমাকে চেনার কথাও না।’

কেরোলিন মাথা নিচু করে বলল, ‘আমি তোমাকে চিনি। তোমার নাম এরিখ। তুমি গত কাল একটা বীজ বোজার পরে ক্লাসে এসেছ। তার আগের দিন ইয়েলো স্ট্রাইপের ফুলহাতা শার্ট পরেছ। তার আগের দিন সাদা জাম্পার...’

আমি হতভম্ব হয়ে কেরোলিনের দিকে তাকালাম। নিজের বিস্ময়ের ধাক্কা একটু সামলে নিয়ে বললাম, ‘ক্লাসে কোন ছাত্র কী পরে আসে তা তুমি জানো?’

কেরোলিন নরম গলায় বলল, ‘জানি।’

পেপার কাপ থেকে কফি গড়িয়ে পড়ে টেবিল নষ্ট করছিল। কেরোলিন টেবিলে রাখা বইপত্র সরাতে গিয়ে সব এলোমেলো করে দিল। তার স্যান্ডউইচ এবং আপেল মেঝেতে পড়ে গেল। আমি বললাম, ‘আমি খুবই দুঃখিত, তোমার লাঞ্ছন নষ্ট করে দিয়েছি।’

সে আগের মতো বলল, ‘ইটস ওকে। ইটস ওকে।’

আমি বললাম, ‘যেহেতু তোমার দুপুরের খাবার আমি নষ্ট করেছি, রাতের ডিনারটা কি আমি কিনে দিতে পারি? Can I ask you for a date?’

কেরোলিন চুপ করে রইল। আমি বললাম, ‘তোমার যদি অন্য কোনো পরিকল্পনা না থাকে তাহলে এস রাতে আমরা একসঙ্গে ডিনার করি।’

কেরোলিন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, ‘ঠিক সাতটায় তুমি কান্দি কিচেন রেস্টরায় চলে এসো। কান্দি কিচেন চেন তো— সাউথ বুলেভার।’

কেরোলিন বিড়বিড় করে বলল, ‘আমি চিনি।’

‘তা হলে সন্ধ্যা সাতটায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে।’

আমি লাইব্রেরি থেকে চলে এলাম এবং সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় নিজের ওপর খুব রাগ হতে লাগল। কেন হঠাৎ মাথায় ভূত চাপল? কেন মেয়েটাকে ‘ডেট’-এ নিতে চাচ্ছি? যে মেয়ে তার ক্লাসের ছেলেমেয়েরা কে কবে কোন কাপড় পরছে তা হড়হড় করে বলে দিতে পারে তার কাছ থেকে পাঁচ শ’ হাত দূরে থাকা দরকার। জেনেশুনে আমি এত বড় ভুল কী করে করলাম? এমন তো না যে আমার ডেট পেতে সমস্যা হচ্ছে।

কান্দি কিচেন রেস্টরায় আমি সাতটার সময় উপস্থিত হলাম। কোনো মেয়েকে ডেটে ডেকে যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়া বড় ধরনের অন্যায়। সেই অন্যায় আমি করতে পারি না। আমি ভেবেছিলাম পৌছেই দেখব কেরোলিন রেস্টুরেন্টের বাইরে জবুথবু হয়ে খানিকটা কুঁজো ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টি মেঝের দিকে। মেঝের ডিজাইন জ্যামিতির কোনো সূত্রের সঙ্গে ফেলা যায় কি না তা-ই ভাবছে।

ঘটনা সে রকম হলো না।

আমি কেরোলিনকে দেখে হোঁচটের মতো খেলাম। সে খুবই সেজেগুজে এসেছে। ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক। সুন্দর করে চুল বাঁধা। লাল স্কার্ট এবং সবুজ টপসে তাকে লাগছে ইন্দ্রাণীর মতো। এই মেয়ে যে সাজতে পারে এবং এতটা সেজে রেস্টরায় আসতে পারে আমি তা কল্পনাও করি নি। আমি বললাম, ‘কেরোলিন তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।’

কেরোলিন লজ্জা পেয়ে হাসল।

আমি বললাম, ‘তোমাকে এই পোশাকটায় চমৎকার লাগছে।’

কেরোলিন ফিসফিস করে বলল, ‘থ্যাংক যু।’

ডিনার খেতে খেতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানলাম। যেমন—

১. কেরোলিন বড় হয়েছে ‘হোমে।’ তার বাবা-মা কে সে জানে না।
২. আজ যে পোশাক সে পরে এসেছে ওটা আজই কেনা হয়েছে। স্কার্ট টপস এবং জুতা কিনতে লেগেছে তিন শ’ এগারো ডলার।
৩. আজ সে জীবনের প্রথম ডেটে এসেছে। তাকে কখনো কোনো ছেলে ডেটে আসার জন্যে নিমন্ত্রণ করে নি।
৪. পড়াশোনা করতে তার একেবারেই ভালো লাগে না। কিছু করার নেই বলেই সে পড়াশোনা করে। যদি কিছু করার থাকত তা হলে অবশ্যই পড়াশোনা করত না।
৫. তার সঙ্গে আমার মতো ‘Softly’ কোনো ছেলে এর আগে কথা বলে নি।

আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। ডিনারের মাঝামাঝি এসে আমার মনে হলো, এই মেয়েটি সারাক্ষণ আমার চোখের সামনে না থাকলে আমি বাঁচব না। আমি আমার বাকি জীবন এই মেয়েটির লাজুক মুখের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিতে পারব। আমি পুরোপুরি ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম। পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবতী মেয়েটি যেন আমার সামনে বসে আছে। যেন তাকে আমি শুধু আজ রাতের ডিনারের সময়টুকুর জন্যে পেয়েছি। ডিনার শেষ হলে সে চলে যাবে। আর তাকে পাব না।’

এরিখ দম নেবার জন্যে থামল। আমি বললাম, ‘এ পৃথিবী একবার পায় তাকে, কোনোদিন পায় নাকো আর।’

এরিখ বলল, ‘তার মানে?’

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ‘তোমার অবস্থার কথা ভেবেই হয়তো আমাদের দেশের এক বাঙালি কবি এই লাইনগুলি লিখেছিলেন।’

‘কবির নাম কী?’

‘কবির নাম জীবনানন্দ দাশ।’

‘তুমি অবশ্যই সেই কবিকে আমার এপ্রিসিয়েশন প্রোভে দেবে।’

‘তিনি জীবিত নেই। কবিতার লাইনগুলি তাঁর জন্মেরও প্রযোজ্য হয়ে গেছে। যাই হোক তুমি গল্প শেষ করো। আমার ধারণা সেই রাতেই তুমি মেয়েটিকে প্রপোজ কর।’

‘তোমার ধারণা এক শ’ ভাগ সত্য। আমেরিকান ছেলেরা মাঝেমধ্যে খুব নাটকীয় কায়দায় প্রপোজ করে। যেমন মেয়েটির সামনে হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করে বসে। দু’ হাত মুঠো করে প্রার্থনার ভঙ্গি করে বলে, আমি তোমাকে আমার জীবনসঙ্গিনী হবার জন্যে প্রার্থনা করছি।’

‘তুমি তা-ই করলে?’

‘হ্যাঁ। ডিনার শেষ করেই তা-ই করলাম। কেরোলিনের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। আমাদের চারদিকে লোক জমে গেল। হাততালি পড়তে লাগল। এবং কান্ট্রি কিচেন রেস্টুরাঁর মালিক রবার্ট উঁচুগলায় বলল— এই আনন্দময় ঘটনা স্মরণীয় করে রাখার জন্যে কান্ট্রি কিচেনে উপস্থিত সবাই এক গ্লাস করে ফ্রি রেডওয়াইন পাবে। আনন্দের একটা জোয়ার শুরু হয়ে গেল।’

‘তোমরা পরদিন বিয়ে করলে?’

‘আমেরিকায় হুট করে বিয়ে করা যায় না। বিয়ের লাইসেন্স করতে হয়। সেই লাইসেন্সের জন্যে ডাক্তারি পরীক্ষা লাগে। আমরা ঠিক এক মাস দশ দিনের মাথায় বিয়ে করলাম। বিয়ে মানেই বিরাট ঘটনা। আমার জন্যে তা ছিল অস্তিত্ব ভুলিয়ে দেবার মতো ঘটনা। আমার আনন্দের সীমা রইল না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করত হ্যান্ডমাইক নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ি, সবাইকে বলি— হ্যালো হ্যালো কেরোলিন নামের মেয়েটি আমার। শুধুই আমার। মাঝে মাঝে রাতে ঘড়িতে

এ্যালার্ম দিয়ে রাখতাম। ঘুম ভাঙলে কী করতাম জানো? কেরোলিনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তার ঘুম ভাঙতাম না। শুধুমাত্র তার দিকে তাকিয়ে থাকার জন্যে জেগে থাকতাম। আমার পাগলামির গল্প কেমন লাগছে?’

‘ভালো লাগছে। কেরোলিনকে দেখতে ইচ্ছা করছে।’

‘আমার কাছে তার ছবি আছে। গল্পটা শেষ হোক তোমাকে দেখাব।’

‘থ্যাংক য়ু।’

‘আমার পাগলামি দেখে কেরোলিন খুব হাসলেও সে নিজেও কিন্তু কম পাগলামি করে নি। যেমন ধরো সে ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিল। তার মতো ছাত্রী পড়াশোনা ছাড়তে পারে এটা ভাবাই যায় না। তার যুক্তি হচ্ছে পড়াশোনা চালিয়ে গেলে সে আমার দিকে নজর দিতে পারবে না। এটা তার পক্ষে সম্ভব না। তার কাছে আমি ছাড়া পৃথিবীর সবকিছুই গুরুত্বহীন। তার বিষয়ে খুব মজার ব্যাপার আছে। সেটা বলছি। প্লিজ হাসতে পারবে না।’

‘তুমি নিশ্চিত থাকো আমি হাসব না।’

‘ও ঘুমাত খুব অদ্ভুত ভঙ্গিতে। সে তার পা দিয়ে আমার পা পেঁচিয়ে একটা গিটুর মতো করে ফেলত। হা-হা-হা।’

‘মজার তো।’

‘আমি তার নাম দিয়েছিলাম Princess knot’

‘বাংলা ভাষায় এটা হবে “গিটু কুমারী” তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে— তোমরা আমেরিকার সবচেয়ে সুখী দম্পতি।’

‘শুধু আমেরিকায় বলছ কেন? আমরা ছিলাম এই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী স্বামী-স্ত্রী।’

‘ছিলাম মানে? কেরোলিন কোথায়?’

‘বিয়ের দু’ বছরের মাথায় সে মারা যায়।’

‘আই অ্যাম সন্নি।’

‘বিয়ের এক বছর আট মাসের দিন তার ক্যান্সার ধরা পড়ে। খারাপ ধরনের স্নায়ুতন্ত্রের ক্যান্সার। কী কষ্ট যে সে করেছে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না! শেষের দিকে এমন হলো আমি চার্চ গিয়ে বলতে বাধ্য হলাম, “হে ঈশ্বর তুমি কেরোলিনের প্রতি করুণা করো। যেখানে থেকে সে এই পৃথিবীতে এসেছে তাকে সেখানে নিয়ে যাও। রোগযন্ত্রণা থেকে তাকে মুক্তি দাও।” রোগটা তার মস্তিষ্কে ছড়িয়ে গেল। সে কাউকে চিনতে পারত না। আমাকেও না। তার কাছে গিয়ে কেরোলিন কেরোলিন বলে ডাকলে সে শুধু চোখ তুলে তাকাত, সেই দৃষ্টিতে পরিচয়ের আভাস মাত্র থাকত না।”

এরিখ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, ‘আহমেদ আমার গল্প শেষ হয়েছে। এখন ভালো করে কফি বানাও। কফি খেয়ে শুয়ে পড়ব। ঘুম পাচ্ছে।’

আমি বললাম, ‘লুপ্ত প্রাচীন লিপির ব্যাপারটা কিন্তু এখনো আসে নি।’

এরিখ বলল, ‘যে লিপির কথা বলছি ওটা কেরোলিনের লেখা। মৃত্যুর দু’দিন আগে ইশারায় জানালো সে কিছু লিখতে চায়। আমি তাকে কাগজ-কলম দিলাম। সে সারা দিন শুয়ে শুয়ে লিখল। সন্ধ্যাবেলা লেখা শেষ হলো। আমাকে লেখা কাগজটা দিয়ে কোথায় চলে গেল। তার দু’দিন পর তার মৃত্যু হয়।’

‘সাক্ষেতিক ভাষায় লেখা কোনো চিঠি?’

‘হ্যাঁ।’

‘সাক্ষেতিক ভাষায় লেখার দরকার পড়ল কেন?’

‘আহমেদ সে-ই তো আমি বলতে পারব না। ক্যান্সারের আক্রমণে তার মস্তিষ্ক এ্যাফেকটেড হয়েছিল, তার কারণে হতে পারে। কিংবা অন্য কিছুও হতে পারে। লিপির পাঠোদ্ধার করা গেলেই ব্যাপারটা জানা যাবে। কিংবা এমনও হতে পারে যে, এটা আসলে কোনো লিপিটিপি নয়। কাগজে আঁকাবুকি কাটা। কেরোলিন আমাকে দিয়ে গেছে যেন এই লেখার রহস্য উদ্ধার করতে গিয়ে আমার জীবন কেটে যায়। আমি তাকে হারানোর কষ্ট ভুলে থাকতে পারি। কেরোলিন মারা গেছে একুশ বছর আগে। এই একুশ বছর ধরে আমি চিঠিটার রহস্য উদ্ধার করার চেষ্টা করছি। মানুষ ক্লান্ত হয়, আমি ক্লান্ত হই না। কেন ক্লান্ত হই না বলো তো?’

‘বলতে পারছি না।’

‘ক্লান্ত হই না। কারণ, আমার মনে হয় কেরোলিন একটু দূরে দাঁড়িয়ে লাজুক ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখছে আমি তার রহস্য ভাঙ্গার চেষ্টা করছি কি না। হাসি ছেড়ে দিচ্ছি কি না।’

‘তুমি আর বিয়ে করো নি?’

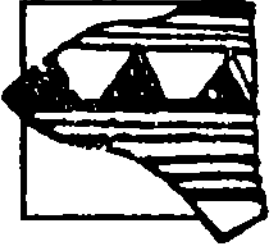
‘না, বিয়ে করি নি।’

আমি বললাম, ‘যদি কখনো তুমি এই সাক্ষেতিক লিপির অর্থ বের করতে পারো তা হলে কি আমাকে জানাবে? কী লেখা আছে আমি জানতে চাচ্ছি না আমি শুধু জানতে চাই তোমার সাধনা সফল হয়েছে। তুমি সন্ধেতের অর্থ ধরতে পেরেছ।’

এরিখ বলল, ‘আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তুমি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকো আমি যদি পাঠোদ্ধার করতে পারি তুমি তা জানবে।’

পিএইচ. ডি. ডিগ্রি নিয়ে আমি দেশে ফিরি ১৯৮৪ সালে। দশ বছর একনাগাড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করি। লেখালেখির ব্যস্ততা খুব বেড়ে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করি। ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। ইউনিভার্সিটির ঠিকানায় চিঠিপত্র জমা হয়— আমি আনতে যাই না। গত ফেব্রুয়ারি মাসে পেনশনসংক্রান্ত জটিলতার জন্যে ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছি। দেখি কয়েক বছরের চার-পাঁচ শ’ চিঠি। বিদেশ থেকে আসা চিঠিগুলি

আলাদা করে বাসায় নিয়ে এলাম। একটি চিঠি এসেছে এরিখ স্যামসনের আইনজীবীর কাছ থেকে। আইনজীবী জানাচ্ছেন— তাঁর ক্লায়েন্ট এরিখ স্যামসন নিউমোনিয়ায় মারা গেছেন। ক্লায়েন্টের নির্দেশমতো আমাকে জানাচ্ছেন যে, এরিখ স্যামসন মৃত্যুশয্যায় লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন।



মৃত্যুগন্ধ

‘বলুন আপনার সমস্যা কী? বলুন।’

সমস্যা বলতে গিয়েও বাসেত থমকে গেল। ডাক্তার সাহেব তার সমস্যা আদৌ শুনবেন কি না বোঝা যাচ্ছে না। তিনি টেলিফোন রিসিভার কানে দিয়ে আছেন। এক হাতে রিসিভার ধরা। অন্য হাতে নাম্বার ডায়াল করছেন। তাঁর দৃষ্টিও বাসেতের দিকে না। তিনি তাকিয়ে আছেন মেঝের দিকে। মেঝেতে কেউ মনে হয় কফি বা চা ফেলেছে। ডাক্তার সাহেবের অ্যাসিস্ট্যান্ট ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে। পরিষ্কার প্রক্রিয়া ডাক্তার সাহেবের পছন্দ হচ্ছে না। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, ‘তুমি দেখি সারা ঘর মাখাচ্ছ। কী বললাম? একটা ভিজা টাওয়েল নিয়ে আস। ব্রেনটা একটু ব্যবহার করো। ব্যবহার না করতে না করতে ব্রেনে তো জংকার পড়ে যাবে।’

এমন ঝামেলার মধ্যে ডাক্তার সাহেব রোগীর কথা শুনবেন কী করে বাসেত বুঝতে পারছে না। বরং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করাই ভালো। ডাক্তার সাহেবের টেলিফোন করা শেষ হোক। মেঝে পরিষ্কার হোক। খুব বেশি সময় অপেক্ষা করা যাবে বলেও মনে হয় না। বাইরে অনেক রোগী।

‘কী হলো চুপ করে আছেন কেন? What is your problem?’

বাসেত তার প্রোবলেমের কথা বলার জন্যে মাথা খানিকটা ঝুঁকিয়ে এনে আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেল। কারণ, ডাক্তার সাহেব টেলিফোনের কানেকশন পেয়ে গেছেন। খুবই আনন্দিত গলায় কথা বলছেন।

‘মোবাইলের কানেকশন পাওয়া কী যে যন্ত্রণা! নাম্বার টিপতে টিপতে আমার তো আঙ্গুল ব্যথা হয়ে গেল। তার ওপর একগাদা নাম্বার। মনে রাখা এক সমস্যা। ভাগ্যিস তোমারটা মুখস্থ করে ফেলেছি। না না আমার দেরি হবে না। রোগী বেশি নেই। চার-পাঁচ জনের বেশি হবে না। আধঘণ্টার মধ্যে আমি পৌঁছে

যাব। এর সঙ্গে এক্সট্রা দশ মিনিট অ্যাড করে রাখো, রাস্তার জ্যামের জন্যে। ঠিক আছে? এখন আর রাগ নেই তো? হা-হা-হা। এখনো রাগ? ঘড়িতে সময় দেখে রাখো। এক ঘণ্টা পর আর কোনো রাগ থাকবে না। রাগের সামনে “অনু” যুক্ত হয়ে অনুরাগ হয়ে যাবে।’

বাসেত তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে, তবে কথাবার্তা কিছুই “মিস” করছে না। ডাক্তার সাহেবকে মোটামুটি রসিক মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে যে কথা বলছে সে কি কোনো মহিলা? একজন পুরুষ যখন অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বলে তখন তার গলার স্বর এক রকম থাকে, আবার সে যখন কোনো মহিলার সঙ্গে কথা বলে তখন গলার স্বর সামান্য হলেও তরল হয়। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম।

‘এখন বলুন আপনার সমস্যা কী?’

ডাক্তার সাহেব টেলিফোন নামিয়ে বাসেতের দিকে তাকালেন। এই ফাঁকে চট করে ঘড়ি দেখে নিলেন। তারপর তাকালেন মেঝের দিকে। ঘরের মেঝে পরিষ্কার হয়েছে, তবে ডাক্তার সাহেবের মনে হয় পছন্দ হয়নি। কারণ, ডাক্তার সাহেবের ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্টকে আরেকবার ধমক দিলেন— ‘তোমাকে কী বললাম? ভিজা টাওয়েল দিয়ে মুছ! খবরের কাগজ দিয়ে কী ঘষাঘষি করছ! যত idiotic কাজকর্ম দেখতে যেমন ছাগলের মতো, কাজকর্মও ছাগলের মতো।’

ডাক্তার সাহেবের অ্যাসিস্ট্যান্টকে বাসেতের কাছে সুপুরুষ বলে মনে হচ্ছে। ছাগলের সঙ্গে তার কোনোরকম মিল নেই। বাসেতের মনে হলো এই ডাক্তার সাহেবের কাছে আসা ঠিক হয়নি। বাসেত যে সমস্যা নিয়ে এসেছে তার জন্যে সময় দরকার। মনে হচ্ছে ডাক্তার সাহেবের সে সময় নেই। তা ছাড়া তিনি বিরক্তও হয়ে আছেন। রাগারাগি করছেন। বাসেত ধমক খাবে না তো? না বোধহয়। রোগী হচ্ছে ডাক্তারের লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকে কেউ ধমক দেয় না।

‘আপনার নাম?’

‘স্যার আমার নাম বাসেত। আবদুল বাসেত।’

‘আপনার সমস্যা কী?’

‘গন্ধবিষয়ক একটা সমস্যা স্যার। স্মেলসেন্স নিয়ে...।’

বাসেত অবাক হয়ে লক্ষ করল ডাক্তার সাহেব তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই যন্ত্রপাতি নিয়ে তার কাছে এগিয়ে এলেন। হা করতে বললেন। বাসেত হা করল। তিনি টনসিল দেখলেন। টর্চলাইট দিয়ে বাসেতের কানের ফুটা দেখলেন। টাং ডিপ্রেসর নিয়ে জিভ চাপাচাপি করলেন।

সমস্যাটা বাসেতের নাকে। কিন্তু দেখা হচ্ছে গলা-কান। ও আচ্ছা, এবার নাকও দেখা হলো। নাক-কান-গলার ডাক্তার যখন, তখন তিনটিই দেখা হবে। সমস্যা না জেনেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এটাও এক আশ্চর্য ব্যাপার। মনে হয়

রুটিন পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হবার পর সমস্যা জানতে চাইবেন। কিংবা কে জানে সমস্যা হয়তো জানতেও চাইবেন না। খসখস করে কাগজে প্রেসক্রিপশন লিখবেন। কোনো একটা নোজ ড্রপ আর তিন-চার রকমের ভিটামিন। মামলা ডিসমিস। আসামি খালাস। ভিজিট বাবদ চার শ' টাকা চলে গেল ডাক্তার সাহেবের এ্যাকাউন্টে। ভিটামিন বিক্রি করে দু'টা পয়সা আয় হলো ভিটামিন কোম্পানির।

‘গন্ধবিষয়ক সমস্যার কথা বলছিলেন। গন্ধবিষয়ক কী সমস্যা? গন্ধ পান না— এনোরোমিয়া?’

‘স্যার গন্ধ পাই। যতটা পাওয়ার কথা তারচেয়ে বেশি পাই। এটাই সমস্যা।’

‘পরিষ্কার করে বলুন। গন্ধ যতটা পাওয়ার কথা তারচেয়ে বেশি পাচ্ছেন বলতে কী বুঝাচ্ছেন? সেন্ট বা আফটার শেভ লোশনের গন্ধে মাথা ধরে যায়?’

‘জি না স্যার। আমি এমন সব গন্ধ পাই যা অন্য কেউ পায় না।’

‘উদাহরণ দিন।’

বাসেত কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, ‘স্যার আমি মৃত্যুর গন্ধ পাই।’

বাসেত মোটামুটি নিশ্চিত ছিল তার কথা শোনার পর ডাক্তার সাহেব খুবই অবাক হবেন। অবাক হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। ডাক্তার সাহেবের দীর্ঘ ডাক্তারি জীবনে নিশ্চয়ই কোনো রোগী এসে বলে নি— সে মৃত্যুর গন্ধ পায়। কিন্তু ডাক্তার সাহেবের আচরণ স্বাভাবিক। তিনি টাওয়েল দিয়ে হাত মুছতে মুছতে সহজ গলায় বললেন, ‘মৃত্যুর গন্ধ পান?’

‘জি। মৃত্যুর আগে মানুষের গা থেকে অদ্ভুত ধরনের গন্ধ বের হয়, সেই গন্ধটা কেউ পায় না, আমি পাই।’

ডাক্তার সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, ‘মৃত্যু তো চা বা কফি না যে তার আলাদা গন্ধ আছে।’

‘স্যার আমি জানি মৃত্যু চা না, কফিও না; কিন্তু মৃত্যুর গন্ধ আমি পাই।’

ডাক্তার সাহেবের চোখ সরু হয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি হয়তো বাসেতকে কঠিন ধমক দিতেন। তা দিতে পারলেন না। কারণ, তাঁর কাছে টেলিফোন এসেছে। মনে হচ্ছে ডাক্তার সাহেবের বাসা থেকে তাঁর মেয়ে টেলিফোন করেছে।

‘মাগো রাত দশটার আগে তো ফিরতে পারব না। তুমি যদি কষ্ট করে দশটা পর্যন্ত জেগে থাক তা হলে আমি চলে আসব। তখন দু'জনে মিলে লেজার ডিস্কে ছবি দেখতে পারব। তবে মা ফর গডস সেক ভূত-প্রেতের ছবি না। লাইট কোনো ভালো ছবি বের করো। কমেডি ধরনের। মিস্টার বিন টাইপ। মা এখন রাখি— আমার সামনে রোগী বসে আছে। সায়েন্স ফিকশন দেখতে চাও? আচ্ছা বেশ সায়েন্স ফিকশন দেখব। তবে সায়েন্স ফিকশানও তো সেই ভূত-প্রেতেরই

কারবার। বিকট সব এলিয়েনদের সঙ্গে যুদ্ধ। মা শোনো, এখন রাখি?’

ডাক্তার সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রেখে বাসেতের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনি তা হলে মৃত্যুর গন্ধ পান?’

‘জি স্যার।’

‘মানুষ গন্ধ কীভাবে পায় সেই প্রক্রিয়াটি কি জানেন?’

‘জি না।’

‘মনে করুন আপনার হাতে আছে বেলি ফুল। সেই বেলি ফুলের বিশেষ কিছু অণু বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তার কয়েকটা আপনার নাকে ঢুকে গেল। নাকের একটি বিশেষ জায়গায় অণুগুলো দ্রবীভূত হয়ে সেখান থেকে নার্ভের মাধ্যমে চলে যাবে ব্রেনে। সিগন্যালটা ইলেকট্রিক্যাল। তখনই আপনি গন্ধ পাবেন। বুঝতে পারছেন?’

‘জি স্যার।’

‘মৃত্যুর এমন কোনো অণু নেই যে সেই অণু নাকের ভিতর দিয়ে আপনার মস্তিষ্কে যাবে। বুঝতে পারছেন?’

‘পারছি স্যার।’

‘দীর্ঘদিন রোগে ভুগছে এমন মানুষের গায়ে বিশেষ কোনো গন্ধ হতে পারে। বেড সোর হলে, পিঠের চামড়ায় পচন ধরে—তার গন্ধ আছে, ওষুধের গন্ধ আছে। গায়ের ঘামের গন্ধ আছে। সব মিলিয়ে বিকট গন্ধ তৈরি হতে পারে। সেই গন্ধকে মৃত্যুগন্ধ ভেবে ভুল করা যায়। আমি কী বলছি আপনি কি ফলো করছেন?’

‘জি করছি।’

‘একজন মানুষ যে হার্ট করে হার্ট অ্যাটাক করে মারা যাবে তার গায়ে গন্ধ হবে না। কিংবা যে মানুষটি রোড অ্যাকসিডেন্টে দশ তারিখ মারা যাবে—ন’ তারিখ তার শরীরে আপনি মৃত্যুগন্ধ পাবেন না।’

‘স্যার আমি পাই।’

‘আপনি পান?’

‘জি। আমার স্ত্রীর মানসিক কিছু সমস্যা ছিল। সে আত্মহত্যা করে। তার বাবার বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা যায়। সে যেদিন বাবার বাড়ি যায় সেদিনই তার গায়ে আমি মৃত্যুর কড়া গন্ধ পেয়েছিলাম।’

‘মৃত্যুর গন্ধ পেয়েও আপনি চুপ করেছিলেন? কোনো ব্যবস্থা নেন নি?’

‘স্যার এই অদ্ভুত গন্ধটা যে মৃত্যুর তা বুঝতে পারি নি। সে-ই প্রথম আমার মৃত্যুর গন্ধ পাওয়া।’

‘গন্ধটা কেমন?’

‘পরিচিত কোনো গন্ধের সঙ্গে এর মিল নেই। আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না।’

ডাক্তার সাহেব ঘড়ি দেখলেন। হাতের ঘড়ি দেখলেন। দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িও দেখলেন। তারপর তাঁর সামনে বসা রোগীর দিকে তাকালেন। তিনি মানুষের নাকের, কানের ফুটোর দিকেই আগ্রহ নিয়ে তাকান। মানুষের মুখের দিকে তেমনভাবে তাকানো হয় না।

সামনে যে বসে আছে তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ভদ্র চেহারা। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ। মানুষটাকে মানসিকভাবে অসুস্থ বলেও মনে হচ্ছে না। অসুস্থ মানুষের চোখের মণি অস্থির ভঙ্গিতে নড়াচড়া করে। এই লোকের তা করছে না। ডাক্তার সাহেব ছোট নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘আপনার নাম যেন কী বলেছিলেন?’

‘বাসেত। আবদুল বাসেত।’

‘বাসেত সাহেব শুনুন। আপনার সমস্যাটা সম্পূর্ণই মানসিক। আপনি মৃত্যুর কোনো গন্ধ পাচ্ছেন না। আপনি ভাবছেন পাচ্ছেন। আমার ধারণা, আপনার স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে আপনি মানসিক ধাক্কা খান। সেই থেকেই এই রোগের উৎপত্তি। আপনার উচিত ভালো কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা। আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব না।’

বাসেত চুপ করে রইল। ডাক্তার সাহেব বললেন, ‘আপনি ভিজিট হিসেবে যে চার শ’ টাকা দিয়েছেন সেই টাকাটা ফেরত দিয়ে যান। আমি বলে দিচ্ছি। ডাক্তার সাহেব বেল টিপলেন। তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট ভীতমুখে ঢুকল।’

‘সুলেমান! তুমি ইনাকে ভিজিটের চার শ’ টাকা ফেরত দাও।’

‘জি আচ্ছা।’

‘রোগী আর কত জন আছে?’

‘ছয় জন।’

‘আজ আর রোগী দেখব না।’

সুলেমান আগের চেয়েও ভীত গলায় বলল, ‘খুব হাউকাউ হবে স্যার। এরা তিন-চার ঘণ্টা ধরে বসে আছে।’

ডাক্তার সাহেব বললেন, ‘থাকুক বসে। আমিও তো একটা মানুষ। নাকি তোমার ধারণা আমি মানুষ না। আমি জিন। ভ্যাবদার মতো সামনে দাঁড়িয়ে থেকো না। বিদায় হও।’

সুলেমান দ্রুত ঘর থেকে বের হতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা খেল। ডাক্তার সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, ‘ইডিয়ট। এক শ’ পার্সেন্ট ইম্পোর্ট কোয়ালিটি ইডিয়ট। দরজা এক দিকে, যাচ্ছে আরেক দিকে। তিনি তাঁর বিরক্ত মুখ মুহূর্তের মধ্যে স্বাভাবিক করে বাসেতের দিকে তাকিয়ে বললেন— আমি কি সাইকিয়াট্রিস্টের টেলিফোন নাম্বার দিয়ে দেব?’

ডাক্তার সাহেব তাঁর ডায়েরি খুললেন। একটা দুটো টেলিফোন নাম্বার দিলে দায়িত্ব শেষ হয়।

বাসেত বলল, ‘দরকার নেই।’

‘দরকার নেই কেন?’

বাসেত বলল, ‘আমার ব্যাপারটা যে মানসিক না সেটা আমি খুব ভালো করে জানি।’

ডাক্তার সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, ‘সব মানসিক রোগীরই ধারণা তার রোগটা মানসিক না।’

‘আমি নিজে-নিজে অনেক পরীক্ষাও করেছি। আমার চেহারা বা কথাবার্তা বোকা মানুষের মতো হলেও আমি বোকা না। আমি মৃত্যুগন্ধ নিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষাও করেছি।’

‘কী রকম পরীক্ষা?’

‘ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে আমার এক ভাগ্নি আছে। ডাক্তার। তাকে দেখতে যাওয়ার অজুহাতে আমি ওয়ার্ডগুলোতে ঘুরতাম। যেসব রোগীর শরীর থেকে মৃত্যুগন্ধ আসত তাদের খোঁজ রাখতাম। এমন কখনো হয়নি যে আমি মৃত্যুগন্ধ পেয়েছি অথচ রোগী বেঁচে গেছে।’

ডাক্তার সাহেব চলে যাবার প্রস্তুতি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বাসেতকে শেষকথা বলছেন এই ভঙ্গিতে বললেন, ‘বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এভাবে হয় না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্যে স্ট্যাটিসটিক্যাল মডেল তৈরি করতে হয়। র‍্যানডম স্যাম্পলিং আছে, ব্লাইন্ড টেস্ট আছে। হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘোরাঘুরি কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা না।’

বাসেত ছোট নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার এই ব্যাপারগুলো আমি জানি। স্ট্যাটিসটিক্যাল মডেলের ব্যাপারটা আমার অজানা না।’

ডাক্তার সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘আপনি কী করেন জানতে পারি?’

‘হ্যাঁ পারেন। আমি শিক্ষকতা করি। আমার বিষয় পদার্থবিদ্যা। আমি একটি প্রাইভেট কলেজে পড়াই।’

ডাক্তার সাহেব ঘড়ি দেখলেন। আগে যেভাবে দেখছেন— প্রথমে নিজের রিস্টওয়াচ, তারপর দেওয়ালঘড়ি। সময় দেখার পরপর কপালের ভুরু সামান্য কুঁচকানো। ডাক্তার সাহেব হাতে ব্যাগ নিলেন। তারপর সেই ব্যাগ ধপ করে নামিয়ে রেখে চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, ‘আপনার নাম বাসেত। আবদুল বাসেত।’

‘জি।’

‘আপনি যে ক্ষমতার কথা বলছেন সেই ক্ষমতা যদি সত্যি থেকে থাকে তা হলে ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়। আমি প্রধানমন্ত্রী হলে আপনাকে আপনার ক্ষমতার জন্যে একটা পার্মানেন্ট চাকরি দিতাম।’

‘কী চাকরি?’

‘গন্ধ শোকার চাকরি। রোজ সকালবেলা আপনি আমার গন্ধ শূঁকে বলে দিতেন আমার শরীরে মৃত্যুগন্ধ আছে কি না। দেশের প্রধানরাই তো অপঘাতে

মৃত্যুর আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি করেন।’

বাসেত কিছু বলল না। ডাক্তার সাহেব বললেন, ‘রসিকতা করলাম কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে রসিকতা করা যায় তো? নাকি রসিকতার মধ্যেও আপনি মৃত্যুগন্ধ পান। হা-হা-হা। সরি! আপনি রাগ করছেন না তো?’

‘জি না।’

ডাক্তার সাহেব বাসেতের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, ‘আমার গা শূঁকে দেখুন তো। আমার গা থেকে মৃত্যুগন্ধ বের হচ্ছে নাকি?’

বাসেত বলল, ‘জি না বের হচ্ছে না।’

‘এই প্রশ্নটাও নিতান্তই রসিকতা করে করলাম। ব্যাপারটা কী রকম আপনাকে বলি। ধরুন একজনকে পাওয়া গেল যে খুব ভালো হাত দেখতে পারে। হাত দেখায় আপনি যদি সামান্যতম বিশ্বাসও না থাকে তারপরেও আপনি কিন্তু তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবেন— ভাই হাতটা একটু দেখে দিন। আমার হচ্ছে সেই অবস্থা।’

‘স্যার আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে। কেউ বোধহয় আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। টেলিফোনে আপনি কথা বলছিলেন তার থেকে অনুমান করে বললাম।’

‘ঠিকই বলেছেন। আসলেই দেরি হয়ে গেছে। তবে আপনার সঙ্গে কথা বলে মজা পেয়েছি। দিনের পর দিন রোগী দেখি— কেউ কানে শোনে না, কেউ নাকে গন্ধ পায় না; এই প্রথম একজন পেলাম যে মৃত্যুগন্ধ পায়। ভাই শুনুন, আপনি কি কাল আসতে পারবেন?’

‘যদি আসতে বলেন আসব।’

‘আসতে বলছি। জাম্প গল্প করার জন্যে। কফি খেতে খেতে মিনিট দশেক গল্প করলাম। কোনো অসুবিধা আছে?’

‘জি না অসুবিধা নেই।’

‘ভেরি গুড। তা হলে কাল চলে আসুন, জম্পেশ আড্ডা দেব। আজই আড্ডা দিতাম। আপনার সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগছে। কেন ভালো লাগছে বুঝতে পারছি না। আমি আবার ‘আড্ডা টাইপ’ না। সিরিয়াস টাইপ। আজ ইচ্ছা থাকলেও গল্প করতে পারছি না। একটা পার্টিতে যেতে হবে। সেখান থেকে বাসায় ফিরতে হবে। আমার মেয়ে আবার একা একা ভিডিও ছবি দেখতে পারে না। সে যখন সিনেমা দেখে আমাকে পাশে থাকতে হয়। আজ সে ভিডিওর দোকান থেকে একগাদা ছবি নিয়ে এসেছে। ছবি দেখে সে যখন ভয় পায় তখন আমাকেও ভয় পেতে হয়। ছবি দেখে তার যখন হাসি পায় তখন আমাকেও হাসতে হয়। আমি বোধহয় হঠাৎ অনেক বেশি কথা বলছি। আমি কথা খুব কম বলি। আজ এত কথা বলছি কেন কে জানে। আচ্ছা বাসেত সাহেব আমি তাহলে উঠি?’

‘জি স্যার ।’

‘আপনি অবশ্যই সুলেমানের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাবেন ।’

‘জি নিয়ে যাব ।’

‘সুলেমান আবার খুবই হারামজাদা টাইপ । না চাইলে দেবে না । আচ্ছা আপনাকে চাইতে হবে না । আমি বলে দিচ্ছি, আসুন আমার সঙ্গে । কাল কিন্তু মনে করে চলে আসবেন । আমি অপেক্ষা করে থাকব ।’

ডাক্তার সাহেব আবার ঘড়ি দেখলেন । ঘড়ি দেখার সেই পুরনো কায়দা— প্রথমে রিস্টওয়াচ দেখা তারপর ভুরু কুঁচকে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকানো ।

‘বাসেত সাহেব!’

‘জি স্যার ।’

‘দেরি যখন হয়েই গেছে পাঁচ মিনিটে তেমন ক্ষতি হবে না । কফি এক কাপ খাওয়া যাক । কী বলেন? কফি বানাতে বলি?’

‘জি বলুন ।’

‘নাকি চা খাবেন? যারা টি ড্রিংকার তারা আবার কফি পছন্দ করে না । কফি কি আপনার পছন্দের ড্রিংক?’

‘জি পছন্দের ।’

‘কোন গন্ধটা আপনার ভালো লাগে? কফির গন্ধ না চায়ের গন্ধ? আপনি তো গন্ধ বিশেষজ্ঞ এইজন্যে আপনাকে জিজ্ঞেস করা । হা-হা-হা ।’

ডাক্তার সাহেব হাসছেন । বাসেতের কাছে হাসিটা সামান্য অস্বাভাবিক লাগল । তবে হাসি স্থায়ী হলো না । সুলেমানকে ডেকে কফির কথা বললেন । গলার টাইয়ের নট আলপা করে দিলেন । এতক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত মনে হচ্ছিল না । এখন মনে হলো । তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি শুধু যে ক্লান্ত— তা না, তাঁর খুব ঘুমও পাচ্ছে । অনেক কষ্ট চোখ মেলে আছেন ।

‘বাসেত সাহেব!’

‘জি ।’

‘আপনি কি শুধু মানুষের গা থেকেই মৃত্যুর গন্ধ পান, না পশুপাখির গা থেকেও পান? মুরগির গা থেকে মৃত্যুর গন্ধ পান?’

‘জি না । আমি অবিশ্যি পশুপাখির মৃত্যুগন্ধ নিয়ে চিন্তাও করি নি ।’

‘নেক্সট টাইম করবেন । ছোটখাটো একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও করতে পারেন । বাজার থেকে একটা লাল মোরগ কিনবেন আর একটা সাদা মোরগ কিনবেন । তারপর মনে মনে ঠিক করবেন— দুপুরে খাবার জন্যে সাদা মোরগটা জবেহ করা হবে । যেই সাদা মোরগের গা থেকে মৃত্যুগন্ধ বের হতে থাকবে অমনি ঠিক করবেন— না সাদা মোরগ না, লাল মোরগ জবেহ করা হবে । তখন

দেখবেন মৃত্যুগন্ধ সাদা মোরগের গা থেকে শিফট করে লাল মোরগে যায় কি না। কী বলছি বুঝতে পারছেন তো?’

‘পারছি।’

‘আপনার কাছে কি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার এই কনসেপ্টটা ফানি লাগছে?’

‘না লাগছে না।’

‘আমার কাছেও লাগছে না। আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটা ইন্টারেস্টিং এক্সপেরিমেন্ট হবে। তবে ভাই আপনি কিছু মনে করবেন না। মৃত্যুগন্ধবিষয়ক ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই হাস্যকর মনে হচ্ছে।’

‘আমি কিছু মনে করছি না।’

‘তবে হাস্যকর লাগুক বা না লাগুক— আপনার সঙ্গে কথা বলে আরাম পেয়েছি। আগামী কাল অবশ্যই রাত নটার পর চলে আসবেন। রোগী যা দেখার ন’টার মধ্যে দেখে ফেলব। ঠিক আছে?’

বাসেত কিছু বলল না। তার মন অসম্ভব খারাপ হয়েছে। কারণ, কাল এই লোকটির সঙ্গে দেখা হবে না। লোকটির গা থেকে তীব্র মৃত্যুগন্ধ বের হচ্ছে। লোকটিকে এই কথা বলাও যাবে না। বলে কী হবে?

ডাক্তার সাহেব বললেন, ‘বাসেত সাহেব সিগারেট খাবেন?’

বাসেত বলল, ‘জি স্যার খাব।’

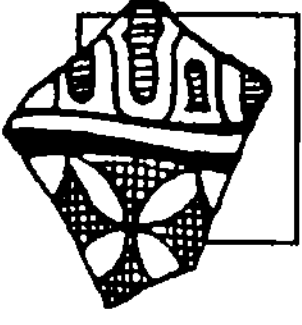
‘আমি চেন স্মোকার, শুধু যখন রোগী দেখি তখন সিগারেট খাই না। রোগীদের সামনে সিগারেট খাওয়া ঠিক না। উপদেশ দেব সিগারেট না খেতে অথচ নিজে খাব তা তো হয় না।’

বাসেত সিগারেট ধরতে ধরতে বলল, ‘স্যার একটা কথা বলি— আজ পার্টিতে না গেলে কেমন হয়?’

ডাক্তার সাহেব তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল।

বাসেত নিচু গলায় বলল, ‘আজ বরং আপনার মেয়ের সঙ্গে সিনেমা দেখুন। বেচারি অপেক্ষা করে আছে।’

ডাক্তার সাহেব তার দিকে তাকিয়ে আছেন। বাসেতও তাকিয়ে আছে। কেউ কারও চোখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে না।



সম্পর্ক

মোবারক হোসেন ভাত খেতে বসে তরকারির বাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা কী?' তাঁর গলার স্বরে দূরবর্তী ঝড়ের আভাস। মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু হয়ে যাবে।

মনোয়ারা দূরবর্তী ঝড়ের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'কী হয়েছে?'

'এটা কীসের তরকারি?'

'কৈ মাছের ঝোল।'

'কৈ মাছের ঝোলে তরকারি কী?'

'চোখে দেখতে পাচ্ছ না কী দিয়েছি! ফুলকপি, শিম।'

'তোমাকে কতবার বলেছি— ফুলকপির সঙ্গে শিম দেবে না। ফুলকপির এক স্বাদ, শিমের আলাদা স্বাদ। আমার তো দু'টা জিভ না যে একটায় শিম খাব আর অন্যটায় ফুলকপি?'

মনোয়ারা হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'যে তরকারি খেতে ইচ্ছা করে সেটা নিয়ে খেলেই হয়। খেতে বসে খামাখা চিৎকার করছ কেন?'

'এই তরকারি তো আমি মরে গেলেও খাব না।'

'না খেলে না খেয়ো। ডাল আছে ডাল খাও।'

'শুধু ডাল দিয়ে ভাত খাব?'

মনোয়ারা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'এটা তো হোটেল না যে চৌদ্দ পদের রান্না আছে।'

মোবারক হোসেনের প্রচণ্ড ইচ্ছা হচ্ছে তরকারির বাটি ছুঁড়ে মেঝেয় ফেলে দিতে। এই কাজটা করতে পারলে রাগটা ভালো দেখানো হয়। এতটা বাড়াবাড়ি করতে সাহসে কুলাচ্ছে না। মনোয়ারা সহজ পাত্রী না। তার চীনা মাটির বাটি ভাঙবে আর সে চুপ করে থাকবে এটা হবার না। মোবারক হোসেন কৈ মাছের ঝোলের বাটি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ধাক্কাটা হিসাব করে দিলেন, যেন তরকারি পড়ে যায় আবার বাটিটাও না ভাঙ্গে।

মনোয়ারা বললেন, 'কী হলো? খাবে না?'

মোবারক হোসেন কিছু না বলে ভাতের থালায় হাত ধুয়ে ফেললেন। থালায়

ভাত বাড়া ছিল। কিছু ভাত নষ্ট হলো। হাত ধোয়ার দরকার ছিল না। তার হাত পরিষ্কার— খাওয়া শুরু আগেরই গুণ্ণোল বেধে গেল।

মনোয়ারা বললেন, ‘ভাত খাবে না?’

মোবারক হোসেন বললেন, ‘না। তোমার ভাতে আমি ‘ইয়ে’ করে দেই।’

বাক্যটা খুব কঠিন হয়ে গেল। রাগের সময় হিসাব করে কথা বলা যায় না। তবে কঠিন বাক্যেও কিছু হলো না। মনোয়ারা খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তরকারির বাটি, ডালের বাটি তুলে ফেলতে শুরু করলেন। যেন কিছুই হয়নি। মোবারক হোসেন স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। পরিবারের প্রধান মানুষটা রাগ করে বলছে—ভাত খাবে না, তাকে সাধাসাধি করার একটা ব্যাপার আছে না? মনোয়ারা কি বলতে পারত না— ভুল হয়েছে, ভবিষ্যতে আর কখনও শিম আর ফুলকপি একসঙ্গে রাখা হবে না। কিংবা বলতে পারত— দু’ মিনিট বোস, চট করে একটা ডিম ভেজে দেই। শুকনা মরিচ আর পেঁয়াজ কচলে মরিচের ভর্তা বানিয়ে দেই। মরিচের ভর্তা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। এই জিনিসটা বানাতে কতক্ষণ লাগে? তা-না, ভাত তরকারি তুলে ফেলছে! ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনের এই হলো ফসল।

মোবারক হোসেনের তীব্র ইচ্ছা হলো বাড়িঘর ছেড়ে গৌতম বুদ্ধের মতো বের হয়ে পড়েন। এ রকম ইচ্ছা তাঁর প্রায়ই হয়। বাড়ি থেকে বেরও হন। রেলস্টেশনে গিয়ে ঘণ্টাখানেক বসে থাকেন। মোবারক হোসেন দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। তাঁর দৌড় রেলস্টেশন পর্যন্ত। মোবারক হোসেন নান্দাইল রোড রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার। রাত ন’টায় একটা স্লিপ ট্রেন ছেড়ে দিয়ে খেতে এসেছিলেন। খেতে এসে এই বিপত্তি— শিম আর ফুলকপির ঘোঁট বানিয়ে বসে আছে।

মোবারক হোসেন মাফলার দিয়ে কান ঢাকতে শুরু করলেন। এটা হলো তাঁর ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়ার সঙ্কেত। অতি সহজে তাঁর কানে ঠাণ্ডা লেগে যায় বলে সব সময় মাফলার দিয়ে কান ঢাকতে হয়। আর এ বছর তুন্দ্রা অঞ্চলের শীত পড়েছে। আগুনের ওপর বসে থাকলেও শীত মানে না।

মনোয়ারা বললেন, ‘যাচ্ছ কোথায়?’

তিনি জবাব না দিয়ে গায়ে চাদর জড়ালেন।

‘স্টেশনে যাচ্ছ?’

তিনি এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। হাতমোজা পরতে লাগলেন। হাতমোজা পরা ঠিক হচ্ছে না। মনোয়ারা মাত্র কিছুদিন আগে হাতমোজা বুনে দিয়েছেন। তার উচিত হাতমোজা জোড়া নর্দমায় ফেলে দেয়া— কিন্তু বাইরে মাঘ মাসের দুর্দান্ত শীত। খোলা মাঠের ওপর রেলস্টেশন। শীত সহ্য হবে না। গৌতম বুদ্ধ কপিলাবস্ত্রতে না থেকে যদি নান্দাইল রোডে থাকতেন এবং মাঘ মাসে গৃহত্যাগ করতেন তা হলে তিনিও হাতমোজা পরতেন। গলায় মাফলার বাঁধতেন।

‘রাতে ফিরবে? না ফিরলে বলে যাও। দরজা লাগিয়ে দেব।’

‘যা ইচ্ছা করো।’

‘আমি কিন্তু শুয়ে পড়লাম। রাতদুপুরে ফিরে এসে দরজা ধাক্কাধাক্কি করবে না।’

‘তোর বাপের দরজা? সরকারি বাড়ির সরকারি দরজা। আমার যখন ইচ্ছা ধাক্কাধাক্কি করব।’

‘তুই তোকারি করবে না। আমি তোমার ইয়ার বন্ধু না।’

‘চুপ। একদম চুপ। No talk.’

মোবারক হোসেন অগ্নিদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টির অর্থ— তুমি জাহান্নামে যাও। তিনি ঘরের কোনায় রাখা ছাতা হাতে বের হয়ে গেলেন। তিনি বের হওয়ামাত্র দরজা বন্ধ করার ঝপাং শব্দ হলো। মোবারক হোসেন ফিরে এসে বন্ধ দরজায় প্রচণ্ড লাথি বসালেন। এতে তাঁর রাগ সামান্য কমল। তিনি রেলস্টেশনের দিকে রওনা হলেন।

রাত নিশুতি। ভয়াবহ ঠাণ্ডা পড়েছে। রক্ত-মাংস জেদ করে শীত হাড়ের মজ্জায় চলে যাচ্ছে। কুয়াশায় চারদিক ঢেকে গেছে। এক মাত্র দূরের জিনিসও দেখা যায় না। অথচ গুরুপক্ষ, আকাশে চাঁদ আছে। মোবারক হোসেনের পকেটে দুই ব্যাটারির টর্চও আছে। টর্চ জ্বালাতে হলে চাঁদের ভেতর থেকে হাত বের করতে হয়। তিনি তাঁর প্রয়োজন বোধ করছেন না। গত দশ বছর তিনি এই রাস্তায় যাতায়াত করছেন। চোখ বেঁধে দিলেও চলে আসতে পারবেন।

রেলস্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। পয়েন্টসম্যান হেদায়েত স্টেশনেই ঘুমায়। সে মনে হয় আছে। আজ তার বোনের বাড়িতে যাবার কথা। মনে হয় যায় নি। যে শীত নেমেছে যাবে কোথায়? মোবারক হোসেন স্টেশনের বাতি দেখে খানিকটা স্বস্তিবোধ করলেন। হেদায়েত থাকলে তাকে দিয়ে চিড়া-মুড়ি কিছু আনানো যাবে। খিদেয় তিনি অস্থির হয়েছেন। উপোস অবস্থায় রাত পার করা যাবে না। বিচকলেও কিছু খান নি। বিকেলে নাশতা হিসেবে মুড়ি এবং নারিকেলকোরা দিয়েছিল। এমন গাধা মেয়েছেলে! নারিকেলকোরা হলো ভেজা ন্যাতন্যাতা একটা জিনিস। মুড়িকে সেই জিনিস মিয়ে দেবে এটা তো দুধের শিশুও জানে। দুই মুঠ মুখে দিয়ে তিনি আর খান নি। এখন অবিশ্যি মনে হচ্ছে ন্যাতন্যাতা মুড়িই তিনি এক গামলা খেয়ে ফেলতে পারবেন। তবে শীতের রাতের আসল খাওয়া হলো আগুনগরম গরুর গোশত তার সঙ্গে চালের আটার রুটি। এই গরুর গোশত ভুনা হলে চলবে না। প্রচুর ঝোল থাকতে হবে। মনোয়ারাকে বললে সে ইচ্ছা করে করে ঝোল গুণিয়ে ভুনা করে ফেলবে। চালের আটার রুটি না করে আটার রুটি করবে এবং পরে বলবে...

মোবারক হোসেনের চিন্তার সূত্র হঠাৎ জট পাকিয়ে গেল। কারণ, তাঁর চোখে ধক করে সবুজ আলো এসে পড়ল। তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলালেন। আলোটা এসেছে স্টেশনঘর থেকে। কেউ মনে হয় টর্চ

ফেলেছে। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ বা এ রকম কিছু। হঠাৎ চোখে পড়েছে বলে সবুজ রঙ মনে হয়েছে। টর্চের আলো সবুজ হবার কোনো কারণ নেই।

নান্দাইল রোড রেলস্টেশনটা এই অঞ্চলের মতোই দরিদ্র। একটি ঘর। সেই ঘরে জানালা নেই। টিকিট দেয়ার জন্যে যে ফাঁকটা আছে তাকে জানালা বলার কোনো কারণ নেই। মোবারক হোসেন যখন এই ঘরে বসে টিকিট দেন তখন তাঁর মনে হয় তিনি কবরের ভেতর বসে আছেন। মানকের নেকের তাঁর সওয়াল জওয়াব করছে। সওয়াল জবাবের ফাঁকে ফাঁকে তিনি টিকিট দিচ্ছেন। সব স্টেশনে একটা টিউবওয়েল থাকে। যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে পানি খায়। ফ্লাস্ক ভরতি করে পানি নিয়ে ট্রেনে ওঠে। এই স্টেশনে কোনো টিউবওয়েল নেই। যাত্রীদের বসার জায়গা নেই। বছর তিনেক আগে দু'টা প্রকাণ্ড রেইনট্রি গাছ ছিল। গাছ দুটোর জন্যে স্টেশনটা সুন্দর লাগত। আগের স্টেশনমাস্টার গাছ কাটিয়ে এগারো হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন। এতে পরে তার সমস্যা হয়েছিল— তাকে বদলি করে দেয়া হয়, তার জায়গায় আসেন মোবারক হোসেন। তাঁর চাকরি এখন শেষের দিকে। এই সময় কখনো কোনো ভালো স্টেশন জুটল না। জুটল ধ্যাদাড়া নান্দাইল রোড স্টেশনের লাগোয়া কোনো চায়ের স্টল পর্যন্ত নেই। হঠাৎ চা খেতে ইচ্ছা হলে কেরামতকে পাঠাতে হয় ধোয়াইল বাজার। চা আনতে আনতে ঠাণ্ডা পানি মুখে দিয়েই থু করে ফেলে দিতে হয়। রেলস্টেশনের সঙ্গে চায়ের দোকান থাকবে না এটা ভাবাই যায় না। এর আগে তিনি যে স্টেশনে ছিলেন সেখানে দুটো চায়ের দোকান ছিল। হিন্দু টি স্টল, মুসলিম টি স্টল। দুটো চায়ের দোকানের মালিকই অবিশ্বাস্য মুসলমান।

মোবারক হোসেন স্টেশনঘরের মাথায় এসে দাঁড়ালেন। চারদিক ধু-ধু করছে। জনমানব নেই। স্টেশনঘরের সামনে থেকে তাঁর চোখে যে আলো ফেলেছিল তাকেও দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় কুয়াশার কারণে দেখা যাচ্ছে না। মোবারক হোসেন চিৎকার করলেন লোকটাকে দু'একটা কঠিন কথা বলবেন, 'মানুষের চোখে টর্চ ফেলা অসম্ভব বেয়াদবি। মহারানি ভিক্টোরিয়াও যদি কারও চোখে টর্চ ফেলেন সেটাও বেয়াদবি।'

স্টেশনঘরে বাতি জ্বলছিল বলে তিনি দূর থেকে দেখেছেন। এটা সত্যি না। স্টেশনঘরে বাতি জ্বলছে না। হেদায়েত নিশ্চয়ই বোনের বাড়ি চলে গেছে। মোবারক হোসেন তালা খুলে স্টেশনঘরে ঢুকলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ঘরটা বাইরের মতো হিমশীতল না। উত্তরে বাতাস তাঁকে কাবু করে ফেলেছিল। বাতাসের হাত থেকে জীবন রক্ষা পেয়েছে। তিনি হারিকেন জ্বালালেন। তাঁর ভয় ছিল হারিকেনে তেল থাকবে না। দেখা গেল তেল আছে। সারা রাত জ্বলার মতোই আছে।

স্টেশনঘরে তাঁর বিছানা আছে। তোশক, লেপ, চাদর, বালিশ। খাওয়া এবং ঘুমানোর ব্যাপারে তাঁর কিছু শৌখিনতা আছে বলে লেপ-তোশক ভালো।

বিছানার চাদরটাও ভালো। যদিও মোবারক হোসেনের ধারণা মাঝেমধ্যে হেদায়েত নিজের বিছানা রেখে তার বিছানায় শুয়ে থাকে। কারণ, তিনি হঠাৎ হঠাৎ বিছানা চাদরে উৎকট বিড়ির গন্ধ পান। হেদায়েতকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সে চোখ কপালে তুলে বলেছে, ‘আমার কি বিছানার অভাব হইছে?’ ব্যাটাকে একদিন হাতেনাতে ধরতে হবে।

মোবারক হোসেন বিছানা করতে শুরু করলেন। শীত যেভাবে পড়ছে অতি দ্রুত লেপের ভেতর ঢুকে যেতে হবে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় ঘুম আসবে না— কী আর করা! নিজের বোকামির ওপর তাঁর এখন প্রচণ্ড রাগ লাগছে। রাগ করে ভাত না খাওয়াটা খুব অন্যায় হয়েছে। তারচেয়েও অন্যায় হয়েছে বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে আসা। তিনি কেন বাড়ি ছাড়বেন? এক কাপ গরম চা পাওয়া গেলে এই ভয়ঙ্কর রাতটা পার করে দেয়া যেত। মোবারক হোসেন ঠিক করে ফেললেন— এবারের বেতন পেয়েই একটা কেরোসিনের চুলা কিনবেন। একটা সসপেন, চা-পাতা, চিনি। যখন ইচ্ছা হলো নিজে চা বানিয়ে খেলেন। মুড়ির টিনে কিছু মুড়ি থাকল। মুড়ির সঙ্গে খেজুর গুড়। শীতের রাতে মুড়ি আর খেজুর গুড় হলো বেহেশতি খানা। ডিম থাকলে সসপেনে পানি ফুটিয়ে একটা ডিম সেদ্ধ করে ফেলা। গরম ভাপ ওঠা ডিমসিদ্ধ লবণের ছিটা দিয়ে খাওয়া... উফ! মোবারক হোসেনের জিভে পানি এসে গেল।

মোবারক হোসেনের খাদ্যসংক্রান্ত চিন্তার সূত্রটি আবারও জট পাকিয়ে গেল। আবারও তার চোখে সবুজ আলো বলসে উঠল। এমন কড়া আলো, যে আলো নিভলে চারদিক কিছুক্ষণের জন্যে অন্ধকারে ডুবে যায়। হারিকেনের আলো সেই অন্ধকার দূর করতে পারেন না। চিকাদের কিচকিচ জাতীয় কিছু শব্দ শুনলেন। শব্দটা আসছে দরজার কাছ থেকে। ছায়ামূর্তির মতো কিছু একটা দরজায় দাঁড়িয়ে। সবুজ আলোর বলক চোখ থেকে না গেলে ছায়ামূর্তির ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না। ভূতপ্রেত না তো? আয়াতুল কুরসিটা পড়া দরকার। সমস্যা হচ্ছে এই সূরাটা তাঁর মুখস্থ নাই। মনোয়ারার আছে। সে কারণে- অকারণে আয়াতুল কুরসি পড়ে। কে জানে এখনও হয়তো পড়ছে। খালি বাড়ি মেয়েছেলে একা আছে। ভয় পাবারই কথা। শীতকালে আবার ভূতপ্রেতের আনাগোনা একটু বেশি থাকে।

মোবারক হোসেনের চোখে আলো সয়ে এসেছে। তিনি হাঁ করে দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন। চিকার কিচকিচ শব্দটা সেখান থেকেই আসছে। দরজা ধরে একজন মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে আছে। কিচকিচ শব্দ সেই করছে। যে দাঁড়িয়ে আছে সে আর যাই হোক ভূতপ্রেত না। ভূতপ্রেত হলে টর্চলাইট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না। ভূতের পায়ে বুটজুতা থাকবে না। মাথায় হ্যাটজাতীয় জিনিসও থাকবে না। চোখে রোদচশমাও থাকবে না। মোবারক হোসেন বিড়বিড় করে বললেন, ‘আপনার পরিচয়?’

বলেই মোবারক হোসেন মেয়েটির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর ভয় হতে লাগল মেয়েটি বলে বসবে আমি মানুষ না, অন্য কিছু। এখন তাঁর মনে হচ্ছে ভূতপ্রেতের হাতে টর্চলাইট থাকতেও পারে। এটা বিচিত্র কিছু না। একবার তিনি একটা গল্প শুনেছেন, রাতে এক ভূত সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। তবে সাইকেলের চাকা রাস্তায় ছিল না। রাস্তা থেকে আধা ফুটের মতো উপরে ছিল। ভূত যদি সাইকেল চালাতে পারে তা হলে টর্চলাইটও হাতে নিতে পারে। চোখে রোদচশমাও পরতে পারে। চিকার মতো কিচকিচও করতে পারে।

‘আমার নাম এলা। আপনি কি আমার কথা এখন বুঝতে পারছেন?’

মোবারক হোসেন আবারও বিড়বিড় করে বললেন, ‘জি।’

‘পরিষ্কার বুঝতে পারছেন?’

‘জি। বাংলা ভাষায় কথা বলছেন বুঝব না কেন?’

‘না, আমি বাংলা ভাষায় কথা বলছি না। আমি আসলে কোনো ভাষাতেই কথা বলছি না। আমার চিন্তাগুলো সরাসরি আপনার মাথায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি যে ভাষায় কথা বলছেন সেই ভাষাও আমি বুঝতে পারছি না, তবে আপনার মস্তিষ্কের চিন্তা বুঝতে পারছি।’

মোবারক হোসেন ক্ষীণ স্বরে বললেন, ‘জি আচ্ছা, ধন্যবাদ।’

‘আপনি এই ক্ষমতাকে দয়া করে কোনো টেলিপ্যাথিক বিদ্যা ভাববেন না। এই ক্ষমতা আমার নেই। আমি এই কাজটার জন্যে ছোট্ট একটি যন্ত্র ব্যবহার করছি। যন্ত্রটার নাম এল জি ৯০০০০।’

মোবারক হোসেন আবার যন্ত্রের মতো বললেন, ‘জি আচ্ছা, ধন্যবাদ।’

‘আপনি কি আমাকে ভয় পাচ্ছেন?’

‘জি না।’

‘আয়াতুল কুরসি ব্যাপারটা কী? আপনি মনে মনে সারাক্ষণ আয়াতুল কুরসির কথা ভাবছেন। সে কে?’

‘এটা একটা দোয়া। আল্লাহপাকের পাক কালাম। এই দোয়া পাঠ করলে মন থেকে ভয় দূর হয়। জিন-ভূতের আশ্রয় থেকে আল্লাহপাক মানব জাতিকে রক্ষা করেন।’

‘তার মানে আপনি আমাকে ভয় পাচ্ছেন?’

মোবারক হোসেন শুকনো গলায় বললেন, ‘জি না।’

‘ভয় না পেলে ভয় কাটানোর দোয়া পড়ছেন কেন?’

মোবারক হোসেন কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। তিনি ভয় পাচ্ছেন এবং বেশ ভালো ভয় পাচ্ছেন। মেয়েটা কথা বলছে, কিন্তু তার ঠোঁট নড়ছে না। ভয় পাবার জন্যে এইটাই যথেষ্ট। তার উপর এমন রূপবতী মেয়েও তিনি তাঁর জীবনে দেখেন নি। পরীস্থানের কোনো পরী না তো? নির্জন রাতে পরীরা মাঝে মাঝে পুরুষদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে পরীস্থানে নিয়ে যায়। নানান কুকর্ম করে

পুরুষদের ছিবড়া বানিয়ে ছেড়ে দেয়। এই জাতীয় গল্প তিনি অনেক শুনেছেন। তবে পরীরা যুবক এবং সুদর্শন অবিবাহিত ছেলেদেরই নিয়ে যায়। তার মতো আধবুড়োকে নেয় না। তাকে ছিবড়া বানাবার কিছু নেই। তিনি ছিবড়া হয়েই আছেন।

‘মোবারক হোসেন।’

‘জি।’

‘আমি আপনাকে আমাদের দেশে নিতে পারব না। ইচ্ছা থাকলেও পারব না। আমার সেই ক্ষমতা নেই। আমি এসেছি ভবিষ্যত পৃথিবী থেকে, পরীস্থান থেকে নয়। আপনাকে ছিবড়া বানানোরও কোনো ইচ্ছা আমার নেই।’

‘সিস্টার আপনার কথা শুনে খুব ভালো লেগেছে। থ্যাংক যু।’

‘আজকের তারিখ কত দয়া করে বলবেন?’

‘মাঘ মাসের ১২ তারিখ।’

‘ইংরেজিটা বলুন, কোন সন?’

‘জানুয়ারির ৩, ১৯৯৭।’

‘আমি আসছি ৩০০১ সন দেখে।’

‘আসার জন্যে ধন্যবাদ। সিস্টার ভিতরে এসে বসুন। দরজা বন্ধ করে দেই। বাইরে অত্যধিক ঠাণ্ডা।’

মেয়েটি ভেতরে এসে দাঁড়াল। মোবারক হোসেন দরজা বন্ধ করলেন। তারপর মনে হলো কাজটা ঠিক হয়নি। দরজা খোলা রাখা দরকার ছিল, যাতে প্রয়োজনে খোলা দরজা দিয়ে দোঁড় পালিয়ে যেতে পারেন। মনোয়ারার সঙ্গে রাগ করে বাড়ি থেকে বের হওয়াটাই ভুল হয়েছে।

দরজা বন্ধ করার পর এলা টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। মোবারক হোসেন চেয়ার এগিয়ে দিলেন। এলা বসতে বসতে বলল, ‘মনোয়ারা কে? আপনি সারাক্ষণ এই নামটি মনে করছেন।’

‘জি, আমার স্ত্রী।’

এলা বিস্মিত হয়ে বলল, ‘স্ত্রী! আপনার স্ত্রী আছে! কী আশ্চর্য!’

মোবারক হোসেন তাকিয়ে আছেন। তার স্ত্রী থাকা এমন কী বিস্ময়কর ঘটনা যে মেয়েটা চোখ কপালে তুলল! রাস্তায় ভিক্ষা করে যে ফকির, তারও একটা ফকিরণী থাকে। তিনি রেলো কাজ করেন। ছোট চাকরি হলেও সরকারি চাকরি। কোয়ার্টার আছে।

‘স্ত্রীর উপর কি কোনো কারণে আপনি বিরক্ত হয়ে আছেন?’

‘ইয়েস সিস্টার। তার ওপর রাগ করেছি বলেই স্টেশনে এসে একা একা বসে আছি।’

‘খুবই ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, এল জি ৯০০০ এই পয়েন্ট নোট করছে। বিজ্ঞান

কাউসিলে আমরা আপনার কথা বলব। র্যানডম সেম্পলের আপনি সদস্য হচ্ছেন। আশা করি আপনার বা আপনার স্ত্রীর এই বিষয়ে কোনো আপত্তি হবে না।’

কোনো কিছু না বুঝেই মোবারক হোসেন খুবই বিনীত গলায় বললেন, ‘জি না ম্যাডাম।’

‘এতক্ষণ সিস্টার বলছিলেন এখন ম্যাডাম বলা শুরু করলেন।’

‘সিস্টার ডেকে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। সিস্টার ডাকের মধ্যে হাসপাতালের গন্ধ আছে। হাসপাতাল মানেই অসুখবিসুখ। সেই তুলনায় ম্যাডাম ডাকটা ভালো।’

‘স্ত্রীর ওপর যখন রাগ করেন তখন আপনি স্টেশনে থাকার জন্যে চলে আসেন। আর যখন স্টেশনে আসেন না তখন স্ত্রীর প্রতি থাকে আপনার ভালবাসা?’

‘জি না। রাগ করেও অনেক সময় বাসায় থাকি। গত কাল রাগ করেছিলাম, তার পরেও বাসায় ছিলাম।’

‘কী কারণে রাগ করেছেন বলতে কি কোনো বাধা আছে?’

‘জি না ম্যাডাম। বলতে বাধা নেই।’

‘তা হলে বলুন।’

‘আজ রাগ করেছি— কারণ, আজ মে ফুলকপি আর শিম একসঙ্গে দিয়ে কৈ মাছের ঝোল রান্না করেছে।’

‘এটা কি বড় ধরনের কোনো অন্যায়? শিম এবং ফুলকপি একসঙ্গে রান্না করলে কি কোনো ফুড পয়জনিং হয়? আমি জানি না বলে জিজ্ঞেস করছি। আমার অজ্ঞতা ক্ষমা করবেন।’

‘শিম এবং ফুলকপি একসঙ্গে রান্না করা যায়। অনেকে পছন্দ করে। আমি করি না। অনেককে দেখেছেন সব তরকারির সঙ্গে ডাল দিচ্ছে। মাছ ভাজা নিয়েছে, তার সঙ্গেও ডাল। মাছ ভাজার এক রকম টেস্ট, ডালের আরেক রকম টেস্ট। দু’টাকে কি মেশানো যায়? তা হলে দুধ দিয়ে আর মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে মাখিয়ে খেলেই তো হতো! আমার পয়েন্টটা কি সিস্টার ধরতে পারলেন?’

‘ধরার চেষ্টা করছি। আপনি আমাকে একেক সময় একেকটা ডাকছেন— কখনো সিস্টার, কখনো ম্যাডাম। আপনি সরাসরি আমাকে এলা ডাকতে পারেন।’

‘ধন্যবাদ।’

‘রাগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। গতকাল কী নিয়ে রাগ করেছেন?’

‘চা দিতে বলেছি। চুমুক দিয়ে দেখি ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডাই যদি খাই তা হলে চা খাবার দরকার কী? শরবত খেলেই হয়! শুধু ঠাণ্ডা হলেও কথা ছিল। দেখি এলাচের গন্ধ। চা কি পায়ের নাকি যে এলাচ দিতে হবে। ম্যাডাম ঠিক বলেছি

না?’

‘আমি বলতে পারছি না। কারণ, চা নামক বস্তুটি সম্পর্কে আমার ধারণা নেই।’

‘শীতের সময় খুবই উপকারী। নেক্সট টাইম যদি আসেন ইনশাল্লাহ আপনাকে চা খাওয়াব। চা-চিনি-দুধ— সব থাকবে।’

‘আর কখনও আসব বলে মনে হচ্ছে না। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আর যেসব কারণে রাগারাগি হয় সেটা কি বলবেন? আপনাদের সব রাগারাগির উৎস কি খাদ্যদ্রব্য?’

‘জি না ম্যাডাম। ওর খাসিলত খারাপ। সবকিছুর মধ্যে উল্টা কথা বলবে। আমি যদি দক্ষিণ বলি— আমার বলাটা যদি তার অপছন্দও হয় দক্ষিণ না বলে তার বলা উচিত পূর্ব বা পশ্চিম— তা বলবে না। সে সোজা বলবে উত্তর।’

‘আপনি বলতে চাচ্ছেন বিপরীত?’

‘এক শ’ দশ ভাগ বিপরীত।’

‘এক শ’ দশ ভাগ বিপরীত মানে কী? এর শ’ ভাগের বেশি তো কিছু হতে পারে না।’

‘আপা কথার কথা।’

‘আপা বলছেন কেন?’

‘আপনাকে বড় বোনের মতো লাগছে এইজন্যে আপা বলেছি। দোষ হয়ে থাকলে ক্ষমাপ্রার্থী।’

‘দোষ-ত্রুটি না, আপনার কথাবার্তা সামান্য এলোমেলো লাগছে। যাই হোক পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই— আপনার এবং আপনার স্ত্রী সম্পর্ক তা হলে ভালো না।’

‘আপনিই বলুন ম্যাডাম ভালো হবার কোনো কারণ আছে?’

‘আপনারা কি একে অন্যকে কোনো গিফট দেন?’

‘একেবারে যে দেই না, তা না— ঈদে-চান্দে দেই। না দেওয়াই উচিত। তারপরেও দেই এবং তার জন্যে যেসব কথা শুনতে হয়— উফ!’

‘একটা বলুন শুন।’

‘ঘরের কিছা বাইরে বলা ঠিক না। তারপরেও জানতে চাচ্ছেন যখন বলি— গত রোজার ঈদে আমি নিজে শখ করে একটা শাড়ি কিনে আনলাম। হালকা সবুজের ওপর লাল ফুল। বড় ফুল না, ছোট ছোট ফুল। সে শাড়ি দেখে মুখ বাঁকা করে বলল, ‘তোমাকে শাড়ি কে কিনতে বলেছে! লাল শাড়ি আমি পরি! আমি লম্বা মানুষ। বহরে ছোট জাকাতের শাড়ি একটা কিনে নিয়ে এসেছ!’

‘জাকাতের শাড়ি ব্যাপারটা বুঝলাম না।’

‘গরিব-দুঃখীকে দানের জন্যে দেওয়া শাড়ি। শাড়ি বলা ঠিক না, বড় সাইজের গামছা।’

‘শেষ প্রশ্ন করি, আপনার স্ত্রীর প্রতি আপনার এখন তা হলে কোনো ভালোবাসা নেই?’

‘ভালোবাসা থাকবে কেন বলুন। ভালোবাসা থাকলে এই শীতের রাতে আমি স্টেশনে পড়ে থাকি?’

এলা নামের মহিলা হাতের টর্চলাইট জ্বালিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে চারদিক সবুজ আলোয় ছয়লাপ করে আবার বাতিটা নেভাল। মোবারক হোসেনের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, ‘আপনি স্টেশনে থাকতে আসায় আমার জন্যে খুব লাভ হয়েছে।’

‘কী লাভ?’

‘আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আপনার মতামত পেয়েছি। মতামত রেকর্ড করা থাকবে।’

‘ম্যাডাম কি এখন চলে যাবেন?’

‘হ্যাঁ চলে যাব।’

‘তেমন খাতির-যত্ন করতে পারলাম না, দয়া করে কিছু মনে নেবেন না। নিজগুণে ক্ষমা করবেন।’

‘খাতির-যত্ন যথেষ্টই করেছেন এবং আমি আপনার ভদ্রতায় মুগ্ধ। আপনাকে একটা সুসংবাদ দিতে যাচ্ছি। আমি মনে করি এই সুসংবাদ শোনার অধিকার আপনার আছে।’

‘জি ম্যাডাম সুসংবাদটা বলেন। সুসংবাদ শুনে শুনে কান ঝালাপালা। একটা সুসংবাদ শুনে দেখি কেমন লাগে।’

‘আপনার ভালো লাগবে। ভবিষ্যত পৃথিবী, যেখান থেকে আমি এসেছি সেই পৃথিবীতে পুরুষ সম্প্রদায় নেই। শুধুই নারী।’

মোবারক হোসেনের মুখ হাঁ হয়ে গেল। ভবিষ্যত পৃথিবীতে পুরুষ নেই। শুধুই নারী! এর মধ্যে সুসংবাদটা কোথায় মোবারক হোসেন ধরতে পারলেন না। ভবিষ্যত পৃথিবীতে শুধুই পুরুষ, নারী নেই এটা শুনলেও একটা কথা ছিল।

এলা বলল, পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার শতকরা আশি ভাগ ছিল নারী-পুরুষঘটিত সমস্যা। প্রেমঘটিত সমস্যা। একসঙ্গে জীবনযাপনের সমস্যা। ইতিহাসে এমনও আছে যে শুধুমাত্র একটি নারীর জন্যে একটি নগরী ধ্বংস হয়ে গেছে। আছে না?’

‘জি আছে। ট্রয় নগরী।’

‘গ্যালাকটিক ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকসের তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে সংঘটিত অপরাধের শতকরা ৫৩ ভাগ নারীঘটিত।’

মোবারক হোসেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘খাঁটি কথা বলেছেন। ধর্ষণ, এ্যাসিড মারা, নাবালিকা হত্যা— পত্রিকা খুললেই এই জিনিস। আল্লাহপাক দয়া করেছেন, এখানে পত্রিকা আসে না।’

এলা বলল, ‘মানুষকে এই সমস্যা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে বিজ্ঞান কাউন্সিল একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে— পৃথিবীতে পুরুষ এবং মহিলা বলে দু’ ধরনের মানব সম্প্রদায় থাকবে না। হয় থাকবে শুধু পুরুষ অথবা শুধু মহিলা। যুক্তিসঙ্গত কারণেই শুধু মহিলা রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কারণ, মহিলাদের ভেতরই দু’ রকমের ক্রমোজোম ‘x’ এবং ‘y’ আছে। বুঝতে পারছেন তো?’

কিছু না বুঝেই মোবারক হোসেন বললেন, ‘জি। আপনার কথাবার্তা পানির মতো পরিষ্কার। দুধের শিশুও বুঝবে।’

‘বংশবৃদ্ধির জন্যে একসময় পুরুষ এবং রমণীর প্রয়োজন ছিল। এখন সেই প্রয়োজন নেই। মানব সম্প্রদায়ের বংশবৃদ্ধি এখন মাতৃগর্ভে হচ্ছে না। ল্যাবরেটরিতে হচ্ছে। শিশুপালনের যন্ত্রণা থেকেও মানব সম্প্রদায়কে মুক্তি দেয়া হয়েছে।’

‘ও।’

এলা বলল, ‘বর্তমান পৃথিবী সুন্দরভাবে চলছে। সমস্যাহীন জীবনযাত্রা। তারপরেও বিজ্ঞান কাউন্সিলে মাঝেমধ্যে প্রশ্ন ওঠে— পুরুষশূন্য পৃথিবীর এই ধারণায় কোনো ত্রুটি আছে কি না। তখনই তথ্য সংগ্রহের জন্যে প্রাচীন পৃথিবীতে স্কাউট পাঠানো হয়। আমরা তথ্য সংগ্রহ করি। আমাদের পাঠানো তথ্য দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে— পুরুষশূন্য পৃথিবী আদর্শ পৃথিবী।’

মোবারক হোসেন ভয়ে ভয়ে বললেন, ‘আমরা পুরুষরা কি খারাপ?’

‘আলাদাভাবে খারাপ না, তবে পুরুষ যখন মহিলার পাশে থাকে তখন খারাপ।’

সবুজ আলো আবারও চোখ ধাঁধিয়ে দিল। আলো নিভে যাবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত মোবারক হোসেন চোখে কিছু দেখতে পেলেন না। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসার পর তিনি দেখলেন— ঘরে আর কেউ নেই। তিনি একা। মোবারক হোসেন সিগারেট ধরালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিত হলেন এতক্ষণ যা দেখেছেন সবাই চোখের ধান্দা। মন মেজাজ ছিল খারাপ, শীতও পড়েছে ভয়াবহ। সব মিলিয়ে চোখে ধান্দা দেখেছেন। একা একা স্টেশনে থাকা ঠিক না। আবার চোখে ধান্দা লাগতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে রাগ করে বের হয়ে এসে আবার ফিরে যাওয়াটাও অত্যন্ত অপমানকর। কিন্তু কী আর করা। মানুষ হয়ে জন্ম নিলে বারবার অপমানের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। বাসায় ফিরে গেলেও খাওয়াদাওয়া করা যাবে না। কিছুটা রাগ তাতে দেখানো হবে।

মোবারক হোসেন বাড়িতে ফিরলেন। মনোয়ারা বলামাত্র হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসলেন। মনোয়ারা এর মধ্যেই ফুলকপি দিয়ে কৈ মাছের ঝোল করেছেন। এবং সেই ঝোল এত সুস্বাদু হয়েছে যা বলার না! রান্নাবান্নার কোনো ইতিহাসের বই

থাকলে কৈ মাছের এই ঝোলের কথা স্বর্ণাক্ষরে সেই বইয়ে লেখা থাকার কথা। মোবারক হোসেনের খুব ইচ্ছা করছে এই কথাটা স্ত্রীকে বলা। শুনলে বেচারি খুশি হবে। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। কারণ, মনোয়ারার চোখ লাল এবং ফোলা। সে এতক্ষণ কাঁদছিল। মোবারক হোসেন যতবারই রাগ করে বাইরে চলে যান ততবারই মনোয়ারা কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেন। এই তথ্যটা মোবারক হোসেনের মনে থাকে না। মোবারক হোসেন নরম গলায় বললেন, ‘বউ ভাত খেয়েছ?’

মনোয়ারা ভেজা গলায় বললেন, ‘না।’

মোবারক হোসেন ভাত মাখিয়ে নলা করে স্ত্রীর মুখের দিকে এগিয়ে বললেন, ‘দেখি হাঁ করো তো।’

মনোয়ারা বললেন, ‘ঢং করবে না তো। তোমার ঢং অসহ্য লাগে।’

অসহ্য লাগলেও এ-ধরনের ঢং মোবারক হোসেন প্রায়ই করেন। এলা নামের মেয়েটাকে এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলা হয় নি।

মোবারক হোসেন মনোয়ারার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘কই খাও! ভাত হাতে কতক্ষণ বসে থাকব!’

মনোয়ারা বললেন, ‘বুড়ো বয়সে মুখে ভাত! হিঃ!’

হিঃ বললেও তিনি এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখভর্তি লজ্জামাখা হাসি।



শবযাত্রা # ২

আমি আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে মানুষটাকে দেখছি। গ্রামের আর দশটা মানুষের থেকে তাকে আলাদা করার কিছু নেই। তার প্রতি কৌতূহলী হবারও কোনো কারণ নেই।

কাঁচা-পাকা চুল, রোদে জ্বলে যাওয়া খসখসে চামড়া, চোখে ভরসাহারা দৃষ্টি। মানুষটা আমার সামনে বেঞ্চিতে বসে আছে। বসে থাকার ভঙ্গিটাও ক্লাস্তির। মনে হচ্ছে এফুনি ঘুমিয়ে পড়বে। আমাদেরকে ঘিরে বেশ কিছু লোকজন। তাদের চোখেও কৌতূহল। তারা মজার কোনোকিছুর জন্যে প্রতীক্ষা করছে। অনেকের মুখেই চাপা হাসি।

আমি লোকটার দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললাম, ‘আপনার নাম কী?’

লোকটা সহজভাবে উত্তর দিল, ‘আমার নাম রহমান মিয়া।’

আমাদের চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে তারা এই উত্তরেই মনে হয় মজা পেয়ে গেছে। এ ওর দিকে তাকাচ্ছে। সবার মুখই হাসি হাসি। রহমান মিয়া নাম শুনে হাসি পাওয়ার কী আছে বুঝতে পারছি না। লোকটাকে দ্বিতীয় কী প্রশ্ন করব তাও বুঝতে পারছি না। এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে চারপাশের কৌতূহলী দর্শক চাচ্ছে আমি লোকটির সঙ্গে কথা বলি। মজাটা যেন থেমে না থাকে। চলতে থাকে।

‘আপনার শরীর ভালো?’

‘জি ভালো।’

‘আপনার ছেলেমেয়ে কী?’

‘সর্বমোট চার জন।’

উপস্থিত দর্শকদের একজন বলল, ‘স্যার, ছেলেমেয়েদের নাম জিজ্ঞেস করেন।’

যে ভঙ্গিতে সে কথাটা বলল তাতে বোঝা যাচ্ছে নাম জিজ্ঞেস করার পরই আসল মজা শুরু হবে। কাজেই আমি লোকটির দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘আপনার ছেলেমেয়েদের নাম কী?’

রহমান মিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘নাম ইয়াদ নাই।’

দর্শকরা অনেকেই আনন্দে হেসে ফেলল। একটা মানুষ তার ছেলেমেয়েদের নাম মনে করতে পারছে না এর মধ্যে হাস্যরসের কিছু নেই। ঘটনাটা বেদনাদায়ক। অথচ সবাই হাসছে। সবাই আনন্দ পাচ্ছে।

‘স্যার, আপনি জিজ্ঞেস করেন তার বাবার নাম কী?’

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘রহমান মিয়া, আপনার বাবার নাম কী?’

রহমান মিয়া শান্ত গলায় বললেন, ‘আমার বাবার নাম ইয়াদ নাই। বিস্মরণ হয়েছে।’

দর্শকদের হাসি প্রবল হলো। আমার মনটাই খারাপ হলো। স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়েছে কষ্টের ব্যাপার। হাসির ব্যাপার না। এটা নিয়ে মজা করার কিছু নেই। অথচ গ্রামের মানুষরা হৃদয়হীনের মতো কাজটা করছে। এখানে এসে পৌঁছার পর থেকে শুনছি, ‘রহমান মিয়া’র খবর দিয়ে আনতেছি। বড় মজা পাবেন।’

সেই রহমান মিয়াকে আনা হয়েছে। সবুজ রঙের লুঙ্গি এবং সাদা রঙের একটা চাদর গায়ে সে ক্লান্ত ভঙ্গিতে আমার সামনে বসে আছে। বেচারার তার ছেলেমেয়েদের নাম মনে করতে পারছে না, বাবার নাম মনে করতে পারছে না। গ্রামের মানুষেরা এতেই মজা পাচ্ছে। অথচ আমি পাচ্ছি না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে লোকটির আলজেমিয়ার’স ডিজিজ হয়েছে। যে রোগ আমেরিকান

প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের হতে পারে সেই রোগ নেত্রকোনা জেলার কলঘাটি গ্রামের রহমান মিয়াও হতে পারে— রোগ মানুষ বিচার করে না।

দর্শকদের মধ্যে অতি উৎসাহী একজন বলল, ‘স্যার, আপনি জিজ্ঞেস করেন কেন তার ছেলেমেয়ের নাম বিস্মরণ হয়েছে, বাবার নাম বিস্মরণ হয়েছে।’

আমার আর কিছুই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। ঘরে ঢুকে শীতলপাটিতে শরীর এলিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু আশপাশের মানুষদের এভাবে রেখে যেতেও খারাপ লাগছে। কলঘাটি থেকে এরাই রিকশা ভাড়া করে রহমান মিয়াকে এনেছে। এদের আগ্রহ এবং উৎসাহে পানি ঢেলে দিতে খারাপ লাগছে। কাজেই আমি বললাম, ‘রহমান মিয়া, ছেলেমেয়েদের নাম আপনি ভুলে গেছেন কেন? বাবার নামই বা ভুলে গেলেন কেন? কিছু-কিছু নাম আছে কেউ কখনও ভোলে না।’

রহমান মিয়া বললেন, ‘মৃত্যুর পর সব ভুলে যায়। অল্পদিন আগে মৃত্যু হয়েছে বলে আমার নিজের নামটা মনে আছে। আর সব বিস্মরণ হয়েছে।’

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, ‘আপনার মৃত্যু হয়েছে মানে কী?’

‘গত বৈশাখ মাসে রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমার মৃত্যু হয়েছে।’

‘বৈশাখ মাসে আপনি মারা গেছেন। আর এটা হচ্ছে আষাঢ় মাস। অর্থাৎ, তিন মাস হলো আপনি মারা গেছেন!’

‘দুই মাস উনিশ দিন।’

দর্শকদের হাসি প্রবল হলো এবং আমিও বুঝলাম কলঘাটি থেকে পঞ্চাশ টাকা রিকশা ভাড়া কবুল করে এই লোকটিকে আমার কাছে আনার কারণ আছে। তবে কারণটা যথেষ্ট না। লোকটির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মাথা-খারাপ একজন মানুষ অনেক কিছুই বলতে পারে। তাকে নিয়ে মজা করা যায় না।

‘আপনি নিশ্চিত যে বৈশাখ মাসে আপনি মারা গেছেন?’

‘জি।’

‘আপনার কবর হয়েছিল, না হয় নি?’

‘কবর খোদা হয়েছিল, কিন্তু আমারে কবরে নামায় নাই।’

‘কেন?’

‘আমি তখন উঠে বসেছি। জিন্দা মানুষের মতো কথা বলেছি। পানি খেতে চেয়েছি। সবাই ভাবছে আমি জিন্দা।’

‘আসলে আপনি জিন্দা না?’

‘জি না।’

‘আপনি মারা গেছেন, কিন্তু আপনার ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই আছে?’

‘আছে। আগের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু আছে। কেন যে আছে এইটাও বুঝি না।’

কথোপকথন এই পর্যায়ে বন্ধ করতে হলো। কারণ, আমার নাশতা খাবার ডাক এসেছে। যে বাড়িতে আমি উঠেছি সে বাড়ির কর্তা (হেডমাস্টার, সোহাগী হাইস্কুল) আমাকে ডাকতে এসেছেন। হেডমাস্টারদের চোখে ভুবনবিখ্যাত যে বিতৃষ্ণা থাকে, সেই বিতৃষ্ণা নিয়ে তিনি রহমানের দিকে তাকালেন। আশপাশের লোকদের দিকে তাকালেন এবং সমস্ত বিতৃষ্ণা চোখের নিমিষে এক পাশে সরিয়ে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে মধুর গলায় বললেন, ‘স্যার, একটু বিষয় আছে। ভিতরে আসেন।’

বেশ কিছু নতুন-নতুন জিনিস আমি গ্রামে এসে লক্ষ্য করছি, তার মধ্যে একটি হচ্ছে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে লোকসমক্ষে উচ্চারণ করা হয় না। ‘স্যার, নাশতা খেতে আসুন’ বলায় কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু আমাকে বলা হচ্ছে— একটা বিষয় আছে। খাওয়াদাওয়াকে ‘বিষয়’ বলা কি গ্রামে সর্বজনীন, না এই বাড়িটির বিশেষত্ব, তা এখনো বুঝতে পারছি না।

আমি হেডমাস্টার সাহেবের আশ্রয়ে গত তিন দিন ধরে আছি। তিনি যথেষ্ট আদরযত্ন করছেন। তবে কী কারণে যেন তাঁর ধারণা হয়েছে আমি ‘বোকা টাইপ’ মানুষ। জগতের জটিলতা থেকে আমাকে দূরে রাখা তাঁর নৈতিক দায়িত্ব। হেডমাস্টার সাহেব এই দায়িত্ব নিষ্ঠুর সঙ্গে পালন করে যাচ্ছেন। পারলে একটা কাচের বৈষমে ভরে আমাকে শিকায় ঝুলিয়ে রাখতেন। সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলে একটু মনঃক্ষুণ্ণ।

হেডমাস্টার সাহেবের হাতে আমি কী করে পড়লাম, সেই গল্প এখানে অবান্তর। তবু বলে নিচ্ছি, তা হলো আমার অবস্থানটা পরিষ্কার হয়।

একটি দৈনিক পত্রিকায় আমি প্রতি সপ্তাহে কলাম লেখি। কলামের নাম ‘নিজেরে হারায়ে খুঁজি’। হালকা বিষয়বস্তু নিয়ে হালকা কলাম। যেমন ঢাকা নগরীর ভিক্ষুক। নগরীর সৌন্দর্যের এরাও যে একটা অংশ এইসব হাবিজাবি। একটা কলাম লিখলাম ঢাকা শহরের অবহেলার পাখি ‘কাক’ নিয়ে। যখন যা মনে আসে তা নিয়ে লেখা। যেহেতু কলামগুলি রাজনৈতিক নয় কাজেই কেউ সেসব গুরুত্বের সঙ্গে পড়ে বলে আমার কখনো মনে হয় না। আমার সব সময় মনে হতো আমি এবং পত্রিকার কম্পোজিটর আমরা দু’জনই ‘নিজেরে হারায়ে খুঁজি’ কলামের নিবিষ্ট পাঠক।

এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো যখন আমার স্কুলের এক বন্ধু টেলিফোন করে বলল, ‘তোরা একটা কলাম পড়ে আমার গায়ের সব লোক খাড়া হয়ে গেছে।’ আমি খুবই চিন্তিত বোধ করলাম। রোমহর্ষক কোন কলাম লিখেছি বলে মনে পড়ল না। আমি বললাম, ‘কোন লেখাটার কথা বলছ?’

সে অতিরিক্ত রকম আগ্রহের সঙ্গে বলল, ‘ওই যে জোছনা নিয়ে লেখা। দোস্ত, তোরা লেখাটা আমি অফিসের সবাইকে পড়ে শুনিয়েছি।’

‘ও আচ্ছা।’

‘ও আচ্ছা না। মারাত্মক লিখেছিস। স্কুলে র‍্যাপিড রিডারে পাঠ্য হবার মতো লেখা। অনেক শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে।’

বন্ধুর উৎসাহে নিজেকে যুক্ত করতে পারলাম না— কারণ লেখটা এমন কিছু না। আমার অন্যসব লেখার মতোই হালকা, গভীরতাহীন। লেখাতে আমি ঢাকার মেয়রকে অনুরোধ করেছিলাম, নগরবাসীকে পূর্ণিমা দেখার জন্যে তিনি যেন একটা ব্যবস্থা করে দেন। ভরা পূর্ণিমার সময় ঢাকা নগরে তিনি যেন দু’ ঘণ্টার জন্যে হলেও ইলেকট্রিসিটি অফ রাখেন। সেখান থেকে চলে গেছি গ্রামের বাঁশঝাড়ের পূর্ণিমায়। যে পূর্ণিমায় রাজকুমার সিদ্ধার্থ স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

আমার বন্ধু বলল, ‘দোস্তু তুই আমাকে পারমিশন দে, আমি তোকে কাজলা দিদির বাঁশবাগানের জোছনা দেখিয়ে আনব। তখন তুই এ রকম আরেকটা লেখা লিখতে পারবি। একটা ফাটাফাটি হয়ে যাবে।’

আমি বললাম, ‘আচ্ছা।’

‘তোর অ্যাপয়েনমেন্ট বুকে লিখে রাখ। নেক্সট পূর্ণিমা কাজলা দিদির বাঁশবাগানের জোছনা। কথা দিচ্ছিস?’

‘পূর্ণিমার তো দেরি আছে। এখনই কথা দিতে হবে?’

‘হ্যাঁ, এখনই কথা দিতে হবে। আমি সরকারি চাকরি করি। তোর মতো ঝরা হাত-পা না যে যখন-তখন যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারি। আমাকে আগেই ছুটির দরখাস্ত করতে হবে। বল ইয়েস।’

আমি ইয়েস বলে ফেঁসে গেলাম। আমাকে একা নেত্রকোনা জেলার এই অতি অজপাড়াগাঁয়ে এসে উপস্থিত হতে হয়েছে। কারণ, বন্ধুটি শেষ মুহূর্তে ছুটি পায় নি। যেহেতু আগেই সব খবর দেয়া, আমাকে একাই আসতে হয়েছে। আমি না এলে বন্ধুর ইজ্জত থাকে না। সে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।

পূর্ণিমা দেখার পক্ষে বিপুল আয়োজন হয়েছে তা খুবই হাস্যকর, কিন্তু আমি হাসতেও পারছি না। হেডমাস্টার সাহেবের বাড়ির কাছে বিশাল এক বাঁশবন শলার ঝাড়ু দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। জঙ্গলে যা হয়— বাঁশগাছের সঙ্গে অন্য কিছু গাছও থাকে। সেইসব গাছ কুড়াল দিয়ে কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। কারণ, হেডমাস্টার সাহেবকে জানানো হয়েছে আমি বাঁশবনের জোছনা দেখতে চাই। বনের মাঝখানে চেয়ার-টেবিল পাতা হয়েছে। আমি চেয়ারে বসে টেবিলে হাত রেখে জোছনা দেখব।

সমস্যা হচ্ছে গত তিন দিন ধরে আকাশ মেঘলা। চাঁদের দেখা নেই। গত রাতে পূর্ণিমা ছিল— চাঁদের দেখা পাওয়া যায় নি। বৃষ্টি পাওয়া গেছে। সারা রাতই বৃষ্টি হয়েছে। আজ বৃষ্টি না হলেও আকাশ মেঘে মেঘে কালো। আমি এক শ ভাগ নিশ্চিত সন্ধ্যার পর থেকে বৃষ্টি শুরু হবে। আমি তাতে মোটেই দুঃখিত বোধ করছি না। আগামী কাল সকালে ঢাকায় চলে যেতে পারছি এতেই আমি

আনন্দিত। পুরোপুরি নগরবাসীকে মানুষের জন্যে গ্রামের সব অভিজ্ঞতা সুখকরও না। গ্রামে বাস করতে এলে ধাক্কা খেতেই হবে।

ঢাকা শহরে আমি নিশ্চয়ই এমন কাউকে পাব না যার ধারণা গত দু' মাস উনিশ দিন ধরে সে মৃত। যদি কেউ থেকেও থাকে— তার আত্মীয়স্বজন তার চিকিৎসা করবে। যত্ন করে ঘরে রেখে পুষবে না। দর্শনীয় বস্তু হিসেবে তাকে ভাড়া করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেবেও না।

হেডমাস্টার সাহেবের সব আয়োজনেই বাড়াবাড়ি থাকে। বৈকালিক নাশতার আয়োজন গুরুতর। নাশতা হিসেবে পোলাও করা হয়েছে। পোলাও এবং গরুর ভুনা মাংস।

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, 'এটা বিকালের নাশতা?'

হেডমাস্টার সাহেব আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'কফি আনিয়েছি। খানার পর কফি আর নোনতা বিস্কুট।'

আমি যথেষ্ট পরিমাণ আশ্বস্ত হয়ে পোলাও খেতে বসলাম। কারণ, 'না' বলে লাভ হবে না। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে 'না' শব্দটির সঙ্গে এরা পরিচিত নয়। অতি সুখাদ্যও যে মাঝে মাঝে খেতে ইচ্ছা করে না এই ধারণা সম্ভবত গ্রামের মানুষের নেই।

ঘিরে জবজবা পোলাও মুখে দিতে দিতে বললাম, 'রহমান মিয়া লোকটা সম্পর্কে হেডমাস্টার সাহেব আপনি কী জানেন?'

হেডমাস্টার মুখভরতি পোলাও নিয়ে বললেন, 'হারামজাদাকে জুতাপেটা করা উচিত। ইডিয়ট।'

আমি বললাম, 'কেন বলুন?'

'ফাজলামি করছে না! সে জিন্দা না মূর্দা এটা সে বলার কে? এটা হলো দশজনের বিবেচনা।'

'আপনাদের বিবেচনায় সে জিন্দা?'

'অবশ্যই। এমবিবিএস ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বলেছে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে যে বেঁচে আছে এটা প্রমাণ করার জন্যে পাস করা ডাক্তার এসেছিল?'

'জি এসেছিল। পালস দেখেছে। ব্লাড প্রেসার মেপেছে। পালস একটু ডাউন আছে তবে প্রেসার নরম্যাল।'

'একটা লোক কথা বলছে, হাঁটছে, খাচ্ছে। সে যে বেঁচে আছে তার জন্যে এটাই যথেষ্ট না? পালস দেখতে হবে, ব্লাড প্রেসার মাপতে হবে?'

হেডমাস্টার সাহেব জামবাটিভরতি গরুর মাংসের প্রায় সবটা নিজের প্লেটে ঢেলে বললেন, 'গ্রামে হলো আপনার অশিক্ষিত মূর্খ জনগোষ্ঠীর বাস। এদের জন্যে পালস দেখা লাগে, ব্লাড প্রেসার মাপা লাগে।'

'এরা কি বিশ্বাস করে ফেলেছিল যে রহমান মিয়া মৃত?'

‘আপনাকে বলব কী? ষোল আনা মানুষের মধ্যে দশ আনা বিশ্বাস করে রহমান মিয়া মারা গেছে। এখনো বিশ্বাস করে।’

‘বলেন কি!’

হেডমাস্টার সাহেব দীর্ঘদিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘শিক্ষার আলো এইজন্যেই দিকে দিকে জ্বালানো দরকার। নবি-এ করিমের (সঃ) সহী হাদিস আছে, শিক্ষার জন্যে সুদূর চীনে যাও। আছে না?’

‘জি আছে।’

হেডমাস্টার সাহেব চতুর্থবারের মতো তাঁর প্লেটে পোলাও নিলেন। জিন্দা লাশকে দেখে আমি যেমন অবাক হয়েছিলাম— প্রায় সুতার মতো শরীরের হেডমাস্টার সাহেবের খাওয়া দেখেও প্রায় তেমন অবাকই হচ্ছি। আমি খাওয়া শেষ করে হাত গুটিয়ে ফেলেছি দেখে হেডমাস্টার সাহেব বাটির বাকি গোশত প্লেটে ঢালতে ঢালতে বললেন, ‘কফি বানাচ্ছে। কফি খান। তারপর কাঁচা সুপারি দিয়ে একটা পান খেয়ে শুয়ে ঘুম দেন। আকাশের যে অন্ধকার আজ বোধহয় চাঁদ উঠবে না। তবে আপনাদের কথা দিলাম, চাঁদ যত রাতেই উঠুক বাঁশবনে চেয়ার-টেবিল নিয়ে যাব, কফি নিয়ে যাব ফ্লাস্কে করে। আরাম করে জোছনা দেখবেন। জোছনা দেখার সময় যেন মশা ডিসটার্ব না করে এইজন্যে গ্লোব মার্কা মশার কয়েল আনিয়ে রেখেছি। সব রেডি করা আছে।’

আমি বললাম, ‘আপনি আরাম করে ঘুমান। আমার দুপুরে ঘুমিয়ে অভ্যেস নেই। আমি বরং রহমান মিয়ার সঙ্গে গল্প করি।’

‘খবরদার, ওই কাজটা করবেন না।’

‘অসুবিধা কী? পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।’

‘যত ইন্টারেস্টিংই মনে হোক, কথা বলবেন না। আমার রিকোয়েস্ট। কথা বললে সমস্যা আছে।’

‘কী সমস্যা।’

কী সমস্যা হেডমাস্টার সাহেব ব্যাখ্যা করলেন না। নিতান্তই নিরীহ একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে হেডমাস্টার সাহেবের এত অনাগ্রহের কারণ ধরতে পারলাম না। আমি এক কাপে দেড় পোয়া চিনি দিয়ে বানানো কফির পেয়ালা হাতে রহমান মিয়ার সঙ্গে গল্প করতে গেলাম।

আগ্রহী দর্শকরা এখনো আছে। তারা আগে দাঁড়িয়ে ছিল, এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে। মনে হচ্ছে তারা আরো কিছু ‘মজা’র প্রত্যাশী। আমি রহমান মিয়ার সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলতে চাচ্ছিলাম তা বোধহয় সম্ভব হবে না। আমি চেয়ারে বসতে বসতে কী বলব না-বলব গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। আমার মনে হচ্ছে রহমান মিয়ার মনের ভেতরে কোনো বিচিত্র কারণে একটা ভুল ধারণা ঢুকে গেছে। ভুল ধারণাটা দূর করারও কেউ চেষ্টা করছে না। সবাই মজা পাচ্ছে। ভুল ধারণা দূর করা মানেই তো ‘মজা’র সমাপ্তি।

‘রহমান মিয়া ।’

‘জি ।’

‘আপনি যে মারা গেছেন এই বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?’

‘জি ।’

‘কখনো সন্দেহ হয় না?’

‘না ।’

‘এত নিশ্চিত হলেন কীভাবে?’

রহমান মিয়া প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বাঁ হাত উঁচু করে আমাকে দেখাল । আমি দেখলাম, হাতের তালুর নিচে চামড়া কালো হয়ে কুঁচকে আছে । কোঁচকানো কালো চামড়া মৃত্যুর প্রমাণ হতে পারে না । আমি কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছি— দর্শকদের একজন বলল, ‘কুপির উপরে হাত ধরছিল । চামড়া পুঁইড়া গেছে । কোনো দুঃখ পায় নাই ।’

চামড়া পুড়ছে কিন্তু ব্যথা পাচ্ছে না, নিশ্চয়ই এর কোনো ব্যাখ্যা আছে । যে স্নায়ু ব্যথাবোধ মস্তিষ্কে নিয়ে যায় সেই স্নায়ু নষ্ট হয়ে গেছে বা এই জাতীয় কিছু হয়েছে । ডাক্তাররা ভালো বলতে পারবেন । কুষ্ঠরোগে এ রকম হয় বলে শুনেছি । কুষ্ঠরোগীর ত্বকের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায় ।

আমি দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বললাম ‘আপনাদের কি ধারণা রহমান মিয়া মৃত?’

বৃদ্ধ একজন দার্শনিকদের মধ্যে বলল, ‘আল্লাহর আলমে বহুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে । সবই আল্লাহপাকের কদরত ।’

‘অর্থাৎ, আপনি বিশ্বাস করছেন সে মৃত?’

‘আমি বিশ্বাসও করি না আবার ধরেন অবিশ্বাসও করি না ।’

‘সেটা কেমন কথা?’

‘লক্ষণ বিচারে মাঝে মাঝে পাই জিন্দা, মাঝে মাঝে পাই মুর্দা । মুর্দারে কোনো সময় মশায় কামড়ায় না । রহমান মিয়াতেও মশায় ধরে না ।’

‘মেয়ে মশা রক্ত খায় তার পেটের ডিমের পুষ্টির জন্যে । রহমান মিয়ার রক্তে হয়তো কোনো সমস্যা আছে যে জন্যে মশারা তার রক্ত খাচ্ছে না ।’

‘জি হইতে পারে ।’

‘আমার ধারণা রহমান মিয়ার খুব ভালো চিকিৎসা হওয়া দরকার । তার রোগটা মনে । এই রোগ সারাতে হবে ।’

‘গরিব মানুষ । ভাত জোটে না আবার চিকিৎসা ।’

আমি রহমান মিয়ার দিকে তাকালাম । প্রথমে যেভাবে বসে ছিল এখনো ঠিক সেইভাবেই বসে আছে ।

হঠাৎ মনে হলো রহমান মিয়ার মধ্যে খুবই অস্বাভাবিক কিছু আছে । যা

বারবার আমার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। অস্বাভাবিকতাটা কি বসে থাকার ভঙ্গির ভেতর? নাকি তাকানোর ভেতর? সে কারো দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। সে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে।

‘রহমান মিয়া!’

‘জি।’

‘তাকান তো আমার দিকে।’

রহমান মিয়া তাকাল। আমি বললাম, ‘আমার দিকে তাকিয়ে থাকুন। না বলা পর্যন্ত চোখ নামাবেন না।’

‘জি আচ্ছা।’

রহমান মিয়া তাকিয়ে আছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অস্বাভাবিকতাটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি চোখের পাতা ফেলছেন না। একবারও না। নিশ্চয়ই এরও কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু আমার বুকে ধক করে ধাক্কার মতো লাগল। ব্যাপারটা কী? আমার মনে হচ্ছে আমি এই মানুষটাকে চোখের ভেতর দিয়ে অনেক দূর দেখতে পাচ্ছি। যা দেখছি তার সঙ্গে আমার চেনা-জানা পৃথিবীর কোনো মিল নেই। আমি নিশ্চিত যে ভয় পেয়েছি বলেই এ রকম মনে হচ্ছে।

‘রহমান মিয়া!’

‘জি।’

‘আপনি মানুষের দিকে চোখ তুলে তাকান না কেন? সব সময় মাটির দিকে তাকিয়ে থাকেন!’

রহমান মিয়া আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন এবং উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘যাই।’

তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কেন তিনি মানুষের চোখের দিকে তাকান না তা তিনি জানেন, কিন্তু বলতে চাচ্ছেন না।

রাতে আমার ঘুম হলো না। রহমান মিয়ার ব্যাপারটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। তাড়াবার চেষ্টা করেও পারছি না। নানান উদ্ভট চিন্তা মাথায় আসছে। জীবিতদের মাঝখানে মৃত মানুষরা ঘুরছে এ ধরনের গল্পগাথা পৃথিবীর সব দেশে প্রচলিত। জম্বিদের নিয়ে রীতিমতো গবেষণামূলক গ্রন্থ আছে। কবর দেওয়ার পর মৃত মানুষ জীবিত হয়ে ফিরে আসে। পরিচিতজনদের সঙ্গে বাস করতে আসে। এরা না মৃত না জীবিত। এরা ‘জম্বি’। ড্রাকুলাদের গল্প তো সবারই জানা। জম্বিদের মতো ড্রাকুলারাও না মৃত না জীবিত। আমাদের রহমান মিয়া এ রকম কেউ না তো?

আচ্ছা এমন কি হতে পারে রহমান মিয়ার শরীর থেকে আত্মা চলে গেছে? তা হলে আত্মা ব্যাপারটা কী?

শেষরাতের দিকে ঘুমাতে গেলাম এবং খুব সংগত কারণেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখলাম— দেখলাম শবযাত্রার দৃশ্য। কবরখানার দিকে যাচ্ছি। আমাদের আগে আগে খাটিয়া যাচ্ছে। তবে খাটিয়াতে কোনো শবদেহ নেই। শূন্য খাটিয়া। শবদেহ আমাদের সঙ্গেই হেঁটে হেঁটে কবরখানার দিকে যাচ্ছে।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। হেডমাস্টার সাহেব ডেকে তুললেন। নান্দাইল রোড স্টেশন থেকে বারটার সময় ট্রেন যাবে ঢাকার দিকে। এখন উঠে রওনা না দিলে ট্রেন ধরতে পারব না। নাশতা রেডি আছে। রিকশাও রেডি। নাশতা খেয়েই রিকশায় উঠতে হবে। হাতে একেবারেই সময় নেই।

অতি দ্রুত হাতমুখ ধুয়ে নাশতা নিয়ে বসলাম। হেডমাস্টার সাহেব গলা নিচু করে বললেন, ‘ওই হারামজাদা সকাল থেকে এসে বসে আছে। তার সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না। নট এ সিগ্নেল ওয়ার্ড। হারামজাদা বাড়ি চিনে ফেলেছে। এখন রোজ আসবে।’

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ‘কার কথা বলছেন?’

‘রহমান মিয়া।’

‘কী চায়?’

‘আপনাকে কী নাকি বলবে? কিছু বলার দরকার নাই।’

রহমান মিয়ার ওপর হেডমাস্টার সাহেবের তীব্র রাগের কারণ আগেও ধরতে পারি নি। এখনো ধরতে পারলাম না।

নান্দাইল রোড স্টেশনের দিকে রওনা হয়েছি। কাদাভরতি রাস্তা। অনেক কষ্টে রিকশা টেনে টেনে নেয়া হচ্ছে। রিকশা ধরে ধরে এগুচ্ছে রহমান মিয়া। আমি বললাম, ‘কিছু বলবেন রহমান মিয়া!’

‘জি।’

‘বলু শুনি।’

‘কথাটা এখন ইয়াদ আসতেছে না।’

‘মনে পড়ছে না?’

‘জে না।’

‘খুব জরুরি কথা?’

‘জি।’

‘আপনার নিজের বিষয়ে কিছু কথা?’

‘জি।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে, মনে করার চেষ্টা করুন। আরেকটা কথা শুনুন-ঢাকায় গিয়েই আমি আপনার বিষয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলব। সম্ভব হলে আপনাকে ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা করব। ডাক্তারদের সঙ্গে আগে কথা না বলে আপনাকে নিতে চাচ্ছি না।’

‘জি আচ্ছা।’

‘আমাকে যে কথাগুলো বলতে চাচ্ছিলেন সেগুলো কি মনে পড়েছে?’

‘জে না।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে। মনে করার চেষ্টা করুন।’

নান্দাইল রোড স্টেশনে অপেক্ষা করছি। খবর এসেছে ট্রেন এক ঘণ্টা লেট। হেডমাস্টার সাহেব আমার সঙ্গে আছেন। ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে তারপর যাবেন। হেডমাস্টার সাহেব রহমান মিয়াকে আমার ধারেকাছে ঘেঁষতে দিচ্ছেন না। ছাতি হাতে তাকে মারতে পর্যন্ত গেলেন। আমি বললাম, ‘হেডমাস্টার সাহেব আপনি লোকটাকে সহ্যই করতে পারছেন না কেন, বলুন তো?’

হেডমাস্টার সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, ‘আরে একটা মরা মানুষের সাথে কী কথা?’

‘মরা মানুষ মানে? কী বলছেন আপনি?’

হেডমাস্টার সাহেব থু করে থুতু ফেলে বললেন, ‘মরা না তো কী! ভালো করে তাকায়ে দেখেন, হারামজাদার মাথার উপরে শকুন উড়তেছে। যেখানে যায় শকুন চলে আসে। দেখেন, নিজের চোখে দেখেন।’

আমি দেখলাম রহমান মিয়া রেন্টি গাছের নিচে বেঞ্চিতে বসে আছেন। হাতে বাদামের ঠোঙা। বাদাম খাচ্ছেন। গাছের ডালে কয়েকটা শকুন। দু’টা শকুন রেললাইনের কাছে। এরা রহমান মিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে।

নিশ্চয়ই এরও কোনো ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা জানি না বলে অস্বাভাবিক লাগছে। আমি বললাম, ‘রহমান মিয়ার বাড়িতেও কি শকুন আসে?’

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, ‘শকুন আসে, শিয়াল আসে, কুকুর আসে। তার বাড়ির সবাই যত্নগাছ অস্থির হয়ে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। সে এখন থাকে নিজের মতো। কেউ তারে জায়গা দেয় না।’

‘তাই নাকি?’

‘শকুন দেশ থেকে উঠে গিয়েছিল। এই হারামজাদা কোথেকে নিয়ে এসেছে। গ্রাম ভরতি হয়ে গেছে শকুনে।’

‘বলেন কী?’

‘গত কালকে আপনি তার সাথে কথা বললেন। সন্ধ্যার সময় দেখি তিনটা শকুন ওড়াউড়ি করছে। শকুন আসা খুবই অলক্ষণ। এইজন্যেই হারামজাদারে দূরে দূরে রাখি।’

ট্রেন এসে পড়েছে, আমি ট্রেনে উঠলাম। আমাকে ট্রেনে উঠতে দেখে রহমান মিয়া জায়গা ছেড়ে উঠে এলেন। হেডমাস্টার সাহেব আবারো ছাতা নিয়ে তাকে মারতে যেতে চাচ্ছেন বলে মনে হলো। আমি হেডমাস্টার সাহেবকে হাতে ধরে থামালাম।

রহমান মিয়া জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, ‘কথাটা মনে পড়েছে?’

রহমান মিয়া ‘হ্যাঁ-সূচক’ মাথা নাড়লেন।

আমি বললাম, ‘বলুন কথাটা কী শুনি।’

ট্রেন চলতে শুরু করেছে। জানালা ধরে ধরে রহমান মিয়া এগুচ্ছেন। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, ‘কথাটা কেউ বুঝব না, আপনে বুঝবেন।’

‘বলে ফেলুন?’

‘এখন আবার ইয়াদ হইতেছে না।’

রহমান মিয়া হতাশ মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। ট্রেন তাকে ছেড়ে চলে আসছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, দু’টা শকুন হেঁটে হেঁটে এগুচ্ছে তার দিকে। শকুনরা যে অবিকল মানুষের মতো হাঁটে এই তথ্য আমার জানা ছিল না। জগতের কত কিছুই তো মানুষ জানে না।



নেড়ি কুকুর এবং আজহারউদ্দিন মণ্ডল

আজহারউদ্দিন মণ্ডল একজন লেখক। গল্প-উপন্যাসের লেখক না। তিনি ফরমাশমতো নানান বিষয়ে বই লেখেন। বিসিএস গাইড, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য, সোলেমানী জাদু, পবিত্র হজ পালনের নিয়মাবলি, বড়দের হাস্যকৌতুক, ছোটদের হাস্যকৌতুক, খোয়াবনামা, অলিম্পিক খেলার ইতিহাস— সব বিষয়ে তাঁর বই আছে। বইগুলোর মধ্যে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য হিট বই, মফস্বলে ভালো চলে। এর মধ্যে তিনটা এডিশন হয়েছে। ফরমাশমতো বই লেখা ছাড়াও তিনি বাংলাবাজারের একজন নামকরা প্রুফ রিডার। বানানে তাঁর দক্ষতার জন্যে অনেকেই তাঁকে আদর করে চিকনা-ডিকশনারি ডাকে। তিনি রোগা বলেই চিকনা-ডিকশনারি। মোটা হলে অবশ্যই নাম হতো মটু-ডিকশনারি। এই নামকরণে তাঁর গর্ববোধ করার কথা। তিনি গর্ববোধ করেন না, বরং তিনি তাতে খুবই লজ্জা পান।

ভদ্রলোকের বয়স সাতান্ন, স্বল্পভাষী। কথা প্রায় বলেন না বললেই চলে। কারো সঙ্গেই তাঁর কোনো বিরোধ নেই। প্রুফ দেখার রেট ফর্মাপ্রতি ষাট টাকা। কেউ যদি সেখানে তাঁকে কুড়ি টাকা রেট ধরিয়ে দেয় তিনি মাথা নিচু করে

থাকেন। কিছুই বলেন না। এমন হাসিমুখে টাকাটা পাঞ্জাবির পকেটে রাখেন যাতে মনে হতে পারে তার রেট কুড়ি টাকা পার ফর্মা।

ভদ্রলোক থাকেন কলাবাগানে। দুপুরে বাংলাবাজারের একটা হোটেলে খেয়ে নেন। হোটেলের সঙ্গে মাসকাবারি ব্যবস্থা করা আছে। রাতে নিজেই রঁধে খান। অতি ভালোমানুষ। একা থাকেন। ভদ্রলোকের প্রথম জীবন সামান্য রহস্যাবৃত। বিয়ে করেছিলেন, একটা মেয়েও হয়েছিল। সেই বিয়ে টেকে নি। স্ত্রী এবং কন্যার সঙ্গে তাঁর এখন আর কোনো যোগাযোগ নেই। এইটুকুই শুধু জানা যায়, এর বেশি কিছু জানা যায় না।

আজহারউদ্দিন মণ্ডল সুখেই ছিলেন। নতুন একটা বইয়ে হাত দিয়েছেন। বইয়ের নাম ভালো ছাত্র হবার গোপন কথা। তাঁর প্রকাশক প্রবাহ পাবলিকেশন্সের মোহাম্মদ মোসলেম মিয়া এই বইটির জন্যে পাঁচ হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছেন। মোসলেম মিয়ার বাংলাবাজারে বইয়ের দোকান আছে। তিনি নোটবই এবং নকল বইয়ের ব্যবসা করেন। কলকাতার লেখকদের বই ছাপিয়ে অল্প দামে বাজারে ছেড়ে দেন। লেখককে রয়েলটি দিতে হয় না বলে ভালো লাভ থাকে। সুনীলের বই আজকাল ভালো চলছে দেখে মোসলেম অন্য লেখকদের বেশ কয়টা বই সুনীলের নামে বের করে ফেলেছেন। কেউ কিছু বুঝতে পারছে না, সেগুলোও ভালো চলছে।

মোসলেম মিয়া বইয়ের জগতের কাউকেই পছন্দ করেন না, তবে আজহারউদ্দিনকে পছন্দ করেন। এবং নানান জনের কাছে আজহারউদ্দিনের জ্ঞানের প্রশংসা করেন। কোনো একটা বিষয় বলে দিলে একটা লোক সেই বিষয়ের ওপরে পনেরো দিনে একটা বই লিখে ফেলতে পারে, এটা মোসলেম মিয়ার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়। এটা ঠিক, নানান বইটাই ঘেঁটে লোকটা বই লেখে। সেই ঘাঁটঘাঁটি করতে পারাও তো সহজ ব্যাপার না। ভালো ছাত্র হবার গোপন কথা বইটির প্রথম দুই অধ্যায় তিনি পড়েছেন। তার ধারণা বইটা স্কুলে এবং কলেজে পাঠ্য হওয়ার মতো।

আজহারউদ্দিন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ভালো ছাত্র হবার গোপন কথা বইটি লিখছিলেন। তিনি নিজে কোনোকালেই ভালো ছাত্র ছিলেন না। ভালো ছাত্র হবার গোপন কিংবা প্রকাশ্য কোনো কথাই তাঁর জানা নেই। কাজেই তাঁকে বানিয়ে লিখতে হচ্ছে। বানিয়ে বানিয়ে লিখলেও প্রচুর চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে। এই মুহূর্তে তিনি বইটির তৃতীয় চ্যাপ্টার লিখছেন। চ্যাপ্টারের শিরোনাম—শরীর ঠিক তো সব ঠিক। এই অংশে ভালো ছাত্র হবার পিছনে শরীরের যে ভূমিকা তার বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন। মোটামুটি গল্পের ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে। কাল্পনিক একটা ছেলে যার নাম সুজন তাকে উদ্দেশ্য করে যেন তার বাবা কথা বলছেন।

সুজন,

লক্ষ্মীপুত্র আমার। আমার আদরের ধন, নয়নের মণি। তোমার শরীর ঠিক আছে তো বাবা? শরীর ঠিক না থাকলে কিন্তু সবই গেল। মনে করা যাক তুমি অত্যন্ত ভালো ছেলে। ইংরেজি, অঙ্ক, ভূগোল— সবই তুমি ভালো জান। কিন্তু মানিক আমার! অসুস্থ শরীরে তুমি কি পরীক্ষা দিতে পারবে? কাজেই মনীষীদের কথাটা কি বিবেচনায় আনা কর্তব্য নয়? মনীষীরা বলে গেছেন—

Health is wealth. সহজ বাংলায় শরীর গেল তো সব গেল।

এই পর্যন্ত লেখার পর একটা ঘটনা ঘটল। তাঁর কাছে মনে হলো কে যেন গলা খাঁকারি দিল। রাত বাজে দু'টা। এ-সময় গলা খাঁকারি কে দেবে? তিনি চমকে তাকালেন। ভূত-প্রেত না তো? তিনি বললেন, 'কে?' বলেই দেখেন একটা নেড়ি কুকুর দরজা দিয়ে মাথা বের করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। কুকুরটা অপরিচিত না। মাঝে মাঝে তাঁর ঘরের বারান্দায় গুয়ে থাকে। আজ দরজা খোলা দেখে হয়তো উঁকি দিচ্ছে। কুকুর যে মানুষের মতো গলা খাঁকারি দিতে পারে তা তাঁর জানা ছিল না। হায়েনা মানুষের মতো হাসে। তাঁর লেখা জ্ঞানের কথা বইয়ে এটার উল্লেখ আছে। জ্ঞানের কথা বইটার দ্বিতীয় মুদ্রণ হলে কুকুর যে মানুষের মতো গলা খাঁকারি দেয় এটা উল্লেখ করতে হবে। তবে তার আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। জ্ঞানবিজ্ঞানের বইয়ে ভুল তথ্য থাকা উচিত না। ভুল থাকলে কোমলমতি শিশুরা ভুল শিখবে। কুকুর হয়তো তার মতো করে শব্দ করেছে। লেখালেখির কাজে অতিরিক্ত মনোযোগ থাকায় তাঁর কাছে কুকুরের শব্দ মানুষের গলা খাঁকারির মতো মনে হয়েছে।

তিনি কুকুরের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বললেন, 'যা ভাগ।'

কুকুরটা মনে হলো খুবই দুঃখিত হলো। কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা সরিয়ে নিল। আজহারউদ্দিন মণ্ডল হাতমুখ ধুয়ে ঘুমাতে গেলেন। রাত বেশি হয়েছে। আরো রাত জাগলে সমস্যা হবে। শরীর ঠিক রাখতে হবে। শুধু যে ভালো ছাত্ররাই শরীর ঠিক রাখবে তা না, অন্যদেরও রাখতে হবে। এমনকি চোরদেরও শরীর ঠিক রাখতে হবে। শরীর ঠিক না থাকলে চোররা চুরি করবে কীভাবে? তাঁর ঘুম এল না। যে-কোনো কারণেই হোক ঘুম চটে গেছে। তিনি কিছুক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করলেন। বিছানা থেকে নেমে পানি খেলেন। দরজা খুলে বারান্দায় চলে এলেন। বারান্দায় খোলা বাতাসে হাঁটাইটি করলে যদি ঘুমটা আসে। খোলা বাতাসে অক্সিজেন বেশি থাকে। অক্সিজেন ঘুমের জন্যে সহায়ক। কোনো এক পত্রিকায় পড়েছিলেন।

কুকুরটা বারান্দায় ঘুমাচ্ছিল। তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়াল এবং জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল। তিনি বললেন, 'ঘুম আসছে না, বুঝলি। ঘুমের প্রবলেম হচ্ছে।'

কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে লেজ নাড়ল। যেন সে বুঝতে পারছে। আজহার সাহেবের ঘুমের প্রবলেম হওয়াতে সে দুঃখিত বোধ করছে।

আজহারউদ্দিন বললেন, ‘তুই কি একা থাকিস নাকি?’

কুকুরটা এমন একটা শব্দ করল যে তাঁর কাছে মনে হলো— হ্যাঁ।

তিনি বললেন, ‘তুই কি একটা মজার ব্যাপার জানিস? মজার ব্যাপারটা হচ্ছে শুধু মানুষ আর কুকুর এই দুটি প্রাণীই একা থাকতে পারে। আর কোনো প্রাণী পারে না। একটা শালিক কখনোই দেখা যায় না। যেখানেই একটা শালিক থাকবে তার আশপাশেই থাকবে আরেকটা শালিক। একটা বাঘ যেখানে থাকবে তার আশপাশেই থাকবে আরেকটা বাঘিনি। বুঝলি। শুধু মানুষ আর কুকুরের বেলায় আলাদা নিয়ম। একটা মানুষ যেমন প্রচুর দেখা যায় তেমনি একটা কুকুরও প্রচুর দেখা যায়।’

কুকুরটা বলল, ‘হুঁ।’

তিনি নিজের মনেই বললেন, ‘মানুষের সঙ্গে কুকুরের আরো মিল আছে। মানুষ জোছনা পছন্দ করে। কুকুরও করে। ভরা জোছনায় কুকুরদের দেখা যায় থাবা মেলে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে।’

কুকুরটা আবারো ‘হুঁ’ জাতীয় শব্দ করল।

আজহারউদ্দিন মগল খুবই অবাক হলেন, আশ্চর্য, তিনি একটা কুকুরের সঙ্গে কথা বলছেন কেন? তাঁর কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? মনে হয় ভালো ছাত্র হবার গোপন কথা বইটা লিখতে গিয়ে মাথার ওপর বেশি চাপ পড়ছে। চিন্তাভাবনা বেশি করতে হচ্ছে। তাঁর কথাবাতা বলার লোক নেই, সেটাও একটা কথা। কথা বলার মতো একজন কেউ থাকলে এই সমস্যা হতো না। যেমন সুজন বলে যদি কেউ সত্যি সত্যি থাকত তা হলে...

আজহারউদ্দিন বারান্দায় রাখা বেঞ্চিতে বসলেন। একটা সিগারেট ধরালেন। কুকুরটা এগিয়ে এল। আজহারউদ্দিন বললেন, ‘একটা বই লিখছি, বুঝলি? ভালো ছাত্র হবার গোপন কথা। তোরা যদি পড়তে পারতি তা হলে তোদের জন্যেও একটা বই লিখতাম, ভালো কুকুর হবার গোপন কথা।’

কুকুরটা আনন্দে লেজ নাড়ল।

‘তোর কি রাতের খাওয়া হয়েছে?’

কুকুরটা লেজ নাড়ল। শুধু লেজ না, হ্যাঁ-সূচক ভঙ্গিতে মাথাও নাড়ল। মনে হচ্ছে তার রাতের খাওয়া হয়েছে।

‘খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো করবি। শরীর ঠিক রাখতে হবে। তোর-আমার জন্যে শরীর ঠিক রাখা খুব দরকার। অসুখে পড়লে দেখার কেউ নেই বুঝলি না! একবার আমার টাইফয়েড হলো। কী কষ্ট যে করেছি সে আর বলার না! এক গ্লাস পানি হাতে এগিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। শেষে মোসলেম মিয়া সাহেব

আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। প্রায় এক মাসের মতো হাসপাতালে ছিলাম।’

কুকুরটা বসেছে তাঁর সামনে। গ্রামোফোন রেকর্ডে কুকুরের বসে থাকার যে ছবি থাকে অবিকল সেভাবে বসা। মনে হচ্ছে সে আজহারউদ্দিনের কথা খুবই মন দিয়ে শুনছে। তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। কুকুরটা কি মানুষের কথা বুঝতে পারছে? বুঝতে না পারলে এমন কানখাড়া করে প্রতিটি কথা শুনছে কেন? তিনি তাঁর জ্ঞানের কথা বইটিতে ডলফিন মাছের কথা বলেছেন। প্রাণীবিজ্ঞানীদের ধারণা, ডলফিন মাছ নিজেদের মধ্যে কথা বলে এবং হয়তো মানুষের কিছু কথাও বুঝতে পারে। কে জানে হয়তো কুকুরও পারে।

আজহারউদ্দিন সারা রাত বারান্দার বেঞ্চিতে বসে কাটিয়ে দিলেন। কুকুরটাও ঘুমাল না। সে তাঁর সামনে কানখাড়া করে বসে রইল।

আজহারউদ্দিনকে দেখে মোসলেম মিয়া আঁতকে উঠে বললেন, ‘আপনার কী হয়েছে?’

আজহারউদ্দিন কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, ‘কিছু হয় নি।’

‘কিছু হয় নি মানে? চোখ ডেবে গেছে। চোখেই নিচে কালি। মনে হচ্ছে কয়েক দিন ধরে দাড়িও শেভ করছেন না। সমস্যাটা কী?’

‘কয়েকদিন ধরে ঘুম হচ্ছে না। সারা রাত জেগে থাকি।’

‘জেগে থাকেন কেন?’

‘ঘুম হয় না এইজন্যে জেগে থাকি। বারান্দায় বসে থাকি।’

‘বইটা যে লিখছিলেন সেটার কত দূর?’

‘এখন লিখতে পারছি না।’

‘লিখতে না পারলেই হবে? আপনি তো রবীন্দ্রনাথ না যে মুড আসবে তারপর লিখবেন। এসএসসি পরীক্ষার আগে আগে বই মার্কেটে ছাড়তে হবে। কাগজ কিনে রেখে দিয়েছি।’

‘একেবারেই ঘুম হচ্ছে না, শরীরটায় জুত পাচ্ছি না।’

‘জুত না পেলেও বই লিখে শেষ করতে হবে। মানুষ হয়ে জন্মানোর এই হলো সমস্যা। আগে কাজ, তারপর শরীর। ঠিক বলেছি না?’

আজহারউদ্দিন নিচু গলায় বললেন, ‘আমারও মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে মানুষ হয়ে না জন্মায়ে যদি পশু হয়ে জন্মাতে পারতাম তা হলে ভালো হতো। যেমন ধরুন কুকুর।’

মোসলেম মিয়া বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘এত প্রাণী থাকতে কুকুর হয়ে জন্মাতে চান কেন? কুকুর হয়ে জন্মাতে তো গু খেতে হবে। গু খাওয়ার চেয়ে মানুষ হয়ে জন্মানো ভালো না?’

আজহারউদ্দিন মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, ‘তা অবশ্য ভালো।’

‘যাই হোক দশ ফর্মা প্রফ জমে আছে, দেখে দিয়ে তারপর বাড়ি যাবেন। আজকেই প্রিন্ট অর্ডার দিতে হবে। পারবেন না?’

‘জি পারব।’

‘আর শুনুন, ঘুম নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করবেন না। নেপোলিয়ান দিনের মধ্যে দুই ঘণ্টা ঘুমাতে। তাও ঘোড়ার পিঠে। তাঁর যদি তাতে অসুবিধা না হয় আপনার হবে কেন? ঠিক বলছি না?’

‘জি, ঠিক।’

‘বসে থেকে সময় নষ্ট করছেন কেন? দশ ফর্মা প্রফ দেখতে সময় লাগবে।’

‘একটা কথা ছিল।’

‘কথা পরে শুনব। প্রফ দেখে যাওয়ার পথে বলবেন। এখন কাজে লেগে যান। আমি চা-সিগারেট পাঠিয়ে দিচ্ছি।’

‘জি আচ্ছা।’

আজহারউদ্দিন রাত এগারোটা পর্যন্ত প্রফ দেখলেন। মোসলেম মিয়া খুশি খুশি গলায় বললেন, ‘এই তো কাজ নেমে গেল। এখন বলুন আপনার কী কথা।’

আজহারউদ্দিন বললেন, ‘থাক আরেক দিন বলব।’

‘আরেক দিন বলবেন কেন, আজই বলুন।’

‘আমার শরীরটা ভালো না।’

‘সে তো দেখতেই পাচ্ছি। বিশ্রাম দরকার। বইটা শেষ করে বিশ্রাম নেন। আমার ধারণা, আপনার এই বইও হিট করবে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য যেমন তিন এডিশন হয়েছে, এটারও ইনশাআল্লাহ তিন-চার এডিশন হবে। নিন একশটা টাকা রেখে দিন। হিসাবনিকাশ পরে হবে।’

আজহারউদ্দিন টাকাকটা পকেটে রাখতে রাখতে বিড়বিড় করে বললেন, ‘আমার মাথাটা ঘোঁষায় খারাপ হয়ে গেছে।’

মোসলেম মিয়া বিরক্ত গলায় বললেন, ‘মাথা খারাপের কথা বলছেন কেন? মাথার কী হয়েছে?’

‘একটা নেড়ি কুকুরের সঙ্গে সারা রাত গল্প করি।’

মোসলেম মিয়া তাকিয়ে রইলেন। আজহারউদ্দিন কী বললেন বুঝতে পারলেন না। মোসলেম মিয়া ভুরু কুঁচকে বললেন, ‘কার সঙ্গে কথা বলেন?’

‘কুকুরের সঙ্গে।’

‘একটা কুকুরের সঙ্গেই গল্প করেন, নাকি সব কুকুরের সঙ্গে গল্প করেন?’

‘একটা কুকুরের সঙ্গে।’

‘কী গল্প করেন?’

‘সাধারণ গল্প, সুখ-দুঃখের আলাপ।’

‘এটা কোনো মাথা খারাপের লক্ষণ না। সুখ-দুঃখের কথা অনেক মানুষই

পশুপাখির সঙ্গে বলে। ছোটবেলায় আমি একটা ময়না পেলেছিলাম, কত কথা বলতাম ময়নার সঙ্গে! যান বাসায় যান। ভালো করে গোসল করে খাওয়াদাওয়া করেন। তারপর একটা হিস্টাসিন খেয়ে ঘুম দেন। হিস্টাসিন অ্যালার্জির ট্যাবলেট হলেও ঘুমের কাজ করে। আপনার কাছে হিস্টাসিন আছে?’

‘জি না।’

‘আমার কাছে আছে, নিয়ে যান। একটা হিস্টাসিন একটা রিলাক্সেন। ডাবল একশান।’

আজহারউদ্দিন এক পাতা হিস্টাসিন ট্যাবলেট নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। মাথা খারাপের আসল লক্ষণ মোসলেম মিয়াকে বলতে পারলেন না। তাঁর মাথা খারাপের আসল লক্ষণ হলো শুধু তিনিই যে কুকুরটার সঙ্গে গল্প করেন তা না, কাকুরটাও তাঁর সঙ্গে গল্প করে এবং কুকুরের প্রতিটি কথা তিনি বুঝতে পারেন।

আজহারউদ্দিন রিকশা করে ফিরছিলেন, পথে রিকশা থামিয়ে দুই সিঙ্গেল তেহারী কিনে ফেললেন। আজ ঘরে ফিরে রাঁধতে ইচ্ছা করছে না। এক সিঙ্গেল তেহারীতেই তাঁর হয়ে যায়। দুই সিঙ্গেল কিনলেন কারণ একটা দেবেন কুকুরটাকে। অবলা প্রাণী, তাকে একবেলা খাবার দিতে তো অসুবিধা কিছু নেই। তবে আজ তিনি গল্পগুজবে যাবেন না। তিনি ঘরে ফিরে গোসল করবেন। সাবান ডলে ভালোমতে একটা গোসল। গোসলের পর তেহারী খাবেন। তেহারীটা এখন গরম আছে। যেতে-যেতে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। গরম করে নিতে হবে। খাওয়াদাওয়ার পর লেখা নিয়ে বসে বসে ভালো ছাত্র হবার গোপন কথা বইটার তৃতীয় চ্যাপ্টার লিখে ফেলতে হবে। কুকুরের সঙ্গে কথা বলা মানে পাগল হবার দিকে অগ্রসর হওয়া। কাজেকর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে।

রিকশায় বসে ভালো ছাত্র হবার গোপন কথা বইটির তৃতীয় চ্যাপ্টার নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। ভাবনাচিত্তার ব্যাপারটা তিনি রিকশা বা বাসে ভালো করেন।

তৃতীয় চ্যাপ্টারের শিরোনাম “রুটিনের জালে বন্দি।” লেখাটা হবে এরকম—

বাবা সুজন,

সোনা আমার। ও আমার সাত রাজার ধন। আমার সাগর সঁচা মানিক। বাবা তুমি কি মাছকে জালে বন্দি হতে দেখেছ? জালে বন্দি হওয়া মাছের জন্যে বড়ই দুঃখের। কিন্তু বাবা তুমি কি জান মানুষকেও মাঝেমধ্যে জালে বন্দি হতে হয়? মানুষের সেই বন্দিদশা কিন্তু তার জন্যে কল্যাণকর। মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে যে জালে বন্দি হতে হবে সে জালের নাম— রুটিনের জাল। জীবনটাকে রুটিনের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। তুমি এক রাতে ঘুমাতে যাবে নটায়, আরেক রাতে দু’টায় তা তো বাবা হবে না।

বাসায় পৌঁছেই আজহারউদ্দিন দেখলেন তাঁর দরজার সামনে কুকুরটা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে দেখেই বলল, ‘দোকানের খাওয়া তো আপনার সহ্য হয় না। আবার দোকানের খাওয়া কিনলেন! বয়স তো হয়েছে শরীরের যত্ন করবেন না?’

আজহার সাহেব কুকুরের সঙ্গে কথাবার্তায় গেলেন না। তালা খুলে ঘরে ঢুকে পড়লেন। তবে ঘরে ঢোকার আগে তেহারীর একটা প্যাকেটের মুখ খুলে উঠানে ছুঁড়ে দিলেন। কুকুরটা উঠানের দিকে চলে গেল। যাবার সময় বিড়বিড় করে কী যেন বলল। আজহার সাহেব পাত্তা দিলেন না। কুকুরের কথা শুনে জীবন কাটালে হবে না। তাঁর কাজকর্ম আছে। ভালো ছাত্র হবার গোপন কথা বইটার জন্যে অ্যাডভান্স নেয়া আছে। এতদিনে বইটা লেখা হয়ে যেত।

তিনি গোসল সেরে খাওয়াদাওয়া করে অনেক দিন পর খাতা-কলম নিয়ে বসলেন। রাত দু’টা পর্যন্ত লেখালেখি করলেন। চ্যাপ্টারটা যেভাবে লিখলেন ভেবেছিলেন তারচে’ ভালো লিখে ফেললেন। তাঁর মন ভালো হয়ে গেল। আগামী কাল মোসলেম মিয়াকে পাণ্ডুলিপিটা দিলে তিনি ঝড়ই খুশি হবেন।

আজহারউদ্দিন বিছানায় যাবার আগে বারান্দার বেঞ্চির উপর বসলেন। ঘুমাতে যাবার আগে একটা সিগারেট খাবেন। জায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে। কিন্তু চা খাওয়াটা ঠিক হবে না। ঘুম চটে যাবে।

কুকুরটা উঠানে বসে আছে। আজহার সাহেবকে দেখলে অন্য সময় কাছে চলে আসত। আজ আসছে না। ব্যাটা বোধহয় রাগ করেছে। রাগ করার যদিও কিছু নেই। আজহারউদ্দিন এক সিঙ্গেল তেহারী এনে খাইয়েছেন। এক সিঙ্গেল তেহারীর দাম পনেরো টাকা।

কুকুরটা এগিয়ে আসছে। আজহারউদ্দিন ঠিক করে ফেললেন— আজ কথা বলবেন না। কুকুরটা কথা বলা শুরু করলেও না। ব্যাটা একা একা আর কতক্ষণ কথা চালাবে?

‘আপনার কী হয়েছে?’

কুকুরটাই প্রশ্ন করছে। আজহারউদ্দিন জবাব দিলেন না। গভীর মনোযোগে সিগারেট টানতে লাগলেন।

‘আমার ওপর রাগ করেছেন?’

আজহারউদ্দিন জবাব না দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরালেন। কুকুরটা তাঁর সামনে বসল।

‘আমি যদি কোনো অপরাধ করে থাকি ক্ষমা করে দিয়েন।’

আজহারউদ্দিন নিজের অজান্তেই বললেন, ‘চুপ।’

‘আপনি একটার পর একটা সিগারেট টানছেন এটা তো ঠিক না। শুয়ে পড়েন। রাত জেগে এত পরিশ্রম করছেন— এটাও ঠিক না।’

আজহারউদ্দিন বললেন, ‘পরিশ্রম না করলে খাব কী?’

কুকুরটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, ‘এটাও ঠিক। কুকুর হয়ে জন্মালে আপনাকে খাওয়া-খাদ্য নিয়ে চিন্তা করতে হতো না। দিনের খাওয়া কোনো-না-কোনোভাবে জুটে যেত। কী করবেন মানুষ হয়ে জন্মেছেন। যান ঘুমাতে যান।’

‘তোর জন্যে তেহারী এনেছিলাম, খেয়েছিস?’

‘ই।’

‘কেমন ছিল?’

‘ভালো। আজ আমার কপাল ভালো গেছে— দুপুরে বিয়েবাড়ির খাবার খেয়েছি। বিরানী আর ফিরনি। আমার সঙ্গে আরো কুকুর ছিল। কামড়াকামড়ি করে খাবারের ভাগ নিয়েছি। তবে তার মধ্যেও আনন্দ আছে।’

‘কী আনন্দ!’

‘সেটা আপনি বুঝতে পারবেন না। কুকুরের আনন্দ। কুকুর হয়ে না জন্মালে এই আনন্দ বোঝা যাবে না।’

‘যুক্তিযুক্ত কথা।’

‘আপনি ঘুমাবেন না?’

‘ঘুম আসতেছে না।’

‘ঘুম না আসলে চা বানান। চা খেতে খেতে ঘুম করেন।’

‘তুই চা খাবি?’

‘জি না। চা আমার পছন্দ না। গরম জিনিস খেতে পারি না।’

‘ঠাণ্ডা করে দেই?’

‘না কষ্ট করার দরকার নাই।’

‘কষ্ট আর কি! নিজের জন্যে তো চা বানাবই।’

আজহারউদ্দিন চা বানানতে গেলেন।

ভালো ছাত্র হবার গোপন কথা বইটার তৃতীয় অধ্যায় পড়ে মোসলেম মিয়া অভিভূত হলেন। বড় সুন্দর লেখা। ভাষা প্রাঞ্জল। ক্ষুরধার যুক্তি।

মোসলেম মিয়া বললেন, ‘ঠাণ্ডা করছি না— নোবেল প্রাইজ পাওয়ার কাছাকাছি বই লিখে ফেলেছেন।’

আজহারউদ্দিন মাথা নিচু করে রাখলেন। মোসলেম মিয়া বললেন, ‘এই বই আমি দু’টা এডিশন ছাপাব। হার্ড কভার এবং পেপারব্যাক। বইয়ের বিজ্ঞাপনও ঠিক করে ফেলেছি—

দশজন গৃহশিক্ষকের চেয়েও

যে গ্রন্থ বেশি ...

আমার ভাষাটাকা আসে না আজহার সাহেব, আপনিই বিজ্ঞাপনটা গুছিয়ে লিখে দেবেন। সব ডেইলি পেপারে বিজ্ঞাপন তো দেবই, টিভিতেও দেব। আর

শুনে আজহার সাহেব, আজ রাতে আপনি আমার সাথে চারটা ডাল-ভাত খাবেন।’

আজহারউদ্দিন বললেন, ‘আজ থাক শরীরটা ভালো না।’

‘না আজই খাবেন। প্রফ দেখার কিছু কাজও আছে। কাজ শেষ করে রাতে আমার এখানে খাওয়াদাওয়া করে আমার এখানেই ঘুমিয়ে পড়বেন। অসুবিধা আছে কোনো?’

‘জি না।’

‘রাত জেগে লেখালেখিও করতে পারেন। চার নম্বর অধ্যায়টা শুরু করে দেন। আমি ফ্লাস্ক ভরতি করে চা দিয়ে রাখব। নাকি নিজের জায়গা ছাড়া লিখতে পারেন না?’

‘লিখতে পারি। জায়গা কোনো ব্যাপার না।’

মোসলেম মিয়া আনন্দিত গলায় বললেন, ‘এটা হলো আসল লেখকের কথা। আসল লেখক যে-কোনো সময় যে-কোনো জায়গায় লিখতে পারে। শুধু নকল লেখকের জন্যেই মুড লাগে, হেন লাগে, তেন লাগে। আপনি ভাই এক শ পার্সেন্ট আসল লেখক। ভালো কথা, চোখ লাল কেন?’

আজহারউদ্দিন নিচু গলায় বললেন, ‘রাতে ঘুম হয় নাই।’

‘হিস্টাসিন খেতে বলেছিলাম খান নাই?’

আজহারউদ্দিন চুপ করে রইলেন। মোসলেম মিয়া বললেন, ‘কাজটা ঠিক হয় নাই। শরীরের দিকে আপনার নিজস্বই যত্ন নাই। অথচ ভালো ছাত্র হবার গোপন কথা বইটাতে শরীর বিষয়ে কী লিখলেন মনে করে দেখুন। থাক আজ আর রাত জেগে কাজ করার দরকার নাই। আরাম করে আজ ঘুমাবেন। আপনার ভালোমন্দ কিছু হলে দেশেরই একটা ক্ষতি হয়ে যাবে।’

খাওয়া-দাওয়ার পর মোসলেম মিয়ার বাইরের ঘরে আজহারউদ্দিন ঘুমাতে গেলেন। নতুন জায়গায় তাঁর ঘুম হয় না। কিন্তু আজ ভিন্ন ব্যাপার হলো। হিস্টাসিন খাবার জন্যেই হোক বা তিনি অতিরিক্ত ক্লান্ত থাকার জন্যেই হোক, বিছানায় শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়লেন।

কয়েক ঘণ্টা তাঁর খুব ভালো ঘুম হলো। যখন ঘুম ভাঙল তখন রাত প্রায় দুইটা। জানালা গলে জোছনার আলো এসেছে। আজহারউদ্দিনের মনে হলো তিনি জোছনার মধ্যে গুয়ে আছেন। তিনি বিছানা থেকে নেমে বারান্দায় এলেন। কী আশ্চর্য কাণ্ড! বারান্দায় নেড়ি কুকুরটা বসে আছে। তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

তিনি বললেন, ‘তুই এখানে?’

কুকুরটা ক্লান্ত স্বরে বলল, ‘গন্ধে-গন্ধে চলে এসেছি।’

‘চলে এসেছিস যখন ডাকলি না কেন?’

‘আরাম করে ঘুমাচ্ছিলেন। মায়া লাগল।’

‘তুই এসেছিস ভালোই হয়েছে। কেমন ফকফকা চান্নি দেখলি? চান্নি কী জানিস?’

কুকুর জবাব দিল না।

আজহারউদ্দিন বেঞ্চে বসতে বসতে বললেন, ‘চান্নি হলো জোছনা। চাঁদ থেকে চান্নি। বকুল জোছনাকে বলত চান্নি। বকুল কে তোকে বলা হয় নি। বকুল হলো আমার বউ। এখন একা থাকলে কী হবে, একসময় আমার বউ ছিল। একটা ছেলেও ছিল। ছেলের নাম হলো সুজন।’

কুকুরটা এসে থাবা গেড়ে তাঁর সামনে বসল। আজহারউদ্দিন জোছনা দেখতে-দেখতে বললেন, ‘খুবই লজ্জার কথা, এইজন্যেই বউ আর ছেলের কথা কাউকে বলি না। ছেলেটার যখন এক বছর বয়স তখন বকুল ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়ে গেল। যার সঙ্গে চলে গেছে তাকেও চিনি। অতি ভালো ছেলে।’

কুকুরটা বলল, ‘ও।’

‘ভাদ্র মাসের ৯ তারিখে বিকেলবেলা গেছে। শুক্রবার। যেদিন যাবে সেদিনও কিছু বুঝতে পারি নি। দুপুরবেলা এত যত্ন করে ভাত খাইয়েছে। মলা মাছ, বেগুনভর্তা, ডাল। মুগের ডাল।’

‘ও।’

‘খাওয়াদাওয়ার পর পান খেয়ে ঘুমাতে গেছি। ঘুম থেকে উঠে দেখি নাই। প্রায় ছাব্বিশ বছর হয়ে গেছে, যত্ন করে সেদিন।’

‘আপনার সঙ্গে আর দেখা হয় নি?’

‘না। বিদেশে চলে গেছে। আমিও যোগাযোগের চেষ্টা করি নি। কী দরকার!’

‘ঠিক বলেছেন, কী দরকার!’

‘এখন বয়স হয়েছে তো। মন দুর্বল হয়েছে। এখন মনটা সারাক্ষণ উদাস হয়ে থাকে। ইচ্ছা করে ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে যাই।’

‘চলেন যাই নামি।’

‘তুই নামতে বলছিস?’

‘হুঁ।’

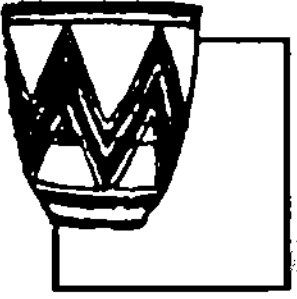
আজহারউদ্দিন মণ্ডল ঘরদুয়ার খোলা রেখেই পথে নামলেন। কুকুরটা আগে আগে যাচ্ছে। তিনি যাচ্ছেন তার পিছনে পিছনে। মাঝে মাঝে তিনি যখন গল্প শুরু করছেন তখনই শুধু কুকুরটা থামছে।

‘আমাদের বিয়ে কী মাসে হয়েছিল জানিস?’

‘শ্রাবণ মাসে।’

‘ঠিক বলেছিস তো। বুঝলি কী করে? আশ্চর্য! হ্যাঁ, শ্রাবণ মাসেই বিয়ে হয়েছিল। আরে বাসরে, কী বৃষ্টি! রাত একটার দিকে শুরু হলো ঝড়। দাঁড়া, কোথাও বসি। বসে গল্পটা বলি— দারুণ ইন্টারেস্টিং!’

আজহারউদ্দিন মণ্ডল ফুটপাথে পা ছড়িয়ে বসলেন। কুকুরটা মুখোমুখি না বসে তাঁর পাশে বসেছে। তাতে গল্প বলতে আজহারউদ্দিন মণ্ডলের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। কুকুর তো আর মানুষ না যে তার সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা বলতে হবে। সে পাশে বসে কথা শুনছে এ-ই যথেষ্ট। এই আনন্দই তার রাখার জায়গা নেই।



প্রেসক্রিপশন

প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করলাম মাথাধরাকে পাত্তা না দিতে। অবহেলা কেউ সইতে পারে না। রোগও পারে না। যোগ্য যখন দেখে তাকে আমল দেয়া হচ্ছে না, অগ্রাহ্য করা হচ্ছে তখন সে মনমেজাজ খারাপ করে চলে যায়। আমার ক্ষেত্রে তা হলো না। পাত্তা না খেয়ে মাথাধরা আরো বাড়ল। একসময় লক্ষ করলাম মাথাধরাটা মেরুদণ্ড বেয়ে নিচে নামার পরিকল্পনা করছে। ত্বরিত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন— আমি একটা ফার্মেসিতে ঢুকে পড়লাম। চারটা প্যারাসিটামল কিনব। দু’টা খেয়ে দু’টা ভবিষ্যতের জন্যে পকেটে রেখে দেব।

আমার অনেকদিনের অভ্যাস যে-কোনো দোকানে ঢোকার আগে দোকানের নাম পড়ি। মাঝেমধ্যে সুন্দর সুন্দর নাম চোখে পড়ে। বেশ মজা লাগে। একটা স্টেশনারি দোকানের নাম পেয়েছিলাম— ‘নীলাচল’। আরেকটা রেস্টুরেন্টের নাম ‘ঝাল-ঝোল’। সাধারণত দেখেছি সুন্দর নামের দোকানগুলি বেশিদিন চলে না। ঝাল-ঝোল এক মাসের মধ্যে উঠে গেল। নতুন এক রেস্টুরেন্ট চালু হলো। নাম—দি নিউ মদিনা বিরিয়ানি অ্যান্ড কাবাব ঘর। সাইনবোর্ডে হাস্যমুখী দাড়িওয়ালা ছাগলের ছবি। এই রেস্টুরেন্টটা বেশ চলছে।

যে কথা বলছিলাম— ফার্মেসিতে ঢোকার আগে চট করে নাম পড়ে নিলাম। নতুন কোনো নাম না হলেও আধুনিক নাম ‘প্রেসক্রিপশন’। আমার কাছে মনে

হলো নামটা শুধু যে আধুনিক তা-ই নয়, বেশ জুতসই নাম। প্রেসক্রিপশন মানেই যে ফার্মেসি।

চারটা প্যারাসিটামলের দাম চার টাকা। মাথাধরা নামক অতি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির জন্যে বড়ই সস্তা চিকিৎসা। সেলসম্যানকে পানি দিতে বললাম। সে গ্লাসে করে পানি এনে দিল। দু'টা ট্যাবলেট তখনই খেয়ে ফেললাম। ওষুধের দাম দিতে গিয়ে আমি হতভম্ব। মানিব্যাগ সঙ্গে নেই। পকেটমার হয় নি এটা জানি। বাসা থেকে মানিব্যাগ ছাড়াই বের হয়েছি। দু'টা ট্যাবলেট গিলে না ফেললে ফিরিয়ে দেয়া যেত। আমি খুবই লজ্জার মধ্যে পড়লাম। কী বলব বুঝতে পারছি না। সেলসম্যানও যেন কেমন-কেমন করে তাকাচ্ছে।

দোকানের মালিক মনে হয় দূর থেকে ব্যাপারটা লক্ষ করছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে গম্ভীরমুখে বললেন, আপনি একটু আমার ঘরে আসবেন? চারটা টাকার জন্যে কঠিন কিছু কথা শুনতে হবে কি না বুঝতে পারছি না।

আমি তাঁর ঘরে ঢুকলাম এবং হড়বড় করে বললাম, 'ওষুধের দাম দিতে পারছি না। কাল ভোরে আমি এসে দিয়ে যাব।'

মালিক ভদ্রলোক বললেন, 'সামান্য দু'টা ট্যাবলেটের দাম দিতে না পারায় আপনি এ-রকম করছেন? ভাই এক কাজ করুন—দুই পাতা ট্যাবলেট নিয়ে যান। এর দাম আপনাকে দিতে হবে না। আর ওষুধ আপনি আমার সামনের চেয়ারে বসুন। চা দিতে বলছি, গরম চা খান, মাথাধরাটা কমবে।'

আমি ভদ্রলোকের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। দিনকাল পাণ্টে গেছে, প্রিয়জনদের কাছ থেকেই ভালো ব্যবহার পাওয়া যায় না, আর এই ভদ্রলোক নিতান্তই অপরিচিত একজন। আমি বললাম, 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

ভদ্রলোক বললেন, 'অবশ্যই পারেন। আমার এমনই নাম যে একবার শুনলে কখনো ভুলবেন না। আমার নাম কয়লা।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কয়লা?'

'হ্যাঁ কয়লা। রসিকতা করছি না। আসলেই আমার নাম কয়লা। জন্মের সময় গায়ের রঙ ছিল খুবই ফরসা। আমার বাবা রহস্য করে বললেন, আমার ছেলে এমন কয়লার মতো কালো হলো ব্যাপারটা কী? সেই থেকে কয়লা নাম। ঠাট্টা করে কয়লা ডাকতে ডাকতে—কয়লা। ভালো নাম মোহম্মদ সানোয়ার হোসেন।'

সানোয়ার সাহেবের দিকে ভালো করে তাকালাম। ভদ্রলোকের গায়ের রঙই যে শুধু সুন্দর তাই না, দেখতেও সুন্দর। বয়স চল্লিশের মতো হবে। চুলে পাক ধরেছে। তার জন্যে মনে হয় ভদ্রলোককে আরো সুন্দর লাগছে। কিছু মানুষ আছে যাদের পাকা চুলে মানায়।

'আপনার মাথাধরার অবস্থা কী?'

'কমে আসছে।'

সানোয়ার সাহেব রহস্যময় গলায় বললেন, ‘এক মিনিটের জন্যে চোখটা বন্ধ করবেন?’

‘কেন?’

‘আপনার কপালে এবং চোখে একটা মলম লাগিয়ে দেব? বার্মিজ মলম। নাম টাইগার বাম। লাগাবার তিন মিনিটের মধ্যে মাথাধরা চলে যাবে।’

আমি চোখ বন্ধ করলাম। ভদ্রলোক চোখের পাতায় এবং কপালে বাম ঘষে দিলেন। খুবই আরামদায়ক ম্যাসাজ। ম্যাসাজের কারণেই মনে হয় ব্যথা অর্ধেক কমে গেল।

‘তিন মিনিট চোখ বন্ধ করে রাখবেন। খুলবেন না।’

আমি চোখ বন্ধ করেই বললাম— ‘আপনার দোকানে মাথাধরা নিয়ে যারা আসে তাদের সবার চোখেই কি আপনি টাইগার বাম ঘষে দেন?’

‘না, দেই না। আপনি লেখক মানুষ আপনার জন্যে অন্য ব্যবস্থা।’

‘ও আচ্ছা।’

চা চলে এল। চায়ের সঙ্গে গরম শিঙ্গাড়া। আগুনপরম শিঙ্গাড়া সব সময় ভালো হয়— এটা মনে হলো আরো ভালো। চা-টা শিঙ্গাড়ার মতো ভালো না হলেও খারাপ না। লেখক হিসেবে মাঝেমধ্যে অপ্রত্যাশিত কিছু খাতির-যত্ন পাই। বড় মাপের লেখকরা এ ধরনের খাতিরগুলোে বিব্রত এবং বিরক্ত হন। যেহেতু আমি খুবই ছোট মাপের একজন— আমি খুশি হই। অবিশ্যি চেষ্টা থাকে খুশি চেপে রাখার।

চা খেতে খেতে আমি ভদ্রলোকের বসার ঘর দেখলাম। তাঁর ফার্মেসির নামে যেমন রুটির পরিচয় পাওয়া যায়, ঘর থেকেও পাওয়া যায়। সুন্দর করে সাজানো ঘর। মেঝেতে কার্পেট। চারদিকে নানান ধরনের ইনডোর প্ল্যান্ট রাখা। একটা প্ল্যান্টে আবার বোতামের মতো নীল ফুল ফুটেছে। অপূর্ব দেখাচ্ছে। ব্যবসায়ী মানুষের বসার ঘরে সাধারণত প্ল্যান্ট দেখা যায় না। ভদ্রলোকের টেবিলে দু’টা বই, একটার নাম—

Doomsday

And

Life after death.

অন্যটার নাম পড়া যাচ্ছে না। সেটিও নিশ্চয় গল্প-উপন্যাসের বই না, সিরিয়াস কোনো বই। দেয়ালে ভদ্রলোকের যুবক কালের ছবি। সাইকেলে হেলান দিয়ে তোলা। ঠোঁটে সিগারেট।

সানোয়ার সাহেব বললেন, ‘আমার বাবার ছবি।’

‘আমি ভেবেছিলাম আপনার যুবক বয়সের ছবি।’

‘অনেকেই তাই ভাবেন। অফিসঘরে নিজের ছবি টাঙিয়ে রাখব এত অহঙ্কার এখনো আমার হয় নি।’

আমি বললাম, ‘আপনার বাবা অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। সিনেমার নায়কের মতো চেহারা।’

সানোয়ার সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, ‘আমার বাবা জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন ছবিতে ঢোকার কৌশল বের করতে গিয়ে। তিনি সকালবেলা এফডিসিতে ঢুকতেন, রাত এগারোটা-বারোটোর সময় ফিরতেন। যেতেন খুব সেজেগুজে।’

পরিচালকদের অ্যাসিস্ট্যান্টদের সিগারেট খাওয়াতেন। তাদের যে-কোনো ফরমাশ নিমেষের মধ্যে করে দিতেন। এর বিনিময়ে হঠাৎ হঠাৎ পাসিং শটে সুযোগ পেতেন।’

‘পাসিং শট মানে?’

‘পাসিং শট হচ্ছে—ধরুন ছবির কোনো দৃশ্য হচ্ছে। নায়ক-নায়িকা গল্প করছে। অনেক দূর দিয়ে একটা লোক হেঁটে চলে গেল। মূল গল্পের সঙ্গে সেই লোকের কোনো সম্পর্ক নেই। লোকটা হেঁটে যাওয়ায় ফ্রেমটা ভরাট লাগবে। সেই লোকের শটটাকে বলে পাসিং শট।’

‘ও আচ্ছা।’

‘পরিচালক বা প্রযোজকের নজরে পড়ার প্রাপ্য চেষ্টা একেবারে বিফলে গেল না। বাবা তাদের নজরে না পড়লেও একজন এক্সট্রা মেয়ের নজরে পড়লেন।’

‘এক্সট্রা মেয়ে মানে কী?’

‘নায়িকার অসংখ্য সখীরা হলো এক্সট্রা। নায়িকা যখন পানি তুলতে যায় তখন এরাও যায়। পানি তোলার পূর্বে যে কোমরদুলানি নৃত্য হয় সেই নৃত্যে তারা অংশগ্রহণ করে। বুঝতে পারছেন?’

‘হ্যাঁ পারছি।’

‘এক্সট্রা মেয়েটির সঙ্গে বাবার ঘনিষ্ঠতা অতি দ্রুত তুঙ্গ স্পর্শ করল। এবং এক শুভ দিনে বাবা তাকে বিয়ে করে ফেললেন। বাবার তখন সম্বলের মধ্যে আছে তাঁর সুন্দর চেহারা এবং একটা হারকিউলিস সাইকেল। সাইকেলের চাকায় হেলান দেয়া ছবিটা তো দেখতেই পাচ্ছেন। পাচ্ছেন না?’

‘পাচ্ছি।’

‘বাবার গল্প বলে আপনাকে মনে হয় খুব বোর করছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই গল্প শেষ হবে। আমার গাড়ির ড্রাইভার চলে এসেছে। আপনি যেখানে যেতে চান আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে।’

‘গাড়ি লাগবে না ভাই। আমি খুব কাছেই থাকি, হেঁটে চলে যাব।’

‘হেঁটে আপনাকে যেতে দেয়া হবে না। আপনাকে জোর করে হলেও গাড়িতে তুলে দেয়া হবে। আমার বাবার সম্পদের মধ্যে ছিল একটা

সেকেডহ্যান্ড সাইকেল আর আমার এখন তিনটা গাড়ি। আমি গাড়িগুলি ডিসপ্লে করব না?’

‘আপনার তিনটা গাড়ি?’

‘এই মুহূর্তে অবিশ্যি দু’টা। একটা বিক্রি করে দিয়েছি। তবে একটা লাক্সারি মাইক্রোবাস কিনব বলে ভাবছি। আপনি ভাববেন না ছোট এই ফার্মেসি থেকে এত আয় হয়। আমার অন্য ব্যবসা আছে। গুলশান এলাকায় একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট আছে। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের দালালি টাইপ কিছু কাজও করি, তবে আমি ব্যবসা শুরু করি ফার্মেসি দিয়ে।’

‘ও আচ্ছা।’

‘মূল গল্পটা শেষ করি। নিন সিগারেট খান। সিগারেট খেতে খেতে গল্প শুনুন। গল্পের শেষটা ইন্টারেস্টিং।’

আমি সিগারেট ধরালাম। এর মধ্যে আবার চা এল। এবারের চা খেতে ভালো। চায়ে চুমুক দিতে দিতে গল্প শুনছি। সানোয়ার সাহেবের গল্প বলার কায়দা ভালো। হড়বড় করে গল্প বলেন এবং মোক্ষম জায়গায় এসে দম নেন। আবার শুরু করেন। গল্পটা এমনভাবে বলেন যাতে মনে হয় গল্পটার প্রতি তিনি কোনো আকর্ষণ বোধ করছেন না। নেহায়েত গল্প করতে হয় বলে গল্প করছেন। গল্পটা করতে না পারলে তাঁর ভালো লাগত।

‘বাবা থাকতেন তাঁর এক দূরসম্পর্কের চাচার বাসায় খিলগাঁয়। যে চাচার বাসায় থাকতেন তাঁর ছোট মেয়েকে তিনি বিয়ে করবেন এ-রকম ধারণা বাবা সম্ভবত দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু বাবার সেই ধুরন্ধর চাচা বাবাকে এতদিন পুষতেন না। হঠাৎ একটা মেয়ে বিয়ে করে ফেলায় বাবার সেই চাচা তৎক্ষণাৎ বাবাকে বের করে দিলেন। নতুন বউ নিয়ে বাবা পড়লেন মহা বিপদে। এই আত্মীয়ের বাড়ি কয়েক দিন, সেই আত্মীয়ের বাড়ি কয়েক দিন এইভাবে দিন কাটাতে লাগলেন। ঢাকা শহরে যত আত্মীয় ছিল, সব কাভার করা হয়ে গেল।

বাবা ফ্লিমপাড়ায় কাজের চেষ্টা করতে লাগলেন। শো বিজনেসের সঙ্গে জড়িত কোনো কাজেই তাঁর আপত্তি নেই। ফ্লোর ঝাঁট দেয়া, আর্টিস্টের মাথায় ছাতা ধরা, ম্যাডামের স্যাভেল এগিয়ে দেয়া— সবকিছুতেই তিনি রাজি। প্রকাডশন বয়ের কাজ। গাধার খাটুনি, সেই তুলনায় বেতন নামমাত্র। খাওয়াটা অবিশ্যি ফ্রি পাওয়া যায়। সামান্য চুরির সুযোগও আছে। বাবা সেই সুযোগ কখনো নিতে পারেন নি। কারণ, মানুষ হিসেবে তিনি বোকা ছিলেন। বোকা মানুষরা সৎ হয় এটা জানেন তো? বোকাদের ভেতর চোর নেই বললেই হয়।

এই মহা দুর্যোগে বাবার এক ছেলে হয়ে গেল। ছেলের নাম রাখা হলো সানোয়ার হোসেন। বাবা আদর করে ছেলেকে ডাকতেন কয়লা বাবা।’

‘আপনিই সেই কয়লা বাবা?’

‘জি।’

‘আপনারা তখন থাকতেন কোথায়?’

‘বাবা এফডিসির কাছেই এক বস্তিতে ঘর ভাড়া করেছিলেন। ঘরের ভাড়া নামমাত্র। তবে সেই নামমাত্র ভাড়ার টাকা যোগাড় করাও বাবার কাছে অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল। গল্পটার প্রায় শেষ অংশে চলে এসেছি। আরেকটা সিগারেট ধরান। সিগারেট শেষ হতে হতে গল্প শেষ হয়ে যাবে।’

আমি বললাম, আপনি ধীরেসুস্থে গল্প শেষ করুন। আমার এমন কোনো তাড়া নেই। তা ছাড়া গল্পটা শুনতে ভালো লাগছে।

সানোয়ার সাহেব হাসিমুখে গল্প শুরু করলেন, ‘আমার জন্ম হয়েছিল এক ঈদের দিনের ভোরবেলায়। সেই কারণে বাবার ধারণা হয়েছিল তাঁর ছেলে সৌভাগ্যবান। সে তার বাবার ভাগ্য বদলে দেবে। সেরকম কিছু লক্ষণও দেখা দিল। আমি সাত দিন বয়স থেকেই রোজগার শুরু করলাম। আমার চেয়ে অল্প বয়সে কেউ রোজগার করতে নেমেছে বলে আমি জানিনা। গিনিস রেকর্ড বুকে আমার নাম যাওয়া উচিত ছিল।’

‘সাত দিন বয়সে রোজগার মানে? কী রকম রোজগার?’

‘অভিনয় করে রোজগার। ফ্লিম লাইনে নবজন্ম শিশু প্রায়ই লাগে। নায়িকার বাচ্চা হয়েছে। সেই বাচ্চা চুরি হয়ে গেলে। এ ধরনের গল্পে বাচ্চা লাগবে। আমি হলাম সেই বাচ্চা। অভিনয় করার দরকার নেই। হাত-পা নাড়তে পারলেই হলো, চিৎকার করে কাঁদতে পারলেই হলো। সাত দিন বয়সে আমি প্রথম ছবি করতে নামলাম— ছবির নাম ডালিম কুমার। আমিই সেই ডালিম কুমার।’

‘ইন্টারেস্টিং তো!’

‘হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং তো বটেই। আমার দু’ নম্বর ছবির নাম— কমলা সুন্দরী। দু’ নম্বর ছবি করতে গিয়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। শীতের রাতে শুটিং হচ্ছিল। দৃশ্যটা এরকম— জানুয়ার পর আমাকে একটা খলুইয়ে ভরে জঙ্গলে ফেলে আমার দুঃখিনী মা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। আমি খলুইয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছি। বনের পশুপাখি আমাকে দেখে যাচ্ছে। একসময় আমার ঘুম ভাঙল। আমি কাঁদতে শুরু করলাম। সেই দেশের রাজা আবার ঠিক তখনই মৃগয়ায় এসেছিলেন। তিনি আমার কান্নার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে আমাকে খলুই থেকে তুলে নিয়ে গেলেন। তিনিই আমার কমলার মতো রূপ দেখে আমার নাম দিলেন কমলা সুন্দরী। এই ছবিতে আমি মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।’

‘হ্যাঁ বুঝতে পারছি।’

‘কমলা সুন্দরীতে অভিনয় করতে গিয়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। শীতের রাত। অনেকগুলি টেক নিতে হয়েছে। আমার গায়ে কোনো কাপড় ছিল না।

বুকে ঠাণ্ডা বেঁধে গেল। জীবন-মরণ সমস্যা দেখা দিল। আমাকে ভর্তি করাতে হলো হাসপাতালে। এর মধ্যে বস্তির বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে। বাড়িওয়ালা সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা এসে শাসাচ্ছে— সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলে “ঘোর অমানিশা”। তখন হঠাৎ আমার বাবার কপাল খুলল। চিত্রজগতের একজন খুন হলেন।’

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, চিত্রজগতের একজন খুন হবার সঙ্গে আপনার বাবার কপাল খোলার ব্যাপারটা ধরতে পারছি না।

সানোয়ার সাহেব হাসিমুখে বললেন, ‘ধরিয়ে দিচ্ছি। এমন কিছু জটিল ব্যাপার না। আপনি কি জানেন শাস্তি কেনাবেচা হয়? একজনের শাস্তি অন্যজন টাকার বিনিময়ে নিজের ঘাড়ে নিয়ে নেয়। অপরাধীর শাস্তি হয় না— টাকা খেয়ে যে অপরাধ নিজের ঘাড়ে নিয়েছে তার শাস্তি হয়।’

‘আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না।’

‘আরো সহজ করে ব্যাখ্যা করি। ধরুন আপনি ক্লাসে পড়া পারেন নি। শাস্তি হিসেবে আপনার গালে চড় দেবার কথা। সেই চড় আপনার হয়ে অন্য কেউ খেল। আপনার কিছু হলো না।’

‘এরকম কি হয়?’

‘অবশ্যই হয়। শাস্তি কেনাবেচার মার্কেট আছে। আপনার যদি প্রচুর টাকা থাকে আপনি খুন করতে পারেন। নিজের হাতেই করতে পারেন। আপনাকে তার জন্যে শাস্তি পেতে হবে না। অন্য একজন আপনার হয়ে ফাঁসিতে ঝুলবে।’

আমি হতভম্ব হয়ে সানোয়ার সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি সহজ গলায় বললেন, ‘আমার বাবা ঠিক এই কাজটি করলেন। তিনি পুলিশের কাছে বললেন, খুন তিনি করেছেন। কীভাবে খুনটা করেছেন তার বিশদ বর্ণনা দিলেন। তাঁর কথামতো যে ছুরিতে খুন করা হয়েছে সেই ছুরি বাবার বস্তির বাসার মুড়ির টিনের ভেতর থেকে খসে বের হলো। অন্যের অপরাধে তার বিচার শুরু হলো। বিনিময়ে তিনি তাঁর পরিবারের জন্যে রেখে গেলেন চার লাখ দশ হাজার টাকা।’

‘আপনার বাবার কী শাস্তি হয়েছিল?’

‘উনার ফাঁসি হয়েছিল। ভাই আমার গল্প শেষ হয়েছে। আপনার জন্যে গাড়ি রেডি আছে। আপনাকে নিয়ে যাবে।’

আমি বিড়বিড় করে বললাম, ‘আই অ্যাম সরি।’

সানোয়ার সাহেব আমার দিকে রাগী চোখে তাকালেন। মনে হলো তিনি হঠাৎ রেগে গেলেন। আবার সেই রাগ সামলে নিয়ে বললেন, ‘বাবার মামলা সাড়ে চার বছর ধরে চলেছে। বাবার যখন ফাঁসি হয় তখন আমার বয়স পাঁচ। ফাঁসির আগে আগে আমাকে কোলে নিয়ে মা বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। বাবা আমাকে অনেক আদর করলেন। বাবার সম্পর্কে আমার কোনো স্মৃতি নেই— শুধু আদরটা মনে আছে। আদর করতে করতে তিনি বলছিলেন— কুটু

কুটু মুটু মুটু ভুটু ভুটু ।’

আমি চুপ করে আছি। গল্পের শেষটা এ রকম নাটকীয় হবে ভাবতে পারি নি। ভদ্রলোকের সামনে বসে থাকতে তখন আর ভালো লাগছে না। কোনো ছুতায় উঠে যেতে পারলে ভালো হয়। তেমন কোনো ছুতাও পাচ্ছি না।

সানোয়ার সাহেব বললেন, ‘গল্পটা কেমন লাগল?’

আমি প্রশ্নের জবাব দিলাম না। চুপ করে রইলাম। সানোয়ার সাহেব থেমে থেমে বললেন, ‘আপনি গল্পকার মানুষ। ইন্টারেস্টিং গল্প আপনারা তৈরি করেন— ছোট প্রাণ ছোট কথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা টাইপ। আমার গল্পটা কি আপনাদের ছোটগল্পের থিওরিতে পড়ে?’

আমি বললাম, ‘ভাই আজ উঠি, আরেক দিন এসে কথা বলব।’

সানোয়ার সাহেব শান্ত গলায় বললেন, ‘গল্প শেষ হবার পরেও কিন্তু কিছু বাকি থাকে। সেটাকে বলে পরিশিষ্ট। আমার গল্পটার একটা পরিশিষ্ট আছে। পরিশিষ্টটা শুনে যান।’

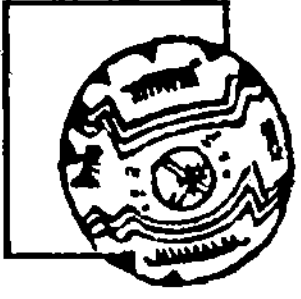
‘বলুন শুনছি।’

‘আমার বাবা আসলে ছিলেন ভাগ্যবান মানুষ। সাধারণ মানুষের বেশির ভাগ স্বপ্নই অপূর্ণ থাকে। শুধু ভাগ্যবান মানুষের সব স্বপ্ন পূর্ণ হয়। বাবার সব স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছিল সেই অর্থে তিনি ভাগ্যবান। তিনি তাঁর ছেলেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন ছেলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। তিনি নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন সিকেমার নায়ক হবেন। তাঁর বেলায় সেই স্বপ্ন না পূর্ণ না হলেও তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয়। আমার মা বেশকিটি ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন।’

‘ও।’

‘যার খুনের শাস্তি বাবা ঘাড় পেতে নিয়েছিলেন— সেই লোকই মাকে এইসব সুযোগ করে দেয়। মজার ব্যাপার হলো মা তাকে বিয়েও করেন। নায়িকারা ছবির প্রডিউসারকে বিয়ে করেই থাকে। এটা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না। আপনি কী বলেন?’

সানোয়ার সাহেব উত্তরের আশায় আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি তাকিয়ে আছি হারকিউলিস সাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর বাবার দিকে।



অন্তরার বাবা

মফিজউদ্দিন সাহেব নির্বিরোধী মানুষ। প্রাইভেট ব্যাংকে ফরেন এক্সচেঞ্জ বিভাগে কাজ করেন। ঢাকার মালিবাগে ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকেন। চিপা গলির ভেতর ফ্ল্যাট। গাড়ি ঢোকে না বলে বেশ সস্তা। চার রুমের বাইশ শ স্বয়ার ফিটের ফ্ল্যাট। ভাড়া তিন হাজার টাকা। মফিজউদ্দিন সাহেবের সংসার ছোট। স্ত্রী, দুই মেয়ে, এক ছেলে। বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। কানাডায় স্বামীর সঙ্গে থাকে। ছোট মেয়েটিরও বিয়ের কথা হচ্ছে। পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখে গেছে। ফাইন্যান্স কিছু না বললেও মেয়ে যে তাদের খুব পছন্দ এটা বোঝা যাচ্ছে। ছেলেটাও পড়াশোনায় ভালো। জুলাই মাসে অনার্স পরীক্ষা দেবে। পাস করে বের হয়ে কোথাও চাকরি না পেলে ব্যাংকে চাকরি হবেই। মফিজউদ্দিন সাহেব তাঁর ব্যাংকের এমডি সাহেবকে বলে রেখেছেন।

কাজেই মফিজউদ্দিন সাহেবকে মোটামুটি সফল এবং সুখী মানুষ বলা যেতে পারে। তাঁর স্ত্রী-ভাগ্যও ভালো। রেহানা অতি শান্ত স্বভাবের মেয়ে। স্বামীর সঙ্গে তাঁর যে ঝগড়াটগড়া হয় না তা নীচ মাঝেমধ্যে হয়। তবে তখনো মফিজ সাহেবের কী দরকার কী দরকার যা তাঁর দিকে কঠিন নজর থাকে।

ব্যাংক থেকে ফিরতে মফিজ সাহেবের রোজই সন্ধ্যা সাতটা-আটটা বেজে যায়। তিনি ফিরেই গরম পানি দিয়ে গোসল করেন। গোসল সেরেই খেতে বসেন। খাওয়া শেষ করে মিনিট দশেক চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন, তারপর এসে টিভির সামনে বসেন। নাটক থাকলে দেখেন। নাটক না থাকলে ভিসিপিটে হিন্দি ছবি দেখেন। পুরোনো ছবি দুবার-তিনবার করে দেখতেও তাঁর কোনো আপত্তি নেই। তবে পুরোনো ছবি যেন তাঁকে দেখতে না হয় রেহানার সেদিকেও নজর আছে। বাসায় কেউ না থাকলে তিনি নিজেই ভিডিও ক্লাব থেকে ছবি নিয়ে আসেন। হিন্দি ছবি দেখার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই, তবু স্বামীকে খুশি করার জন্যে তিনি বলেন, ‘নাচ-গান আসলে আমাকে ডাক দিও তো। তোমার সঙ্গে বসে দেখব।’ মফিজ সাহেব সুবোধ স্বামীর মতো নাচ-গানের জায়গা এলে স্ত্রীকে ডাকেন।

স্বামী-স্ত্রীর সাংসারিক কথাবার্তা ছবি দেখার সময়ই হয়। কারণ, মফিজ সাহেব ছবি শেষ করেই ঘুমাতে যান। তাঁকে খুব ভোরে উঠতে হয়। প্রাইভেট ব্যাংক, ন’টা থেকে ব্যাংকিং আওয়ার।

মফিজ সাহেবেরও জীবনযাত্রা এভাবেই চলছিল। এক বুধবারে সামান্য ব্যতিক্রম হলো। তিনি পলিথিনের এক পোঁটলা নিয়ে অফিস থেকে ফিরে যথারীতি গোসল করতে গেলেন। গোসলের মাঝখানে রেহানা বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন, ‘পোঁটলার ভেতর কাপড় কীসের?’

মফিজ সাহেব বললেন, ‘আমার কাপড়।’

‘তোমার কী কাপড়?’

‘কিনলাম আর কি!’

‘কিনবে তো বটেই। বিনা টাকায় তোমাকে কে কাপড় দিবে? কীসের কাপড়?’

‘কাফনের কাপড়।’

‘কাফনের কাপড় মানে কী?’

মফিজ সাহেব জবাব দিলেন না। মাথায় পানি ঢালতে লাগলেন। রেহানা বললেন, ‘জবাব দিচ্ছ না কেন কাফনের কাপড় মানে কী? বাবু কাফনের কাপড়? তোমার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কি মারা গেছ নাকি যে তোমার কাফনের কাপড়? গোসলটা একটু বন্ধ রেখে কথার জবাব দাও তো।’

‘আমার এক কলিগ হজ করতে গিয়েছিলেন। তাকে আনতে বলেছিলাম।’

‘মক্কা থেকে তোমার জন্যে কাফনের কাপড় আনতে বলেছ? কেন দেশে সাদা কাপড় পাওয়া যায় না?’

‘কাবা শরিফ ছুঁয়ায়ে এনেছে।’

‘কাবা শরিফ ছুঁয়ায়ে তোমার জন্যে কাফনের কাপড় আনতে হবে কেন?’

মফিজ সাহেব গোসল শেষ করে বের হলেন। শান্ত গলায় বললেন, ‘ভাত দাও।’

‘ভাত দাও মানে? তুমি আগে বল কাফনের কাপড় কী মনে করে আনালে?’

মফিজ সাহেব জবাব দিলেন না। খাবার টেবিলের দিকে রওনা হলেন।

বিয়ের কথা ঠিকঠাক হবার পর কোনো এক বিচিত্র কারণে মেয়েরা বাবার দিকে চলে আসে। অতিরিক্ত মমতা দেখায়। খানিকটা অহুদীও করে। মফিজউদ্দিন সাহেবের মেয়ে অন্তরার ভেতরও এই ব্যাপার হয়েছে। সে তার ঘরে বসে ছিল। মায়ের চোঁচামেচি শুনে বিরক্ত মুখে বলল, ‘এ রকম করছ কেন মা?’

রেহানা বললেন, ‘কী করছি? তোর বাবা কী করেছে শুনতে পাস নি? কাফনের কাপড় নিয়ে এসেছে।’

‘কী হয়েছে তাতে? অনেকেই আনে। শুধু শুধু চোঁচিও না তো মা। একটা মানুষ সারা দিন অফিস করে এসেছে তাকে তুমি রেস্ট দেবে না? চিৎকার করে মাথার পোকা নড়িয়ে দিচ্ছ।’

‘এই কাফনের কাপড় আমি কিন্তু ঘরে রাখব না।’

‘আচ্ছা রেখো না। এখন দয়া করে চিৎকার থামাও। ভাত খাবার পর বাবা মুভি দেখবে— নতুন কিছু এনেছ? না আনলে স্লিপ দিয়ে কাজের মেয়েটাকে পাঠাও। বেচারি রোজ পুরোনো মুভি দেখে, আমার খুব খারাপ লাগে। মাদার ইন্ডিয়া ছবিটা এই নিয়ে তিনবার দেখল। তিনবার দেখার মতো কী আছে?’

অন্তরা তার বাবার খাবার সময়ও কিছুক্ষণ সামনে বসে রইল। প্লেটে ভাত তুলে দিল। মফিজউদ্দিন সাহেব নিঃশব্দে খেয়ে গেলেন। এমনিতেই তিনি কথা কম বলেন, খাবার সময় একেবারেই বলেন না।

মফিজউদ্দিন খেয়েদেয়ে অন্য দিনের মতো রেস্ট নিতে গেলেন না। সরাসরি ছবি দেখতে গেলেন। অন্তরা টেলিফোন নিয়ে তার নিজের ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে দিল। যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে রোজ রাত ন’টার সময় সে টেলিফোন করে। টেলিফোনে এক ঘণ্টার মতো কথা হয়। এক ঘণ্টা কথায় অনেক কিছু চলে আসে। অন্তরা তার বাবার কাফনের কাপড় কেনার প্রসঙ্গ নিয়ে এল—

‘এই জান আজ কী হয়েছে? ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়েছে।’

‘কী হয়েছে?’

‘আমার বাবা অর্থাৎ তোমার শ্বশুর সাহেব ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড করেছেন।’

‘কী কাণ্ড?’

‘আন্দাজ কর তো, দেখি পার কি না।’

‘আন্দাজ করতে পারছি না। উনি কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড করেছেন?’

‘উনি বলছ কেন?’

‘উনি বলব না তো কী বলব?’

‘বাবা বলবে।’

‘এখনই বাবা বলব না কি?’

‘হ্যাঁ, এখনই বাবা বলবে। আমি তো তোমার মাকে এখনই মা বলি।’

‘কবে মা বলবে?’

‘ওমা এর মধ্যে ভুলে গেছ! কাল আমি জিজ্ঞেস করলাম না, মা কেমন আছেন। আমি কি বলেছি তোমার মা কেমন আছেন?’

‘ও আচ্ছা। এখন মনে পড়েছে।’

‘তোমার এমন ভুলোমন, কোন দিন আমাকে ভুলে যাবে! কে জানে হয়তো এখনই ভুলে যাবে। বল তো আমার নাম কী?’

‘আসলেই তো ভুলে গেছি— তোমার নাম যেন কী?’

‘ফাজলামি করবে না তো।’

‘আচ্ছা যাও ফাজলামি করব না। তোমাদের বাসায় ভয়ঙ্কর ব্যাপার কী হলো তা কিন্তু এখনো বল নি।’

‘আমার বাবা কাফনের কাপড় কিনে নিয়ে এসেছেন।’

‘সে কি! কার জন্যে?’

‘কার জন্যে আবার, নিজের জন্যে।’

‘বল কি! মাথা খারাপ নাকি?’

‘নিজের শ্বশুর সম্পর্কে এসব কী বলছ, ছিঃ!’

‘আই অ্যাম সরি। তবে অন্তরা শোনো কাফনের কাপড় কিন্তু অনেকেই কেনে। আমার এক দূরসম্পর্কের নানা কিনেছিলেন। শেষে দেখা গেল—তঁার সংসারের সবাই মারা গেছে তিনি শুধু বেঁচে আছেন। তাঁর আর মৃত্যু হচ্ছে না।’

‘আসলে বাবা হচ্ছেন খুবই স্ট্রেঞ্জ মানুষ। তিনি নিজের মতো থাকেন। অফিস করেন। কোনো বিষয়ে তাঁর কোনো কমপ্লেইন নেই।’

‘কাফনের কাপড় কিনে এনে কী বললেন?’

‘কিছুই বলেন নি। তিনি নিজের মতো আছেন। এখন ছবি দেখছেন।’

‘কার ছবি দেখছেন?’

‘ভিসিআর-এ ছবি দেখছেন। বাবার এই একটা শখ—ছবি দেখা। এখন দেখছেন ঠাণ্ডি হাওয়া। তুমি ঠাণ্ডি হাওয়া দেখেছ?’

‘না।’

‘গানগুলি এত সুন্দর। শুনলে পাগল হয়ে যেতে হয়। আচ্ছা আমি তোমাকে ক্যাসেট পাঠিয়ে দেব।’

‘পাঠিয়ে দিতে হবে না। আমি নিজে এসে নিয়ে যাব।’

‘খবরদার এই কাজ করবে না। নিজের আগে শ্বশুরবাড়িতে ঘোরাঘুরি আমার খুব অপছন্দ।’

‘অপছন্দ হলেও এই কাজটা আমাকে করতে হবে। রাজকন্যাকে না দেখে আমি থাকতে পারছি না।’

‘খবরদার ঢং করবে না। আচ্ছা তুমি এত ঢং কোথায় শিখেছ?’

‘আমার ইচ্ছা করছে এখনই চলে আসি। আমি গোপনে এসে চুপ করে তোমার দরজায় ঢোকা দেব। তুমি দরজা খুলতেই ঝপাং।’

‘ঝপাং মানে?’

‘ঝপাং করে তোমার গায়ে লাফিয়ে পড়ব।’

‘এই শোন তুমি কিন্তু কথাবার্তা অসভ্য দিকে নিয়ে যাচ্ছ। এ রকম করলে আমি কিন্তু টেলিফোন রেখে দেব।’

‘উঁহু রাখতে পারবে না। কারণ, আমাদের কথা হয়েছিল আমি একটা অসভ্য কথা বলতে পারি।’

‘একটা বলে ফেলেছ আর পারবে না।’

‘এখনও বলি নি।’

‘আমি কিন্তু টেলিফোন রেখে দিচ্ছি। এই রাখলাম, ওয়ান, টু, থ্রি।’

অন্তরা টেলিফোন নামিয়ে রিংগার অফ করে দিল। ওপাশ থেকে টেলিফোন

করে করে ক্লান্ত হোক। মজা বুঝুক। রাত বারটার পর অন্তরা নিজেই করবে। এর মধ্যে অসভ্য কথা বলার জন্যে বাবু সাহেবের যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে যাবে।

অন্তরা মাকে নিয়ে খেতে বসল। সাজ্জাদ বাসায় নেই। সে তার বন্ধুর বাড়িতে পড়াশোনা করতে গিয়েছে। পড়াশোনা শেষ করে রাতে সেখানেই থেকে যাবে। অন্তরা বলল, ‘কাজের মেয়েটাকে বল তো মা বাবাকে এক কাপ চা দিয়ে আসুক। ছবি দেখার সময় চা খেতে ভালো লাগে।’

রেহানা বললেন, ‘তোমার বাবার চা-কফি কিছুই লাগে না। কাপে করে গরম পানি দিয়ে আয়। চুকচুক করে গরম পানি খাবে আর ছবি দেখবে। ছবিও কিন্তু দেখে না। ঘটনা কী জিজ্ঞেস কর, বলতে পারবে না।’

‘কী যে তুমি বল! কেন বলতে পারবে না?’

‘তাকিয়ে থাকার জন্যে তাকিয়ে থাকা।’

‘তুমি বাবার ওপর রেগে আছ বলে এ-রকম কথা বলছ।’

‘রাগের মতো কাজ করলে আমি রাগব না!’

‘বাবা মোটেই রাগের মতো কাণ্ড করেনি। কাফনের কাপড় অনেকেই কেনে। আমার এক খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডের নানা কিনেছিলেন। তার পর কী হয়েছে শোন মা। তাঁর সংসারের সবাই একে-একে মরে গেলেন। তিনি শুধু বেঁচে রইলেন। অমর হয়ে গেলেন। বাবার বেলাতেও বোধহয় এ-রকম হবে। দেখা যাবে বাবা বেঁচে আছেন। আমরা সবাই মরে ভূত হয়ে গেছি। হি-হি-হি।’

রেহানা মুখ কালো করে বললেন, ‘হাসি কেন? হাসির কী হলো?’

‘হাসি আসছে আমি করব কী? মাংগো কী অদ্ভুত দৃশ্য বাবা কাফনের কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমরা সবাই মরে ভূত হয়ে বিভিন্ন গাছে বাস করছি! হি-হি-হি।’

‘হাসি বন্ধ কর। বন্ধ কর বললাম।’

অন্তরা হাসি বন্ধ করতে পারল না। হাসির ফাঁকে ফাঁকে বলল, ‘মা, ভূত হয়ে আমি কিন্তু বগমভিলিয়া গাছটায় থাকব তুমি অন্য কোনো গাছ বেছে নাও। হি-হি-হি।’

অন্তরার ইচ্ছা করছে ভূতবিষয়ক এই মজার ব্যাপারটা এম্ফুনি টেলিফোন করে আসল মানুষটাকে জানায়। তবে ইচ্ছা করলেও এই কাজটা সে এখন করবে না। রাত বারোটোর আগে অবশ্যই না। রাত বারোটো পর্যন্ত বাবু সাহেব টেলিফোনে আঙুল টিপে টিপে ক্লান্ত হয়ে নিক। অসভ্য কথা বলার মজাটা টের পাক।

রেহানা ঘরের কাজ শেষ করে ঘুমাতে যাবার আগে ঘড়ির দিকে তাকালেন, দশটা বেজে এগারো মিনিট। অন্তরার বাবা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠিক দশটায় সে দাঁত মেজে বিছানায় যায়। তার বিছানায় যাওয়া মানেই ঘুম। তখন ডাকলে ‘উ’ করে সাড়া দেয় ঠিকই, কিন্তু সেই সাড়া দেয়াটাও হয় ঘুমের মধ্যে।

আশ্চর্য একটা মানুষ। সংসারে কী হচ্ছে কী না হচ্ছে কোনো খোঁজ নেই। ছেলেটা আজ বাসায় নেই এটাও তাঁর চোখে পড়ল না। চোখে পড়লেও অবিশ্যি কিছু হবে না। জিজ্ঞেস করবে না, সে কোথায়। বাসায় একটা বিয়ে হচ্ছে। জিনিসপত্র কেনাকাটা আছে। বিয়ের তারিখ ঠিক করা আছে—কোনোটোর সঙ্গে কোনো যোগ নেই। সে আছে নিজের মতো, মাস শেষে বেতনের টাকাটা তুলে দিলেই যেন সব দায়িত্ব শেষ। এ-রকম মানুষের আসলে সংসার করাই ঠিক না। এরা আসলে মানুষও না। ঘরের আসবাব। সংসারে এদের ভূমিকা ফার্নিচারের মতো। জায়গামতো ফার্নিচারটা বসিয়ে দাও। মাঝেমধ্যে ঝাড়া দিয়ে ঝেড়ে ধুলা উড়িয়ে দাও—সব ঠিক।

রেহানা পান মুখে দিয়ে অন্তরার ঘরের দিকে গেলেন। তাঁরও কথা বলার মানুষ নেই। মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা। সেই সুযোগও বেশি দিন পাওয়া যাচ্ছে না। বিয়ে হয়ে মেয়ে চলে যাচ্ছে।

রেহানা অন্তরার ঘরে ঢুকতেই অন্তরা বলল, ‘মা আজ তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারব না। আজ যাও তো।’

‘কী করবি? টেলিফোন নিয়ে বসবি?’

‘টেলিফোন নিয়ে বসব মানে, আমি কি সারাদিন টেলিফোন নিয়ে থাকি?’

‘যখনই তোর ঘরের সামনে দিয়ে যাই তখনই দেখি গুটুরগুটুর করছিস। বিয়ের আগে এত কথা বলে ফেললে বিয়ের পর কী বলবি?’

‘আশ্চর্য কথা! তোমার ধারণা দেখে অবাক হচ্ছি মা। তুমি ভাবছ আমি ওর সঙ্গে কথা বলি? আমার এত কী দায় পড়েছে? আজ সে টেলিফোন করেছিল। আমি মুখের ওপর টেলিফোন রেখে দিয়ে রিংগার অফ করে দিয়েছি যাতে টেলিফোন করলেও আমাকে ধরতে না হয়।’

‘সে কি! কেন?’

‘আমার কথা বলতে ইচ্ছা করে না এইজন্যে।’

‘এটা তো ঠিক মা, মুখের ওপর টেলিফোন রেখে দিবি কেন?’

‘কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক না তা নিয়ে তোমাকে বক্তৃতা দিতে হবে না মা। প্লিজ তুমি এখন যাও। তোমাকে অসহ্য লাগছে।’

‘কেন, আমি কী করলাম?’

‘তুমি কী করলে আমি জানি না। আমি শুধু জানি—এ বাড়ির সবাইকে আমার অসহ্য লাগছে।’

রেহানা মুখ কালো করে মেয়ের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। নিজের শোবার ঘরে ঢুকে চমকে গেলেন। কারণ, অন্তরার বাবা এখনো জেগে আছে। তারচেয়ে বড় কথা তাঁর সামনে কাফনের কাপড় বিছানো। কাপড়টা প্যাকেট থেকে বের করা হয়েছে। রেহানা বললেন, ‘জেগে আছ কেন?’

মফিজউদ্দিন বিড়বিড় করে বললেন, ‘ঘুম আসছে না।’

‘সামনে কাপড় নিয়ে বসে আছ কেন?’

‘মেপে দেখলাম। মনে হচ্ছে কাপড় একটু শর্ট পড়বে।’

‘মাপলে কীভাবে? বাজার থেকে গজফিতাও নিয়ে এসেছ?’

‘হাত দিয়ে মাপলাম। তিন হাত হচ্ছে এক গজ।’

রেহানা স্বামীর সামনে বসতে বসতে বললেন, ‘তোমার কী হয়েছে ঠিকমতো বল তো।’

‘কিছু হয় নাই।’

‘অবশ্যই হয়েছে। তোমার চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা হয়েছে। কাফনের কাপড় কেন কিনলে বল?’

‘কাজ আগিয়ে রাখলাম। যেদিন মারা যাব সেদিন যদি হরতাল থাকে তাহলে দোকানপাট থাকবে বন্ধ।’

‘কবরের গর্তও খুঁড়িয়ে রাখ। হরতালের দিন কবর খোদার লোক যদি না পাওয়া যায়!’

মফিজউদ্দিন কিছু বললেন না। রেহানা বললেন, ‘আস ঘুমাতে আস। আর খবরদার তুমি এই কাপড়ে হাত দেবে না।’

‘আচ্ছা।’

‘এই কাপড়ের প্রসঙ্গ মুখেও আনবে না।’

‘আচ্ছা।’

রেহানা স্বামীকে নিয়ে ঘুমাতে গেলেন। ইচ্ছা করে আজ ঘনিষ্ঠ হলেন। স্বামীর গায়ে হাত রেখে আদুরে গলায় বললেন, ‘এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ এ-রকম তো কখনো হয় না। বিশেষ কিছু প্রয়োজন থাকলে বল। লজ্জা করার দরকার নেই। কিছু লাগবে?’

‘না।’

‘আচ্ছা বেশ ঘুমাবার আগে পাঁচ-দশ মিনিট গল্প কর। নাকি তাও করবে না?’

‘কী গল্প?’

‘যা ইচ্ছা বল। আজকে যে ছবিটা দেখলে সেই গল্প বলতে পার। অফিসের গল্প বলতে পার। তোমাদের অফিসে মজার কিছু হয় না?’

‘না।’

‘কোনো গল্প করতে ইচ্ছা করছে না?’

মফিজউদ্দিন ক্ষীণ স্বরে বললেন, ‘একটা গল্প করছে ইচ্ছা করতে কিন্তু তুমি রাগ করবে।’

‘না রাগ করব না, বল।’

‘কাফনের কাপড় নিয়ে গল্প। পুরুষদের কাফনের কাপড় লাগে তিনটা। এদের আলাদা আলাদা নাম আছে। একটা হলো পিরহান। ঘাড় থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। আরেকটাকে বলে ইজার। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ইজার দিয়ে ঢাকা

হয়। আরেকটাকে বলে লেফাফা। এই ইজারের মতোই। শুনছ?’

‘হ্যাঁ শুনছি।’

‘মেয়েদের কাপড় লাগে পাঁচটা। পিরহান, ইজার, লেফাফা তো আছেই, তার ওপর বাড়তি হলো— ছের বন্দ। ছের বন্দ দিয়ে মাথার চুল জড়িয়ে দিতে হয়। আর হলো সিনা বন্দ। সিনা বন্দ দিয়ে বুক থেকে উরু পর্যন্ত ঢাকা হয়।’

রেহানা থমথমে গলায় বললেন, আরো কিছু বলবে? মফিজউদ্দিন বললেন, ‘কাফনের কাপড়ের আরেকটা মজার ব্যাপার আছে। হিজড়াদের মেয়েদের মতো কাফনের কাপড় পরাতে হয়। ওদেরও পাঁচ টুকরা কাপড় লাগে।’

‘ও।’

‘আর পুরুষত্ব নেই পুরুষ, যারা নপুংসক তাদের জন্যেও পাঁচটা কাপড় লাগে।’

‘যথেষ্ট কথা বলেছ। আর না এখন ঘুমাতে যাও।’

‘ঘুম আসছে না।’

‘ঘুম না আসলে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি কর। কিংবা ছবি দেখ। অন্তরাকে বল ভিসিআর ছেড়ে দেবে।’

‘ভিসিআর আমি নিজেই ছাড়তে পারি।’

‘তা হলে তো ভালোই।’

মফিজউদ্দিন বিছানা থেকে নেমে পড়লেন। রেহানাও নামলেন— তাঁর মাথা চড়ে গেছে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে হবে। ঘুমের ওষুধ খেলেও হয়তো ঘুম হবে না।

রাত বারোটা বাজে। অন্তরা টেলিফোন করল। একটা রিং হতেই ওপাশ থেকে রিসিভার তুলল। অন্তরা বলল, ‘ঘুমিয়ে পড়েছিলে?’

‘ঘুমাব মানে? তুমি এমন খট করে টেলিফোন রেখে দিলে।’

‘তুমি অসভ্য কথা বলবে আর আমি টেলিফোন ধরে থাকব। আমি এ-রকম মেয়েই না। এই শোম আমার না মনটা খুব খারাপ।’

‘কেন?’

‘মার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি এইজন্যে মন খারাপ।’

‘খারাপ ব্যবহার করেছ কেন? উনি কী করেছিলেন?’

‘আমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছিল।’

‘গল্প করতে এলে খারাপ ব্যবহার করবে কেন?’

‘মাকে তো তুমি চেন না। মা বিরাট গল্পবাজ। একবার গল্প শুরু করলে আর থামবে না। গল্প করেই যাবে।’

‘তাতে অসুবিধা কী? তুমি গল্প করতে।’

‘মার সঙ্গে গল্প করলে আমি তোমার সঙ্গে কখন গল্প করব? এখন একটা কথা আমার বলতে ইচ্ছা করছে কিন্তু বললে তুমি মাথায় উঠে যাবে। এইজন্যে

বলব না।’

‘প্রিজ বল।’

‘কথাটা হচ্ছে—তুমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে আমার কথা বলতে ভালো লাগে না।’

‘মিথ্যা কথা।’

অন্তরা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, ‘তুমি আমার কথা বিশ্বাস করলে না?’

‘ওপাশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে বলা হলো, বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করব না কেন?’

‘তা হলে কেন বললে—মিথ্যা কথা।’

‘এমনি বললাম, মজা করার জন্যে বললাম।’

‘খবরদার আর বলবে না।’

‘আচ্ছা যাও আর বলব না।’

‘প্রমিজ!’

‘প্রমিজ।’

‘একটু ধর তো এক মিনিট।’

‘কোথায় যাচ্ছ?’

‘বসার ঘরে ভিসিআর চলছে। দেখে আসি কী ব্যাপার।’

‘এত রাতে কে ছবি দেখছে?’

‘সেটাই তো বুঝতে পারছি না, তুমি ধর তো।’

অন্তরা বসার ঘরে ঢুকল। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল। মফিজউদ্দিন সাহেব ভিসিআর দেখছেন। তাঁর গায়ে কাফনের কাপড়। তিনি শুয়ে আছেন লম্বা হয়ে। মাথার নিচে বালিশ দেয়া যাচ্ছে ভিসিআর দেখতে অসুবিধা না হয়। অন্তরা কাঁপা গলায় ডাকল, ‘বাবা!’

মফিজউদ্দিন মেয়ের দিকে এক পলক তাকিয়েই টিভি পর্দার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন।

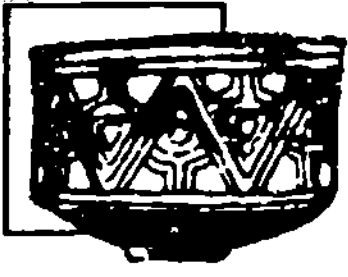
অন্তরা বলল, ‘তুমি কী পরে আছ বাবা?’

মফিজউদ্দিন টিভি পর্দা থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই বললেন, ‘কাপড়টা পরে দেখলাম ফিটিং হয় কি না। ভালো ফিটিং হয়েছে।’

অন্তরা সারা বাড়ি কাঁপিয়ে বিকট চিৎকার দিল। গলা ফাটিয়ে ডাকল, ‘মা... মা...।’

মফিজউদ্দিন সাহেবের তাতে কোনো ভাবান্তর হলো না।

কাফনে মোড়া একজন মানুষ, শুধু মুখটা বের হয়ে আছে। চোখ খোলা। সেই চোখ তাকিয়ে আছে টিভি পর্দার দিকে। টিভি পর্দার আলো এসে চোখে পড়েছে। তাঁর চোখ চকচক করছে।



তাহারা

নিউরোলজির অধ্যাপক রহমান খান খুবই বিরক্ত হচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছা করছে সামনে বসে থাকা বেকুবটার গালে শক্ত করে থাপ্পড় দিতে। বেকুবটা বসেছে তাঁর সামনে টেবিলটার অন্য প্রান্তে। এত দূর পর্যন্ত হাত যাবে না। অবিশ্যি তাঁর হাতে প্লাস্টিকের লম্বা স্কেল আছে। তিনি স্কেল দিয়ে বেকুবটার মাথায় ঠাস করে বাড়ি দিয়ে বলতে পারেন— যা ভাগ।

কী কী কারণে এই কাজটা তিনি করতে পারলেন না তা দ্রুত চিন্তা করলেন।

প্রথম কারণ বেকুবটা তার ছেলেকে নিয়ে এসেছে। ছেলের সামনে বাবার গালে থাপ্পড় দেয়া যায় না বা স্কেল দিয়ে মাথায় বাড়ি দেয়া যায় না। থাপ্পড় বাদ। এটা টেকনিক্যালি সম্ভব না। বাকি থাকল স্কেলের বাড়ি।

দ্বিতীয় কারণ বেকুবটা পাঁচশ টাকা ভিজিট দিয়ে তাঁর কাছে এসেছে। সরকারি নিয়মে প্রাইভেট প্র্যাকটিশনারা তিনশ টাকার বেশি ভিজিট নিতে পারেন না। তিনি নেন— তারপরেও রোগী কম না। যে পাঁচশ টাকা ভিজিট দিয়ে এসেছে তার মাথায় স্কেল দিয়ে বাড়ি দেওয়া যায় না।

তৃতীয় কারণ স্কেলটা প্লাস্টিকের। তিনি গত বার জার্মানি থেকে এনেছেন। স্কেলটা তিন ফুট লম্বা। ফোল্ড করা যায়। মাথায় বাড়ি দিয়ে স্কেল ভেঙে যেতে পারে।

অধ্যাপক আনিসুর রহমান স্কেল হাতে নিয়ে দ্রুত কুঁচকে ভাবছেন এই তিনটি কারণের মধ্যে কোনটা জোরালো। বৈজ্ঞানিকভাবে বলা যেতে পারে ওয়েস্টেজ কত?

তিনি লক্ষ করলেন বেকুবটা পকেটে হাত দিয়ে একটা কার্ড বের করে তার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

‘স্যার এইটা আমার কার্ড। আমার নাম জালাল। কাটা কাপড়ের ব্যবসা করি। বঙ্গবাজারে আমার একটা দোকান আছে। আমার ভাইস্তা দোকান দ্যাখে, আমি সময় পাই না। দোকানের নাম জালাল গার্মেন্টস।’

আনিসুর রহমান হাতের স্কেল নামিয়ে রাখলেন। টিস্যু বক্স থেকে টিস্যু পেপার নিয়ে নিজের নাক মুছে টিস্যু পেপার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। বাস্কেটে পড়ল না। যখনই তিনি রোগী দেখেন এই কাজটা করেন। যখন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে টিস্যু পড়ে না তখন তিনি ধরে নেন এই

রোগীর চিকিৎসায় কোনো ফল হবে না। যদিও এ-রকম মনে করার কোনো কারণ নেই। কুসংস্কার, খারাপ ধরনের কুসংস্কার। বিজ্ঞানের মানুষ হয়ে এই কাজে প্রশ্নই দেয়া ঠিক না।

‘স্যার আমার দোকানে একবার যদি পদধূলি দেন তাহলে অত্যন্ত খুশি হব। আপনাদের মতো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাজারে যান।’

‘আপনার নাম জালাল?’

‘জি। আমার ভাইস্তার নাম রিয়াজ। ফিল্ম আর্টিস্ট রিয়াজ যে আছে তার সাথে চেহারার কিঞ্চিৎ মিলও আছে। তবে তার গায়ের রঙ রিয়াজ ভাই এর চেয়েও ভালো।’

‘আপনি আপনার ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে এসেছেন?’

‘জি জনাব। আমার একটাই ছেলে তার নাম হারুন। ভালো নাম হারুন অর রশিদ। বাগদাদের খলিফার নামে নাম রেখেছি।’

‘আপনি এত কথা বলছেন কেন জানতে পারি? রোগী দেখাতে এসেছেন রোগীর বিষয়ে কথা বলবেন। কী রোগ সেটা বলবেন।’ দুনিয়ার কথা শুরু করেছেন।

‘জানব আমার গোস্তাকি হয়েছে। ক্ষমা করে দেবেন। কথা আগে আমি এত বলতাম না। কম বলতাম। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কথা বলা বেড়ে গেছে। আগে পানও খেতাম না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর পান খাওয়া ধরেছি— এখন সারা দিনই পান খাই। বললে বিশ্বাস করবেন না চা যখন খাই তখনও এক গালে পান থাকে।’

‘আপনার ছেলের সমস্যা কী?’

‘অঙ্ক সমস্যা।’

‘অঙ্ক বুঝতে পারে না এই সমস্যা?’

‘জি না— এইটাই সে বুঝে। যে অঙ্ক দিবেন চোখের নিমিষে করবে। চোখের পাতি ফেললেই আগে অঙ্ক শেষ।’

‘এটা তো কোনো সমস্যা হতে পারে না।’

‘খাঁটি কথা বলেছেন স্যার। এটা ভালো। তারে টেস্ট করার জন্যে দূরদূরান্ত থেকে লোক আসে। একবার টেলিভিশন থেকে এসেছিল ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে নিয়ে যাবে। নিয়ে গিয়েছিল। ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানটা আপনি দেখেছেন কি না জানি না। অনেকেই দেখেছে। আমি নিজে দেখতে পারি নাই। বেছে বেছে অনুষ্ঠান চলার সময় কারেন্ট ছিল না। অনুষ্ঠানের শেষে ছিল একটা পুরানো দিনের গান— “আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে, সাত সাগর আর তেরো নদীর পারে।” ঐটা শুধু দেখেছি। সাগরিকা ছবির গান। সাগরিকা ছবিটাও দেখেছি। উত্তম সুচিত্রার ছবি।’

‘জালাল সাহেব।’

‘জি।’

‘আপনি আপনার ছেলেকে নিয়ে চলে যান। এই ছেলেকে আমার দেখার কিছু নাই। আমি নিউরোলজির কোনো সমস্যা হলে দেখি।’

‘পাঁচশ টাকা আমি আপনার এসিস্টেন্টকে ভিজিট দিয়েছি।’

‘ভিজিটের টাকা ফিরত নিয়ে যান আমি বলে দিচ্ছি। আনিসুর রহমান রেবল টিপলেন।’

জালাল কাতর গলায় বলল, ‘জনাব সমস্যাটা একটু শুনেন। আমি তো সমস্যা বলতেই পারি নাই। বিরাট বিপদে আছি।’

‘আমার নিজের শরীর ভালো না। আজ আমি আর রোগী দেখব না।’

‘কাল আসি? কাল অবশ্য মাল নিয়ে আমার চাঁপাইনবাবগঞ্জ যাওয়ার কথা। আমি নিজে মাল নিয়ে কখনো যাই না। ছেলে একলা থাকে। মা মরা স্নেহ বঞ্চিত ছেলে। তার সঙ্গে থাকতে হয়। এই যে কাল যাচ্ছি ছেলেকেও সাথে নিয়ে যাচ্ছি। মালামাল নিয়ে যাওয়ার কাজের জন্যে আমার একজন কর্মচারী ছিল—ইদরিস নাম। গত এপ্রিল মাসের নয় তারিখ এগারো হাজার টাকার মাল আর নগদ ছয় হাজার টাকা নিয়ে পালায়ে গেছে। থানায় জিডি এন্ট্রি করেছি।’

‘স্টপ ইট।’

‘জনাব কী বললেন?’

‘বললাম স্টপ ইট। কথা বলবেন না।’

‘জি আচ্ছা। ছেলেটাকে একটু দেখবেন?’

‘দেখছি আপনার ছেলেকে। দয়া করে কথা বলবেন না।’

‘আজকে দেখে দিলে খুবই উপকার হয়। তাহলে আগামী কাল আসতে হয় না। পার্টিকে মোবাইলে কথা দিয়ে দিয়েছি। পার্টি যদি দেখে আমি কথা দিয়ে কথা রাখি না তাহলে পরে সমস্যা হবে। ব্যাবসার আসল পুঁজি গুডউইল।’

‘স্টপ ইট!’

‘জি আচ্ছা।’

‘আপনি দয়া করে বাইরে গিয়ে বসুন। আমি আপনার ছেলের সঙ্গে কথা বলছি।’

‘আমি বাইরে চলে গেলে লাভ হবে না স্যার। আমার ছেলে বাপ ছাড়া কিছু বুঝে না। তার মা যখন জীবিত ছিল তখনো এই অবস্থা ছিল। এটা নিয়ে তার মায়ের খুবই আফসোস ছিল। তার মা হারুন হারুন বলে গলা ফাটায়ে দিচ্ছে ছেলে জবাব দেবে না। অথচ আমি একবার পাতলা গলায় হারুন ডাকলে—জি বাবা বলে দৌড় দিয়ে ছুটে আসবে। লোক মুখে শুনি ছেলেরা হয় মায়ের ভক্ত। মেয়েরা হয় বাপের ভক্ত। আমার বেলায় উল্টা নিয়ম।’

‘জালাল সাহেব!’

‘জি।’

‘আপনি কি বাইরে গিয়ে বসবেন? এখুনি বাইরে যাবেন। রাইট নাও। আপনি যদি তিন সেকেন্ডের ভিতর বাইরে না যান আমি দারোয়ান দিয়ে বের করে দেব।’

‘রাগ করছেন কেন স্যার।’

‘তিন সেকেন্ড। জাস্ট থ্রি সেকেন্ডস।’

জালাল মিয়া উঠে দাঁড়ালেন। তার ছেলেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। জালাল মিয়া বললেন, ‘বাবা তুমি বসো। ডাক্তার সাহেব তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।’

ছেলে সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল।

‘উনি যা জিজ্ঞেস করবেন জবাব দিবে। তোমার যে মাথার যন্ত্রণা হয় এইটা বলবা।’

ছেলে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল।

‘বাবা আমি বাইরেই আছি কোনো সমস্যা নাই।’

ছেলে আবারো অতি বাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়ল।

আনিসুর রহমান খান ছেলের দিকে তাকালেন। শান্ত ভদ্র চেহারা। চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। তবে মাথায় চুল কম। এই বয়সি ছেলেদের মাথাভর্তি চুল থাকার কথা। বুদ্ধিহীন বড় বড় চোখ। মোথের দৃষ্টি টেবিলের পায়ার দিকে।

‘তোমার নাম কী?’

‘হারুন অর রশিদ।’

‘বাগদাদের খলিফা?’

‘জি না।’

‘আমি তোমার সাথে হাটা করছি, তুমি যে বাগদাদের খলিফা না তা আমি জানি। তোমার সমস্যা কী?’

‘জানি না।’

‘তোমার বাবা আমার কাছে তোমাকে কেন এনেছেন?’

‘জানি না।’

‘তোমার বাবা মাথা ব্যথার কথা বলছিলেন। মাথা ব্যথা হয়?’

‘হুঁ।’

‘কখন?’

‘যখন অঙ্ক করি।’

‘আমি তো শুনলাম তুমি বিরাট অঙ্কবিদ। অঙ্ক করলেই যদি মাথা ব্যথা হয় তাহলে কীভাবে হবে। এখন মাথা ব্যথা আছে?’

‘না।’

‘আচ্ছা তোমাকে একটা অঙ্ক করতে দিচ্ছি— দেখি অঙ্কটা করার পর মাথা ব্যথা হয় কি না। দুই এর সঙ্গে চার যোগ করলে কত হয়?’

হারুন অর রশিদ এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিল না। টেবিলের পায়া থেকে চোখ তুলে আনিসুর রহমানের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, ‘ছয় হয়।’

আনিসুর রহমান বললেন, ‘এই তো পেরেছ। তুমি যে অঙ্কবিদ এটা তোমার বাবা ঠিকই বলেছেন। কাগজ কলম ছাড়াই তো অঙ্কটা করে ফেলেছ। এখন বল মাথা ব্যথা করছে?’

‘মাথা ব্যথা করছে না।’

‘তোমার কোনো অসুখ-বিসুখ নাই। যাও বাড়িতে যাও, বাড়িতে গিয়ে ঘুমাও।’

হারুন উঠে দাঁড়াল। আনিসুর রহমান বললেন, ‘তুমি তোমার বাবাকে কম কথা বলতে বলবে। আমার ধারণা তোমার বাবার ধারাবাহিক কথা শুনে তোমার মাথা ধরে। আচ্ছা যাও বিদায়।’

হারুন অর রশিদ আনিসুর রহমানকে অবাক করে দিয়ে বলল, ‘বাবার কথা শুনে আমার মাথা ধরে না। আপনি যে সব অঙ্ক দিয়েছেন সে সব করেও মাথা ধরে না। ওরা যে অঙ্ক দেয় সেগুলি করার সময় মাথা ধরে।’

‘ওরা মানে কারা?’

‘আমি তাদেরকে চিনি না। কখনও দেখি মাই। তারা হঠাৎ মাথার ভিতর অঙ্ক দিয়ে দেয়।’

‘তুমি বস।’

হারুন বসল। আনিসুর রহমান তীর দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, ‘পরিষ্কার করে বল কী বলতে চাচ্ছ। মাথার ভিতর অঙ্ক কীভাবে ঢুকিয়ে দেবে? নাকের ফুটা দিয়ে? কথা বলছ না কেন? কথা বলো।’

হারুন অর রশিদ আনিসুর রহমানের চেয়ারের পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। আনিসুর রহমান ছেলেটাকে চুমুক দিতে গিয়েও দিতে পারলেন না কারণ ছেলেটা কাঁদছে।

‘কাঁদছ কেন?’

‘আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন এইজন্যে কাঁদছি।’

‘সরি। আর ঠাট্টা করব না। কোক খাবে? আমার ফ্রিজে কোকের ক্যান আছে। খাবে?’

‘হ্যাঁ খাব।’

আনিসুর রহমান খান ছেলেটির দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখে এখন মমতার প্রবল ছায়া। ছেলেটি অনেকক্ষণ ধরেই মানসিক চাপে ছিল এই অবস্থায় তাকে কোক খেতে বলা হয়েছে। তার অবস্থানে যে আছে সে কখনও বলবে না— খাব। সে বলেছে। তাকে কোক দেয়া হয়েছে। সে আগ্রহ নিয়ে চুমুক দিচ্ছে। তার দৃষ্টি চেয়ারের পায়ে। চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। ছেলেটার চেহারা সুন্দর। বেশ সুন্দর। চেহারায় মায়ার ভাব অত্যন্ত প্রবল।

দরজায় শব্দ হলো। ছেলের বাবা মাথা বের করে বলল, 'স্যার আসব?'

আনিসুর রহমান কঠিন গলায় বললেন, 'না।'

'জি আচ্ছা স্যার। আমি বাইরে আছি। এক মিনিট যদি সময় দেন হারুনের মূল বিষয়টা বলি। সে ওছায়ে বলতে পারবে না। নার্ভাস প্রকৃতির ছেলে...'

'আপনি বাইরে বসুন।'

'জি আচ্ছা স্যার। প্রয়োজন হলে ডাক দিবেন আমি আছি। অল্প কিছুক্ষণের জন্যে শুধু রাস্তার পাশে পান-সিগারেটের দোকানটায় যাব। পান শেষ হয়ে গেছে। স্যার আপনার জন্যে কি একটা পান নিয়ে আসব? আমার কাছে ময়মনসিংহের খুব ভালো জর্দা আছে, মিকচার জর্দা।'

'আপনি বাইরে থাকুন। দরজা ভিড়িয়ে দিন। অনেক কথা অল্প সময়ে বলে ফেলেছেন।'

দরজা বন্ধ হলো। আনিসুর রহমান ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি বলতে চাচ্ছ তোমার মাথার ভিতর কারা যেন অঙ্ক চুকিয়ে দেয়?'

'জি।'

'আর তুমি সেই অঙ্ক করতে থাকো?'

'জি।'

'অঙ্ক করা শেষ হলে তারা কি অঙ্কের উত্তর দিতে তোমার কাছে আসে?'

'না।'

'তাহলে তারা অঙ্কের উত্তর পায় কী করে?'

'তারা মাথার ভিতর থেকে নিয়ত নেয়।'

'অঙ্ক দেয়া নেয়া এটা কি তোমার মায়ের মৃত্যুর পর শুরু হয়েছে?'

'না তারও আগে। আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন।'

'প্রথম তোমাকে যে অঙ্কটা করতে দিয়েছিল সেটা তোমার মনে আছে?'

'আছে।'

'অঙ্কটা বলো আমি কাগজে লিখে নিই।'

'বলব না।'

'কেন?'

'বলতে ইচ্ছা করছে না।'

'ওরা যে-সব অঙ্ক দেয় সে-সব করতে তোমার কতক্ষণ লাগে?'

'কোনো কোনোটার খুব অল্প সময় লাগে। আবার কোনো কোনোটা অনেক বেশি সময় লাগে। শেষ হয় না চলতেই থাকে।'

'এখন কি কোনো অঙ্ক করছ?'

'হুঁ। এই অঙ্কটা শেষ হচ্ছে না। সহজ অঙ্ক কিন্তু শেষ হচ্ছে না।'

'এই অঙ্কটা কি আমাকে বলবে?'

'এটা হলো একটা ভাগ অঙ্ক, বাইশকে সাত দিয়ে ভাগ।'

‘এটা তো খুবই সহজ অঙ্ক। দাঁড়াও আমি দেখি— আনিসুর রহমান কাগজ কলম নিলেন। হাসিমুখে বললেন এই তো হয়েছে— ৩.১৪২।’

হারুন বলল, ‘শেষ করুন। শেষ হবে না, চলতেই থাকবে।’

আনিসুর রহমান বললেন, ‘শেষ হবে না মানে কী? শেষ হতেই হবে। একসময় পৌনঃপুনিক চলে আসবে। পৌনঃপুনিক কী জানো?’

‘জানি।’

‘স্কুলে শিখিয়েছে?’

‘না ওরা শিখিয়েছে।’

‘ওরা মানে কারা?’

‘আমি জানি না।’

‘একজন না অনেক জন?’

‘অনেক জন। ওদের মধ্যে একটা মেয়ে আছে।’

‘মেয়ে আছে বুঝলে কী করে, তার চেহারা দেখেছ?’

‘না। গলার স্বর শুনেছি।’

‘গলার স্বর কেমন?’

‘খুব মিষ্টি কিন্তু ভাঙা ভাঙা।’

‘তারা কি তোমাকে শুধু অঙ্কই দেয় নাকি গল্পও জবও করে?’

‘মেয়েটা মাঝে মাঝে গল্প করে।’

‘কী বলে?’

‘বলে যে ওরা যে শুধু আমাকে দিয়েই অঙ্ক করায় তা-না অনেককে দিয়েই করায়।’

‘তুমি কখনও জিজ্ঞেস করোনি— আপনারা কে?’

‘জিজ্ঞেস করেছি। তারা উত্তর দেয় না, শুধু হাসে।’

আনিসুর রহমান ঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত দশটা বাজে। নিজের উপর এখন তাঁর সামান্য বিরক্তি লাগছে। তিনি ছেলেটিকে দীর্ঘ সময় দিয়েছেন। যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এরা ছিল শেষ রোগী এইজন্যেই সময়টা দেয়া গেছে। তা ছাড়া আগামী কাল শুক্রবার। তাঁর চেম্বার বন্ধ। ছেলেটা সুস্থ এবং স্বাভাবিক। সামান্য কিছু মানসিক সমস্যা হয়তো আছে। সেই সমস্যার সমাধান সাইকিয়াট্রিস্টরা করবেন। তিনি সাইকিয়াট্রিস্ট না। এই বিষয়টাই ছেলের বাবাকে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে। তবে ঐ উজবুকটার সঙ্গে কথা না বলতে পারলে ভালো হতো। তার সঙ্গে কথা বলার অর্থ একটা উপন্যাসের অর্ধেকটা শুনে ফেলা।

আনিসুর রহমান বাসায় ফিরলেন রাত এগারোটায়। আধাঘণ্টা দেরিতে। তাঁর রুটিন হলো সাড়ে দশটার ভেতর বাসায় ফেরা। বড় একটা টাওয়েল জড়িয়ে খালি গায়ে রকিং চেয়ারে খানিকক্ষণ বিশ্রাম। বিশ্রাম করতে করতেই

খবরের কাগজ পড়া। সবাই খবরের কাগজ পড়ে ভোরে। তিনি এই সময়ে পড়েন। তাঁর বক্তব্য কিছু-কিছু খাবার আছে টাটকা, খেতে ভালো না একটু বাসী হলে ভালো লাগে। বাংলাদেশের খবরও সেই পর্যায়ে। বাসী ভালো, টাটকা ভালো না। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তিনি ঘরে ব্রিউ করা এক মগ কালো কফি খান। তাঁর একমাত্র কন্যা জেনিফারের সঙ্গে গল্প করেন। স্ত্রী রুমানার সঙ্গে কথা বলেন। ঠিক এগারোটায় বাথরুমে ঢুকে যান। বাকি আধঘণ্টা কাটে বাথরুমের বাথটাবে। বাথটাব ভর্তি থাকে পানি। তিনি গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে পানিতে শুয়ে থাকেন। মগ ভর্তি কফি তখনো শেষ হয় না। তিনি কফিতে চুমুক দেন। বাথরুমের দরজা থাকে খোলা। জেনিফার যাতে বাথরুমে আসা যাওয়া করতে পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। জেনিফার স্কলাসটিকায় ফিফথ গ্রেডে পড়ে। সে বাবার অসম্ভব ভক্ত। বাবা যতক্ষণ বাসায় থাকেন ততক্ষণই কিছু সময় পরপর তার বাবার সঙ্গে কথা বলা চাই।

তিনি আজ দেরি করে ফিরলেন কিন্তু সময়মতোই বাথরুমে ঢুকে গেলেন। মাঝখানের আধঘণ্টার কার্যক্রম বাতিল হয়ে গেল। জেনিফার তাকে কফির মগ দিয়ে গেল। মিষ্টি করে বলল, ‘খবরের কাগজ দেব বাবা?’

আনিসুর রহমান বললেন, ‘না।’

‘তুমি কি আজ রাতে আমার সঙ্গে মুভি দেখবে?’

‘দেখতে পারি। কাল ছুটি কাজেই রাত জাগা যেতে পারে। ভালো কোনো মুভি আনিয়ে রেখেছিস?’

‘এমেডিউস দেখবে?’

‘বিষয়বস্তু কী?’

‘মোজার্টের লাইফ।’

‘এইসব হাই ফাই জিনিস ভালো লাগবে না। ভূতপ্রেতের ছবি আছে না?’

‘অনেকগুলি আছে কোনোটা দেখবে?’

‘যেটা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সেটা, ভালো কথা মা তোর ক্যালকুলেটর আছে না?’

‘আছে।’

‘একটা কাজ করতো চট করে ২২ কে ৭ দিয়ে ভাগ করে রেজাল্টটা নিয়ে আয়।’

‘কেন?’

‘এমনি।’

আনিসুর রহমান গায়ে সাবান ডলতে লাগলেন। আজকের কফিটা অন্যদিনের চেয়ে খেতে ভালো লাগছে। এটা চিন্তার বিষয়। তিনি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে রাতে কফি খেতে খুবই ভালো লাগে সে রাতের

খাবারটা খেতে ভালো হয় না। তিনি দুপুরে একটা কলা এবং স্যান্ডউইচ খান।
রাতের খাবারটা এইজন্যেই তার কাছে জরুরি।

জেনিফার বাথরুমে ক্যালকুলেটর নিয়ে ঢুকল। মিষ্টি করে বলল, ‘ভাগ
করেছি। রেজাল্ট হচ্ছে ৩.১৪১৮ ৫৭১৭’

আনিসুর রহমান বললেন, ‘এই পর্যন্তই?’

জেনিফার বলল, ‘আমার ক্যালকুলেটরে দশমিকের পর আট ডিজিট পর্যন্ত
হবে এর বেশি হবে না।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে।’

‘তুমি এটা দিয়ে কী করবে?’

‘এমনি— কোনোই কারণ নেই। আজকের রাতের রান্না কী?’

‘আজ রাতে তোমার খুব পছন্দের খাবার আছে। ইলিশ মাছের ডিমের ভূনা।
কাতল মাছের মাথার মুড়িঘণ্ট।’

‘মাংস নেই?’

‘মনে হয় না। মাংস রান্না করতে বলব?’

‘দরকার নেই। তুই একটা কাজ করতো মা এই একটাই কম্পিউটারে করে
দেখ আরো বেশি ডিজিট পাওয়া যায় কী না।’

‘কেন বাবা?’

‘এমনি মা। No particular reason’

রাতে খেতে গিয়ে আনিসুর রহমান খান চমৎকৃত হলেন। মাছ ছাড়াও দু’ ধরনের
মাংস আছে। মুরগির ঝাল ফাই, গরুর কলিজা ভূনা। একজন ডাক্তার হিসেবে
কলিজা ভূনার মতো হাই কোলেস্টেরল ডায়েট খাওয়া একেবারেই উচিত না
কিন্তু যাবতীয় হাই কোলেস্টেরল ডায়েট তার অতি পছন্দ।

রুমানা বললেন, ‘তুমি জেনিফারকে দিয়ে পাই এর ভ্যালু বের করাচ্ছ
কেন?’

আনিসুর রহমান বললেন, ‘বাইশকে সাত দিয়ে ভাগ দিতে বলেছি।’

‘এটা হলো পাই। পরিধি ডিভাইডেড বাই ব্যাস। পরিধি হচ্ছে $2\pi r$ আর
ব্যাস হচ্ছে $2r$ ভাগ করলে থাকে π .’

‘তুমি এতসব জানো কীভাবে?’

রুমানা বললেন, ‘তুমি প্রায়ই ভুলে যাও যে আমি ফিজিক্স পড়েছি।’

আনিসুর রহমান বললেন, ‘এটা তো ফিজিক্স না এটা হলো ম্যাথ।’

রুমানা বললেন, ‘চুপ করে খাও তো। কোনটা ফিজিক্স কোনটা ম্যাথ তা
নিয়ে তোমার গবেষণা করতে হবে না।’

আনিসুর রহমান বললেন, ‘পাই বস্তুটার মান কত?’

‘মান হলো ৩.১৪’

‘তা হবে কেন এটা তো পয়েন্ট ওয়ান ফোরে শেষ হয় না, চলতেই থাকে।’

‘চলতে থাকলেই সব সংখ্যা নিতে হবে? দরকারটা কী?’

আনিসুর রহমান বললেন, ‘তা ঠিক কোনো দরকার নেই। পণ্ডশ্রম। একেবারেই পণ্ডশ্রম।’

রুমানা বললেন, ‘তুমি ডাক্তার মানুষ তুমি পাই নিয়ে হইচই করছ কেন?’

আনিসুর রহমান বললেন, ‘হইচই করছি কোথায়? হইচই করছি না তো।’

‘রান্না কেমন হয়েছে?’

‘অসাধারণকে দশ দিয়ে গুণ দিলে যা হয় তাই হয়েছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কলিজা ভূনা আজ রাতে খেলাম।’

‘ইলিশ মাছের ডিমের চেয়েও ভালো হয়েছে?’

‘এই তো এক সমস্যায় ফেললে শ্যাম রাখি না রাধা রাখি।’

রুমানা বললেন, ‘তুমি ডাক্তার মানুষ। ডাক্তারি নিয়ে নিয়ে থাকো। পাই এর মান, বাংলা সাহিত্য এইসবে যাবার দরকার নেই। শ্যাম রাখি না রাধা রাখি বলে কিছু নেই। বাক্যটা হলো শ্যাম রাখি না কূল রাখি।’

‘সরি।’

‘সরি বলারও কিছু নেই। শুধু শুধু সরি বলছ কেন?’

আনিসুর বললেন, ‘সরি বলার জন্যে সরি।’

রাতটা তাঁর খুব ভালো কাটল। তিনজন মিলে ফ্রাইডে দ্যা থার্টিন ছবিটা দেখলেন। ছবি দেখে ভীত হবার আনন্দ পুরোপুরি উপভোগ করে রাতে ঘুমুতে গেলেন। ঘুম খুব ভালো হলো না। সারাক্ষণই স্বপ্ন দেখলেন তিনি বাইশকে কখনো সাত দিয়ে ভাগ দিচ্ছেন কখনো তিন দিয়ে ভাগ দিচ্ছেন আবার কখনো বা পাঁচ দিয়ে দিচ্ছেন। রাতে কয়েক বার তাঁর ঘুম ভাঙল। এ রকম কখনও হয় না। তিনি ঘুমের ট্যাবলেট ছাড়াই এক ঘুমে রাত পার করার মানুষ।

পরের তিন সপ্তাহ আনিসুর রহমানের অতি ব্যস্ততায় কাটল। তিনি ব্যঙ্গালোরে একটি সেমিনার এ্যাটেন্ড করতে গেলেন। ফিরে এসে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস ফাইন্যাল পরীক্ষার একস্টারনাল একজামিনার হিসেবে রাজশাহী গেলেন। রুমানার এক খালাতো বোনের ছুট করে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চিটাগাং গেলেন। তবে এর ফাঁকে ফাঁকে পাই বিষয়ক কিছু তথ্য সংগ্রহ করলেন। যেমন—

১. এই সংখ্যাটির মান এখনো নির্ণয় করা যায়নি। অতি শক্তিমান কম্পিউটারের সাহায্যে চেষ্টা করা হয়েছে। সংখ্যা দশমিকের পর চলতেই থাকে। কখনো পৌনঃপুনিক আসে না।

২. মহান গ্রিক অঙ্কবিদ পিথাগোরাসের ধারণা 'পাই' প্রকৃতির একটি রহস্যময় বিষয়। যিনি এই রহস্য উদ্ধার করতে পারবেন তিনি প্রকৃতির একটা বড় রহস্য উদ্ধার করতে পারবেন।

৩. আমেরিকান এস্ট্রনমার কার্ল সেগান 'পাই' এর রহস্য নিয়ে একটি বই লিখেছেন। যে বই এর বিষয়বস্তু হচ্ছে 'পাই' এর মানে ঈশ্বর কিছু বলতে চাচ্ছেন। এটা তাঁর ভাষা।

তিনি এর মধ্যে হারুন অর রশিদ নামের ছেলেটির খোঁজ বের করারও চেষ্টা করলেন। সমস্যা হলো ছেলেটির নাম ছাড়া তাঁর আর কিছুই মনে নেই। ছেলেটার বাবা একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়েছিল সেই কার্ড তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। কোথায় যে তার একটা দোকান বা শো রুম আছে বলেছিল। জায়গাটার নাম মনে করতে পারলেন না। শুধু মনে আছে সেই দোকানে ভদ্রলোকের এক আত্মীয় বসে যার চেহারা ফিল্মের কোনো নায়ক বা নায়িকার চেহারার মতো। এই তথ্য দিয়ে কাউকে খুঁজে বের করা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। তারপরেও তিনি তার এ্যাসিস্টেন্টকে দায়িত্ব দিয়েছেন— ঢাকার সব ক'টা স্কুলে সে যাবে। সেখানে হারুন অর রশিদ নামে এগারো-বারো বছরের কোনো ছেলে আছে কী না খোঁজ করবে। সেই অনুসন্ধানেও কোনো ফল হচ্ছে না।

আনিসুর রহমানের জীবনযাপন পদ্ধতিতে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। তিনি এখন আর রাত সাড়ে দশটায় কাসার ফেরেন না। তিনি ফেরেন রাত এগারোটায়। এই আধঘণ্টা সময় গভীর নিষ্ঠায় পাই এর মান বের করার চেষ্টা করেন।

হলুদ মলাটের একটা পুষ্টির একটা বাঁধানো খাতা তিনি কিনেছেন। খাতার পাতার অর্ধেকের বেশি লিখে ফেলেছেন। অঙ্ক এখনো চলছে। কাজটা করে তিনি আনন্দ পাচ্ছেন। দশটা বাজার পরপরই তিনি অস্থির বোধ করেন কখন অঙ্ক শুরু করবেন। খাতাটা তিনি বাড়িতে নেন না। অতি মূল্যবান বস্তুর মতো চেম্বারে ড্রয়ারে তালাবন্ধ করে রাখেন। খাতা বিষয়ে বা অঙ্ক বিষয়ে তিনি কারো সঙ্গেই কোনো কথা বলেন না। মাঝে মাঝে তাঁর স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করেন, 'তোমার কি কোনো সমস্যা যাচ্ছে! তোমাকে সব সময় অস্থির লাগে কেন?'

তিনি হড়বড় করে বলেন, 'কই অস্থির না তো।'

'রাতে মনে হয় তোমার ভালো ঘুম হয় না। প্রায়ই শুনি তুমি বিড়বিড় করছ।'

'আমার ঘুমের কোনো সমস্যা নেই।'

'একজন ডাক্তার কি দেখাবে?'

'খামাখা কেন ডাক্তার দেখাব।'

'তাহলে চল কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসি।'

‘চল যাই। কোথায় যেতে চাও?’

‘মালয়েশিয়া যাবে? শুনেছি খুব সুন্দর জায়গা।’

‘যেতে পারি।’

আনিসুর রহমান পনেরো দিনের জন্যে সবাইকে নিয়ে মালয়েশিয়া গেলেন। খাতাটা সঙ্গে নিলেন না। পনেরো দিন আনন্দ করেই কাটালেন। দেশে ফিরে আবার সেই আগের রুটিন। তবে অঙ্ক করার সময় আরেকটু বাড়ালেন। এখন তিনি অঙ্ক করেন পঁয়তাল্লিশ মিনিট। বাসায় আগের মতোই এগারোটায় ফেরেন। রোগী দেখেন পনেরো মিনিট কম।

ছয় মাসের ভেতর আনিসুর রহমানের খাতার সংখ্যা হলো দশটা। অঙ্ক করার সময়ও বাড়ল। তিনি এখন ঘড়ি ধরে এক ঘণ্টা সময় দেন অঙ্কের পেছনে। তাঁর বড় ভালো লাগে।

এক ডিসেম্বর মাসের কথা। ঝাঁকিয়ে শীত পড়েছে। কোন্ড ওয়েভ শুরু হয়েছে। নেমেছে কুয়াশা। আনিসুর রহমান চেম্বারে বসে আছেন। রাত আটটা। দু’জন রোগী ছিল। তাদের দেখা শেষ হয়েছে। চেম্বারে আর কেউ নেই। আনিসুর রহমান তাঁর এ্যাসিস্টেন্টকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর নিজের মনে খুব আনন্দ। তিন ঘণ্টা টানা সময় পাওয়া গেছে। মন লাগিয়ে অঙ্ক করা যাবে। তিনি নতুন একটা খাতা বের করলেন। আর তখন তাঁর মাথার ভেতর কেউ একজন কথা বলে উঠল। মেয়ের গলা। অতি মিষ্টি গলা তবে ভাঙা ভাঙা।

‘আনিসুর রহমান ভালো আছেন?’

‘কে-কে কে?’

‘আমরা আপনার নিবেদন দেখে খুশি হয়েছি।’

‘কে? আপনারা কে?’

‘এখন থেকে আমরা আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। আপনাকে অঙ্ক করতে সাহায্য করব।’

‘আপনারা কে?’

‘আমরা কে সেটা জরুরি না। যে অঙ্কটা আপনি করছেন সেটা জরুরি।’

আনিসুর রহমান হতাশ গলায় বললেন, ‘আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?’

‘আজেবাজে কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না। অঙ্কটা করুন।’

‘এই অঙ্কটা কী কখনও শেষ হবে?’

‘না।’

‘যে অঙ্ক শেষ হবে না সেই অঙ্ক করে লাভ কী?’

‘শেষ না হলেও একটা সিরিজ বের হয়ে আসবে। আমাদের প্রয়োজন

সিরিজ। সিরিজও শেষ না।’

‘সিরিজ কী?’

‘১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ একটা সিরিজ যেটা চলতে থাকে, আবার ২ ৪ ৬ ৮ ১০ আরেকটা সিরিজ। কোনো সিরিজই শেষ হয় না।’

‘একই অঙ্ক কি আপনারা অনেককে দিয়ে করাচ্ছেন? আমি যতদূর জানি হারুন অর রশিদও এই অঙ্ক করছে।’

‘যেই মুহূর্তে আপনি শুরু করেছেন আমরা হারুনকে সরিয়ে দিয়েছি। তাকে অন্য কাজ দিয়েছি। তাকে সিরিজ করতে দিয়েছি।’

‘হারুনের সঙ্গে কি যোগাযোগ করা যায়?’

‘অবশ্যই যায়, সে আমাদের সঙ্গেই আছে। একদিন আমরা আপনাকেও আমাদের মধ্যে নিয়ে নেব।’

‘কবে?’

‘সেটা তো এখনো বলতে পারছি না। হারুনের সঙ্গে কথা বলবেন।’

‘হ্যাঁ।’

‘আরেকদিন কথা বলিয়ে দেব। কেমন?’

‘আচ্ছা।’

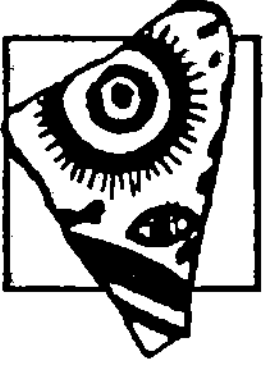
‘অঙ্ক করুন।’

‘আচ্ছা।’

হারুন অর রশিদের খোঁজ পাওয়া গেছে। তার বাবা এসে খবর দিয়ে গেছেন। ছেলেটা মারা গেছে অক্টোবরের ১১ তারিখ। মাথায় প্রবল যন্ত্রণা হয়েছিল। হাসপাতালে নিতে বিতেই সে মারা যায়। মৃত্যুর সময় তার নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছিল।

ছেলের বাবা কাঁদতে কাঁদতে বলল, ‘স্যার আমি আপনার কাছে এসেছি কারণ ছেলেটা প্রায়ই আপনার কথা বলত।’

লোকটার হয়তো আরো অনেক কথা বলার ছিল। আনিসুর রহমান তাকে সুযোগ দিলেন না। মানুষের সঙ্গে কথা বলে তিনি এখন সময় নষ্ট করেন না। তিনি কাজ করে যান। কাজটা প্রয়োজন। অন্য সবকিছুই অপ্রয়োজনীয়।



অঁহক

ইন্টার গ্যালাকটিক স্পেসশিপগুলির পরিচালনা নীতিমালায় তিনটি না সূচক সাবধান বাণী আছে। স্পেসশিপের ক্যাপ্টেনকে এই তিন ‘না’ মেনে চলতে হবে।

১. স্পেসশিপ কখনও নিউট্রন স্টারের বলয়ের ভিতর দিয়ে যাবে না।

২. ব্ল্যাক হোলের বলয়ের ভিতর দিয়ে যাবে না।

৩. অঁহক গোষ্ঠীর সীমানার কাছাকাছি যাবে না। ভুলক্রমে যদি চলে যায়, অতি দ্রুত বের হয়ে আসবে।

সমস্যা হলো নিউট্রন স্টার এবং ব্ল্যাকহোলের আকর্ষণ আগে-ভাগে টের পাওয়া যায়। সময়মতো ব্যবস্থা নেয়া যায়। কিন্তু অঁহকদের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। আগে-ভাগে তাদের উপস্থিতি জানার কোনো উপায় নেই।

অথচ অঁহকরা মহাশূন্যের বুদ্ধিমান প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু। বিপদগ্রস্ত মহাশূন্যযানের সাহায্যের জন্যে অতি ব্যবস্ত। তাদের কর্মক্ষমতাও অসাধারণ। যে-কোনো যন্ত্রাংশ ত্রুটি দ্রুত ঠিক করতে পারে। এই অনন্ত মহাবিশ্বের যে-কোনো শ্রেণীর প্রাণীর যে-কোনো ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক করে ফেলতে পারে। তারপরেও এদের কাছে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। এদেরকে ব্ল্যাক হোল কিংবা নিউট্রন স্টারের মতোই বিপদজনক ভাবা হয়।

অঁহকদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ কোনো তথ্য কোথাও নেই। গ্যালাকটোপিডিয়াতে লেখা আছে—

অঁহক

অতি উন্নত বুদ্ধিমত্তার প্রাণী। ছোট ছোট দলে এরা অনন্ত মহাশূন্যে ভেসে বেড়ায়। অসংখ্য বাহু বিশিষ্ট প্রাণী। এদের খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি অজ্ঞাত। ধারণা করা হয় এরা খাদ্য গ্রহণ করে না। মহাজাগতিক বিকিরণ থেকে এরা প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে। অন্য সব বুদ্ধিমান প্রাণীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে চায়। তবে বিপদগ্রস্ত প্রাণীদের সাহায্যে অতি দ্রুত ছুটে আসে। ভগ্ন যন্ত্রাংশ ঠিক করা এবং আহত প্রাণীদের চিকিৎসায় এদের ক্ষমতা সীমাহীন।

অন্য বুদ্ধিমান প্রাণীদের কাছাকাছি এলে এরা নিজেদের অদৃশ্য রাখতে পছন্দ করে। এই ক্ষমতা তাদের আছে। তারা টেলিপ্যাথিক মাধ্যমেও বুদ্ধিমান প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম। আহত বুদ্ধিমান প্রাণীদের চিকিৎসা

দান কালে তারা এই ক্ষমতা ব্যবহার করে আহতের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেয়। তবে নিজেদের সম্পর্কে কিছুই বলে না।

তাদের যান্ত্রিক কোনো কিছু নেই। কারণ, তাদের যন্ত্রের কোনো প্রয়োজন নেই। মহাকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে তারা ছোট্টাছুটি করতে পারে।

ধারণা করা হচ্ছে অঁহকরা অতি শান্তিপ্ৰিয়। সিরাস নক্ষত্রের গ্রহ 'ভি থ্রি'র অতি উন্নত প্রাণী মায়রাদের একটি দল একবার অঁহকদের লক্ষ করে আণবিক ব্লাস্টার লেজার-নিও ব্লাস্টার এবং পজিট্রন ব্লাস্টার নিক্ষেপ করে। সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণার মতো অবস্থা তৈরি হয়। এর উত্তরে অঁহকরা তাদের যাত্রাপথ থেকে সরে যায় এবং তাদের কাছে একটি বার্তা পাঠায়। বার্তায় বলা হয়— ধ্বংসে আনন্দ নেই। আনন্দ সৃষ্টিতে।

অঁহকদের মোট সংখ্যা, তাদের জীবনকাল কিংবা বাসস্থান সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। খুব সম্ভব তাদের নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান নেই। তাদের শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া এবং জৈব রসায়ন বিষয়ক কোনো কিছুই জানা যায়নি। স্পেকট্রোগ্রাফিতে প্রাপ্ত সামান্য তথ্যে অনুমান করা হয় তারা মেঘ সদৃশ প্রাণী। তাদের বলয় থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে গামা রশ্মি এবং এক্স রশ্মির বিকিরণ হয়। এই বিকিরণ অনিয়মিত বলেই তাদের উপস্থিতি আগেই বোঝা যায় না।

গ্যালাকটোপিডিয়াতে অঁহকদের সম্পর্কে ধারণা কিছু নেই। মহাবিশ্বের অন্যসব বুদ্ধিমান প্রাণীদের সঙ্গেই তাদের যুক্ত করা হয়েছে। তবে তাদের স্থান হয়েছে রেড বুক। রেড বুক নামক গাছের অর্থ এদের কাছে যাওয়া অতি বিপদজনক।

স্পেসশিপ 'লি-২০১' একটি সাধারণ ফেরিশিপ। এর কাজ সৌরমণ্ডলের ভেতরের গ্রহ এবং উপগ্রহ থেকে খনি দ্রব্য মঙ্গল গ্রহে নিয়ে যাওয়া। খনিজ দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিতে সব বড় বড় কলকারখানাই মঙ্গল গ্রহে করা হয়েছে।

স্পেসশিপ লি-২০১-এর মাল বহনের ক্ষমতা অসাধারণ। এর ইঞ্জিন ইলেকট্রন এমিশন ইঞ্জিন। পুরানো ধরনের ইঞ্জিন হলেও ভারী ইঞ্জিন এবং কার্যকর ইঞ্জিন। সাধারণত $.2c$ [c আলোর গতিবেগ] গতিতে চলে। প্রয়োজনে এই গতিবেগ বাড়িয়ে $.6c$ পর্যন্ত যাওয়া যায়।

লি সিরিজের স্পেস শিপ পরিচালনার জন্যে কোনো মহাকাশ নাবিকের প্রয়োজন হয় না। সাধারণ এনারবিক রোবট কম্পিউটারের সাহায্যে এই কাজ সুন্দরভাবে করতে পারে।

তবে লি সিরিজের দু'শ'র উপরের নাম্বার শিপে অবশ্যই একজন মহাকাশ নাবিক লাগে। কারণ, এই সিরিজ তৈরি করা হয়েছিল মিল্কিওয়ে গ্যালিয়াম ভেতরের মাইনিং এর জন্যে। ইলেকট্রন এমিশন টেকনোলজি ছাড়াও এই জাতীয় মহাকাশযানে হাইপার স্পেস জাম্পের ব্যবস্থা আছে। দু'শ' সিরিজের এটি

দ্বিতীয় মহাশূন্যযান। প্রথমটি লি-২০০ মহাশূন্যে বিধ্বস্ত হয়েছিল। বিধ্বস্ত হবার কোনো কারণ জানা যায়নি। ধারণা করা হয় কোনো বিচিত্র কারণে মহাশূন্যযানটি হাইপার স্পেস জাম্প দেয়। সেট কোঅর্ডিনেট না থাকায় সেটা চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যায়।

এক হাজার টন গ্যালিয়াম ধাতু নিয়ে মহাকাশযান লি ২০১ বৃহস্পতির একটি উপগ্রহ থেকে মঙ্গলের দিকে রওনা হয়েছে। কন্ট্রোল প্যানেলে যে বসে আছে তার নাম নিম। বয়স মাত্র ২৭। মেয়েটি তিন মাস আগে মহাকাশযান পরিচালার সার্টিফিকেট পেয়েছে। তবে ট্রেনিং পিরিয়ড এখনো শেষ হয় নি। তাকে এক হাজার ঘণ্টার একা ফ্লাইং টাইম সংগ্রহ করতে হবে। নিম এখন পর্যন্ত সংগ্রহ করেছে দু'শ' একুশ ঘণ্টা। আজকের ফ্লাইট শেষ হলে আরো এগারো ঘণ্টা যুক্ত হবে।

নিমের চোখ কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে। তাকিয়ে থাকার কোনো অর্থ হয় নি। অটো পাইলট এ দেয়া আছে। আর মাত্র আটত্রিশ মিনিট এগারো সেকেন্ডে সে পৌঁছে যাবে মঙ্গলের উপগ্রহ ডিমোসের পাশে। ফিল্ড অরবিট নিয়ে অপেক্ষা করবে মঙ্গলে অবতরণ অনুমতির জন্যে। সেখানেও কিছু করতে হবে না। সবই অটো পদ্ধতিতে হবে। এই কাজের জন্যে মহাকাশ নাবিকের প্রয়োজন নেই। সাধারণ মানের একজন এনারবিক রোবটই যথেষ্ট। নিমের পাশের আসনে যে রোবটটি বসে আছে সে সাধারণ মানের নয়। যে-কোনো মহাকাশযান সে চালাতে পারে। অতি আধুনিক হাইপার স্পেস ডাইভার চালনার দক্ষতাও তার আছে। এই এনারোবিক রবটের নাম দূস। এরা s^2 টাইপ রোবট বলেই তাদেরকে মানুষের মতো আলাদা আলাদা নাম দিয়ে সম্মান দেখানো হয়।

দূস নিমের দিকে তাকিয়ে বিনীত গলায় বলল, 'মিস ক্যাপ্টেন আমি কি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি?'

নিম বলল, 'নিশ্চয়ই পার।'

দূস বলল, 'আপনি কি কোনো অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করছেন?'

'অস্বাভাবিকতাটা কী ধরনের?'

'আমাদের এই মহাকাশযানের গতি $.2c$ থাকার কথা। প্রোগ্রাম সে রকমই করা হয়েছে। আপনার কি মনে হয় না গতি বাড়ছে?'

নিম বিরক্ত গলায় বলল, 'সে রকম মনে হয় না। পর্দার দিকে তাকিয়ে দেখ গতি দেখানো আছে।'

দূস বলল, 'আপনি কি দয়া করে ভিউ ফাইডারের দিকে তাকাবেন। যে-কোনো দুটি উজ্জ্বল তারার দিকে তাকালেই লক্ষ্য করবেন আমাদের মহাকাশযানের গতি $.4c$ র কাছাকাছি।'

'এটা হতেই পারে না।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন এটা হতে পারে না। কিন্তু ফুয়েল কনজামশান

রেটের দিকে তাকাল আপনি দেখবেন আমি যা বলছি তা ঠিক।’

নিম অতি দ্রুত কয়েকটি রিডিং নিল। রিডিং থেকে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। ফ্যুয়েল কনজামশান রিডিং .4c গতিবেগের কথাই বলে। কিন্তু এই গতিবেগে কনট্রোল প্যানেলে লালবাতি জ্বলবে। হাইপার ডাউভ প্রক্রিয়া কার্যকর হবে।

দুস বলল, ‘ম্যাডাম আপনি ভীত হবেন না।’

নিম বলল, ‘আমি ভীত তোমাকে কে বলল?’

দুস বলল, ‘মহাকাশযানের গতি এখন .5c, ভীত হবার মতো পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে বলেই আমি আপনাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে ভীত না হবার জন্যে বলছি।’

নিম মঙ্গলের স্পেসশিপ মনিটরিং সেলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল। যোগাযোগ করা গেল না। দুস বলল, ‘ম্যাডাম কোনো মহাকাশযানের গতিবেগ যদি .5c র চেয়ে বেশি হয়ে যায় তখন সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়।’

‘এই তথ্য আমি জানি।’

‘আপনি যদি জানেন তাহলে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন কেন?’

‘তুমি আমাকে কী করতে বলছ?’

‘আমি আপনাকে ভীত না হবার জন্যে বলছি।’

‘একটু আগেই তুমি বলেছ ভীত হবার মতো ঘটনা ঘটেছে।’

দুস বলল, ‘আমার ধারণা যে সমস্যা তৈরি হয়েছে সে সমস্যা আপনার ট্রেনিং এর অংশ।’

নিম বলল, ‘তার মানে কী?’

‘ট্রেনিং নাবিকদের জন্যে মাঝে মাঝে পরিকল্পিতভাবে সমস্যা তৈরি করা হয়। দেখার জন্যে এরা সমস্যার সমাধান কীভাবে করে।’

‘তোমার এ রকম মনে হচ্ছে?’

‘আমি সম্ভাবনার কথা বলছি। নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।’

‘এই সমস্যাটি ট্রেনিং এর অংশ তার সম্ভাবনা কত?’

‘.30।’

‘বল কী এত কম সম্ভাবনা?’

‘ত্রিস পারসেন্ট সম্ভাবনা কম না, মিস ক্যাপ্টেন।’

‘৭০ পারসেন্ট সম্ভাবনা যে এটা বাস্তব সমস্যা?’

‘আপনি যথার্থ বলেছেন। মহাকাশযানের গতিবেগ বেড়েই চলেছে। ট্রেনিং এর সময়েও গতিবেগ এত বাড়ানো হয় না। তা ছাড়া এটা মাল বোঝাই ফেরিশিপ।’

‘এখন করণীয় কী?’

‘আপনি খুব ভালো করেই জানেন এখন করণীয়।’

‘তারপরেও তুমি আমাকে সাহায্য করো।’

‘আপনি যদি কূলকিনারা না পান তাহলে ইমার্জেন্সি ব্লু বাটন টিপবেন। ইমার্জেন্সি বাটন টেপার পর আপনার কিছুই করার থাকবে না। কম্পিউটার মিডিসি আপনার হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে। ছোট সমস্যা কিন্তু থেকেই যাবে মিস ক্যাপ্টেন।’

‘সমস্যা কী?’

‘যেসব ট্রেইনী নাবিক ব্লু বাটন টেপে তাদের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়। তারা আর কখনো আকাশে উড়তে পারবে না।’

‘আমার কী করা উচিত?’

‘আমার ইমার্জেন্সি বাটন টেপা উচিত।’

‘নিম ইমার্জেন্সি বাটনে চাপ দিল। প্যানেলে সবুজ আলো জ্বলে উঠল। কম্পিউটার মিডিসির ধাতব গলা শোনা গেল।’

‘কম্পিউটার মিডিসি বলছি। আমি মহাকাশযানের কম্পিউটারের কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। আমরা ক্রমবর্ধমান গতিতে এগুচ্ছি। অতি দ্রুত ত্বরণ বন্ধ করা প্রয়োজন। সেটা করা যাচ্ছে না। আয়ন ইঞ্জিনের যে ক্রটি ধরতে পেরেছি সেই ক্রটি সারানো এই মুহূর্তে সম্ভব নয়।’

নিম বলল, ‘ক্রটি কেন দেখা গেল?’

‘এই মুহূর্তে বলা সম্ভব হচ্ছে না। হাতে সময় নেই।’

‘তুমি এখন কী সিদ্ধান্ত নিয়েছ?’

‘কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। খুব অল্প সময়েই এই মহাকাশযান বিধ্বস্ত হবে। কারণ, এটি একটি মাল্টি-বোকাই কার্গো। .6c র গতিবেগ এ নিতে পারবে না।’

‘আমাদের হাতে কত সময় আছে?’

‘তিন মিনিটেরও কম।’

‘আমার কি কিছু করণীয় আছে?’

‘না। আপনি পেন্টাথেল থ্রি ইনজেকশন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। মৃত্যু হবে ঘুমের মধ্যে।’

নিম ঠাণ্ডা গলায় বলল, ‘অতি সুন্দর প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ।’

‘নিমের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণ হলো। ভয়াবহ বিস্ফোরণ।’

অঁহকদের ছোট্ট একটা দল দ্রুত কাজ করছে। তাদের কাজ যিনি তদারক করছেন তাকে তারা মহান শিক্ষক নামে ডাকছে। কাজের প্রতিটি পর্যায়ে তারা মহান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলছে। এমনও হচ্ছে একসঙ্গে সবাই কথা বলছে। মহান শিক্ষক একই সঙ্গে সবার কথার জবাব দিচ্ছেন।

মহান শিক্ষক বললেন, ‘তোমরা কি আনন্দ পাচ্ছ?’

একসঙ্গে সবাই বলল, ‘আমরা খুবই আনন্দ পাচ্ছি।’

‘আমরা কেন বেঁচে আছি?’

‘আনন্দের জন্যে বেঁচে আছি।’

‘আমরা কেন বেঁচে থাকব?’

‘আনন্দের জন্যে বেঁচে থাকব।’

‘মৃত্যু কী?’

‘আনন্দের সমাপ্তি।’

‘তোমরা যে মেয়েটির শরীরবৃত্তির ক্ষতি ঠিকঠাক করছ সে কোন সম্প্রদায়ের, তা কি জানো?’

‘জানি মহান শিক্ষক। সে মানব সম্প্রদায়ের।’

‘মানব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য কী?’

‘বৈশিষ্ট্যহীন একটি সম্প্রদায়। যাদের শরীরবৃত্তির কর্মকাণ্ড অতি দুর্বল।’

‘দুর্বল বলছ কেন?’

‘এরা অক্সিজেন নির্ভর একটি প্রাণী। অক্সিজেন একটি ভারী গ্যাস। ভারী গ্যাস নির্ভর প্রাণী দুর্বল হয়। হাইড্রোজেন বা হিনিয়াম নির্ভর প্রাণীরা সত্যিকার অর্থেই বুদ্ধিমান। যেমন আমরা হাইড্রোজেন নির্ভর।’

‘এর বাইরে কী আছে?’

‘এরা অতি নিম্নশ্রেণির বুদ্ধিহীন প্রাণীদের মতোই খাদ্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। কাজেই তারা চিন্তা বা শিক্ষার সময় পায় না। তারা তাদের সময়ের একটি বড় অংশ ব্যয় করে খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্য পরিপাক এবং খাদ্য বর্জনে।’

‘ভালো বলেছ, এদের আর কী ক্রটি আছে?’

‘এদের সভ্যতা যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা। এরা আমাদের মতো যন্ত্রমুক্ত না। মহান শিক্ষক আপনি বলেছেন যন্ত্রনির্ভর সভ্যতাই নিম্ন সভ্যতা। এই সত্যটি সব সময় মনে রাখবে।’

‘মহান শিক্ষক আমরা মনে রাখব।’

‘তোমাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে বলো।’

‘মেয়েটি যে যন্ত্রযানে করে এসেছে সেটি সম্পূর্ণ ঠিক করা হয়েছে। যন্ত্রযানের মূল ডিজাইনে একটি ক্রটি ছিল। আমরা সেই ক্রটিও ঠিক করে দিয়েছি।’

‘কাজটা করে কি আনন্দ পেয়েছ?’

‘মহান শিক্ষক খুবই আনন্দ পেয়েছি।’

‘মেয়েটির অবস্থা কী?’

‘কিছুক্ষণের মধ্যেই সেও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। মেয়েটির শরীরের যে অংশ অক্সিজেনবাহী তরল পরিপূর্ণ করে সেই অংশই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে সামান্য বেশি সময় আমরা নিয়েছি। তার জন্যে আমরা দুঃখিত মহান শিক্ষক।’

‘কাজটা করে কি তোমরা আনন্দ পেয়েছ?’

‘আমরা অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। এখন আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি।’

‘কী নির্দেশ?’

‘মেয়েটি জ্ঞান ফিরে পাবার পর যেন অত্যন্ত আনন্দ পায় তার জন্যে কিছু কি করব? তার শরীরের কিছু পরিবর্তন? তার জন্যে মঙ্গলময় হয় এমন কিছু পরিবর্তন?’

‘অবশ্যই করবে। আমরা উপকারী সম্প্রদায়। আমাদের কাজ দুর্বল সম্প্রদায়ের উপকার করা। তাদের ত্রুটি দূর করা। অতি দুর্বল বুদ্ধিমত্তার প্রাণীরা নিজেদের ত্রুটি ধরতে পারে না। মেয়েটির কোন কোন ত্রুটি সারাবার কথা ভাবছ?’

‘সে মহাকাশযান চালক। মাত্র দুটি হাতে এই জটিল মহাকাশযানের সমস্ত বোতাম এবং চক্রের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আমরা তাকে আরো বাড়তি দু’টা হাত দিতে চাচ্ছি।’

‘হাতের আঙুলের সংখ্যা পাঁচটির জায়গায় দশটি করে করতে চাচ্ছি।’

‘এটিও ভালো প্রস্তাব। করে দাও।’

‘মানব সম্প্রদায়ের পেছনে কোনো চোখ নেই। পেছনে চোখ না থাকার কারণে সে পেছনে দেখতে পারে না। পেছনে দেখার জন্যে তাকে সমস্ত শরীর ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে হয়। আমরা ভাবছি তার পেছনে একটি চোখ দিয়ে দেব।’

‘জায়গাটা ঠিক করেছ?’

‘ঘাড়ে দিতে চাচ্ছি।’

‘দাও ঘাড়েই দাও। তবে ঘাড়ে একটি চোখ না দিয়ে দু’টা চোখ দাও। মানব সম্প্রদায় সব সময় দু’টা চোখ ব্যবহার করে এসেছে। সেখানে হঠাৎ করে পেছনে একটা চোখ তার পছন্দ নাও হতে পারে।’

‘ঠিক আছে মহান শিক্ষক, আমরা পেছনেও দু’টা চোখ দিয়ে দেব।’

‘আর কিছু কী ভাবছ?’

‘আপনার অনুমতি পেলে আরেকটি ছোট পরিবর্তন করা যায়।’

‘বলো কী পরিবর্তন?’

‘মানব সম্প্রদায়ের গায়ের চামড়া সবচেয়ে দুর্বল। আমরা কি একটি ধাতব আবরণ দিয়ে দেব।’

‘না। তার প্রয়োজন দেখি না। চামড়া দুর্বল হলেও সে স্পেস শ্যুট পরে। এটি যথেষ্ট মজবুত। গায়ের চামড়া ছাড়া বাকি পরিবর্তনগুলি করে দাও।’

‘মহান শিক্ষক।’

‘বলো।’

‘মেয়েটি যখন তার শরীরের পরিবর্তনগুলি দেখবে তখন সে খুবই আনন্দ পাবে।’

‘অবশ্যই আনন্দ পাবে।’

‘মেয়েটির আনন্দের কথা ভেবেই আমাদের আনন্দ হচ্ছে।’

‘আনন্দ মানেই বেঁচে থাকা। আমরা বেঁচে আছি। তোমাদের সবার কাজে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট।’

‘ধন্যবাদ মহান শিক্ষক।’

নিমের মহাকাশযান মঙ্গল গ্রহের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তার জ্ঞান ফিরেছে কিছুক্ষণ আগে। সে হতভম্ব হয়ে তার চারটি হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে দূস।

নিম চোখ তুলে ছায়ার দিকে তাকাল।

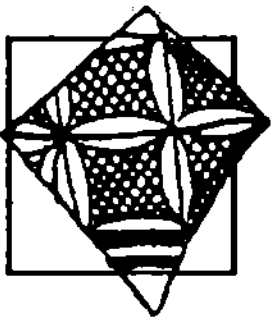
দূস বলল, ‘মিস ক্যাপ্টেন আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা ভয়ঙ্কর অঁহকদের হাতে পড়েছিলাম।’

নিমের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। সে এখনও জানে না তার ঘাড়েও দু’টা চোখ আছে। সেই চোখ দিয়েও পানি পড়ছে।

দূস বলল, ‘মিস ক্যাপ্টেন কাঁদবেন না। আপনার জন্যে একটি ভালো সংবাদ আছে।’

নিম ফোপাতে ফোপাতে বলল, ‘কাজো সংবাদটি কী?’

দূস বলল, ‘আপনার ঘাড়ে যে দু’টা চোখ আছে, সেই চোখ দু’টা আসল চোখের চেয়েও অনেক অনেক সুন্দর।’



পরেশের ‘হইলদা’ বড়ি

পরেশ বৈদ্য নয়াবাজারে একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করে। বত্রিশ ভাজা কাজ। সকালে দোকান ঝাড়ু দিয়ে তার দিনের শুরু হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত খদ্দেরদের সে কাপড় দেখায়, বিকিকিনি করে। ক্যাশ দেখে। দুপুরে তার এক ঘণ্টার ছুটি। এই এক ঘণ্টায় সে রান্নাবান্না করে। তার রান্নার হাত ভালো। দোকানের মালিক

আজিজ মিয়া তার হাতের রান্নার বিশেষ ভক্ত। অনেককেই তিনি বলেছেন, 'হিন্দুটা রান্না ভালো। বিশেষ করে মাষকলাইয়ের ডাল। বাংলাদেশে এত ভালো মাষকলাইয়ের ডাল আর 'কেউ যদি রান্নাতে পারে তাহলে আমি কান কেটে ফেলব।'

আজিজ মিয়া পরেশ বৈদ্যকে খুবই পছন্দ করেন। মানুষটা সৎ। তার কোনো দাবিদাওয়া নাই। থাকা খাওয়া এবং মাসে মাত্র তিনশ টাকায় এমন বিশ্বাসী লোক পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আজিজ মিয়া প্রায়ই ভাবেন পরেশের বেতন বাড়িয়ে পাঁচশ করে দেবেন। সেটা সম্ভব হচ্ছে না। দোকানে হাটবার ছাড়া বিকিকিনি একেবারেই নাই। নয়াপাড়া অতি অজ জায়গা। অঞ্চলটাও দরিদ্র। গামছা ছাড়া কাপড় কেনার সামর্থ্যও মানুষের নেই।

বেতন বাড়াতে না পারলেও ভদ্র ব্যবহার দিয়ে আজিজ মিয়া সেটা পুষিয়ে দেন। দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যাবার সময় তিনি পরেশকে সঙ্গে নিয়ে যান বাড়িতে। পাশে বসিয়ে যত্ন করে খাওয়ান। খাওয়াদাওয়ার শেষে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করেন। পরেশ দোকানে ফিরে যায়। রাতে সে দোকানেই ঘুমায়।

আজিজ মিয়ার চার মেয়ে। বড় দু'টা বিবাহযোগ্য। তাদের জন্যে পাত্র খোঁজা হচ্ছে। মনমতো পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। পরেশ বৈদ্য হিন্দু না হয়ে মুসলমান হলে তিনি অবশ্যই তার বড় মেয়ে পরিশ্রী খানমের সঙ্গে তার বিবাহ দিতেন। পরেশ যদি এখন মুসলমান হয় তাহলে তিনি বিবেচনা করবেন। শুধু পরেশের বয়স একটু বেশি। চল্লিশের উপর। তবে পুরুষমানুষের জন্যে বয়স কিছু না। মেয়েদের বয়সটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পুরুষের না।

তিনি বিষয়টা নিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছেন। তাঁর স্ত্রী খাদিজা বেগম হতভম্ব হয়ে বলেছেন, 'মালারূপের সাথে মেয়ে বিবাহ দিতে চান? কী বলেন আপনি?'

'মুসলমান হবার পরে বিবাহ করবে। ইসলাম ধর্মীয় মতে বিবাহ।'

'কচ্ছপ খাওইন্যার সাথে মেয়ের বিবাহ। ছিঃ!'

'মুসলমান হবার পরে তো আর কচ্ছপ খাবে না।'

'এইসব আপনি ভুলে যান। কর্মচারীর সাথে মেয়ের বিবাহ! আল্লা মাফ করুক। ছেলের শিক্ষা নাই দীক্ষা নাই। আপনার মেয়ে কলেজে ভর্তি হইছে।'

পরেশ বৈদ্যের লেখাপড়ায় সামান্য ঘাটতি আছে। সে ক্লাস সিক্স-সেভেন পর্যন্ত পড়েছে। তবে তার হাতের লেখা অত্যন্ত সুন্দর। মুক্তার মতো অক্ষর। তবে মুক্তাক্ষর কোনো পাত্রের গুণ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

এক আষাঢ় মাসের কথা। সারা দিন খটখটে রোদ গেছে। সন্ধ্যা নাগাদ আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। শুরু হলো প্রবল বর্ষণ। আজিজ মিয়া ঠিক করলেন আজ আর বাড়ি ফিরবেন না। দোকানেই রাতটা কাটিয়ে দেবেন। কাঁদা ভেঙে দুই মাইল হাঁটার অর্থ হয় না। তা ছাড়া বাড়ির কাছাকাছি খালের মতো

আছে। আগে পায়ে হেঁটে খাল পার হওয়া যেত। গত কয়েক দিন পানি বেড়েছে। আজ যে বৃষ্টি— খালে সাঁতার পানি হয়ে যাবার কথা।

আজিজ মিয়া পরেশকে ডেকে বললেন, ‘ভালু রেঁধে ফেল। রাতে আর বাড়িতে যাব না।’

পরেশ নিচু গলায় বলল, ‘মামানি দুঃশ্চিন্তা করবেন না? (আজিজ মিয়ার স্ত্রীকে পরেশ মামানি ডাকে)।’

আজিজ মিয়া বললেন, ‘করুক দুঃশ্চিন্তা। মেয়েছেলে যদি মাঝে মাঝে দুঃশ্চিন্তা না করে তাহলে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়। আল্লাপাক মেয়েছেলে পয়দা করেছেন দুঃশ্চিন্তা করার জন্যে।’

‘রাতে খাবেন কী?’

‘মাংস খেতে মনে চাচ্ছে। মাংস এখন পাব কই। খিচুড়ি করো। সঙ্গে ডিম ভূনা। পাতলা খিচুড়ি করবে।’

‘আচ্ছা করব।’

‘খিচুড়ির মধ্যে চায়ের চামচের দুই চামচ ঘি দিয়ে দিও। ঘিয়ের সুঘ্রাণ ভালো লাগবে। ঘি আছে না?’

‘আছে।’

‘কাঁঠালের বিচি দিয়ে ঝাল মুরগির মাংস খেতে পারলে দিলকুস হতো। ডিমও খারাপ না।’

আজিজ মিয়া রাতে খুব তৃপ্তি করে খেলেন। তিনি ঠিক করলেন, বৃষ্টি-বাদলার দিনে পরেশকে সব সমস্ত পাতলা খিচুড়ি এবং ডিমের তরকারি করতে বলবেন। তাঁর পান তামাকের অভ্যাস নেই তারপরেও তিনি দু’টা পান খেলেন। পরেশকে দিয়ে সিগারেট আনালেন। সিগারেট ধরিয়ে অতি আনন্দে টানতে লাগলেন।

দোকানের গন্ধিতে বিছানা করা ছিল। তিনি ঘুম ঘুম চোখে বিছানায় গেলেন। টিনের চালে বৃষ্টি পড়ছে। ঝুমঝুম শব্দ। আরামদায়ক ঠাণ্ডা হাওয়া। আজিজ মিয়ার মনে হলো তিনি জগতের অতি সুখী মানুষদের একজন।

পরেশ বলল, ‘একটু চুল টেনে ঘুম পাড়ায়ে দেই। আরাম লাগবে।’

পরেশ চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। আজিজ মিয়ার এত আরাম লাগছে যে বলার না। আবার ঘুমও পাচ্ছে প্রচণ্ড। তিনি চেষ্টা করছেন জেগে থাকতে। ঘুমিয়ে পড়লে এই আরামটা পাওয়া যাবে না।

‘পরেশ।’

‘জি মামা?’

‘এ রকম মাথা বানানো কোথায় শিখেছ? একমাত্র নাপিতরাই এত সুন্দর মাথা বানায়। তোমাদের বংশে কোনো নাপিত ছিল?’

‘না মামা।’

‘তোমার বেতন বাড়ানোর চেষ্টা নিব। বাড়ানো উচিত। রোজগার পাতি নাই বলে কিছু করতে পারতেছি না।’

‘দরকার নাই মামা।’

‘দরকার যে নাই তুমি তা বলবেই। কারণ, তুমি অতি ভালো ছেলে। তুমি যদি ‘কচ্ছপ খাওয়া’ ধর্মের না হতে অবশ্যই পরীবানুর সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতাম। পরীবানুর চেহারা ছবি তো খারাপ না। কী বলো? তবে মিজাজ ভালো না। মায়ের মতো চড়া মিজাজ। মেয়েছেলের চাড়া মিজাজ সংসারের জন্যে ভালো না।’

পরেশ জবাব দিচ্ছে না। একমনে চুল টেনে যাচ্ছে। আজিজ মিয়া চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন এবার পাশ ফিরলেন। পাশ ফিরে আরাম আরো বাড়ল। পরেশ এখন ঘাড় ম্যাসেজ করে দিচ্ছে। এই ম্যাসেজে আরাম আরো বেশি হচ্ছে। আজিজ মিয়া চেষ্টা করছেন আরো কিছুক্ষণ জেগে থাকতে। ঘুমিয়ে পড়া মানে সব শেষ।

‘পরেশ।’

‘মামা বললেন।’

‘চুপ করে থাকবা না। কথা বলো। গল্পগুজব করো।’

‘কী গল্প করব?’

‘যা ইচ্ছা করো। মাথা ম্যাসেজ ছাড়া আর কী বিদ্যা তুমি জানো? বলতে থাক শুনি। আমার ধারণা তুমি আরো অনেক কিছু জানো।’

‘জানি মামা।’

‘বলো। একটা একটা করে বলো। বাদ্য বাজনা জানো?’

‘না বাদ্য বাজনা জানি না। তবে আমি সামনে পিছনে সব দেখতে পারি।’

‘এইটা কি বললো পরেশ। সামনে পিছনে তো সবই দেখে। সামনে দেখি আবার ঘাড় ঘুরাইয়া পিছনে তাকাইলে পিছন দেখি।’

‘আমারটা এই ক্ষমতা না।’

‘কীরকম?’

‘ধরেন আইজ থাইক্যা এক লাখ বছর পরে পৃথিবীর কী অবস্থা হইবে এই গুলান দেখতে পারি।’

‘ভালো। খুব ভালো।’

‘একজন আমারে একটা হইলদা বড়ি খাওয়াইছিল তখন থাইক্যা দেখি।’

‘কী বড়ি?’

‘ইলদা বড়ি।’

আজিজ মিয়া পুরোপুরি তন্দ্রার মধ্যে চলে গেলেন। চেতনার অতি সামান্যই অবশিষ্ট আছে। পরেশের কথা শুনছেন পুরোপুরি বুঝতে পারছেন না। নিজেও মাঝেমধ্যে কথা বলছেন। কী বলছেন সেই বিষয়েও তাঁর ধারণা নেই।

পরেশ বলল, ‘আমি সবই দেখতে পাই।’

আজিজ মিয়া বললেন, ‘সব দেখতে পাওয়াই ভালো। কিছু দেখা কিছু না দেখা ভালো না।’

‘আসমানে যে চণ্ড আছে সেই চণ্ড কিন্তু মামা থাকবে না। পৃথিবীর উপরে আইসা পড়বে।’

‘পড়ুক। ধুম কইরা পড়ুক। চণ্ড না থাকা ভালো। চণ্ড আসমানে থাকলেই জোছনা হয়। সেই জোছনায় অনেক পাপকার্য হয়। আমি নিজেই এই রকম একটা পাপকার্য করেছিলাম। পাটক্ষেতে। আসমানে চণ্ড থাকা উচিত না। গেরামে পাটক্ষেত থাকাও উচিত না। বুঝেছ?’

‘বুঝেছি মামা। সূর্যের কী গতি হইব শুনবেন?’

‘বলো শুন।’

‘সূর্য সবকিছু টান দিয়া নিজের উপরে ফেলব। আগুনের থাবা বাইর কইরা টান দিব। তারপরে ছোট হওয়া ধরব। বিন্দুর মতো ছোট হইব।’

‘কি বললা— বিন্দু?’

‘হুঁ মামা বিন্দু।’

‘আমার খালাতো এক বোন ছিল বিন্দু নাম। বিবাহ হয়েছে। জামাই সউদিতে কাজ করে। বিরাট পয়সা করেছে।’

‘জগতের যা কিছু আছে বুঝছেন মামা? সব একদিন আন্ধাইর হইয়া যাইব। আসমানে কোনো তারা থাকব না। সব নিভা। তখন মাঝে মইদ্যে গমগম আওয়াজ উঠব। মামা বুঝছেন?’

‘বজ্রপাতের আওয়াজ। বুঝেছি। বড় বৃষ্টির মধ্যে বজ্র পড়বই। ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছে। গায়ে একটা চাদর দিয়া দেও।’

পরেশ মামার পায়ে চাদর দিতে দিতে বলল, ‘হইলদা বড়ি আমারে কে দিছিল সেই ঘটনা শুনছেন মামা? বিরাট ইন্টারেস্টের ঘটনা।’

‘বড়ি পয়সা দিয়া খরিদ করছিলা?’

‘না। এবেই দিছে।’

‘বিরাট বড় হাই তুলতে তুলতে আজিজ মিয়া বললেন, ‘মাগনা অশুধে কাম করে না। অশুধ বিষুধ যখনই কিনবা পয়সা হইলেও হাদিয়া দিবা। মনে থাকব?’

‘থাকব। এখন কি ঘটনাটা বলব?’

‘কী ঘটনা?’

‘হইলদা বড়ি কে দিছে সেই ঘটনা। বিরাট ইন্টারেস্টের ঘটনা।’

‘বাদ দেও। ঘটনা যত কম শুন্য যায় ততই ভালো। ঘুমে চউখ বন্ধ হইয়া আসতেছে। এখন ঘুমাব।’

‘আচ্ছা ঘুমান।’

‘তুফান হইতেছে না কি?’

‘না এখনও শুরু হয় নাই। তবে শেষ রাইতে বিরাট তুফান হইব। লগ্নভণ্ড তুফান।’

‘কে বলছে?’

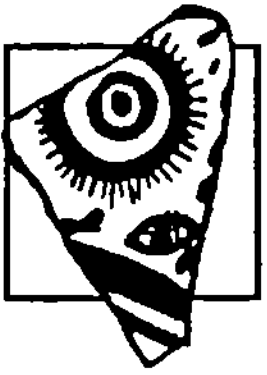
‘আপনেরে বলছি না হইলদা বড়ি খাওনের পরে আমি সব জানি। দূরের জিনিস যেমন জানি কাছের জিনিসও জানি।’

‘ও আইচ্ছা। জানা ভালো। কাছের জিনিস জানা খারাপ না।’

বলতে বলতে আজিজ মিয়া ঘুমিয়ে পড়লেন। গাঢ় ঘুম। ঘুমের মধ্যে তাঁর নাক ডাকতে লাগল।

পরেশ তাঁর মাথার কাছে বসে এখনও চুল টেনে দিচ্ছে। সে ঘুমাতে যাচ্ছে না। কারণ, আজ রাত একটা অতি ভয়ঙ্কর রাত। এই রাতে বিরাট ঝড় হবে সেটা ভয়ঙ্কর কিছু না। ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো ঝড়ের ঠিক আগে আগে পরীবানু গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন দেবে।

হইলদা বড়ি খাওয়ার কারণে পরেশ সবই জানে। এও জানে যে, গায়ে আগুন দেয়ার ঘটনাটা আটকানোর কোনো উপায় নেই। উপায় থাকলে সে আটকাতো। হইলদা বড়ি তাকে শিখিয়েছে এই বিশ্বাসঘাতকের জন্য থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা ঘটীর সব ঘটে আছে। এর কোনো কিছুই কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। মানুষের কাজ শুধুই দেখে যাওয়া।



AMARBOL.COM

জাদুকর

আজ হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার অঙ্কখাতা দিয়েছে।

বাবলু পেয়েছে সাড়ে আট। শুধু তাই নয়, খাতার উপর লাল পেনসিল দিয়ে ধীরেন স্যার বড় বড় করে লিখে দিয়েছেন, ‘গরু’। কী সর্বনাশ!

বাবলু খাতা উল্টে রাখল। যাতে ‘গরু’ লেখাটা কারো চোখে না পড়ে। কিন্তু ধীরেন স্যার মেঘস্বরে বললেন, ‘এই, বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়া।’

বাবলু বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়াল।

‘তোর অঙ্ক খাতায় কী লিখে দিয়েছি সবাইকে দেখা।’

সে মুখ কালো করে সবাইকে দেখাল খাতাটা। ফাস্ট বেঞ্চে বসা কয়েক জন ভ্যাকভ্যাক করে হেসে ফেলল। ধীরেন স্যার গর্জন করে উঠলেন। ‘এ্যাই, কে হাসে! মুখ সেলাই করে দেব।’

হাসি বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ধীরেন স্যারকে সবাই যমের মতো ভয় করে। আড়ালে ডাকে ‘যম স্যার’। ফাস্ট বেঞ্চে আবার একটু খিকখিক শব্দ হলো। ধীরেন স্যার হুংকার দিয়ে উঠলেন। ‘আরেকবার হাসির শব্দ শুনলে চড় দিয়ে দাঁত খুলে ফেলব। নাট্যশালা নাকি? এ্যা?’

ক্লাস পুরোপুরি নিঃশব্দ হয়ে গেল। ধীরেন স্যার থমথমে গলায় বললেন, ‘এ্যাই বাবলু, তুই ঘণ্টা না পড়া পর্যন্ত বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাকবি।’

বাবলু উদাস চোখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। বেঞ্চির উপর এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা তেমন কিছু না। কিন্তু বাসায় ফিরে বাবাকে কী বলবে এই ভেবেই বাবলুর গায়ে ক্ষণে-ক্ষণে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। বাবা মোটেই সহজ পাত্র নন। ধীরেন স্যারের মতো মাস্টারও তাঁর কাছে দুঃখপোষক শিশু। বাড়িতে আজ ভূমিকম্প হয়ে যাবে, বলাই বাহুল্য। বাবলু এই ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও কুলকুল করে ঘামতে লাগল।

বাবলু ভেবে পেল না অঙ্কের মতো একটা ভয়াবহ জিনিস কী করে পড়াশোনার মধ্যে ঢুকে গেল। কী হয় অঙ্ক শিখতে তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে বাঁদরের উঠবার দরকারটা কী? আচ্ছা ঠিক আছে, উঠছে উঠে পড়ুক। কিন্তু প্রথম মিনিটে উঠে দ্বিতীয় মিনিটে আবার পিছললে পড়বার প্রয়োজনটা কী? বাবলু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

স্কুল ছুটি হলো পাঁচটায়। বাবলু বাড়ি না গিয়ে স্কুলের বারান্দায় মুখ কালো করে বসে রইল। স্কুলের দপ্তরী আনিস মিয়া বলল, ‘বাড়িত যাও ছোট ভাই।’

বাবলু বলল, ‘আমি আজকে এইখানেই থাকব।’

‘কও কী ভাই! বিষয় কী?’

‘বিষয় কিছু না। তুমি ভাগো।’

আনিস মিয়া একগাল হেসে বলল, ‘পরীক্ষায় ফেইল করছ, কেমন? বাড়িত থাইক্যা নিতে না আসলে যাইতা না। ঠিক না?’

আনিস মিয়া দাঁত বের করে হাসতে লাগল। বাবলু স্কুল থেকে ছুটে বাইরে চলে আসল। সরকার বাড়ির জামগাছের নিচে বসে রইল একা একা।

জায়গাটা অসম্ভব নির্জন। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। বাবলুকে ভয় দেখানোর জন্যেই হয়তো অসংখ্য বিঁঝি একসঙ্গে ডাকতে লাগল। বিলের দিক থেকে শব্দ আসতে লাগল, ‘হঅ হঅ’। ডানপাশের ঝোপ কেমন যেন নড়ে উঠল। বাবলু শার্টের লম্বা হাতায় ঘনঘন চোখ মুহতে লাগল।

‘এই ছেলে, কাঁদছ কেন?’

অন্ধকারে ঠিক পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না। বাবলুর মনে হলো লম্বামতো

একজন লোক ঝোপটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির হাতে ভারী একটা ব্যাগ জাতীয় কিছু। পিঠেও এ-রকম একটা বোচকা ফিতা দিয়ে বাঁধা।

‘এই খোকা, কী হয়েছে?’

বাবলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, ‘আমি অঙ্কে সাড়ে আট পেয়েছি।’

‘তাই নাকি?’

‘জি। আর ধীরেন স্যার আমার খাতার উপর লিখেছেন— গরু।’

বাবলু খাতাটা বের করে লোকটির দিকে এগিয়ে দিল। লোকটি এগিয়ে এসে খাতাটি নিল। সে বেশ লম্বা। এই অন্ধকারেও প্রকাণ্ড বড় একটা চশমা পরা থাকায় প্রায় সমস্তটা মুখ ঢাকা পড়ে আছে।

লোকটি গম্ভীর গলায় বলল, ‘খাতার উপর গরু লেখাটা অন্যায় হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তির উপর সরাসরি কটাক্ষ করা হয়েছে। তার উপর এত বড় বড় করে লেখার প্রয়োজনই বা কী? ছোট করে লিখলেই হতো।’

বাবলু শব্দ করে কেঁদে উঠল।

‘উহঁ, কাঁদবে না। কাঁদার সময় নয়। কী করা যায় এখন তাই নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে।’

বাবলু ধরা গলায় বলল, ‘আমি স্কুলেও যাব না। বাসায়ও ফিরে যাব না। বাকি জীবনটা জামগাছের নিচে বসে কাটার। না জাহাজের খালাসি হয়ে বিলাত চলে যাব।’

‘বুদ্ধিটা মন্দ না। কিন্তু চট করে কিছু একটা করা ঠিক হবে না। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে। তোমার নাম তো জ্ঞান হলো না।’

‘আমার নাম বাবলু। ক্লাসে সেয়েতনে পড়ি। আপনি কে?’

‘ইয়ে আমার নাম হলো গিয়ে হইয়েৎসুন।’

‘কী বললেন?’

‘আমার নামটা একটু অদ্ভুত, আমি বিদেশী কিনা!’

‘কী করেন আপনি?’

‘আমি একজন পর্যটক। আমি ঘুরে বেড়াই।’

বাবলু কৌতূহলী হয়ে বলল, ‘আপনার দেশ কোথায়?’

‘আসো, তোমাকে দেখাচ্ছি।’

হইয়েৎসুন আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, ‘ঐ যে দেখছ ছায়া ছায়া, ওইটা হচ্ছে ছায়াপথ। মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি। স্প্রিংয়ের মতো। এর মাঝামাঝি একটি সৌরমণ্ডল আছে। আমরা তাকে বলি ‘নয়ুততিনি’ তার ন’নম্বর গ্রহটিতে আমি থাকতাম।’

বাবলু একটু সরে বসল। পাগল নাকি লোকটা! কথা বলছে দিব্যি ভালো মানুষের মতো।

‘বুঝলে বাবলু, বলতে গেলে আমরা বেশ কাছাকাছি থাকি। পৃথিবীও কিন্তু

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে পড়েছে। হা হা হা।’

‘আপনারাও বুঝি বাংলায় কথা বলেন?’

‘উইঁ। তোমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলছি কারণ আমার সঙ্গে একটি অনুবাদক যন্ত্র আছে।’

সে ইশারা করে গোলাকৃতি একটি বাক্স দেখাল। বাক্সটি তার কাঁধের কাছে ঝুলছে। মশার আওয়াজের মতো পিনপিন একটি শব্দ আসছে সেখান থেকে।

‘এই যন্ত্রের সাহায্যে যে-কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর ভাষা বুঝতে পারা যায় এবং সে ভাষায় কথা বলা যায়। প্রাণীদের মস্তিষ্কের নিওরোনে বিভিন্ন ধ্বনির যে লাইব্রেরি আছে এবং শব্দবিন্যাসের যে সমস্ত ধারা তা এই যন্ত্রটি ধরতে পারে।’

বাবলুর একটু ভয় ভয় লাগল। লোকটি বলল, ‘এই যে চারদিকে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে এরা কী বলছে তা তুমি বুঝতে পারবে যদি যন্ত্রটা তোমার কাঁধে ঝুলিয়ে দেই, দেব?’

বাবলু ভয়ে ভয়ে বলল, ‘দিন, কিন্তু ব্যথা লাগবে না তো?’

‘উইঁ। মাথা খানিকটা ভোঁ-ভোঁ করবে হয়ত। দিগ্বেদে দেখ।’

হইয়েৎসুন যন্ত্রটা বাবলুর কাঁধে বসিয়ে দিতেই বাবলু গুনল, ঝিঁঝি পোকাগুলো কথা বলছে।

‘পোকা চাই। খাবারের জন্যে পোকা চাই।’

এ লোক দুটি যাচ্ছে না কেন? কী করছে, কী করছে?’

‘এরা দু’জন কী করছে?’

‘পোকা চাই। পোকা চাই। পোকা চাই।’

বাবলু স্তম্ভিত হয়ে গেল। লোকটি বলল, ‘মানুষ যেভাবে কথা বলে এরা কিন্তু সেভাবে কথা বলে না। তাঁনার সঙ্গে ডানা ঘসে শব্দ করে। ভাবের আদান-প্রদানের কত অদ্ভুত ব্যবস্থাই না প্রাণী জগতে আছে!’

বাবলু তার কথায় কান দিচ্ছিল না। কারণ, সে পরিষ্কার গুনতে পেল জামগাছের একটি পাতার বাসা থেকে ফিসফিস করে কথাবার্তা হচ্ছে।

‘আহা, এই লোক দুটি কি বকবক শুরু করেছে? ঘুমুতে দেবে না নাকি?’

‘ঠিক বলেছ। মানুষদের মধ্যে কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছুই নেই। এগুলো মহাবোকা।’

বলতে বলতে পাখিগুলো খিকখিক করে হাসতে লাগল।

লোকটি বলল, ‘বাবলু যন্ত্রটি এবার খুলে ফেলা যাক। তোমার অভ্যাস নেই তো, মাথা ধরে যাবে।’

বাবলু বলল, ‘আমি যদি এখন ওদের সঙ্গে কথা বলি ওরা আমার কথা বুঝতে পারবে?’

‘দু’ একটা কথা বুঝতে পারে। তবে বেশির ভাগই বুঝবে না। ওদের বুদ্ধিবৃত্তি নিম্নস্তরের। অবিশ্যি সবার না। পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধিমান প্রাণী আছে।

যেমন ধরো তিমি মাছ ।’

‘তিমি মাছ বুদ্ধিমান?’

‘অত্যন্ত বুদ্ধিমান । শুধু হাত নেই বলে যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারে না । ডলফিনও খুব বুদ্ধিমান । ওদের যদি হাত থাকত তাহলে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে যেত ।’

‘ওদের হাত নেই কেন?’

‘প্রকৃতির খেলা । প্রকৃতির খেলাপিপনার জন্যে তিমি এবং ডলফিনের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীদেরও পশুর মতো জীবনযাপন করতে হচ্ছে ।’

হইয়েৎসুন একটি ছোট নিশ্বাস ফেলে যন্ত্রটা বাবলুর কাঁধ থেকে নিয়ে নিল ।

‘এবার তোমার ব্যাপারটা চিন্তা করা যাক । কী ঠিক করলে? জাহাজের খালাসি হবে?’

‘না ।’

‘তবে কি অন্ধকারে জামগাছের নিচে বসে থাকবে?’

‘উঁহু । আমি আপনার সঙ্গে যাব ।’

‘তাই বুঝি?’

‘জি ।’

‘কিন্তু তা সম্ভব নয় । আমাদের চলাফেরার জন্যে রকেট বা স্পেসশিপ নেই । আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাই সরাসরি বস্তু স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় । তোমাকে দিয়ে তা হবে না । তা হলে আমি এখন যাব তোমাদের বৃহস্পতি গ্রহের একটি চাঁদে । তার নাম হচ্ছে টিটান । সেখানে অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী আছে ।’

‘আমিও আপনার সঙ্গে টিটানে যাব ।’

‘একেবারেই অসম্ভব । সে জায়গাটা বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাসে ভরপুর । তার উপর আছে সালফার আই-অক্সাইড । আমার তাতে কিছু হবে না । কিন্তু তুমি মারা যাবে সঙ্গে সঙ্গে ।’

বাবলু মুখ কালো করে চুপ করে রইল । লোকটি শান্তস্বরে বলল, ‘তুমি বরং ভালোমতো পড়াশোনা শুরু করো । কারণ, তোমাদের এখানে অনেক কিছুই শেখার আছে । অঙ্কে সাড়ে আট পেলে হবে না ।’

বাবলু কোনো উত্তর দিল না । লোকটি বলল, ‘মানুষের মস্তিষ্ক হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর । ইচ্ছে করলেই এরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমাদের ছাড়িয়ে যাবে ।’

বাবলু মুখ কালো করে বলল, ‘আমি অঙ্ক-টংক কিছু শিখতে চাই না ।’

হইয়েৎসুন হেসে ফেলল । হাসতে হাসতেই বলল, ‘মানুষেরা প্রাণী হিসেবে কিন্তু খুব অদ্ভুত । এরা প্রায় সময়ই যা ভাবে তা বলে না । মুখে এক কথা বলে কিন্তু মনের কথা ভিন্ন । তুমি মনে-মনে ভাবছ এখন থেকে খুব মন দিয়ে অঙ্ক শিখবে যাতে ও ধরনের যন্ত্র বানাতে পার কিন্তু মুখে বলছ অন্য কথা । ঠিক না?’

বাবলু থেমে বলল, ‘আপনি কী করে বুঝলেন?’

‘আমার কাছে ছোটখাটো একটা কমুনিকের যন্ত্র আছে। তা দিয়ে বুদ্ধিমান প্রাণীরা কী ভাবছে তা অনেক দূর থেকে টের পাওয়া যায়। যেমন ধরো, যন্ত্রটা তোমার কাঁধে ঝুলিয়ে দিলে তুমি বুঝতে পারবে তোমার বাবা এবং তোমার ধীরেন স্যার এই মুহূর্তে কী ভাবছেন। তাঁরা দু’জনেই হারিকেন নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তোমাদের স্কুলের দপ্তরী আনিস মিয়া বাসায় গিয়ে খবর দেয়ার পর থেকেই তোমার বাবা খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন। তোমার বাবার মনের অবস্থাটা বুঝতে চাও?’

বাবলু মাথা নাড়ল, সে বুঝতে চায়। লোকটি যন্ত্রটা কাঁধে ঝুলিয়ে দিতেই বাবলু শুনল, বাবা মনে-মনে বলছেন, আমার পাগলা ছেলেটা কোন অন্ধকারে একা একা বসে আছে কে জানে!

সাড়ে আট পেয়েছে তো কী হয়েছে? আহা বেচারী! আমার ভয়ে বাড়িও আসতে পারছে না। নাহ্ আর কোনোদিন রাগারাগি করব না। ভাবতে ভাবতে বাবা চোখ মুছলেন।

ধীরেন স্যারও ঠিক একই রকম কথা ভাবছে। আহা বাচ্চা ছেলেটা কোথায় না কোথায় বসে আছে অন্ধকারে। খাতায় গুরু লেখাটা খুবই অন্যায় হয়েছে। সেই লজ্জাতেই বাড়ি যাচ্ছে না। নাহ্ ছাত্রদের সঙ্গে আরেকটু ভদ্র ব্যবহার করা দরকার। আর এই রকম রাগারাগি করব না। বাবলুটাকে রোজ এক ঘণ্টা করে অঙ্ক শেখাব।

হইয়েৎসুন হাসতে হাসতে বলল, ‘কি, শুনলে তাদের মনের কথা?’

‘হুঁ।’

‘জাহাজের খালাসি হবার পরিকল্পনা এখনো আছে?’

‘জি না।’

‘ভালো। খুব ভালো। তা বাবলু সাহেব, আমার তো এখন যেতে হয়।’

‘আরেকটু বসুন।’

‘না, আর বসা যাচ্ছে না। তোমার বাবা আর তোমার স্যার এদিকেই আসছেন। আমাকে দেখলে ব্যাপারটা ভালো হবে না। যাই তাহলে, কেমন?’

তার কথা শেষ হবার আগেই বাবাকে এবং ধীরেন স্যারকে দেখা গেল। দপ্তরী আনিস মিয়া একটি হারিকেন হাতে আগে আগে আসছে। বাবলু ভিন গ্রহের লোকটিকে আর দেখতে পেল না।

বাবা এসেই প্রচণ্ড একটা চড় বসালেন। রাগী গলায় বললেন, ‘এই বয়সে বাঁদরামি শিখেছিস। বাড়ি না গিয়ে গাছের নিচে বসে ধ্যান করা হচ্ছে। তোর পিঠের ছাল তুলব আজকে।’

ধীরেন স্যার থমথমে স্বরে বললেন, ‘খারাপ পরীক্ষা হয়েছে— কোথায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে বই নিয়ে বসবি তা না, সাপখোপের আড্ডার মধ্যে এসে

বসা। আগামী কাল তুই সারা পিরিয়ড আমার ক্লাসে নীলডাউন হয়ে থাকবি।
গুরু কি আর সাথে লিখেছি?’

বাবলু এঁদের কথায় একটুও রাগ করল না। কারণ, এখন সে নিশ্চিত জানে
এসব তাদের মনের কথা নয়। তা ছাড়া সে হারিকেনের আলোয় স্পষ্ট দেখল
বাবার চোখ ভেজা। কাঁদতে কাঁদতেই তাকে খুঁজছিলেন।



পিশাচ

‘স্যার, আমি পিশাচ-সাধনা করি।’

আমি কৌতূহল নিয়ে পিশাচ-সাধকের দিকে তাকালাম। মামুলি চেহারা।
মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথার চুল নেই। শরীরের তুলনায় মাথা বেশ
ছোট। সেই মাথা শারীরিক কোনো অসুবিধার কারণেই হয়তো সারাক্ষণ
বামদিকে ঝুঁকে আছে। তার হাতে কালো কাপড়ে ঢাকা একটা পাখির খাঁচা।
খাঁচায় যে পাখিটা আছে সেটা খুব সম্ভব কাক। পা ছাড়া পাখিটার আর কিছু
দেখা যাচ্ছে না। কাকের পা বলেই মনে হচ্ছে।

লোকটার বয়স আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম। গ্রামের অভাবী মানুষের বয়স
চট করে ধরা যায় না। দুঃখ ধান্দায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরেই তাদের মধ্যে বুড়োটে
ভাব চলে আসে। আমার কাছে মনে হলো, লোকটার বয়স চল্লিশের বেশি হবে
না। মাথার চুল অবিশ্যি বেশির ভাগই পাকা। মুখের চামড়াও ঝুলে পড়েছে।

লোকটার পরনে টকটকে লাল রঙের নতুন লুঙ্গি। গলায় একই রঙের লাল
চাদর উড়নির মতো ঝোলানো। এটাই সম্ভবত পিশাচ-সাধকদের পোশাক। সব
ধরনের সাধকদের জন্যে পোশাক আছে— ড্যানসিং দরবেশরা আলখাল্লা পরেন,
সন্ন্যাসীরা গেরুয়া পরেন, নাগা সন্ন্যাসীরা নগ্ন থাকেন। পিশাচ-সাধকরা লাল
লুঙ্গি এবং লাল চাদর কেন পরবে না? আমি পিশাচ-সাধকের দিকে তাকিয়ে
গম্ভীর গলায় বললাম, ‘তুমি তাহলে পিশাচের সাধনা করো?’

পিশাচ-সাধক সব ক'টা দাঁত বের করে হাসল। আনন্দিত গলায় বলল,
'কথা সত্য।'

লোকটার দাঁত ঝকঝকে সাদা। গ্রামের মানুষরা পান-সিগারেট খেয়ে দাঁত
কুৎসিতভাবে নোংরা করে রাখে, এর বেলায় তা হয়নি।

'নাম কী তোমার?'

'মকবুল। স্যার, আমি পিশাচ-সাধক মকবুল। যদি অনুমতি দেন আপনাদের
কদমবুসি করি।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'অনুমতি দিলাম।'

সে অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'পায়ে হাত দিবো না স্যার। ভয়ের কিছু
নাই।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'পায়ে হাত দিলে ভয়ের কী?'

'পিশাচ-সাধনা যারা করে তারা কারোর শইল্যে হাত দিলে বিরাট ক্ষতি
হয়।'

'ক্ষতিটা কার হয়— তোমার, না তুমি যার গায়ে হাত দিবে তার?'

'আমি যার শইল্যে হাত দিবো তার। আপনার শইল্যে হাত দিলে আপনার
বিরাট ক্ষতি হইবো। যেখানে হাত দিবো সেখানে ক্ষতি হইবো।'

'পায়ে হাত দাও। দেখি ক্ষতি কী হয়। ঘা হয় কি-না।'

'ছি-ছি! কন কী আপনে? আপনার ক্ষতি হবে এমন কাজ পিশাচ-সাধক
মকবুল করব না।'

সে আমার পা থেকে এক ফেড় হাত দূরে মাটিতে হাত দিয়ে ভক্তিভরে
কদমবুসি করল। কদমবুসির পর দু'হাত জোড় করে চোখবন্ধ অবস্থায় আকাশের
দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ঝিড়ঝিড় করল। কে জানে পিশাচ-সাধকদের কদমবুসি
করার এটাই হয়তো নিয়ম। বিপুল বিশ্বের কতই বা আমি জানি।

'তোমার খাঁচায় কী? কাক না-কি?'

'জি স্যার কাক। আমরা বলি কাউয়া।'

'তোমার কাকের ব্যাপারটা কী বলো তো?'

'সাধনার জন্যে লাগে স্যার।'

'ও আচ্ছা।'

গ্রাম বেড়াতে এলে এ-জাতীয় যজ্ঞগার ভেতর দিয়ে আমাকে যেতে হয়। দু-
তিন দিনের জন্যে যাই। নানান ধরনের মানুষ এর মধ্যে আসে। মূল উদ্দেশ্য
অর্থভিক্ষা। সরাসরি ভিক্ষা চাইতে সংকোচ হয় বরেনই নানান কিচ্ছা-কাহিনীর
ভেতর দিয়ে তারা যায়। একবার এক মওলানা সাহেব এসেছিলেন। তাঁকে নাকি
আমাদের নবী-এ করিম স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন— তোর ছেলেকে আমার
রওজা মোবারকে এসে দোয়া করে যেতে বল। সে যে দোয়া করবে ইনশাআল্লাহ

তা-ই কবুল হবে। মওলানা সাহেব এসেছেন ছেলের মদিনা-ভ্রমণের টাকা সংগ্রহ করতে।

এইসব ক্ষেত্রে আমি কোনো তর্কে যাই না। টাকা দিয়ে দেই। তেমন বেশি কিছু না, সামান্যই। তাতেই তারা খুশি হয়। তাদের প্রত্যাশাও হয়তো অল্পই থাকে।

আমি ঠিক করেছি পিশাচ-সাধককে পঞ্চাশ টাকা দেবো। পিশাচ-সাধক যে এই টাকা পেয়েই মহাখুশি হবে সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তার আনন্দ আরো বাড়বে যদি কিছুক্ষণ তার সঙ্গে গল্প করি। আমাদের অঞ্চলের গ্রামের মানুষ অলস প্রকৃতির। অলস মানুষের আনন্দ-বিলাস গল্পগুজব। হাসিমুখে কিছুক্ষণ গল্প করলেই তারা খুশি। আমি গল্প শুরু করলাম।

‘তুমি তাহলে পিশাচ-সাধক?’

‘জি স্যার।’

‘জিন-সাধনার কথা শুনেছি, পিশাচ-সাধনার কথা শুনি নি।’

‘পিশাচ-সাধনা আরো জটিল। পিশাচ নিয়া কারবার। এরা ভয়ঙ্কর। সাধনাও কঠিন।’

‘এমন ভয়ঙ্কর সাধনার দিকে গেলে কী জন্য?’

‘মন ওইদিকে টানছে। মনের উপরে তো হাত নাই। কপালগুণে ভালো ওস্তাদও পেয়েছিলাম।’

‘ওস্তাদের নাম কী?’

‘উনার নাম কলিমুল্লাহ দেওয়ান।’

‘নাম তো জবরদস্ত।’

‘উনি মানুষও জবরদস্ত ছিলেন। আলিশান শরীর। কথা যখন বলতেন মনে হইতো মেঘ ডাকতেছে। এক বৈঠকে দুইটা কাঁঠাল খাইতে পারতেন।’

‘মারা গেছেন না-কি?’

‘জি, উনার ইন্তেকাল হয়েছে। বড়ই দুঃখের মৃত্যু। ঘটনাটা বলব?’

‘বলো।’

‘এক মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে তিনি ঘর থাইক্যা বাইর হইছেন। মনের বেখেয়ালে শরীর বন্ধন দেন নাই। পিশাচ আইসা ধরল। মট কইরা একট শব্দ হইল। মাথায় মোচড় দিয়া দিল ঘাড় ভাইঙ্গা।’

‘পিশাচ-সাধনা দেখি খুবই বিপদজনক ব্যাপার।’

‘বিপদ বলে বিপদ! চিন্তায় চিন্তায় অস্থির থাকি। ভুলভ্রান্তি হইলে বাঁচনের উপায় নেই।’

‘পিশাচ-সাধককে দেখে অবিশ্যি আমার মনে হলো না সে কোনোরকম চিন্তায় আছে। তাকে বরং আনন্দিতই মনে হলো।’

‘খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?’

‘জি-না, খাওয়া হয় নাই।’

‘খাওয়া-দাওয়াতে কোনো বাছ বিচার আছে?’

‘জি-না, আমরা সবই খাইতে পারি। তবে টক খাওয়া নিষেধ। টক ছাড়া সবই চলে। মাছ-মাংস ডিম-দুধ ... অসুবিধা কিছু নাই।’

আমি মানিব্যাগ খুলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সে খুবই আগ্রহের সঙ্গে নোটটা নিল। আবারো কদমবুসি। আবারো হাত জোড় করে চোখবন্ধ অবস্থায় আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড়ানি। খাঁচায় বন্ধি কাকও এইসময় ডানা ঝাপটাতে শুরু করল। কফ লাগা গলায় কয়েবার বলল, কা-কা। মোটামুটি রহস্যময় দৃশ্য।

মকবুল বলল, ‘স্যারের সঙ্গে কথা বইল্যা আরাম পাইছি। জমানা খারাপ, মানুষের সাথে কথা বইল্যা এই জামানায় কোনো আরাম নাই। এই জামানা হইল অবস্থাসের জমানা। কেউ কারো কথা বিশ্বাস করে না। আমাদের নিয়া হাসাহাসি করে। স্যার, আমরা চাইরটা ভাত দেওনের হুকুম দিয়া দেল। আপনে হুকুম না দিলে এরা ভাত দিবো না। একবাটি মুড়ি খাওয়াইয়া বিদায় কইরা দিবো।’

‘ভালোমতো যাতে খাওয়া-দাওয়া করতে পারো সে ব্যবস্থা করছি।’

‘খাওয়া-খাদ্য না পাইলেও আমাদের চলে। পিশাচের সাধনা করি, আমাদের স্বভাব-চরিত্রও পিশাচের মতো। তিন-চার দিন না খাইলেও আমাদের কিছু হয় না। আবার ধরেন, মরা লাশ পাইয়া আছে, প্রয়োজনে লাশের মাংসও খাইতে পারব, অসুবিধা নাই।’

‘খেয়েছ কখনো?’

‘জি-না।’

‘খাওনি কেন?’

‘প্রয়োজন পড়ে নাই। তা ছাড়া লাশ পাওয়াও যায় না। হিন্দুরা লাশ পুড়িয়ে ফেলে। মুসলমানরা দেয় কবর। কবর থাইক্যা লাশ বাইর কইরা খাওয়া বিরাট দিকদারি। ঠিক না স্যার?’

‘ঠিক তো বটেই। তোমার সাধনার ফলাফল কী? পিশাচ বশ মানবে?’

‘অবশ্যই। আমি নিজেও পিশাচের মতো হয়ে যাব। দিলে মায়া-মুহুরত কিছু থাকব না। ইচ্ছা হইল খুন করলাম, থানা-পুলিশ কিছু করতে পারব না।’

‘খুন করতে ইচ্ছা করে?’

‘জে-না। করে না।’

‘তাহলে এত কষ্ট করে এই সাধনা করছ কেন? সাধনা করে পিশাচ হবার দরকারইবা কী! আমাদের সমাজে পিশাচের তো অভাবও নেই। সাধনা ছাড়াই অনেক পিশাচ আছে!’

‘কথা সত্য বলেছেন। তবে স্যার ঘটনা হইল পিশাচ-সাধনা থাকলে লোকজন ভয় পায়। সমীহ করে। একজন পিশাচ-সাধকের কেউ তুই-তুকারি করবে না। আপনে আপনে করবে। কারোর বাড়িতে গেলে মাটিতে বসতে হবে না। চিয়ার দিবে। যার চিয়ার নাই সে জলচৌকি দিবে। মুড়ি খাওয়াইয়া বিদায় দিবে না, গরম ভাত দিবে। সালুন দিবে। দিবে কি-না বলেন?’

‘দেওয়া তো উচিত।’

‘বিপদে-আপদে সবেই ছুইটা আসবে আমার কাছে। এরে বান মারতে হবে। তারে বশীকরণ মন্ত্র দিতে হবে। বান ছুটাইতে হবে। পিশাচ-সাধকের কাজের কী শেষ আছে? ঠিক বলেছি না স্যার?’

‘ঠিকই বলেছ।’

‘টাকাপয়সা ধনদৌলতেরও তখন সমস্যা নেই। জমি-জিরাত করব। ঘরবাড়ি করব। শাদি করব। আমি স্যার অখনো শাদি করি নাই। ঘর নাই, দুয়ার নাই। খাওয়া-খাদ্য নাই। আমার কাছে মেয়ে কে দিবো কন?’

‘পিশাচ-সাধকের কাছেও কি আর মেয়ে দিবে? মেয়ে বাবা-মা’র কাছে পিশাচ পাত্র হিসাবে ভালো হবার কথা না।’

মকবুল দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, ‘সেইটা কোনো বিষয় না স্যার। সাধনার শেষে যারে ইচ্ছা তারে আমি বিবাহ করতে পারব। পিশাচই ব্যবস্থা কইরা দিবে। আমার কিছু করতে হবে না।’

‘তাই না-কি?’

‘অত কষ্ট কইরা সাধনা যে করতেন, বিনা কারণে তো করতেছি না। আমি তো বেকুব না। এই যে আপনার সঙ্গে এত গল্প করলাম, আপনার কি মনে হয়েছে আমি বেকুব?’

‘তা মনে হয় নাই।’

‘পিশাচ-সাধনায় পাশ করে, তারা ইচ্ছা করলে অন্যের বিবাহিত ইসতিরিরেও বিবাহ করতে পারে। যেমন মনে করেন, এক লোক তার পরিবার নিয়া সুখে আছে। তার দুইটা ছেলেমেয়েও আছে। আমি পিশাচ-সাধনায় পাশ করা মকবুল যদি সেই লোকের পরিবারেরে বিবাহ করতে চাই, তাইলে সঙ্গে সঙ্গে তারার সুখের সংসারে আগুন লাগব। ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইব। আমি আপসে সেই মেয়েরে বিবাহ করব। সেই মেয়েও আমার জন্যে থাকবে দিওয়ানা।’

‘এ-রকম কোনো পরিকল্পনা কি আছে?’ পিশাচ-সাধক মকবুল মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো, এটাই তার পিশাচ-সাধনার মূল প্রেরণা। ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা যাচ্ছে।

‘কাকে বিয়ে করতে চাও। মেয়েটা কে?’

‘আমার মামতো বোন— নাম কইতরি। তার বিবাহ হয়ে গেছে। নবীনগরের কাঠমিস্ত্রি ইসমাইলের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে। তারার দুইটা পুত্রসন্তানও

আছে। সুখের সংসার। অন্যের সুখের সংসার ভাঙলে বিরাট পাপ হয়। আমি পিশাচ, আমার আবার পাপপুণ্য কী? ঠিক বলেছি না স্যার?’

আমি জবাব দিলাম না। মানুষটার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইলাম। কাকের খাঁচা নিয়ে আমার সামনে যে উবু হয়ে বসে আছে, সে কোনো সাধারণ মানুষ না। পিশাচ-সাধনা করুক বা না করুক, সে বিরাট প্রেমিকপুরুষ।

মকবুল গলা নামিয়ে বলল, ‘কইতিরির চেহারা এমন কিছু না। গায়ের রং শ্যামলা। মাথার চুল অল্প। সন্তান হওনের পরে বেজায় মোটা হয়েছে। কিন্তু স্যার তার জন্যে সব সময় কইলজা পুড়ে। বুক ধড়ফড় করে। রাইতে ঘুম হয় না। আমি থাকি নবীনগরে। একদিনের জন্যেও নবীনগর ছাইড়া যাইতে পারি না। এই যে আপনার কাছে আসছি, একটা দিন থাকলে আপনার ভালোমন্দ দুইটা কথা শুনতে পারি— সেই উপায় নাই। আমার নবীনগর যাইতেই হবে।’

‘কইতিরির সঙ্গে তোমার কথাবর্তা হয়?’

‘জে-না। তার বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করি। কী তাকে দেখি। একদিন দেখেছি তার ছেলেটারে নিয়া পুসকুনির দিকে হাইতেছে। সে আমারে দেখে নাই। ছেলে দুইটাও সুন্দর হয়েছে মাশলাহ। বড়টার নাম গোলাপ, ছোটটার নাম সুরজ।’

‘সব খবরই দেখি রাখ।’

‘কী বলেন স্যার, রাখব না! আপনি একটু দোয়া কইরেন, পিশাচ-সাধনা যেন তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারি।’

‘তুমি সাধনার কোন পর্যায়ে আছ?’

‘মাত্র শুরু করেছি, সময় লাগবে। পানিতে চুবাইয়া দশটা কাউয়া মারণ লাগবে। এইটা এখনো পারি নাই। এই কাউয়াটা সাথে নিয়া ঘুরতেছি ছয় মাসের উপরে হইছে। দুইবার পুসকুনিতে নামছি এরে চুবাইয়া মারার জন্যে, দুইবারই উইঠা আসছি। জীকন্তু একটা প্রাণী পানিতে চুবাইয়া মারা তো সহজ কথা না। একবার পানিতে চুবাইয়াই টান দিয় তুললাম। কাউয়া কিছু বুঝে নাই। হে ভাবছে আমি তারে গোসল দিছি। পশুপাখির বুদ্ধি তো আমার মতো না। তারার বুদ্ধি কম।’

‘কাকটা ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরার দরকার কী?’

‘কাউয়ার উপরে মুহব্বত জন্মাইছে। ছাইড়া দিতে মন চায় না। ছাড়লেও হে যায় না। মুহব্বতের মর্ম পশুপাখিও বুঝে। এই দেখেন ছাড়তাছি। সে যাবে না।’

মকবুল খাঁচার দরজা খুলে দিল। কাকটা বের হয়ে এসে মকবুলের চারপাশে গম্ভীর ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আবারো খাঁচায় ঢুকে গেল।

‘স্যার, আমার জন্যে খাস দিলে দোয়া কইরেন, যেন পিশাচ-সাধনা শেষ করতে পারি।’

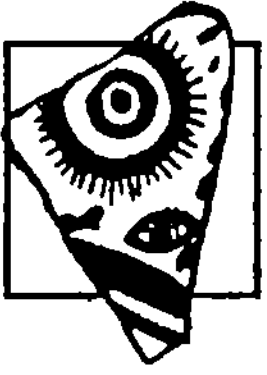
‘কাক মারতে পারবে?’

‘উপায় কী! মারতে হবে। যে সাধনার যে নিয়ম। দিল শক্ত করার চেষ্টা নিতাই। হবে, দিল শক্ত হবে। সময় লাগবে। লাগুক। তাড়াহড়ার তো কিছু নাই। কী বলেন স্যার?’

খাঁচার ভেতর থেকে কাক আবারো কা-কা করে দুবার ডাকল। মকবুল বিরক্ত গলায় বলল, ‘খাওন তো দিবোরে বাপ। তরে খাওন না দিয়া আমি খাব? তুই আমারে ভাবস কি! চুপ কইরা থাক, স্যারের সাথে মূলবান আলাপ করতেছি।’

কাক চুপ করে গেল।

আমি তাকিয়ে আছি। অবাক হয়ে এমন একজনকে দেখছি যে হৃদয়ে ভালোবাসার সমুদ্র ধারণ করে পিশাচ হবার সাধনা করে যাচ্ছে।



সালাম সাহেবের পাপ

মিসির আলি আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, ‘অবসেশন’ শব্দটার বাংলা কী বলুন তো!’

আমি খানিকটা ঝাঁপিয়ে পড়ে গেলাম। চট করে মাথায় কিছু আসছে না। তাই তো, অবসেশনের ঠিক বাংলাটা কী?

মিসির আলি মিটিমিটি হাসছেন। সচরাচর তাঁকে হাসতে দেখা যায় না। তাঁর হাসি দেখে ভালো লাগছে। বেচারী দীর্ঘদিন রোগভোগ করে কাহিল হয়ে আছেন। পনোরো দিন পর গত কাল প্রথম শিং মাছের ঝোল দিতে ভাত খেয়েছেন। আমি গিয়েছি রোগী দেখতে।

মিসির আলি আবার বললেন, ‘অবসেশনের বাংলা বলতে পারছেন না, তাই না?’

আমি বললাম, ‘মাথায় আসছে। মুখে আসছে না।’

মিসির আলি বললেন, ‘ইংরেজি অনেক শব্দ আছে যার ঠিক বাংলা নেই। আবার অনেক বাংলা শব্দও আছে যার ইংরেজি হয় না। যেমন— ‘অভিমান’। অভিমানের ইংরেজি বলতে পারবেন?’

আমি বললাম, ‘ভাষাতত্ত্ব থাকুক, আপনার শরীর কেমন বলুন।’

মিসির আলি বললেন, ‘শরীর সেরে গেছে। এইজন্যে মনটা সামান্য খারাপ।’

‘শরীর সারায় মন খারাপ কেন?’

মিসির আলি বললেন, ‘শরীর যখন খুব খারাপ থাকে, তখন মনের অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়। ঘোরলাগা ভাব তৈরি হয়। এই অবস্থাটা আমার পছন্দের। ঘোরলাগা অবস্থায় কোনো কিছু ভাবতে ভালো লাগে।’

আমি বললাম, ‘চেষ্টা করুন আবার যেন অসুখে পড়তে পারেন। শীতের সময় আছে, ধানমণ্ডি লেকের নোংরা পানিতে ডুব দিয়ে এলে কেমন হয়?’

‘খারাপ হয় না। চলুন যাই।’

মিসির আলি খাট থেকে নেমে গেলেন। আমি আঁতকে উঠলাম। উনি কি সত্যি লেকে গোসল করার কথা ভাবছেন? মিসির আলী জাতীয় মানুষরা উদ্ভট কর্মকাণ্ড পছন্দ করে। আমি বললাম, ‘যাচ্ছেন কোথায়?’

মিসির আলী বললেন, ‘আপনাকে একজন মানুষের ছবি দেখাব।’

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। মিসির আলী বললেন, ‘আপনি কী ভেবেছিলেন? লেকে গোসল করার জন্যে টাওয়েল আনতে যাচ্ছি?’

‘আপনাকে দ্রুত খাট থেকে নামতে দেখে সেরকমই ভেবেছি।’

‘আমি খুবই সাধারণ মানুষ। ‘অ্যাকসেনট্রিক’ কেউ না। আমি একজন অ্যাকসেনট্রিক মানুষের ছবি আপনাকে দেখাব। ভালো কথা, ‘অ্যাকসেনট্রিক’ শব্দটার বাংলা বলুন তো?’

আমার হাতে একজন বুড়ো মানুষের সাদাকালো ছবি। মাথাভর্তি আইনস্টাইনের মতো চুল। সব চুল সাদা। বড় বড় চোখ। তিনি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন।

মিসির আলী বললেন, ‘ছবি দেখে লোকটাকে কেমন মনে হচ্ছে?’

‘ভালোমানুষ মনে হচ্ছে।’

‘ভালোমানুষ মনে হচ্ছে কেন? চোখ বড় সেই জন্যে? সরু চোখের মানুষরা ভালো হয় না? সব জাপানি কি খারাপ?’

আমি বললাম, ‘আপনার সঙ্গে কূটতর্কে যেতে চাচ্ছি না। কী বলবেন বলুন।’

মিসির আলী বললেন, ‘ভদ্রলোকের নাম মোহম্মদ সালাম। কৃষি ব্যাংকে কাজ করতেন। এখন রিটায়ার করেছেন। অতি ভালোমানুষ। দুই ছেলে এক মেয়ে এবং স্ত্রী নিয়ে সুখী সংসার। তাঁর বড় ছেলেটি ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়।’

‘ভদ্রলোকের ছবি নিয়ে ঘুরছেন কেন?’

‘একটু আগে ‘অবসেশন’ শব্দটা নিয়ে কথা বললাম না? ঐ ভদ্রলোকের একটা ভয়াবহ অবসেশন আছে। যখন আমি অসুখে পড়েছিলাম তখন ভদ্রলোকের অবসেশনটা নিয়েই ভেবেছি। তাঁর অবসেশনের গল্পটা শুনবেন?’

‘শোনার মতো হলে শুনতে পারি।’

‘শোনার মতো তো বটেই, তবে ছোট্ট সমস্যা আছে।’

‘কী সমস্যা?’

‘ভদ্রলোকের গল্প শুনলে তাঁর অবসেশন আপনার ভেতরে ঢুকে যেতে পারে।
তার ফল শুভ হবে না।’

‘গল্পটা বলুন।’

মিসির আলী বললেন, ‘চা বানিয়ে আনি। চা খেতে খেতে বলি। আপনি
খাটে পা উঠিয়ে আরাম করে বসুন।’

আমি আরাম করে বসেছি। চা খাচ্ছি। রাত নয়টার মতো বাজে। বাইরে
বৃষ্টি হচ্ছে। মিসির আলী খাটে হেলান দিয়ে গল্প বলছেন।

মোহম্মদ সালাম সাহেব এ-রকম এক বর্ষার রাতে বাড়ির সবাইকে নিয়ে টিভিতে
কী একটা নাটক দেখছিলেন। হাসির কোনো নাটক। সবাই হাসছে। তিনিও
হাসছেন। নাটকের মাঝখানে হঠাৎ তিনি উঠে বারান্দায় চলে গেলেন। বেশ
কিছুক্ষণ হলো ফিরছেন না। তাঁর স্ত্রী, উনার নাম মহল, স্বামীর সন্ধানে বারান্দায়
এসে দেখেন— ভদ্রলোক বেতের চেয়ারে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন।

মহল বললেন, ‘কী হয়েছে? নাটক দেখাচ্ছে না?’

সালাম সাহেব জবাব দিলেন না। তাঁর চোখ চকচক করছে। মহল বিস্মিত
হয়ে বললেন, ‘কাঁদছে না-কি?’

সালাম সাহেব চাপা গলায় বললেন, ‘মহল, আমি আমার জীবনে ভয়ঙ্কর
একটা অপরাধ করেছি। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার। আমি কাল থেকে
প্রায়শ্চিত্ত শুরু করব।’

মহল বললেন, ‘কী অপরাধ করেছ?’

সালাম জবাব দিলেন না। মাথা নিচু করে রাখলেন।

মহল বললেন, ‘অফিসের টাকাপয়সা মেরে দিয়েছ?’

সালাম বললেন, ‘ছি! তুমি আমাকে চেনো না।’

মহল বললেন, ‘তাহলে কী? অফিসের কোনো মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে?
তাকে নিয়ে হোটেল-ফোটেলে গেছ? রুম ভাড়া করেছ?’

সালাম বললেন, ‘ছি ছি!’

মহল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘তাহলে উঠে আস।’

সালাম বললেন, ‘না।’

মহল বললেন, ‘নাটক না দেখলে ভাত খেতে আস। কিম্বা ধরে বসে থাকবে
না।’

সালাম সাহেব উঠে গেলেন। স্বাভাবিকভাবে ভাত খেলেন। জর্দা দিয়ে পান
খেলেন। দিনের শেষ সিগারেট খেয়ে ঘুমুতে গেলেন। মাঝরাতে মহলের ঘুম

ভেঙে গেল। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, সালাম শোবার ঘরের কাঠের চেয়ারে জবুথবু হয়ে বসে আছেন। মহল বলেন, ‘এই কী হয়েছে?’

সালাম বললেন, ‘কিছু না।’

‘চেয়ারে বসে আছ কেন?’

‘ঘুম আসছে না।’

‘ঘুম আসছে না কেন?’

‘পাপটা মাথায় ঘুরছে। ভয়ঙ্কর একটা পাপ করেছি মহল।’

মহল বললেন, ‘খুন করেছ কাউকে?’

সালাম বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘আমি খুন করব মানে? কাকে খুন করব?’

মহল বললেন, ‘পাপটা তাহলে কী? বলো আমাকে?’

সালাম মাথা নিচু করে রইলেন। কিছু বললেন না।

মহল বললেন, ‘ঘুমের ওষুধ দেই, খেয়ে ঘুমাও।’

সালাম বললেন, ‘দাও।’

তিনি দু’টা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েও সারারাত জেগে বসে রইলেন। তাঁর সমস্যা সে-রাত থেকেই শুরু হলো।

চাকরি শেষ হবার আগেই রিটায়ারমেন্টে চলে গেলেন। আলাদা ঘরে বাস করতে লাগলেন। সারা দিন একা থাকেন। কারো সঙ্গে কথা বলেন না। রাতে ঘুমান না। তাঁকে বড় বড় সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো হলো। সাইকিয়াট্রিস্টরা রোগ ধরতে পারলেন। রোগের নাম ‘অস্কিউট অবসেশন’। কোনো একটা বিষয় মাথার ভেতর গভীরভাবে গোঁজা গেছে। এই রোগ সারাতে হলে পাপটা কী তা জানতে হবে? সালাম সাহেব এই বিষয়ে কিছুই বলবেন না। তাঁর স্ত্রী নানানভাবে চেষ্টা করলেন। যেমন—

মহল : শোন, তুমি কি বাসার কাজের মেয়ের সঙ্গে কিছু করেছ? করে থাকলে বলো। আমি কিছুই মনে করব না।

সালাম : ছি মহল, ছি! আমি কি এত ছোট!

মহল : অফিসের গাড়ি নিয়ে আসার সময় গাড়ির ড্রাইভার কাউকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছ?

সালাম : না।

মহল : আচ্ছা শোন। তুমি কি সমকামী? এই নিয়ে কোনো সমস্যা?

সালাম : মহল, তুমি আমাকে নিয়ে এত নোংরা চিন্তা কীভাবে করছ?

এই পর্যায়ে সালাম সাহেবের স্ত্রী আমার কাছে কেঁদে পড়লেন। তাঁর ধারণা আমি কথা বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি ভদ্রলোককে নিয়ে আমার বাসায় উপস্থিত হলেন। সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ। সাধারণ কথাবার্তা। আমি তাঁকে চা

খেতে দিলাম। তিনি আশ্রয় নিয়ে চা খেলেন। আমি বললাম, 'ভাই পাপের ডেফিনেশন কী? কোনটাকে আপনি পাপ ভাবেন?'

তিনি বললেন, 'যেটা ইমমোরাল সেটাই পাপ।'

আমি বললাম, 'সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মোরালিটি বদলায়। একটা সময় ছিল যখন বিবাহ নামের ইনস্টিটিউশন তৈরি হয় নি। তখন যে-কোনো ছেলে যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘুমুতে পারত। কেউ বিষয়টাকে ইমমোরাল ভাবত না। এখন ভাবে।'

সালাম সাহেব বললেন, 'আপনার কথা বুঝতে পারছি।'

আমি বললাম, 'আপনি কি কোনো ইমমোরাল কাজ করেছেন?'

তিনি বললেন, 'জি-না, তবে তার চেয়েও অনেক বড় পাপ করেছি।'

'সেটা কি আপনি বলবেন না?'

'জি-না।'

'আপনার কারণে আপনার স্ত্রী কষ্ট পাচ্ছেন। আপনার বাচ্চারা কষ্ট পাচ্ছে। এটাকে কি আপনার পাপ বলে মনে হয়?'

সালাম সাহেব বললেন, 'জি পাপ। তবে আমি যে পাপ করেছি, তারচেয়ে অনেক ছোট পাপ।'

'এখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন?'

'জি। যেদিন প্রায়শ্চিত্ত শেষ হবে সেদিনই আমি স্বাভাবিক হয়ে যাব। আমি আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।'

'তিনি কি ক্ষমা করবেন?'

'বুঝতে পারছি না। যে ভয়ঙ্কর পাপ করেছি ক্ষমা পাওয়ার কথা না। তারপরেও তিনি রহমানের রহিম।'

সালাম সাহেব এক পর্যায়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছেড়ে গ্রামের বাড়ি চলে গেলেন। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বাড়ির সামনের কাঁঠাল গাছের নিচে পাটি পেতে বসে থাকেন। খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ।

মিসির আলী বললেন, 'গল্প শেষ।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'গল্প শেষ মানে? সালাম সাহেবের কী হলো? উনি পাপটা কী করেছেন বলবেন না?'

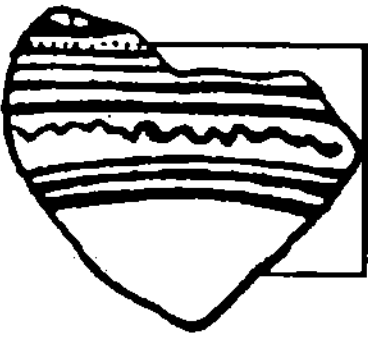
মিসির আলি হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'সালাম সাহেবের বিষয়ে আমি কিছু জানি না। তবে পাপটা কী সেটা মনে হয় জানি। অসুস্থ অবস্থায় যখন বিছানায় পড়েছিলাম তখন চিন্তা করে বের করেছি।'

আমি বললাম, 'বলুন শুন।'

মিসির আলী বললেন, ‘আমি গল্পের শুরুতেই বলেছিলাম সালাম সাহেবের গল্পটা না শোনা ভালো। শুনলে এই গল্প মাথায় ঢুকে যাবে। এখন তাই হয়েছে। গল্পটা আপনার মাথায় ঢুকে গেছে। এই গল্প মাথায় নিয়ে আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে। অসংখ্যবার আপনার মনে হবে, সালাম সাহেব পাপটা কী করেছিলেন? উত্তর পাবেন না।’

আমি বললাম, ‘আপনি সত্যি বলবেন না?’

মিসির আলী গম্ভীর গলায় বললেন, ‘না।’



বিভ্রম

মিলির হঠাৎ মনে হলো তার সামনে বসে থাকা যুবকটা বিরাট চোর। এ রকম মনে করার কোনো কারণ নেই। তারা দু’জন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে এসেছে। কোনার দিকের একটা টেবিল তাদের জন্যেই বুক করা। মিলির বড় খালা সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি চাইনিজ রেস্টুরেন্টের মালিকের সঙ্গেও কথা বলে রেখেছেন— ‘কোনার দিকের একটা টেবিল দেবেন। বেয়ারারা যেন ঘনঘন বিরক্ত না করে। ওরা ঘণ্টা দু’এক থাকবে।’

ঘটনাটা হচ্ছে— মিলির সামনে বসে থাকা ছেলেটার নাম সুজাত আলি। নিউইয়র্কে থাকে। দেশে এসেছে বিয়ে করতে। মিলির বড়খালা সালেহা বেগম খুব চেষ্টা করছেন যেন ছেলেটার সঙ্গে মিলির বিয়ে হয়ে যায়। মিলির বিয়ে নিয়ে খুব ঝামেলা হচ্ছে। একটার পর একটা বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। মিলির চেহারা মোটেই অসুন্দর না। গায়ের রঙ চাপা। নাকটা মোটা। মোটা নাকে তাকে খারাপ লাগে না। মিলির নিজের ধারণা মোটা নাকের কারণে তার চেহারায় মায়া ভাব বেড়েছে। কয়েক দিন আগে HBO-তে টাইম মেশিন নামে সে একটা ছবি দেখেছে। ছবির নায়িকার সঙ্গে তার মিল আছে। নায়িকার গায়ের রঙ কালো। নাক খ্যাবড়া। তারপরেও এত মিষ্টি চেহারা।

হ্যান্ড ব্যাগে রাখা মিলির মোবাইল টেলিফোন বাজছে। নিশ্চয়ই তার বড় খালা। উনার টেনশান বাতিক আছে। এই নিয়ে দশ মিনিটের মাথায় তিনবার

টেলিফোন করলেন।

‘মিলি।’

‘ই।’

‘ছেলে এসেছে?’

‘ই।’

‘এখন তোর সামনে?’

‘না। সিগারেট কিনতে গেছে।’

‘তোর সঙ্গে কথা হয়েছে?’

‘না। শুধু বলেছে সিগারেটের প্যাকেট ফেলে এসেছে। কিনতে গেছে।’

‘ছেলেকে দেখে কেমন মনে হলো? তোর ফাস্ট ইমপ্রেশন কী?’

‘চেহারা চোর ভাব আছে।’

‘চেহারা চোর ভাব আছে মানে?’

‘দেখেই মনে হয়েছে বিরাট চোর। খালা আমি রাখি। চোরটা আসছে।’

মিলি মোবাইল পুরোপুরি অফ করে দিল। বড় খালা একটু পরপর টেলিফোন করবেন। লাইন না পেয়ে বিরক্ত হবে। বিরক্ত হলেই ভালো— একটা চোরের সঙ্গে তিনি বিয়ের কথাবার্তা চলাচ্ছেন।

সুজাত আলি চেয়ারে বসতে বসতে আনন্দিত গলায় বলল, ‘বাংলাদেশে সিগারেট তো খুবই সস্তা। মাত্র ৭৫ টাকা নিল। নিউইয়র্কে এই প্যাকেট কিনতে লাগত চার ডলার। বাংলাদেশী টাকায় প্রায় আড়াইশ টাকা।’

মিলি বলল, ‘দেশ থেকে বেশি করে সিগারেট কিনে নিয়ে যান।’

‘এক কার্টনের বেশি নিতে দেয় না।’

‘চুরি করে নিয়ে যাবেন। স্মিটকেস ভর্তি থাকবে সিগারেট।’

সুজাত আলি শব্দ করে হাসছে। মিলি প্রায় শিউরে উঠল। লোকটার কালো মাড়ি বের হয়ে এসেছে। কালো মাড়ির উপর ঝকঝকে ধারালো দাঁত। সে দুই হাত টেবিলে রেখেছে। মোটা মোটা আঙুল। হাত ভর্তি লোম। লোকটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, ‘খাবারের অর্ডার দিয়ে দাও।’

মিলি একবার ভাবল বলে, আমার সঙ্গে আজ আপনার প্রথম দেখা। আমি কোনো বাচ্চা মেয়ে না। এই বৎসর ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পাশ করেছি। প্রথম দেখাতেই আমাকে তুমি তুমি করে কেন বলছেন? সে কিছু বলল না।

লোকটা এখন নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। মিলির কী বলা উচিত— দয়া করে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়বেন না। ঠেলাওয়ালারা বিড়ি খেয়ে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে।

‘মিলি।’

‘জি।’

‘স্যুপের অর্ডার দিবে না। আমি স্যুপ খাই না।’

‘পানি খেয়ে পেট ভর্তি।

‘অর্ডারটা আপনিই দিন।’

‘ঠিক আছে।’

‘সিগারেট শেষ করে নেই।’

মিলি বলল, ‘নিউইয়র্কে আপনি কী করেন?’

‘অড জব করি।’

‘অড জব কী?’

‘যখন যেটা পাই। উইক এন্ডে ক্যাব চালাই।’

মিলি বলল, ‘বড় খালা বলেছিলেন আপনি কম্পিউটার সায়েন্স পড়ছেন।’

সুজাত আলি বলল, ‘আত্মীয়স্বজনরা এইটা ছড়ায়েছে। যাতে আমাকে বিয়ে দিতে পারে এইজন্যে। ট্যাক্সি ড্রাইভার গুনলে তো কেউ মেয়ে বিয়ে দিবে না। ঠিক না?’

মিলি বলল, ‘কেউ-কেউ হয়তো দিবে। যারা মাহা বিপদে আছে তারা। আপনি তো অনেক মেয়ে দেখেছেন। তাদের অবস্থা?’

‘বেশি মেয়ে দেখি নাই। তুমি থার্ড। এর আগে দুইজনকে দেখেছি। ওনলি টু।’

‘সবই চাইনিজ রেস্টুরেন্টে?’

‘উহঁ। একজনকে দেখলাম বসুন্ধারা বলে একটা বড় শপিং কমপ্লেক্স যে করেছে সেখানে। সেখানে নয়তলায় ফুডকোর্ট করেছে। ফুডকোর্টে আমি একটা বার্গার খেয়েছি আর মেয়েটা কোরু খেয়েছে।’

‘মেয়েটার নাম মনে আছে?’

‘নামটা ভুলে গেছি। আচ্ছা দাঁড়াও তোমাকে জেনে দিব। তালিব্যাশ দিয়ে নাম।’

মিলি বলল, ‘মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছিল?’

সুজাত আলি বলল, ‘পছন্দ হয়েছে। মেয়ের গায়ের রঙ ভালো। মুখের কাটিং ভালো। শুধু শর্ট। উঁচা হাই হিল পরে এসেছে তারপরেও শর্ট। মেয়েটার নাম এখন মনে পড়েছে। শায়লা।’

‘মেয়েটাকে বাতিল করে দিলেন?’

‘আরে না। আমি বাতিল করব কেন? সত্যি কথা বলতে কি শর্ট মেয়ে আমার পছন্দ। আমার মা ছিল শর্ট। বাবা বিরাট লম্বা। লম্বা বাবার পাশে শর্ট মা গুটুর গুটুর করে হাঁটতো। দেখতে ফাইন লাগত।’

‘বিয়ে মেয়ে পক্ষ বাতিল করে দিল?’

‘ইঁ।’

‘কেন?’

‘আছে ঘটনা। বলতে চাই না। খাবারের অর্ডার দিয়ে দেই? ভালো ভুখ

লেগেছে।’

‘দিন। আপনার একার জন্যে দেবেন। আমি শুধু একটা কোক কিংবা পেপসি। খাব।’

সুজাত আলি বলল, ‘শুধু কোক পেপসি কেন?’

মিলি বলল, ‘শায়লা মেয়েটাও তো শুধু কোকই খেয়েছিল।’

‘সে আর তুমি কি এক?’

‘হ্যাঁ, এক। আপনি খাবারের অর্ডার দিন। ভালো কথা আপনার পড়াশোনা কী?’

‘ইন্টারে পড়ার সময় গিয়েছিলাম— পরে আর পড়াশোনা হয় নাই। চেষ্টাও করি নাই। ঐ সব দেশে পড়াশোনা না-জানা লোকের চাকরির সুবিধা বেশি। পড়াশোনা জানা লোক তো আর অড জব করতে পারবে না। লজ্জা লাগবে। ঠিক বলেছি না?’

মিলি জবাব দিল না। লোকটা মিলির জবাবের জন্যে অপেক্ষা করল না। এক গাদা খাবারের অর্ডার দিল। মিলি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কুস্তিগীর চেহারার একজন মানুষ। কুস্তিগীরদের যেমন শরীরের তুলনায় মাথা ছোট হয়। এরও সে-রকম। সবচেয়ে কুৎসিত হচ্ছে লোকটার ছোট ছোট কান। কানভর্তি লোম শজারুর কাঁটার মতো বড় হয়ে আছে। মিলির কি লোকটাকে বলা উচিত— আপনি পরের বার যখন চুল কাটতে যাবেন তখন অবশ্যই দয়া করে কানের চুলগুলোও কাটাবেন। লোকটা এখন দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁচাচ্ছে। দাঁত থেকে ময়লা বের করে ন্যাপকিনে মুছছে। মিলির কি উচিত না উঠে চলে আসা?

মিলি বলল, ‘আপনার কি উচিত না দাঁত খুঁচানো বন্ধ রাখা? দৃশ্যটা দেখতে ভালো না। দাঁত খুঁচানো, দাঁত ব্রাশ এই কাজগুলো আমরা বাথরুমে করি। সেইটাই শোভন।’

সুজাত আলি এই কথায় লজ্জা পেল কি-না তা বুঝা গেল না। তবে সে দাঁত খুঁচানো বন্ধ করল। সে আরেকটা সিগারেট বের করেছে। মনে হয় খাবার আসার আগে আগে সে আরেকটা সিগারেট খাবে। সে মিলির দিকে ঝুঁকে এসে বলল, ‘বাংলাদেশের এই এক মজা রেস্টুরেন্টে সিগারেট খেতে দেয়। আমেরিকায় অসম্ভব।’

মিলি বলল, ‘বাংলাদেশে অনেক কিছুই সম্ভব যেটা বাইরে সম্ভব না। এই যে আপনি মনের আনন্দে বিয়ের জন্যে একের পর এক মেয়ে দেখে যাচ্ছেন, এই কাজটা কি অন্য কোথাও পারবেন?’

সুজাত জবাব দিল না। খাবার চলে এসেছে। সে মনের আনন্দে নিজেই হাত বাড়িয়ে খাবার নিচ্ছে। এখন আবার প্রতিটি খাবার নিচু হয়ে গুঁকে গুঁকে দেখছে। মিলির গা গুলিয়ে উঠছে। সে অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, ‘দ্বিতীয় যে

মেয়েটাকে দেখলেন তার অবস্থা কী?’

সুজাত বলল, ‘খুব ভালো মেয়ে। যেমন চেহারা তেমন স্মার্ট। ফড়ফড় করে ইংরেজি বলে, নাম সীমা। লম্বা চুল। মেয়েও লম্বা।’

‘তাকে বিয়ে করলেন না কেন?’

‘সে রাজি হলো না। কথাবর্তা অনেক দূর এগিয়েছিল। তাকে ডায়মন্ডের আংটিও দিয়েছিলাম। আংটি সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম। বিদেশে ডায়মন্ড সস্তা। মাঝে মাঝে সেল হয়। আমি সেল থেকে হাফ প্রাইসে কিনেছিলাম। দুইশ’ পঁচিশ ডলার।’

‘বিয়ে ভাঙার পর আংটি ফেরত পেয়েছেন?’

‘জি। আমার সঙ্গেই আছে। দেখবে?’

‘না।’

‘আমি শুরু করে দিলাম। তুমি সত্যি খাবে না? চিকেনের একটা ড্রামস্টিক খাও?’

‘আপনি খান। আমি আপনার খাওয়া দেখি।’

মিলি সত্যি সত্যি আগ্রহ নিয়ে খাওয়া দেখছে।

লোকটা খাবারের উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মুখ থেকে হুম হাম জাতীয় শব্দও হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হাড় ভাঙার কড়মড় শব্দ। মিলি বলল, ‘এদের রান্না কি ভালো?’

‘হুঁ। আমার কাছে কোনো রান্নাই খারাপ লাগে না। আমি সবই খাই। শুধু তিতা করলা খাই না। তুমি খাও?’

‘হ্যাঁ খাই।’

‘তোমার সাথে এই একটা অমিল হয়ে গেল।’

‘তাই তো দেখছি। পাত্রী হিসেবে কি আমাকে আপনার পছন্দ হয়েছে?’

‘হুঁ। তুমি খুবই সুন্দর।’

‘শায়লা, সীমা এদের চেয়েও?’

‘হুঁ। শুধু একটা সমস্যা।’

‘বলুন কী সমস্যা।’

‘তোমার পিতা-মাতা নাই। তাঁরা তোমার অল্প বয়সে গত হয়েছে। তুমি বড় হয়েছে তোমার খালার কাছে। তোমাকে বিবাহ করলে শ্বশুর-শাশুড়ির আদর পাব না। আমি আবার আদরের কাঙাল।’

‘আপনি আদরের কাঙাল?’

‘হুঁ। আমার পিতা-মাতাও তোমার মতো আমি ছোট থাকতেই বেহেশতে নসিব হয়েছেন। এর তার বাড়িতে বড় হয়েছি। সারা জীবন কষ্ট করেছি। সবচেয়ে বড় যে কষ্ট সেটা করেছি।’

‘সবচেয়ে বড় কষ্ট কোনটা?’

‘না খাওয়ার কষ্ট। এই কষ্টের সীমা নাই। তুমি কি কোনোদিন না খেয়ে কাটায়েছ?’

‘না।’

‘তুমি বিরাট ভাগ্যবতী।’

‘তাইতো দেখছি।’

‘আমার বিষয়ে আর কিছু জানতে চাইলে বল। বিয়ের আগে দুই পক্ষের সব পরিষ্কার থাকা ভালো।’

মিলি ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলে বলল, ‘আপনি তো মনে হয় মোটামুটি নিশ্চিত যে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে। তা কিন্তু হচ্ছে না। আপনাকে আমার পছন্দ হয়নি। আমার পরেও নিশ্চয়ই আরও অনেক মেয়ে দেখবেন। তাদের কোনো একজনকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে যান।’

সুজাত বলল, ‘আর দেখব না।’

‘বিয়ে না করেই ফেরত যাবেন?’

‘হুঁ।’

‘আর মেয়ে দেখবেন না— কারণটা কী?’

‘লজ্জা লাগে।’

‘কীসের লজ্জা?’

‘সবকিছু মিলায়ে লজ্জা। নিজেকে নিয়ে লজ্জা লাগে— না আছে চেহারা, না আছে পড়াশোনা। যোগ্যতা একটাই— বিদেশে থাকি। তোমার মতো যেসব মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে নিয়ে কথা বলি তাদের জন্যেও লজ্জা লাগে। সুন্দরী, বিদ্যাবতী মেয়ে ক্যাব ড্রাইভার বিয়ে করার জন্যে তৈরি।’

মিলি কঠিন গলায় বলল, ‘আপনি ভুল করছেন আমি কিন্তু জানতাম না আপনি ক্যাব ড্রাইভার। আমাকে বলা হয়েছে আপনি কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করছেন।’

‘ও আচ্ছা।’

‘মিলি তার গলায় কাঠিন্য কিছুমাত্র না কমিয়ে বলল, ‘আপনার সম্পর্কে আমি অনেক খারাপ খারাপ কথা বলতে পারি কিন্তু বলব না।’

সুজাত বলল, ‘একটা বল।’

‘আপনার চেহারায় চোর ভাব আছে। আচ্ছা আপনি কি কখনো চুরি করেছেন?’

সুজাত সহজ গলায় বলল, ‘একবার চুরি করেছি। দেশ ছেড়ে বিদেশ যাব। টাকা শর্ট। পরে ছোট মামির গয়না চুরি করলাম। পরে অবশ্য সব শোধ করেছি।’

‘আপনার খাওয়া শেষ হয়েছে না?’

‘হুঁ।’

‘বেয়ারাকে বিল দিতে বলুন। আমি বিল দেব।’

‘তুমি কেন বিল দিবে?’

‘আমি দেব। আপনাকে এই বিল কিছুতেই দিতে দেব না।’

‘আর শুনুন আমাকে তুমি করেও বলবেন না।’

‘তুমি তো বয়সে আমার ছোট।’

‘বয়সে ছোট হলেও তুমি বলবেন না।’

‘তুমি রেগে গেছ কেন?’

‘রেগে যাওয়ার অনেক কারণ আছে আপনি বুঝবেন না। এত বুদ্ধি আপনার নেই।’

‘এটা অবশ্য সত্য কথা বলেছি। আমার বুদ্ধি খুবই কম। তোমার বুদ্ধি ভালো। বুঝা যায়।’

‘আবার তুমি?’

‘অনেকক্ষণ ধরে তুমি তুমি বলেছি অভ্যাস হয়ে গেছে। মানুষ অভ্যাসের দাস।’

‘মানুষ অভ্যাসের দাস না। অভ্যাস মানুষের দাস। প্লেটে হাত ধুচ্ছেন কেন?’

‘অসুবিধা কী?’

‘অসুবিধা অবশ্যই আছে। আপনি কি জীবনে কখনো ভালো রেস্টুরেন্টে খাননি।’

‘খেয়েছি। সবচেয়ে বেশি খেয়েছি ম্যাগডোনাঙ্গে। ঐখানে কাজ করতাম। ফ্লোর পরিষ্কার করতাম।’

‘ঝাড়ুদার ছিলেন।’

‘তারা বলে ক্লিনার।’

‘আপনার লজ্জা করত না?’

‘লজ্জা করবে কী জন্যে? আমার সঙ্গে একজন ছিল— নাম ক্লিফোর্ড। সে ইউনিভার্সিটিতে পড়তো। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে কাজ করত। এখন সে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির লেকচারার।’

‘আপনি তো নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির লেকচারার হননি। আপনি এখনো ঝাড়ুদার।’

সুজাত বিব্রত গলায় বলল, ‘এখন কিন্তু ঝাড়ুদার না।’

মিলি বলল, ‘আপনার একমাত্র যোগ্যতা আপনি অন্য দেশের নাগরিক। ডলার রোজগার করেন। যে দেশের নাগরিক সেই দেশের কিছুই জানেন না। শুধু রাস্তাঘাট চেনেন। ক্যাব চালাতে হয় রাস্তা না চিনলে হবে না।’

‘সেই দেশের কিছুই চিনি না তা ঠিক না। চিনি তো।’

‘রবার্ট ফ্রস্টের নাম শুনেছেন?’

‘না। উনি কে?’

মিলি কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে।

বেয়ারা বিল নিয়ে এসেছে। দুই হাজার তিন শ’ টাকা বিল। মিলির ব্যাগে আছে সতেরো শ’ টাকা। লজ্জায় তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। সুজাত বলল, ‘টাকা কি কম পড়েছে?’

মিলি কিছু বলল না। হতাশ গলায় ব্যাগের দিকে তাকিয়ে রইল। সুজাত বলল, ‘কত কম পড়েছে বল বাকিটা আমি দিয়ে দেই? পরে আমাকে রিটার্ন করলেই হবে।’

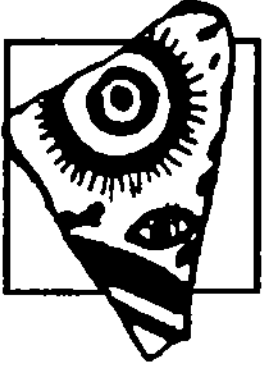
মিলির চোখে পানি এসে গেল। সে চোখের পানি নিয়েই বাসায় ফিরল।

মিলির বড় খালা বললেন, ‘তোকে বুদ্ধিমতী জানতাম, তুই তো বিরাট গাধা। ছেলে তোর সঙ্গে আগাগোড়া ফাজলামি করে গেছে তুই বুঝলি না? এই ছেলে অড জব করে, ক্যাব চালায় সবই সত্যি কিন্তু তার ফাঁকে পড়াশোনা করে কম্পিউটার সায়েন্সে MS করেছে। সে এখন নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির লেকচারার। আমি কোনো কিছু না জেনে শুনে এমন আয়োজন করব? তুই বোকা হতে পারিস আমি তে বোকা না।’

তুই রেস্টুরেন্টের বিল দিতে গেলি ছয়শ’ টাকা কম পড়ে গেল। সেই টাকা দিল সুজাত। আবার বলল বাকি টাকা রিটার্ন করতে। তখনও কিছু বুঝতে পারলি না? তুই রেস্টুরেন্ট থেকে কেঁদে-কেটে বের হলি সঙ্গে সঙ্গে সুজাত আমাকে টেলিফোন করল। সে হাসতে হাসতে মারা যাচ্ছে। মিলি শোন, সুজাতের তোকে খুবই পছন্দ হয়েছে। সে আমাকে অনুরোধ করেছে যেভাবেই হোক তোকে যেন রাজি করাই। প্রয়োজন সে না-কি বাড়ির সামনে অনশন করবে। এখন তাকে বলব কি?

মিলি কাঁদতে কাঁদতে বলল, ‘তাকে অনশন করতে বল।’

সুজাত সত্যি সত্যি মিলিদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসিমুখে হাঁটাহাঁটি করছে। মিলি তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে। সে অবাক হয়ে লক্ষ করল ছেলেটার চেহারা তার কাছে সুন্দর লাগছে। বুদ্ধিমান, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একজন যুবক। যার চোখে মায়াভাব প্রবল।



দ্বিতীয় মানব

চৈত্র মাসে মানুষের মেজাজ এমনিতেই খারাপ থাকে। ঠাণ্ডা ধরনের মানুষের বেলাতেও দেখা যায়— রোদ চড়তে থাকে, তাদের মেজাজও চড়তে থাকে। সেই হিসাবে মাহতাব উদ্দিন সাহেবের মেজাজ তুঙ্গস্পর্শী হবার কথা। কারণ, আজ চৈত্রের তৃতীয় দিবস, সময় দুপুর, ঝাঁঝালো রোদ উঠেছে। এবং মাহতাব সাহেব এমনিতেই রাগী মানুষ। ধমক না দিয়ে কথা বলতে পারেন না।

বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে মাহতাব উদ্দিন সাহেবের মেজাজ ঠাণ্ডা। তিনি প্রায় হাসি-হাসি মুখে বসার ঘরে খবরের কাগজ হাতে বসে আছেন। তাঁর সামনে টেবিলে চা। টেবিলে ওপাশে বসার ঘরের মাঝমিঝি নীল লুঙ্গি পরা অত্যন্ত বলশালী একটা লোক খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার গা-ভর্তি ঘন লোম। বিশাল মুখমণ্ডল। মনে হচ্ছে গত সাতদিন সে দাঁড়ি কামায়নি। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে আছে নিজের পায়ের আঙুলের দিকে।

মাহতাব উদ্দিন লোকটির দৃষ্টি অনুসরণ করে তার পায়ের আঙুলের দিকে তাকালেন। থ্যাবড়া থ্যাবড়া পায়ের মোটা মোটা আঙুল। ডান পায়ের বুড়ো আঙুল এবং তার পরেরটা সে হারমোনিয়ামের রিডের মতো ওঠানামা করাচ্ছে। মাহতাব উদ্দিন বললেন, ‘তোমার নাম কী?’

লোকটা তার পায়ের আঙুলের নাচানাচি দেখতে-দেখতে বলল, ‘খলিলুল্লাহ। দশজনে খলিল বইল্যা ডাকে।’

‘তোমার নাম খলিলুল্লাহ?’

‘জে।’

‘খালি গায়ে ঘুরছ কেন?’

‘গরম লাগে।’

‘আমার সামনে থেকে যাও। গেঞ্জি শার্ট বা ফতুয়া যে-কোনো একটা-কিছু গায়ে দিয়ে আসো। কখনো খালি গায়ে থাকবে না। খালি গায়ে বাড়ির ভেতর ঢোকা বিরাট অসভ্যতা। আমার বাড়িতে অসভ্যতা করা যাবে না।’

‘জে আইচ্ছা।’

‘খালি পায়েও থাকবে না। সব সময় স্যান্ডেল পরে থাকবে।’

খলিলুল্লাহ বিড়বিড় করে বলল, 'স্যাভেল নাই।'

মাহতাব উদ্দিন বললেন, 'আপাতত শার্ট গায়ে দিয়ে আসো। স্যাভেল বিষয়ে পরে কথা হবে।'

'জে আইচ্ছা।'

রাগে মাহতাব উদ্দিনের গা জ্বলে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি মুখ হাসি-হাসি করে রেখেছেন। কারণ, তিনি তাঁর মেয়ে টুনটুনিকে গত কাল রাত এগারোটায় কথা দিয়েছেন— আগামী সাতদিন তিনি রাগারাগি করবেন না, কাউকে ধমক দেবেন না, এমনকি কঠিন কথাও হাসিমুখ ছাড়া কখনো বলবেন না।

এই প্রতিজ্ঞা রাখা মাহতাব সাহেবের জন্যে অত্যন্ত কঠিন। তিনি অসম্ভব রাগী মানুষ। অল্পতেই তাঁর মেজাজ খারাপ হয়। তাঁর কপালটা এ-রকম যে, মেজাজ খারাপ হবার মতো ঘটনা কিছুক্ষণ পরপর তাঁর চোখের সামনে ঘটে।

আজ ছুটির দিন। তিনি মোটামুটি ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে চা খাচ্ছেন। টুনটুনিকে নিয়ে গুলশানের এক আইসক্রিমের দোকানে যাচ্ছেন। ফেরার পথে টুনটুনি বারিধারা থেকে তার দুই বাস্কবীকে নিয়ে বাড়িতে আসবে। তিন বাস্কবী ছাদের সুইমিংপুলে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করবে। সকাল থেকেই সুইমিংপুলে পানি দেয়া হচ্ছে। আনন্দময় ছুটির দিন। এর মধ্যে উপস্থিত হয়েছে খলিলুল্লাহ। চাকরির সন্ধানে মাহতাব সাহেবের দেশের বাড়ি থেকে এসেছে।

চাকরির সন্ধানে দেশ থেকে লোকজন আসাই মেজাজ খারাপ হবার মতো ঘটনা। ঢাকা শহরের পথেঘাটে চাকরি পড়ে থাকে না। কেউ এলো, পথ থেকে একটা চাকরি কুড়িয়ে তার হাতের দিয়ে দেয়া হলো, হাসিমুখে চাকরি নিয়ে সে বাড়ি চলে গেল। ঘটনা সেরকম না। বিএ, এমএ পাস ছেলে শুকনা মুখে পথেঘাটে ঘুরছে। চাকরির সন্ধানে দেশ থেকে আসা লোকজনদের মাহতাব সাহেব কঠিন ধমক দিয়ে তাত্ক্ষণিকভাবে বিদায় করেন। খলিলুল্লাহর ব্যাপারে এটা করতে পারছেন না। কারণ, তিনি টুনটুনিকে কথা দিয়েছেন আগামী এক সপ্তাহ কারো সঙ্গে রাগারাগি করবেন না। মুখ হাসি-হাসি করে রাখবেন।

মাহতাব সাহেব মুখ হাসি-হাসি করেই রেখেছেন। প্রচণ্ড রাগ নিয়েও মুখ হাসি-হাসি করে রাখা একটি কষ্টকর প্রক্রিয়া। তাঁকে এই কষ্টকর প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। কতক্ষণ যেতে পারবেন সেটা হলো কথা।

খলিলুল্লাহ আবার ঢুকছে। সে লুঙ্গির উপর একটা চকচকে হলুদ শার্ট পরে এসেছে। গলায় মাফলারের মতো ভেজা গামছা পেঁচানো। মাহতাব সাহেব তাকে গলায় গামছা পরতে বলেননি। মনে হচ্ছে গলায় গামছা পরাটাকে সে সাজসজ্জার অংশ হিসেবে নিয়েছে।

'আমার কাছে চাকরির সন্ধানে এসেছ?'

খলিলুল্লাহ কিছু বলল না। আগের মতো পায়ের বুড়ো আঙুল ওঠানামা করাতে লাগল। তবে এখন সে দুটো পায়ের বুড়ো আঙুলই নাচাচ্ছে।

‘দেশের বাড়িতে কী কাজ করতে?’

‘মাটি কাটতাম।’

‘মাটি কাটা ছাড়া আর কোনো কাজ জানো?’

‘জে না।’

‘মাটি কাটা বন্ধ করে ঢাকায় এসেছ কেন?’

খলিলুল্লাহ জবাব দিল না। তার দৃষ্টি পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে।

মাহতাব সাহেব বললেন, ‘ঢাকা শহরে মাটি কাটার কাজ নেই। শহরে মাটিই নেই, কাটবে কীভাবে? ঢাকা শহর হলো ইট-সিমেন্টের। ইট-সিমেন্ট কাটতে পারো?’

‘জে না।’

‘তাহলে তো আর করার কিছু নেই। বাড়ি চলে যাও।’

‘জে আইচ্ছা। চইল্যা যাব।’

মাহতাব সাহেব খুবই বিস্মিত হলেন। বাড়ি চলে যাওয়া কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘাড় কাত করে বলছে— ‘জে আইচ্ছা’। এই সময় ক্ষেত্রে নানান অনুনয় বিনয় চলে। ‘ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেয়ে আছি’—এ জাতীয় কথাবার্তা বলা হয়। কেউ এক কথায় বাড়ি চলে যেতে রাজি হয় না।

‘বাড়িতে যে যাবে যাবার ভাড়া আছে?’

‘জে না।’

‘যাবে কীভাবে?’

‘হাঁটা পথে।’

‘হাঁটা পথে মানে কি হেঁটে হেঁটে?’

‘জে।’

‘হেঁটে হেঁটে চলে যেতে পারবে?’

‘জে। হাঁইট্যা আসছি। হাঁইট্যা যাব।’

‘নেত্রকোনা থেকে ঢাকা হেঁটে এসেছ?’

‘জে।’

‘কত ঘণ্টা লেগেছে?’

‘ঘণ্টার হিসাব করি নাই। সকলে রওনা দিলে পরের দিন দুপুরের মইধ্যে যাওয়া যায়।’

‘সারা দিন সারারাত হাঁটতে হবে?’

‘জে।’

‘শোন খলিলুল্লাহ, তোমার হেঁটে যাবার কোনো দরকার নেই। দুপুরে খাওয়াদাওয়া করো। তারপরে আমার কেয়ারটেকার আছে, তার কাছ থেকে বাস-ভাড়া নিয়ে চলে যাও। কেয়ারটেকারের নাম বারেক মিয়া।’

‘জে আইচ্ছা।’

‘দেশের বাড়িতে তোমার আছে কে?’

‘কেউ নাই। আমি একলা।’

‘বাড়িঘর আছে?’

‘জে না।’

‘বাড়িঘর নাই ঘুমাও কোথায়?’

‘এর-তার বাড়ির উঠানে শুইয়া থাকি। মাঝে-মইদ্যে মসজিদে ঘুমাই।’

‘ঠিক আছে এখন যাও। দুপুরে চলে যাবে।’

‘জে আইচ্ছা।’

খলিলুল্লাহ পা ছুঁয়ে সালাম করতে এল। মাহতাব সাহেব বললেন, ‘সালাম করতে হবে না।’ খলিলুল্লাহ সালাম না করে উঠে দাঁড়াল। মাহতাব সাহেব বললেন, ‘আমার বাড়িতে চাকরির গাছ নেই যে গাছ ভর্তি চাকরি ফল ফলে আছে। তোমরা কেউ আসবে আর আমি বাঁশ দিয়ে চাকরি ফল পেড়ে তোমাদের হাতে একটা করে ধরিয়ে দেব। কাঁচা পাকা ফলের মতো, কোনোটা কাঁচা চাকরি, কোনোটা পাকা চাকরি। বুঝতে পেরেছ কী বলছি?’

খলিলুল্লাহ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, ‘আমি চাকরির জন্যে আসেনি।’

মাহতাব সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, ‘চাকরির জন্যে আসেনি তাহলে কীসের জন্যে এসেছ? ঢাকা শহর দেখতে? চিড়িয়াখানা, এয়ারপোর্ট দেখে বেড়াবে? না-কি চিকিৎসার কোনো ব্যাপার। পেটেব্যথার চিকিৎসা?’

খলিলুল্লাহ শার্টের পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ এগিয়ে দিল। মাহতাব সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, ‘কী?’

‘হেডমাস্টার সার একটা পত্র দিয়েছেন।’

মাহতাব সাহেব তুচ্ছ কুঁচকালেন। এই আরেক সমস্যা, গ্রাম থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তির চিঠি দিয়ে পাঠাচ্ছে, ‘অমুকের চিকিৎসা করাতে হবে। তমুকের মেয়ের বিবাহ, সাহায্য লাগবে।’ হেডমাস্টার সাহেব জাতীয় মানুষেরা চিঠি দিয়েই খালাস। মাহতাব চিঠিতে চোখ বুলালেন—

জনাব মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী,

আসসালাম। আমি নীলগঞ্জ হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার হাবীবুর রহমান। আপনার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, সম্ভবত আপনার ইয়াদ আছে। আপনার মতো বিশিষ্ট মানুষ আমার মতো নাদানকে মনে রাখিবেন ইহা আমি আশা করি না। যা হউক, পত্রবাহক খলিলুল্লাহকে আপনার নিকট পাঠাইলাম। সে বছর তিনেক আগে মাটি কাটা শ্রমিকদলের সহিত আমাদের

অঞ্চলে উপস্থিত হয়। এলজিআরডির রাস্তার কাজ সম্পন্ন হইবার পর সমস্ত শ্রমিকদল বিদায় হইয়া গেলেও খলিলুল্লাহ থাকিয়া যায়। সারা দিন কাজ-কাম করিয়া সে গ্রামবাসী কারো একজনের উঠানে শুইয়া ঘুমাইত। সে কিছুদিন আমার বাড়িতেও ছিল। এই সময় তাহার কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা আমার চোখে পড়ে।

অল্প কথায় বলিতে গেলে আমি বিস্ময়াভিভূত। আপনারা শহর অঞ্চলে বাস করেন। জ্ঞানী-গুণী মানুষ। আপনারা এইসব জিনিসের মূল্য বুঝিবেন বিধায় তাহাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম। যদি অপরাধ হয় নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। পত্রের ভুল-ত্রুটি মার্জনীয়।

আরজগুজার
হাবীষুর রহমান

মাহতাব সাহেব খলিলুল্লাহর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই চিঠিতে কী লেখা তুমি জানো?'

'জে না।'

'পড়তে জানো না?'

'জে না।'

'চিঠিতে লেখা তোমার কী সব ক্ষমতা না-কি আছে। কী ক্ষমতা?'

'আমি জানি না।'

'মাটি কাটার বাইরে আর কিছু করতে পারো?'

খলিলুল্লাহ বলল, 'কলের জিনিস ফইড় করতে পারি।'

'কলের জিনিস ফইড় করতে পারো মানে কী?'

খলিলুল্লাহ বিম্বস্ত হয়ে গেল। মাহতাব সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'তোমার সঙ্গে কথাবার্তা শেষ। এখন সামনে থেকে যাও।'

খলিলুল্লাহ বলল, 'জে আইচ্ছা। স্যারের চিঠিটা কি ফিরত নিয়া যাব?'

'চিঠি ফেরত নিতে হবে না। চিঠি থাক। তুমি ফেরত যাও।'

'জে আইচ্ছা।'

মাহতাব সাহেবের মনে হলো, খলিলুল্লাহ বেশ আনন্দের সঙ্গেই ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। তার চেহারা এবং কথাবার্তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে সে অতি নির্বোধ একজন মানুষ। অতি নির্বোধদের কর্মকাণ্ডে কিছু অস্বাভাবিকতা থাকে। গ্রামের মানুষদের কাছে নির্বোধের অস্বাভাবিকতাকে মনে হয় বিরাট কিছু। খলিলুল্লাহর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কুমিল্লা শহরে এ-রকম এক অর্ধউন্মাদ নির্বোধ নিয়ে কম নাচানাচি হয়নি। তার বিরাট ভক্ত দল জুটে গেল। সবার মুখে

পীর-পাগলা, পীর-পাগলা। তিনি নিজেও একদিন পীর-পাগলাকে দেখতে গেলেন। পীর পাগলা ফোঁৎ করে নাক থেকে সর্দি ঝেড়ে তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'চেটে খেয়ে ফেল।' তিনি হতভম্ব। পীর-পাগলাকে ঘিরে যারা বসেছিল তাদের একজন বলল, 'ভাইসাব চোখ বন্ধ করে টান দিয়ে খেয়ে ফেলেন। আপনার গতি হয়ে যাবে।'

মাহতাব সাহেব ঘড়ি দেখলেন। টুনটুনিকে নিয়ে বের হবার কথা। সে এখনো তার ঘর থেকে বের হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সমস্যা হয়েছে। টুনটুনি বলে গিয়েছিল, দুই মিনিটের মধ্যে নামছি বাবা। দু' মিনিটের জায়গায় কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে। বান্ধবীদের নিয়ে সুইমিংপুলে ঝাপাঝাপির প্রোগ্রাম হয়তো বাতিল হয়ে গেছে। টুনটুনির বেশির ভাগ প্রোগ্রাম শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে যায়। সে তখন তার ঘরের দরজা বন্ধ করে একা একা বসে থাকে।

টুনটুনি নামটা শুনলে মনে হয় সে নিতান্তই বাচ্চা একটা মেয়ে, বয়স চার কিংবা পাঁচ। আসলে টুনটুনির বয়স এ নভেম্বরে তৈরি হবে। সে হোলিক্রস স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। সায়েন্স গ্রুপ। পৃথিবীর সমস্ত বাবা-মা যে আদর্শ সন্তানের কথা ভাবেন টুনটুনি সে-রকম একজন। টুনটুনির স্বভাব-চরিত্রে কোনো ত্রুটি আছে কিনা এটা ধরার জন্যে যদি কোনো তদন্ত-কমিশন বসে এবং হাইকোর্টের কোনো বিচারপতি যদি তদন্ত-কমিশনের চেয়ারম্যান হন তাহলেও কোনো ত্রুটি ধরা পড়বে না।

বাবা-মা'রা চান তাদের ছেলেমেয়ে পড়াশোনায় ভালো হোক। টুনটুনি তাদের সেকশানের ফাস্ট গার্ল। এসএসসি পরীক্ষায় এই মেয়ে যে স্ট্যান্ড করবে এ বিষয়ে শিক্ষকরা একমুখি ভাগ নিশ্চিত।

বাবা-মা'র স্বপ্ন তাদের ছেলেমেয়ে শুধু পড়াশোনা না, অন্য বিষয়েও ভালো করবে। গান-বক্তৃতা-নাটক-লেখালেখি। টুনটুনি চমৎকার রবীন্দ্রসংগীত গায়। আঠারো বছর হবার আগে রেডিও বা টেলিভিশনে এনলিস্টেড হবার নিয়ম নেই বলে সে এনলিস্টেড না। টেলিভিশনের নতুন কুঁড়িতে সে রবীন্দ্রসংগীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছে।

গান ছাড়াও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় টুনটুনি একটা জিনিস শিখেছে, তার নাম ম্যাজিক। তার জন্মদিনে সে একটা বই পেয়েছিল, বইটার নাম '1001 Tricks'। বই পড়ে-পড়ে হাতসাফাইয়ের এই বিদ্যা সে নিখুঁত আয়ত্ত করেছে। একটা আস্ত পেনসিল নাকের ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া, কয়েক শূন্যে ভ্যানিস করে দিয়ে অন্যের কান থেকে বের করা, দড়ি কেটে জোড়া লাগানো এই ম্যাজিকগুলি সে চমৎকার করে দেখাতে পারে। তাদের আমেরিকান ক্লাস টিচার (মিস এলেন) একবার টুনটুনির নাকের ফুটো দিয়ে পেনসিল ঢোকানোর ম্যাজিক

দেখে 'Stop it' বলে এমনভাবে কেপে উঠলেন যে চেয়ার নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন। বহুগুণে গুণবতী হওয়া সত্ত্বেও টুনটুনির কোনো বন্ধু নেই। তার ক্লাসের মেয়েরা তার সঙ্গে গল্প বলার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ বোধ করে না। তাদের জন্মদিনে সবার দাওয়াত হয়— টুনটুনির কথা সবাই ভুলে যায়। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে দু'জন দু'জন করে গ্রুপ। দেখা গেল টুনটুনিকে নিয়ে কেউ গ্রুপ করতে চাচ্ছে না। ফিজিক্স টিচার মিসেস রিতা বললেন, 'জেসমিন (টুনটুনির ভালো নাম জেসমিন চৌধুরী) তোমার সঙ্গে কেউ আসতে চাচ্ছে না কেন?'

টুনটুনি ধরা গলায় বলল, 'কিছু হবে না ম্যাডাম।'

'কিছু হবে না মানে? তুমি একা কাজ করবে?'

টুনটুনি বলল, 'আমাদের ক্লাসে odd number student। একজনকে তো একা থাকতেই হবে।'

টুনটুনির খুবই মন খারাপ হলো। মন খারাপ হলে মন ভালো করার জন্যে কিছু কাজ করে। যেমন, মনে-মনে ইকড়ি মিকড়ি ছড়া বানায়। এই কাজটা সে খুব ছোটবেলায় করত, তখন দ্রুত মন ভালো হয়ে যেত। এখন আর এত দ্রুত মন ভালো হয় না, তবু হয়।

আজ এই মুহূর্তে টুনটুনির মন খুবই খারাপ। তার দু'বান্ধবীর একজন (তিতলি) বলেছে পিয়াল যদি যায় আমি অবশ্যই যাব। পিয়ালকে তার বাসা থেকে তুলে আমাকে তুলে নিয়ে যেও। পিয়াল বলেছে, 'আমি যাব না। আমার পেটব্যথা। আমি বিছানা থেকেই থাকব না।'

পিয়ালের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ কথা বলার সময় পিয়াল হাসছিল। প্রচণ্ড পেটব্যথা নিয়ে কেউ খিলখিল করে হাসতে পারে? টুনটুনির ধারণা তিতলী এবং পিয়াল দু'জনে যুক্তি করে কাজটা করেছে। শুরুতেই তারা না বললেই পারত।

টুনটুনি মন খারাপ ভাবটা কাটাবার জন্যে ইকড়ি মিকড়ি ছড়া বানাচ্ছে—

ইকড়ি মিকড়ি ইকড়ি মিকড়ি।

এসেছে তিতলী ফিকড়ি ফিকড়ি।

পিয়ালও এসেছে, পা তুলে বসেছে।

ব্যথা তার উঠেছে চিকড়ি চিকড়ি।

ইকড়ি মিকড়ি ইকড়ি মিকড়ি।

টুনটুনির দরজায় টোকা পড়ল। টুনটুনি বলল, 'কে?'

মাহতাব উদ্দিন বললেন, 'দরজা বন্ধ করে বসে আছিস কেন রে মা? যাবি না?'

টুনটুনি বলল, 'প্রোগ্রাম ক্যানসেল হয়েছে বাবা।'

'ক্যানসেল হলো কেন? বান্ধবীরা আসবে না?'

'না।'

‘তারা না এলে না আসবে, আমি আর তুই আমরা দু’জনে মিলে পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করব।’

‘আমার আজ আর পানিতে নামতে ইচ্ছে করছে না।’

‘দরজা খোল তো।’

টুনটুনি দরজা খুলল। মাহতাব উদ্দিন মেয়ের বিষণ্ণ মুখ দেখলেন। তাঁর মন অসম্ভব খারাপ হয়ে গেল। মা মরা এই মেয়েটির মন খারাপ হলে তাঁর নিজের মাথা এলোমেলো লাগে।

‘টুনটুনি।’

‘বলো।’

চৈত্রের দুপুরে পিতা-কন্যা পানিতে ভাসছে— এর আনন্দই অন্যরকম। মন খারাপ করে বসে থাকিস না, সুইমিং কস্টিউম বের কর।

টুনটুনি বলল, ‘ঠিক আছে বের করছি।’

মাহতাব সাহেব মেয়ের খাটে বসতে বসতে বললেন, ‘তুই শুনে খুশি হবি যে আজ এখন পর্যন্ত আমি কারো সঙ্গে রাগারাগি করিনি। খলিলুল্লাহর সঙ্গে হাসি-হাসি মুখে কথা বলেছি।’

‘খলিলুল্লাহ কে?’

‘গ্রাম থেকে একজন এসেছে। নেত্রকোণা থেকে সরাসরি হেঁটে ঢাকায় চলে এসেছে।’

‘কী জন্যে এসেছে? চাকরির জন্যে না সাহায্য?’

‘কী জন্যে এসেছে সেটা পরীক্ষার বোঝা যাচ্ছে না। হেডমাস্টার সাহেব চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছেন তার না-কি বিশেষ কিছু ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতা পরীক্ষা।’

‘কী ক্ষমতা?’

‘জানি না তো মা কী ক্ষমতা। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সেও বলতে পারে না। সে বলল, ‘ফইড’ করতে পারে। ফইড কী জিনিস কে বলবে।’

টুনটুনি বলল, ‘মামা আমি উনার সঙ্গে কথা বলব।’

মাহতাব সাহেব বললেন, ‘কোনো দরকার নেই। যন্ত্রণা বাড়াবি না।’

টুনটুনি বলল, ‘দরকার আছে। তুমি তাকে আমার ঘরে পাঠাও।’

‘সে হয়তো এতক্ষণে চলে গেছে।’

‘চলে গেলে তাকে আনবার ব্যবস্থা করো। আমি তার সঙ্গে কথা বলব। প্লিজ। তার সঙ্গে কথা বলার পর তোমাকে নিয়ে পানিতে নামব।’

টুনটুনির মুখ থেকে বিষাদ ভাবটা চলে গেছে। আশ্রহ এবং উত্তেজনায় টুনটুনির চোখ চকচক করছে। মাহতাব উদ্দিনের মনে হলো— অতি নির্বোধ একজন মানুষের কল্যাণে কিছুক্ষণের জন্যেও যদি তাঁর মেয়েটার মন ভালো হয় তাতে ক্ষতি কিছু নেই। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। খলিলুল্লাহ চলে গিয়ে থাকলে তাকে ফেরত আনার জন্যে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত লোক পাঠাতে হবে।

টুনটুনি বলল, ‘আপনার নাম খলিলুল্লাহ?’

খলিলুল্লাহ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার দৃষ্টি সুইমিংপুলের পানির দিকে। মানুষের বাড়ির ছাদেও যে দিঘি থাকতে পারে এই ধারণা সম্ভবত তার নেই। খলিলুল্লাহর চোখেমুখে চাপা উত্তেজনা। সে এক মুহূর্তের জন্যেও সুইমিংপুলের পানি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারছে না।

টুনটুনি কথা বলার জন্যে খলিলুল্লাহকে ছাদে নিয়ে এসেছে। বাবার সামনে কথা বলতে সে হয়তো অস্বস্তি বোধ করবে এই ভেবে মাহতাব সাহেবকে নিচে পাঠিয়ে দিয়েছে। টুনটুনি বসেছে সুইমিংপুলের উঁচু পাড়ে। খলিলুল্লাহ তার সামনেই দাঁড়ানো।

‘বাবা বলছিল আপনার না-কী কী ক্ষমতা আছে। কী ক্ষমতা? আমাকে বলুন। আমাকে বলতে কোনো সমস্যা নেই। আমি ছোট মানুষ তো। ছোট মানুষকে যে-কোনো কিছু বলা যায়।’

খলিলুল্লাহ টুনটুনির কথার উত্তরে কিছু বলল না। আগের মতোই পানির দিকে তাকিয়ে রইল।

টুনটুনি বলল, ‘আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন। রিলাক্সড হয়ে বসুন।’

খলিলুল্লাহ বসল না। টুনটুনি বলল, ‘আমারও কিছু ক্ষমতা আছে। আমি কী করতে পারি জানেন? আমি একটা পিংপং বলকে দু’টা বানাতে পারি। আবার একটা বল শূন্যে ভ্যানিস করে দিতে পারি। দেখবেন?’

খলিলুল্লাহ হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। টুনটুনি ব্যাগে করে ম্যাজিক দেখানোর জিনিস নিয়ে এসেছিল। একটা পিংপং বল দু’টা করার ম্যাজিক খুব সহজ ম্যাজিক। তবে যারা ম্যাজিকের কৌশল জানে না তারা খুবই অবাক হয়। টুনটুনি আগ্রহ নিয়ে ম্যাজিকটা দেখান। একটা পিংপং বল দু’টা হয়ে যাচ্ছে।

আবার একটা বল শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। খলিলুল্লাহ অবাক হয়ে ম্যাজিকটা দেখল। টুনটুনি বলল, ‘আপনি কি এ-রকম পারেন?’

‘জে না।’

‘তাহলে কী পারেন?’

‘কলের জিনিস ফইড় করতে পারি।’

‘আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না। কলের জিনিস কী? আর ফইড়ই-বা কী?’

‘একটা নষ্ট কলের জিনিস দেন, আমি ফইড় করব।’

‘আমি তো আপনার কথাই বুঝতে পারছি না। কলের জিনিস ফইড় করা ছাড়া আর কী পারেন?’

‘পানির খেলা পারি।’

‘পানির খেলাটা কী?’

‘পানির মইধ্যে থাকতে পারি।’

‘পানির মধ্যে তো সবাই থাকতে পারে। আমি একবার সন্ধ্যাবেলায় সুইমিংপুলে নেমেছিলাম, রাত এগারোটায় উঠেছি। তারপর আমার অবিশ্যি জ্বর এসে গিয়েছিল।’

খলিলুল্লাহ নিচু গলায় বলল, ‘পানির মইধ্যে নাইম্যা আমার খেলাটা দেখাই? দেখাইলে বুঝবেন। না দেখাইলে বুঝবেন না।’

‘সুইমিংপুলে নামতে চান?’

খলিলুল্লাহ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। টুনটুনি বলল, ‘আপনি সুইমিংপুলে নামলে বাবা খুব রাগ করবেন।’

‘তাইলে থাউক।’

টুনটুনি বলল, ‘পানির খেলাটা কীরকম? একরোবেটিক কিছু?’

খলিলুল্লাহ বলল, ‘না দেখলে বুঝবেন না। দেখলে মজা পাইবেন। সবাই মজা পায়।’

‘আপনার এই খেলা দেখলে সবাই মজা পায়?’

‘জে পায়।’

টুনটুনির খুবই ইচ্ছা করছে পানির খেলাটা দেখতে। খেলাটা সত্যি সত্যি যদি খুব মজার হয় তাহলে সেও শিখে নিতে পারবে। এই খেলা দেখিয়ে অন্যদের অবাক করে দিতে পারবে। লোকটা যদি সাবান দিয়ে গোসল করে তারপর পানিতে নামে তাহলে কি বাবু খুব বেশি রাগ করবেন?

‘এই খেলা দেখাতে আপনার কতক্ষণ লাগবে?’

‘আপনে যতক্ষণ বলবেন ততক্ষণ দেখাব।’

‘আচ্ছা বেশ, দেখান আপনার খেলা। বেশিক্ষণ দেখাতে হবে না, অল্প কিছুক্ষণ দেখালেই হবে। পানিতে নামার আগে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে— গায়ে সাবান মেখে খুব ভালো করে গোসল করতে হবে। ডানদিকের হলুদ দরজাওয়ালা ঘরটায় শাওয়ার আছে, সাবান আছে। ভালো করে গোসল করে নিন। শাওয়ার কী করে ছাড়তে হয় জানেন?’

‘জে না।’

‘আসুন আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আরেকটা কথা, আপনি পানিতে নামার সময় বাবা যদি হঠাৎ ছাদে এসে দেখে ফেলেন তাহলে তিনি খুবই রাগারাগি করবেন। কাজেই আপনি আপনার খেলাটা দ্রুত দেখিয়ে উঠে পড়বেন। ঠিক আছে?’

খলিলুল্লাহ ঘাড় কাত করে হাসল। এই প্রথম মনে হলো বাচ্চা মেয়েটার কথাবার্তায় সে খুব মজা পাচ্ছে।

টুনটুনি ভেবেছিল পানির খেলাটা খুব জটিল কিছু হবে। বাস্তবে দেখা গেল ব্যাপারটা জটিল কিছু না। পানিতে হাত-পা ছড়িয়ে ডুবে থাকা। টুনটুনিদের

সুইমিংপুলে পানি বেশি নেই। সবচেয়ে গভীর জায়গাটা মাত্র পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। অগভীর জায়গাটা সাড়ে তিন ফুট। খলিলুল্লাহ নামের লোকটা অগভীর জায়গায় হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। পরিষ্কার পানিতে তার চোখমুখ দেখা যাচ্ছে। টুনটুনি প্রথমে ভাবল যে সে পানির নিচে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, হাসছে— এটাই বোধহয় খেলা। খেলাটা যে এরচেয়েও অনেক বেশি জটিল এটা বুঝতে তার কিছুক্ষণ সময় লাগল। যখন সে বুঝতে পারল তখন বুকে ধাক্কার মতো লাগল। মানুষ দু'এক মিনিটের বেশি পানির নিচে থাকতে পারে না। খলিলুল্লাহ পানির নিচে অনেকক্ষণ হলো আছে। সেই অনেকক্ষণ কতক্ষণ? পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট না তার চেয়েও বেশি? এটা কী করে সম্ভব? এটা কি ম্যাজিকের কোনো কৌশল?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সুইমিং কস্টিউম পরে মাহতাব সাহেব আসছেন। তিনি টুনটুনির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খলিলুল্লাহর সঙ্গে তোর ইন্টারভ্যু কি শেষ হয়েছে?'

‘টুনটুনি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।’

মাহতাব সাহেব বললেন, ‘লোকটার ক্ষমতার কোনো নমুনা দেখেছিস। ‘ফইড’ খেলা দেখিয়েছে?’

টুনটুনি কিছু বলল না।

মাহতাব সাহেব বললেন, ‘সে গেছে কোথায়?’

টুনটুনি আঙুল দিয়ে সুইমিংপুলের পানি দেখিয়ে চাপা গলায় বলল, ‘বাবা, লোকটা খুব কম করে হলেও দশ মিনিট হলো পানিতে ডুবে আছে।’

মাহতাব সাহেব ঘড়ি ধরে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সুইমিংপুলের পাশে বসে রইলেন। এক পলকের জন্যেও খলিলুল্লাহর মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরালেন না। এই পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তিনি ছ’টা সিগারেট খেয়ে ফেললেন। একসময় হাত ইশারা করে খলিলুল্লাহকে পানি থেকে উঠতে বললেন। সে খুব স্বাভাবিকভাবে উঠে এলো।

মাহতাব সাহেব শীতল গলায় বললেন, ‘তুমি নিচে যাও। আজ আর তোমার দেশের বাড়িতে যাওয়ার দরকার নেই।’

খলিলুল্লাহ বলল, ‘জে আইচ্ছা।’

মাহতাব উদ্দিন টুনটুনির দিকে তাকিয়ে আছেন। কারো মুখে কোনো কথা নেই। টুনটুনি কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। সে বাবার কাছ থেকে গুনতে চায়। মাহতাব সাহেব সপ্তম সিগারেটটা ধরালেন। টুনটুনি বলল, ‘তুমি অনেকগুলি সিগারেট খেয়ে ফেলেছ।’

মাহতাব উদ্দিন বললেন, ‘হুঁ।’

টুনটুনি বলল, ‘সুইমিংপুলে নামবে?’

মাহতাব উদ্দিন বললেন, ‘না।’

‘আজ খুব গরম পড়েছে তাই না বাবা?’

‘হুঁ।’

টুনটুনি বলল, ‘সবচেয়ে গরম কোন মাসে পড়ে বাবা? চৈত্র মাসে না ভাদ্র মাসে?’

‘জানি না।’

পিতা-কন্যা এমনভাবে কথা বলছে যেন কিছুক্ষণ আগে সুইমিংপুলে কোনো ঘটনা ঘটেনি। যেন দু’জনই ব্যাপারটা ভুলে থাকতে চায়। টুনটুনি বলল, ‘আবহাওয়াটা কেমন যেন ভারী হয়ে আছে। বাবা, একটা জোকস বলো।’

মাহতাব উদ্দিন বললেন, ‘একটা অফিসে টেলিফোন এসেছে। অফিসের বসকে টেলিফোনে চাইছে। বসের সেক্রেটারি বলল, আপনি কে বলছেন পরিচয় দিন, স্যার যার তার সঙ্গে কথা বলেন না। টেলিফোনের ওপাশ থেকে ভারী গলা শোনা গেল, আমি অনেক উপরের লোক। তোমার বসকে দাও।

আপনি কি কোনো মন্ত্রী?

না, আমি তারও উপরে?

আপনি কি প্রধানমন্ত্রী?

আরে না, আমি তারও উপরে।

বলেন কী? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন না তো?

তারও উপরে?

বলেন কী? আপনি কি আল্লাহ?

আরে না তারও উপরে।

আল্লাহর উপরে তো কেউ না।

আমি সেই কেউ না।

গল্প শুনে টুনটুনি খিলখিল করে হাসছে। মাহতাব উদ্দিন বললেন, ‘তোমার হাতে পিংপং বল না? দেখি পিংপং বলের খেলাটা আরেকবার দেখা তো।’

টুনটুনি দেখাল একটা বল দু’টা হয়ে যাচ্ছে। দু’টা বল একটা হচ্ছে।

তোমার হাত তো খুব চালু হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে একেবারে প্রফেশনাল। নতুন কী জাদু শিখলি?

টুনটুনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, ‘বাবা আমরা দু’জনাই ভান করছি যেন এখানে কিছুই হয়নি। কোনো ঘটনা ঘটেনি। সব স্বাভাবিক। কিন্তু দু’জনই খলিলুল্লাহর ঘটনা দেখে ধাক্কার মতো খেয়েছি। এই বিষয়ে কিছু বলো।’

‘চিন্তা করছি।’

‘চিন্তা করে কিছু পাচ্ছ না?’

‘একটা জিনিস পাচ্ছি— এ-রকম কিছু ঘটতে পারে না। মানুষ স্থলচর প্রাণী। উভচর প্রাণী না। বেঁচে থাকার জন্যে মানুষকে প্রচুর অক্সিজেন নিতে হয়। এই অক্সিজেন সে বাতাস থেকে নেয়। পানিতে যে-সব প্রাণী বাস করে তাদেরও

অক্সিজেন লাগে। তারা সেই অক্সিজেন পানি থেকে নেয়। মানুষের পক্ষে কোনোভাবেই এক ঘণ্টা পানিতে বসে থাকা সম্ভব না।’

‘খলিলুল্লাহ কীভাবে থাকল?’

‘সে কোনো একটা কৌশল করেছে। যে কৌশল আমরা ধরতে পারছি না। ডুবুরিরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পানির নিচে থাকে। তারাও কৌশল ব্যবহার করে। অক্সিজেন মাস্ক পরে থাকে। খলিলুল্লাহ যে কৌশল ব্যবহার করেছে সেটা অপ্রকাশ্য কৌশল। আমরা তা বুঝতে না পেরে হকচকিয়ে গেছি। কোনো কিছু দেখে হকচকিয়ে গেলেই যে জিনিসটা সত্যি তা কিন্তু না। আমরা যখন স্টেজে ম্যাজিক-শো দেখতে যাই তখন কী দেখি? তখন দেখি জাদুকর জুয়েল আইচ ইলেকট্রিক করাত দিয়ে একটা মেয়েকে কেটে দু’ভাগ করছেন। ঘটনাটা সবার চোখের উপর ঘটলেও ঘটনা সত্যি না।’

‘তোমার ধারণা খলিলুল্লাহ যা দেখিয়েছে তা সত্যি না?’

‘না।’

‘তাহলে সে এটা কীভাবে করেছে?’

‘জানি না কীভাবে করেছে। আমি চিন্তা করছি।’

‘উনাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়?’

‘জুয়েল আইচকে যদি জিজ্ঞেস করি, আপনি কীভাবে করাত দিয়ে কেটে একটা মেয়েকে দু’ভাগ করেন, তিনি কি উত্তর দেবেন? উত্তর দেবেন না। খলিলুল্লাহ উত্তর দেবে না। আমি অবশ্যই খলিলুল্লাহকে প্রশ্ন করব। তবে আটঘাট বেঁধে প্রশ্ন করব। যখন উত্তর দেয়া ছাড়া তার অন্য উপায় থাকবে না।’

‘আটঘাট কীভাবে বাঁধবে?’

‘জানি না কীভাবে বাঁধব। চিন্তা করছি।’

টুনটুনি হঠাৎ হেসে ফেলল। মাহতাব সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, ‘হাসছিস কেন?’

‘তুমি খুবই ঘাবড়ে গেছ বাবা। তোমার চোখমুখ শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। তোমাকে ঘাবড়ে যেতে দেখে আমার হাসি পাচ্ছে।’

মাহতাব উদ্দিন অষ্টম সিগারেটটা ধরিয়ে চিন্তিত মুখে টানতে লাগলেন। সেদিন বিকেলেই তিনি নীলগঞ্জ হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হাবীবুর রহমান সাহেবের কাছে চিঠি দিয়ে লোক পাঠালেন। তিনি লিখলেন—

জনাব হাবীবুর রহমান

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। যার মারফত চিঠি পাঠিয়েছেন সে আমার বাড়িতেই আছে। তার কিছু ক্ষমতার কথা আপনি বলেছেন। কী ধরনের ক্ষমতা তা ব্যাখ্যা করেননি। দয়া করে

বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে লিখে জানাবেন, তাহলে আমার অনুসন্ধান করতে সুবিধা হবে। লোকটির পূর্ণ ইতিহাসও জানাতে চেষ্টা করবেন। ইতিহাস বলতে আমি তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহারের কথা বলছি। আমি তাকে তার বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি— সে বলেছে সে কলের জিনিস ফইড় করতে পারে। ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি। আপনি এ বিষয়ে যা জানেন তা আমাকে জানাবেন। খলিলুল্লাহর দেশের বাড়ি কোথায়, তার আত্মীয়স্বজন কে আছে তাও জানাবেন। আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা আছে। সময় সুযোগমতো ইনশাআল্লাহ সাক্ষাৎ হবে। আপনি ভালো থাকবেন।

বিনীত

মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী

মাহতাব উদ্দিন চিঠি লিখলেন, টুনটুনি লিখল ডায়েরি। তার একটা ডায়েরি আছে। নীল মলাটের ডায়েরিটার নাম ‘দুঃখ ডায়েরি’। তার জীবনে দুঃখ বা কষ্টের কিছু ঘটলে সে এই ডায়েরিতে তা লিখে রাখে। লাল মলাটের ডায়েরির নাম ‘আনন্দ ডায়েরি’। আনন্দময় ঘটনাগুলি এই ডায়েরিতে লেখে। তিন নম্বর ডায়েরিতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি থাকে। এই ডায়েরিতে সে লিখল—

আলেকজান্ডার বেলায়েভের একটি উপন্যাসের নাম ‘উভচর মানুষ’। আমি যে কয়টি ভালো উপন্যাস পড়েছি এটা তার একটা। বইটা কিছুদিন আগেও আমার কাছে ছিল। এখন হারিয়ে গেছে। বইটির নায়ক ‘উভচর মানুষ’। সে স্থলেও থাকতে পারে আমার পানিতেও থাকতে পারে। প্রথমবার বইটি পড়ে বইয়ের নায়কের দুঃখে খুব কেঁদেছিলাম। আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলাম যেন আল্লাহ আমাকে উভচর মানুষ বানিয়ে দেন। খুবই মজার ব্যাপার, আমাদের বাড়িতে এখন একজন উভচর মানুষ বাস করে। এই মানুষটার নাম খলিলুল্লাহ। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পানিতে থাকতে পারে। মানুষটা সম্পর্কে আমরা কেউ কিছু জানি না। তবে খুব শিগগিরই আমি জেনে ফেলব। আমি বিশটি প্রশ্ন তার জন্যে তৈরি করছি। প্রশ্নগুলি তৈরি হয়ে গেলেই আমি তাঁকে প্রশ্ন করব এবং উত্তরগুলিও লিখে ফেলব। লোকটি যদি সত্যি উভচর হয় তাহলে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে হইচই পড়ে যাবে। তবে আমার বাবার ধারণা লোকটা কোনো একটা কৌশল করে পানির নিচে থাকে। জাদুর কৌশলের মতো কোনো কৌশল। বাবার ধারণাও ঠিক হতে পারে। বাবা খুবই বুদ্ধিমান একজন মানুষ।

হাবীবুর রহমান সাহেব চিঠির জবাব পাঠিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

জনাব মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী,

আসসালাম। লোক মারফত আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনার কুশল জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আমার নিজের শরীর-স্বাস্থ্য ভালো যাইতেছে না। বৃদ্ধ বয়সের নানান আধি ব্যাধিতে আক্রান্ত। কিছুদিন যাবৎ প্রস্রাবে সমস্যা হইতেছে। প্রস্রাবের সময় খুব জ্বালাপোড়া করে। স্থানীয় ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছেন। তেমন ফল পাইতেছি না। তিনি ঢাকায় বড় ডাক্তার দেখাইবার জন্যে পরামর্শ দিতেছেন। ঢাকায় আমার চেনা-জানা কম। এখন আপনি একমাত্র ভরসা। আপনার মতো মানুষের সহায়তা পাইলে আমার মতো নাদানের জন্যে অত্যন্ত উপকার হয়। হোটেলে থাকিয়া চিকিৎসার ব্যয়সংকুলান আমার জন্যে অসম্ভব ব্যাপার। বিষয়টি আপনার গোচরে আনিলাম। এখন আপনার মর্জি।

খলিলুল্লাহর বিষয়ে আসি। আপনি লিখিয়াছেন—‘নষ্ট কল ফইড় করিতে পারি’ এই বাক্যটির অর্থ আপনি উদ্ধার করিতে পারিতেছেন না। ‘ফইড়’ নেত্রকোনার আঞ্চলিক শব্দ। এর অর্থ ‘ঠিক করা’। খলিলুল্লাহ যন্ত্রপাতি ঠিক করিতে পারে। যদিও কলকজার বিষয়ে সে কিছুই জানে না। ট্রানজিস্টার রেডিওর সমস্যা সে ধরিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করিতে পারে। আমার বাসায় একটি ১৪ ইঞ্চি টিভি দীর্ঘদিন অকেজো পড়িয়া ছিল। নেত্রকোনা শহরে রেডিও-টিভি সারাই-এর দোকানে পাঠাইয়াও ফায়দা হয় নাই। সেই টিভি খলিলুল্লাহ ঠিক করিয়া দিয়াছে। এই কাজটি সে কীভাবে করে তা এক বিরাট রহস্য। আল্লাহপাকের জগৎ রহস্যময়। তিনি একেকজন মানুষকে একেক ক্ষমতা দিয়া পাঠাইয়াছেন। খলিলুল্লাহর যন্ত্রপাতি ঠিক করিবার এই আশ্চর্য ক্ষমতা আপনি নিজে পরীক্ষা করিলে খুবই মজা পাইবেন। খলিলুল্লাহ বিষয়ে এরচে’ বেশি কিছু আমি জানি না। অবশ্য সেইভাবে খোঁজ-খবরও নেই নাই। যদি বলেন অনুসন্ধান করিব। অনুসন্ধান ফল হইবে কিনা জানি না। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—স্কুলের পুকুরে দীর্ঘ সময় পানিতে ডুবিয়া থাকিবার খেলা দেখাইয়াও সে অনেকের প্রশংসা কুড়াইয়াছে।

পত্র এইখানে শেষ করিতেছি। আপনি আমার জন্যে দোয়া করিবেন। দয়াময়ের নিকট আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি।

আরজগুঞ্জার

হাবীবুর রহমান বিএ বিটি

অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার

নীলগঞ্জ হাইস্কুল

পুনশ্চ : আমার বড় বৌমা মুসাম্মাদ দিলশাদ খানম খলিলুল্লাহ সম্পর্কে কিছু তথ্য জানে। সে তার শাশুড়ি আম্মাকে বলিয়াছে যে খলিলুল্লাহ সম্পর্কে সে খুব আশ্চর্যজনক কিছু কথা জানে। সে সব কথা প্রকাশ করা সমীচীন নহে।

বড় বৌমা সন্তান-সন্তবা। এখন বাপের বাড়িতে আছে। আপনি আগ্রহী হইলে বড় বৌমার নিকট তথ্য সংগ্রহ করিয়া আপনাকে পাঠাইতে পারি।

টুনটুনি দশটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর যোগাড় করেছে। কিছু-কিছু উত্তরের সঙ্গে তার মন্তব্যও আছে। টুনটুনির প্রশ্নোত্তর পর্ব এই রকম—

১ম প্রশ্ন : আপনার নাম কী?

উত্তর : আমার নাম খলিলুল্লাহ। লোকে আমারে ডাকে খলিল। কেউ-কেউ ডাকে খইল্যা।

মন্তব্য : এই প্রশ্নটি করা ঠিক হয় নি। কারণ, এই প্রশ্নের উত্তর আমি জানি। শুধু জানি না যে, তাকে কেউ-কেউ খইল্যা ডাকে। খইল্যা নিশ্চয়ই অপমানসূচক ডাক।

২য় প্রশ্ন : আপনার দেশের বাড়ি, অর্থাৎ গ্রামের বাড়ি কোথায়?

উত্তর : জানি না তো মা। আমি ছোট থাইক্যা ভাইস্যা বেড়াইন্যার দলে।

মন্তব্য : লোকটার কথা শুনে মনে হচ্ছে কিছু লোকজন আছে যারা ভেসে বেড়ায়। যাযাবররা ভেসে বেড়ায়। তারা কোথাও বেশিদিন এক জায়গায় থাকতে পারে না। বেদেরাও ভেসে বেড়ায়। আমার নিজেরও মাঝে মাঝে যাযাবর হতে ইচ্ছা করে।

৩য় প্রশ্ন : আপনি কি লেখাপড়া জানেন?

উত্তর : না।

৪র্থ প্রশ্ন : স্বরে অ, স্বরে আ, ক, খ, জানেন না?

উত্তর : না।

মন্তব্য : আমি ঠিক করেছি তাকে লেখাপড়া শেখাব। আমার ধারণা তিনি খুব অল্প সময়ে লেখাপড়া শিখতে পারবেন।

৫ম প্রশ্ন : আপনি পানির নিচে কতক্ষণ থাকতে পারেন? আপনার সর্বোচ্চ রেকর্ড কী?

উত্তর : পানির ভিতরে ঢুকলে সময়ের হিসাব থাকে না। যতক্ষণ থাকতে বলেন থাকতে পারব।

মন্তব্য : লোকটা বলে কি! সে কি আসলেই উভচর মানব। আমার খুবই অবাক লাগছে।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন : বেঁচে থাকার জন্যে মানুষকে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয়। তার অক্সিজেন প্রয়োজন। আপনি অক্সিজেন কোথায় পান?

উত্তর : অক্সিজেন জিনিসটা কী আমি জানি না তো আম্মা।

৭ম প্রশ্ন : পানিতে আপনি নিশ্বাস নেন না?

উত্তর : জে না। নিশ্বাস বাতাসে নিতে হয়। পানির মধ্যে নিতে হয় না। নাক দিয়া ঢুকলে মাথাত যন্ত্রণা হয়।

৮ম প্রশ্ন : আপনি যে পানিতে থাকতে পারেন এটা কখন বুঝতে পারলেন?

উত্তর : খুবই ছোট সময়ে। পুসকুনিত হাত ধুইতে গিয়া পানিতে পইড়া গেছিলাম। তারপর দেখি খুবই মজা। সারা দিঘি ঘুইরা বেড়াইছি। এই দিকে সবাই ভাবছে আমার মৃত্যু হয়েছে। পানিত জাল ফালাইছে। হিঃ হিঃ হিঃ।

৯ম প্রশ্ন : আপনি যে দীর্ঘ সময় পানিতে থাকতে পারেন এটা নিয়ে হইচই পড়ে যায়নি? পত্রিকায় লেখালেখি হয়নি?

উত্তর : ইস্কুলের পিছনের পুসকুনিতে দুইবার খেলা দেখাইছি। ম্যালা লোকজন হইছিল। চেয়ারম্যান সাব আমার খেলা দেইখ্যা খুশি হইয়া আশায়ে রূপার মেডেল দিছিল। মেডেল হারাইয়া ফেলছি।

১০ ম প্রশ্ন : এটাকে খেলা বলছেন কেন?

উত্তর : আম্মা গো, এইটা তো খেলাই। ডুব দিয়া কে কতক্ষণ পানির নিচে থাকতে পারে— এই খেলা সব সময় খেলা হয়। অন্যরা কম পারে, আমি বেশি পারি।

টুনটুনি ঠিক করেছে খলিলুল্লাহকে নিয়ে সে জ্যাপ বুকের মতো বানাবে। খলিলুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী থাকবে। তার ছবি থাকবে। প্রশ্নোত্তর থাকবে। তার ওজন, উচ্চতা, চোখের মণির রঙ— সবই থাকবে। খলিলুল্লাহকে সে কী ডাকবে তা নিয়ে সমস্যায় পড়ে গেছে। আগে ঠিক করেছিল সে খলিল ভাই ডাকবে। কিন্তু খলিলুল্লাহ তাকে আম্মাজি ডাকছে। মা নিশ্চয়ই ছেলেকে ভাই ডাকতে পারে না।

মাহতাব উদ্দিন সাহেবের দু'টা অফিস। একটা মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায়, অন্যটা বাদামতলীতে। তিনি সম্প্রতি ইটের ভাটা বসিয়েছেন। ইট বানানোর এই ব্যবসা খুবই লাভজনক বলে কাছাকাছি নতুন অফিস নিয়েছেন। অফিস বুড়িগঙ্গার পাশে। অফিস ঘরটা দোতলা। উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। চারদিকে

প্রচুর লোকজন, ভিড়, হইচই এর মধ্যে মাহতাব উদ্দিনের অফিস ঘরটা নির্জন।

মাহতাব সাহেব সময় পেলেই এই অফিসে বিশ্রাম নিতে আসেন।

তিনি যে ঘরে বসেন সেখান থেকে বুড়িগঙ্গা দেখা যায়। পুরনো দিনের ভারি একটা ইজিচেয়ার জানালার কাছাকাছি রাখা আছে। তিনি ইজিচেয়ারে শুয়ে বুড়িগঙ্গায় নৌকা চলাচল দেখেন।

আজও তিনি ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টি অবিশ্যি বুড়িগঙ্গার দিকে না, খলিলুল্লাহর দিকে। খলিলুল্লাহকে একটা কাজ দেয়া হয়েছে। নষ্ট টিভি ঠিক করতে দেয়া হয়েছে। মাহতাব উদ্দিন তাকিয়ে আছেন তীক্ষ্ণ চোখে।

খলিলুল্লাহর হাতে যন্ত্রপাতি বলতে একটা বড় জু ড্রাইভার। টিভিটা রাখা হয়েছে টেবিলে। সে কাজ করছে দাঁড়িয়ে। অতি দ্রুত সে টিভির যন্ত্রপাতি খুলে ফেলছে। টেবিল ভর্তি হয়েছে নানান ধরনের জুতে। একেক ধরনের জু একেক জায়গায় রাখা উচিত। তা সে করছে না। সব এক জায়গায় রেখেছে। কোন জু কোথায় বসবে এটা সে মনে রাখবে কী করে কে জানে। এটা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। এটা তার ব্যাপার।

মাহতাব সাহেব বললেন, ‘খলিলুল্লাহ, টিভি কীভাবে কাজ করে তুমি জানো?’

খলিলুল্লাহ বলল, ‘জে না।’

‘একটা যন্ত্র সম্পর্কে তুমি কিছু জানো না, যন্ত্রটা ঠিক করবে কীভাবে?’

খলিলুল্লাহ জবাব দিল না।

‘টিভিটা ঠিক করতে কতক্ষণ লাগবে?’

খলিলুল্লাহ বলল, ‘ঠিক হয়ে গেছে।’

মাহতাব সাহেব বললেন, ‘ঠিক হয়ে গেছে?’

খলিলুল্লাহ বলল, ‘জে হয়েছে।’

‘এখন কানেকশন দিলে টিভি চলবে?’

‘জে চলবে।’

মাহতাব সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, ‘যদি না চলে আমি কানে ধরে তোমাকে একশ’বার ওঠবস করাব।’

খলিলুল্লাহ অবাক হয়ে বলল, ‘আমারে কানে ধইরা উঠবস কেন করাইবেন?’

‘আমার সময় নষ্ট করেছ এইজন্যে। আমার সময়ের দাম আছে। যাই হোক টিভির জুগুলো লাগাও। এখানে ডিশের লাইন আছে কানেকশান দাও। তারপর কানে ধরে ওঠবস করার জন্যে তৈরি হয়ে যাও।’

‘জে আইচ্ছা।’

‘আমি পুরস্কার যেমন দিতে পারি, শাস্তিও দিতে পারি। যদি দেখি সত্যি সত্যি টিভি ঠিক হয়েছে তাহলে তোমার জন্যে পুরস্কার আছে।’

‘স্যার, আমার পুরস্কার লাগবে না।’

‘না চাইলেও পুরস্কার দেয়া হবে। শাস্তির ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। শাস্তি না চাইলেও পাবে।’

টিভির জু লাগানো হয়েছে। খলিলুল্লাহ বলল, ‘কাউরে যন্ত্রটা চালু করতে বলেন।’

মাহতাব উদ্দিন বললেন, ‘কাউকে চালু করতে বলতে হবে কেন? তুমি চালু কর। It is your duty.’

খলিলুল্লাহ বলল, ‘আমি যন্ত্র চালাইতে পারি না। ফইড় করতে পারি।’

মাহতাব উদ্দিনকে কফির মগ এনে দেয়া হয়েছে। কফির মগে চুমুক দিতে দিতে তিনি টিভি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর বাড়ির কেয়ারটেকার বারেক কানেকশান দিচ্ছে। একটু দূরে মেঝেতে গম্ভীর মুখে বসে আছে খলিলুল্লাহ। তার দৃষ্টি টিভি স্ক্রিনের দিকে না। তার দৃষ্টি তার নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে। সে এখনো তার দু’আঙুল নাচাচ্ছে।

টিভি-পর্দায় সুন্দর ছবি আসছে। শব্দ আসছে। বারেক কীতুহলী হয়ে টিভি পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে। মাহতাব উদ্দিন তাকিয়ে আছেন খলিলুল্লাহর দিকে। যে নষ্ট টিভিটা ঠিক করেছে তার তো অন্তত একবারের জন্যেও হলে টিভি সেটের দিকে তাকানোর কথা। সে তাকিয়ে না। সে মুগ্ধ হয়ে নিজের বুড়ো আঙুলই দেখছে। মাহতাব উদ্দিন বারেকের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, ‘বারেক, তুমি খলিলুল্লাহকে বাসায় নিয়ে যাও। দারোয়ানকে বলে দাও, সে যেন বাসা থেকে বের হতে না পারে। তাকে ঘরে আটকে রাখো।’

‘বারেক ইয়া-সূচক মাথা নাড়ল।’

মাহতাব সাহেব আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, ‘এই টিভি সেটটা কোনো মেকানিকের কাছে নিয়ে যাও। তাকে বলো এখান থেকে কোনো আইসি খুলে রাখতে যেন টিভি সেটটা অচল হয়ে যায়। আইসি খুলে রাখার পর সেটটা বাসায় নিয়ে যাবে।’

‘ঠিক আছে স্যার।’

‘কী বলেছি বুঝতে পারছ?’

‘পারছি।’

‘কী বললাম, রিপিট করো।’

বারেক বলল, ‘খলিলুল্লাহকে বাসায় নিয়ে যাব। দারোয়ানকে বলব সে যেন বাসা থেকে বের না হতে পারে। টিভি সেটটা মেকানিকের কাছে নিয়ে যাব। মেকানিককে বলব একটা আইসি খুলে রাখতে। নষ্ট টিভিটাও বাসায় নিয়ে যাব।’

‘ঠিক আছে। খলিলুল্লাহকে আমার কাছে পাঠাও।’

খলিলুল্লাহ সামনে এসে দাঁড়াল। মাহতাব সাহেব বললেন, ‘তোমাকে

পুরস্কার দেব বলেছিলাম। পুরস্কার দিচ্ছি। বারেক তোমাকে দোকানে নিয়ে যাবে। শার্ট, প্যান্ট, স্যাভেল কিনে দেবে। নাপিতের দোকানে গিয়ে ভালোমতো চুল দাড়ি কাটবে। এই হলো পুরস্কার। বিড়ি-সিগারেট খাও?’

‘জে না।’

মাহতাব সাহেব মানিব্যাগ খুলে পাঁচশ’ টাকার একটা নোট বের করতে করতে বললেন, ‘টাকাটা রাখো। তোমার হাতখরচ। যে ক’দিন তুমি আমার এখানে থাকবে পাঁচশ’ টাকা করে প্রতিদিন পাবে। মাটি কেটে দিনে কত করে পেতে?’

‘আশি টাকা রোজ।’

‘আশি টাকা রোজের জায়গায় তুমি পাছ পাঁচশ টাকা রোজ। এটা ভালো না?’

‘জে।’

‘সাভারে আমার একটা বাগানবাড়ি আছে। সেখানে বড় পুকুর আছে। তোমাকে পুকুরে নামাব। দেখতে চাই তুমি কতক্ষণ পুকুরে ডুবে থাকতে পারো।’

‘জে আইচ্ছা।’

‘চা বিসকিট কিছু খাবে?’

‘জে না।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও।’

খলিলুল্লাহ চলে গিয়েছে। মাহতাব সাহেব একা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। অফিসের প্রচুর কাজ জমে আছে। কাজ করতে ইচ্ছা করছে না। মাথার ভেতর খলিলুল্লাহর ব্যাপারটা ঘুরধাক খাচ্ছে। ইলেকট্রনিক্সের কিছুই জানে না একটা লোক ইলেকট্রনিক্সের যন্ত্রপাতি ঠিক করে ফেলবে এটা হতে পারে না। অক্সিজেন মাস্ক ছাড়া একটা মানুষ পানির নিচে শুয়ে থাকবে এটা হতে পারে না। প্রকৃতি মানুষকে সেভাবে সজানায়নি। খলিলুল্লাহ মানুষ না, অন্যকিছু। সেই অন্যকিছুটা কী? মানুষ তার সমাজে মানুষের রূপে অন্যকিছু পছন্দ করে না। এমনকি পাগলদেরকেও তারা চিকিৎসার নাম করে আলাদা সরিয়ে রাখে। খলিলুল্লাহ যদি সে-রকম অন্যকিছু হয় তাকেও আলাদা সরিয়ে রাখতে হবে। মানুষের সমাজে তাকে থাকতে দেয়াটা বিরাট বোকামি হবে। এত বড় বোকামি আর যেই করুক তিনি করতে পারেন না। খলিলুল্লাহর ব্যাপারটা কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারলে ভালো হতো। এমন কেউ যে সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে পারবে। বেশিরভাগ মানুষ গুরুত্বই সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে পারে না। যখন বুঝতে পারে তখন আর সমস্যা হাতের মুঠোয় থাকে না। হাতের মুঠো থেকে বের হয়ে যায়।

মাহতাব সাহেব মোবাইল টেলিফোন হাতে নিলেন। জালালের সঙ্গে কথা বলবেন। তার টেলিফোন নাম্বার মনে নেই, তবে যোগাড় করা সমস্যা হবে না।

জালাল খাঁ তাঁর কলেজ-জীবনের বন্ধু। বই পড়া তার জীবনের একমাত্র ব্রত। তার সকাল শুরু হয় হাতে একটা বই নিয়ে, রাতে যখন ঘুমুতে যায় তখনো হাতে বই থাকে। চাকরি-বাকরি নিলে পড়াশোনার সময় কমে যাবে এই যুক্তিতে সে চাকরিই নিল না। অবিশ্যি যে পরিমাণ টাকাপয়সা তার বাবা-মা তার জন্যে রেখে গেছে তাতে জালাল খাঁর পরের তিন পুরুষেরও কিছু করতে হবে না। এখানেও শুভংকরের ফাঁকি, জালাল বিয়েই করেনি।

তার টেলিফোন নাম্বার পাওয়া গেল। বেশ কয়েক বার চেষ্টার পর তাকে ধরা গেল। মাহতাব বললেন, ‘জালাল, কেমন আছিস?’

জালাল শুকনো গলায় বললেন, ‘ভালো।’

মাহতাব সাহেব বললেন, ‘কী করছিস?’

‘পড়ছি। আপনাকে চিনতে পারছি না। আপনি কে?’

‘আগে বল কী পড়ছিস, তারপর বলব আমি কে?’

‘ফাইবার অপটিক্সের উপর একটা পপুলার বই।’

‘বইটা কেমন লিখেছে?’

‘মোটামুটি। তথ্য কম, বর্ণনা বেশি। লেখক খুব সহজ ভাষায় জটিল জিনিস বলতে গিয়ে লেজে-গোবরে করে ফেলেছেন। বেশি সহজ হয়ে গেছে। নিউজ পেপারের সায়েন্স আর্টিকেল হয়ে গেছে।’

‘খটমট কিছু না হলে তোর ভালো লাগে না?’

‘তা-না। আমি আপনাকে এখনো চিনতে পারছি না। দয়া করে নামটা বলুন।’

‘মাহতাব।’

জালাল খাঁ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘ও আচ্ছা, তুই? টুনটুনি কেমন আছে? ও আমাকে একটা জটিল প্রশ্ন করেছিল। আমি তাকে বলেছিলাম বই দেখে প্রশ্নের উত্তর দেব। বাসায় এসে প্রশ্নটা ভুলে গেছি। টুনটুনিকে একটু জিজ্ঞেস করতো প্রশ্নটা কী?’

‘তাকে জিজ্ঞেস করতে পারব না, সে আশপাশে নেই। আমি অফিস থেকে টেলিফোন করছি। তুই কি আজ সন্ধ্যায় আমার বাসায় আসতে পারবি?’

‘কেন?’

‘অদ্ভুত এক হিউম্যান স্পেসিমেন দেখবি।’

‘সব হিউম্যান স্পেসিমেনই তো অদ্ভুত।’

‘এ একটু বেশি অদ্ভুত। সে নষ্ট কলকজা ফইড় করতে পারে।’

‘মানে কী?’

‘যে-কোনো ইলেকট্রনিক্সের জিনিস ঠিক করতে পারে।’

‘সে তাহলে ভালো একজন ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ার। এতে অদ্ভুতের কী আছে!’

‘তার কোনো ডিগ্রি নেই।’

‘এটাও কোনো ব্যাপার না। নিজে-নিজে পড়াশোনা করে মানুষ অনেকদূর উঠতে পারে।’

‘সে পড়াশোনাও জানে না।’

‘অনেক ভালো মিস্ত্রি আছে পড়াশোনা জানে না।’

‘জালাল শোন, আমি যার কথা বলছি সে মাটিকাটা শ্রমিক। তার হাতে যে-কোনো জটিল যন্ত্র দিলে সে কীভাবে কীভাবে সেটা ঠিক করে ফেলে। শোনা কথা না। আমার নিজের দেখা। তার কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই। সে কোনো ওস্তাদের সঙ্গে কখনো এ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে কাজ করেনি। তার সঙ্গে কোনো এমিটার, ভোল্টামিটার নেই। সে কাজ করে তার দু’টা হাত দিয়ে।’

‘তা কী করে হবে?’

‘আমিও বলছি— তা কী করে হবে? কিন্তু হচ্ছে। সমস্যাটা এইখানেই। তোর সামনে আমি পরীক্ষাটা করতে চাই। তোর সামনে আমি একটা নষ্ট টিভি সারাতে দেব।’

‘নষ্ট টিভি সারানোর দরকার কী? আমি এক কাজ করি, বেশকিছু আইসি নিয়ে আসি, তার মধ্যে একটা আইসির লজিক গেট থাকবে নষ্ট। সে আইসিগুলি হাতে নিয়ে বলুক কোনটা নষ্ট।’

‘তুই যেটা ভালো বুঝিস। আমি ঠিক সন্ধ্যাবেলা তাকে নিয়ে যেতে গাড়ি পাঠাব।’

‘গাড়ি পাঠাতে হবে না।’

‘অবশ্যই পাঠাতে হবে। গাড়ি না পাঠালে তুই ভুলে যাবি।’

মাহতাব সাহেব ইজিচেয়ার ছেড়ে টেবিলের কাছে চলে এলেন। হাবীবুর রহমানকে আরেকটা চিঠি পাঠাতে হবে। আজ দিনে-দিনে লোক মারফত চিঠি পাঠিয়ে দিতে হবে। যে চিঠি নিয়ে যাবে সে-ই উত্তর নিয়ে আসবে। দেরি করা যাবে না। মাহতাব সাহেব নিজের ভেতর চাপা অস্থিরতা অনুভব করছেন। মনে হচ্ছে প্রেসার বেড়েছে। ডাক্তার ডেকে প্রেসার মাপানো দরকার। তিনি বেল টিপে ডাক্তার খবর দিতে বললেন। ডাক্তার আসতে আসতে দ্রুত চিঠি লিখে ফেললেন।

জনাব হাবীবুর রহমান সাহেব,

আপনি লিখেছেন আপনার বড় বৌমা খলিলুল্লাহ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানে। আমি নিজে আপনার বড় বৌমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।

আপনি চিকিৎসার জন্যে যে-কোনো সময় ঢাকা আসতে পারেন। বাকি ব্যবস্থা আমি করে দেব।

বিনীত

মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী

যা ভেবেছিলেন তাই। প্রেসার বেড়েছে ১৩০/১০০। ডাক্তার সাহেব বললেন, ‘আপনি কি কোনো কিছু নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করছেন?’

মাহতাব সাহেব বললেন, ‘না।’

‘রিলাক্সেন ট্যাবলেট খেয়ে রেস্ট নিন।’

মাহতাব সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, ‘আমি রেস্টই আছি।’

টুনটুনি মুগ্ধ গলায় বলল, ‘খলিল ভাই, আমি তো আপনাকে চিনতেই পারিনি। খলিলুল্লাহ টুনটুনিকে আম্মাজি ডাকলেও টুনটুনি ঠিক করেছে তাকে সে খলিল ভাই ডাকবে।’

খলিলুল্লাহ লজ্জিত গলায় বলল, ‘নাপিতের কাছে গেছিলাম। চুল কাটছি। শেভ হইছি।’

‘যে সবুজ শার্টটা পরেছেন সেই শার্টেও আপনাকে দারুণ মানিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে আপনার বয়সও অনেক কমে গেছে। এখন আপনাকে দেখে কেউ বলবে না যে আপনি একজন মাটি-কাটক। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি ইউনিভার্সিটিতে পড়েন।’

খলিলুল্লাহ মাথা নিচু করে হাসল। টুনটুনি বলল, ‘আপনাকে এখন আর খলিলুল্লাহ নামে মানাচ্ছে না। আপনার জন্যে নতুন একটা নাম বের করতে হবে।’

‘কী নাম?’

‘চিন্তা করছি, সুন্দর কোনো নাম মাথায় আসলেই সেই নাম আপনাকে দিয়ে দেব। ঠিক আছে?’

‘ঠিক আছে আম্মাজি।’

‘দু’টা নাম এই মুহূর্তে মাথায় এসেছে। দু’টা নামের শুরুই ‘অ’ দিয়ে। একটা হলো অরণ্য, আরেকটা অমিয়। এর মধ্যে আপনার কোনটা পছন্দ?’

‘আম্মাজি, আপনার যেটা পছন্দ আমার সেইটাই পছন্দ।’

‘আমার পছন্দ অরণ্য। এখন থেকে আপনার নাম খলিলুল্লাহ না, এখন থেকে আপনার নাম অরণ্য।’

‘জি আইচ্ছা।’

‘অরণ্য নামের মানে জানেন?’

‘জে না।’

‘অরণ্য নামের অর্থ হলো— বন, জঙ্গল, Forest। আর অমিয় নামের অর্থ হলো সুধা। বরিষে অমিয় ধারা। সুধা বর্ষণ হচ্ছে। কী বলছি কিছু বুঝতে পারছেন?’

‘জে না।’

‘অরণ্য ভাইয়া শুনুন, নাম বদলের সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা বলার ভঙ্গিও বদলাতে হবে। যার নাম অরণ্য সে নিশ্চয়ই গ্রাম্য ভাষার কথা বলবে না। এখন থেকে শুদ্ধ শব্দে ভাষায় কথা বলবেন।’

‘জি আইচ্ছা।’

‘জি আইচ্ছা না। বলুন জি আচ্ছা। আইচ্ছা থেকে ‘ই’ বাদ দিন।’

খলিলুল্লাহ বলল, ‘জি আচ্ছা।’

টুনটুনি বলল, ‘ছাদে চলুন। আমি স্ক্র্যাপ বুক বানাচ্ছি, সেখানে ছবি থাকবে। আপনার বায়োডাটা থাকবে। আপনার ছবি তুলতে হবে।’

‘জি আচ্ছা।’

টুনটুনি গম্ভীর গলায় বলল, ‘আপনার নাম কী?’

খলিলুল্লাহ শুদ্ধ বাংলায় বলল, ‘আমার নাম অরণ্য।’

‘ছবি তোলার পর কী হবে জানেন?’

‘না।’

‘লেখাপড়া সেশন। আপনাকে অক্ষর শেখাব। ঠিক আছে?’

‘হুঁ।’

‘দু’টা বা তিনটা অক্ষর মিলে মিশে যখন শব্দ হয়ে তখন খুব মজা পাবেন। উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। একটা অক্ষর হলো, ক একটা ল। এই দু’টা অক্ষর মিলে মিশে হলো কল।’

খলিলুল্লাহ বলল, ‘কলা কীভাবে হয়?’

টুনটুনি অবাক হয়ে বলল, ‘বাই আপনার তো ভালো বুদ্ধি! আকার বলে আমাদের বাংলা ভাষায় একটা জিনিস আছে। যে-কোনো অক্ষরের সঙ্গে আকার যুক্ত হলে আ এসে লাগে। ল’র সঙ্গে আকার যুক্ত হলে হয় লা। বলুন দেখি ‘ক’ এর সঙ্গে আকার যুক্ত হলে কী হয়?’

‘কা।’

‘এই তো পেরেছেন। এখন বলুন কলা কীভাবে হবে?’

‘ক, তার সঙ্গে ল, ল-এর সঙ্গে আকার।’

‘আপনি খুব দ্রুত লেখাপড়া শিখতে পারবেন। এখন চলুন ফটোসেশনে।’

‘ফটোসেশন কী?’

‘ফটোসেশন হলো ছবি তোলার কর্মকাণ্ড। আমার হাতে যে ক্যামেরাটা দেখছেন এই ক্যামেরাটা সাধারণ ক্যামেরা না। এর নাম ডিজিটাল ক্যামেরা। আমার একটা ম্যাকিনটস কম্পিউটার আছে। ডিজিটাল ক্যামেরায় আপনার ছবি তুলে কম্পিউটারের মেমোরিতে দিয়ে দেব। দেখতে আপনার খুব মজা লাগবে। আপনি যে সবুজ শার্ট পরে আছেন ইচ্ছা করলেই আমি ছবিতে সবুজ শার্টের রঙ বদলে দিতে পারব। আপনার চোখের কালো মণিগুলি নীল করে ফেলতে পারব।’

‘চোখের মণি নীল করলে কী হয়?’

‘আমার কাছে খুব ভালো লাগে। মনে হয় খানিকটা সমুদ্র চোখে চলে এসেছে। আমার মা’র চোখের মণির রঙ ছিল হালকা নীল।’

খলিলুল্লাহ ছবি তোলার জন্যে সুইমিং পুলের পাশে চেয়ারে বসেছে। টুনটুনি চোখের সামনে ক্যামেরা ধরেছে। অটো ফোকাস ক্যামেরা। ক্যামেরা নিজেই ফোকাল লেংথ ঠিক করে জানান দেবে— সব ঠিক আছে, সাটারে চাপ দাও। ক্যামেরায় সবুজ বাতি জ্বলছে। টুনটুনি সাটারে টিপ না দিয়ে বিস্মিত হয়ে বলল— আশ্চর্য তো আপনার চোখের মণি হালকা নীল। আমি আগে কেন লক্ষ করিনি? আমার ধারণা ছিল আপনার চোখের মণি কালো। এখন দেখছি নীল।

খলিলুল্লাহ হাসছে। টুনটুনি বিভিন্ন ভঙ্গিমায় খলিলুল্লাহর দশটা ছবি তুলল।

জালাল খাঁকে আনতে গাড়ি গিয়েছিল সন্ধ্যায়। তিনি এসেছেন রাত ন’টায়। পিটার নিকলস-এর একটা বই পড়ছিলেন— Holocaust and Catastrophe।

বই হাত থেকে নামাতে পারছিলেন না বলে এত দেরি। বই-এর শেষ দু’টা পাতা গাড়িতে বসে পড়েছেন।

জালাল খাঁর বয়স পঞ্চাশ। এই বয়সে মানুষের মাথায় কাঁচাপাকা চুল থাকে। জালাল খাঁর মাথার সব চুল পাকা। টবটকে গৌরবর্ণের একজন মানুষ যার মাথা ভর্তি শরতের মেঘের মতো ধবধবে সাদা চুল। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বই পড়েছেন এই সূত্রে মানুষটার নাম গিনেস বুক অব রেকর্ডস-এ যেতে পারত। কিন্তু গিনেস বুক ওয়ার্ল্ডের এ ধরনের কোনো ক্যাটাগরি নেই।

মাহতাব সাহেব বললেন, ‘তুই কি আইসি এনেছিস?’

জালাল খাঁ বললেন, ‘কীসের আইসি?’

মাহতাব সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘কীসের আইসি মানে? তোকে না বললাম, একজন মানুষকে টেস্ট করা হবে।’

জালাল খাঁ বললেন, ‘তোকে তো খুবই উত্তেজিত মনে হচ্ছে। এত উত্তেজিত কেন? এত উত্তেজিত হবার মতো কিছু পৃথিবীতে ঘটে না। এটম বোমা পড়ার ঘটনা এই পৃথিবীতে মাত্র দু’বার ঘটেছে।’

‘তোকে আনাই হয়েছে লোকটাকে পরীক্ষা করার জন্যে।’

‘পরীক্ষা করা হবে। পরীক্ষার ব্যবস্থা করা আছে। আমার একটা ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডার আছে। নষ্ট হয়ে গেছে। ভয়েস রেকর্ডস হয় না। সেটা এনেছি। তোর মিস্ত্রিকে সেটা ঠিক করতে দেয়া হবে। তুই শান্ত হ। ডাক তাকে। তার আগে ব্রিফিং দে— লোকটার ব্যাপারটা কী? সে কি ভিলেজ ইডিয়ট?’

‘ভিলেজ ইডিয়ট মানে?’

‘সব গ্রামে একজন থাকে মহানির্বোধ। তাকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করে। সে যখন হঠাৎ কিছু বুদ্ধির পরিচয় দেয় তখন হইচই পড়ে যায়। সে-রকম না তো?’

‘না, সে-রকম না। লোকটা নির্বোধ না। পড়াশোনা কিছুই জানে না। তার জীবিকা হলো মাটি কাটা।’

জালাল খাঁ বললেন, ‘তোমার কথা বুঝতে পারছি না— লোকটার যদি যন্ত্রপাতি ঠিক করার জাদুকরি ক্ষমতা থাকে তাহলে সে মাটি কাটবে কেন? সে একটা ওয়ার্কশপ দিয়ে দু’হাতে টাকা কামাবে। এটা সে কেন করছে না?’

মাহতাব সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, ‘তুই ডেকে জিজ্ঞেস কর কেন করছে না। আমি রহস্যভেদ করতে পারছি না বলেই তোকে ডেকেছি।’

জালাল খাঁ হাসতে হাসতে বললেন, ‘জানি না তোমার কী হয়েছে। তুই খুবই উত্তেজিত। উত্তেজনায় তোমার কথাবার্তাও জড়িয়ে যাচ্ছে। ডাক তোমার মিস্ত্রিকে। কথা বলি।’

মাহতাব সাহেব বন্ধুকে নিয়ে লাইব্রেরি-ঘরে বসলেন। বারেককে পাঠালেন খলিলুল্লাহকে আনতে। বিশেষ করে বলে দিলেন খলিলুল্লাহর সঙ্গে টুনটুনি যেন না আসে। টুনটুনি সারাক্ষণ খলিলুল্লাহর সঙ্গে লেগে আছে— এটা মাহতাব সাহেবের ভালো লাগছে না। লাইব্রেরি-ঘরে খলিলুল্লাহর বসার জন্যে একটা টুল রাখা হলো। টুলের সামনে দু’টা সোফা। একটিতে মাহতাব সাহেব, অন্যটিতে জালাল খাঁ। রীতিমতো ভাইবা পরীক্ষা।

খলিলুল্লাহকে দেখে মাহতাব উদ্ভীষ্ট চমকে উঠলেন। এ কে? এ তো খলিলুল্লাহ না। এ অন্য কেউ। কী সুন্দর চেহারা! মুখের চামড়ায় রোদে-পোড়া ভাব নেই। মেয়েদের চামড়ার মতো কমনীয় চামড়া। চোখের মণির রঙ নীলাভ। এটা অবিশ্যি সবুজ রঙের শার্ট পরার কারণে হতে পারে। শার্টের সবুজ রঙ পড়েছে চোখের মণিতে। আগে লোকটা কুঁজো হয়ে দাঁড়াত, এখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের ঘায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে তাকাচ্ছে না। বরং কৌতূহলী চোখে জালাল খাঁকে দেখছে।

জালাল খাঁ বিস্মিত হয়ে চাপা গলায় মাহতাব সাহেবকে বললেন, ‘এই কি তোমার সেই খলিলুল্লাহ?’

মাহতাব সাহেব বললেন, ‘হুঁ।’

‘মাটি কাটা যার জীবিকা?’

‘হুঁ।’

‘দেখে তো সে-রকম মনে হচ্ছে না।’

মাহতাব সাহেব কিছু না বলে সিগারেট ধরালেন। সিগারেট ধরতে গিয়ে লক্ষ করলেন তাঁর হাত কাঁপছে। টেনশনের লক্ষণ। তাঁর ভেতর চাপা টেনশন কাজ করছে। প্রেসার কি আবারো বেড়েছে?

জালাল খাঁ খলিলুল্লাহর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমার নাম কী?’

‘আমার নাম অরণ্য।’

জালাল খাঁ তাকালেন মাহতাব সাহেবের দিকে। মাহতাব সাহেব নিজের মনে সিগারেট টানছেন। খলিলুল্লাহর কথায় তাঁর কোনো ভাবান্তর হলো না।

‘তোমার নাম অরণ্য?’

‘জি।’

‘তুমি লেখাপড়া জানো?’

‘জানতাম না। এখন শিখছি।’

‘কে শেখাচ্ছে?’

‘আম্মাজি শিখাচ্ছেন।’

‘আম্মাজিটা কে?’

‘আম্মাজির নাম টুনটুনি।’

‘ও আচ্ছা, আমাদের টুনটুনি হলো শিক্ষিকা? খুব ভালো। কতদিনে লেখাপড়া শিখে ফেলতে পারবে বলে তোমার ধারণা।’

‘বেশিদিন লাগবে না।’

‘শুনেছি তুমি গ্রামে থাকতে। মাটি কাটার কাজ করতে। এটা কি সত্যি?’

‘জি সত্যি।’

‘গ্রামের একজন মাটি কাটা শ্রমিক গ্রাম্য ভাষায় কথা বলবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলছ।’

‘আম্মাজি আমাকে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে বলেছেন।’

‘তোমার আম্মাজি তোমাকে যা বলে তাই করো?’

খলিলুল্লাহ কিংবা অরণ্য এই প্রশ্নের জবাব দিল না। সে জালাল খাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল। এই হাসিতে কোনো সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই।

জালাল খাঁ বললেন ‘শুনেছি তুমি ইলেকট্রনিক্সের যন্ত্রপাতি নষ্ট হলে সারাতে পারো।’

‘ইলেকট্রনিক্সের যন্ত্রপাতি কী আমি জানি না। রেডিও-টিভি সারাতে পারি।’

‘আমার সঙ্গে একটা ডিভিআর আছে। ডিভিআর হলো ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডার। জিনিসটা দেখতে কলমের মতো। পকেটে রেখে দিলে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত মানুষজনের কথাবার্তা রেকর্ড হয়। যন্ত্রটা কাজ করছে না। তুমি এটা ঠিক করতে পারবে?’

খলিলুল্লাহ হাত বাড়িয়ে বলল, ‘যন্ত্রটা দেন।’

জালাল খাঁ ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডারটা দিলেন। বারেক কফি নিয়ে এসেছে। জালাল খাঁ কফির মগ হাতে নিয়ে খলিলুল্লাহর দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখে কৌতুক ঝিকমিক করছে। তিনি যে ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডার দিয়েছেন সেটা ঠিক আছে। বারো ভোল্টের নিকেল ক্যাডমিয়াম ব্যাটারিটা রেকর্ডারে ফিট করা নেই। তিনি পকেটে করে নিকেল ক্যাডমিয়াম ব্যাটারি এনেছেন তবে সেই ব্যাটারি ক্যামেরার ব্যাটারি। ছয় ভোল্টের ব্যাটারি।

খলিলুল্লাহ কলমের মতো ছোট জিনিসটা একবার ডান হাতে নিল। আরেকবার বাম হাতে নিল। সে যন্ত্রটার দিকে তাকাচ্ছে না। তবে তার চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে আছে। যেন সে হাত দিয়ে ছুঁয়ে জটিল কোনো জিনিস বোঝার চেষ্টা করছে।

জালাল খাঁ বললেন, ‘তোমার কাছে ছোট জু ড্রাইভার আছে? জু ড্রাইভার থাকলে যন্ত্রটা খুলে দেখ— কোনো জিনিস নষ্ট না খুলে বুঝবে কী করে?’

খলিলুল্লাহ ছোট নিশ্বাস ফেলে বলল, ‘যন্ত্রটা ঠিক আছে।’

‘যন্ত্র ঠিক আছে তাহলে চলে না কেন?’

খলিলুল্লাহ ব্যাটারি চেম্বার খুলে বলল, ‘এই জায়গায় একটা জিনিস লাগবে।’

‘ব্যাটারির কথা বলছ? এটা হলো ব্যাটারি চেম্বার। আমার কাছে একটা ব্যাটারি আছে। দেখ তো এটা দিয়ে হবে কি না।’

খলিলুল্লাহ ব্যাটারির হাতে নিয়েই বলল, ‘এটা দিয়ে হবে না। আচ্ছা দেখি, যাতে হয় সেই ব্যবস্থা করি।’

‘কী ব্যবস্থা করবে?’

খলিলুল্লাহ হাসছে। ভালো কোনো ম্যাজিক দেখানোর আগে ম্যাজিসিয়ানরা যে ভঙ্গিতে হাসে সেই ভঙ্গির হাসি।

জালাল খাঁ লক্ষ করলেন খলিলুল্লাহ হাতের নখ দিয়ে ডিভিআর এর অতি ক্ষুদ্র জু খুলে ফেলছে। খোলা জুগুলো কোথাও রাখছে না, হাতের তালুর ভাঁজেই আছে। কাজটা সে এত দ্রুততার সঙ্গে করছে যে মনে হচ্ছে হাতের নখ দিয়ে জু খোলা হলো লোকটার পেশা। গত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে সে এই কাজই করছে।

‘কোন জু কোথায় লাগবে তোমার মনে আছে? একেকটা তো একেক রকম।’

‘মনে আছে।’

‘তোমার কতক্ষণ লাগবে?’

খলিলুল্লাহ জবাব দিল না। এখন সে কাজ করছে চোখ বন্ধ করে। জালাল খাঁ মাহতাব সাহেবের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন, ‘ছয় ভোল্টের ব্যাটারি দিয়ে বারো ভোল্টের ডিভিআর চলবে না। তোমার এই লোক কী করছে সে-ই জানে, তবে তার কর্মপদ্ধতি মজার। যন্ত্রপাতি সম্পর্কে এই লোক কিছু জানে না— তাও ঠিক না। সে অবশ্যই জানে। ডিভিআর হাতে নিয়েই সে বলেছে এটা ঠিক আছে। ব্যাপারটা সত্যি হলেও আমার ধারণা কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে।’

জালাল খাঁর কথার মাঝখানেই খলিলুল্লাহ বলল, ‘স্যার নেন। এখন ঠিক হয়েছে।’

‘ঠিক হয়েছে মানে?’

খলিলুল্লাহ ছোট্ট করে নিশ্বাস দিল। জালাল খাঁ ভয়েস রেকর্ডার হাতে নিলেন। বোতাম টিপে কয়েক বার ‘হ্যালো হ্যালো, ওয়ান টু থ্রি’ বললেন। রিপ্রে করলেন। ভয়েস রেকর্ডার থেকে কথা শোনা গেল— ‘হ্যালো হ্যালো, ওয়ান টু থ্রি।’

জালাল বিস্মিত গলায় ইংরেজিতে বললেন, ‘ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। যন্ত্রের কোনো এক জায়গায় রেজিস্টার বদলাতে হয়েছে। সেটা কী করে সম্ভব আমি বুঝতে পারছি না। আমি পুরোপুরি কনফিউজড।’

খলিলুল্লাহ বলল, ‘স্যার আমি যাই?’

জালাল খাঁ বললেন, ‘যাও। যন্ত্রটা হাতে করে নিয়ে যাও। এটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম।’

‘আমার দরকার নাই।’

খলিলুল্লাহ চলে যাচ্ছে। জালাল খাঁ একবার তাকাচ্ছেন খলিলুল্লাহর দিকে, একবার তাকাচ্ছেন মাহতাব সাহেবের দিকে। দু’জনের কেউই কোনো কথা বলছেন না। মাহতাব সাহেবের ঘাড়ের ব্যথা হচ্ছে। কথা বলছে। অবশ্যই প্রেসার বাড়ার লক্ষণ।

রাত দশটা বাজে।

মাহতাব ঘুমবার আয়োজন করছেন। তিনি কখনোই রাত বারোটোর আগে ঘুমুতে যান না। আজ তাঁর শরীর খারাপ লাগছে। বিকেল থেকেই প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা ছিল। কড়া পেইন কিলার খেয়ে মাথার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। যন্ত্রণা চলে গেছে কিন্তু সে তার পালক স্ক্রল পেয়েছে। সেই পালকের নাম ভোঁতা অবসাদ। তিনি রাতে খাবারও খাননি। হঠাৎ করে আবার এসিডিটি দেখা দিয়েছে। এন্ডোসকপির মতো কষ্টকর প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আবার মনে হয় যেতেই হবে।

দরজায় টোকা পড়ছে। মাহতাব সাহেব বললেন, ‘কে?’

টুনটুনির গলা শোনা গেল। টুনটুনি বলল, ‘বাবা আমি। আমি কি ভেতরে আসব?’

মাহতাব সাহেব বললেন, ‘দরজা খোলা আছে। মা, তোমাকে আমি অনেকবার বলেছি আমি তোমাদের স্কুলের হেড মিসট্রেস না। আমার ঘরে ঢোকার সময় তোমার অনুমতি নিতে হবে না। যখন ইচ্ছা ঘরে ঢুকবে। যখন ইচ্ছা বের হয়ে যাবে।’

টুনটুনি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। মাহতাব সাহেবের ঘরে খাটের পাশে কার্পেটের উপর আখরোট কাঠের একটা রকিং চেয়ার আছে। টুনটুনি রকিং চেয়ারে বসে দোল খেতে লাগল। তার মুখ বিষণ্ণ। মাহতাব সাহেব বললেন, ‘মা, কোনো কারণে তোমার কি মন খারাপ?’

টুনটুনি জবাব দিল না। মাহতাব সাহেব বললেন, ‘মা শোন, তোমার সঙ্গে আমার একটা অলিখিত চুক্তি আছে। চুক্তিটা মনে আছে?’

‘মনে আছে।’

‘বলো দেখি চুক্তিটা কী?’

‘আমার যদি মন খারাপ হয় তাহলে কেন মন খারাপ সেটা তোমাকে জানাব।’

মাহতাব সাহেব মেয়ের সামনে বসতে বসতে বললেন, ‘টুনটুনি মা শোনো, তোমার মা বেঁচে নাই। তোমার মা বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই বের করে ফেলতেন কেন তোমার মন খারাপ। মাদের পক্ষে অনেক কিছু সম্ভব যা বাবাদের পক্ষে সম্ভব না। কাজেই তোমাকেই মুখ ফুটে বলতে হবে কেন তোমার মন খারাপ।’

টুনটুনি দোল খাওয়া বন্ধ করে বলল, ‘অরণ্যকে তুমি তালাবদ্ধ করে রেখেছ কেন?’

‘অরণ্যটা কে?’

‘অরণ্য কে তুমি খুব ভালো করে জানো। আমি খলিলুল্লাহর নাম বদলে অরণ্য নাম দিয়েছি।’

মাহতাব সাহেব শীতল গলায় বললেন, ‘মা, একটু কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? তার নাম তুমি বদলাবে কেন?’

টুনটুনি বলল, ‘বাবা, তুমিও কি একটু বাড়াবাড়ি করছ না। তাকে তুমি কেন তালাবদ্ধ করে রাখবে? আমাদের এই বাড়িটা তো জেলখানা না। এবং সে এমন কোনো অপরাধও করেনি।’

‘তাকে তালাবদ্ধ করে রেখেছি এইজন্যে কি তোমার মন খারাপ?’

টুনটুনি জবাব দিল না। ‘আমারো’ দোল খেতে লাগল। মাহতাব সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, ‘খলিলুল্লাহকে শাস্তি দেবার জন্যে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়নি। ও বেশ ভালো যেতে না পারে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি লোকটির কর্মকাণ্ডে শঙ্কিত। আমি স্বস্তি বোধ করছি না। আমার মনে হচ্ছে Something is wrong somewhere.’

‘তুমি কি লোকটাকে ভয় পাচ্ছ?’

‘হয়তো পাচ্ছি। যারা স্বাভাবিক মানুষ তারা অস্বাভাবিক মানুষের আশপাশে অস্বস্তিবোধ করে। কালো আফ্রিকানদের দেশে প্রথম যখন সাদা চামড়ার মানুষ গেল, আফ্রিকানরা সেই সাদা চামড়ার মানুষকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলল। শুধু যে মেরে ফেলল তা না, আগুন দিয়ে ঝলসে খেয়েও ফেলল। একইরকম ঘটনা ঘটল সাদা চামড়াদের দেশে। তাদের কাছে যখন হঠাৎ কালো চামড়ার একজন এসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে অশুভ মানুষ হিসেবে তাকে পুড়িয়ে মারা হলো।’

‘তুমি অরণ্যকে ভয় পাচ্ছ?’

‘অরণ্য অরণ্য করবে না মা। তার যা নাম তাকে তাই ডাকো। সেটাই শোভন ও সুন্দর।’

‘তুমি খলিলুল্লাহ ভাইকে ভয় পাচ্ছ?’

‘হ্যাঁ, পাচ্ছি। কিছুটা ভয় পাচ্ছি।’

‘তাহলে একটা কাজ করো, ওকে ছেড়ে দাও। সে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে চলে যাবে।’

‘এটা সম্ভব না।’

‘সম্ভব না কেন?’

‘সম্ভব না, কারণ আমি তাকে ছাড়ব না। আমার কাছ থেকে যাবার আগে সে তার সব রহস্য ভেঙে তারপর যাবে। আমি রহস্য পছন্দ করি না।’

‘বাবা, আমি তোমার কথা শুনে খুব অবাক হচ্ছি।’

‘অবাক হলেও কিছু করার নেই। মা শোনো, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। আমি শুয়ে পড়ব।’

টুনটুনি বলল, ‘তোমার সঙ্গে আমার যে লিখিত চুক্তি ছিল তার দু’টা পাট আছে। প্রথম পাটে আমি আমার মন খারাপের কথা তোমাকে বলব। দ্বিতীয় পাটে আছে তুমি চেষ্টা করবে আমার মন খারাপ ভাবটা দূর করতে। তা কিন্তু তুমি করছ না।’

‘কী করলে তোমার মন খারাপ ভাব দূর হবে? ওকে ছেড়ে দিলে? ওকে আমি ছাড়ব না। তালাও খোলা হবে না। তবে একটা কাজ করতে পারি— তোমাকে তালার চাবিটা দিতে পারি। তোমার যখনই তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করবে তুমি তালা খুলে তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে। কথা শেষ হবার পর আবার তালাবদ্ধ করে ফেলবে। এবং চাবি আমার কাছে ফেরত দেবে। রাজি আছ?’

‘হ্যাঁ, রাজি আছি।’

মাহতাব সাহেব ড্রয়ার খুলে মেয়ের হাতে চাবি দিলেন। টুনটুনি চাবি নিয়ে চলে গেল। মাহতাব সাহেব বাথরুমে ঢুকে চোখেমুখে পানি দিলেন। তাঁর সারা শরীর কেন জানি জ্বলছে। বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে পারলে ভালো হতো। এখন তা করা যাবে না। টুনটুনি ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মাহতাব সাহেব আবার তাঁর ড্রয়ার খুললেন। হাবীবুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে চিঠি এসেছে সেটা আবার পড়লেন—

চৌধুরী সাহেব,

আসসালাম। আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি অতি মহানুভব ব্যক্তি। আপনি আমাকে ঢাকায় আসিতে বলিয়াছেন। আমার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। আমি যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়াছি। আজকালকার যুগে এতটা কেউ করে না। আমি অতি দ্রুত ঢাকা আসিবার ব্যবস্থা করিতেছি।

আপনার কথামতো বড় বৌমার নিকট খলিলুল্লাহর বিষয়ে

সন্ধান নিব বলিয়া মনস্থির করিয়াছি। এখনো ব্যবস্থা নিতে পারি নাই। আপনি আমার বড় বৌমার সহিত সাক্ষাতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা আমার জন্যে অতীব সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু জনাব আমার বড় বৌমার পিতামাতা অত্যন্ত রক্ষণশীল ধারার মানুষ। তেরো বৎসর বয়স হইতেই বড় বৌমার বাপের বাড়ির সকল মেয়েদের বোরকা পরিধান করিতে হয়। এমতাবস্থায় আপনাকে ঐ বাড়িতে নিয়ে গেলেও বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে বড় বৌমা সন্তান প্রসবের পর আমার বাড়িতে আসিলেই আপনি তাহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে পারিবেন।

আমার বড় বৌমা তাহার শাওড়ি-মাতার সহিত (অর্থাৎ, আমার স্ত্রী) যে আলাপ করিয়াছে তাহা অতি সম্প্রতি আমি আমার স্ত্রীর নিকট হইতে উদ্ধার করিয়াছি। আপনার জ্ঞাতার্থে আপনাকে তথা জানাইতেছি। আমার বড় বৌমার ধারণা খলিলুল্লাহ মানুষ নহে, সে জিন।

জিন ও ইনসানের কথা পবিত্র কোরান শরীফে উল্লেখ আছে। হজরত সোলায়মান আলায়হেস সালামের অধীনে জিন সম্প্রদায় কর্মকাণ্ড করিত— ইহাও কোরান শরীফে উল্লেখ আছে।

আপনার অবগতির জন্যে জানাইতেছি— সর্বমোট তিন প্রকারের বুদ্ধিমান সম্প্রদায় আল্লাহপাক সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন ফেরেশতা। ইহারা আগুনের তৈয়ারি। ইহারা সন্তান-সন্ততির জন্ম দিতে পারে না। ইচ্ছামতো যে-কোনো রূপধারণ করিতে পারে।

ফেরেশতাদের পুরেই আছে জিন সম্প্রদায়। ইহারাও আগুনে তৈয়ারি। তবে ইহারা সংসারধর্ম পালন করে। সন্তান সন্ততির জন্ম দেয়। মানুষের মতোই ইহাদেরও জন্ম-মৃত্যু আছে। শয়তান (ইবলিশ) জিন সম্প্রদায়ভুক্ত। যদিও অনেকে শয়তানকে পথভ্রষ্ট ফেরেশতা মনে করে। ইহা সঠিক না।

বড় বৌমা কেন খলিলুল্লাহকে জিন ভাবিয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে ইহা অবশ্যই সত্য নয়। মেয়েছেলেরা দুর্বলচিত্ত হইয়া থাকে। রজ্জুকে সর্প ভ্রম করা তাহাদের স্বভাব।

জনাব আপনার নিকট দীর্ঘ পত্র দিয়াছি। পত্রের দোষত্রুটি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহপাক আপনার মঙ্গল করুক।

ইতি
নাদান
হাবীবুর রহমান

চিঠি পড়তে পড়তেই মাহতাব সাহেবের মাথাব্যথা ফিরে এল। চোখ টনটন করতে লাগল। আজ কড়া কোনো ঘুমের ওষুধ না খেলে ঘুম আসবে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি কি বেশি টেনশান করছেন? বাড়াবাড়ি ধরনের এই টেনশানের মানে কী?

মাহতাব সাহেব টেলিফোন হাতে নিলেন। জালাল খাঁর সঙ্গে কথা বললে যদি টেনশান কিছু কমে। সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ। জালাল নিজে টেনশানমুক্ত জীবনযাপন করে। যে নিজে টেনশানমুক্ত জগতে বাস করে সে অন্যদের টেনশান দূর করতে পারে না।

‘হ্যালো জালাল?’

‘হ্যাঁ। কে?’

‘চিনতে পারছিস না কে?’

‘না।’

‘আমি মাহতাব।’

‘ও আচ্ছা তুই। তোর টেলিফোন পাব এটা আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম। অরণ্যের খবর কী?’

‘জানি না কী খবর। তাকে তালাবন্ধ করে রেখেছি।’

‘সে-কি! কেন?’

‘আমি তার ব্যাপারে কনফিউজড।’

‘কনফিউজড হলেই তাকে তালাবন্ধ করে রাখতে হবে? তুই একটা কাজ কর। তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে।’

‘অসম্ভব! তাকে আমি হস্তক্ষেপ করব না।’

জালাল খাঁ হেসে ফেললেন। মাহতাব বললেন, ‘তুই হাসছিস কেন?’

‘তুই অসম্ভবরকম টেনশান হয়ে আছিস এইজন্যে হাসছি। আমার ধারণা তোর প্রেসার বেড়েছে। ড্রপ স্ট্রট হচ্ছে। তুই একজন ডাক্তার ডেকে আন।’

জালাল শোন, ‘আগামী বৃহস্পতিবারে তোর কি অবসর আছে?’

‘আমার সব দিনই অবসর, আবার সবদিনই ব্যস্ততা।’

‘বৃহস্পতিবারটা তুই অবশ্যই অবসর রাখবি। আমার বাগানবাড়িতে যাবি। সেখানে খলিলুল্লাহকে নিয়ে জটিল একটা এক্সপেরিমেন্ট করব।’

‘তুই বারবার তাকে খলিলুল্লাহ বলছিস কেন? টুনটুনি তার নাম দিয়েছে অরণ্য। তাকে অরণ্য ডাকবি। মাহতাব শোন, আমি তোর এই অদ্ভুত মানুষ নিয়ে ভাবছি। কিছু পড়াশোনাও করছি। আমার ধারণা সে Home Superior।’

‘Home Superior কী?’

‘ডারউইনের এভোলিউশনের ধারায় মানুষের পরের বিবর্তন হলো Home Superior।’

‘ভালো করে বুঝিয়ে বল।’

‘বুঝিয়ে বলার সময় এখনো আসেনি। যখন সময় আসবে তখন বুঝিয়ে বলব। মাহতাব, আমি টেলিফোন রাখলাম। পড়ার মাঝখানে কেউ টেলিফোন করলে আমার খুবই বিরক্তি লাগে।’

মাহতাব সাহেব খানিকটা বিব্রত গলায় বললেন, ‘তোকে একটা হাস্যকর প্রশ্ন করছি, তুই কিন্তু হাসবি না।’

জালাল খাঁ বললেন, ‘তুই কনট্রাডিকটরি কথা বলছিস। হাস্যকর কথা বলবি অথচ আমি হাসতে পারব না? আচ্ছা চেষ্টা করব না হাসতে, বল কী কথা?’

‘এমন কি হতে পারে যে খলিলুল্লাহ আসলে মানুষ না। জিন।’

‘জিন?’

‘হ্যাঁ, জিন।’

‘মাটির কলসিতে যারা বন্দি থাকে তারপর ধোয়া হয়ে বের হয় সে রকম কিছু?’

মাহতাব বিরক্ত গলায় বললেন, ‘তুই আমার কথাগুলি ফানের দিকে নিয়ে যাচ্ছিস। আমি ফান করছি না।’

জালাল খাঁ বললেন, ‘তোর ঘরে কি ঘুমের ওষুধ আছে?’

‘আছে।’

‘কয়েকটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে তুই ঘুমিয়ে পড়। আমি ভোরবেলা তোর সঙ্গে কথা বলব। সকালে তুই আরেকটা কাজ করবি— অরণ্যকে কোনো এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবি। ডাক্তার তার ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করবে, ইসিজি নেবে। ডাক্তার যখন বলবে অরণ্যের ব্লাড গ্রুপ ও পজিটিভ তখন নিশ্চয়ই ভাববি না যে অরণ্য মানুষ না জিন। জিনদের ও পজিটিভ ব্লাড গ্রুপ থাকার কথা না।’

‘খলিলুল্লাহর ব্লাড গ্রুপ ও পজিটিভ তোকে কে বলল?’

কেউ বলেনি, ‘কথার কথা বলছি। তুই কি আর কিছু বলবি?’

‘না।’

‘আমি কি টেলিফোন নামিয়ে রাখতে পারি?’

মাহতাব সাহেব কিছু বললেন না। জালাল খাঁ টেলিফোন নামিয়ে রাখার পরেও তিনি বেশ কিছু সময় রিসিভার কানে নিয়ে বসে রইলেন।

ঘড়িতে এখন এগারোটা বাজে। টুনটুনির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। বাতি নিভিয়ে বিছানায় যাওয়া যাবে না। মাহতাব সাহেব দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেকেন্ডের কাঁটা নড়ার কট কট শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিনি যে উত্তেজিত এই কট কট শব্দ তার প্রমাণ। উত্তেজিত হলেই সেকেন্ডের কাঁটা নড়ার কট কট শব্দ তিনি শুনতে পান। ঘড়িটি কি দেয়াল থেকে নামিয়ে ফেলবেন?

এখন বাজছে এগারোটা এক। আশ্চর্য, মাত্র এক মিনিট পার হয়েছে? সময়

কি থমকে গেছে? মাহতাব সাহেবের মনে হচ্ছে তিনি অনন্তকাল ধরে বসে আছেন। দেয়ালঘড়ির সেকেন্ডের কাটার কট কট শব্দ শুনছেন।

টুনটুনি খলিলুল্লাহর ঘরে বসে আছে। সে বসেছে চেয়ারে। খলিলুল্লাহ দেয়ালে হেলান দিয়ে বিছানায় বসে আছে। টুনটুনি বলল, ‘আপনাকে যে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এতে কি আপনার খারাপ লাগছে?’

‘না।’

‘খারাপ লাগছে না কেন?’

‘আম্মাজি, আমার কোনো কিছুতেই খারাপ লাগে না।’

‘আমাকে আপনি আম্মাজি ডাকেন কেন?’

খলিলুল্লাহ জবাব দিল না, হাসল।

‘আপনার মা কি দেখতে আমার মতো ছিলেন?’

‘আমার মায়ের কথা আমার মনে নাই।’

‘মাকে কখনো দেখেননি?’

‘মনে নাই।’

‘আপনার বাবাকে আপনি দেখেছেন?’

‘মনে নাই।’

‘আপনার কিছুই মনে নাই এটা কেমন কথা?’

‘আম্মাজি, আমার একবার খুব কঠিন অসুখ হয়েছিল। অসুখের পর আগের কথা সব ভুলে গেছি।’

‘কী অসুখ হয়েছিল?’

‘মাথায় যন্ত্রণা হয়েছিল। এমন যন্ত্রণা যার কোনো মা-বাপ নাই। তখন চোখের সামনে শুধু কলকজা দেখতাম।’

‘স্বপ্নে দেখতেন?’

‘স্বপ্নে দেখতাম না বাস্তবে দেখতাম সেটা খেয়াল নাই। শুধু দেখতাম কলকজা। বড় কষ্ট করেছি। অসুখ অনেকদিন ছিল।’

‘এখন সেই স্বপ্ন দেখেন না?’

‘না, এখন অন্য কিছু দেখি।’

‘কী দেখেন?’

খলিলুল্লাহ জবাব দিল না। হাসল। টুনটুনি বলল, ‘আজ আমার খুব মন খারাপ।’

খলিলুল্লাহ বলল, ‘কেন মন খারাপ?’

‘আজ আমার মায়ের মৃত্যুদিন?’

‘হ্যাঁ। আপনার যেমন আপনার মায়ের কথা কিছু মনে নেই— আমারও আমার মায়ের কথা কিছু মনে নেই। আমার যখন দু’বছর বয়স তখন আমার মা মারা যান। দু’বছর বয়সের স্মৃতি মানুষের মাথায় থাকে না।’

‘তোমার বাবা আর বিয়ে করেননি?’

‘বিয়ে করেছিলেন। নতুন মা রোড এম্ব্রিডেন্টে মারা যান। চিটাগাং থেকে ঢাকা আসার পথে রোড এম্ব্রিডেন্ট হয়। ড্রাইভার এবং মা দু’জনই মারা যান। বাবা আহত হয়েছিলেন। অনেক দিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল।’

টুনটুনি ছোট নিশ্বাস ফেলে বলল, ‘আসল মা’র কথা আমার মনে নেই, কিন্তু নতুন মা’র কথা মনে আছে। উনি আমাকে খুব আদর করতেন। আমার টুনটুনি নাম উল্টো করে আমাকে ডাকতেন নিটুনটু। আচ্ছা আপনি ঘুমান, আমি উঠি। আপনার ঘর আমি তালাবদ্ধ করে রাখব, আপনি রাগ করবেন না।’

‘আমি রাগ করব না।’

‘আপনার যদি কখনো মনে হয় আপনি এখানে থাকবেন না, পালিয়ে যাবেন— তাহলে আমাকে বলবেন, আমি গভীর রাতে এসে তালা খুলে দেব। আপনি বাড়ির পেছনে চলে যাবেন, সেখান থেকে দেয়াল টপকে পালিয়ে যাবেন। পারবেন না?’

‘হ্যাঁ পারব।’

টুনটুনি খলিলুল্লাহর দরজায় তাল লাগিয়ে দিল।

মাহতাব উদ্দিন ঘুমুতে গেলেন রাত একটায়। ঘুমুতে যাবার আগে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে একটা ডরমিকাম খেলেন। সাত মিলিগ্রামের ডরমিকাম, নিশ্চিত ঘুমের জন্যে যথেষ্ট। ঘুমের ঔষধ খাবার সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় যাবার নাকি নিয়ম নেই। পাঁচ দশ মিনিট পরে যেতে হয়। শরীর রিলাক্স করার জন্যে সামান্য হাঁটাইটি করতে হয়। বিছানায় যাবার ঠিক আগে আগে এক কাপ গরম দুধ এবং এক গ্লাস হিম শীতল পানি খেতে হয়। তিনি সবই করলেন কিন্তু তার ঘুম এলো না। দেয়াল ঘড়ির সেকেন্ডের কাটা প্রথমে দেয়ালে তারপর দেয়াল থেকে তাঁর মাথার ভেতরে কট কট করতে লাগল। তিনি বিছানা থেকে উঠে ঘড়ি নামিয়ে তার ব্যাটারি খুলে রাখলেন। তারপরেও সেকেন্ডের কাটার কটকটানি বন্ধ হলো না। মাথার ভেতর কট কট করতেই থাকলো।

তাঁর ঘুম এলো ফজরের নামাজের পর। ঘুমের মধ্যে তিনি ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখলেন। যেন তিনি তাঁর বিছানায় শুয়ে আছেন। ঘুম ভাঙতেই চারদিকে লালভ আলো দেখতে পেলেন। সেই সঙ্গে শৌ শৌ বিজ বিজ শব্দ। ব্যাপারটা কী জানার জন্যে চারদিকে তাকাচ্ছেন, হঠাৎ চোখ পড়ল ঘরের মেঝের দিকে।

ঘরের মেঝেটা বদলে গেছে। এটা এখন আর মেঝে না, গলিত লাভার মতো হয়ে গেছে। লাভা ফুটছে। বৃদ বৃদ ভাঙছে। সেখান থেকেই বিজ বিজ শব্দ হচ্ছে। ঘটনা কী? তিনি কি কোনো এক অদ্ভুত উপায়ে আগ্নেয়গিরির ভেতরে ঢুকে পড়েছেন? তিনি আতঙ্কে অস্থির হয়ে ঘাটে উঠে বসলেন এবং লক্ষ করলেন তার রট আয়রনের খাটের পায়া জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি লাভাতে গলে গলে যাচ্ছে তিনি দ্রুত নেমে যাচ্ছেন লাভা সমুদ্রে। যে দিকে চোখ যাচ্ছে গলন্ত লাভা।

শৌ শৌ শব্দ আসছে। শব্দটা হচ্ছে ঠিক মাঝখানে। কোনো একটা ঘটনা সেখানে ঘটছে। ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনা! মাহতাব সাহেব স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। কিছু একটা বের হয়ে আসছে। একটা মানুষের মাথা। মানুষটা কে? খলিলুল্লাহ? হ্যাঁ খলিলুল্লাহই তো। মাহতাব সাহেব চোঁচিয়ে বললেন, ‘কী চাও তুমি, কী চাও?’

মানুষের মাথার মুখ হা হয়ে গেল। সে ফিস ফিস করে বলল, ‘আমি কিছু চাই না।’

‘চলে যাও তুমি, চলে যাও।’

‘কোথায় চলে যাব?’

‘যেখানে থেকে এসেছ সেখানে চলে যাও।’

‘যাব কীভাবে? আপনি তো আমাকে তালিবদ্ধ করে রেখেছেন।’

মাহতাব সাহেব স্বপ্নের ভেতর ঝেঁপেছেন— টুনটুনি, চাবি দিয়ে তালা খুলে দে। চলে যাক। এ যেখানে থেকে এসেছে সেখানে চলে যাক।

মাহতাব উদ্দিনের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি দেখলেন— তাঁর সারা শরীর ঘামে ভেজা।

টুনটুনি তার ম্যাকিনটস কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। সে খুব অবাক হয়ে কম্পিউটারের পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে। পর্দায় অরণ্য’র ছবি। জ্যাপ বুক বানানোর জন্যে সে ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলি কম্পিউটারে ঢুকিয়েছে। আগে তোলা ছবি এবং পরে তোলা ছবি পাশাপাশি দেখে তার খুবই অবাক লাগছে। প্রথমদিকে তোলা ছবিগুলির সঙ্গে শেষের দিকে তোলা ছবির মধ্যে বড় অমিল আছে। চোখের মণির রঙে অমিল। প্রথম যে ছবিগুলি তোলা হয়েছিল সেখানে চোখের মণির রঙ কালো। এখনকার ছবিতে হালকা নীল।

মানুষের চোখের মণির রঙ কি পাল্টাতে পারে? অসম্ভব। মানুষ গিরগিটি না যে রঙ পাল্টাবে। তাহলে কি ডিজিটাল ক্যামেরায় কোনো গুণগোল হয়েছে? সেই সম্ভাবনাও ক্ষীণ। কারণ টুনটুনির মনে আছে সে খালি চোখে দেখেছে অরণ্যের চোখের রঙ হালকা নীল।

যদি দেখা যায় যে মানুষটা ইচ্ছামতো চোখের মণির রঙ পাল্টাতে পারে তাহলে মন্দ হয় না। টুনটুনির ইচ্ছা করছে অরণ্যকে জিজ্ঞেস করতে। সেটা সম্ভব না, কারণ টুনটুনির বাবা অরণ্যকে লোক দিয়ে সাভার পাঠিয়ে দিয়েছেন। কেন পাঠিয়েছেন বলেননি। জিজ্ঞেস করার পরেও বলেননি। শুধু বাবাকে খুব চিন্তিত মনে হয়েছে। তিনি অরণ্যকে নিয়েই চিন্তিত এটা বোঝা যাচ্ছে। কারণ তিনি টুনটুনিকে ডেকে বলেছেন, ‘তুমি যখন-তখন খলিলুল্লাহর ঘরে যাবে না।’

টুনটুনি বলেছে— ‘কেন যাব না?’

‘আমি নিষেধ করছি সেই জন্যে যাবে না।’

‘তুমি নিষেধ করছ কেন?’

‘নিষেধ করছি কারণ তুমি একটি অল্পবয়সি মেয়ে। হুটহাট করে একটা যুবক ছেলের ঘরে কেন ঢুকবে?’

‘বাবা অরণ্য কিন্তু আমাকে মা ডাকে।’

‘সে তোমাকে মা ডাকুক, খালা ডাকুক, দাদি ডাকুক কিছু আসে যায় না। আমি তোমাকে যেতে নিষেধ করছি, তুমি যাবে না।’

‘রেগে যাচ্ছ কেন বাবা?’

‘রেগে যাচ্ছি না। আমার যা বলার আমি সহজভাবেই বলছি।’

‘তুমি মোটেই সহজভাবে কিছু বলছ না। তোমার গলার স্বর নিচু, এটা ঠিক আছে। কিন্তু রাগে তোমার হাত-পা কাঁপছে। তোমার চোখ লাল হয়ে আছে। আমার ধারণা তুমি অসুস্থ। তুমি কি দ্রুত করে একজন ডাক্তার দেখাবে?’

মাহতাব সাহেব জবাব দেননি। তিনি মেয়ের সামনে থেকে সরে গিয়েছেন। তার কিছুক্ষণ পরই ডাক্তার আসতে দেখে টুনটুনি ভাবল বাবা তার নিজের জন্যে ডাক্তার এনেছেন। দেখা গেল ঘটনা তা না। ডাক্তার অরণ্যের জন্যে এসেছে। ব্লাড প্রেসার মাপছে, রক্ত নিচ্ছে। নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে।

টুনটুনি নিশ্চিত তার বাবা অরণ্যকে নিয়ে খুবই চিন্তিত। টুনটুনি চিন্তিত হবার মতো কিছু দেখছে না। মানুষটা রহস্যময় এবং বিস্ময়কর। কিন্তু চিন্তিত হবার মতো না। মানুষ চিন্তিত হবে হিংস্র জন্তু দেখে। দুষ্ট মানুষ দেখে। অরণ্য হিংস্র জন্তু না। দুষ্ট মানুষও না।

টুনটুনি অরণ্যের ছবির প্রিন্ট আউট দিয়েছে। কালার প্রিন্টার থেকে ছবি প্রিন্ট হচ্ছে। কী সুন্দর ছবি!

মাহতাব উদ্দিন তাঁর সাভারের বাগানবাড়ির পুকুর পাড়ে বসে আছেন। তাঁর পাশে জালাল খাঁ বসে আছে। পুকুর পাড়ে দ্বিতীয় কোনো প্রাণী নেই। মাহতাব উদ্দিন কঠিন নিষেধ জারি করেছেন পুকুর পাড়ে যেন কেউ না আসে। পুকুরে

খলিলুল্লাহকে নামানো হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ হলো সে ডুব দিয়েছে। এখনো ভাসেনি। মাহতাব উদ্দিন বললেন, ‘জালাল দেখ তো কতক্ষণ পার হয়েছে।’

জালাল খাঁ বললেন, ‘সতেরো মিনিট।’

‘সতেরো মিনিট একটা মানুষ ডুব দিয়ে আছে। পানিতে নামানোর সময় একটা হাফপ্যান্ট পরে নেমেছে। এখনো ভেসে ওঠেনি। তোর কাছে কি কোনো ব্যাখ্যা আছে?’

‘না।’

‘কোনো ব্যাখ্যা নেই?’

‘না।’

‘কোনো মানুষের পক্ষে কি এই কাজটা করা সম্ভব?’

জালাল খাঁর গম্ভীর গলায় বললেন, ‘মানুষের ক্ষমতা সীমাহীন। তার পক্ষে অনেক কিছুই সম্ভব, কিন্তু অক্সিজেন ছাড়া বাঁচা সম্ভব না।’

মাহতাব উদ্দিন বললেন, ‘লোকটা অক্সিজেন ছাড়া বেঁচে আছে?’

জালাল খাঁ বললেন, ‘হ্যাঁ।’

‘মাছ যেমন পানি থেকে অক্সিজেন নেয় সে কি এইভাবে নিচ্ছে না?’

‘না।’

‘কীভাবে বুঝলি, না।’

‘অক্সিজেন নিলে তাকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়তে হতো। তা সে করছে না। যদি করত পানিতে বুদবুদ দেখা যেত। পানিতে বুদবুদ দেখছি না। আরেকটা সম্ভাবনা আছে।’

‘কী সম্ভাবনা?’

‘আমাদের অরুণা যদি তার শারীরবৃত্তীয় সমস্ত কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখে তাহলে অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়বে না।’

‘সেটা কি সম্ভব?’

‘প্রাচীন মুনিঋষিরা করতে পারতেন বলে বইপত্রে পড়েছি। যোগী সাধকরাও না-কি পারেন। তবে আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য না। তোমার এই স্পেসিমেন আর যাই হোক কোনো মুনিঋষি না, যোগী সাধকও না।’

মাহতাব উদ্দিন বললেন, ‘সে কে?’

জালাল খাঁ বললেন, ‘জানি না। আমি একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি।’

‘কী হাইপোথিসিস?’

‘এখনো তেমন কিছু দাঁড় করাতে পারিনি, ভাবছি। আমাদের এগোতে হবে লজিকের মাধ্যমে। প্রসেস অব এলিমিনেশন পদ্ধতিতে।’

জালাল খাঁ সিগারেট ধরালেন। ঘড়ি দেখলেন। পঁচিশ মিনিট পার হয়েছে। মানুষটা এখনো পানিতে ডুব দিয়ে আছে। মাহতাব উদ্দিন বললেন, 'প্রসেস অব এলিমিনেশনটা কী?'

জালাল খাঁ বললেন, 'প্রথমে আমাদেরকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে অরণ্য নামের জিনিসটি মানুষ না অন্য কিছু। যদি মানুষ হয় তাহলে এক ধরনের যুক্তি আর যদি অন্য কিছু হয় তাহলে অন্য ধরনের যুক্তি।'

মাহতাব উদ্দিন বললেন, 'অন্য কিছুটা কী হতে পারে?'

'রোবট হতে পারে।'

'রোবট?'

'হ্যাঁ, রোবট। দেখতে মানুষের মতো। কথাবার্তা মানুষের মতো। যেহেতু রোবট, তার অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ছে না। সে পানির নিচে যতক্ষণ ইচ্ছা থাকতে পারবে।'

'তোর ধারণা সে রোবট?'

'আমার কোনো ধারণা নেই। প্রসেস অব এলিমিনেশনের ভেতর দিয়ে যেতে হলে প্রথমে তাকে রোবট ভাবতে হবে। তারপর যুক্তি দিয়ে দেখাতে হবে সে রোবট না। তখন রোবট ক্যাটাগরি বাদ পড়বে।'

মাহতাব উদ্দিন ছোট নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'সে রোবট না। তার ব্লাড টেস্ট হয়েছে। ব্লাডের গ্রুপ 'O' পজিটিভ। ইউরিন, স্টুল সব একজামিন করা হয়েছে, ইসিজি করা হয়েছে, প্রেশার মাপা হয়েছে, এক্স-রে নেয়া হয়েছে। সবকিছুই সাধারণ মানুষের মতো, শুধু হার্ট সামান্য এনলার্জড।'

জালাল খাঁ বললেন, 'তাহলে তাকে বরং মানুষ হিসেবে ধরে নিয়ে এগোতে থাকি। ধরা যাক সে মানুষ, তবে অস্বাভাবিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ। Home superior।'

মাহতাব উদ্দিন বললেন, 'Home superior ব্যাপারটা কী? তুই আগেও একবার বলেছিস।'

জালাল খাঁ বললেন, 'জন বেরেসফোর্ড নামের একজন লেখক *The Hampdenshire Wonder* নামে একটা বই লিখেছিলেন। বইটা ১৯১১ সনে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বই-এ তিনি Home superior-এর কথা প্রথম বলেছেন। তাঁর ধারণা পৃথিবীর বর্তমান মানব সম্প্রদায়ের পরিবর্তে নতুন মানব সম্প্রদায় চলে আসবে। তারা দেখতে মানুষের মতো হলেও তাদের থাকবে অস্বাভাবিক ক্ষমতা। এরাই পৃথিবী শাসন করবে। এরাই গ্রহ-নক্ষত্র জয় করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।'

'এরা আসবে কোথেকে?'

‘মিউটেশনের মাধ্যমে মানুষের ডিএনএ পরিবর্তিত হয়ে Home superior তৈরি হবে। এরা হলো কার্টুনে দেখা কল্পনার Superman।’

‘ডারউইনের বিবর্তনবাদ? বিবর্তিত হয়ে মানুষ এ-রকম হবে?’

জালাল খাঁ বললেন, ‘ডারউইনের বিবর্তনবাদের সমস্যা হচ্ছে এই থিওরি অতীতের বিবর্তনের ধারা বলতে পারে কিন্তু ভবিষ্যতে কী বিবর্তন হতে যাচ্ছে তা বলতে পারে না। মানুষের ডিএনএ-র পরিবর্তনটা কীভাবে হবে ডারউইনের থিওরি সেটা বলছে না। হঠাৎ করে একজন Home superior তৈরি হবে না-কি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এদের দেখা যাবে তা কেউ বলতে পারছে না।’

‘জালাল, তোর ধারণা খলিলুল্লাহ নামের মাটিকাটা কুলি একজন Home Superior?’

‘হতে পারে। তার অস্বাভাবিক ক্ষমতা তো চোখের সামনে দেখছি। যন্ত্রপাতির উপর তার কী পরিমাণ দখল সেটাও দেখতে পাচ্ছি।’

‘আমাদের এখন করণীয় কী?’

‘আমাদের করণীয় একটাই— অরণ্যের সঙ্গে কথা বলা। তার সাহায্য নিয়েই বের করা সে কে? তার DNA-র সিকোয়েন্সগুলি কী তা জানা। যে পড়াশোনা জানে না তাকে পড়াশোনা শেখানো। সে যদি Home superior হয় তাহলে মানবসম্প্রদায়ের অর্জিত জ্ঞানের সবটুকু সে নিজের ভেতর অতি দ্রুত নিতে পারবে।’

মাহতাব উদ্দিন বললেন, ‘কতক্ষণ পার হয়েছে দেখ তো?’

‘এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট।’

‘তাকে কি ডেকে তুলব না সে আরো কিছুক্ষণ পানিতে থাকবে?’

জালাল খাঁ বললেন, ‘থাকুক পানিতে। আমাকে তুই একটা কাগজ কলম দে। তাকে যেসব প্রশ্ন করব তা লিখে ফেলি। থাক কাগজ কলম লাগবে না।’ জালাল খাঁ পুকুরের দিকে তাকিয়ে আছেন। মাহতাব উদ্দিনও তাকিয়ে আছেন। কেউ কোনো কথা বলছেন না। পুকুরের পানি শান্ত। সেখানে কোনো আলোড়ন নেই।

জালাল খাঁ মাহতাব উদ্দিন সাহেবের বাগানবাড়ির বসার ঘরে সোফায় বসে আছেন। তাঁর সামনে বেতের চেয়ারে খলিলুল্লাহ বসে আছে। সব মিলিয়ে পানিতে দু’ঘণ্টা ছাব্বিশ মিনিট ছিল। এক ঘণ্টা হলো সে পানি থেকে উঠে এসেছে। সামান্য কিছু খাওয়া-দাওয়া করে সে এসে বসেছে বসার ঘরে। জালাল খাঁ তাঁর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান। মাহতাব উদ্দিনেরও এই আসরে থাকার কথা ছিল। তাঁর হঠাৎ প্রবল মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে বলে তিনি অন্য একটা

ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে শুয়ে আছেন। তাঁর মাইগ্রেনের সমস্যা আছে।
হঠাৎ হঠাৎ মাইগ্রেনের ব্যথা উঠে তাঁর জগৎ সম্পূর্ণ এলোমেলো করে দেয়।
আজকের মাথা ব্যথার ধরন সে-রকম।

জালাল খাঁ অরণ্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন আছ?'

অরণ্য বলল, 'ভালো আছি।'

'পানির নিচে থাকতে কেমন লাগে?'

'ভালো লাগে।'

'শুকনায় থাকতে ভালো লাগে না-কি পানিতে থাকতে ভালো লাগে?'

'দু'টাই ভালো।'

'তোমাকে আমি কিছু প্রশ্ন করব, জবাব দেবে?'

'জি, দেব।'

'তোমার কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা যে আছে এটা তুমি জানো?'

'আগে জানতাম না। এখন জানি।'

'তুমি পানিতে ডুবে থাকতে পারো এটা দেখলাম। এ ছাড়া আর কী পারো?
শূন্যেও ভেসে থাকতে পারো?'

'পারি।'

জালাল খাঁ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে আবারো
বললেন, 'তুমি শূন্যে ভেসে থাকতে পারো?'

'পারি।'

'তাহলে ভেসে দেখাও।'

'এখন পারব না।'

'কখন পারবে?'

'যখন আশপাশে কেউ থাকে না তখন পারি।'

'কতক্ষণ ভেসে থাকতে পারো?'

'অনেকক্ষণ পারি।'

'তুমি কে এটা বলো।'

'আমি জানি না আমি কে।'

'তোমার কি জানতে ইচ্ছা হয় তুমি কে?'

'না।'

'কিন্তু আমি জানতে চাই তুমি কে? তুমি আমাকে সাহায্য করো। তুমি
সাহায্য করলেই আমি তোমার ব্যাপারে জানতে পারব। তুমি সাহায্য না করলে
পারব না। আচ্ছা শোনো, তুমি কি রোবট?'

'রোবট কী?'

‘রোবট হলো যন্ত্রমানব। যাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই, আবেগ নেই। তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে?’

‘আছে।’

‘আবেগ আছে? কষ্ট পেলে কাঁদো?’

‘না।’

‘কষ্ট পেলে কাঁদো না? কখনো তোমার চোখে পানি আসেনি?’

‘একবার এসেছে।’

‘সেটা কখন?’

‘আম্মাজি তার মা’র কথা বলছিল। তার মা’কে সে কখনো দেখে নাই। মা’র কথা বলতে গিয়ে সে এত মন খারাপ করল যে আমার চোখে পানি এসে গেল।’

‘এর অর্থ হচ্ছে তোমার আবেগ আছে। আচ্ছা, তুমি তোমার বাবা-মাকে মনে করতে পারো? তারা কোথায়?’

‘জানি না।’

‘বাবা মা’র কথা কিছুই জানো না?’

‘আমার কিছু মনে নাই। একবার আমার ঘুম বড় অসুখ হয়েছিল। অসুখ হবার পর অসুখের আগের সবকিছু ভুলে গেছি।’

‘কী অসুখ হয়েছিল?’

‘মাথায় যন্ত্রণা। দুঃস্বপ্ন দেখতাম।’

‘কী দুঃস্বপ্ন?’

‘নানান রকম কলকজা শুনতাম। অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্র। অসুখের সময় বড় কষ্ট করেছি।’

জালাল খাঁ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ‘যন্ত্রের কথায় মনে পড়ল তুমি নষ্ট যন্ত্রপাতি ঠিক করতে পারো। এই প্রমাণ আমরা দেখেছি। যে নষ্ট যন্ত্র ঠিক করতে পারে সে যন্ত্র বানাতেও পারে। তুমি যন্ত্র তৈরি করতে পারবে?’

‘কী যন্ত্র?’

‘আমাদের জানা নেই এমন।’

‘আপনি বলেন কী যন্ত্র বানাতে চান।’

জালাল খাঁ আশ্রয় নিয়ে বললেন, ‘একটা টাইম মেশিন কি বানানো যায়? এইচ জি ওয়েলস-এর টাইম মেশিন।’

‘সেই মেশিনে কী হয়?’

‘সেটা একটা অদ্ভুত মেশিন। এই মেশিনে করে মানুষ অতীত থেকে বর্তমানে আসতে পারে। বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে যেতে পারে।’

‘আপনার কথা বুঝতে পারছি না।’

জালাল খাঁ উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত পা নেড়ে এমন ভঙ্গিতে কথা বলা শুরু করলেন যেন টাইম মেশিন বানাতে পারে এমন একজন ইনজিনিয়ার তাঁর সামনে বসে আছে। ব্যাপারটা শুধু বোঝানোর অপেক্ষা, বোঝানো হয়ে গেলে টাইম মেশিন তৈরি হয়ে যাবে। তাৎক্ষণিক ডেলিভারি।

‘মেশিনটা হবে এরকম— মনে করো আমি মেশিনটায় বসলাম, সুইচ টিপলাম। অমনি আমি চলে গেলাম অতীতে, যখন আমার বাবার বয়স মাত্র সাত বছর।’

‘এই যন্ত্র তৈরি করা যাবে না।’

‘কেন তৈরি করা যাবে না?’

‘নিয়মের মধ্যে পড়বে না।’

‘কীসের নিয়ম?’

‘জগতের নিয়ম। এই যন্ত্র তৈরি হলে জগতের নিয়মে গণ্ডগোল হয়ে যাবে। জগতের নিয়মে গণ্ডগোল হয় এমন কিছু জগৎ তৈরি করতে পারে না।’

জালাল খাঁ নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘তুমি ঠিকই বলেছ। টাইম মেশিন ফিজিক্সের সূত্র গ্রহণ করে না। ধরো আমি যদি অতীতে ফিরে গিয়ে আমার সাত বছর বয়সি বাবাকে মেরে ফেলি তাহলে কী হবে? তাহলে আমি কীভাবে বেঁচে থাকব? আমার বাবাই তো সাত বছর বয়সে মারা গেছেন। তিনি বড় হয়ে বিয়ে করতে পারেননি। কাজেই আমার জন্ম হয়নি। তাহলে আমি কোথেকে এলাম?’

অরণ্য একদৃষ্টিতে জালাল খাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে চাপা কৌতূহল। যেন সে কিছু বলতে চায়। জালাল খাঁ বললেন, ‘তুমি কিছু বলবে?’

‘আমি আম্মাজির জন্যে একটা যন্ত্র বানাব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

‘কার জন্যে যন্ত্র বানাবে, টুনটুনির জন্যে?’

‘জি।’

‘কী যন্ত্র?’

‘আম্মাজি এই যন্ত্রে তার মায়ের কথা শুনতে পাবে। অনেক কাল আগে যেসব কথা বলেছিল সেসব কথা।’

‘কীভাবে?’

‘মানুষের কথা নষ্ট হয় না। মানুষের কথা থেকে যায়। ঘরের দেয়ালে থাকে, বাতাসে থাকে। সেখান থেকে কথা বের করে আনা যাবে।’

‘কীভাবে?’

‘সেটা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আপনাকে বোঝাতে পারব না।’

‘যন্ত্রটা তৈরি করতে তোমার কী লাগবে?’

‘কলমের মতো একটা যন্ত্র যে আপনার আছে সেটা লাগবে। আরো কিছু জিনিস লাগবে।’

‘তোমার যা যা লাগবে সবই আমি যোগাড় করে দেব। তুমি যন্ত্রটা বানাও। আমরা এই যন্ত্রের নাম দেব Past Recorder, PR। বাংলায় তার নাম হবে ‘অতীত-কথন’। আচ্ছা তুমি কি যন্ত্রটা একা একা তৈরি করতে পারবে? তোমাকে সাহায্য করার লোক লাগবে না?’

‘আমাকে সাহায্য করার লোক আছে।’

‘কোথায় আছে?’

অরণ্য জবাব দিল না। চুপ করে বসে থাকল। সে এখন তাকিয়ে আছে তার পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে। বুড়ো আঙুল উঠানামা করছে।

জালাল খাঁ তার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, ‘তুমি কে?’

অরণ্য বলল, ‘আমি জানি না আমি কে?’ বলেই সেও জালাল খাঁর দিকে ঝুঁকে এসে বলল, ‘আপনি কি জানেন আপনি কে?’

জালাল খাঁ হতাশ গলায় বললেন, ‘আমিও জানি না আমি কে?’

হাবীবুর রহমান সাহেব চিকিৎসার জন্যে ঢাকা চলে এসেছেন। খালি হাতে আসেননি— তিন কেজি মাষকলাইয়ের (ডাল), পাঁচ কেজি কালিজিরা পোলাওয়ের চাল, দু’টা বিশাল সাইজের মিষ্টিকণ্ডা নিয়ে এসেছেন। তিনি হাত বাড়িয়ে মাহতাব সাহেবের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। হ্যান্ডশেকের পর কোলাকুলি করলেন। মাহতাব সাহেবের কাঁড়িঘর দেখে বেচারা পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছেন। এই জিনিস তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। বসার ঘরের মেঝের অর্ধেকটা মারবেলের, বাকি অর্ধেক মনে হচ্ছে কাচের, নিচ থেকে সবুজ আলোর আভা আসছে। হাবীবুর রহমান সাহেব বললেন, ‘ভাইসাহেব, ভালো আছেন?’

মাহতাব উদ্দিন বললেন, ‘ভালো আছি।’

‘যাকে পাঠিয়েছিলাম, খলিলুল্লাহ, সে কেমন আছে?’

‘সেও ভালো আছে।’

‘তার মাধ্যমেই আপনার সঙ্গে পরিচয়, জগতের কী অদ্ভুত লীলা।’

‘অদ্ভুত লীলা তো বটেই।’

‘জনাব, আপনি বলেছিলেন আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।’

মাহতাব উদ্দিন শুকনো গলায় বললেন, ‘চিকিৎসার ব্যবস্থা অবশ্যই করা হবে। আপাতত বিশ্রাম করুন। আপনাকে গেস্টরুম দেখিয়ে দেবে।’

‘শুকিরয়া। জনাব, খলিলুল্লাহর সঙ্গে একটু কথা বলি। সে আছে কোথায়?’

‘সে ভালো মতোই আছে। তার সঙ্গে আপনার কথা বলার প্রয়োজন দেখছি না।’

‘না না, কোনো প্রয়োজন নাই। সে থাকবে তার মতো। আমি থাকব আমার মতো। আমার খুবই ভালো লাগছে যে আপনার আশ্রয়ে এসে দরিদ্র মানুষটার একটা গতি হয়ে গেল। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। আমরা উপলক্ষ মাত্র। জনাব, কেবলা কোনদিক? তিন ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়েছে। মাগরেবের ওয়াক্তও হয়ে গেছে।’

‘আপনি আপনার ঘরে যান। কেবলা কোনদিকে তা আপনাকে দেখিয়ে দেবে জায়নামাজ এনে দেবে।’

‘জায়নামাজ আমার সঙ্গেই থাকে জনাব। জায়নামাজ আর কোরান শরিফ এই দু’টা জিনিস ছাড়া আমি ঘর থেকে বের হই না। ছোটবেলার অভ্যাস।’

মাহতাব উদ্দিন বসার ঘর থেকে বের হলেন। এখন সন্ধ্যা হয়হয়। বাসায় যখন থাকেন সন্ধ্যাবেলা ছাদে হাঁটাহাঁটি করেন। সূর্যাস্ত দেখেন। গ্রামে সূর্যাস্ত দেখার একরকম আনন্দ। শহরে দালানকোঠার ঘরে খলিলুল্লাহকে নিয়ে আসা হয়েছে। এই ঘরটিও তালাবদ্ধ। তাতে খলিলুল্লাহর কোনো সমস্যা হচ্ছে না। সে নিজের মনেই আছে। এই ঘরটা বেশ বড়। ঘরের মেঝেতে পাটি বিছানো। পাটিভর্তি হাজারো খুঁটিনাটি যন্ত্রপাতি। দু’টা কম্পিউটারের মাদারবোর্ড। একটা মনিটর। ইলেকট্রিকের তার। সোল্ডারিং গান। খলিলুল্লাহ যা যা চেয়েছে জালাল খাঁ সবই যোগাড় করে দিয়েছেন। তাকে নিয়ে ইলেকট্রনিক্সের দোকানে ছেড়ে দিয়েছেন। সে যা যা চেয়েছে সবই তাকে দেয়া হয়েছে। প্রায় পাঁচ কেজি ওজনের একটা মোমের টুকরার উপর জিনিসগুলি বসেছে। মোমের টুকরাটি মনে হয় মূল বেস। প্রতিদিন তাকে প্রচুর বরফ দিতে হচ্ছে। বরফ কী জন্যে লাগছে কে জানে। বরফের আপাতত কোনো ব্যবহার দেখা যাচ্ছে না।

মাহতাব উদ্দিন খলিলুল্লাহর ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। জানালায় টোকা দিয়ে বললেন, ‘কেমন আছ খলিলুল্লাহ?’

খলিলুল্লাহ মুখ তুলল না। কাজ করতে করতেই বলল, ‘ভালো আছি।’

‘যন্ত্র তৈরি হচ্ছে?’

‘জি।’

‘এই যন্ত্রে অতীতের কথা শোনা যাবে?’

‘জি। শুধু কথা শোনা যাবে না। ছবিও দেখা যাবে।’

‘বলো কি! ছবিও দেখা যাবে?’

‘জি। যন্ত্রটা এই ঘরে ফিট করা হয়েছে, কাজেই এই ঘরে পনেরো বিশ কুড়ি বছর আগে কী হয়েছিল সেটা দেখা যাবে।’

‘এমন যন্ত্র সত্যি তৈরি হবে?’

‘জি হবে। হবে না, হয়েছে। আমি পরীক্ষাও করেছি।’

মাহতাব উদ্দিন আগ্রহের সঙ্গে বললেন, ‘পরীক্ষায় কী দেখলে?’

‘দেখলাম এই ঘরে একজন মহিলাকে তালাবদ্ধ করে রাখা হতো। মহিলার চোখ নীল।’

‘তাই দেখলে?’

‘জি।’

‘খুব ভালো যন্ত্র। পুরোপুরি তৈরি হোক, তারপর আমাকে খবর দিও। আমি এসে দেখে যাব।’

‘জি আচ্ছা।’

‘অন্ধকারে কাজ করছ কীভাবে?’

‘আমার অসুবিধা হয় না।’

‘অসুবিধা না হলে তো ভালোই।’

মাহতাব উদ্দিন আবার হাঁটতে শুরু করলেন। পুরোপুরি অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত তিনি ছাদের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত হাঁটলেন। এশার নামাজের আযানের পর তিনি নিচে নামলেন। আজ সারা দিন টুনটুনির সঙ্গে দেখা হয়নি, মেয়েটির সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। বারেক খবর দিয়েছে টুনটুনির জ্বর। চারদিকে ভাইরাস ফিভার হচ্ছে। টুনটুনিকেও কোনো একটা ভাইরাসে ধরেছে কিনা কে জানে।

টুনটুনি ঘর অন্ধকার করে গুপেছিল। মাহতাব উদ্দিন ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালালেন। টুনটুনি চাদর গায়ে বিছানায় শুয়ে আছে। তার চোখ লাল। মাহতাব উদ্দিন বললেন, ‘জ্বর কি খুব বেশি?’

টুনটুনি বাবার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, ‘বাবা, তুমি আমাকে অরণ্যের সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছ না কেন? তাকে নিয়ে ছাদের চিলেকোঠায় আটকে রেখেছ। আমাকে কেউ ছাদে যেতে দিচ্ছে না।’

মাহতাব সাহেব বললেন, ‘খলিলুল্লাহ তোর জন্যে কী একটা যন্ত্র বানাচ্ছে। যন্ত্রটা পেয়ে তুই খুব সারপ্রাইজড হবি। সেই সারপ্রাইজটা যেন নষ্ট না হয় সে জন্যেই তোকে যেতে দিচ্ছি না।’

‘যন্ত্রটা দিয়ে কী হয়?’

কী হয় আগে বললে তো সারপ্রাইজ থাকবে না।

টুনটুনি বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, ‘বাবা, মানুষকে তালাবদ্ধ করে রাখতে তুমি খুব মজা পাও— তাই না?’

‘তার মানে?’

‘চিলেকোঠার ঐ ঘরে তো তুমি আমার মাকেও তালাবদ্ধ করে রাখতে।’

মাহতাব সাহেব শান্ত গলায় বললেন, ‘টুনটুনি, তোমাকে আমি বলেছি

তোমার মা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাকে ভালোবাস্ত করে রাখা ছাড়া আমার দ্বিতীয় পথ ছিল না।’

টুনটুনি তাকিয়ে আছে। তার চোখ রক্তাভ।

মাহতাব সাহেব বললেন, ‘এভাবে তাকিয়ে আছ কেন? আর কিছু বলতে চাও?’

টুনটুনি বলল, ‘না।’

রাত একটা।

মাহতাব উদ্দিন তাঁর ঘরে বসে আছেন। তাঁর সামনে মাথা নিচু করে বারেক দাঁড়িয়ে আছে। মাহতাব সাহেব বললেন, ‘হাবীবুর রহমান সাহেবকে কাল ভালো ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা করবে।’

বারেক বলল, ‘জি করব।’

মাহতাব উদ্দিন সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে শান্ত গলায় বললেন, ‘খলিলুল্লাহর একটা ব্যবস্থা আজ রাতেই করতে হবে। কী ব্যবস্থা বুঝতে পারছ?’

‘পারছি।’

‘আর যাই করো তাকে পানিতে ফেলবে না। পানিতে ফেলে কিছু করা যাবে না। এ অন্য জিনিস।’

বারেক চাপা গলায় বলল, ‘স্যার এই বিষয় নিয়ে আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না। আমাদের ইটের ভাটা আছে।’

‘ঠিক আছে, এখন যাও।’

রাত দু’টা কুড়ি মিনিটে খলিলুল্লাহকে হাত-পা বেঁধে ইটের ভাটায় ফেলে দেয়া হলো।

রাত দু’টা পঁচিশ মিনিটে টুনটুনির জ্বর খুব বাড়ল। গা দিয়ে রীতিমতো আগুন বের হচ্ছে। মাহতাব উদ্দিন মেয়েকে বাথটাবে গুইয়ে দিয়ে নিজেই গাড়ি নিয়ে ডাক্তার আনতে ছুটে গেলেন। জ্বরের ঘোরে টুনটুনি পানির নিচে চলে গিয়েছে। তখন খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার হলো। টুনটুনি লক্ষ করল সে পানির নিচে ডুবে থাকতে পারছে, তার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। সে একসঙ্গে অসংখ্য নারী পুরুষের গলা শুনছে। সবাই বলছে, ‘টুনটুনি— দ্বিতীয় মানব সম্প্রদায়ের জগতে স্বাগতম। তুমি এখন আমাদের একজন।’

